যৌবনে বিদ্যাসাগর

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবতী দেবী

১৮৪৭ সালের সংস্কৃত কলেজ
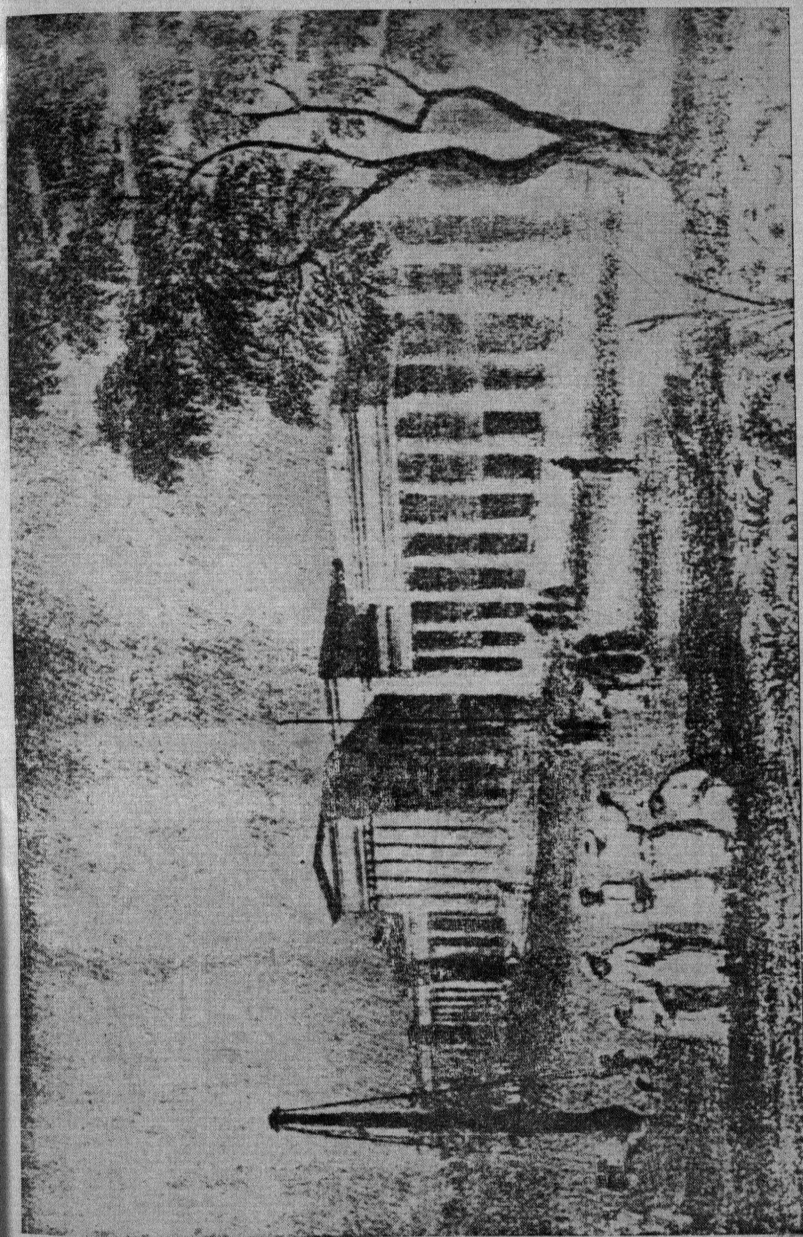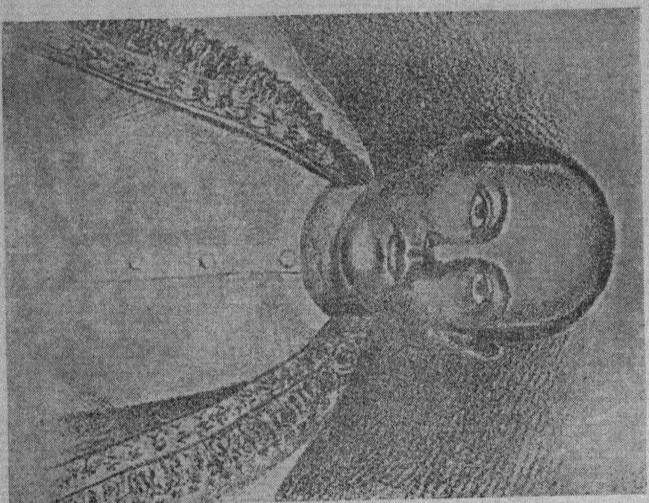
প্রথম বিধবাবিবাহকারী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

জয়নারায়ন তর্কপঞ্চানন।

# বিদ্যাসাগর

# বিদ্যাসাগর

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ণিক রায়

সম্পাদিত

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭,

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্সের পক্ষে সঞ্জীব চক্রবর্তী কর্তৃক ২৫/২৬ কলেজ স্ট্রীট
মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং স্টার প্রিণ্টিং
প্রেস-এর পক্ষে জয়দেব পাল কর্তৃক ২১/এ রাধানাথ
বোস লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে
মুদ্রিত

## প্রকাশকের নিবেদন

যদিও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত 'বিদ্যাসাগর' জীবনীগ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ বাজারে সুলভ, তবুও আমরা এই গ্রন্থটিরই নতুন একটি সংস্করণ বের করতে প্রয়াসী হয়েছি বিভিন্ন কারণে। এই জীবনীগ্রন্থটির মধ্যে দু-তিনটি তথ্যপ্রমাদ আছে, সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি লেখা হয়েছিলো ঊনবিংশ শতাব্দের শেষে, চণ্ডীচরণ তখনকার কালের প্রগতিবাদী মন নিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবন আলোচনা করেছিলেন। তারপর বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে জীবনের বহু দিক আলোকপাত করেছেন অনেকে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখবার আগ্রহও লক্ষণীয়। এবং বিদ্যাসাগরকে ঊনবিংশ শতকের সমাজ ও পরিবেশে স্থাপিত করে না দেখার ফলে অনেকে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন; এবং একালের দৃষ্টি বিদ্যাসাগরের ওপর ফেলবার জন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে নি, তাই অনেক মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের প্রকৃত জীবনধারণার বিপরীত ও বিরোধী। এই সব ত্রুটিমোচনের জন্যেই বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করছি। সম্পাদনা করেছেন বার্ণিক রায়, সম্পাদনাকে যথাযথ করবার জন্যে দীর্ঘ সময় লেগেছে; এ যাবৎ বিদ্যাসাগরসম্বন্ধে আবিষ্কৃত সমস্ত তথ্য ও আলোচনাই বার্ণিক রায় তাঁর সম্পাদনায় কাজে লাগিয়েছেন। গ্রন্থটির শেষে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণসমন্বিত বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জি ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা ও পরিবেশে বিদ্যাসাগরকে বুঝতে সাহায্য করবে বলে আশা করি। এতো ঘটনাসম্বলিত বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ জীবনপঞ্জি আর কখনো প্রকাশিত হয় নি। আগামী বছর, ১৯৯১ জুলাই ২৯. বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শতবর্ষ। এই শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিশেবে এই সুসম্পাদিত বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থটি দেশবাসীর কাছে অর্পণ করে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। অনবধানতাবশত কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ও ঘটনাবিন্যাসের অসংলগ্নতার জন্য আমরা দুঃখিত। বিনীত

সঞ্জীব চক্রবর্তী

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে-জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশদিশ ভরে,
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

—মধুসূদন দত্ত

২

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্র রুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি!
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি।
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি

সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ ভাদ্র, ১৩৪৫

৩

কোন্ বেদনায় তুমি মানুষকে ভালোবেসেছিলে,
সে কোন্ মানুষ? তাকে তুমি সত্যি পেয়েছো জীবনে?
নাকি স্বপ্নে দেখেছিলে? তারি খোঁজে জীবন কেটেছে;
রক্তাক্ত হৃদয় আর দুচোখে কান্নার জল ভাসে;
কখনো কোথাও শান্তি পাও নি, হেঁটেছো দিনরাত্রি;
খুঁজেছো তোমার ধ্যান, যে-ধ্যানে দেবতা বিশ্বে নেই,
মানুষ ও মানুষের ভালোবাসা, দীপ্ত হাসি,
তোমার মনীষা কর্ম জাগিয়ে রেখেছে সারাক্ষণ।
হয়তো গভীরে আরো কোনো প্রেমময়ী ভালোবাসা
তোমার হৃদয়ে দেবী আলোকিত পদ্মের মতন
জগতের নারীদের মুখে জেগে উঠেছিলো,
সেই অদিতির হাসি তোমার সকল কষ্ট দুঃখ
ভুলিয়ে রেখেছে, শান্তি এনেছে সেবায় দয়া দানে,
তাকে বুকে নিয়ে শুধু জেনেছো মানুষ,তার নাম ভালোবাসা।

—বার্ণিক রায়

## নিবেদন

## বিদ্যাসাগর ও কিছু অপ্রিয় কথা

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের আলোচনায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাংলাদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ কখনো ঘটে নি ; রেনেসাঁস যে-অর্থে ইতালিতে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে মুক্তি ও স্বাধীনতা এনেছিলো, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতায় জাতির ও দেশের ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য কখনো আসে নি বাংলাদেশে। ইতালির রেনেসাঁসের সময়ও নানাবিধ বিরোধ ছিলো, কিন্তু ইংরেজের সৃষ্ট সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও বুর্জোয়া মনোভাবের জগাখিচুড়ি সংমিশ্রণে, সেই সঙ্গে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শোষণে, বাঙালির মনের মধ্যে জীবনে, আচরণে, চর্যায়, ব্যবহারে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে সদ্যোজাত সংস্কৃতির মধ্যে স্বভাবের বিরোধ প্রচণ্ড। ইয়ংবেঙ্গল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালির প্রতিনিধি বিরোধে ও স্বার্থান্বেষণে ; 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ও পুলিশি ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার ছিলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে উচ্চকণ্ঠে তিনি বিদ্রোহী ; উদারনীতিক মতবাদে বিশ্বাসী, যৌবনের উন্মাদনায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের তরুণী বিধবা বসন্তকুমারীকে নিয়ে এসে রেজিস্ট্রিম্যারেজ করেন, অসবর্ণ এই বিবাহ ; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত হবার বহু পূর্বেই এই বিয়ে হয় ; পরে লখ্‌নৌতে গিয়ে ইংরেজবিরোধিতা জলাঞ্জলি দিয়ে সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজসরকারকে নানাভাবে সহায়তা করেন, পুরস্কারস্বরূপ তালুকদারি ও 'রাজা' উপাধিলাভ। অথচ বেথুনকে স্ত্রীশিক্ষার জন্যে জমি দান করেন, লখ্‌নৌ-এ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, 'লখ্‌নৌ টাইমস' 'সমাচার হিন্দুস্থানী' 'ভারতপত্রিকা' প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। উদারনীতিক রামমোহন 'ডেসপট'দের দেওয়া 'রাজা' উপাধি পেয়ে তাদের জন্যে বিলেতে উমেদারি করতে যান। ব্যবসায় ও জমিদারিতে প্রচুর অর্থ অর্জন করে ইংলণ্ডে বিলাসে ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' বলে খ্যাত হন ; কেননা তাঁর প্রভূত অর্থ শিল্পে বা ব্যবসায় নিয়োগ করবার উপায় ছিলো না, নেটিভ বলে চা-বাগান পর্যন্ত কিনতে পারেন নি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। এই বিরোধিতা শিক্ষিত বাঙালির অন্তর্মূলে।

ইংরেজি শিক্ষাজাত পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বচ্ছ যুক্তি ও বুদ্ধি আমাদের জাতীয় জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে নি ; উকিলের স্বভাবজাত ধূর্ততার সঙ্গে পুলিশের চৌর্য রক্তের মধ্যে শয়তানি এনে দিয়েছে ; তাই কোনো প্রচেষ্টাই

স্বচ্ছ ও স্বাভাবিকতার পথ ধরে নি। সমাজ রাষ্ট্র ও অর্থনীতির মধ্যেই এই বিরোধ ঃ রবীন্দ্রনাথ পেশায় ও জীবিকায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ; শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিচর্চায় বুর্জোয়া, বুর্জোয়া লিবর‍্যাল-ধর্মের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ; কবিধর্মে মনুষ্যত্বে ও মানবধর্মে আস্থাবান ; এই বিভিন্ন বিরোধী উপাদান কদাচিৎ সুসমন্বিত হতে পেরেছে বলেই শিল্পের ফর্মে নানাবিধ ত্রুটি ও বিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধের ধারা বেয়েই কম্যুনিস্ট আন্দোলন আসবার জন্যে এর মধ্যেও মার্কসীয় জীবনবোধের স্বচ্ছতা আবিল অনুন্নত দেশে এবং ওপর থেকে চাপানো। যারা বাংলায় রেনেসাঁস ঘটেছে বলে, তাদের অধিকাংশই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা ও সুযোগভোগী, ব্যবসায় ও দেওয়ানিগিরিতে ইংরেজের সংস্রবে ঘনিষ্ঠ, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, ব্রিটিশ মতবাদে দীক্ষিত, ব্রিটিশ ব্যবসায়ের দালালগোষ্ঠী। ইংরেজিশিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ; মেকলের ইচ্ছার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াই সক্রিয় ঃ 'পশ্চিম য়ুরোপের ভাষাই রাশিয়াকে সভ্য করে তুলেছে, ঠিক সে রকমই ভারতবাসীকে করে তুলতে হবে, তাদের মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজি ভাষাতেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে।' আঠারশ পঁয়ত্রিশের দোসরা ফেব্রুয়ারি মেকলে বলেছিলেন এসব তাঁর মিনিটে। আঠারশ তিপান্ন সালে 'হাউস অব কমনসের কমিটি'র সামনে পরে হ্যালিডে বলেছিলেন ঃ 'আমি বিশ্বাস করি ভারতে আমাদের উদ্দেশ্য ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলা তাদের নিজেদের শাসন করবার জন্যেই।' এই চাপিয়ে-দেওয়া ভাষা শিক্ষা ও সভ্যতা ইতালির রেনেসাঁসে অভূতপূর্ব।

জমি থেকেই ইতালির শহরের মানুষ ও তাদের পরিবার উঠে এসেছিলো ; ইতালির শহরের মানুষ তাদের জমির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলো কদাচিৎ। সচরাচর দেখা যেতো যে ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কমালিক তাদের লাভের কিছু অংশ তাদের পরিবারের কৃষিকাজে বিনিয়োগ করছে এবং গ্রামের অভিজাতেরা সারা বছর শহরে কাটাতো না। ইতালির শহরের অভিজাতবৃন্দ ব্যবসায়ী মহাজন দক্ষ কারিগরেরা পাশাপাশি বাস করতো, একই সেনাবিভাগে কাজ করতো, পরস্পরের পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ হতো বিবাহসূত্রে। সমাজে ক্রমোচ্চ শ্রেণী-বিন্যাস বা 'হাইঅ্যারকি' ছিলো ঠিকই, কিন্তু সমাজব্যবস্থা জটিল সম্পর্কে নানাভাবে জড়িয়েছিলো, অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে ভেদ ছিলো না। ভূম্যধিকারী ও বিত্তবান ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো নানা উপায়ে। যখন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন নাগরিক আনুগত্য ও রাজনৈতিক ক্রিয়াপদ্ধতি শহরের মানুষকে গোষ্ঠিবদ্ধ করেছে। সার্বভৌমত্ব সর্বদা সক্রিয় ছিলো রাজনৈতিক ক্রিয়া ও কর্মে। পার্লামেণ্টে সাধারণ সভায় জরুরি অবস্থার সময় এই রাজনৈতিক চেতনা তীব্রতা পেতো।

গ্যুয়েল্‌ফস ও গিবেলিন্‌স্‌-এর মধ্যে বিরোধ ছিলো ঠিকই, মারামারিও হতো প্রায়শ তাদের মধ্যে, কিন্তু এটা হতো শক্তি ও অর্থের অসম বণ্টনের জন্যে ; এই অসমতার সঙ্গে সামন্তপ্রভুদের উস্কানি ও দাঙ্গা বাধাবার প্ররোচনা কাজ করতো। সামন্ততান্ত্রিক আর্থসমাজ ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদ ও নাগরিক সমাজ গড়ে উঠছিলো। সন্ধিক্ষণকে তৈরি করে দিচ্ছিলো সমাজব্যবস্থা ও সমাজসম্পর্ক। নগরের মধ্যে ব্যবসায়ী পুঁজিবাদ বা মার্চেণ্ট ক্যাপিটালিজম, স্বাধীন নাগরিক রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো ইতালিতে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাই তাদের প্রেরণা জোগাতো, 'ডেসপট'দের পৃষ্ঠপোষকতা নয়। আর্মান্দো সাপোরির ভাষায় ইতালির রেনেসাঁস প্রকৃত-পক্ষে ঘটেছিলো ক্রুসেডের সাহায্যে ইস্‌লামের অধিকার থেকে ভূমধ্যসাগরের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ইসলামীয় সভ্যতা ও রাজনীতির বিরুদ্ধেই গড়ে উঠেছিলো নাগরিক সভ্যতা ও শহরের কেন্দ্র।

এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে গড়ে-ওঠা বাঙালির মানসিকতার কোনো যোগ নেই। এদেশে লিব্‌রলপন্থী কিছু কিছু শাসক এসেছেন, ইংলণ্ডের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার মতো ভারতেও মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাপ্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা, কিন্তু এই শিক্ষা ওপর থেকে নীচে চুঁইয়ে পড়বার মতো, তাই এই শিক্ষা ব্যর্থ ও পীড়াদায়ক হয়েছে। ১৮১৪ সালে মিঃ মে চুঁচড়োয় ছত্রিশটি স্কুল খুলেছিলেন, ছাত্র ছিলো আট হাজার। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বর্ধমানে মাতৃভাষায় অনেক স্কুল খুলেছিলেন, তার ছাত্রসংখ্যা ছিলো এক হাজার। এই নতুন শিক্ষার সুবিধে লাভ করেছিলো অসহিষ্ণু ব্রাহ্মণেরা। ১৮১৭ সালে মাতৃভাষায় শিক্ষা আরো বেশি প্রবর্তিত হয়েছিলো। শ্রীরামপুরের নর্মাল স্কুলও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। (এর পরে ১৮৩৫ ও ৩৮ সালে উইলিয়াম অ্যাডামের মাতৃভাষায় জনশিক্ষার জন্যে পরামর্শ, পরে ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় একশ একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।) গুরুমশায়ের টোলের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় ছিলো তখন। জেলার শহরে প্রথমে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ; মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা উন্নতি লাভ করে, তারপরে শিক্ষার সংস্কার নামে গ্রামীণ মাতৃভাষার স্কুলে, এবং এর সুযোগ দরিদ্র চাষিদের মধ্যে আসবে, এরা শিক্ষার সঙ্গে একেবারেই যুক্ত ছিলো না। এই শিক্ষায় শ্রেণীস্বার্থের সংঘর্ষ ঘটায় এবং তা ঘটেছে বাংলার শিক্ষিত জমিদারদের জন্যে। অসংখ্য জনগণই দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি, তাদের মধ্যে শিক্ষা চারিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি গ্রামের বিদ্যালয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবে, প্রতিটি চাষি পড়তে ও লিখতে পারবে মাতৃভাষায়। আলোকিত শিক্ষার নীতি (enlightened educational policy) আক্ষরিক ও আত্মিক রূপে সম্পূর্ণ হবে। 'দ্য ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া' ১৮৬৮, ২৩ সেপ্টেম্বর এ-সব কথা

বলে। এবং ইংরেজের পক্ষে স্বীকার করা হয়, বাংলার চাষিসম্প্রদায়ের চরম অজ্ঞতা অবমাননাকর ; কেননা শিক্ষানীতি ১৮৬৮ সালেও ঠিক পথে চালিত হয় নি। এই তথ্যের মধ্যেই প্রকাশ শিক্ষার মধ্যে শ্রেণীবিরোধ ও সংঘর্ষ অন্তর্নিহিত। গ্রামের স্কুলের মাতৃভাষায় একরকম শিক্ষা ; জেলা-শহরে ও কলকাতা শহরে ইংরেজি ভাষায় মেকলের ও হ্যালিডের অভীপ্সিত শিক্ষা —এবং এই শিক্ষার ধারা অতীব দুঃখজনক, উনিশ শ নব্বুইসালেও একইভাবে চালু। কলকাতার জন্মের তিনশ বছর পূর্তির উল্লাসে যেমন ঔপনিবেশিক পরাধীনতার মনোভাব প্রকট, তেমনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারা সমানভাবে বয়ে চলেছে আজও।

দ্বিতীয়ত, অজ্ঞ রায়ত বা চাষিদের শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে ইংরেজেরই চেষ্টায়, কিন্তু কোনো চাষি সাড়া দেয় নি, এতে চাষির দায়িত্ব নেই ; কারণ তার খেতেই পয়সা জোটে না, উৎপন্ন শস্য জমিদার ও তার অনুচরেরা এবং মহাজনেরা কেড়ে নিয়ে পেটে শুকিয়ে রাখে সারা বছর, সেখানে ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পড়াতে পাঠাবে ভাবতেও অবাক লাগে। এখনো কি গাঁয়ের চাষির ছেলেমেয়েরা পড়বার সুযোগ পায় স্কুলে ? খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা কি চুকেছে ? শিক্ষা অবৈতনিক হয়েছে, কিন্তু বাধ্যতামূলক হয় নি। প্রথমে লোভে পড়ে চাষির ও মজুরের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ঢোকে, তারপর ছেড়ে দেয়, লাঙল ধরে, নয় রাজনৈতিক মাস্তানি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর যখন মন্তব্য করেছিলেন, সমগ্র জনসাধারণের শিক্ষা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় কিন্তু এই দায়িত্ব কোনো সরকার গ্রহণ করতে বা পূর্ণ করতে পারে কিনা সন্দেহজনক, তখন বিদ্যাসাগরকে বাস্তববাদী বলেই মনে হয়, জনবিরোধী কখনোই নয়।

১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম মাতৃভাষায় জাতীয় জনশিক্ষার যে-রিপোর্ট দেন, তাতেও উচ্চমধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের, শহর ও গ্রামের মধ্যে শ্রেণীগত শিক্ষার ফারাক রয়ে গেছে। ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জের নির্দেশ অনুসারে একশ একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ; এই বঙ্গবিদ্যালয়ের আদর্শেই, আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগরের জনশিক্ষামূলক মডেল স্কুলের জনশিক্ষা প্রবর্তিত। ঠিকই, বিদ্যাসাগরের জনশিক্ষানীতিতে শ্রেণীবিরোধের বীজ নষ্ট হয় নি, কিন্তু শ্রেণী-স্বার্থহীন শিক্ষার প্রচার কি ব্রিটিশশাসনে সম্ভব ছিলো ?

মুসলমান বুদ্ধিজীবী, যিনি নিজেও বই-বেচার ব্যাবসাজাত পয়সায় খেয়ে-পরে থাকেন, বিদ্যাসাগরকে শ্রেণী-স্বার্থে আবদ্ধ বলেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'ও কিছু লেখেন নি বলে বিদ্যাসাগরকে এ-ব্যাপারে উদাসীন এবং ঘুরিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন। বিদ্যাসাগর বর্ণের দিক থেকে উচ্চ ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীর দিক থেকে কোনো শ্রেণীতেই বদ্ধ ছিলেন না ; মধুসূদনের ভাষায় 'দীন', 'দীন যে দীনের বন্ধু'।

দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। কোনো জাতীয়তাবাদী নেতাও কি সে-কথা ঘোষণা করেছিলেন! হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়সম্বন্ধে প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়,কেননা নীলচাষের বিরুদ্ধে লখতে গিয়ে চাষিদের দুঃখদুর্দশা ও ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি দক্ষ ইংরেজি ভাষায় অগ্ন্যুচ্ছ্বাস উদ্‌গার করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদের বিষয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন! ১৮৬২ সালের ৮ ডিসেম্বর হরিশের মৃত্যুতে 'দ্য হিন্দু প্যাট্রিঅ্যাট' লিখেছিলো ঃ 'তিনি জমিদার ও রায়ত উভয়কেই চালিত করেছিলেন। তিনি উভয়েরই পরম বন্ধু ছিলেন।' যিনি জমিদারদের বন্ধু, তিনি কীভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন, এই অমিল ধাতুর সমন্বয় মুসলমান বুদ্ধিজীবীই করতে পারেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আঠার শ সাতাশি সালে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রথমে উচ্চারণ করেছিলেন, পরে সরবে সোচ্চারে সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ ঘোষ। ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণ উদ্‌ঘাটিত করে এমনকি রমেশ দত্তও নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতের ত্রস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরম বিপদকে দূর করবার জন্যে উপায় বের করতে, যাতে পার্টির্দ্বন্দ্ব ঠাণ্ডা হয়, কেননা প্রতিটি ইংরেজ ও ভারতবাসী ব্রিটিশশাসনে যারা অভিজ্ঞ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত তারা সকলেই অনুভব করে বিপদ দূর করবার উপায়ের জন্যে। বিদ্যাসাগর নিজের কর্মের পরিধি ও সীমাসরহদ্দ জানতেন,তার বাইরে কিছু করতে পারবেন না বলে অবহিত ছিলেন বলেই ওই পথে এগোন নি, কিছু বলেন নি। কিন্তু তিনি যে জমিদারদের সম্বন্ধে কীরকম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দেশে উক্তিটিই তার নজির ঃ 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' বিদ্যাসাগর উগ্র ব্যক্তিত্বের মানুষ, স্ববিরোধিতা ও আপোশ তাঁর মধ্যে নেই, 'দ্য হিন্দু প্যাট্রিঅ্যাট' পত্রিকার লেখাসম্বন্ধে তাঁর মনে আপত্তি থাকলে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন অনায়াসেই, সুতরাং হরিশের লেখায় তাঁর অনুমোদন ছিলো। ইংরেজ-অনুসৃত রীতিতেই তিনি দেশের সমস্ত শ্রেণীর ও স্তরের মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন ; এই জাগরণ ঘটলে, দেশের পরাধীনতা কেন, যে-কোনো বন্ধনের মুক্তি ঘটবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিলো।

বিদ্যাসাগর ব্যবসায়ী ছিলেন—এই উক্তি প্রথম করেন এক ছদ্ম কম্যুনিস্ট, যিনি বিভ্রান্ত মদ্যপ সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে, তাই তাঁর সমাজতত্ত্বের চিন্তাও উদ্‌ভ্রান্ত,মার্কসীয় তত্ত্বের ও অর্থনৈতিক জ্ঞানও বিকল — এই ভ্রান্ত জ্ঞানকেই পা-ফাঁক করে সিগারেট-ফুঁকে নতুন কিছু করবার মতো মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও পশ্চিমবঙ্গের উচ্চিংড়ে বুদ্ধিজীবীরা 'বিদ্যাসাগর

ব্যবসায়ী' স্লোগানের প্রতিধ্বনি করে। অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী (ট্রেডার, বিজনেসম্যান) বলে তাকে যে লাভের উদ্দেশ্যে পণ্যের কেনাবেচা করে অর্থের বিনিময়ে, বৃত্তির বিপরীত এটি। বিদ্যাসাগর মেধা থেকে জাত লেখাকে কী পণ্য করে কেনাবেচা করেছিলেন, কেনাবেচার লাভকে কি পুঁজি করে সম্পদ বাড়িয়েছিলেন? লাভের জন্যে বিদ্যাসাগর বই ছাপিয়ে বেচেছিলেন এবং সেই লাভ নিজের স্বার্থেই বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি, এমন কোনো তথ্য নেই আমাদের। ব্যবসায়ীরা শাদা দেয়ালে সিঁদুর-তেলে 'শুভ লাভ' লিখে তাকে পুজো করে, বিদ্যাসাগর কি সেরকম 'শুভ লাভে'র পুজো করেছিলেন জীবনে? এতো বড়ো মার্কস্‌তত্ত্ববিদেরা মিল্টনসম্বন্ধে মার্কসের কথা বোধ হয় পড়েই নি, পাছে মডেল নষ্ট হয়: 'মিল্টন পাঁচ পাউণ্ডের জন্যে 'প্যারা-ডাইজ লস্ট' লিখেছিলেন, তিনি উৎপাদনবিহীন শ্রমিক। অপরদিকে যে-লেখক তার লিখিত বস্তুকে প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দেয় কারখানার নিয়মে সে লেখক উৎপাদনশীল শ্রমিক। যে-রীতিতে রেশমপোকা রেশম উৎপাদন করে মিল্টনও সেই রীতিতে 'প্যারাডাইজ লস্ট' সৃষ্টি করেছেন। এটা তাঁর স্বভা-বের ক্রিয়া।' অর্থাৎ পুঁজি-উৎপাদানে সহায়তা করে নি 'প্যারাডাইজ লস্ট'।

১৮৫৩, ২২ জুলাই মার্কস বলেছিলেন ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ড দুটো উদ্দেশ্য সাধন করবে: একটি ধ্বংসমূলক, অন্যটি সৃষ্টিমূলক — পুরনো এশীয় সমাজের বিনাশ এবং এশিয়ায় পশ্চিমী সমাজের বস্তুগত ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। পুরনো সমাজ ধ্বংস করেছে ঠিকই ব্রিটিশ, কিন্তু পশ্চিমী সমাজের বস্তুগত ভিত্তি গড়ে ওঠে নি ভারতে। ভারতে ব্রিটিশশাসনে রাজনৈতিক ঐক্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রজার মনের ঐক্য নষ্ট হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে। ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, স্বাধীন সংবাদপত্র, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারিপ্রথা থেকে ইংরেজি শিক্ষিত নতুন গোষ্ঠীর আবির্ভাব, রেলোয়ের প্রবর্তন, কৃষিতে জলসেচ এবং এমনকি চাষিকে শিক্ষিত করে তোলবার ইচ্ছা—এ সকলের মধ্যে ইংরেজের স্বার্থই নিহিত, যাতে ব্যাবসা ভালো চলে, কাঁচা মাল ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করা যায়, সংবাদ পাঠানো যায় দ্রুত স্থানান্তরে, রাজ্যবিস্তারে ও শাসন কায়েম করবার জন্যে দূর দূরান্তে সৈন্য পাঠানো যায় সত্বর, জমিদার থেকে উঠে-আসা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বশংবদ দাসের মতো ব্রিটিশশাসনকে দৃঢ় করবার জন্যে তাদের জমিদারিতে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব দমন করতে পারবে, চাষি কিছু লেখাপড়া শিখলে চাষ আরো উন্নত হলে কাঁচামাল রপ্তানি বাড়বে—এই সব স্বার্থ মনে রেখেই ঐ সকল প্রচেষ্টা। কিন্তু রেলোয়ে স্থাপনের জন্যে ইংরেজ পুঁজি বিনিয়োগ হলেও চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয়েরা পাঁচ শতাংশ সুদ দিতে বাধ্য ছিলো সরকারের মারফত, দেশের অর্থশোষণ রেলোয়ের মাধ্যমেও হয়েছে। মার্কস আশা করেছিলেন রেলোয়ে ব্যবস্থা ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত হবে, অর্থাৎ কয়লা, লোহা,

যন্ত্রপাতিগড়া, রেলোয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য শিল্প গড়ে উঠবে—কিন্তু এর কোনোটাই হয় নি। শিল্প গড়ে উঠলে শ্রমের বংশানুগত বিভাজন চলে যাবে। কেননা শ্রমের বংশানুক্রমিক বিভাগের ওপর জাতিভেদ প্রথা, এই জাতিভেদ-প্রথার জন্যেই ভারতীয় প্রগতি ও শক্তির সুনিশ্চিত বাধা। ১৮৫৩, ১০ জুন 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন' প্রবন্ধের শেষে মার্কস যে-প্রশ্নটি করেছিলেন, সমাজের অর্থনীতি ও চিন্তা পাল্টাবার মূল সূত্র সেটিই: 'মৌল বিপ্লব ছাড়া এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মানবজাতি কি তার ভবিতব্য সম্পূর্ণ করতে পারবে?' এই 'মৌল বিপ্লব' এখনো ঘটে নি।

বংশানুক্রমিক বৃত্তির কিছুটা হ্রাস হয়েছে ঠিকই; বিদ্যাসাগরের পিতৃদেব ঠাকুরদাস ব্রাহ্মণ হয়েও নিচুবর্ণের লোকের কাছে খাতা লেখার কাজ করেছিলেন, কিন্তু জাতির গভীর স্তরে নিহিত জাতিভেদপ্রথার মূল শিকড় নড়ে নি। রাম-মোহন সর্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ করতে পারেন নি, পশ্চিমীশিক্ষা ও ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা, লিবরলপন্থী নেতাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ও ভাববিনিময় তাঁর মূলকে একই জায়গায় রেখেছিলো; এদিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক সেই ধারাই দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথে। পশ্চিমী শিক্ষায় ও ইংরেজের সঙ্গে সহবাসে ও সহচর্যে, ব্যাবসার সংস্রবে, ইংরেজের কমপ্রাডোর গোষ্ঠীর উল্লম্ফনে সমাজে অর্থের সচলতা এসেছিলো, ব্যাবসার ও বিনিময়ের অর্থনীতির প্রাদুর্ভাব লক্ষণীয়, গড়ে উঠেছিলো শহরভিত্তিক কিছু আন্ত-র্জাতিকতা, শহরের সংকীর্ণ শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ প্রজা হিশেবে ব্রিটনদের সঙ্গে সমান অধিকারের বোধ ও তার বিরোধে প্রতিক্রিয়া, ব্রিটিশের অধীনে উদারনৈতিক মতবাদের প্রভাবে দেশের ধর্ম রাজনীতি শিক্ষা রাজস্ব স্বাধীনতা অর্থনীতি স্ত্রীশিক্ষা সামাজিক কুপ্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র উচ্ছ্বাস, ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণে দেশের দারিদ্র্যসম্বন্ধে সচেতনতা, ইংরেজের প্রশাসন ও বিচার-বিভাগীয় ব্যবস্থাসম্বন্ধে তীব্র ধিক্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ঔপনিবেশিক ও য়ুরোপীয় শোষণের প্রতিবাদ, স্বায়ত্ত শাসন ও নির্বাচন রীতির দাবি, কিছু কিছু জায়গায় রাজনৈতিক বিরোধিতা—এ সবই অনুকরণজাত লেখায়, সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষারূপে প্রকাশ পেয়েছে: কিন্তু এই ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ ছিলো না; বাস্তবে সকলেই ইংরেজপ্রভুর অধীন। এই বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা আজও দেখতে পাওয়া যায়, তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক সুন্দর ও মহান্ বাক্য উচ্চারিত হয় পরিকল্পনার খশড়ায়, বাস্তবে রূপায়িত হতে গিয়ে সব ব্যর্থ হয়। তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত ইংরেজের আমল থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি।

জাতীয়তা বোধের উন্মেষও হয়েছে জর্জ টমসন ও হিউমের মতো ইংরেজের

হাত ধরে, জমিদার ও ধনিকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলো ব্যবসায় ও অর্থোন্নতিতে বাধাপ্রাপ্ত হবার জন্যে; অধিকাংশ জায়গায় নিরাশ্রয় মধ্যপন্থী শিক্ষিতেরা এদেরই নীতির বাহন হয়ে বক্তৃতা করেছে সরবে এবং ইংরেজের আনুকূল্য লাভেও পেছপা হয় নি। এই কারণে কলকাতার পরেই গ্রামের সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক চেতনা এমনি-ভাবে দ্বিধাবিভক্ত। বাইরে থেকে-আসা অর্থনীতি ও রাজনীতি যেমন দেশের সার্বিক উন্নতি করতে পারে না, তেমনি যে-বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে শহরে ও গ্রামের মধ্যে, তার সামঞ্জস্যও গড়ে ওঠেনা। শহরের শিক্ষিত মানুষ যেমন বিচ্ছিন্ন সমস্ত দেশ থেকে, অজ্ঞ গ্রামও বঞ্চিত শহরের সফলতা থেকে, তাই গ্রাম ও গ্রামের মানুষ চির অন্ধকারে। শহরে এসে শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে, পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে বিদ্যাসাগরও গ্রাম ও সমাজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, কেননা গ্রামের সমাজ বিদ্যাসাগরকে বুঝতে পারতো না অজ্ঞতার জন্যে, বিদ্যাসাগরও কুঁচকে যেতেন তাদের হৃদয়ের অন্ধকারের জন্যে। দেশের সমাজ যদি অর্থনীতির অনুসরণে সমগ্রভাবে শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠতো, তাহলে এই বিরোধ কখনোই ঘটতো না। কিন্তু ওপর থেকে চাপানো শিক্ষা সকলকে গড়ে তুলতে পারেনা, এবং আজকেও এই ঔপনিবেশিক ধারারই প্রবর্তন দেখি সর্বত্র। বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশশাসনের ও শিক্ষার একটি প্রতিনিধি স্থানীয় উদাহরণ। এবং বাঙালি মানসের বিসদৃশ বিরোধী মনো-ভাবেরও। এই বিচ্ছিন্নতা এখনো বর্তমান জাতীয় শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় ত্রুটির জন্যে।

এই বিরোধ হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কেও। হিন্দু কথাটা এখন সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আসলে এটি একটি ভৌগোলিক নাম, সিন্ধু থেকে হিন্দু; সিন্ধু-উপত্যকায় গড়ে-ওঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামই হিন্দুসভ্যতা, অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথা গায়ত্রীমন্ত্রে উচ্চারিত, অতীত ভবিষ্যৎ ও পুরুষকারকে নিয়ে সমন্বিত 'ধর্ম' শব্দের ধারণায় এবং ঈশা উপনিষদের শ্লোকের বোধে: যিনি সমস্ত বস্তুকেই আত্মার মধ্যে দেখেন এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে আত্মাকে দেখতে পান, তিনি কাউকেও ঘৃণা করেন না। (যস্তু সর্বাণি ভূতন্যাত্মন্যেবানুপশ্যাতি সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে) এতে বাইরের কথা নেই, আছে অন্তর সাধনায় বিশ্বশক্তির সর্বজনীনতাকে লাভ করবার চেষ্টা, এবং চিরন্তন মানবতা। আরব মুসলমানেরা আসে সপ্তম শতাব্দে উত্তর ভারতে মহম্মদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্রাজ্যবাদিতাকে বুকে করে; গোঁড়ামি ও জঙ্গিমনোভাব, বিধর্মীকে পরাস্ত ও নমিত করবার উদ্দামতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, রসুল মহম্মদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার—অর্থাৎ

মহম্মদই একমাত্র শেষ ধর্মগুরু — সাম্রাজ্যলোভী 'ডেসপটে'র মনের ভেতরে ধর্মীয় উন্মাদনা শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করেছে রাজ্যবিস্তারে। মুসলমান শব্দটির মধ্যে শান্তি নিহিত, কিন্তু এটি নষ্ট হয়ে যায় বিধর্মীর ক্ষেত্রে। ধর্মের এই মৌল জঙ্গিমনোভাব মুসলমান রাজশক্তিকে পররাজ্য অধিকারে অদম্য করে তুলেছে। ইহুদি ধর্মেও মিসাইয়া বা ইহুদিদের প্রত্যাশিত মুক্তির আদর্শ অন্তর্গূঢ় ; আরব ও ইহুদিরা জাতির দিক থেকে সেমেটিক, যিশুর সেমেটিক আদর্শেও প্রথম দিকে ধর্মের অন্ধগোঁড়ামি ও তপশ্চর্যা ছিলো, কিন্তু ইহুদি ধর্মের গোঁড়ামি গ্রীক দর্শনের 'লোগোসে'র প্রভাবে দূর হয়ে যায়, সেমেটিক অন্ধবিশ্বাস যুক্তির বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত হয়, গ্রীক 'লোগোস' ঈশ্বর মানুষ ও পৃথিবীকে যুক্তিতে সমন্বিত করে। কিন্তু মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য বাইরের সংস্কারের, ভেতরকার সাধনার ধন নয় যুক্তি মননে বিশ্বাসে ও ইচ্ছায়। দুই সেমেটিক ধর্মের মৌল প্রভেদ আরবকে করেছে 'ডেসপট', ভোগী ও বিলাসী ; অন্যদিকে ইহুদিকে করেছে অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও আবিষ্কারক। মুসলমানের মধ্যে এই অনুসন্ধিৎসা ও দর্শনের সর্বজনীনতা কোথাও নেই। খ্রীস্ট ধর্মও সেমেটিক ও ইহুদি অন্ধবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ; কিন্তু গ্রীকদের দর্শনের প্রভাবে ও রোমীয়দের বিশ্বজনীন আইনের সংস্পর্শে সে তার সংকীর্ণতা অনায়াসে কাটাতে পেরেছে। ইস্লামের বিশুদ্ধতা এসব বাইরের বস্তুকে আমল দিতে চায় না। তাই ইরান ও ভারতবর্ষ সহজেই অন্তরশক্তিবিহীন শারীর বীর্য ও দম্ভের কাছে অবনমিত হয়েছে। ঋগ্বেদ যে-ঋত শক্তিকে বিশ্বাস করে, পারসিকও সেই একই 'অষ' বা ঋত-শক্তির অধিকারী, যে শক্তি বিশ্বের সমস্তকে একসূত্রে ধরে আছে ঃ অষম্ বোহু বহিশ্তম্ অস্তী / উশ্তা অস্তী উশ্তা অহ্মাই / হ্যৎ অষাই বহিশ্তাই অষম্। (যস্ন ২৮. ১২) অর্থাৎ ঋতই হচ্ছে সর্বোচ্চ শুভ, জীবনের দীপ্তি, এই দীপ্তি জীবনে আসে, এই দীপ্তিই ঋত, ঋতই সর্বোচ্চ ঋতের জন্যে ঃ যৎ ঋতায় বসিষ্ঠায় ঋতম্ ( হ্যৎ অষাই বহিশ্তাই অষম্) এই সর্বজনীন ঋতকে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আবেস্তা বুঝিয়েছে ঃ যো যয়োম্ কারয়েইতি হো অষম্ কারয়েইতি ( যঃ যবম্ কিরতি সঃ ঋতম্ কিরতি ) অর্থাৎ যে শস্য বোনে সে ঋতকেও বোনে। একথা ঋগ্বেদেরও ঃ তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুব ঋতাবরী রজসে ধারয়ৎকবী (১.১৬০.১) কিন্তু ইস্লামের প্রার্থনায় সকলকে যুক্ত করে এমন এক হবার মন্ত্র নেই, আছে শুধু ঈশ্বর ও মহম্মদের প্রতি বিশ্বাস ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা মুহম্মদ-উর্ রসুল-উল্লাহ্। এই কারণেই সাড়ে পাঁচশ বছর মুসলমান শাসনে হিন্দুর চেতনা যুক্তি ও মন জাগে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইংরেজের মধ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্বজনীন যুক্তি ও চেতনা নিহিত, কিন্তু মুসলমান অতীত প্রাচ্যের চিরপ্রথা ও বাঁধা মত দিয়ে আমাদের চিত্তকে আবদ্ধ করেছে ; সংখ্যা হিশেবে তারা রয়েছে দেশের

মধ্যে। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই, বিরোধে ও ব্যবধানে, দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করবে রাজনীতিকদের ভোটের লালসায় ইন্ধন দিয়ে। যে-বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান ব্রিটিশ রাজত্বে ছিলো হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যশক্তির প্রাতিষ্ঠায় লালন করেছিলো সুকৌশলে, সেই বিচ্ছিন্নতা ভারত-বিভাগের পরেও সংশোধিত হয় নি আইনে ও প্রশাসনে। তাই ভারতবর্ষে সকল ভারতবাসীর জন্যে একই ভারতীয় আইন প্রবর্তিত হয় নি, হিন্দু ও মুসলমানের আইন ভিন্ন।

মুসলমানেরা প্রথমে অভিমানে ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ করে নি, প্রশাসনে চাকুরি নিতে অনিচ্ছুক ছিলো, নবাবের জাত বলে অহংকারও ছিলো প্রচণ্ড। ইংরেজও তার প্রবর্তিত অর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থায় মুসলমানদের ইংরেজশাসন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো ভয়ে। গ্রামে হিন্দু জমিদার ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা ছিলো, এই বিচ্ছিন্নতা উচ্চবর্ণ হিন্দু ও নিম্নবর্ণ হিন্দু কৃষকদের মধ্যেও ছিলো ভালোভাবে। শহরে অশিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুর, উচ্চবর্ণ হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণ হিন্দুর বিরোধ ছিলো তীব্র, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসংস্কার এর কিছুই করতে পারে নি। ১৮৬১ সালে শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিরোধ ঘটলো তীব্রভাবে। মুসলমানেরা পশ্চিমী শিক্ষা নিয়ে প্রশাসনে চাকরি করতে ঢোকে নতুন চেতনায়; চাকরিতে ঢুকলেও ইসলামধর্মের জঙ্গিমনোভাব, ঔদ্ধত্য এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ ত্যাগ করে নি, বরং বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলো। ধর্মীয় আন্দোলনই তার নজির। ফলে হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ বাড়িয়েই তোলে, ইংরেজদের সংস্রবে ও প্রশ্রয়ে। জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছে ইংরেজের সহায়তায়। এই বিরোধ তাদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও প্রকাশিত। হিন্দুদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা থেকে নিজেদের আলাদা করবার জন্যে মুসলমানি বাংলা ভাষা প্রবর্তন করে সাধারণ মুসলমানের জন্যে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা মুখে বাংলা বললেও ফারসি-মেশানো উর্দু বলতেই আভিজাত্য বোধ করে, বাংলা লেখে না, এই মনোভাব এখনো। আরবি নামের মানে না জানলেও কোনো বাঙালি মুসলমান বাংলা নাম রাখে না তাদের, এমনিভাবে দেশ জাতি ও সংস্কৃতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, ধর্মীয় সংস্কারে তাদের মন পড়ে থাকে মক্কা ও মদিনায়। তাই বর্তমানেও ভারতে বসবাসকারী কোনো মুসলমান পুরো ভারতীয় নয়। শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিরা তাদের ত্যাগ করেনি, তারাই ধর্মের ও জাতিতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ইংরেজের পক্ষপুটে আলাদা থাকতে চেয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দোষ তারা এই মনোভাব পাল্টাবার কোনো কার্যক্রম নিতে পারে নি সার্থকভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধানকে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা জীইয়ে রেখেছে; নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ও তপশিলী

ও উপজাতি অঞ্চলে তপশিলী ও উপজাতিদের প্রার্থী মনোনীত করে। ইরান যেমন 'আবেস্তা' ভুলেছে ইসলামের তরবারির কাছে, ভারতবর্ষও 'ঋগ্বেদ' ভুলবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে অদূর ভবিষ্যতে।

জাতিতত্ত্বের দিক থেকে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদ নেই ; কারণ বাংলার প্রায় সব মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে রূপান্তরিত। পূর্ব বাংলায় ইয়েমেন ও হেদ্‌জাজের সমুদ্রযাত্রী আরব মুসলমানেরাই এসেছিলো, কিন্তু তারা কি এতো সংখ্যক মুসলমানের জন্ম দিতে পেরেছে ? এই মুসলমানের সঙ্গে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার আর্য মুসলমানের চেহারা আকৃতিতে প্রচুর প্রভেদ। অনেকে দাবি করেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা মুগল ও পাঠান আক্রমণে সৈন্য বংশ-উদ্ভূত। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলমানের মধ্যে বিরোধ। তাদের পূর্ব পুরুষ তুর্কি তারপর পাঠান। আরেকদল অভিজাত মুসলমান দাবি করে তারা নাদির শাহ্‌র সঙ্গে এসেছে, তাদের বাসস্থান ছিলো ককেসাসে। তাই মুসলমনের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ, কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারে তাদের মধ্যে ঐক্য। ইসলামধর্মের ঐক্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ তৈরি করেছে, অথচ একই ভৌগোলিক সীমায় একই সংস্কৃতির আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে। মুসলমান ধর্মের জিগির তাদের ভুলিয়েছে অধিকাংশ মুসলমানই কঠোর জাতিভেদ প্রথার জন্যে অর্থনৈতিক অত্যাচারের জন্যে হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। ভুলে যায় বলেই তারা দাবি করে তারা আরব পাঠান তুর্কি তারতার ও নাদির শাহের বংশধর ; সুতরাং দেশের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো আত্মীয়তা নেই ধর্মে ও জাতিতত্ত্বে। দীর্ঘদিন বাস করে মুসলমানেরা হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহবিরোধ ও অন্য কুসংস্কার পেয়েছে ; হিন্দুরা পেয়েছে নারীর পর্দানশিনতা, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক উগ্র ঔদ্ধত্য, ভোগবিলাস, ব্যভিচার ও পোশাকের চাকচিক্য—কিন্তু চেতনার জাগরণ দুজনের কারো হয় নি। সুফির উদারতা উপনিষদের মধ্যেই সর্বত্র ঃ সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম এতৎ। আবেস্তার চীস্ত, তুমি কে ? এর উত্তর ঃ নরো ঈশ্‌ নরো বীশেন্তে, হে মানুষ তোমার মধ্যেই নরেশ্বর আছেন। ( যস্ন ৪৮.১০ )

বাংলার এই সমাজ-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিদ্যাসাগরকে স্থাপন করে তার বিচার করা প্রয়োজন। উইলিয়াম জোন্‌স প্রাচ্যবিদ্যার মধ্য দিয়ে, হয়তো সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদিতায়, যুক্তির সর্বজনীনতা এনে হিন্দু সমাজের চেতনাকে ও সমাজকে পরিবর্তিত করতে শুরু করেছিলেন, সেই পরিবর্তিত চেতনার কিছু আলো উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন কর্মীর ও মনীষীর রচনায় পাই, কিন্তু সামগ্রিক মুক্তি সম্ভব ছিলো না ইংরেজের অধীনে ; কারণ সার্বভৌমত্ব ছিলো না। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রেণীস্বার্থের

জন্যে দরিদ্র হয়েও সকলের জন্যে চিন্তা না করে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন; বেথুন স্কুলে স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়স্থাপনে সময় ও পরিবেশের কাছে নতিস্বীকার করবার ফলেই স্ত্রীশিক্ষক গড়ে তোলবার ব্যাপারে বিরুদ্ধতা করে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্কোচ করেছিলেন স্ববিরোধিতায়; সুবর্ণ বণিকদের ছাত্র হিশেবে প্রবেশাধিকার না দিয়ে জাতিভেদপ্রথাকে মেনে নিয়েছেন উদারনৈতিকতার বিরুদ্ধে; সহবাসসম্মতি বিলে শাস্ত্র মেনে বাল্য-বিবাহকেই অনুমোদন করেছেন, অথচ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন প্রথমে। সহবাসসম্মতি বিলের কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া, সময় পরিবেশ বাস্তব ঘটনার বিচারে, অন্য অভিযোগগুলো টেঁকে না। একথা ভোলা উচিত নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে, উদারনৈতিক মনোভাবের প্রভাবে, সমাজের কিছু অংশে মুক্তি আনতে চেষ্টা করলেও পরাধীন ব্রিটিশশাসনে তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও পরাধীন মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিদ্যাসাগরই একমাত্র স্ববিরোধহীন ব্যক্তিত্ব; মৃত্যুর ছ'মাস আগে তিনি অসুস্থ, সহবাসসম্মতি বিলের অনুমোদন দিয়ে তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরোধিতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

বার্ণিক রায়

# বিদ্যাসাগরের জীবনই সাহিত্য

# বিদ্যাসাগরের জীবনই সাহিত্য

বিদ্যাসাগরের জীবনসম্বন্ধে যে কিছু বলতে আমার ধৃষ্টতা হয়েছে তার একমাত্র কারণ এই যে বিদ্যাসাগর ও আমি একই দিনে জন্মেছি। ফলে দুজনের জীবনের ঘটনা ও তার পরিণাম প্রায় এক ; কিন্তু তাঁর সুকৃতি আমার নেই এবং যে পৌরুষ ও বীর্যবত্তা নিয়ে তাঁর কালের ঢেউয়ের ঝাপটা সহ্য করে মাথা তুলে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সময়ের জন্যেই একালের মানুষ সেই বিদ্রোহ করতে পারে না, বিদ্রোহ করলেও গোষ্ঠী রাজনীতি ও অর্থনীতি দাবিয়ে দেয়।

বিদ্যাসাগরের জীবন শেষের দিকে নিঃসঙ্গ পথিকের, স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন. পুত্র পরিত্যাক্ত, কন্যাদের জামাতাদের দুজনের মধ্যে একজন অকাল মৃত্যু বরণ করেছেন, অন্য জামাতাকে বিতাড়িত করেছেন অসততার জন্যে, যে-বিধবাদের সুখের জন্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়ে জীবনব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, সেই বিধবাকন্যার মুখ দেখেই তাঁর জীবন কেটেছে, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য বন্ধুরাও প্রয়োজনে বা স্বার্থে দেখা করেন. আসেন, কিন্তু কারো ওপর বিশ্বাস করতে পারেন না, আস্থা নেই; মেজ ভ্রাতা দীনবন্ধু তাঁর খ্যাতিতেও বিদ্যাবত্তায় ঈর্ষান্বিত, তিনি মনে করতেন বিদ্যাসাগরের চেয়ে কোনো অংশে কম নন ; বিদ্যাসাগর চরম আঘাত খেয়েছিলেন দীনবন্ধু যখন সংস্কৃতপ্রেস ও ডিপোজিটারির অংশ দাবি করেছিলেন তাঁর অর্ধেক অংশ আছে বলে, যা মূলত মিথ্যে। অথচ তাঁর চাকরি গবর্নরকে বলে তিনিই করে দিয়েছিলেন। তৃতীয় শম্ভুচন্দ্র নিজের প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের পাশে, বিদ্যাসাগরের প্রয়োজনে বহুদূরে ; বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রামছাড়া করেছিলেন। শম্ভুচন্দ্রই তাঁর নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে বিদ্যাসাগরের অসম্মতি সত্ত্বেও মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহ দেন. গ্রামের নিকট আত্মীয়ের কাছে বিদ্যাসাগর অপমানিত, গ্রামবাসীদের কাছে নির্বাসিত ; বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যদিও শেষের দিকে ভারত সম্রাটের সুহৃদরূপে সি. আই. ই উপাধি পেয়েছিলেন ; কিন্তু ব্রিটিশ সরকারও নিজের সুবিধার জন্যই বিদ্যাসাগরকে খাতির করতো, বিদ্যাসাগরের বা দেশের জন্যে নয়, শেষের দিকে বরং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সেই হৃদ্যতা ছিলো না, কোম্পানির ইংরেজের কাল পাল্টে গেছে, ভিক্টোরীয় ইংরেজের দাপট ও অহংকার ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। কাশীতে পিতার মৃত্যু হয়েছে, এর আগেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে তাঁর। দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র আলাদা, নারায়ণের জন্যে আলাদা বাড়ি করে দেন, মাকে নিজের

কাছে রাখতে চান, কিন্তু ভগবতী দেবী আসেননি, তাঁর জন্যে এবং তাঁর ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে দিতে হয়। সকলে পৃথক হলেও মাসোয়ারা পাঠাতেন এঁদের। যে-নারীশিক্ষায় তাঁর প্রাণান্ত চেষ্টা, সেই নারী শিক্ষাই ঠাকুরদাস পছন্দ করতেন না বাড়িতে; শিক্ষায় তথ্য ও জ্ঞানের সঙ্গে নীতিকে যুক্ত করে চেতনায় পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, মায়ের প্রশ্রয়ে তাঁর নিজের পুত্রই নীতিহীন কুপথগামী হয়ে যায়। আর কলকাতায় প্রাচীন সমাজ বিদ্যাসাগরের প্রতি বিদ্বিষ্ট। হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিতেরা বিদ্যাসাগরের দানে আকৃষ্ট, কিন্তু জ্ঞানে ও কর্মের প্রতি উদাসীন, নতুবা ধর্মে অভিষিক্ত। বিদ্যাসাগর ধর্মসম্বন্ধে সংশয়বাদীও নন্, নাস্তিকও নন্। মানুষের সেবা ও তাকে দয়া করলেই হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও মুক্তি, মানুষের সেবার মধ্যেই দেবতার তৃপ্তি, যদিও দেবতা থাকেন, দয়ার মধ্যে, পরের দুঃখ ও ক্লেশ দূর করবার প্রবণতায় আর্তের সঙ্গে একাত্মবোধ মানুষকে নিজের সীমা থেকে মুক্তি দেয়, দয়া ও ত্যাগ একই প্রবৃত্তি, নিজেকে মুক্ত করে সকলের সঙ্গে মিশে গেলে মিলন বোধের প্রসারতা, তাইতো ব্যাপ্তি, বৃহতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা।[১] এই বোধেই ঈশ্বরচন্দ্র মানবিক ও আস্তিক্য বুদ্ধিতে বলীয়ান, কেননা তাঁর মানবিক বোধ তাঁর চেতনায়, এবং তাঁর ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ, তাই প্রচলিত পৌত্তলিকতা তাঁর যেমন নেই, প্রতিমাতে ভক্তি অর্পণ করেন নি, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের ভক্তি ও ব্রহ্মকেও অবলম্বন করেন নি, কেননা দুয়ের মধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিকতা; যে শুধু মানুষকে ভালবাসে, মানুষের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে হয়, মানুষের দুঃখত্রাণকে নিজের মুক্তি ভাবে, তার কাছে প্রতিষ্ঠানের কোনো মূল্য নেই; এই নির্মল সত্য হৃদয় দিয়ে যেমন বিদ্যাসাগর বুঝতেন, তেমনি উপলব্ধি করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে দেখতে এসে রামকৃষ্ণ: 'আলুপটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়. তা তুমি খুব নরম, তোমার অত দয়া।' কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনভাবে মানবসত্যকে বুঝবার লোক ছিলোনা, অথচ এই মানবসত্য উপনিষদে ও তন্ত্রে নিত্য জ্যোতির্ময় হয়ে আছে, তাই বিদ্যাসাগর সকলের কাছ থেকে দূরে; প্রাচীন হিন্দুধর্মাবলম্বীরা, ব্রাহ্মরা এবং নব্যহিন্দুসম্প্রদায় কেউই বিদ্যাসাগরের সংস্কার ও প্রথামুক্ত বিশুদ্ধ মানবসত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। তিনি নির্বাসিত, কিন্তু নির্বাসনে কি নিজের রাজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন? পান নি; হয়তো কিছু পেয়েছিলেন, সে হলো শিক্ষা, আর্তের সেবা ও দুঃখের প্রতি দয়া। আর অন্য দিকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহে তাকে ক্ষইয়ে দিতে হয়েছে। এই ক্ষয়ের মধ্যেই দীপ্তি ও আলোক, যে আলোকে অন্ধকার ও দুঃস্বপ্ন হটে যায়, তিনি তাঁর

---

১. পরবর্তীকালে কিছুটা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষের দিকে এই সত্যে প্রাণিত হয়েছিলেন, বিবেকানন্দের ওপর প্রভাব শিক্ষাজীবন থেকেই পড়েছিল।

সংগ্রামময় জীবনে অন্ধকার ও দুঃস্বপ্ন হটাবারই চেষ্টা করেছিলেন ; প্লেটোর সেই অন্ধকার গুহাবাসীরা দিনের আলোকে যেমন মিথ্যে ভেবেছিল, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষও অন্ধকারে থাকতে ভালোবেসেছে; ভালবেসেছে বলেই বিদ্যাসাগর জীবদ্দশায় ব্যর্থ; আর্তের দুঃখত্রাণ করা তাঁর ইনস্টিংক্ট। এই ইনস্টিংক্টকে তখনকার লোকেরা ভাঙিয়েছে। যখনতখন এসে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সাহায্য ও দান নিয়েছে। প্রতারণা করেছে। দানের কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু তাঁর বীরত্ব বীর্যবত্তা সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মুখ্য মহত্ত্ব বুঝতে পারেনি ; আজও বুঝেছে বলে মনে হয় না। ইসলাম ও ইংরেজের অধীনে গ্লানিময় অস্বস্তি ও পরাভব জাতির রক্তে বিভ্রান্তি ও নিষ্ঠুরতা নিয়ে এসেছে। পরাভবের মধ্যেই নিজেকে স্বাধীনতায় রক্ষা করবার জন্যে প্রথার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। এই ঐতিহ্য সজীব ক্রিয়ার রীতি। ঐ রীতিই সমাজবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতাকে শৃঙ্খলা আনতে সাহায্য করেছে, এবং এই শৃঙ্খলা শেষ পর্যন্ত সংস্কার মূর্ত ও বিমূর্ত শৃঙ্খল হয়ে সমাজের মানুষকে কন্ঠরুদ্ধ করেছে কঠোর ভাবে, তাই বিধবাকে অযথা এখনো দেবী বানিয়েছে, নতুবা জঞ্জাল বলে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। মানবীরূপে সামাজে ও গৃহে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর নারীকে রক্তেমাংসে-গড়া মানবীরূপে দেখেছেন। তাঁর সুখ,তাঁর কামনাবাসনা স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন, সেখানেও তিনি বিফল মনোরথ। বিধবাবিবাহ অনেকেই করেছে টাকার ও যৌনতার লোভে, বিধবাবিবাহ আইনের ব্যাপারে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর পেছনে ছিলো ঠিকই, রাজনারায়ণ বসু দুই ভাইকে বিধবাবিবাহও দিয়েছিলো, কিন্তু পরে অনেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়, বিদ্যাসাগরের চিঠিতেই এই মর্মান্তিক সত্য উদ্ঘাটিত ঃ

> 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যে রূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে আশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়া এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।'

বিদ্যাসাগরও বাঙালিকে জানতেন অসার ও অপদার্থ বলে। শুধুমাত্র ইংরেজের অধীনে থেকে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্যে বাঙালি দ্বিমুখিতা অর্জন করেনি ইয়ংবেঙ্গলের মতো। ঐতিহ্যগত প্রথা ও সংস্কারও তার অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সেই অন্ধকার দূর না করা পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের মানবসত্য উপেক্ষিত থেকেই যায়। বিদ্যাসাগর জাতিবর্ণ ধর্ম সংস্কার ও দেশাচারের বাইরে মানুষকে শাশ্বত বুদ্ধি ও হৃদয়ে উজ্জ্বল

ও পবিত্র দেখতে পেরেছিলেন, এইভাবে দেখতে পেরেছিলেন মধুসূদন ও পরে রবীন্দ্রনাথ ; তাই এই দুজনই তাঁকে প্রকৃত চিনতে পেরেছিলেন, মধুসূদনের কাছে বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে প্রথম মানুষ,'শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। আর রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন আধুনিক ও নবীন রূপে, চির যৌবনে অভিষিক্ত বলেই বলশালী। এই নবীনতার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগর পূজনীয়, বিদ্যাসাগর চলবার পথ প্রস্তুত করে দিয়ে গেছেন।

সুতরাং অসার অপদার্থের সঙ্গে উচ্চপ্রাণ সহৃদয় উদার প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ন্যায় ও কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরদুঃখে কাতর বিদ্যাসাগরের অহরহ দ্বন্দ্ব বাধবেই। এই অশান্তি নিয়েই সারা জীবন তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে দেশবাসীর মধ্যে, কলঙ্ক ও অপকীর্তি মাথায় নিয়ে, সেই সঙ্গে নিয়তিতাড়িত হয়ে। উত্তর পাড়ায় বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করে মিস্ কার্পেন্টারের সঙ্গে ফেরবার পথে গাড়ি উল্টে পড়ে গিয়ে আঘাত পান, সেই আঘাতেই তাঁর যকৃৎ উল্টে যায়, এই অসুখ তাঁর আর সারেনি। এই অসুখের পর তিনি আর দুধ খেতে পারতেন না। দৌহিত্রকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'ছোট বেলায় পয়সার অভাবে দুধ খেতে পাইনি, এখন অসুখের জন্যে পাইনা।' জীবনের শেষের দিকে অনেককেই দীর্ঘ নিশ্বাসে, চোখের জল ফেলে বলেছেন : 'কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।'

একদিকে ইন্‌স্টিংক্টজাত পর-দুঃখকাতরতা, দয়া ও দানে ত্যাগস্বীকার, অন্যদিকে সমাজের প্রথার নির্দয়তা ও জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সংগ্রাম। এই দুইয়ে মিলেই পরিপূর্ণ বিদ্যাসাগর। যার মধ্যে তাঁর জীবন ক্ষতবিক্ষত দ্বন্দ্বদীর্ণ, ট্রাজিক সংগ্রামের বলিষ্ঠতায় মহান্ ও নৈতিকতায় উজ্জ্বল ; অন্যদিকে পরাজয়ের নৈরাশ্যজাত ক্ষতিবোধ আমাদের সত্তাকে নাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই ক্ষতিবোধের মধ্যে দিয়েও তাঁর উদ্দেশ্যের জন্যে সংগ্রামের নিরন্তর চেষ্টা মানুষের মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে—বিদ্যাসাগরের জীবন এই ট্রাজিক মহনীয়তায় উজ্জ্বল।

বিদ্যাসাগর মানুষ, হৃদয়বান্, পণ্ডিত, মনীষী, মনুষ্যত্বে ও পরোপকারে ও সমাজসংস্কারে সাহিত্যসাধনায় মহাপুরুষ। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। চোদ্দ বছর বয়সে দীনময়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ছাত্রবয়সে, তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বিদ্যাসাগরের তিরিশ বছর বয়সে। এরপরে পরপর চারটি কন্যাসন্তান। সন্তান উৎপাদনের এই ব্যবধান এত দীর্ঘ কেন ? তিনি বিবাহে অরাজি ছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। এবং এই অসন্তুষ্টিই হয়তো তাঁকে সরিয়ে রেখেছে স্ত্রীর কাছ থেকে। এবং আর একটা কারণও অমূলক নয়, যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিদ্যাসাগরের জন্ম এবং যে উদারতায় তিনি মানুষ, তার ওপর হিন্দুকলেজের আবহাওয়ায় তাঁর

মানসিক গঠন হয়েছে, তার সঙ্গে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ীর সামঞ্জস্য হয় নি, মনের মিল প্রথম থেকেই দূরত্বে ছিলো। পরবর্তীকালে যে কলহ ও মনান্তর হয়েছে সে তো পারিবারিক ঘটনায়ই প্রকাশ। তিনি যখন অসুস্থ, কলকাতায় একাকী, দীনময়ীর শাশুড়ি ও শ্বশুর মারা গেছেন, তখনও বিদ্যাসাগরের কাছে দীনময়ী আসেন নি। তাঁর দাম্পত্য জীবনের ছবি আমরা কোথাও পাই না, বরং ভাইদের জন্যে তাঁর সঙ্গে বিবাদ হয়েছে, এই সংবাদই নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসাগরও স্ত্রী হিশেবে তাঁর প্রতি কর্তব্য করেছেন, উইলে তাঁর জন্যে তিরিশ টাকা মাসোহারা স্থির করে দিয়েছিলেন; কিন্তু যে স্নেহ প্রেম থাকলে দাম্পত্যজীবন সুখের হয়, তার কোনো প্রমাণ মেলে না তাঁর জীবনীতে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরপুত্র নারায়ণ বিধবাবিবাহ করবার জন্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ ও মতান্তর ঘটে; হয়তো পরে কেটে যায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনে দীনময়ী সম্বন্ধে উদাসীনতা শুধু কি সংস্কৃতিগত? যে-বাল্যসহচরীর অকাল বৈধব্য হঠাৎ জানতে পেরে তিনি ছাত্রাবস্থায় দেশের বাড়িতে গিয়ে সরবে রোদন করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহপ্রথাপ্রবর্তনের জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই বাল্যসহচরীই কি বিয়াত্রিচে? বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের গভীরে ও গোপনে এমন একজন নারী যে সৌন্দর্যময়ীরূপে বিরাজিত, তাঁর লেখা পড়ে সে সত্য স্পষ্ট হয়। এবং তাঁর লেখা বাল্য-বিবাহের দোষ প্রবন্ধে যেন এরই ইঙ্গিত ক্ষীণভাবে পাওয়া যায়ঃ 'হায় কী দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয় কালে তাদৃশ পরিণেতার আচারব্যবহার ও চরিত্রবিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল। ···এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয়, প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহ পরিচারিকা স্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।'

বিদ্যাসাগর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সহবাসসম্মতি আইনে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ সালেঃ মেয়েদের ঋতুমতী হবার আগে সহবাস আইনের কাছে অপরাধ বলে ঘোষিত হলে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। মনুষ্যত্বের দিক থেকে শিশু-স্ত্রীদের যুক্তিযুক্তভাবে শুধুই রক্ষা করবে না এই আইন, শাস্ত্রে নির্ধারিত ধর্মীয় ব্যবহারের সঙ্গে বিরোধ ঘটাবে না।—এখানে শাস্ত্রকে ও ধর্মকে, সর্বজনীন যুক্তির চেয়েও বেশি জোর দিয়েছেন। যদিও বারো বছরের চেয়ে বয়েস বেশিই স্বীকৃত হয়েছে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যে; কেননা এখানে মেয়েরা ঋতুমতী হয় বারো থেকে পনেরোর মধ্যে। কিন্তু বক্তব্য সেখানে নয়, বিদ্যাসাগরের ঝোঁক শাস্ত্রে ও ধর্মে। এর আগেই শিবনাথ শাস্ত্রী আঠার শ ছিয়াত্তর সনে মেয়েদের বিবাহের বয়েস ষোল নির্দিষ্ট

করেছিলেন, সেখানে শাস্ত্রানুসারে বালস্ত্রীদের বাঁচাবার পথ খুঁজছেন বিদ্যাসাগর। এই শাস্ত্রের প্রতি, ধর্মের প্রতি ঝোঁক কি দেশের মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের জন্যে, না নিজের দুর্বলতার হেতু ? কেননা, বিধবাবিবাহ-প্রচারে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন মানুষের হৃদয়মন পরিশীলিত হয় নি বলে ; তাই কি ধর্মের ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন ? এ কি স্ববিরোধ, না বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যাসাগরের একই যুক্তির ধারা, যাতে শাস্ত্রের নামে মেয়েদের বিবাহের ও সহবাসের বয়েসকে বারো ও তার ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন।[২]

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ইগো প্রধান। তাঁর কর্তব্যকর্মে, আদর্শে, নিষ্ঠায় আচরণে এই ইগো প্রবলতম। ব্যক্তিবোধের সঙ্গে সমাজের মনোভাবের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিত্য ক্রিয়াশীল। কিন্তু ব্যক্তিবোধ যেখানে প্রবল হয়ে উঠে সেখানে সে সত্তাকে প্রাণপণে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার মধ্যেই ইগোর ক্রিয়া।[৩]

এই ইগো ছাড়া আরো কতোগুলি উপাদান জড়িয়ে থাকে; ব্যক্তির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অ্যাটিটিউড ও সেন্টিমেন্টের প্রকাশের বিশেষ গতি এবং সেই সঙ্গে বিশেষ মূল্যবোধ। অথবা মূল্যবোধের মধ্যেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং ব্যক্তির অ্যাটিটিউড ও সেন্টিমেন্ট প্রকাশ পায় চরিত্রে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্তান হিশেবেই বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য ভাবধারায় মূল্যবোধ তৈরি করে নিয়েছিলেন।[৪] হয়তো এর সঙ্গে ঔপনিষদিক তান্ত্রিক

---

২. From every point of view therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife before she has her first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child wives, but would, so tar from interfering with religious usages, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, is a spiritual character and is liable to be disregarded.

৩. শিবনাথ শাস্ত্রীও বিদ্যাসাগর চরিত্রে 'উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্ব' দেখতে পেয়েছেন।

৪. হিন্দু কলেজের শিক্ষায় পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন এর পৃষ্ঠপোষকেরা ; এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইতিহাস ভূগোল ও বিজ্ঞান উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল

ও সন্ন্যাসের ত্যাগের সংস্কারও যুক্ত ছিল। সমস্ত মানুষের সব চেয়ে বেশি সম্ভাব্য আনন্দদানকেই তিনি জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও গতি হিশেবে মেনে নিয়েছিলেন। সকলের এই আনন্দ কাঙ্ক্ষিত ও অবশ্যকর্তব্য; তাই এই আনন্দ বিদ্যাসগরের কাছে বিমূর্ত নয়। বস্তুরূপে প্রতীয়মান, এই বস্তুকে তিনি পেতে চেয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমাজে। সকলের আনন্দদানের মধ্যে নিজেই আনন্দ যখন মেলাতে চেয়েছেন, তখনই মুক্তি হয়তো এসেছে। এই চারিত্র্যই বিদ্যাসাগরের জীবনের মূল বলে মনে হয়। এই উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা গতির জন্যেই প্রাণ পণ করেছেন বিদ্যাসাগর।

মানুষকে সুখী করে তোলাই বিদ্যাসাগরের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। সুস্থ শরীরে বিবেকবান হয়ে বেঁচে থাকুক—এই কামনাই তিনি করেছেন সারা জীবন। এবং বিবেকবান হলেই মানুষ স্বাধীন ও মুক্ত স্বভাব হতে বাধ্য। শাস্ত্র ও গোষ্ঠীর অনুগামী হওয়ার চেয়ে মানুষকে বিবেকবান, স্বাধীন মুক্ত করে তুলতেই চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকেই জেদী, একগুঁয়ে অর্থাৎ ইগো তাঁর মধ্যে প্রবল। নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর; পিতা যা বলতেন তার বিপরীতে যাওয়াই তাঁর প্রবণতা। সেই সঙ্গে মানসিক গঠনে বংশানুধারায় ব্যক্তিগত গুণের সমগ্র কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। যার ফলে নির্ভীকতা স্পষ্টতা উদারতা, সর্বজনের প্রতি সমান অনুভব ও বিবেকের সংস্পর্শ বেদনা উজ্জ্বল হয়েছিল।

অতি দরিদ্র পরিবারের জন্মেও তিনি অতি দুষ্টু প্রকৃতির; পরের মেলে-দেওয়া কাপড়ে কাঠিতে বিষ্ঠা ছড়িয়ে দিয়েছেন, চুপে চুপে অন্যের বাগানে

---

১৮২৫ সাল থেকেই। বিদ্যাসাগর এই পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন, এই ভাবধারা তাঁর মধ্যেও, তবে তাঁর ভাষার মাধ্যম বাংলা। আলেকজান্ডার ডাফের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়িতে অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে ইয়ংবেঙ্গলেরা বক্তৃতা করবার সময় বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করতেন: ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টসন ও গিবন; রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্‌থাম; বিজ্ঞানের বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি; ধর্মীয় বিষয় হলে হিউম ও টমাস পেইন; আধ্যাত্মিক বিষয় হলে লক রীড স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন; এই সঙ্গেই স্কট ও বায়রনের উক্তি উদ্ধৃতি দিতেন, এবং রবার্ট বার্নসের কবিতাও। এই ইয়ংবেঙ্গলদের কয়েকজনের সঙ্গে, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিশেষভাবে বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর ইতিহাস রাজনীতি বিজ্ঞান ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাভাবনার সামিল হয়েছিলেন। শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে এই চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত।

ফল নিয়ে এসেছেন। যবের শিস্ ছিঁড়ে নষ্ট করেছেন এবং গলাধঃকরণ করতে দম আটকে মরতে বসেছিলেন। বাল্যকালে তিনি অকুতোভয়, সকলকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠবার অদম্য চেষ্টা তাঁর মধ্যে, এর জন্যে পরিবারের কারো কাছ থেকে বাধা পান নি, এবং ব্রাহ্মণেতর প্রতিবেশীর কাছেও অবাধ্য, ফলে তাঁর ইগো ও স্বাধীনতা নির্বাধ। এখান থেকেই তাঁর ইগোর জন্ম, একেই তিনি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সারাজীবন। দরিদ্র হলেও তিনি ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, বর্ণে শ্রেষ্ঠ, পিতামহ রামজয় তর্কালঙ্কারের পৌত্র বলে সন্ন্যাসীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা তাঁর ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। মাতামহের তান্ত্রিকতা তাঁকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ব্রাহ্মণেতর ও ব্রাহ্মণ পরিবেশের মধ্যে, বংশানুধারায় ব্যক্তিগত গুণের সামগ্রিকতা এইভাবে যুক্ত হয়েছে তাঁর চরিত্রে। সেই সঙ্গে তিনি পেয়েছেন পুরুষানুক্রমে অসাধারণ মেধা। এই মেধাও তাঁকে স্বাধীন ও নির্বাধ করেছে, তিনি অতি সহজেই ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছেন। পিতার কাছে যে বাধা পেয়েছেন স্নানে ও খাবারের ব্যাপারে, উল্টো দিকে মেধার দিক থেকে প্রশ্রয়ই তাঁকে বলা যায়। মেধায় তিনি সকলের ওপর উঠেছেন, সকলেও তাঁকে ওপরে উঠিয়েছেন। তিনি যেমন বিচার করেছেন মেধা দিয়ে নিজেকে, তেমনি অন্যেরাও বিচার করেছেন তাঁকে মেধার পরিমাপে। দুই বিচারের মধ্যে সামঞ্জস্য নিহিত, তিনি মেধা দিয়ে নিজেকে ও পরিবারকে উন্নীত করেছেন। পরিবারের ও পরিচিতেরা মেধায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উন্নীত করেছে; দুইয়ে মিলে মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বা আইডেন্টিটি ঘটেছে সুন্দরভাবে। বিদ্যাসাগর উপাধি পাওয়া পর্যন্ত নিজের সঙ্গে অন্যের একাত্মতা অটুট অক্ষুণ্ণ। তাঁর অনুভব ও কর্মে সজীবতা সক্রিয়তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছিল। তাঁর সত্তা যেখানে প্রকৃত, এই প্রকৃত সত্তা স্বাধীন হয়ে উঠেছে, স্বাধীন এবং নির্বাধ। অন্যের প্রতিরোধ ও বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি, এমন কি চাকরি পেতেও।[৫]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করবার দিন পর্যন্ত এই স্বাধীন মনোভাব ও স্বাধীনতা অনমিত। সেই সঙ্গে বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা বেড়েছে। নিজের প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে; ইংরেজিভাষা শিখে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে নতুনভাবে। ওপরআলা ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় ও সদ্ভাব নিবিড়তর হচ্ছে।[৬]

---

৫ ১৮৩৮ সালে মেজর জি. টি. মার্শাল সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক হন, তখন থেকেই মার্শাল বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবত্তায় ও ব্যবহারে খুশি ও শুভানুধ্যায়ী হয়ে ওঠেন; তাঁরই চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি ও পরে উন্নতি। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি।

৬. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী করবার সময়েই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে, স্যার জন পিটার গ্রান্ট, স্যার সিসিল বিডন, স্যার উইলিয়াম গ্রে প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের। বিদ্যাসাগরের সততা, আন্তরিকতায়, নিষ্ঠায় বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে এঁরা

তাঁর স্বভাব উদারতায় বন্ধুর জন্যে চাকরি করে দিচ্ছেন নিজে চাকরি না নিয়ে। বন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতায় সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবন্ধনির্বাচনী কমিটির সভ্য হন এবং লেখা সংশোধন করেন। ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন, ইংরেজিশিক্ষার অবসরে হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিতদের সঙ্গে বন্ধুতা ঘটে। নিজেকে প্রসারিত করে দিচ্ছেন নানাভাবে, অন্যেরাও তাঁর কাছে আসছে হৃদয়ের আকর্ষণে ও প্রয়োজনে। পরিবারেও অর্থের ভিত্তিতে সকলের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি ও শ্রদ্ধা অনেক উচ্চে। পিতাকে চাকুরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করায় পিতার কাছেও পুত্রের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অসীম। অন্যদিকে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় নিজেকে ব্যক্ত করছেন, হয়তো নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন 'বাল্যবিবাহের দোষ কী।' কেননা অধ্যয়নকালে তাঁর বিবাহ পিতার আদেশে মেনে নিলেও সমাজ ও কালের দাবিতে স্বীকার করতে পারেন নি। এর মধ্যেই বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে মতান্তরে।

আঠারশ একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর থেকে আঠারশ পঞ্চাশের ডিসেম্বরে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিয়োগ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের জীবন অশ্বগতিময় ও উন্নতির। বন্ধুবিচ্ছেদ মাঝখানে তাঁকে বিষণ্ণ করেছে। এ ছাড়া তিনি স্বাধীন, নির্বাধ, মুক্ত, মনে হয় বিশ্ব যেন তাঁর হাতের কাছে, এবং তাঁর ভেতরকার ইগো আরো প্রবল হচ্ছে। প্রতিষ্ঠা করতে চাইচে নিজে সমাজে জাতির কাছে। যৌবনে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যও তাঁর সৌভাগ্যেরই সঙ্গে যুক্ত। কলেজেই তরুণ অধ্যাপকদের সঙ্গে কুস্তি লড়েন।

এই সময়েই তাঁর প্রথম পুত্র আঠারশ ঊনপঞ্চাশ সালে ভূমিষ্ঠ হন, বিবাহের প্রায় পনেরো বছর বাদে, তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা শরৎকুমারীর কখন জন্ম হয় জানা যায় না। তবে আঠারশ সাতাত্তর সালে বিবাহ হয় এবং এগার বছর বাদে বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ীর মৃত্যু ও চোদ্দ বছর পরে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।

সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত এই পর্বেই, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হিন্দি বইয়ের বাংলা অনুবাদ দিয়ে সাহিত্যসাধনা শুরু, পরে সংস্কৃত ও ইংরেজি বইয়ের ভাব নিয়ে নতুন রচনা, বাংলাগদ্যের শিল্পরূপের প্রবর্তনা, ভাবের সঙ্গে ছন্দ সুরধ্বনি চিত্রের অভিনব সুষম মূর্তি। এবং গদ্যের বিচিত্র রূপ তাঁর চিত্রের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছে।

নারীশিক্ষা, গণশিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের পঠনপাঠনে সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রতিটি ক্ষেত্রে সার্থকতার ঔজ্জ্বল্য তাঁর জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। বীটনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা নতুন পথ ও উৎসাহ এনে দিচ্ছে তাঁর জীবনে।

---

বিদ্যাসাগরের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। পরবর্তী কালে এঁরা যখন বাংলাদেশের ছোটলাট হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর এঁদের সকলের কাছেই প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন।

এবং কলেজের ব্যাপারে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু-সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে পড়বার অধিকার উন্মুক্ত করে দিলেন আঠারশ একান্ন সালের ডিসেম্বর মাসে, প্রতিপদ ও অষ্টমীর বদলে রবিবার ছুটির দিন নির্ধারিত করেন ইংরেজি বিদ্যালয়ের নিয়মের মতো। প্রবেশার্থী ছাত্রদের দু টাকা ও সংস্কৃত কলেজের মাসিক একটাকা বেতনগ্রহণের রীতি চালু করলেন; কেননা অর্থের বিনিময়ে অর্জন মিথ্যা হতে বাধ্য, বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্সের সভ্যপদ লাভ করেন, আঠারশ একান্ন সালেই অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, এখন অতিরিক্ত পদ পেলেন আঠারশ পঞ্চান্ন সালে দক্ষিণ বাংলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের; সেই বছরই শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্যে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষকরূপে নির্বাচন করেন; আঠারশ পঞ্চান্ন সালের অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল, বর্ধমানে পাঁচটি, হুগলিতে পাঁচটি, মেদিনীপুরে চারটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন, এ বছরেই অক্টোবর মাসে বিধবাবিবাহ আইনের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেন, সাতাশে ডিসেম্বর বহুবিবাহ বন্ধ করবার জন্যে আবেদন করেন সরকারের কাছে, আঠারশ ছাপান্ন সালের ষোল জুলাই বিধবাবিবাহ আইন ঘোষিত হয়; সাতই ডিসেম্বর প্রথম বিধবাবিবাহ দেন শ্রীশবিদ্যারত্নের সঙ্গে, আঠারশ সাতান্ন সালে নভেম্বর-ডিসেম্বরে হুগলি জেলায় সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, আঠারশ আটান্ন সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে হুগলি জেলায় আরো তেরটি, বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর এই বছর তেসরা নভেম্বর অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন, পনেরই নভেম্বর 'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ করেন। কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ পর্যন্ত গণশিক্ষা, বালিকাশিক্ষা, উচ্চশিক্ষাবিস্তারে ও সংস্কারে তিনি যেমন নিজেকে নিয়োজিত করছেন, তেমনি সমাজসংস্কারে তাঁর বুদ্ধি ও কর্তব্য সাহস ও মানবিকতাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সমাজের সংস্কারের জড়তার প্রথার বিরুদ্ধে। এখানে তিনি বিদ্রোহী এবং এই বিদ্রোহ সার্থক, তাই তাঁর স্বাধীনতা নির্বাধ; এই মুক্তি ও স্বাধীনতাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব তখন পূর্ণ বিকশিত; তিনি তা চাইছেন, আকাঙ্ক্ষা করেছেন, যে উদ্দেশ্যে তাঁর কামনা বাসনা উদ্বেলিত, সবই চরিতার্থ হচ্ছে বলে তাঁর নিজের গড়া নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে, এবং এই সামঞ্জস্যসঞ্জাত সৌন্দর্যই প্রতিভাত হচ্ছে সাহিত্যিক গদ্যে, চেতন ও অচেতন এক হয়ে গেছে, তাঁর সত্তার নিভৃত গোপন বাইরে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, যাকে 'অ্যানিমা' বলি, সে যেন জীবনে কর্মে ও ব্যবহারে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছে সামঞ্জস্যে।

যদিও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন বেতালপঞ্চবিংশতি অনুবাদে, তথাপি এইসব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের মনের ক্রমিক ধারা ও বিকাশ লক্ষ করা

যায়, এবং অনেক সময় প্রতীকের মতো উদ্‌ভাসিত ; গল্পকাহিনী কিংবদন্তির মধ্যে তাঁর কল্পনা বাসনা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ফ্যান্টাসি এবং বাস্তব জীবন প্রতীকে উজ্জ্বল। কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকার রাত্রে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, মেঘের ঘনঘটা ও গর্জন চারিদিকে ভূতপ্রেত ভয়ানক কোলাহল করছে ; রাজা প্রেত ভূমিতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, ভূতপ্রেতগুলি বিকটমূর্তি হয়ে জ্যান্ত মানুষ ধরে মাংস খাচ্ছে, ডাকিনীরা বালকদের ধরে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চর্বণ করছে, শিরীষবৃক্ষের শিকড় থেকে অগ্রভাগ পর্যন্ত ধকধক করে জ্বলছে ; এই পরিবেশেও রাজা অকুতোভয় : 'এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজা নির্দিষ্ট প্রেত-ভূমিতে উপনীত হইলেন।'

এই বিদ্যাসাগরই এই রাজা, প্রেত ও ডাকিনী তাঁর সমাজপরিবেশের মানুষ এবং অন্ধকার আবৃত কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সময় ও পরিবেশ, এরই মধ্য দিয়ে নির্ভয়ে পথ কেটে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

বিপুল কর্মোদ্যমের সময়ই তিনি 'শকুন্তলা' প্রকাশ করেন। 'শকুন্তলা'র শেষে আছে :

> 'পরে কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্তা হইয়া উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে, কশ্যপ দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ প্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ ; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণপূর্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা 'মহাশয়ের যে আজ্ঞা', এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজে রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন।'

নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শকুন্তলা দুষ্যন্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলনে পূর্ণ আত্মিক রূপ বাইরের ক্রিয়াকর্ম ও চেতনার সঙ্গে, অন্তরের নিভৃত গোপনরূপে শকুন্তলা যখন মিলে গেছে, তখন নতুন সৃষ্টি ভরত, যে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হবে, সকল ভুবনের ভর্তা হবে। তাই কশ্যপ কণ্ব মেনকা শিষ্যদের সঙ্গে মিলনে চেতন ও অচেতন এক হয়ে পরম সুখে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে ; শকুন্তলা যেন বিদ্যাসাগরের

এই পর্বের 'অ্যানিমা'; মধুসূদন যে তিনটি গুণ বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন, এই পর্বেই তার সামগ্রিক মূর্তি: প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, ইংরেজের শক্তি এবং বাঙালি মায়ের হৃদয়।

মধুসূদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সৌন্দর্যচেতনার ও সমাজবোধের ও বিচারের অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়: মধুসূদন খ্রীশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে সমাজ জাতি থেকে দূরে ও নির্বাসিত; বিদ্যাসাগর প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন বলেই সমাজে ও পরিবারে থেকেও নির্বাসিত একরকম, ঠাকুরদাস তাঁকে মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাইলেও রাজি করাতে পারেন নি। মধুসূদন প্রাচীন ও নবীন দুয়ের কাছেই অপাঙেক্তয়, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' এই দুই প্রহসনে গোঁড়া ও নব্যশিক্ষিত হিন্দুদের চটিয়েছেন, দুই সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি পরিত্যাজ্য; বিদ্যাসাগরের ভাগ্যেও তাই, রাধাকান্ত দেব ও তাঁর সম্প্রদায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্যাসাগরকে গ্রহণ করতে পারেন নি। সংস্কৃত কলেজের পন্ডিতেরা তো নয়ই, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্যামাচরণ দে, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার এঁরা বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ; এঁদের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য ঋণী, কিন্তু এঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একাত্মতা ছিলো না, মনের মিলের অভাব, মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে তো বন্ধুবিচ্ছেদই হয়ে গিয়েছিল কথার খেলাপ করেছিলেন বলে; মধুসূদনের কল্পনাপ্রতিভা যেমন 'তিলোত্তমা', তেমনি সীতাও তাঁর নিভৃত হৃদয়ের 'অ্যানিমা', সীতার বনবাস তিনি লেখেন নি, কিন্তু সীতার অপহরণ রচনা করেছেন রামচন্দ্রের কাছ থেকে, এই অপহরণই পরে বনবাসে রূপান্তরিত, স্বজন হারিয়ে নিঃস্ব পুরীতে রাবণ যেমন ট্রাজিডির নায়ক। মধুসূদনও একাকী নিঃসঙ্গ, কেউ তাঁকে বুঝতে পারে নি। তাঁর হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারে নি, তাঁর হৃদয়ের কৃষ্ণকুমারীও সমাজের ও শত্রুর বৈরিতায় মৃত্যু বরণ করেছে। বিদ্যাসাগরও নিঃসঙ্গ একাকী, তাঁর জীবনও ট্রাজিক, তাই তিনি চোখের জল ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন: 'সুখ পাইনি, কাউকে সুখী করতেও পারিনি।' তবু তো বেঁচে থাকতে হয়, বেঁচেছিলেন, কি নিয়ে বেঁচেছিলেন? এই কারণেই, আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর কবি, কবি না হলে কবিকে বুঝতে পারে না। কবির হৃদয় দিয়েই বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন বুঝেছিলেন, মূল্যায়ন করেছিলেন প্রকৃতভাবে। নারী মুক্তির ও স্বাধীনতার এবং নারীর মানবীয়তার স্বীকৃতি যেমন বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিধবাবিবাহনিষেধে, বহুবিবাহরোধের মধ্য দিয়ে কর্মে এবং লেখায় প্রকাশ করেছেন, তেমনি নারীর মানবীরূপের স্বাধীন নির্মুক্ত জ্যোতির্ময় রূপ মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তারার পত্রে দেখিয়েছেন, সমাজ সংস্কার প্রথারীতি ন্যায়-অন্যায় সবই অন্তরের মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি করে।

সমাজবোধের সঙ্গে ব্যক্তিবোধের পারস্পরিক ক্রিয়ায়ই চরিত্র, কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অভাব থেকে কামনা বাসনা জেগে ওঠা নারীর পক্ষেও মানবিক ; মধুসূদন কবির হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, সেখানে পাপপুণ্য থাকলেও জয়ী হয় না। এই অর্থে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে চির আধুনিক কবি এবং বিদ্যাসাগর চির আধুনিক মানুষ ; তাই এক আধুনিক কবি এক আধুনিক মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন, এবং আধুনিক মানুষ আধুনিক কবিকে জীবনের চরম বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে ঋণ করে ঋণ পাঠিয়েছিলেন। এই কারণেই আধুনিক মানুষ বিদ্যাসাগরকে তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন মধুসূদন। ঐ যুগে নারীর স্বাধীন হৃদয়কে বোঝবার ও উপলব্ধি করবার ক্ষমতা বোধ হয় বিদ্যাসাগরের ছাড়া আর কারো ছিলো না।

বিদ্যাসাগরের কাছে মধুসূদনের ঋণ শুধু অর্থের ব্যাপারে নয়, সাহিত্যিক ঋণেও মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছে আবদ্ধ। এ কথা হয়তো নিভৃত হৃদয়ে মধুসূদন বুঝতেন, তাই বারংবার তাঁর কাছে এসেছেন, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগরসম্বন্ধে। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলাগদ্য যথাযথ সৃষ্টি না হলে মধুসূদনের মেঘনাদবধ রচিত হতো না। কেননা, গদ্যের দৃঢ়তা না পেলে কাব্য স্বচ্ছন্দ সুস্পষ্ট হতে পারে না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির ছন্দ সুরধ্বনি কবিতার চিত্রময়তা পরিস্ফুট করে, গতি দেয়, শক্তি আনে। বঙ্কিমের আগে বাংলা গদ্য তৈরি হয়েছে বিদ্যাসাগরের হাতেই, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলালে'র ভাষা দিয়ে মহাকাব্য রচনা করা যায় না বৈচিত্র্যের অভাবে ; এই ভাষায় জটিল বিচিত্র বহুবিধ অনুষঙ্গময় ভাব একই সঙ্গে প্রকাশ করতে পারা যায় না, ধ্বনির সমারোহে যে চিত্র ও বেদনাকে একই সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, তখনকার কালের কোনো গদ্যের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। মধুসূদন যেমন প্রাচীন মিথ্‌কে শব্দের মিথের ধ্বনিচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছেন, বিদ্যাসাগরও এই কাজ করেছেন 'শকুন্তলা'য়, 'সীতার বনবাসে'। আর একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাসাগর-মূল্যায়ন অনেকটা ভ্রান্ত। বিদ্যাসাগর শুধু অনুবাদ করেন নি, মূলকে অবলম্বন করে আধুনিক জীবনের বোধ, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায় এবং তার ভাষাতেও আধুনিক মনের বোধ ও অনুভব ব্যক্ত, সংস্কৃত ও ইংরেজির পুচ্ছানুগ্রাহিতা নেই। মধুসূদনও তো মহাকাব্যে আধুনিক মানুষের মনকে, অনুভব ও হৃদয়কে চিন্তা ও যুক্তিকে প্রাচীন মিথের অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আর একটি জিনিশও লক্ষণীয়, মধুসূদনের কাব্যে যতির বৈচিত্র্য নেই, আছে ছেদের বৈচিত্র্য, অনুভবকে তিনি যুক্তি অর্থ দিয়ে বুঝতে চাইছেন। এই দুই টানাপোড়েন চলছে মধুসূদনের কাব্যে ; দ্বন্দ্বে টানাপোড়েনে, ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ায়, আকর্ষণ-বিকর্ষণে ছন্দের ধ্বনির সুর গড়ে উঠেছে, বয়ে চলেছে। কিন্তু গদ্যে ছেদের এই বৈচিত্র্য তো বিদ্যাসাগরই প্রবর্তন করেন। ধ্বনির সাম্যকে সুষমাকে সৌন্দর্যকে এবং অর্থকে পরিস্ফুট করবার জন্যে বিদ্যাসাগরের গদ্যের পরিমিতি বোধ অসামান্য; তিনি ছেদে থামেন আস্তে, মৃদু বিরতি ঘটে, কিন্তু ধ্বনির রেশ থেকে যায়, ঐ রেশ পরের ধ্বনির সমূহের সঙ্গে মিশে যায়, মিশে যাবার পরেই আবার একটু থামেন, এমনিভাবেই মৃদু থামার ও গতিতে তাঁর বাক্যের পদগুচ্ছ অর্থে সুস্পষ্ট হচ্ছে, ধ্বনির সুরে প্রবহমানতায় বয়ে চলেছে এগিয়ে। এই রীতিই তো মধুসূদনের আহৃত রীতি তাঁর মহাকাব্যে। অর্থের ও চিত্রের স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতা যেমন একদিকে, অন্যদিকে সুরের প্রবহমানতা দুয়ের রচনার মধ্যেই জাজ্বল্যমান। রবীন্দ্রনাথের গদ্য এবং কবিতায় কাব্যে পদগুচ্ছ ধ্বনির সুরের স্রোতে হারিয়ে যেতে চায়, যুক্তির বদলে হৃদয় ও অনুভব গ্রাস করে ফেলে; কিন্তু বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের বাক্যে যুক্তি ও হৃদয়ের স্থান সমানুপাতিক:

> 'বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ; অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণপূর্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, 'মহাশয়ের যে আজ্ঞা', এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন; এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।'

অথবা

> 'কৌশল্যা, বাষ্পাকুললোচনে, শোকাকুল বচনে, তাহাদের নিকট কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং সীতা যে তৎকাল পর্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও বলিলেন।
>
> ক্রমে ক্রমে, সমবেত আমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণ গায়ক বাল্মীকি-শিষ্যেরা রাজতনয়; সীতা পরিত্যাগের পর, বাল্মীকির আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন: তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা তাঁহাকে গৃহে লইবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্তে লোক প্রেরিত হইয়াছে।'

এরি সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মধুসূদনের কবিতার:

> ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
> অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন;
> সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
> যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী
> নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
> যোগীকুলধ্যেয় যোগী।

অথবা

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

এবং বিদ্যাসাগরের গদ্য কতো বিচিত্র হতে পারে, কতো বিচিত্র ভাব প্রকাশে[৭] সক্ষম, বিভিন্ন বইয়ের গদ্য তারই নজির। তাঁর গদ্য প্রয়োজনে তৎসমশব্দবহুল যেমন, তেমন সরল সহজ শব্দে তৈরি দেশী ও কথ্য শব্দে গঠিত। সংক্ষিপ্ত, তীব্র, ক্ষিপ্র, আবেগে উচ্ছ্বসিত, যুক্তিতে সুসমঞ্জস, অর্থে গাঢ়, রসিকতায় উদ্বেল ও চটুল, তাঁর লেখায় যেমন গ্রাম্য বর্বরতা নেই, তেমনি নেই গ্রাম্য

৭. বঙ্কিমচন্দ্র 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও গতিত্ব এবং ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন; বিদ্যাসাগরের ভাষা অনেকটা সুবোধ্য, সুমধুর ও মনোহর। বিদ্যাসাগরের আগে এরকম গদ্য কেউ লিখতে পারেন নি। তাহলেও সকলের বোধগম্য ভাষা বিদ্যাসাগরের নয়, এবং তাঁর ভাবায় ওজস্বিতা ও বৈচিত্র্যের অভাব আছে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করায় জীবনের ছবি সাহিত্যে ফুটে ওঠে নি।

বঙ্কিমের এই দুটি অভিযোগই খণ্ডন করা যায় বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', বিধবাবিবাহবিষয়ক ও বহুবিবাহ নিষেধাত্মক ও বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও তাঁর চিঠিপত্রগুলি ভালোভাবে পড়লে; হয়তো বঙ্কিমের রচনার মতো এতো বৈচিত্র্য পাওয়া যাবে না, এতো তরঙ্গ, সূক্ষ্ম গভীর গহন গোপন অনুভবের প্রকাশ নেই, প্রতীকের ব্যঞ্জনা পরিবেশ থেকে সহসা উঠে আসে না, কিন্তু বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, জীবনের ছবিই লেখায় ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র Bengali Literature (১৮৭১) প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে হঠোক্তি করেছেন: শিশুপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক হিশেবে বিদ্যাসাগরকে বিচার করেছেন তিনি, তাই এই সব বইয়ে প্রতিভার উন্নত রূপ ফুটে ওঠে নি। His claims to the respect and gratitude of his countrymen are many and great, but high literary excellence is certainly not among them. He has a great literary reputation; so had Iswar Chandra Gupta : but both reputations are undeserved, and that of Vidyasagar scarcely less so than that of Gupta. If suceessful translation from other languages constitute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidya-

পাণ্ডিত্য, দেশের লোক শাস্ত্র পছন্দ ও বিশ্বাস করে বলেই শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও তার অনুবাদ দিয়ে প্রামাণিক করে তুলতে হয়েছে তাঁকে, নইলে পাশ্চাত্য যুক্তির ধারায় সিদ্ধান্তের অনুসারী গদ্যই তিনি রচনা করেছেন। এবং এই খানেই চিন্তাধারায় ও মনোভাবে রামমোহনের অনুসারী হয়েও রচনা প্রণালীতে পৃথক। রামমোহনের তর্কবিচার ও রচনারীতি ভারতীয় দর্শনের পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার পথ বেয়ে চলে, কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান সেই পথে এগোয় না। বিদ্যাসাগর এ সম্বন্ধে অতি সচেতন ঃ

'অতএব বিধবাবিবাহ কর্তব্যকর্ম কিনা, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া

---

sagar's case ; and if the compilation of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. But we deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius , beyond translating and primer-making Vidyasagar has done nothing.

এরপরে বলেছেন বাংলা প্রবন্ধে ঃ

'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাংলা সাহিত্য পূর্বমত সংকীর্ণ পথেই চলিল।

...বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী ও অনুবর্তী। বাঙালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভান্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভান্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই।' ১৮৯২

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ইংরেজি রচনাটি লেখেন তখন বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত

প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।'

শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত সত্যকে যুক্তির সর্বজনীনতা দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর উইলিয়াম জোন্‌সের প্রাচ্যবিদ্যার ধারায়। তিনি এই সত্যপ্রতিষ্ঠায় সমর্থও হয়েছেন শাস্ত্রের অরণ্য থেকে, কিন্তু দেশের লোক শাস্ত্রকেও মানে না, মানে শাস্ত্রের নামে দেশাচারকে, প্রথাকে, রীতিকে। তাই সত্য তাদের হৃদয়ে ঢুকতে পারে নি, তিনি ঢোকাতে পারেন নি, সেই জ্ঞান ও শিক্ষায় সত্যবুদ্ধিতে মার্জিত করে তুলতে পারেন নি বিদ্যাসাগর, এইখানেই দেশের ও জাতির কাছে তাঁর ব্যর্থতা।

বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে কার্যে পরিণত করবার দৃঢ়তা অপরিসীম, ব্যাবহারিক বুদ্ধি ও মানুষ চেনবার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ, সেই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিঅহং, যাকে ইংরজিতে 'ইন্‌ডিভিজুয়ালিটি' বলে, অতি তীব্র ও প্রবল, ইয়ং-এর আগে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্যক্তির আঘাত তেমন লাগে নি, তিনি যা বলেছেন শিক্ষাব্যাপারে, মডেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে, পাঠ্যপুস্তক রচনায়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে ; মেনে নেবার কারণ এই নয় বিদ্যাসাগর বশংবদ ছিলেন, তাঁর কর্তৃপক্ষ দেখেছেন বিদ্যাসাগর কর্মোদ্যোগী বিচক্ষণ, কর্তব্যনিষ্ঠ সৎ মেধাবী ও মনস্বী ; সর্বোপরি কোম্পানি ভারত শাসন করতে এসে যে সুবিধা চায় নীতিগ্রহণে, তাতে

---

ও 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' দেখতে পারেন নি। এবং প্যারীচাঁদের ওপর রচনা লিখবায় সময় দেখে থাকতে পারেন, কেননা ১৮৯১-এ আত্মচরিত প্রকাশিত হয়েছে, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ১৮৯২ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকায় এপ্রিলে ছাপান, দেখলেও দেখতে পারেন, কারণ সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই দুটি রচনা দেখবার পরও যদি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা বৈচিত্র্যহীন ও জগতের থেকে জীবনকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতার অভাব দেখতে পেয়ে থাকেন, তাহলে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর বিরূপতাই প্রমাণ করে। বিদ্যাসাগর যে কতোখানি সচেতন সৌন্দর্যশিল্পী ছিলেন গদ্যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখাটির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্তি থেকেই বোঝা যায় : 'তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না ; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল

বিদ্যাসাগর উপযুক্ত ব্যক্তি তাদের। কিন্তু বিভাগের নিয়ম তখন তেমন প্রবল ছিলো না। ইয়ং এসে বিভাগীয় নিয়ম খাটাতে লাগলেন। বিরোধ বাধলো এখানেই। আঠারোশো চুয়ান্ন সালের সাতই ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ওপর যে-নোট দিয়েছিলেন সরকারকে, তা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এতে যেমন তাঁর শিক্ষার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে, শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের অবস্থার উন্নতিবিষয়ে তাঁর সদাজাগ্রত চিন্তা ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাঁর কর্তৃত্ব, ব্যক্তি-অহং-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাপ্রকাশিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এক্স-অফিসিয়ো হেডসুপারিনটেনডেন্ট মনোনীত হবেন, বছরে একবার বাংলা ভাষার বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যাবেন। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক নির্বাচন তাঁর ওপরই ন্যস্ত হবে, সংস্কৃত কলেজে যেহেতু সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষকদের ট্রেইনিং দেবার জন্যে এখানেই নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে বিবেচিত হতে পারে, এর ফলে শিক্ষকদের ট্রেইনিং, পাঠ্য-পুস্তক প্রস্তুতি ও রচনা, শিক্ষকনির্বাচন ও সাধারণ তত্ত্বাবধান একই অফিসে নির্বাহিত হতে পারবে; একজন সহকারী হেড-সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হবে, তার কাজ হবে অধ্যক্ষকে সাহায্য করা, শিক্ষকদের ট্রেইনিঙের ব্যাপারে পাঠ্য-পুস্তকপ্রস্তুতিতে, বিদ্যালয় পরিদর্শনের কালে অফিসের কাজ চালাবার জন্যে। দেশীয় বা মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে কোনো বিদ্যালয়ই সুপারিন-টেনডেন্ট পরিদর্শন করবেন, উৎসাহ দেবেন, রিপোর্ট দেবেন। সুপারিনটেন-ডেন্টের কর্তব্যই হলো শহরে ও গ্রামের অধিবাসীদের বুঝিয়ে দেওয়া যে সরকারী বিদ্যালয়ের মডেলে তাদের নিজেদের অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সব উক্তিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্ববোধই প্রকাশিত। এই কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট

---

হইত;—তাই সর্বদা কাটকুট করি।' শিশুদের পাঠ্যপুস্তক 'কথামালা' ও 'বোধোদয়' প্রসঙ্গেই বিদ্যাসাগরের এই উক্তি।

বিদ্যাসাগরের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতার কারণের মূলে হয়তো 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অধিকতর নিন্দা; আর এই 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গভীর সংযোগ; বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো মনে করতেন 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিন্দার পেছনে বিদ্যাসাগরের প্ররোচনা আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখাতেই তার প্রমাণ: 'আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 'শবপোড়া-মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন?' এছাড়া বঙ্কিমের হিন্দুসংস্কার ও ঈর্ষাও থাকতে পারে; হয়তো ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগরের অনূদিত বেতাল পঞ্চবিংশতি বঙ্কিমকে পড়তে হয়েছিল, এই দুঃখের স্মৃতিও বঙ্কিমের মনে সারাজীবন জাগরূক ছিলো।

সেক্রেটারি হিশেবে যখন তিনি কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তখন থেকেই ; তাই সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হলে হ্যালিডে তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করতে চান, কিন্তু কলেজে তাঁর কর্তৃত্ব থাকবে না—একথা নিশ্চিত জেনেই এই পদ নেন নি। সাহিত্যের অধ্যাপক পদ তখনই তিনি গ্রহণ করলেন, যখন সেক্রেটারির পদ দেওয়া হলো, এবং অধ্যক্ষ হয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেন। তাঁর চরিত্রের এই দুই বিরোধী দিক অদ্ভুত, কর্তৃত্বে ব্যক্তি-অহং-এর প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রবল প্রতাপশালী, কাউকে সইতে পারেন না। আবার এই প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী মানুষই পরের দুঃখে নিজেকে লুপ্ত করে দেন, নিজের অহং আর থাকে না, দয়া করেন পরের দুঃখনাশের জন্যেই, সেই দয়াদানে ও ত্যাগে, হয়তো আত্মদমন। এখানেই ভারতীয় ঔপনিষদিক দান দয়া দমননীতি তাঁর রক্তে মিশে গেছে, হয়তো খ্রীশ্চান মিশনারীদের দানের ধর্মও এর মধ্যে যুগের হাওয়ায় এসেছিল। কিন্তু দয়া দান আত্মবিলোপ বিদ্যাসাগরের কাছে অর্জিত নয়, স্বভাবগত। তাই তিনি ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্য সত্ত্বেও নিজে কষ্ট স্বীকার করে দারোয়ানের কাছে ঋণ করে অথবা নিজের ছাত্রবৃত্তির টাকা দিয়ে অন্যের কষ্ট লাঘব করেছেন। একই চরিত্রের দুই ভিন্ন রূপ, কিন্তু পরিপূরক নয়।

ওপরঅলা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজ-না-কাল বিরোধ বাধতোই বিদ্যাসাগরের। একটা স্তর পর্যন্ত বিদেশি শাসক দেশীয় গুণীর মর্যাদা দিতে পারে পদে ও উন্নতিতে, সর্বোচ্চ পদে উন্নীত করতে পারে না, সমান মর্যাদাও দিতে পারে না, বিদ্যাসাগর এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে কোনো লেখা আমার চোখে পড়ে নি। বিদ্যাসাগর হয়তো মেকলের লিবারেলিজমের আদর্শে ও এনলাইটেন্ড শিক্ষায় প্রবুদ্ধ হয়ে মনে করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকের কাছে ইংরেজ ও ভারতীয় একই প্রজা, গুণগত কোনো প্রভেদ নেই, সুতরাং গুণের ভিত্তিতে অধিকার দাবি করতে পারে ভারতীয়েরা, এই বোধেই স্বচ্ছন্দভাবে ইংরেজদের সঙ্গে তিনি মিশতেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন যে শোষণের, দেশের যুবশক্তি ও জাতীয়তাকে দাবিয়ে রাখলেই শোষণ ভালোভাবে চলতে পারে, শিক্ষার আলো জনগণের মধ্যে সার্থকভাবে বিতরণ করলে, চিত্তের জাগরণ ঘটলে, বিদেশি শাসকের শোষণ ও পীড়ন ধরা পড়বে, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর কী ভেবেছিলেন আমি ঠিক জানি না, অন্তত কোনো লেখা আমি পড়িনি। শিবনাথ শাস্ত্রী মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক সংস্থায় বিদ্যাসাগরকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, শরীরের অজুহাতে তিনি রাজি হন নি। তিনি যেমন ধর্মীয় সংস্থার সংস্রবে যেতেন না, তেমনি রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিলো, অথবা এ বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন এর কোনো নজির নেই। এইখানে রামমোহন স্বদেশচিন্তায় অনেক ব্যাপক, তিনি ইংরেজকে স্বীকার করে নিয়েও ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের বিভেদ বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের

মধ্যে ঐক্য আনতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতাবোধে, তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাও অনেক উন্নত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। 'বাঙলার ইতিহাস' বইয়ে লর্ড হেস্টিংস সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন :

> 'লার্ড হেস্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানকূপে পতিত থাকিলে, কোনো কালে, রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না ; এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেস্টিংস বাহাদুর, এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, ইংরেজেরা প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপিত করিয়াছেন ; অতএব, সর্বপ্রযত্নে, প্রজার সভ্যতা সম্পাদন ইংরেজ জাতির অবশ্যকর্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।'

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্বের প্রশংসা দিয়েই বিদ্যাসাগর ইতিহাস শেষ করেছেন : তিনি ইংরেজি শিক্ষার উৎসাহ দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যার অনুশীলনের চেয়ে ইংরেজি বিদ্যার অনুশীলনে বেশি টাকা খরচ করেন, ইংরেজি বিদ্যালয়-স্থাপনের অনুমতি দেন, যুরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যা শেখাবার জন্যে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন, মানুষের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জন্মাবার জন্যে সেবিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন, পঞ্চোত্তরা মাশুল বিষয়ে মনোযোগ দেন বেণ্টিঙ্ক ; 'সমুদ্রে ও নদীতে বাষ্পনাবিককর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।' যাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সংবাদ মাসে মাসে দু জায়গায়ই পৌঁছুতে পারে, তার ব্যবস্থা করেছিলেন : 'যাহা হউক, লার্ড বেণ্টিঙ্ক, বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীতে, লৌহ নির্মিত বাষ্পজাহাজ চালাইবার বিষয়ে, তাঁহাদিগকে (কোম্পানির ডিরেক্টরদিগকে) সম্মত করিলেন। এই বিষয়ে, যুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে, বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে।'

> '১৮৩৫ সালের মার্চমাসে, লার্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকারকালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন কোনও উদ্বেগ ছিল না। একদিবসের জন্যও, সন্ধি ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহার অধিকারকাল কেবল প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল।'

মার্শম্যানের গ্রন্থ অবলম্বন করে এই ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক রূপে রচিত, ঠিক অনুবাদ নয়। স্বৈরাচারী বিলাসী মুসলমান রাজ্যের পর ইংরেজ ভারতে সর্বজনীন আইন, জনসাধারণের জন্যে বিদ্যাশিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও তার প্রবর্তনে মানুষের কল্যাণ, মানুষের হিতের জন্যে সামাজিক ও আর্থিক পরিকল্পনার চেষ্টা করে—এগুলিই সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজসম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও

সম্ভ্রমবোধ জাগিয়েছে।'[৮] ইয়ংবেঙ্গলরাও মুগ্ধ ও মূঢ়, কিন্তু চাকরিতে উন্নতি করতে বাধা পেয়েই ভারতীয় ও ইংরেজদের পার্থক্য বুঝেছে, তাকে নির্দেশ করেছে, দূর করবার চেষ্টা করেছে এবং ভালো চাকরি পেয়ে এসব ভুলে গেছে। বিদ্যাসাগর যখন ছাত্র তখনই বেণ্টিঙ্কের আসল সঠিক উন্নতি ঘটেছিল বলে তাঁর বিশ্বাস; কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বোধ স্পষ্ট হয় নি। অধ্যক্ষপদ থেকে ইস্তফা দেবার সময়েও দেশীয় ও ইংরেজের বিভেদ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন কিনা স্পষ্ট নয়। পরে অর্থাভাবে বিডনের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে একটা শর্ত ছিলো বিদ্যাসাগরের, ইংরেজ অধ্যাপকের সমান বেতন দিলে তিনি নিতে পারেন অধ্যাপকের চাকরি। অর্থাৎ দেশীয় ও ইংরেজের মধ্যে একই পদের জন্যে দুরকম বেতন প্রচলিত ছিলো; কিন্তু এই বিজাতীয় ভেদ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সংবাদ আমরা পাই না।

আমি বলতে চাই, বিদ্যাসাগরের এই পর্বে, আঠারশ একান্ন থেকে আঠারশ আটান্ন সালের মধ্যে তাঁর চেতন ও অবচেতনে, বাইরের ক্রিয়া কর্ম ও অন্তরের সৌন্দর্যের সঙ্গে, কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সুষম প্রসারের কালে তিনি যখন সমাজ জাতি মানুষকে নিয়ে শিক্ষাসংস্কারে, সাহিত্যরচনায় ব্যাপৃত, তখনই গোপনে রাজনৈতিক বিরোধ ধূমায়িত হচ্ছিল, সেটাই পরবর্তীকালে চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্বে প্রকট হয়ে পড়ে। অধ্যক্ষপদ ছেড়ে দেবার পর থেকেই তাঁর 'অ্যানিমা'র মৃত্যু ঘটে সীতার বনবাসের সীতার মৃত্যুর মতো। বাইরে সচেতন জগতে ক্রিয়াকর্মে তৎপরতায় শিক্ষাপ্রসারে সমাজসংস্কারে বিধবাবিবাহদানে তিনি নিজের অহংকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছেন। রক্ষা করতে চাইছেন ঠিকই, কিন্তু অন্তরের নিভৃত সৌন্দর্যকে যেন আর স্পর্শ

---

৮. এ সম্বন্ধে গভীর মনোভাবও স্মরণীয়, সত্যানন্দের প্রতি চিকিৎসকের উক্তির মধ্যেই ইংরেজসম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত, ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনমুক্ত করা বঙ্কিমের অভিপ্রেত, কিন্তু তার পূর্বে তাদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষায় স্বাধীন হতে হবে; বিদ্যাসাগর ইংরেজ সম্বন্ধে এইরকম চিন্তায় মনোনিবেশ করেন নি কখনো:

'ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত; লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া, অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন আর্যধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান গুণবান আর বলবান হয় ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।' আনন্দমঠ, প্রথম সংস্করণ।

করতে পারছেন না। দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর সীতার মতো সমাজের চাপে মরে গেল। এই দিক থেকে মধুসূদনের মতোই, সীতার মৃত্যু বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রতীক ব্যঞ্জনাময়।

'ইহা বলিয়া, বাল্মীকি বিরত হইলে, সভামণ্ডপে অতিমহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, নরপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতাদেবীর পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যারপরনাই পরিতোষ লাভ করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম এতক্ষণ বিষম সংশয়ে কাল যাপন করিতেছিলেন; এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতার পরিগ্রহবিষয়ে সর্ব সাধারণের সম্মতি নাই। এ জন্য তিনি অতি ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া উপায়ন্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়াছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া বাতাহতা লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।'

শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণ ও সুষম, অধ্যক্ষপদের থেকে ইস্তফা দিয়ে বিদ্যাসাগরও সীতার মতো মানুষের মনের সংশয়ে ও আঘাতে সঙ্কুচিত, শেষে অন্তরে মৃত।

'সীতার বনবাসে'র চার বছর বাদে 'প্রভাবতী সম্ভাষণে' এই নিভৃত কামনা ও সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বপ্নে তাকে প্রতীকে জাগিয়ে তুলেছেন; বাস্তব থেকে স্বপ্নে এই সৌন্দর্য ও কামনা পর্যবসিত:

'এইরূপে, আমি, সর্বক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।[১] দৈবযোগে, একদিন, দিবা-

---

৯. এই রচনারীতির প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রেও লক্ষ করা যায়, বিদেশ থেকে আহৃত ছেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গে গদ্য ভাষাকে নৃত্যপর করবার চেষ্টা বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রে আছে: 'অতি বিস্তৃত অরণ্য—বিচ্ছেদশূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য, মধ্যাহ্নেও আলোক, অস্ফুট, ভয়ানক।' আনন্দমঠ

ভাগে, আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেইদিন, সেই সময়ে, ক্ষণ-কালের জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অভূতপূর্ব আগ্রহসহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এমন আকস্মিক মর্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সে দিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

* * *

বৎসে! কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোন অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃত রসে অভিষিক্ত হইত।

* * *

কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপরনাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব; তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অনুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

এর ছ'বছর বাদে শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্রে ভেতরেও বাইরের বিচ্ছেদের ও দ্বন্দ্বের জ্বালাময় ইতিহাস বিদ্যাসাগর নিজেই বিবৃত করেছেন: 'নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ

অতি সামান্য কথা। কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা, কাহারও উচিত নহে।'

সমাজের সঙ্গে জাতির সঙ্গে আর আইডেন্টিফিকেশন বা একাত্মতা ঘটছে না। দুয়ের মিলনে সুষমা অন্তর্হিত, বিদ্যাসাগরও সমাজকে সমালোচনা করে দূরে সরিয়ে রাখছেন, সমাজও তাঁকে নির্বাসিত করতে চাইছে, ভেতর ও বাইরের ফারাক ঘটছে বিস্তর, ইংরেজি লিবারেল শিক্ষার আত্মস্বতন্ত্রতা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে এখন বিদ্যাসাগরের কাছে; নিজেকে সকলের মধ্যে, সকলকে নিজের মধ্যে আর মিলিয়ে নিতে পারছেন না তিনি, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত অহংমুখী : 'আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ।'

জীবনের শেষের দিকে দৌহিত্রদের সঙ্গে ঠাট্টা বা কথাবার্তায় তাঁর হৃদয়ের মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতাই ব্যক্ত করেছেন বিদ্যাসাগর। এক একদিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগরের বসবার ঘরে পরিবারের সকলে মিলে ঠাট্টা-আমোদ করতেন। সকলের ছোট গুজে বা রামকমলই এ আসর জমিয়ে রাখতো, বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্রও ছিলো সে, এর জন্যে বিদ্যাসাগর। তাকে উপহার দেবার জন্যে সিকি দুয়ানি আধুলি টাকা সব সময়ই কাছে রাখতেন; দৌহিত্র চাইবামাত্র তাকে দিয়ে জিগ্যেস করতেন বিদ্যাসাগর : 'দাদা, তুমি কাকে ভালোবাসো?' শিশু উত্তর দিতো : 'দাদামশাই, তোমাকেই খুব ভালোবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নতুন নতুন সিকি দুয়ানিকে বেশি ভালোবাসি।' বিদ্যাসাগর বলতেন : 'সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝো না, তাই বলে ফেলো, অন্যেরা ওকথা স্বীকার করে না।'

জীবনের এই অশান্তি ও আঘাত থেকে, ব্যর্থতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি ও শান্তি পেতেন কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের সহজ স্বচ্ছন্দ অকপট জীবনে মিশে, তাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভালোবাসা পেয়ে এবং তাদের রোগে শোকে সেবা ও পরিচর্যা করে নিজের কষ্ট ভুলে থাকতেন, স্নায়ুপীড়ার হাত থেকে

স্নেহই পেতেন; এখানে আবার সেই পারস্পরিক হৃদয় বিনিময়, তাই একাত্মতা। কোনো নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতা নেই বিদ্যাসাগর ও তাদের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের কালের মানুষ ঔপনিবেশিকতায় শিক্ষিত দ্বিমুখী মানুষ, এবং ব্যক্তিস্বার্থে কিছুটা কপট; তাই অকপট বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এদের বিরোধ নিরন্তর; ভ্রাতারাও এর থেকে বাদ যায় না। পিতা ঠাকুরদাস পুত্রের চিন্তাভাবনা অনুভব জীবনের আদর্শ ও নিষ্ঠা বুঝতে পারতেন না, মায়ের সঙ্গে ইন্‌স্টিংক্টের দিক থেকে আত্মিকতা থাকলেও ব্যবহার ও আচরণে, জীবনচর্যায় হয়তো ফারাক ছিলো। মায়ের কাছ থেকেই সেবা, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, দান ও ত্যাগের স্বভাব পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, ভগবতী দেবী জীবন্ত ভগবতীর মতোই পুত্রকে শিখিয়েছিলেন মানুষের-গড়া কাঠ খড়দড়ির প্রতিমা মানুষের উপকার করতে পারে না, মানুষই মানুষকে ভালোবাসায় সেবায় দয়ায় তার দুঃখ দূর করতে পারে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর কাজ করেন সেবায় দয়ায় ভালোবাসায়। তবু আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত বিদ্যাসাগর পরিবারকে এবং তার নিজের পুত্রকে যেভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, ভগবতী দেবী কখনোই তা বুঝতে পারেন নি। ইন্‌স্টিংক্টের মিল থাকলেও বাইরে এই বিরোধ, নারায়ণকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে যথেচ্ছাচারী ও বিপথগামী করে তুলেছেন বিদ্যাসাগরের পিতা ও মাতা।

সান্ত্বনা পেতেন আর্তের দুঃখীর সেবা করে, দান করে, নিজেকে বিলিয়ে দিতেন দুঃখদূরের মধ্য দিয়ে। এই স্বভাব থেকে নিবৃত্তি তাঁর কখনো হয় নি; এত দুঃখের মধ্যে এ এক রকম বীর্যবত্তা ও পৌরুষ।

আর নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে চাইতেন নিরক্ষর দুঃখী মানুষের সন্তানদের শিক্ষার আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে; শিক্ষার আলো যতোই তাদের অন্ধকার বুকের মধ্যে পড়েছে, ততোই যেন তাঁর হৃদয়ের জ্যোতি প্রসারিত হচ্ছে, সেই জ্যোতিতে তিনি আলোকিত হচ্ছেন। তাইতো কার্মাটাঁড়ে নিরক্ষর অখ্যাত সাঁওতালদের শিক্ষার জন্যে শেষ বয়েসেও ইস্কুল করে দিয়েছেন, শুধু অন্নবস্ত্র ওষুধ দিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি, মানুষদের জাগাতে চেয়েছেন, এই মানুষ কোনো শ্রেণী জাতিবর্ণ সম্প্রদায়ে প্রভেদে চিহ্নিত ছিলো না, মানুষরূপেই তার পরিচয় তাঁর কাছে। তাই বর্ধমানে মুসলমানদের জন্যেও তার হৃদয় উন্মারিত। রামমোহন ব্রাহ্মধর্মে জাতিধর্ম বর্ণভেদকে মুছে দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের ভেদকে; তাই বিদ্যাসাগর জীবনে একাকী, নিঃসঙ্গ, অসুখী, অশান্তিপীড়িত হলেও ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ হন নি, পেসিমিস্ট হন নি, জীবনের বোধ তিক্ত হয়ে ওঠে নি, মৃত্যুর কদিন আগেও চন্দননগরে বিকলাঙ্গ এক শিশুর সুস্থতার জন্যে অর্থসাহায্য দিয়ে শিশুর পিতা ও মাতার থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করে করুণা ও দয়ায় নিজেকে বিস্মৃত করতে চেয়েছেন জগতের সঙ্গে। এ ঠিকই, ঔপনিবেশিক

শাসনে, অর্থনৈতিক পরাধীনতায়, বিকলাঙ্গ সমাজ পরিবেশে, ভ্রান্তশিক্ষায় যে কপট ও স্বার্থান্বেষী ও প্রতারণাময় মানুষের চলাফেরা ও ওঠাবসা, তাতে দয়ায় ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু পৌরুষে ও বীর্যবত্তায় বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে সমষ্টিকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য; যদি না চিত্তের উদ্বোধন ঘটে। তাই জাতীয় আন্দোলনও ব্যর্থ আমাদের।[১০] বিদ্যাসাগর খুব সংকীর্ণ পরিসরে ও সীমিত চেষ্টায় বিদেশি শাসনের নাগপাশে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে জনগণকে সেইভাবেই উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন, উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ঐক্য আনতে চেয়েছেন পরোক্ষভাবে, পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথেরও এই চেষ্টা ছিল।

মানুষকে কোনো মডেলে ফেলে বিশ্লেষণ করলে সে হাস্যকর হয়ে উঠবে। বিদ্যাসাগর মানুষ হিশেবে সতেজ ও সজীব সুস্থ এবং প্রাণবন্ত, সমাজ পরিবেশ ও মানুষের চাপে তিনি পীড়িত ও অসুখী, অথচ যেখান থেকে তাঁর চিত্তের ব্যথা ও বেদনা এবং যন্ত্রণা, সেই সমাজের থেকেই তাঁর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম। বিদ্যাসাগর হৃদয়বান মানুষ, ইমোশনে আপ্লুত হন, ইমোশনকেই যুক্তি দিয়ে বাঁধেন। বিধবাবিবাহের পেছনে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাই প্রণোদিত করেছে তাঁকে বৃহত্তর ও সর্বজনীন কল্যাণে; তাঁর গ্রামের বাড়ির পাশে তাঁর বাল্যসহচরীর বালবৈধব্য পঠদ্দশায় তাঁকে বিচলিত ও মূঢ় করে দিয়েছিল, এই কর্মী ও মহাপুরুষের হৃদয়ে সেই হৃদয়ের গোপন আকর্ষণই হয়তো এই বৃহত্তর কর্মে প্রেরণা দিয়েছে। সেই সঙ্গে বয়স্ক বৃদ্ধ অধ্যাপকের মৃত্যুতে তাঁর বালিকা স্ত্রীর বিধবারূপ দেখে সমাজের নিষ্ঠুর চেহারায় আত-ঙ্কিত এবং তাঁকে যন্ত্রণা জর্জরিত করে তুলেছিল। বিধবাবিবাহ নিয়ে আন্দো-লন বিদ্যাসাগরের নতুন প্রচেষ্টা নয়, ইয়ংবেঙ্গলেরা ও নব্যশিক্ষিতেরা পত্র-পত্রিকায় এই আন্দোলন তত্ত্বগতভাবে করেছেন; কিন্তু সতেজ প্রাণের স্পর্শে তাকে কর্মে রূপায়িত করবার শক্তি, তাঁদের ছিলো না। জ্বলন্ত হৃদয় তাঁকে এই পথে এনেছে। বাল্যবিবাহসম্বন্ধেও সেই একই কথা, নিজের জীবনেই তো এই বিষময় ফল দেখেছেন, গিরিশ বিদ্যারত্নের আত্মজীবনীতে এই বাল্যবিবাহ মানুষকে গড়ে উঠতে কিভাবে বাধা দেয় তার ইঙ্গিত স্পষ্ট আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তত্ত্বে এসে তাকে কর্মে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। শুধু যুক্তি ও সর্বজননীন বুদ্ধি দিয়ে মানবকল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরসম্বন্ধে এরকম সিদ্ধান্ত বাতুলতা।

ইংরেজিতে হিউম্যানিটি, হিউম্যানিজম, হিউম্যানিস্ট, হিউম্যানিটা-রিয়ানিজম প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। রেনেসাঁসের মডেলে তাঁকে

---

১০. বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, 'আনন্দমঠে' তার কিছু প্রতিফলন আছে।

হিউম্যানিস্ট ভাবলে বিদ্যাসাগরকে শুধুমাত্র একজন প্রাচীন মানবিকী বিদ্যায় বিশারদ রূপে গণ্য করতে হয়। কিন্তু তাঁর মানবহিতৈষণা বর্তমান জীবনের সঙ্গে জড়িত। তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন ঠিকই কলেজ থেকে, কিন্তু তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিজীবী মানুষ হয়ে জীবন কাটান নি, জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত। হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদসম্বন্ধে একালের ভাবনা দিয়েও তাঁকে মানবতাবাদী আখ্যায় ভূষিত করা যায় না : মানুষ কর্মে ও ব্যবহারে নিজেকে গড়ে তুলছে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে প্রকৃতিকে বশীভূত করে রূপান্তরিত করে প্রকৃতির নিয়মকে আয়ত্ত করতে চাইছে যেমন, তেমনি নিজেকেও অসীম সম্ভাবনায় সৃষ্টি করে তুলছে, নিজের চেষ্টায় সম্পদ ও প্রয়োজন বাড়িয়ে তুলছে, মানুষ তার পরিবেশকে নতুনভাবে মানবায়িত ও প্রাকৃতিক করে তুলছে ; এই মানবতাবাদ ঔপনিবেশিক পরাধীনতায় কখনোই সম্ভব ছিলো না। প্রকৃতিকে বশীভূত ও রূপান্তরিত করবার জন্যে বিজ্ঞানের কোন্ আবিষ্কার বাঙালিকে প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে শিখিয়েছিলো? কোন্ সম্পদ ও চাহিদা সে সৃষ্টি করেছে? ব্যাবহারিক কর্মে তার সেই স্বাধীনতা কোথায় ছিলো? এখনো কি অনুন্নত দেশে আছে? সুতরাং মানবতাবাদের হয়তো একটা সংকীর্ণ অর্থ তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি, তিনি অলৌকিক নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, ঈশ্বর তাঁর কাছে সমস্যা নয়, মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য অশিক্ষা অন্নাভাব মানুষের নিষ্ঠুর আচার বিচলিত করতো, ভাবিয়ে তুলতো, এগুলি সবই মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সেই অর্থে মানবতা এদের মধ্যে অন্তর্গূঢ়। কিন্তু মানবতাবাদের নিহিত তাৎপর্য এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে না। কেননা মানবতা যখন আত্মিক স্তরে পৌঁছোয়, বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে তখন ধর্মীয় বোধ এক হয়ে যেতে চায়, আত্মসংযম আত্মিকতার সর্বোচ্চ উপায়, মানবতাবাদী চিন্তায় এবং ধর্মীয় বোধের মধ্যে একই সঙ্গে আছে। মানবীয়তা বা হিউম্যানিটারিয়ানিজম নিয়ে বিদ্যাসাগরের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না, এবং দেবতা নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা ছিলো না, তাঁকে মানবীয় করে তোলবার সমস্যা তাঁকে পীড়িত করেনি, ত্রিত্ব বা ঐক্য চিন্তার বিপরীতে খৃীস্টের মানবীয়তা নিয়ে যে-আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগের পরে গড়ে উঠেছে, আমাদের দেশে তার উপযোগিতাও নেই, কারণ আমাদের দেবতা মানুষ হয়েই আসে। কৃষ্ণ সেই মানুষ, বঙ্কিমকে এই মানবীয়তা স্পর্শ করলেও বিদ্যাসাগরকে করেনি, কেননা এটা তাঁর কাছে মূল্যহীন। কিন্তু হিউম্যানিটি বা মনুষ্যত্বই বিদ্যাসাগরের জীবনের চরিত্রের মূল ধর্ম। মানুষের জন্যে অন্তরে দয়া ও সমবেদনায় আপ্লুত ; ভালো করবার, মঙ্গল করবার, দুঃখ দূর করবার ইচ্ছা শুধু নয়, দুঃখ দূর করবার জন্যে প্রাণপাত করা, এই দয়া ও সমবেদনার বিশিষ্ট ধর্ম, মনুষ্যত্বের এটাই লক্ষণ, হৃদয়বোধের এই বিশিষ্টতার গুণেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিদ্যাসাগর অক্ষয়

মনুষ্যত্বের অধিকারী ; যিনি মনুষ্যত্বের অধিকারী, যাঁর হৃদয়ে মানুষের দুঃখে দয়া ও সমবেদনা উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তারই প্রভাবে মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্যে যে শক্তি, তারই নাম হয়তো পৌরুষ, সুতরাং মনুষ্যত্বের সঙ্গে পৌরুষ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। বিদ্যাসাগরের বিদ্যা পাণ্ডিত্য দয়া নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু এই অক্ষয় মনুষ্যত্বের গুণেই মধুসূদনের ভাষায় তিনি প্রথম মানুষ, শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মনুষ্যত্বের এই জ্যোতির্ময় প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কারো মধ্যে দেখা যায়নি কপটতা ও দ্বিমুখিতার জন্যে, স্বার্থের সঙ্গে আপোশের জন্যে, রামমোহনকেও এই দুর্নাম থেকে মুক্ত করা যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মধ্যে মনুষ্যত্বধর্মের কোনো গ্লানিমা নেই ; এ যেন অদিতির প্রথম পবিত্র জ্যোতি সমস্ত বিশ্বভুবনে চেতনা সঞ্চার করছে। তাই মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথই বিদ্যাসাগরকে যথার্থ চিনেছিলেন। কিন্তু যাঁর মধ্যে এই রকম মনুষ্যত্ব, যিনি অপরের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করেন, দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁর নিজের দায়িত্বের কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সমর্পণ করে স্বাধীন হয়ে ওঠেন, সেই স্বাধীনতায় তিনি শুধু সংগ্রাম করেন বাধার সম্মুখীন হয়ে, তাকে তাঁর মনুষ্যত্বের জন্যে তাঁর স্বাধীনতার জন্যে তাঁকে কষ্ট যন্ত্রণা ও দুঃখ পেতেই হবে। পরের দুঃখ দূর করতে গেলে দুঃখবরণ করে নেওয়াই জীবনের নিয়তি, এই নিয়তিই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাঁর সারা জীবন। তিনি পরের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করেন, কিন্তু অন্যেরা তাঁর দুঃখ বুঝতেই পারে না, এখানেই তো ট্রাজিক সংগ্রামময় নাটক।

মানুষই মনুষ্যত্বগুণের অধিকারী হয় মৃগতরুপক্ষীরা হতে পারে না, মানুষ মনুষ্যত্বগুণের অধিকারী হয় যুক্তির যোগে ও ঐক্যে, যেখানে সত্যের সঙ্গে ঈশিতার সঙ্গম ঘটে। এখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব অন্যের হৃদয়ে আসন লাভ করে এবং যুক্তির মধ্যে হৃদয় এক হয়ে আছে।

বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে যে উদ্যম ও উৎসাহ দেখিয়েছেন, সেখানে তাঁর জ্বলন্ত হৃদয় সুস্পষ্ট। পুরুষের সমান অধিকার দেবার জন্যে, নিজেকে সকলের চোখে এনলাইটেন্ড ভাবার জন্যে, প্রগতিপরায়ণ করে তুলতে, সাহেবদের কাছে নিজের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলবার জন্যে, আধুনিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অংশ নেবার জন্যে ইয়ংবেঙ্গল ও নব্যশিক্ষিতের মতো নারীশিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন নি, বক্তৃতা দেন নি। তান্ত্রিক মাতামহের ধারা তাঁর মধ্যে বইছিল, সৃষ্টিশক্তিকে তিনি নারীর মধ্যে যেন দেখতে পেয়েছিলেন, সকল পদার্থের ওপরে এই নারীশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করেছে, বুদ্ধির মধ্যে চৈতন্যের কারণ তো এই সৃষ্টিশক্তি ঃ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। হয়তো অজ্ঞাতে অবচেতনে, জাতির অবচেতনে নারীশক্তিসম্বন্ধে এই বোধ বিদ্যা-সাগরের মধ্যে কাজ করছিল, এবং শাস্ত্রের আদর্শ তো বাল্যকাল থেকেই পেয়ে আসছিলেন ছাত্রাবস্থায়ই ; যেখানে নারী সমাদর পায় সেখানে দেবতারাও

প্রসন্ন থাকেন, যেখানে সমাদর পায় না, সেখানে সমস্ত কর্ম ফলহীন। যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। সর্বোপরি ভগবতী দেবীর মতো মায়ের প্রভাব, যিনি নিজে দরিদ্র হয়েও অতিথি ও দুঃখীকে সেবা করে সন্তুষ্ট হতেন; এবং রাইমণির মতো বাল্যকালে নারীর সান্নিধ্য, যাঁর স্নেহ সকল সন্তানের প্রতি সমানভাবে বর্ষিত। এই নারীর এই স্নেহ মমতা দয়া আদর্শই বিদ্যাসাগরকে নারীর মুক্তিসম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলো। বিধবাবিবাহ বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ এবং নারীশিক্ষা এসবই একই সূত্রে গ্রথিত, শুধু পুরুষের আত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হিশেবে নয়। শক্তিরূপিণী জ্যোতির্ময়ীরূপে নারীকে তিনি দেখেছেন, তাই তাদের চারপাশের অন্ধকার ও চিত্তের অন্ধকার দূর করে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর। এবং বিদ্যাসাগর পুরুষের চেয়েও নারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তৎসত্ত্বেও সমাজের দেওয়া ঐতিহ্য ও সংস্কার যে অন্ধকার সৃষ্টি করেছে নারীর হৃদয়ে, তা তিনি দূর করতে পারেন নি। এখনো কি অন্তর্হিত হয়েছে? এই অন্ধকার জীইয়ে রাখতে পুরুষ শুধু সাহায্য করেছে। তিনি যদি স্নেহ ভালোবাসা মমতা দয়া না পেতেন, তাহলে এই জ্বলন্ত অনুভব এমনভাবে গড়ে উঠতো না। বাল্যসহচরীর প্রতি তাঁর হৃদয়ের আকর্ষণ এবং তাঁর প্রতি বাল্যসহচরীর আকর্ষণও এই প্রবল কর্মোদ্যমের পশচাতে সক্রিয় ছিলো। কিন্তু দুঃখ এইখানে, যেখানে সমগ্র জাতিকে নারীশিক্ষায় আলোকিত করেছেন, সেখানে পিতা ঠাকুরদাসের নারীশিক্ষার প্রতি বিরূপতার জন্যে গৃহের বধূদের শিক্ষিত করে তুলতে পারেন নি; এখানেও তাঁর দ্বন্দ্ব।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আর একটি মডেল অর্ধশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের লক্ষণ: তিনি বিদ্যা দিয়ে বাণিজ্য করেছেন, বিদ্যা তাঁর মূলধন, অবাধ বাণিজ্যের মতো বিদ্যার মূলধন খাটিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চিত করে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ইনডিভিজুয়ালিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ ইতালিতে রেনেসাঁসের যুগে বণিক মূলধনরীতি যেমন গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক জড়তার বিরুদ্ধে; বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করে, ছাপাখানা থেকে নিজের বই ছাপিয়ে মুনাফা লুটেছিলেন, বইয়ের দোকান করে বই বেচেও পয়সা অর্জন করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বৃত্তিগত পেশার বাইরে অর্থোপার্জন অসম্ভব ছিলো। ইংরেজের রাজত্বে এই সমাজব্যবস্থা চুরমার হয়ে যায়; ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছায় পেশা নির্বাচন করতে পারে এবং ব্যক্তি-অধিকারের প্রসারে যে-কোনোভাবে অর্থ-উপার্জন তার পক্ষে অন্তরায় নয়। বিদ্যাসাগরও এই পথ বেছে নিয়েছিলেন, এই ব্যাপারে ইংরেজের সহায়তাও স্মরণীয়; কেননা, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছাপিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে শর্তমতো এক শ কপি বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছিলেন, তাতে প্রেস কেনবার ধার শোধ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু বণিক-মূলধন বা মারচেন্ট ক্যাপিটালের মূল কথাই হলো:

মানি বা টাকার মূলধনকে উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করা, এরপরে উৎপাদনে উৎপাদনের উপায়কে পাল্টে ফেলে নতুন পণ্যদ্রব্যের সৃষ্টি ; এই পণ্যদ্রব্যসৃষ্টিতে শিল্পজাত মূলধন তৈরি হয় ; শেষ স্তরে পণ্যদ্রব্য-মূলধন টাকার মূলধনে বাস্তবায়িত হয়। প্রেসে বই ছাপিয়ে টাকার মূলধনকে কি বিদ্যাসাগর উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করে শিল্পজাত মূলধনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কখনো ? ঠাকুরদাসের আমল থেকেই ব্যক্তিগত পেশার সীমা বিদ্যাসাগরের পরিবারে ভেঙে গিয়েছিল। সামান্য কয়েকটি ইংরেজি শব্দ শিখে খাতা লিখে তাঁকে মাসিক মাইনে নিয়ে সংসার চালাতে হতো, দারিদ্র্যের জন্যেই সংস্কৃত পন্ডিত পরিবারের বৃত্তিজাত প্রথা ভাঙতে বিরূপতা পেতে হয় নি, কিন্তু ঠাকুরদাসের সংস্কারে অবচেতনে এই বৃত্তির প্রতি আকর্ষণ ছিলো তীব্র। তাই পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলবার প্রেরণা ও উদ্যম দিয়েছিলেন, ছাত্রবৃত্তির টাকা দিয়ে জমি ও পুঁথি কিনে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এদিকে একেবারে সংস্কারমুক্ত। রসময় দত্তের সঙ্গে যখন বিরোধ বাধছিল তাঁর আত্মসম্মান ও স্বাধীন চিত্ততায়, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে দরকার হলে তিনি আলুপটল বেচবেন। কিন্তু কখনো বলেননি যে তিনি গাঁয়ে গিয়ে টোলে পড়াবেন। ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ও সেই ছাপাখানা থেকে নিজের ছাপানো ব্যাবসার চেয়েও নিজেকে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষারই ইঙ্গিত দেয়। পয়সা নিশ্চয়ই এসেছে, যার জন্যে বঙ্কিমের মনেও হয়তো কিছু ঈর্ষা কাজ করেছিল তখন, কারণ সেই যুগে বই থেকে মাসে তিন-চার হাজার টাকা উপার্জন বিস্ময়কর বাঙালির পক্ষে। কিন্তু সেটা হয়েছে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। তাঁর পাঠ্যপুস্তক তখন কে ছাপতো নিজে না ছাপলে ? পাঠ্যপুস্তক ছাপানোতেই তাঁর ব্যাবহারিক বুদ্ধির পরিচয় ব্যক্ত। কিন্তু বই বিক্রির টাকায় তিনি কি ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি করতেন বণিকেরা যেমন মূলধন খাটিয়ে করে থাকে ? বিদ্যাকে মূলধন হিশেবে মধ্যযুগে ও পুরাকালে পণ্ডিতেরা খাটাতেন না টোলে পড়িয়ে অথবা সভায় পণ্ডিত সেজে ? অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা সেটা করে না এখন কলেজে ও বিদ্যালয়ে পড়িয়ে ? কলেজে পড়িয়ে মার্কসিস্ট বুদ্ধিজীবী হয়ে পত্রিকা চালিয়ে সুকৌশলে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে হাজার হাজার টাকা আয় করে প্রকাশন প্রতিষ্ঠান খুলে অর্থ উপায় নিশ্চয়ই বণিকবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে না !

বিদ্যাসাগরসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার আরও নমুনা, তিনি সিপাহীবিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজ মিলিটারিদের হাতে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যপ্রসারে সহায়তা করেছেন ; ইংরেজের সহযোগিতা করেছেন ; ইংরেজের প্রতি তাঁর আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে। একথা বিস্মৃত হলে অপরাধ যে বিদ্যাসাগর সরকারী কর্মচারী ছিলেন যখন সিপাহীবিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজ মিলিটারিরা

দখল করে। সরকারের হুকুমনামায়ই সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পঠনপাঠনে অসুবিধে হবে জেনে আপত্তি করেছিলেন প্রথমে। আপত্তি যখন টেঁকেনি, তখন বৌবাজারে তিনটি বাড়ি ভাড়া করবার জন্যে সরকারের কাছে অর্থ চেয়েছিলেন, সেই অর্থ মঞ্জুরও করেছিলো সরকার। ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারি নির্দেশ দেয় বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে, বাংলা সরকারের সেক্রেটারি কলেজ খালি করবার জন্য চিঠি দেয় বিদ্যাসাগরকে। এই নির্দেশের ফলে কলেজ এতো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হয়েছিল ডি. পি. আই ইয়ংকেও বিদ্যাসাগর জানাতে পারেন নি; এই নিয়ে ইয়ঙের সঙ্গে সামান্য মতান্তরও হয়। তবে সিপাহীবিদ্রোহসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমত কী ছিল, তা জানবার উপায় নেই। কেননা, কোনো রাজনৈতিক চিন্তায় ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনৈতিক বিরোধে বিদ্যাসাগরের কোনো সজাগ মনের চিহ্ন নেই।[১১]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসম্বন্ধে, দেশের দুর্দশা-বিষয়ে লেখা বেরিয়েছে। তিনি হয়তো নির্বাচন ও সংশোধনও করেছেন, কিন্তু নিজে এ ব্যাপারে লিপ্ত হননি। তবে বাংলাদেশের নিরক্ষর নিরন্ন দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত মানুষসম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা যতো প্রসারিত, ব্যাপক, গভীর, অন্য কারো ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন দরিদ্র, তাই দরিদ্রের দুঃখ জানতেন, তাঁর দারিদ্র্য ঘুচলেও তিনি দরিদ্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হননি কখনো; রাজারা দরিদ্রদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে একসঙ্গে দেখে লজ্জিত হয়ে কথা বলতে সংকুচিত হতেন। বিদ্যাসাগর রাজাদের ত্যাগ করে দরিদ্রদের সঙ্গে থাকাই শ্রেয় ও আনন্দের মনে করতেন। এই দুঃখী জনসাধারণের প্রতি বিদ্যাসাগরের অপরিসীম করুণা ও ভালোবাসা, সেখানে মেথর মুচি হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চানের কোনো ভেদ নেই; তাঁর কাছে শুধু একটিই সত্য: এরা দুঃখী দরিদ্র মানুষ। এদের দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর করতে হবে। কথা দিয়ে নয়, বক্তৃতা দিয়ে নয়, নিষ্ক্রিয় সমবেদনায় নয়, নিজের জীবন দিয়ে, নিজের সামর্থ্যের অনুসারে। তিনি দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের দুঃখ তিনি একা দূর করতে পারেন না। সে ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর সীমিত সামর্থ্যে যেটুকু সম্ভব ছিল, সেটুকুই করেছেন, সেখানে কোনো কার্পণ্য নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই; তিনি লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের

---

১১. রামগোপাল ঘোষ ১৮৪৩ সালে ২০ এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভায় যে-বক্তব্য পেশ করেন, সেটাই ছিলো শিক্ষিত বাঙালির রাজনৈতিক মনোভাব: এর সদস্যেরা রাজবিদ্রোহী না হয়ে, ইংলণ্ডের রাজার চালিত আইন মেনে নিয়ে ভারতবর্ষের সকল প্রকার মঙ্গলের চেষ্টা করবেন।

দুঃখ দারিদ্র্য দূর করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি দেশের জনগণের হৃদয়ে শিক্ষার আলো দিয়ে মনের দারিদ্র্য দূর করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে অনেকটাই সমর্থ হয়েছিলেন। জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণের মধ্য দিয়েই তাঁর স্বদেশানুরাগ ও দেশসেবা, এই দেশসেবা সদর্থক। মানুষ যদি শিক্ষার আলো পায়, তাহলে সে যে-কোনো কাজ করতে পারে, সে স্বাধীন হতে পারে, স্বাধীনতা মানেই বাধা অতিক্রম করার অদম্যশক্তি ও সংগ্রাম, নিজের দায়িত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ; স্বাধীনতাসম্বন্ধে এই উদারনৈতিক চিন্তা ও মনোভাবই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁকে নিয়োজিত করেছে। এইখানেই তিনি পরাধীন ভারতবর্ষে জনগণকে পরোক্ষে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। অন্য উপায়ে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করবার উপায় সুযোগ পরিবেশ ও তাঁর সামর্থ্য ছিলো না; হয়তো সততা ও আন্তরিকতা বিঘ্নিত হতো।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কী সূত্রে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়েছিল, তার যথার্থ তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন বিদ্যাসাগর আঠারশ আটান্ন সালে, কিন্তু তার অনেক আগে আঠারশ তেতাল্লিশ সালে ষোলই আগস্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বেরয়। এই পত্রিকার পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু, যিনি বিদ্যাসাগরের বাল্যবন্ধুঃ তিনিই হয়তো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে বিদ্যাবত্তায় গদ্যরচনার নিপুণতায় পেপার কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠ হিশেবে গণ্য হন। রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। দুই পরিবারই ঐশ্বর্যশালী জমিদার, প্রতিপত্তিতে এবং ইংরেজি শিক্ষায় আধুনিক চেতনাসম্পন্ন। দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গতা বেশি মানসিকতার দিক থেকে, কেননা দুজনেই যুক্তিবাদী, ঈশ্বরে তেমন আস্থাশীল নন। যুগ ও দেশসম্বন্ধে সচেতন, বাইরে জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই ইহ জীবনে মানুষের বেঁচে থাকবার সার্থকতা, কর্ম ও শ্রমেই মানুষ নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, দুজনেই যুক্তিধর্মী, সংহত গদ্য-রচনায় উৎসাহী। রাজনারায়ণ বসুর লেখা ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ব্রাহ্মধর্মের ওপর প্রবন্ধ সম্ভবত বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তই ছাপতে রাজি হননি, তাতেই বিরক্ত হয়ে এ দুজনের সম্বন্ধে রাজনারায়ণকে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে সুবিধা নাই।' দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বকে স্ফুরিত করেছে ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে রামমোহন থেকে যে-যুক্তি ও মানবিক ধারা চলে আসছিল, দেবেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র সেনেএসে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ

হয়ে গেছে। দেবেন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগর নাস্তিক হলেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরে গভীর যোগ ছিল; দেবেন্দ্রনাথও ধর্মের মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারই করতে চেয়েছেন, রামমোহনকে যদি ব্রাহ্ম হিশেবে গণ্য করি, তাহলে রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত এই সমাজসংস্কারের ধারা অব্যাহত। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের 'প্রাতঃস্মর্তব্যম্'-এ আছে : 'লোকেশ চৈতন্য-ময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণো, ভবদাজ্ঞয়ৈব হিতায় লোকস্য, তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামনু বর্তয়িষ্যে' রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের সকালে পাঠ্য এই মন্ত্রটি 'মঙ্গল্য'-এর স্থানে 'শ্রীকান্ত' আছে, 'হিতায় লোকস্য' স্থানে 'প্রাতঃ সমুত্থায়' ছিলো। 'শ্রীকান্ত' প্রয়োগে ঈশ্বরকে সাকার চৈতন্যস্বরূপ হিশেবে দেখতে চেয়েছেন রঘুনন্দন, বিষ্ণু মূর্তিময় নয়, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছেন। আর 'লোকস্য হিতায়' বসিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারের ও কল্যাণের আদর্শই ব্যক্ত করেছেন ; ব্যক্তিগত মোক্ষই ধর্মের উদ্দেশ্য তাঁর নয়। এই জায়গায় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগ। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এবং জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর নিহিত অর্থাৎ বিষ্ণু হয়ে আছেন, এই দুই মনোভাব দেবেন্দ্রনাথের ও বিদ্যাসাগরেরও। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে ধর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন, 'জ্ঞান-উজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ধর্ম', বিদ্যাসাগরের ধর্মও তো মানবহৃদয়, সে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়েছে যুক্তি সমন্বিত জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস, এই সব কারণের জন্যেই দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মের সঙ্গে সমাজসংস্কারই এর কারণ। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মানসিকতার যোগ যুক্তির ও মানবতার, দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় নাস্তিকতার। কিন্তু প্রভেদও আছে, পরবর্তীকালে দুশ্চিকিৎস্য মস্তিষ্ক পীড়ায় যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দেবতা-বিগ্রহের কাছে মাথা ঠুকেছেন অক্ষয়কুমার। বিদ্যাসাগর অসীম মানসিক শক্তির অধিকারী। তিনিও দুরারোগ্য যকৃতের ব্যাধিতে কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বরবিগ্রহের কাছে মাথা নোয়ানো নি। বিদ্যাসাগরের সমাজসচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষাপ্রসারে ও তার সংস্কারে, নারীশিক্ষাবিস্তারে, বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তনে, বাল্য ও বহুবিবাহ প্রতিরোধে, ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের অপনয়নে। কিন্তু রায়ত বা প্রজাদের ওপর জমিদারদের বিভিন্নমুখী শোষণ ও অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি নীরব, অন্তত কোথাও কিছু বলেন নি। অক্ষয়কুমার 'পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে বাংলাদেশের চাষির যে মর্মান্তিক অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন, পরবর্তীকালেও কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারে নি। পল্লিগ্রামের মানুষ, বিশেষ করে চাষি, দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, শরীর শীর্ণ, ম্লান মুখ, পরনে ছেঁড়া কাপড়। জমিদার রাজস্ব ছাড়াও শুল্ক, অনাদায়ী রাজস্বের জন্য নিয়মাতিরিক্ত রাজস্ব, শুল্কের বৃদ্ধি,

আরও বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বনি হিসাবানা—এ সমস্ত উপায়ে টাকা আদায় করতো। এছাড়া জমিদারের বাড়ি বিবাহ আদ্যকৃত্য দেবোৎসব পুণ্যাহ ক্রিয়া ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষেও মঙ্গলের নামে দস্যুবৃত্তি করে টাকা আদায় করতো তারা। আবার কোনো প্রজা যদি দেবতার মন্দির পাকাবাড়ি দেবোৎসব ও মঙ্গলকর্মানুষ্ঠান করতো, তাহলেও জমিদারকে শুল্ক দিতে বাধ্য হতো। এই-ভাবে নিঃস্ব হয়ে ঋণজালে জড়িত হয়ে মহাজনের খপ্পরে পড়তো, যদিও প্রশাসন ও বিচার কোম্পানির হাতে, কিন্তু পল্লিগ্রামে জমিদারেরাই শাসক ও বিচারক, এই দুই উপায়েই আবার অর্থশোষণ করতো এরা। এছাড়া রাস্তার শুল্ক, দ্রব্যের কর, বাণিজ্যের একচেটে অধিকার স্থাপন করেও পয়সা নিতো নিয়ম করে; এমন কি প্রজাদের নিজেদের শরীরও নিজের নয়, বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর কাজ করতে বাধ্য। তার ওপর জমিদারের গোমস্তা নায়েব পাইকের অর্থাৎ কর্মচারীর নির্মম অত্যাচার ও অর্থশোষণ তাদের দুরবস্থাকে আরো বাড়িয়ে দিতো। যাদেরই একটু অবস্থা ভালো, তারাই যে-কোনো উপায়ে নিরীহ প্রজাদের শোষণ করতো, জমিদারের বাজারসরকার পর্যন্ত। জমিদারদের সঙ্গেই ছিলো পাত্তনিদার ইজারাদার ও দর ইজারাদার, এমনিভাবে শোষণের স্তর ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হতো। জমিদারদের সঙ্গেই শোষণের আর এক যন্ত্র ফৌজদারি দারোগা পুলিশ, যে-কোনো অজুহাতে টাকা আদায় করতো, আদায় করতে না পারলে কয়েদ করে রাখতো। দারিদ্র্যে অত্যাচারে শোষণে অনাহারে এরা সব সময়ই নিরুৎসাহ বীর্যহীন ও সদাশঙ্কিত এবং ভীত ও ভীরু। তথাপি হৃত সর্বস্ব হয়েও এদের অসীম সহিষ্ণুতায়, ধৈর্যে, কঠিন প্রাণ শক্তিতে, নিজে কঠিন অনাহারে থেকে, পরের জন্য শস্যোৎপাদন করে। বাঙালি চাষির এই চিরন্তন পরিচয় তুলে ধরেছেন অক্ষয়কুমার। তাঁর প্রবন্ধ নিরক্ষর চাষিরা পড়বে না, জানবে না; কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় লোকদের এ শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করে দিচ্ছেন, যাতে তাদের চেষ্টায় তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। অক্ষয়কুমার নিজেও জানতেন চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তনে সামন্ত-তান্ত্রিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে আকুলতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতপত্রে অক্ষয়কুমার বলেছেন : 'আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।' বিদ্যাসাগর অর্থের জন্যে হাত পেতেছেন জমিদারদের কাছে সমাজ-সংস্কারের জন্যে, তাই এই দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি এবং তাঁর শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কার ছাড়া সমাজসংস্কার অনেকটাই শহরকেন্দ্রিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র নীলকর সাহেবদের বিষয়ে যে সচেতনতা প্রকাশ করেছেন সে-সম্বন্ধেও যেন বিদ্যাসাগর নীরব।

তাঁর সংস্কার কর্মে তিনি ইংরেজের সহযোগিতা ও সহায়তাই চেয়েছেন। জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে গেলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই যেতে হতো। কেননা জমিদার ও নীলকর সাহেবরা ব্রিটিশ সরকারেরই এজেণ্ট। হয়তো এটাও হতে পারে, শুধু ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করে লাভ নেই, যথার্থ কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের যতোটুকু বাস্তবিক হিত করা যায়, দুঃখকষ্ট দূর করা যায় ততোটুকুই করা কর্তব্য, এরকমই চিন্তা করতেন বিদ্যাসাগর। তাই বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল সমস্যায় সময়ের জন্যেই মাথা ঘামান নি। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত বলবার মতো তথ্য আমাদের কাছে নেই।

বঙ্কিম তাঁর শেষপর্বে বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু গদ্যের মধ্যে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ ছিলো না, কেননা সমকালের বাস্তবের এবং মানুষের জীবনের ছবি তাতে প্রকাশ পায় নি। একথা সর্বৈব সত্য নয়, সমাজসংস্কার বিষয়ক লেখায় আত্মচরিত ও প্রভাবতী সম্ভাষণে, বর্ণপরিচয়ের গল্পে তাঁর কালের মানুষের জীবনের বিচিত্র কাহিনীই অনুভূতির বিচিত্রতায় ভাষার বিভিন্ন স্টাইলে প্রকাশ করেছেন তিনি। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহবিষয়কেও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির স্বচ্ছতায় দেখতে চাননি বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর জানতেন শাস্ত্রের চেয়ে দেশাচারই প্রবল মানুষের মধ্যে, দেশাচারের জন্যেই তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যুক্তির স্বচ্ছ আলোকে দেশাচারের অন্ধকারকে দূর করতে চেয়েছেন। দেশাচার প্রবল বলেই তাকে স্বীকার করতে হবে, মেনে নিতে হবে, যতোক্ষণ না বুদ্ধির আলোকে হৃদয় আলোকিত হয়, বঙ্কিমের এই যুক্তি মেনে নেননি বিদ্যাসাগর। ব্যর্থ হতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সত্যের জন্যে যুক্তি দিয়ে উদ্যম চালিয়ে যেতেই হবে। আইন করে দেশাচারকে সংস্কারকে প্রথাকে দূর করা যায় না ঠিকই। বিদ্যাসাগর হয়তো এ বিষয়ে বেন্থামের আদর্শে প্রভাবিত; রাষ্ট্রের দ্বারা প্রবর্তিত আইন সকলের অবশ্য গ্রহণীয়; কেননা এ আইন সর্বজনীন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে-সময় আইনের সাহায্য নিয়ে দেশাচার ও কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছেন, সেই সময় ইংরেজের আইনের প্রতি বাঙালির ও শিক্ষিত ভারতবাসীর ভক্তি ও ভয় ছিল। ভক্তি ছিলো আইনের মধ্যে যুক্তির সর্বজনীনতার কারণে, ভলতেয়ারের মতো হয়তো বিদ্যাসাগরও মনে করতেন অপরাধীর শাস্তি উপযোগী হওয়া উচিত, আইনের সমগ্র হবে পরিচ্ছন্ন ঐক্যময় ও সংহত। তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমের এক জায়গায় অদ্ভুত মিল; বঙ্কিম বলেন: 'হিন্দুধর্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত তাহাই যে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।' বিদ্যাসাগর সমাজজীবন শাস্ত্রালোচনায় সত্যের বিশুদ্ধ রূপকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন, এবং শাস্ত্রের মধ্যে দেশের সংস্কৃতির ঐতিহ্যধারায়

প্রবাহিত, তাই সমাজসংস্কারে ঐতিহ্যবাহিত, সমাজধর্মের সঙ্গে সমাজের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও বোধকে বিদ্যাসাগর যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সত্যকে দেশে কালে ও সমগ্র জাতিসত্তার সঙ্গে সমগ্র ও এক করে দেখাই পরিপূর্ণ দেখা, সত্যের এই রূপই আধুনিক।

আধুনিক ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই স্কুলপূর্ব নার্সারি শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রবর্তন ও সংস্কারে সর্বপ্রথম হোতা। তাঁর বর্ণপরিচয় শিশুর প্রথম শিক্ষার সূচনা করে, বর্ণের সঙ্গে শব্দ, শব্দের সঙ্গে বাক্য এবং যুক্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণ দিয়ে বাক্য ও ধ্বনির সমন্বয়কে শিশুর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করে দেন, সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে গল্পের সাহায্যে ছবি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন। গল্পের মধ্যে যে জীবন, সে জীবন অলৌকিক নয়, কাল্পনিক নয়, বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবনের ছবি এবং ছাত্রাবস্থায় তাঁর বাল্যকালের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন সহজ ভাষায়। কথায় ছবি আছে, কিন্তু চিত্রে তাকে স্পষ্ট করা হয় নি। এছাড়া ধ্বনিবিন্যাস পদ্ধতি একালেও পুরনো হয়ে যায় নি। বাংলা ভাষাব ও শিক্ষাব ভিত তাঁর হাতেই তৈরি হয়। দুই বন্ধুর প্রচেষ্টাই স্থায়ী হয়েছে, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এবং প্যারীচরণের ফার্স্টবুক। একথা ঠিকই বাংলা ভাষার নিয়ম শৃঙ্খলা ধ্বনি ও ছেদে, সুস্পষ্ট অর্থের পরিচ্ছন্নতা ও বাক্যের শুদ্ধতা এনেছেন যেমন, তেমনি মুখের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। তাঁব সৃষ্ট ভাষাই বাংলাভাষার মান সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভাষার ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে কথা বলার স্বাভাবিক বিবাম ও বিশ্রামে। গদ্য ছন্দের মূল্যও এখানে। একালের সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তনও তাঁর হাতে, উপক্রমণিকা ও কৌমুদীর মধ্য দিযে বাংলায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় সংস্কৃত ভাষাশিক্ষায় প্রবেশ করবার সুযোগ তিনি করেছেন।

মাতৃভাষায় শিক্ষার চেষ্টা বিদ্যাসাগরের আগেই কিছু হয়েছে, কিন্তু তাকে হাতে কলমে সার্থক করে তোলবার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরেরই। তাঁর মডেল স্কুল, শিক্ষকদের ট্রেইনিং দেযার জন্যে নর্মাল স্কুল, খেটে-খাওয়া মানুষদের জন্যে নৈশ স্কুল, অবৈতনিক বিদ্যালয়, কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের জন্যে বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, নারী শিক্ষকদের ট্রেইনিং দেবার জন্যে স্কুল, গরিবদের স্কুলের পাশাপাশি ধনীদের ছেলেদের জন্যে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন গরিবদের জন্যে, কিন্তু বাধ্যতামূলক করতে পারেন নি, বিদেশি শাসনে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু একালেও কি আমাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে, রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে; নইলে ডেভালাপমেন্ট ও অন্যান্য কারণে যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয় এখন, তা মাইনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

বিদ্যাসাগরের জনগণের শিক্ষাসম্বন্ধেও বিভ্রান্ত মত প্রচলিত। গণশিক্ষার কথা ভারতে বিদ্যাসাগরই তোলেন প্রথমে। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার জন্যে যে-নোট দিয়েছেন আঠারশ চুয়ান্ন সালের নভেম্বরে, তার প্রথমেই বলেছেন, জনগণের অবস্থার উন্নতি হতে পারে মাতৃভাষায় শিক্ষার উপায়েই। শুধু পড়া লেখা ও কিছু অঙ্ক করতে শিখলেই এই গণশিক্ষা সার্থক হবে না, ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, গণিত, জ্যামিতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, রাজনৈতিক অর্থনীতি শারীরবিদ্যা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর বর্ণপরিচয়, ঋজুপাঠ, কথামালা, নীতিসার, বোধোদয়, পশ্বাবলী, চরিতাবলী, নীতিবোধ, ভূগোল বিবরণ, বাঙ্গলার ইতিহাস, চারুপাঠ, জীবনচরিত রচিত হয়েছে, গণিত শুধু অন্যের লেখা। একজন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয় একান্ত চালানো যাবে না, কমপক্ষে দু জন চাই; কেননা তিনটে থেকে পাঁচটা ক্লাস নিতে হবে; হেডপণ্ডিত থাকবে, তার মাইনে হবে পঞ্চাশ টাকা। শিক্ষকেরা যাতে প্রতিমাসে নিয়মিত মাইনে পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার জন্যে যে স্কুল স্থাপিত হবে শহরে ও গ্রামে, তা ইংরেজি কলেজ ও স্কুলের সন্নিকটে স্থাপিত হবে না। ইংরেজি কলেজ ও স্কুলের সন্নিকটে দেশীভাষার স্কুল স্থাপিত হলে, তার সমাদর হবে না দেশবাসীর কাছে। মাতৃভাষার শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করছে সক্রিয় ও সমর্থ তত্ত্বাবধানের ওপর, এবং কৃতী ছাত্রদের উৎসাহদানের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। দেশবাসীর মধ্যে শুধু জ্ঞানের জন্যে বিদ্যার্জন করবার প্রবণতা এখনো গড়ে ওঠে নি। তাই হার্ডিঞ্জের সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে কার্যকর করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগরের এইসব মন্তব্য একশ তেত্রিশ বছর পরেও নির্মমভাবে সত্য।

এইসব মডেল বা দেশীয় স্কুলে কারা পড়বে, আঠারশ সাতান্ন সালের তাঁর এক রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়: লোকেরা বলে খেটে-খাওয়া মানুষের ছেলেরাই সাধারণত এই সব স্কুলের ছাত্র হবে; এরা তাদের ছেলেদের নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পড়াতে পারবে না অর্থের অভাবে। বিদ্যাসাগরের মতে এই ধারণা ভুল। মাতৃভাষার স্কুলে তিন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরাই পড়বে, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশ্রেণী। উচ্চবিত্তেরা অর্থের জোরেই ভার্নাকুলার স্কুল থেকে তাঁদের ছেলেদের সরিয়ে নেবে বাংলায় কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করবার পরেই, এবং ইংরেজি কলেজে বা ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে। নিম্নবিত্ত অর্থাৎ দরিদ্রেরা অবস্থার চাপে অনেকাংশেই ছেলেদের স্কুলের বিদ্যার নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত রাখতে সমর্থ হবে না; যে-মুহূর্তে তাদের ছেলেরা পড়তে শিখতে ও অঙ্ক কষতে শিখবে, তখনই স্কুল ছাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাই ভার্নাকুলার স্কুলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র হবে। তারা এখানে এই স্কুলের পুরো শিক্ষা পাবে; তাদের অর্থের সংগতির অভাবেই ইংরেজি

স্কুলে যাবে না। তারা এইসব বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শেষ করবে। এই শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যেই ভার্নাকুলার স্কুল অতি আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর আরও বলছেন: লোকেরা অভিযোগ তোলে, মডেল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার জন্যে: কিন্তু মডেল স্কুল সব শ্রেণীর ছেলেদের শিক্ষার জন্যেই স্থাপিত হয়েছে।

এইসব রিপোর্টে দেখা যায় গ্রাম বাংলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে কতোখানি চিনতেন, বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণীর সমস্যা কতো গভীরে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন; বঙ্কিমও পেরেছিলেন, 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে; 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কান্নার সঙ্গে তাঁর কান্না মিশে গেছে: 'যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাংলায় লোক যে শিখিল না। বাংলায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।' দুজনের অনুভব প্রায় একই। অন্য আরেকটি বিষয়েও বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের অনুভব ও চিন্তার সাদৃশ্য অতুলনীয়। কমলাকান্তের হয়ে বঙ্কিম বলেছিলেন: 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমাব প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' এই আবেগদীপ্ত ভাষাকেই ধর্মতত্ত্বে সংহতরূপ দিয়েছেন বঙ্কিম: 'মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই।' বিদ্যাসাগর মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসাকেই জীবনের সার মনে করেছিলেন. মানুষই যেন তাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বর। এই কারণে রামকৃষ্ণদেবকে কথা দিয়েও তাঁর সঙ্গে আর দেখা করতে যেতে পারেন নি; কেননা রামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের আদর্শের মৌল প্রভেদ; রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ ও জীবনবোধ হলো: 'ঈশ্বরকে ভালোবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য'; কিন্তু বঙ্কিম চিন্তায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, চিন্তায় কর্মপ্রণালী তৈরি করেছেন, এবং ব্যাবহারিক বুদ্ধিতে কার্যে পরিণত করেছেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমের প্রভেদ। বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছেন। এই তাঁর স্বদেশ প্রেম ও স্বদেশানুরাগ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের চেয়েও চিত্তের এই স্বাধীনতার অধিকার অনেক বড়ো। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর এই রিপোর্টে খেটে-খাওয়া দরিদ্রশ্রেণী সম্বন্ধে বলেছেন: যে নীতির উপর ভিত্তি করে দেশী স্কুল গড়ে উঠেছে, তাতে খেটে-খাওয়া মানুষের অন্তরায়ই। এখানে শুধু ছেলেদের বই শ্লেট কিনলে হবে না, ইস্কুলের মাইনে জোগাতে হবে। এদেশে শ্রম এতো সহজলভ্য, খেটে-খাওয়া মানুষের আয় তাঁদের জীবনধারণের পক্ষেই ন্যূন। যদি এই শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়, তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বিনা বেতনে

শিক্ষা দিতে হবে ; অন্যথায় দেশী স্কুলের প্রচলিত ধারার শিক্ষায় এই শ্রেণী কোনো বাস্তব সুবিধা পাবে আশা করা অযৌক্তিক।

দেশের সমাজের এই অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিদ্যা-সাগর, তাই দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। এই অসুবিধা নিশ্চয়ই দূর করা যেতো, যদি দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র থাকতো, এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্রও বুর্জোয়া না হয়ে সমাজ-তান্ত্রিক হতো। বিদ্যাসাগর আর্থিক এই সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সমস্যার সমাধানের কথা উল্লেখ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো। তাই নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় দেশের দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা বিরাট অংশের কিছু জায়গায় আলো ফেলা যায়, সমস্ত জায়গা আলোকিত করা যায় না কখনো, সমগ্র সমাজের স্বাধীনতা ব্যক্তির স্বাধীনতায় পূর্ণতা পায় না। ঔপনিবেশিক শাসনে সেই স্বাধীনতা আশা করা অন্যায়।

বিদ্যাসাগর রিপোর্টে আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন : দেশীয় ভাষার স্কুলের ছাত্রদের সরকারের উৎসাহ প্রয়োজন। দেশের লোকেরা ইংরেজি শিক্ষা দিতে চায় ছেলেদের, উন্মুখও এ ব্যাপারে। কারণ তারা বিশ্বাস করে এতে সরকারি চাকরি তাদের জুটবে। অন্য ভাষায় শিক্ষা পেলে চাকরি পাওয়া খুবই কষ্টকর। এই ধারণা দূর করতে হলে দেশীয় ভাষার স্কুলের ছেলেদের সরকারি ভালো চাকরি দিতে হবে। রাজস্ব বা বিচার বিভাগের নিচু পদে চাকরি দিতে হবে ; অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের উচু পদে উন্নতি দিতে হবে। এই শ্রেণী থেকে দক্ষ ও বিশ্বাসী অধীনস্থ অফিসার গড়ে উঠবে। যে সমস্ত গাঁয়ে মডেল স্কুল স্থাপিত হয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা তাদের কল্যাণে তীব্র অনুরাগী, প্রথমে হয়তো উদাসীন ছিলো, এখন তাদের উপযোগিতা সমাদর করতে শিখেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আঠারশ উনষাট সালের উনত্রিশে সেপ্টেম্বরের চিঠির মন্তব্য স্মরণীয়। বিহারের স্কুলের গুরুমশাইয়ের পাঠশালার শিক্ষা তিনি জনগণকে দিতে চান নি ; চিঠি লেখা ও জমিদারি সেরেস্তায় হিশেব রাখা ও কিছু ছাপানো বই পড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বিদ্যাসাগর মনে করেন নি। এই শিক্ষা তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে ; জনগণের কাছে প্রসারিত হবে না ; জনগণ বলতে যদি খেটে-খাওয়া মানুষ বোঝায়। এই খেটে-খাওয়া শ্রেণীর ছেলেদের খুব কমই স্কুলের ছাত্র হবে। এটাই হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা। এই অবস্থা এতো নিচু যে লেখাপড়ার খরচ জোগাতে পারে না তারা। একটু বয়েস হলেই তুচ্ছ চাকরি বা পয়সা উপায় করাটাই শ্রেয় মনে করে। তাই তাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলো কি শিখলো না, এতে তাদের অবস্থার হেরফের হবে না। এই কারণে, তাদের ছেলেদের স্কুলে

পাঠাতে তারা উৎসাহী নয়। শুধু জ্ঞানের জন্যে কেউ বিদ্যার্জন করে না দেশে। এই অবস্থায় শ্রমজীবী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আর যদি সরকার এই নিয়ে পরীক্ষা চালাতে চায়, তাহলে এই শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই পরীক্ষা কিছু হচ্ছে, কিন্তু এর ফল খুব আশাপ্রদ নয়। ইংলন্ডে ও এখানে এই রকম একটা ধারণা হয়েছে উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেক কিছু করা হয়েছে, এখন জনগণের শিক্ষার জন্যে কিছু করণীয়।

এই বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করবার পরই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সরকারকে জানিয়েছেন ঃ ব্যাপক হারে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষাকে সরকার অবশ্য সীমাবদ্ধ রাখবে। একটি বালককে যথার্থ উপায়ে শিক্ষিত করে তুললেই সরকার জনগণের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অধিক কাজ করবে, একশ শিশুকে শুধু পড়া লেখা ও সামান্য অঙ্ক কষানোর চেয়ে একাজ অধিক মূল্যবান। সমস্ত জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষণীয় ; কিন্তু এই কাজ, সন্দেহের ব্যাপার, কোনো সরকার নিতে পারে বা সমাধান করতে পারে। মন্তব্য করা যেতে পারে, ইংলন্ডে সভ্যতার উন্নত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানেও জনগণ শিক্ষার ব্যাপারে এই দেশের জনগণের চেয়ে ভালো অবস্থায় নেই।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে শুধু পরশপাথরের মতো ছুঁইয়ে দিতে চাননি, শিক্ষিত হলো অথচ সমর্থ হলো না এই উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না, আত্মিক মানসিক দৈহিক সব ব্যাপারেই যুগের প্রয়োজনে শিক্ষাকে উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর পাঠ্য তালিকায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান গণিত জ্যামিতি জীবনচরিত ইতিহাস ভূগোল নীতিদর্শন সবই অন্তর্ভুক্ত ছাত্রের ও শিক্ষকের বিবেক ও চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন আলোর গতির দিকে ; ঘটনা ও তথ্যের দাবি যেমন মেনেছেন, তেমনি তথ্যকে জ্ঞানে পরিণত করবার উপায় দেখিয়েছেন ; যাতে যুক্তি ও জ্ঞানে মনের আলস্য কাটে, লোকাচার ও প্রথার অভ্যস্ততা দূর হয়। দেখে শুনে সিদ্ধান্ত করবার পদ্ধতিই খাঁটি পদ্ধতি ; নইলে তত্ত্বগত বিদ্যা প্রয়োগ করতে গেলে ব্যর্থ হতে বাধ্য, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জ্ঞান ও তত্ত্ব বাংলায় ব্যবহার করতে গিয়েই ব্যর্থতা এসেছে ; নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্বের সুস্পষ্ট রূপ গড়ে ওঠে নি। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি জাতীয় মনের স্বাস্থ্য ফেরাতে চেয়েছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ; আর যে-শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কালের সঙ্গে যুক্ত নয়, সে-শিক্ষাও বিদ্যাসাগর চাইতেন না। এবং যে-শিক্ষা আধুনিক জীবনকে আলোকিত করে না, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ দেখায় না, সেই শিক্ষা ছাত্রদের বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই আদর্শেই তিনি স্কুলের শিক্ষা ও কলেজের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছেন, যদিও এবিষয়ে পূর্বসূরি রামমোহনই এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু গণশিক্ষায় এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না দারিদ্র্যের জন্যে। সমগ্র দেশ

থেকে একজোটে দারিদ্র্য দূর করতে পারে রাষ্ট্র, কিন্তু সেই রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির স্বেচ্ছা-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে তা ত্রুটি-পূর্ণ হতে বাধ্য, সেখানে সুদক্ষ প্রশাসনে দারিদ্র্য দূর করে দেশের আপামর জনসাধারণকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষায় আলোকিত করতে হবে। এখন শিক্ষা অবৈতনিক ও সর্বজনীন, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। তাই এখনো পাড়াগাঁয়ে দরিদ্রেরা ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়েও পরে পাঠাতে পারে না, কাজে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু দরিদ্রদের পড়বার সময় যদি আর্থিক সুযোগ করে দেবার উপায় থাকে এবং শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তা সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। আজ প্রায় দেড়শ বছর পরেও শিক্ষাকে, অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাকে, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে পারিনি, এ আমাদের জাতির মানসিক দুর্বলতা ও কপটতা।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সংবিধানে শিক্ষা সকল নাগরিকের অধিকার, এ অধিকার সুনিশ্চিত। সাত থেকে পনেরো বছরের বালকবালিকাদের জন্য শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত, সব শিক্ষাই অবৈতনিক। ভালো উন্নত মেধাবী ছাত্রের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা দেওয়া হয় মাতৃভাষায়। শ্রমিকদের জন্যে টেক্‌নিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, সাংস্কৃতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় কলকারখানায়, সরকারি খামারে, ট্রাক্‌টার স্টেশনে এবং অন্যত্র।

বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বিদেশির অধীনে থাকবার জন্যে বাধা পেয়েছে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা যদি স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষের বুদ্ধির শক্তি পেতো, তাহলে কখনোই তিনি বলতে পারতেন না, কোনো সরকার জনগণের শিক্ষার পুরো দায়িত্ব নিতে পারে কিনা বা সমাধান করতে পারে কি না। নিশ্চয়ই পারে, এবং রাষ্ট্রই পারে। ইংলন্ডের এডুকেশন অ্যাক্ট ১৮৭০ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু তখন বিদ্যাসাগর মডেল স্কুলের শিক্ষা থেকে দূরে সরে এসে মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের উচ্চশিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করে দেশে উচ্চশিক্ষাব্রতী হিশেবে প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ইংলন্ডের বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশের মনীষীরা খুব ভেবেছেন বলে মনে হয় না। শিক্ষা তখন উচ্চ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে মধ্যেই সীমিত হয়ে গেলো, ভদ্রলোকেরাই শিক্ষার ফলে উচ্চপদ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা পায়; ইংরেজিশিক্ষার কদরই দেশের মধ্যে চলে। ফলে শিক্ষিতের ভাষা অশিক্ষিতে বোঝে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান তখন দুস্তর হয়ে ওঠে; ভদ্রলোক শ্রেণীও নিজের স্বার্থে, চাকরি ও পদের লোভে এটাই চাইতো; এবং ইংরেজও ব্যবধান জীইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দেখে। সমস্ত দেশ যদি ইংলন্ডের মতো বাধ্যতামূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক হ'ত, তাহলে ইংরেজশাসন ভারতে দুঃসাধ্য। সিপাহী

যুদ্ধের আগের প্রশাসক ইংরেজের সঙ্গে এর পরের ইংরেজের পার্থক্যও প্রচুর ; যে উদারনৈতিক মানবতার দ্বারা ইংরেজ মানবহিতৈষণায় প্ররোচিত হতো, ভিক্টোরীয় ইংরেজ সম্পদের ও সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের অহংকারে দীপ্ত, সেখানে ভারতীয়েরা অশিক্ষিত নেটিভ ছাড়া আর কিছু নয়, সুতরাং তাদের দাবিয়ে রেখে শোষণ করাই একমাত্র কাম্য।

কলেজের শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম : সংস্কৃত কলেজ হয়ে উঠবে বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ় সংস্কৃত বিদ্যার পীঠস্থান, মাতৃভাষায় উন্নত সাহিত্যের শিশুপ্রতিষ্ঠান এবং এই কলেজেই শিক্ষিত শিক্ষক গড়ে উঠবে, যারা সাহিত্য দেশের জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেবে। বাংলায় শিক্ষার তত্ত্বাবধানে যারা থাকবে, তাদের উদ্দেশ্য হবে 'এনলাইটেন্ড' বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।[১২] এই 'এনলাইটেন্ড' শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিদ্যাসাগরের আগে রামমোহন আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতেও এই একই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, দেশীয় জনসাধারণের উন্নতি যেহেতু সরকারের উদ্দেশ্য, সেই হেতু আরো বেশি করে শিক্ষার 'লিবার‍্যাল' ও 'এনলাইটেন্ড' ধারার উন্নতিতে সাহায্য করবে। রামমোহনের চিন্তার আধুনিকতা যেমন 'লিবার‍্যাল' ও 'এনলাইটেন্ড' চিন্তাভাবনা ও আদর্শে, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারে, সংস্কৃত সাহিত্যের ও দর্শনের বিচারে ও মূল্যায়নে, সমাজ সংস্কারে, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে শিক্ষাপ্রসারে, পাঠ্যপুস্তক রচনায়, এই 'লিবার‍্যাল' ও 'এনলাইটেন্ড' চিন্তাভাবনার দ্বাবা পরিশোধিত, যেমন কোঁতের দ্বারা বঙ্কিমের লেখা। যার মূল কথা দেকার্তের দর্শনে : আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি; cogito ergo sum এবং বিদ্যাসাগরের জীবনও এই মননের ব্যক্তি-স্বাধীনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একথা স্পষ্ট ও ভালো করে বোঝা যায় বিদ্যা-সাগরের সুহৃদ বন্ধু সমর্থক হিতৈষী ছিলেন হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ; এঁদের সঙ্গেই তাঁর চলাফেরা ঘোরাফেরা বিদ্যাচর্চা ও পরামর্শ, রামতনু লাহিড়ি ও রাজনারায়ণ বসু তাঁব পরম সহৃদ তাঁর সমাজসংস্কারের সকলের চেয়ে বেশি সমর্থক। এই কারণে পৌত্তলিক ও তথাকথিত হিন্দুরা তাঁর কাছে অর্থসাহায্য

---

১২ এ প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের শিক্ষাচিন্তাও স্মরণীয়, তিনি শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার কথা বলেন নি, বাঙালিদের কৃষি ও শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার কথাও বলেছেন্; কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে নি তখন : As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid vernacular education, agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened masses to become useful members of Society. (১৮৫৯) বিদ্যাসাগর কৃষি ও শিল্পশিক্ষার দিকে নজর দেন নি।

ছাড়া এসেছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিবারেলিজমের আদর্শে দীক্ষিত বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ও মর্যাদার স্বরূপই বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর রচনায়, কেননা তিনিও কমবেশি এই আদর্শেই মানুষ। ইংরেজের দেশে লিবারেলিজমের চেহারা একরকম, সে স্বাধীন ও পরাক্রম-শালী; পরাধীন ভারতে তার রূপ ভিন্ন, অনেকটা বিকৃত, কেননা ওখান থেকে গাছ এনে এখানে পোঁতা হয়েছে। আর লিবারেলিজমের আদর্শও সমাজ-তান্ত্রিকতার আদর্শে পুরনো ঠেকে।

এই এনলাইটেন্ড বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন এমন লোকের, যারা সংস্কৃত পন্ডিত হয়েও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে কৃতবিদ্য। যারা ইংরেজি জানে না, তারা য়ুরোপীয় জ্ঞানভান্ডার থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে সুসামঞ্জস্যময় প্রকাশক্ষম কথ্য বাক্‌ভঙ্গি-সমন্বিত বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না। হয়তো অজ্ঞাতে নিজের গদ্যের তিনটি গুণের উল্লেখই করেছেন তিনি : সুসামঞ্জস্য প্রকাশক্ষম ইডিয়মধর্মী (elegant expressive idiomatic) ইংরেজি পন্ডিতদের বাংলা ভাষা ইডিয়মধর্মী ও সুষমাপূর্ণ হয় না, যখন তারা বাংলা ভাষায় আইডিয়া প্রকাশ করতে চায়। তাদের লেখায় ইংরেজি-আনা এত প্রচন্ড, পরে সংস্কৃত শিখলেও বাংলা স্টাইলে সুষমা ও ইডিয়ম আসে না। তাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যদি প্রথম থেকেই ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত হয়, তাহলে এনলাইটেন্ড বাংলা সাহিত্যের অবদানে তাদের কৃতিত্বই বেশি হবে।

এই চিন্তা ভাবনাও বিদ্যাসাগরের নিজের নয়; বিদ্যাসাগর যখন ছাত্র, তখন হোরেস হেম্যান উইলসন দুবার সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। বিলেত থেকে রামকমল সেনকে এক চিঠিতে উইলসন লিখেছিলেন: সংস্কৃতের চর্চার ওপরই নির্ভর করছে য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে কীভাবে নিজের মধ্যে নেবে; ইংরেজিকে ভারতের ভাষা করে তোলবার চিন্তা কাল্পনিক অসম্ভবতা। ইংরেজি ব্যাপকভাবে পড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশীয় ভাষার উন্নতি হবে ইংরেজি আইডিয়ার জন্য সংস্কৃত শব্দের সমৃদ্ধিতে এবং একে কার্যে রূপায়িত করতে হলে সংস্কৃত ও ইংরেজি এ দুয়েরই চর্চা অবশ্যই করতে হবে। উইলসন এই চিঠিটি লেখেন আঠারশ চৌত্রিশ সালের বিশে অগাস্ট।

এবং সংস্কৃতের মধ্যে যে সর্বজনীন সত্য ও চিন্তা নিহিত আছে, আমার নিজের বিশ্বাস, এই মূল্যায়নের পেছনে উইলিয়াম জোনসের প্রভাব বিদ্যা-সাগরের ওপর অস্পষ্ট নয়। ভারতীয় আর্যসভ্যতা শুধু অতুলনীয় নয়, গ্রীক ও য়ুরোপীয় সভ্যতার চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য-সম্বন্ধে এবং তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্যসম্পর্কিত যে-সব মন্তব্য করেছেন, তাতে তার নিপুণ সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন,

পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর মন্তব্যই পল্লবিত। তিনি যে-পদ্ধতিতে 'মেঘদূতে'র প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের বিচার করেছেন, 'হর্ষচরিতে'র বিচারে বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠের তুলনা করেছেন, অভিজ্ঞানশকুন্তলার পাঠভেদ মিলিয়েছেন, পরবর্তী সংস্কৃত গবেষকদের পথ যেমন খুলে দিয়েছেন, তেমনি মনে হয়, পরবর্তী গবেষণা খুব বেশি এগোয় নি। ব্যাকরণ যে এগোয় নি, এতো সর্বজন স্বীকৃত।

তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যে-সব কাজে হাত দিয়েছেন, তাতে ব্যর্থতাই এসেছে, বিধবাবিবাহে, বহুবিবাহে, মাতৃভাষায় শিক্ষায়, গণশিক্ষায়, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে—বাস্তবে কর্মের দিক দিয়ে সব ব্যাপারে তিনি অগ্রণী, প্রথম পুরোহিত, কিন্তু ব্যর্থকাম। বিকৃত সমাজে স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্যেই তাঁর ব্যর্থতা, মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের ব্যাপারে বাঙালি হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব সকলে স্বীকার করে। এর পরেও দুটি কাজে তিনি হাত দিয়েছেন ; হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ড ট্রাস্ট ও বড় লোকের ছেলেদের জন্য পঞ্চাশ টাকা বেতনে স্কুলের প্রতিষ্ঠা। এ সবই কিন্তু প্রায় দেড়শ বছর পরেও তাঁরই অনুসৃত ধারায় আজও সমাজের হিতৈষণায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। তাঁর কারণ, তাঁর মনস্বিতা মানুষের চিরন্তন হৃদিমনীষামনসাকে স্পর্শ করেছিলো। যখনই মানুষ মানুষের কল্যাণে হৃদয়মনীষামনসাকে স্পর্শ করবে, তখনই বিদ্যাসাগরের অমেয় মনুষ্যত্বের ধারা ও মনীষার দীপ্তি সকলকে স্নাত করিয়ে দেবে॥

কলকাতা ৪৮ বার্ণিক রায়

# উৎসর্গ

বিশ্বরাজের বিচিত্র বিধানে—ভারতের ভাগ্যচক্রের সঙ্কটময় পরিবর্তনে
যখন চারিদিক অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবৃত- জাতীয়
জীবন মৃত মৃত্যুর করালগ্রাসে প্রবিষ্টপ্রায় লোকমণ্ডলীর
মধ্য হইতে যে মহাত্মার অভ্যুদয়ে ভারতে নবযুগের
সূচনা হইয়াছে—ভবিষ্যবংশ উপাস্য দেবতাবোধে
যাঁহার চরণে প্রণত হইবে—ভাবী
ইতিহাস লেখক বর্তমান জাতীয়
জীবন স্রোতের উৎপত্তি ও
স্থিতি নির্দেশ করিতে
গিয়া যাঁহার
বিরাট
মূর্তি সমক্ষে
লেখনী ত্যাগ করিয়া
করজোড়ে ভক্তিভরে মস্তক
অবনত করিবে—যিনি ভারতের
পরমধন লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের পুনঃ
প্রতিষ্ঠায় জীবনদান করিয়া গিয়াছেন সেই
মহাত্মা রাজর্ষি রামমোহন রায়ের চরণে
গ্রন্থকারের পূজার নৈবেদ্যরূপে এই গ্রন্থ নিবেদিত

গ্রন্থকার

# ভুমিকা

আজ বাঙ্গালা সাহিত্য শোভা ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া আমাদের নয়নের তৃপ্তি ও মনের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে, যাঁহারা সেবকরূপে তাহার এই শোভা ও সৌন্দর্যের সূচনা করিয়াছেন, সেই ভক্তদলের অগ্রণিগণের মধ্যে বিদ্যাসাগরমহাশয় অতি উচ্চস্থানে আসীন। দীর্ঘকালবাপী কঠোর পরিশ্রমে সেই লোকপ্রবরের জীবনচরিত পরিসমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গীয় ও বিদেশীয় পাঠকমণ্ডলীর করে অর্পণ করিবার সময়ে আমার অনেক বলিবার আছে, কিন্তু সকল কথা না বলিয়া কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

ভারতবর্ষের বীর-কাহিনী পৃথিবীবক্ষে যে অক্ষয় কীর্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তথায় অমর-পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র মানব-সুহৃদরূপে, অবলাবান্ধবরূপে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিক্‌সকল আলোকিত করিয়াছেন। আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, এতাদৃশ গুণবান্ মহাজনের চরিতকাহিনী বর্ণন করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, বহু পুণ্যের ফল হইলেও, মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে সে সৌভাগ্যের অভ্যুদয়, সে পুণ্য সম্ভোগ নিতান্তই স্পর্ধার কথা। তাঁহার ন্যায় মহাজনকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে ও উপযুক্তরূপে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়া সম্ভব নহে। খদ্যোত কখনও গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের গৌরব অনুভব করিতে পারে না—গোষ্পদধৃত বারিবিন্দু কখনও অনন্ত পারাবারের তরঙ্গলীলা কল্পনা করিতে পারে না; ক্ষুদ্র মানবও তদ্রূপ আপনার ক্ষুদ্রত্বে বিশ্বব্যাপী প্রেম প্রবাহকে ধারণ করিতে পারে না। তাহার সকল আয়াসই বিফল হইবার কথা।

বিদ্যাসাগরমহাশয় পণ্ডিতসমাজের বরণীয়; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বর্তমান জীবনচরিতপ্রণেতা তাঁহার তুলনায় মূর্খের অগ্রগণ্য। তিনি সহৃদয় লোকবৎসল মহাপুরুষ, তাঁহার জীবনীপ্রণেতা সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র প্রান্তরে আবদ্ধ—বদ্ধজীব। এমনস্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এরূপ বিসদৃশ অবস্থায় বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস কেন? তদুত্তরে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবান ছিলেন, এবং শত শত ঘটনায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আমিও সেজন্য আমরণ ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিব। সেই পূজার আয়োজনেই এই জীবনচরিতের সূচনা এবং তাঁহার সুপবিত্র জীবনকাহিনী বর্ণন করিবার ইহাই আমার একমাত্র অধিকার। তাঁহার শেষ জীবনের দীর্ঘকাল তাঁহার পবিত্র সহবাসে সুখে আমি নানা প্রকারে উপকৃত। কিন্তু এই হতভাগ্য উপকৃত জন সাংসারিক সম্পদে বঞ্চিত, সুতরাং অন্যবিধ উপায়ে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। অন্য কোন মহানুভব ব্যক্তি তাঁহার জীবনচরিত প্রণয়নে অগ্রসর হইলে, আমার বহুযত্ন রক্ষিত উপকরণগুলি তাঁহারই করে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম।

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোককে এই সুকঠিন কর্তব্যভার কেবল প্রাণের আবেগে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে এমন দুরূহ কার্যে পদে-পদে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকারের দীনতা স্মরণ করিয়া, মহাপুরুষের গুণগরিমার সমাদর করিলেই আমি আমার পাঠকমণ্ডলী ও সুহৃদ্‌বর্গের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

বিদ্যাসাগরমহাশয় বাঙ্গালার সামান্য পল্লীগ্রামেরদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতে গণনীয় ও পূজনীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। রাজসেবা, সম্ভ্রান্ত বন্ধুসেবা ও দরিদ্রসেবা একটি জীবনে সমভাবে স্থান পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার; কিন্তু তাঁহার জীবনে তাহাও সম্ভব হইয়াছে। দেশের ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র সমভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিতে দলবদ্ধ হইতে পারেন, এরূপ অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্রের লোকান্তর গমনেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার উপযুক্ত মর্যাদা আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। কখনও পারিব কি না সন্দেহ। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, সে কৃতজ্ঞতা-ঋণ অপরিশোধ্য; সেই অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকারমানসে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা, এই ঋণ স্বীকার করিতে গিয়া আমি বঙ্গদেশীয় আরও অনেকগুলি মহাত্মার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকার্যে যদি আমি আংশিক ভাবেও কৃতকার্য হইয়া থাকি, তবে সেজন্য আমার কোন প্রশংসা নাই। আমার ভক্তিভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষিগণ, আমার সমবয়স্ক সুহৃদ্‌গণ, এবং অপর বহুসংখ্যক পরিচিত-অপরিচিত স্বদেশবাসীগণই প্রকৃত প্রশংসার পাত্র; কারণ তাঁহাদের সস্নেহ উৎসাহ ও নানা প্রকার সাহায্যদান ভিন্ন আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ বৃহদনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। যাঁহাদিগের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমি নানা প্রকারে ঋণী, তাঁহাদের সুদীর্ঘ নামাবলীর উল্লেখ করা সম্ভব নহে, তাই সকলের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও কয়েক জন সদাশয় মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমি এই কার্যে ব্রতী হইবার সূচনায় মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ ও সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহ বাক্যে যে কিরূপ উপকৃত হইয়াছি, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে। তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা লাভে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার হইত, সুতরাং আমি ইঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

এই জীবনী যদি কোনো অংশে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবক ও পাঠকদলের সমাদরের জিনিস হয় তবে সে জন্য বিশেষভাবে প্রশংসার পাত্র বিদ্যাসাগর-পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি যেরূপ আগ্রহ ও আকিঞ্চনের সহিত

তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কারণ পুস্তক পাঠ করিতে করিতে পাঠক তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাইবেন। সুতরাং তিনিও আমাকে এইরূপ নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত করিয়াছেন। তৎপরে বিদ্যাসাগর-সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও বহুবিধ উপকরণ-দ্বারা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র 'সাহিত্য' সম্পাদক আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সরেশচন্দ্র সমাজপতি গ্রন্থের সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ পরামর্শ ও পারিবারিক জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

যে-সকল ঘটনার সমাবেশ না হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইত না, তাহার একাংশের উল্লেখ করিলাম। অপরাংশের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির প্রধান কর্মচারী আমার সহোদর-প্রতিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শনব্যতীত পুস্তকপ্রকাশ অসম্ভব হইত। অবিনাশবাবু পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে সকল নয়ন-রঞ্জন লিথো-চিত্রের সমাবেশ পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেগুলি গভর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চি কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। তিনিও এই কার্যে বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। পুস্তক ও পুস্তকান্তর্গত চিত্র সকলের ব্যয় বাহুল্যনিবন্ধন আমি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পক্ষেঃ শ্রীমতী মহারানী স্বর্ণময়ী সি. আই. ই. শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস্. সি. আই. ই. শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় (নলডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাশ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী টাকি), শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম. এ. বি. এল., শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ইঁহারা সহায়তা করিয়া আমাকে উপকৃত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন।

৫৬।১ সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

## সূচিপত্র

এই সংস্করণের নতুন পরিশিষ্ট ঃ

My dear Dutt

I am still very unwell and confined to bed — and in consequence utterly incapable of mental or physical exertion of any kind — You will therefore be good enough to excuse my inability to work in furtherance of your object.

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Yours truly
Iswara

18-3-68

Please return by the bearer Thakur's letters — Nilcomal wants them back to enable him to reply to them

মাইকেল মধুসূদনকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

ইয়ং বেঙ্গল দলের রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে আবেদনপত্রের স্বাক্ষর।

# প্রথম অধ্যায়
## উপক্রমণিকা

বিচিত্র-কর্মা বিধাতার ঐন্দ্রজালিক বিধানে ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী। তাঁহার লীলা পরম্পরা—সৃষ্টি প্রথম হইতে একাল পর্যন্ত, ভারতের সুপবিত্র ক্ষেত্রে অসম্ভব ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ ও সফলতা সন্দর্শন করিয়া মানবমন নিয়ত মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহার উর্বরতা, যাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যাহার চিরতুষারাবৃত অত্যুন্নত পর্বতমালা, যাহার নিবিড় বনরাজি, যাহার শান্তিরসাস্পদ উপবনসমূহ, যাহার নিস্তব্ধ ও নীরব গিরিগহ্বর, যাহার নির্জন প্রান্তরপ্রদেশ সকল, যাহার প্রাণপ্রদ সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ নদ-নদী ও হ্রদ সকল চিরশোভাময় হইয়া লোকচক্ষুর পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। এই সেই দেশ, যাহার খনিসকল অনন্তকাল ধরিয়া নানা রত্নের আকর হইয়া সমগ্র পৃথিবীর লোকমণ্ডলীর সুখ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। এই সেই দেশ, যাহার সমুদ্রকূল চিরকাল অতিথি অভ্যাগতের পদার্পণে ও বিদেশীয় বণিক-গণের কোলাহলে চিরশব্দায়মান হইয়া রহিয়াছে? এই শোভা ও সৌন্দর্যের রত্নখনি ভারত ষড়ঋতুর ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া আরও অধিকতর প্রীতিপদ ও সুখকর হইয়াছে। কেবল প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের আলয় হইলে এ শ্যামলা সুজলা সুফলা ধরিত্রীর এত আদর হইত না। আরণ্য-কুসুমসম নির্জনে সে শোভা লুকাইয়াই থাকিত। এ সুখপূর্ণ, এ সৌন্দর্যপূর্ণ চিরশোভাময়ী ভারতজননীর সুকোমল অঙ্কে অনেক বীরশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সকল সম্পদের আধার এই কল্পতরুমূলে দণ্ডায়মান হইয়া, এই অক্ষয় বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া পাঠক। তুমি কি প্রার্থনা করো? যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এমন কি অমূল্য ধন আছে, যাহা এই সর্বফলপ্রদ কল্পতরু-শাখায় না ফলিয়াছে? এমন কি দুর্লভ বস্তু তুমি কামনা কর, যাহা এই সুমহান অক্ষয় বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া পাও না?

তোমার স্মৃতি যদি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া না থাকে, তবে সময়স্রোতের আবর্জনা সরাইয়া ফেল, সেই গৌরবানুভূতিপূর্ণ মধুর পুরাতন কীর্তি-কাহিনীর অমৃত হিল্লোল এখনও তোমার শ্রুতিগোচর হইবে। বহুকাল ধরিয়া তোমার চক্ষের উপর কালের যে ধূলিকণাসকল সমষ্টীভূত হইয়াছে বলিয়া তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, সাধনসহকারে তৎসমুদায় অপসারিত কর, দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া দেখিতে পাইবে ঃ

এই সেই দেশ, যে দেশের পবিত্র বেদগানে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মপরায়ণ মহর্ষিগণের বিচরণে এই ভূমি চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে, কত শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে সত্য, তথাপি মানব-স্মৃতি সে শোভন

দৃশ্য, সে পবিত্র চিত্র, সে সুমিষ্ট কল্পনা সযত্নে রক্ষা করিতে ও ভক্তিসহকারে স্মরণ করিতে নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে। এই সেই পুণ্য-ভূমি, যাহার তপোবন সমূহে মহাযোগী শুকদেব ও নারদ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি মহাবলসম্পন্ন মহাত্মা বিচরণ করিয়াছেন এবং যাহার রাজসিংহাসনে রাজর্ষি জনক, প্রজাবৎসল রামচন্দ্র, সত্যধর্মপরায়ণ মহারাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নরপতিগণ উপবেশন করিয়াছেন। সমরধর্মপরায়ণ বিচিত্র বলশালী মহানুভব ভীষ্ম, অর্জুন,কর্ণ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ—তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভারতে পৃথ্বীরাজ প্রতাপসিংহ—ও তদীয় সন্তানগণের শোণিত-স্রোতে যে ভূমি সিক্ত হইয়াছে, পূত হইয়াছে, ধন্য হইয়াছে, এই সেই পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষ। এই দেশেই রাজকুমার শাক্যসিংহ সংসার সুখের অসারতা দর্শন করিয়া সারতত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন ক্ষয় করিয়াছিলেন—এই পুণ্য-ভূমিই তাঁহার মানবপ্রেম প্রচারের মহাতীর্থ। শঙ্করের সুবিশাল কীর্তিস্তম্ভ বেদান্তাদি ভাষ্য ভারতেরই মহিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কবি-কুল সম্রাট মহামতি কালিদাস যে মহাসভার রাজকবি ও যে রত্নমণ্ডলীর প্রধান রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সে অক্ষয় কীর্তি-মন্দির উজ্জয়িনী-বক্ষে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে সে কীর্তিগাথা অনন্তকাল ধরিয়া ভারতের গৌরব ঘোষণা করিবে।

ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব ও জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া অবশেষে যখন ধর্ম-বিহীনতা ও সামাজিক অবনতির প্রবল আবর্তে আর্যজাতি মগ্ন হইল, যখন তাহাদের স্বদেশ পরকীয় হস্তে ন্যস্ত হইল, যখন ওহারা স্বগৃহে পরের অর্থে প্রতিপালিত হইতে শিখিল, তখনও সেই নিরাশার ঘন অন্ধকারে, সেই মৃতপ্রায় নরনারীমণ্ডলীর মধ্য হইতে নানক ও গুরুগোবিন্দ, দাদু ও কবির, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, হরিদাস ও রামপ্রসাদের ন্যায় ধর্মপরায়ণ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণের অভ্যুদয় কি বিধাতার বিধান নহে?

তৎপরে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিতপ্রায়, বিস্মৃতির অগাধ সলিলে মগ্নপ্রায়, ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পূর্ব প্রান্তে, পুরুষপ্রবর মহাত্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ও বিধাতার বিচিত্রতার আর এক অঙ্ক। যখন তাঁহার সুগম্ভীর আহ্বানে ভারত সন্তানের বহুকালের নীরবতা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের গাঢ়নিদ্রার অবসান হইয়াছিল, তাহাদের জড়প্রায় হস্ত পদে চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল, বহুকালব্যাপী ঘন অন্ধকারের অবসানে যখন নব্য ভারতের ভাবী শুভদিনের প্রথম ঊষার আভাস দেখা দিয়াছিল, ভারতের পূর্বপ্রান্তে যখন মেঘমালার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া সুপ্রভাত সমাগম হইয়াছিল, তখন মর্ত্যে ঋষিগণ ও স্বর্গে দেবতারা জয়োচ্চারণপূর্বক ভারতসন্তানগণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। যখন আশাভরসার প্রথম প্রভাতীকরণে বঙ্গজননীর বিষাদময় মুখমণ্ডল পরিলক্ষিত হইতেছিল, অজ্ঞতা, আলস্য, জড়তা, ও সঙ্কীর্ণতা যখন

কীটরূপে বঙ্গসমাজের জীবনশক্তি ক্ষয় করিতেছিল, যখন পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উভয়তীরে জীবন্ত নারীদেহসকল জ্বলন্ত হুতাশনে ভস্মীভূত হইত এবং সেই সকল অসহায়া হিন্দু বিধবাকুলের আর্তনাদ আকাশ পূর্ণ করিত, যখন জড় ও জীব মিলিত হইয়া এই নারীহত্যাকার্যে রত ছিল (১) যখন কোমল পুষ্প-কোরক সদৃশ অসহায় শিশুসন্তানসকল সাগর-বক্ষে প্রক্ষিপ্ত হইত এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত জনকজননী শূন্য হৃদয়ে—শূন্য প্রাণে—শূন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া হাহাকার রবে চারিদিক পূর্ণ করিত (২), যখন সুশিক্ষা ও সুশাসনের অভাবে ধনী দরিদ্রের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিত, একজন অন্যজনের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিতে নিরন্তর প্রয়াস পাইত, যখন অবলা অসহায়া নারীজাতির পক্ষ সমর্থনের জন্য ও দরিদ্র প্রজাকুলের স্বার্থ রক্ষা ও সুখবৃদ্ধির জন্য দৃঢ়ব্রত ধর্মাত্মা রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন, যখন ভারতের আশা ভরসার প্রভাতরবি ক্রমে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে যখন বঙ্গ-সূর্য আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীর গর্ভে চিরদিনের তরে মগ্ন হইয়াছিল, তখন কে জানিত যে আর এক বীর-শিশু জন্মভূমির ভাগ্য-ললাটে আর এক অঙ্কপাত করিবে। তখন কে জানিত যে সংস্কৃতকালেজের নিম্নতর শ্রেণীর দশমবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র,মহাত্মা রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন? কে জানিত যে, রামমোহন যে সমাজসংস্কার কার্যের সূচনা করিয়া অসময়ে আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে বিদেশে জীবনলীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন; সে সদনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম সূত্র, তিনি বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে রাখিয়া গিয়াছিলেন? কে জানিত যে, হুগলীর দক্ষিণসীমান্তে স্থিত ক্ষুদ্র পল্লী রাধানগর, মেদিনীপুরের উত্তরপ্রান্তস্থ বীরসিংহ পল্লীর সহিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে একই সূত্রে গ্রথিত হইবে? বিধিলিপি কে জানে? দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সাধুজনেই বিধাতার অঙ্গুলিসংকেত বুঝিতে পারেন, অন্যের কি সাধ্য যে, সে গূঢ় অভিপ্রায়ের কঠিন আবরণ উন্মোচন করে?

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালার শুভদিনের সুপ্রভাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাজবিপ্লব, সমাজসংস্করণ ও সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন বীরসিংহের কুটির-প্রাঙ্গণে জননী-ক্রোড়ে শৈশবকাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন ও স্যার রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর তাঁহার ভাবী কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন পল্লীগ্রামের প্রান্তরে

---

১ পতির প্রতি হিন্দুপত্নীর প্রগাঢ় অনুরাগ হইতেই সহমরণের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। সেরূপ সহমরণ কোনো কালে কোনো দেশে আইনের সাহায্যে নিবারিত হয় না।

২ কেবল বঙ্গদেশেই আংশিকভাবে এ প্রথা প্রচলিত ছিল।

হইবামাত্র প্রসূতি সুস্থ হইবেন। যখন সকলেই দেখিলেন শিরোমণি মহাশয়ের কথাই সত্য হইল, তখন কথিত মহাপুরুষের সমাগমও কিয়ৎপরিমাণে লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিল। লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মিবার আরও একটি কারণ ঘটিয়াছিল, সেইটি এই যে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ ধর্মপরায়ণ যোগী তীর্থপর্যটনকারী প্রবাসী রামজয় তর্কভূষণ এক সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার বংশে এক শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষের আগমন হইবে সে শিশু উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে; তাহার কার্যকলাপে দেশের গৌরব বর্ধিত হইবে, সে দয়ার অবতার হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে। স্বপ্নে তাঁহার প্রতি দেশে ফিরিয়াআসিতে, পরিবার পরিজনের সংবাদ লইতে এবং ঐ সুসন্তানের শুভাগমন প্রত্যাশা অপেক্ষা করিতে আদেশ হইল। রামজয় তর্কভূষণ তদনুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বপ্নাদিষ্ট বিষয়ের সফলতার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই স্থানেই আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উক্ত সিদ্ধপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিহ্বার তলে আলতায় কিছু লিখিয়া দিয়া (১) বলিয়াছিলেন, এই শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারিদিকে কম্পিত হইবে, ইহার দয়াদাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম, এ বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না; আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হইল, আমার বংশ পবিত্র হইল।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে ছিলেন না। নিকটবর্তী কোমরগঞ্জ নামক স্থানে মঙ্গলবার ও শনিবার সপ্তাহে দুই দিন হাট হইত। মঙ্গলবার আহারান্তে তিনি হাটে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ পুত্রকে এই শুভ সমাচার দিবার জন্য কোমরগঞ্জ অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, পথে পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে বলিলেন, 'এক এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।' সেই সময়ে তাঁহাদের গৃহে একটি আসন্ন-প্রসবা গাভীও ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা গৃহে পদার্পণ করিয়া সর্বাগ্রে গোবৎস দেখিবার জন্য গোশালার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার পিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ও দিকে নয়, এ দিকে এস, আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।' এই বলিয়া সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শিশুকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহাকে "এঁড়ে বাছুর" বলিবার কারণ এই যে, এ বালক এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হইবে। যাহা ধরিবে, তাহাই করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না। এই বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও পরম দয়ালু হইবে, ইহার যশোগীতে চারিদিক পূর্ণ হইবে, ইহার জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্তিলাভ হইল। এইজন্য ইহার নাম রাখিলাম

---

১ কি লিখিয়াছেন, তাহা কাহাকেও বলেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র।' বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া সূতিকাগৃহে পিতামহ কর্তৃক যে নামে অভিহিত হইয়াছিলেন সেই "ঈশ্বরচন্দ্র" নামেই তিনি উত্তরকালে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন; নামান্তর হয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বীরসিংহ। বীরসিংহগ্রামের বন, উপবন, ধান্যক্ষেত জলাশয় ও অপরাপর সামান্যতর প্রাকৃতিক শোভা তাঁহার শৈশবস্মৃতি অধিকার করিয়াছিল সত্য, বাল্যকালের ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, বাল্য-কলহ, বাল্যসৌহার্দ্য—এ সকলই বীরসিংহের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও, বীরসিংহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান হইলেও, ইহা তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের বাসভূমি নহে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বনমালীপুর নামে এক গ্রাম আছে. উহাই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহের বাসস্থান। কি কারণে বনমালীপুরের বাসস্থান বীরসিংহে উঠিয়া আসিল, নিম্নে তাহা নির্দেশ করা যাইতেছে।

বনমালীপুরে অবস্থানকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অবর্তমানে তদীয় পঞ্চপুত্র (জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন. পঞ্চম রামচরণ) একত্র বাস করিতে-ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতৃদ্বয় সংসারের সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করিয়া পরিশেষে অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এরূপ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতেন এবং তাঁহাদের তৃতীয় সহোদর' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের এতই অবমাননা করিতেন, তাঁহাকে এতই ক্লেশ দিতেন যে, তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কিছুকাল অতিকষ্টে যাপন করিয়া পরিশেষে দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যাসহ পত্নী দুর্গাদেবীকে গৃহে রাখিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। রাঢ়দেশে তিনি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে অধ্যাপকমণ্ডলী নিমন্ত্রিত ও সমাগত হইয়াছিলেন, তাহাতে নবদ্বীপের সে সময়ের প্রধান নৈয়ায়িক সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দর্শনে প্রীত হইয়া, সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রচুর সাধুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সে সময়ে তাঁহার প্রতিপত্তি ও সম্মান আরও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনা দ্বারা তিনি সর্বসাধারণের অধিকতর সম্মান ও সমাদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ গৃহত্যাগের সময়ে যে পত্নী দুর্গাদেবীকে সন্তানসহ বনমালীপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি ঐ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয় কন্যা। তর্কভূষণ মহাশয়ের দেশত্যাগের পর দুর্গাদেবী কিছুকাল অতিকষ্টে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া, অবশেষে অসহনীয় যন্ত্রণার তাড়নায়

ত্যক্তবিরক্ত হইয়া বীরসিংহে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। দুর্গাদেবীর দুই পুত্র ও চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, কন্যাগণের জ্যেষ্ঠার নাম মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয় গোবিন্দমণি, কনিষ্ঠা অন্নপূর্ণা এই সন্তানদের সর্বজ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জনক।

দুর্গাদেবী পুত্রকন্যাসহ পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর তাঁহার পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বহু সমাদরে কন্যা দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগুলিকে গ্রহণ করিলেন এবং পরমযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। অল্প কয়েক দিনের জন্য দুর্গাদেবীর মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, পুত্রকন্যাসহ তিনি কিছুকাল কথঞ্চিৎ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার সে আশা অনতিকাল মধ্যে নিরাশার গভীর অন্ধকারে আবৃত হইল। একে স্বামী নিরুদ্দেশ, তাতে কয়েকটি অপোগণ্ড বালকবালিকার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর। পিত্রালয়ে পিতামাতার অত্যধিক বার্ধক্য নিবন্ধন তদীয় পুত্র ও পুত্রবধূর উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত হওয়ায়, দুর্গাদেবীর দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগের সীমা রহিল না। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ অনির্দিষ্ট কালের জন্য এইরূপ সাতজন লোকের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না এবং সেই কারণে সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার অপ্রীতিকর বচসা ও কলহের অবতারণা করিতেন। সময়ে সময়ে অত্যধিক মর্মপীড়ার কারণ উপস্থিত হইলে, কন্যা তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার গোচর করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয় হইত না, কারণ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তদীয় পত্নী সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্রবধূর অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার কর্তৃত্ব খাটিত না। এজন্য কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবী বুঝিলেন, পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে পিতার অন্নে দেহ ধারণ করা দুরাশা মাত্র। অবশেষে পিতার আদেশে পিতৃগৃহের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে পুত্রকন্যাসহ অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সেকালে নিরুপায় ভদ্র পরিবারের অসহায়া স্ত্রীলোকেরা টেকুয়া ও চরখায় সুতা কাটিয়া অন্যের সাহায্যে সেই সুতা বাজারে বিক্রয় করিয়া অতি দীনভাবে আপনাদের ভরণপোষণ কার্য নির্বাহ করিতেন। দুর্গাদেবীও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে, হয় ত এই সামান্য উপায়ে অর্জিত অর্থে কায়ক্লেশে তাঁহার দিনপাত করা সম্ভব হইত। এতগুলি সন্তান লইয়া এ উপায়ে কোনোক্রমেই অন্ন সংস্থান হয় না, এজন্য পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস জননীর অসহনীয় যন্ত্রণা দর্শনে নিরতিশয় কাতর হইয়া অর্থো-পার্জনের আকাঙ্ক্ষায় বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

জননীর অনুমতি লইয়া বালক ঠাকুরদাস অর্থোপার্জনের জন্য যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র।

সে সময়ে তাঁহাদের অতি নিকট জ্ঞাতিপুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সুবিধা ও সুযোগক্রমে কলিকাতায় সম্মানিত ও প্রতিপন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। সুসময় ও সহৃদয়তাগুণে তিনি অকাতরে অন্নদান করতেন। জ্ঞাতিপুত্র ঠাকুরদাস বিপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বালক ঠাকুরদাসকে পরমযত্নে গৃহে স্থান দিলেন। ঠাকুরদাস ইতিপূর্বে বনমালীপুরে ও তৎপরে বীরসিংহে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে যথারীতি সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করিবেন এইরূপ স্থির হইল এবং তিনিও তাহাতে বিশেষ ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী সংস্কৃত অধ্যয়নে আশু অর্থোপার্জনের আর কোনো আশাভরসা থাকে না, তখন জননীর দুঃখ কষ্ট স্মরণ করিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিকে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে নিরুপায়া জননী ও ভাইভগিনীগুলির অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য মনের উত্তেজনা; এই উভয়বিধ চিন্তার মধ্যে পরিশেষে শেষোক্তটিরই জয় হইল। অল্প সময় মধ্যে কোনো প্রকার অর্থকারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জননীর দুঃখ দূর করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ঐ সময়ে মোটামুটি ইংবাজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদের অফিসে সহজেই কর্ম কাজ হইত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা করাই পরামর্শসিদ্ধ ভাবিয়া সকলেই ঠাকুরদাসকে সেইরূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এখনকার মতো সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষার কোনো প্রকার সুবিধা ছিল না। পড়িবার পুস্তক ছিল না, পড়াইবার লোক ছিল না। তখন এখনকার মতো পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয়ও হয় নাই। সে কালে লোকে ইংরাজী কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সময় হয়ত দুই তিনটি বিশেষ্য-পদ বা দুই তিনটি ক্রিয়াপদ একত্রে যোজনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিত। সাহেবরা কোনো প্রকারে তাহার অর্থ বুঝিয়া লইতেন। অনেকে অধিকাংশ স্থলে মনের ভাব কতক ইংরাজী, কতক হিন্দি আর অবশিষ্ট আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশ করিত। একজন লোকে খুব ভাল ইংরাজী শিখিয়াছে বলিয়া যখন প্রশংসাপত্র পাইত, তখন তাহার এই অর্থ বুঝিতে হইত যে, সে ব্যক্তি পাঁচ শত, কি হাজার কি দুই হাজার শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছে। এই রূপেই সে সময়ে ইংরাজী বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইত। ঠাকুরদাস এইরূপ ইংরেজী শিক্ষার আয়োজন করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের এক বন্ধু কাজ চালাইবার মতো ইংরাজী জানিতেন, তিনিই ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুরোধে ঠাকুরদাসকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই ভদ্র লোকটি

বিষয়কর্মোপলক্ষে সমস্ত দিনই বাহিরে থাকিতেন, সুতরাং সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

ঠাকুরদাস সেই ভদ্রলোকের বাসায় গিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন সন্ধ্যার সময় সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরদাস তুমি এত রোগা হইতেছ কেন? ঠাকুরদাস কি উত্তর দিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। তখন সেই সদাশয় মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, 'মহাশয়, ইংরাজী পড়ার সূচনা হইতে আমি একাহারে দিন যাপন করিতেছি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরি লোকের আহারাদি শেষ হয়। আহারের জন্য বিলম্ব করলে পড়া হয় না, আবার পড়িতে আসিলে, রাত্রিতে গিয়া দেখি, সকলের আহার হইয়া গিয়াছে। অগত্যা রাত্রিতে আর আহারাদি হয় না। সেই জন্যেই শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে।' ঐ সময়ে সেই শিক্ষকের এক দয়ালু আত্মীয় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই শিক্ষালোলুপ বালকের ক্লেশের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, 'দেখ ঠাকুরদাস! যাহা শুনিলাম, তাহাতে তোমার আর ওখানে থাকা হইতে পারে না, যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার বাসায় স্থান দিতে পারি।' ঠাকুরদাস এই প্রস্তাবে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। এই ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি তাহার পরদিন হইতে তাঁহার বাসায় গিয়া রহিলেন এবং দুইবেলা আহারের সংস্থান হওয়াতে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দয়ালু ব্যক্তির যেরূপ সদাশয়তা ও সৌজন্য ছিল, অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। তাঁহাকে সর্বদা অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতে হইত, এজন্য ঠাকুরদাসকে অনেক সময় ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হইত; কিন্তু তথাপি এই ব্যক্তির স্নেহ মমতা ও মিষ্ট কথায় সে ক্লেশ কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু এ পর্যন্ত দুই বেলা দুই মুষ্টি খাইতে পাইয়া, নিশ্চিন্তমনে লেখাপড়া করিতে অবসর পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই ভদ্রলোকটি দালালির কার্য করিতেন। সহসা ইহার আয়ের এত হ্রাস হইল যে, দিন চলা ভার হইল। তিনি সামান্য অর্থোপার্জনের জন্য সমস্ত দিনই বাহিরে থাকিতেন, সন্ধ্যারসময়ে কোনো দিন কিছু আনিতেন, কোনো দিন বা শূন্যহস্তে বাসায় ফিরতেন। যে দিন কিছু আনিতেন, সে দিন সমস্ত দিনের পর রাত্রিতে দুইজনের আহার হইত, যে দিন কিছু পাইতেন না সেদিন হয় ত উপবাসেই যাইত। এইরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে ঠাকুরদাসের ক্লেশের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার পক্ষে হইল—'অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।' অনেক সময়ে সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইতে হইত। ক্ষুধায় কাতর হইলে কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেন

না। তাঁহার একখানি সামান্য পিতলের থালা আর একটি ছোট ঘটি ছিল, তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, এক পয়সার শালপাতা কিনিয়া রাখিলে, দশ-বার দিন তাহাতে আহার চলিতে পারিবে ; এমন অবস্থায় থালাখানি বিক্রয় করিয়া যে পয়সা হইবে, তাহা দ্বারা যে-যে দিন দিনের বেলায় আহার না হইবে, সেই সেই দিন এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইলেই চলিবে, এই ভাবিয়া তিনি সেই থালাখানি নূতন বাজারে কাঁসারিদের দোকানে বিক্রয় করিতে গেলেন, একে একে সকল কাঁসারিই বলিল, 'আমরা অজানিত লোকের নিকট পুরান বাসন কিনিয়া শেষে কি বিপদে পড়িব ? সময়ে সময়ে পুরান বাসন লইয়া বড় ফাঁসাতে পড়িতে হয়। আমরা তোমার ও থালা লইতে পারিব না।' যখন কোনো দোকান্দারই থালা লইল না, তখন নিরুপায় হইয়া বিষন্নমনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হইয়া থালা বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, আহারের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া শেষে দারুণ যন্ত্রণায় সে দিনও উপবাসে কাটিল।

আর একদিন সায়াহ্ন সময় ক্ষুধার জ্বালায় আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিবার অভিপ্রায়ে তিনি সেই রৌদ্রে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। বড়বাজারে তাঁহার আশ্রয়দাতার বাসা হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত আসার পর তিনি চক্ষে সরিষাফুল দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময় তিনি এক দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই দোকানে একটি মধ্যবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক মুড়িমুড়কি বেচিতেছিল। সেই বিধবা ঠাকুরদাসকে ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবাঠাকুর দাঁড়াইয়া আছ কেন?' ঠাকুরদাস পানার্থে একটু জল চাহিলেন। সেই বিধবা ঠাকুরদাসকে সস্নেহে ও সমাদরে বসিতে বলিয়া জল আনিয়া দিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অন্যায় বোধে কিছু মুড়কিও দিল। ঠাকুরদাস মুড়কি কয়টি যেরূপ ব্যগ্রভাবে ভক্ষণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সেই বিধবা বুঝিতে পারিল যে তাঁহার সেই দিন আহার হয় নাই। তখন সেই স্ত্রীলোকটি কহিল, 'বাবাঠাকুর আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই?' ঠাকুরদাস বলিলেন, 'না, মা, আজ এখনও আমি কিছু খাই নাই।' তখন সেই স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল, 'বাবাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর।' এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে দই কিনিয়া আনিল। মুড়কি ও দই দিয়া ঠাকুরদাসকে ফলার করাইল। আহার করাইয়া তাহার নিকট তাঁহার অবস্থার কথা শুনিল এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া বলিয়া দিল, 'দেখ, যেদিন তোমার খাওয়া না হ'বে, সেদিন উপোস করিয়া থাকিও না আমার এইখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।' এই বিধবা যে কেবল অনুরোধ করিয়াছিল তাহা নহে,

অনাহারে না থাকিয়া, দোকানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইতে ঠাকুরদাসকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত অসম্পূর্ণ শৈশবচরিত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন ঃ 'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়-বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না ; যাহা হউক, যে-যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।' যাঁহার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন, যাঁহার দ্বারা সংসারের কল্যাণ সাধিত হইবার কথা, তাঁহাকে বিধাতা এইরূপ দুঃখকষ্টেও রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এরূপ দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণে পিষিয়া গিয়াও সৎপথে চলিতে প্রয়াস পান, বিধাতা তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারী করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করেন। ঠাকুরদাসও উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ অপরিসীম ক্লেশে যখন ঠাকুরদাসের দিনগুলি কাটিতে লাগিল, তখন তিনি প্রায়ই তাঁহার আশ্রয়দাতাকে বলিতেন, কোনো সুযোগে আমাকে কোথাও একটু কাজ কর্ম করিয়া দিন। আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি প্রাণপণ শ্রম করিয়া প্রভুর কার্য করিব, প্রাণান্তেও অধর্মাচরণ করিব না। আমার উপকার করিয়া আপনাকে কখন কোনো কথা শুনিতে বা লজ্জিত হইতে হইবে না। দেখুন, আমার মা ভাইবোনের কথা যখন মনে হয়, তখন আর মুহূর্তের জন্য জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। যখন ঠাকুরদাস আর্তভাবে এই সকল দুঃখের কথা বলিতেন, তখন চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত। তাঁহার এই কাতরতা দর্শনে আশ্রয়দাতার হৃদয়ে বিশেষ দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি মাসিক দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসকে একস্থানে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্বের ন্যায় আশ্রয়দাতার বাসায় থাকিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটি টাকা বাড়িতে পাঠাইতে লাগিলেন। ঠাকুরদাস বুদ্ধিমান দৃঢ়চিত্ত ও কার্য-কুশল লোক ছিলেন ; যেখানে যখন কর্ম করিতেন; তখন সেখানকার প্রভু তাঁহার দৃঢ়তা শ্রমপটুতা ও নিপুণতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। এই জন্য তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, যখন তাঁহার পিতৃঠাকুরের এই মাসিক দুই টাকা বেতনের কর্ম হয়, তখন তাঁহার পিতার গৃহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল। দুই টাকা বেতনের কর্ম হইয়াছে শুনিয়া, বাড়ির সকলে আহ্লাদে দিশাহারা হইয়াছিলেন। দুই-তিন বৎসরের মধ্যে ঠাকুরদাস নিজের শ্রমশীলতা গুণে দুই টাকার স্থানে পাঁচ টাকা বেতন পাইতে

লাগিলেন, ইহাতে জননী ও ভাইভগিনীগুলির অন্নকষ্টের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে, ঠাকুরদাস অধিকতর আগ্রহাতিশয় সহকারে কাজকর্ম করিতে লাগিলেন।

দুই টাকা বেতনের কথা শুনিয়া দিশাহারা হইবার কথা। সেকালে আট আনা দশ আনায় একমন চাউল পাওয়া যাইত। এক টাকায় একমণ দুধ মিলিত। শাক-শবজি ও তরিতরকারী প্রায় ক্রয় করিতে হইত না। সেকালে দরিদ্র লোকে টাকা প্রায় দেখিতে পাইত না, দেখার দরকারও হইত না! বিনা টাকায় দিন চলিত। বঙ্গের কি দুরদৃষ্ট! আমাদের কি পোড়াকপাল! এমন সুখের দিন দরিদ্রের ক্রোড় হইতে চিরদিনের জন্য অপহৃত হইয়াছে। জন্ম-ভূমির দগ্ধভাগ্যে কি সে শুভদিন আর আসিবে না, যখন অন্নের কাঙ্গাল দীনদুঃখিগণ গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটিরে বসিয়া অবাধে অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে পারে? দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ই কেবল এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে সক্ষম ছিলেন। কাজে ও কথায় তিনিই ইহার সদুত্তর দিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিনি প্রথমে বনমালীপুরের বাটীতে আসিয়া সেখানে পত্নী ও তনয়তনয়াগণের কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া বীরসিংহে গমন করেন। এখানে আসিয়া প্রথমে কাহারও নিকট পরিচয় দেন নাই। ছদ্মবেশে পরিবার ও সন্তানগণের অবস্থা দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণাই সর্বাগ্রে পিতাকে চিনিতে পারিয়া বাবা বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করায় সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনিও আত্মপরিচয় দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং কয়েকদিন বীরসিংহে বাস করিয়া পত্নী ও পুত্রকন্যা লইয়া বনমালীপুরে যাইবার মানস করিলেন। কিন্তু পত্নীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের কথা শুনিয়া সাতিশয় মর্মপীড়া পাইয়া শেষে বাধ্য হইয়া বীরসিংহেই বাস করা স্থির করিলেন। এইরূপে বীরসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৈত্রিক বাসস্থান হইয়াছে।

তর্কভূষণ মহাশয় কয়েকদিন বাটীতে অবস্থান করার পর, ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারে ভাগবতচরণ সিংহ নামক একজন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। ইঁহার সহিত ঠাকুরদাসের পিতার বিশেষ পরিচয় ছিল, সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়ালু ও ধার্মিক লোক ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তাঁহার দেশত্যাগ ও নানাদেশ পরিভ্রমণ ও নানা তীর্থ পরিদর্শন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ঠাকুরদাসকে তাঁহার গৃহে রাখিবার জন্য তর্কভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর পিতার আদেশমতো ঠাকুরদাস, সিংহ মহাশয়ের গৃহে নিশ্চিন্তমনে দুবেলা

উদর পূরিয়া আহার করিতে পাইয়া পরমসুখে অনুভব করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার বোধ হইয়াছিল, যেন পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। এইখান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃগৃহের সুখ এবং সুবিধার সূত্রপাত হইয়াছিল; সিংহ মহাশয়ের গৃহে ঠাকুরদাসের যে কেবল অন্নকষ্ট দূর হইয়াছিল তাহা নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় তিনি মাসিক আট টাকা বেতনে কোনো স্থানে কর্মে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের বেতনবৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া জননী দুর্গা-দেবীর আর আহ্লাদের সীমা ছিল না।

এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ-চব্বিশ বৎসর হইবে। তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন এবং গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাসদৃশী এই ভগবতীদেবীই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী। ভগবতীদেবীর পিতা তর্কবাগীশ মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মচিন্তা, ধর্মালোচনা ও সাধন ভজনে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। বিষয়কর্মে মনযোগ দেওয়া এবং সংসার সুখ সম্ভোগ করা অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি সর্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। তিনি বহুকাল শবসাধনে নিযুক্ত থাকায় শেষে উন্মাদগ্রস্ত হন। এজন্য পত্নী গঙ্গাদেবী, লক্ষ্মী ও ভগবতী নাম্নী কন্যাদ্বয় ও উন্মাদ স্বামীকে লইয়া পাতুল গ্রামে পিতৃগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ভগবতীদেবী আশৈশব মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। এই আদর্শ হিন্দুগৃহের ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি ও ভাবভক্তি ভগবতীদেবীর চরিত্রগঠনের প্রধানতম উপকরণ হইয়াছিল। ভগবতীদেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অবর্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ অন্যান্য সহোদর ও সহোদরাদের লালনপালনের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পিতার সুনাম রক্ষার জন্য নিয়ত যত্নবান থাকিতেন। হিন্দু গৃহে একান্নবর্তী পরিবারে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে সকলেই সুখে কালযাপন করিতে পারে, এই পরিবার তাহার আদর্শস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পূর্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র জীবনচরিতের প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে লিখিয়াছেন: সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী ভ্রাতাদের অধিক দিন পরস্পর সদ্ভাব থাকে না; যিনি সংসারের কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্যান্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে সেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা, কোনো মতে ঘটিয়া উঠে না, এজন্য অল্প দিনেই ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে; অবশেষে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। কিন্তু সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি সহোদর সমান ছিলেন, এজন্য কেহ কখনও ইহাদের চারিজনের মধ্যে মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভাগিনী ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের ওপরও তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা

পুত্রকন্যাসহ মাতুলালয়ে গিয়া যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন, কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারে না।'

'অতিথির সেবা অভ্যাগতের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এ অঞ্চলের কোনো পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল কথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই, পরম সমাদর, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

'বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায় এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদ-ভঞ্জন, বিপদ্-মোচন, অসময়ে সাহায্য দান প্রভৃতি কার্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয় অথবা স্বীয়পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, একদিন এক‌ক্ষণের জন্যও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত নিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতো অমায়িক, পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না'

'রাধামোহণ বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ লইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, মাতৃদেবী পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়,ক্রমান্বয়ে পাঁচ-ছয় মাস বাস করিতেন কিন্তু একদিনের জন্যেও স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্র কন্যাদের এরূপ স্নেহ প্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে তদীয়া একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিচলিত স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিল।'

আত্মীয় স্বজনের সেবা, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভারগ্রহণ, মৃত আত্মীয়স্বজনের অনাথ ও নিরাশ্রয় পুত্রকন্যার লালন-পালনই এই পরাধীন ও প্রাণহীন বঙ্গসমাজের পরমসম্পদ ও অমূল্যধন বলিয়া চিরকাল কীর্তিত হইয়া আসিতেছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত উপরোক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তি সেইরূপ আদর্শ হিন্দুগৃহের প্রকৃত চিত্রের পরিচায়ক। এমন এক সময় ছিল যখন লোক বিষয় সম্পত্তি লাভ ও অর্থোপার্জন করিয়া কেবল নিজের ও নিজের পরিবার-

বর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে আত্মীয়স্বজন ও অপর দশজনের সুখ সাধন করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন। সেকালে লোকে দশজনের সুখ বর্ধন করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাহার কারণ এই যে, নিজের সুখের বিনিময়ে অন্য দশ জনের সেবা করাই ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ধর্ম বোধে ধর্মাকাঙ্ক্ষী লোকেরা এইরূপ সদানুষ্ঠানে নিয়ত রত থাকিতেন। এক্ষণে এই ধর্মবুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার লোক এরূপ ধর্মকর্মের পরিবর্তে আত্মসুখের একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপরোক্তরূপ, আদর্শ হিন্দুপরিবার এবং রাধামোহন বিদ্যাভূষণের ন্যায় সহৃদয় পরোপকারী ধর্মনিরত লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

সেকালে একদিকে যেমন অল্প আয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ হইতে ও অল্প ব্যয়ে লোককে প্রতিপালন করা যাইত, অপরদিকে সম্পন্ন লোকদের নিজের পরিবারবর্গের সভ্যতাসঙ্গত বহুবিধ সুখভোগের বাসনা তত প্রবল ছিল না। সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহেও এখনকার অতি সামান্য লোকের গৃহের অপেক্ষা অধিক অলঙ্কারাদি থাকিত না। অনেক স্ত্রীলোক দুই-চারখানি রৌপ্যালঙ্কার পাইলেই আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন। সেকালে পুরুষেরা যেমন দশজনকে প্রতিপালন করিতে সুখানুভব করিতেন, স্ত্রীলোকেরা আবার সাবিত্রীর ন্যায় পতিরতা ও সীতার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। সেকালে গৃহে পুরাঙ্গনারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া, বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচুর পরিমাণে সুখশান্তি বিরাজ করিত এবং বিপন্ন আত্মীয়স্বজন, সম্পন্ন গৃহে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জননীর মাতুলালয়ে হিন্দুগৃহের এরূপ উচ্চ আদর্শ দর্শন করিয়াও একান্নবর্তী পরিবারের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন: যেখানে পুরুষ স্ত্রীর কথায় মরে বাঁচে, সেখানে সহোদরে-সহোদরে আত্মীয়তা থাকে না, এমন অবস্থায় আর একান্নবর্তিতা রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করা বৃথা। যাহারা দূরে আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া অশান্তির আগুনে দগ্ধ করা অপেক্ষা, যাহারা একত্র আছে তাহাদের কোনো প্রকার মনোমালিন্য ঘটিবার পূর্বেই পৃথক-পৃথক বাস করা শ্রেয়ঃ, কারণ তাহা হইলে, সহোদর আর কখনো সহোদরের শত্রু হইবে না! চিরদিন সদ্ভাব ও শান্তি সুরক্ষিত হইবে। সুখের সংসারে অর্থাগম হইলে, তদ্দ্বারা সহোদরের, তাঁহার পুত্রকন্যাগণের ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের যথেষ্ট হিতসাধন করা যায়, কিন্তু অশান্তিপূর্ণ সংসারে লক্ষ টাকাতেও কাহারও কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর নহে। এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিনই এই প্রথার বিরোধী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। কোনো ক্রমে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে কিংবা লোকের প্রদত্ত অবমাননা ও অনাদর নীরবে সহ্য করিতে পারিতেন না।

তিনি চিরজীবন নিজ অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতে শিখিয়াছিলেন। উপকার প্রত্যাশায় কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার করিতেন না। সেরূপ নীচ বৃত্তি অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন, অথচ তিনি অতি অমায়িক ও সদাশয় লোক ছিলেন। ছোট বড় সকল লোকের প্রতি সমভাবে সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। যাহারা কথায় এক প্রকার বলে, কার্যে তদ্বিপরীতাচরণ করে, তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তিনি অতি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে এই ভয়ে নিজের অভিপ্রায় গোপন করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী ছিলেন। তিনি যাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাহারা হীন জাতি হইলেও তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিতেন, ভদ্রবেশধারী নীচমনা লোকদিগকেই তিনি ইতর শ্রেণীর লোক বলিয়া অবাধে নিজের মত প্রকাশ করিতেন। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু কখনও ক্রোধের পাত্রের অনিষ্টসাধন করিতেন না।

তাঁহার শরীরে প্রভুত বল ছিল। একবার মেদিনীপুরে যাইবার পথে, একটা ভল্লুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও, তাহাকে বধ করিয়া, রুধিরাক্ত কলেবরে বহু পথ অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। তথায় কিছুকাল রোগভোগ করিয়া তবে গৃহে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। সে সময়ে প্রায় সকল স্থানেই দস্যুভয় ছিল। অনেকেই একাকী অসতর্কভাবে পথে বাহির হইয়া দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইত, এজন্য সকলে তাঁহাকে একাকী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিত। কিন্তু এক লৌহদণ্ড হস্তে তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র গমনাগমন করিতেন। একদিকে যেমন তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল, অন্যদিকে তাঁহার মনের শক্তিসামর্থ্যও প্রচুর ছিল। অথচ তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন নিরীহ লোক ছিলেন, এজন্য সকলেই তাঁহাকে ঋষি বা যোগীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। গোপনে বনমালী-পুরের গৃহত্যাগের পর আট বৎসরকাল তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম ও অন্যান্য নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া, শেষে স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে অবশিষ্ট কাল গৃহে সন্তানসন্ততিদের মধ্যে অতিবাহিত করেন। (২)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে সকল ঘটনার সমাবেশ হইলে, যে সকল কারণ বিদ্যমান থাকিলে মানবজীবনের প্রকৃত স্ফূর্তি হয়, যে সকল অবস্থার ভিতরে পড়িলে, শিক্ষা করিবার উপযোগী যে সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিলে, মানুষ উত্তরকালে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যে সে সকল সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহের

---

২ পূর্বপুরুষ ও শৈশবচরিতবিষয়ক বিবরণের অধিকাংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত শৈশবচরিত হইতে গৃহীত হইয়াছে। বর্ণিত বিষয়ের কোনো কোনো অংশ তাঁহার নিকট শুনিবারও সুযোগ ঘটিয়াছিল।

দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভর ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ তাঁহাকে সংসারের সম্পত্তি কিছু দেন নাই সত্য, কিন্তু এমন কিছু দিয়াছিলেন, যাহার গুণে ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর,—গুণের সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। আর তিনি জননীর নিকট জননীর মাতুলালয়ের দয়াদাক্ষিণ্য, পরদুঃখকাতরতা ও পরসেবার ভাব লাভ করিয়াছিলেন। সে গৃহে, যে দয়ার চিত্র দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার জননী চিরমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি যাহা নিজে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্ব লাভের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া তিনি দয়ার সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃকুলের ঐ উভয়বিধ ভাব মিলিত হইয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র ভাবে গঠন করিয়াছিল। এক দিকে অন্যায়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, অন্য দিকে দুঃখীর প্রতি আশ্চর্য দয়া, এই উভয়ভাবের মিলন এই উভয়দিক হইতে সংঘটিত হইয়াছিল। পিতার দিক হইতে পৌরুষ ভাবের তীক্ষ্ন রেখা ও জননীর দিক হইতে দুঃখীর দুঃখ-মোচনের জন্য কোমলতার সুমিষ্ট ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর-চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনচরিতের সুদৃঢ় ভিত্তি এই কোমলতাময় পৌরুষ-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুকঠিন প্রস্তরময় পর্বতদেহে সুমিষ্ট সলিল-ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন সমতল ক্ষেত্র স্নিগ্ধ করে উর্বর করে, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃকুলের ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার শৈলবক্ষে তাঁহার মাতৃকুলের দেবদুর্লভ লোকসেবার মান্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসমাজকে উর্বর করিয়াছে—মিষ্ট করিয়াছে। আমরা যতই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রবর্ণনে অগ্রসর হইব ততই পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পিতা, পিতামহ, মাতা ও মাতৃমাতুলের অভিনয় দেখিতে পাইব।

## তৃতীয় অধ্যায়
## শৈশবকাল

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর হইতে ঠাকুরদাসের সংসারের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়, এজন্য সকলেই বালককে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বালকও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির পরিচয়দানের সুযোগ পাইয়া বাড়ির ও প্রতিবেশিগণের ভয়ানক অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। সে সময়ে বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক গুরুমহাশয় পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। কালীকান্ত গুরুমহাশয় বালকগণকে স্নেহসহকারে শিক্ষা দিতেন, অথচ অল্পসময় মধ্যে অধিক শিক্ষা দিতে পারিতেন। এই দুই কারণে গ্রামের মধ্যে অন্যান্য গুরুমহাশয় অপেক্ষা তাঁহারই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শিক্ষকাগ্রগণ্য পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, 'বস্তুতঃ পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয়দলের আদর্শ ছিলেন।' বালকগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শিক্ষা দিতে পারাই প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সে ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুরুমহাশয় হইয়া উত্তরকালে তাহার নিকট এরূপ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন।

পাঠশালায় একবৎসর (১) লেখাপড়া করার পর তাহার কঠিন পীড়ার সূচনা হইল। প্রথমে কিছুকাল জ্বর, তৎপরে উদরাময় ও শেষে প্লীহাজ্বর ভোগ করিয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল যে, সকলেই সে যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যূন ছয় মাস কাল এইরূপ রোগভোগ করার পর পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নাই শুনিয়া, তাঁহার জননীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবার মানসে পুত্রসহ ভাগিনেয়ীকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাসগ্রাম পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামক গ্রামে বহুসংখ্যক সুবিজ্ঞ কবিরাজের বাস। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল কবিরাজ নামক একজন উপযুক্ত কবিরাজের উপর ভাগিনেয়ীপুত্রের চিকিৎসার ভার দিলেন।

---

১ সহোদর শম্ভুচন্দ্র প্রণীত জীবন-চরিতে তিন বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। স্বরচিত জীবন-চরিতে এক বৎসরের উল্লেখ আছে।

প্রায় ছয়মাস কাল তথায় অবস্থানপূর্বক সুচিকিৎসার গুণে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলেন। তৎপরে অধ্যয়নার্থে বীরসিংহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, 'এই পীড়ার সময় তাঁহার উপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।'

ইহার পর নূতন করিয়া আবার কালীকান্তের পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে আট বৎসর পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঐ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেধাশক্তি, তীক্ষ্মবুদ্ধি ও শ্রমপটুতা দর্শনে গুরুমহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুরুমহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন, এবং সর্বাপেক্ষা তাঁহার উপর গুরুমহাশয়ের অত্যধিক টান ছিল। এই তিন বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা এক প্রকার সমাপ্ত করেন।

এই আট বৎসর বয়স পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র আপনার বাল্যসুলভ চপলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রামের কোনো গৃহস্থের দ্বারে মলমূত্র ত্যাগ করা তাঁহার একটি প্রধান কার্য ছিল। ঐ গৃহস্থের নবীনা বধূ বালকের এতাদৃশ নিত্য দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া সময়ে সময়ে বালককে ধরিতে ও দণ্ড দিতে গেলে, বৃদ্ধা গৃহিণী ভবানন্দকথিত ভাবী কীর্তিকলাপের উল্লেখ করিয়া বধূকে নিবৃত্ত করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি এই সময়ে ভয়ানক দুরন্ত ছিলেন। লোকে কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে দিলে তিনি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাহাতে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন। ধান্যক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অপক্ক ধানের শীষ তুলিয়া কতক খাইতেন কতক ফেলিয়া দিতেন। একবার যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় যবের শীষ ফুটায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী ঠাকুরাণী গলায় অঙ্গুলি দিয়া বহুকষ্টে তাহা বাহির করিয়া দেন, তবে সে যাত্রা রাক্ষা পান। এরূপ আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তাঁহার বাল্য জীবনে ঘটিয়াছে, যে সকলের জন্য সময়ে সময়ে তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

অত্যধিক দুরন্ত হইলে কি হয়, লেখাপড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগের ত্রুটি ছিল না। গুরুমহাশয় যাহা কিছু শিখাইতেন, অতিমাত্র আগ্রহসহকারে অত্যল্প কালমধ্যে তিনি তাহা শিক্ষা করিতেন। এজন্য গুরুমহাশয় অনেক সময়ে অপরাহ্নে অপরাপর বালকগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিকটে রাখিতেন এবং যে সকল পাঠ মুখে মুখে অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেন। বেশী রাত্রি হইলে, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার পিতামহীর নিকট পেঁছাইয়া দিতেন। এই সময় গুরুমহাশয় একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতাকে বলিলেন, এখানকার পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরের তাহা হইয়াছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর; ইহাকে কলিকাতায় লইয়া

গিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ বালক যেরূপ মেধাবী, ইহার স্মৃতি-শক্তি যেরূপ প্রবল, তাহাতে এ বালক যাহা শিখিবে, তাহাতেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় অতিসার রোগে তিনি লোকান্তরিত হন। সেই উপলক্ষে ঠাকুরদাস পিতৃকৃত্য সমাপনার্থে গৃহে গমন করেন। এই কার্য শেষ হইলে পর ঠাকুরদাস কলিকাতায় আসিবার সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসেন। কলিকাতায় নিকটে রাখিয়া লেখা-পড়া শিখানই পুত্রকে সঙ্গে আনিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আসিবার সময়ে গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে ছিলেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ও পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইবেন, বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় পথে একটি ঘটনা উপলক্ষে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। সিয়াখালার নিকট সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বাটনা বাটা শিলের মতো এক একখানি পাথর মধ্যে মধ্যে পথের ধারে বসান রহিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন, 'ওগুলি শিল নয়, ওকে মাইল স্টোন বলে।' তিনি বলিলেন, 'বাবা মাইলস্টোন কাকে বলে কিছুই বুঝিলাম না।' তখন পিতা পুত্রকে বলিলেন, ওটা ইংরাজী কথা, এক মাইল আমাদের হিসাবে আধক্রোশ, আর স্টোন শব্দের অর্থ পাথর। প্রত্যেক আধক্রোশ অন্তর ঐরূপ এক একখানি পাথর পোঁতা আছে। কলিকাতার এক মাইল অন্তরে যে পাথর আছে, তাহাতে এক অংক খোদা আছে, আর এই পাথরখানিতে উনিশ অংক লেখা আছে। কলিকাতা এখান হইতে উনিশ মাইল অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ।' এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ পাথরখানি ভাল করিয়া দেখাইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নামতার হিসাবে পাথরে হাত দিয়া বলিলেন, 'তবে কি এইটি ইংরাজীর এক আর একটি নয়?' পিতা বলিলেন, হ্যাঁ, তাই বটে।' তখন বালক মনে মনে সংকল্প করিলেন, পথে যাইতে যাইতে ইংরাজী অংক শিখিবেন। উনিশ হইতে দশ পর্যন্ত আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন, 'বাবা আমার ইংরাজী অঙ্ক শিখা হইল। আমি এক হইতে দশ পর্যন্ত শিখিয়াছি।' তখন পিতা পরীক্ষার জন্য ক্রমে নয় আট ও সাত জিজ্ঞাসা করায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক বলিলেন; তবুও ঠাকুরদাসের মনে সন্দেহ রহিল তিনি ভাবিলেন নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত, এটা না জানিয়া চালাকি করিয়াও একজন বলিতে পারে। সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য ঠাকুরদাস ছয়ের অঙ্ক না দেখাইয়া একেবারে পঞ্চমাংকে আসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার হিসাব মতো এটা কত হয়?' তখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন, 'বাবা, এটা

হবে ছয়ের অংক, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখিয়াছে।' ঠাকুরদাস আনন্দিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, 'তোমার ইংরাজী অংক শিক্ষা হইয়াছে সত্য। আমি ইচ্ছা করিয়া ছয়ের অংক গোপন করিয়াছিলাম।' বালকের এতাদৃশ মেধা ও বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পরম সন্তোষ সহকারে ছাত্রের চিবুক ধারণ পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বেশ বাবা বেশ।' তৎপরে তিনি ঠাকুরদাসকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বরের লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত করিবেন, যদি বাঁচিয়া থাকে, এ বালক মানুষ হইবে, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই।' বালক ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ও গুরুমহাশয়ের আনন্দ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুরদাস জগদ্দুর্লভবাবুর কতকগুলি ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষণকাল নিকটে বসিয়া সেই কাজ দেখিলেন। পরে অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত পিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'বাবা, আমিও ঐ সকল ঠিক দিতে পারি।' তখন জগদ্দুর্লভবাবু আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর তুমি কি ইংরাজী জান?' ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বদিনের মাইলস্টোনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমার ইংরাজী অংক শিক্ষা হইয়াছে, আমি ঠিকের কাজ বেশ করিতে পারি।' তখন ঠাকুরদাস ও জগদ্দুর্লভবাবু উভয়েই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কয়েকখানি বিল তাঁহাকে ঠিক দিতে দিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। তখন সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা পড়ার বিশেষ উপায় করিতে বলিলেন, তাঁহাদের কথার উত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, 'আমি ঈশ্বরকে হিন্দু কালেজে দিব ভাবিতেছি।' তখন কেহ কেহ বলিলেন, আপনার দশ টাকা আয়, এরূপ অবস্থায় কিরূপে হিন্দু কালেজে উহাকে পড়াইবেন?' তখন ঠাকুরদাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বললেন, 'ঈশ্বরের পড়ার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিব, আর অবশিষ্ট পাঁচ টাকা সংসার খরচেরজন্য বাড়ি পাঠাইব।'

ইচ্ছাসত্ত্বেও অর্থাভাবে ঠাকুরদাস নিজে লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই, এজন্য চিরকাল মনে মনে ক্লেশানুভব করিতেন। এমন অবস্থায় যে বহুক্লেশ সহ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে উপযুক্তরূপ লেখাপড়া শিখাতে তিনি কৃতসংকল্প হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ত্রুটি করেন নাই। সন ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া পিতার সহিত সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বেই ভাগবতচরণ সিংহ দেহত্যাগ করেন। সে সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। তাঁহার বয়স তখন পঁচিশ বৎসর মাত্র। তিনি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিতৃব্য শব্দে সম্ভাষণ করিতেন, তদনুসারে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দাদা ও ভগিনীদ্বয়কে বড় ও ছোটদিদি বলিয়া ডাকিতেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র জননী ও পিতামহীকে ছাড়িয়া আসিয়া যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কারণ বালক বিদেশে পরগৃহে যে ভয়াবহ অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ করিবে, তাহা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। কিন্তু তিনি বড়বাজারে এই সিংহ পরিবারে যে সমাদর ও যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীতে যেরূপ মধুরভাবে চিত্রিত হইয়াছে, আমরা পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিতেছি :

'এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া এক দিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ঠ স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রায়মণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন তাঁহার জন্য যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

স্ত্রীজাতির সম্মান করা এবং তাঁহাদের কল্যাণসাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকা মহাত্মাদের একটা বিশেষ লক্ষণ। ধর্মপ্রাণ যীশুখৃষ্ট পতিত স্ত্রীলোকদিগকে ভাল বাসিতেন এবং সঙ্গে থাকিতে দিতেন, এজন্য অনেকে তাঁহার সদ্বিবেচনার নিন্দা করিত, কিন্ত তাহাতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। সর্বদায় স্নেহসহকারে তাহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ধর্মবীর মহম্মদ মুসলমানের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার বহুল প্রচার নিবারণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া স্ত্রীজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা মনু তাঁহার

ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিয়া কুললক্ষ্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।'

স্ত্রীগণ যেখানে সমাদৃত, সম্মানিত ও পূজাপ্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারাও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এতাদৃশ, শাস্ত্রসম্মত পূজার যোগ্য, নারীজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাত্মা, রামমোহন রায় জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিতের একস্থানে লিখিত আছে: তিনি সেই বন্ধুবিহীন দেশ (তিব্বতদেশে) মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন। তদ্দেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্মবিরুদ্ধ কার্যের জন্য তাঁহার প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইত এবং তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তিনি কোমলহৃদয়া রমণীকুলের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন; তাহারাই তাঁহাকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। রাজা রামমোহন রায় চিরদিন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে, বন্ধুবান্ধব সন্নিধানে, স্বদেশ বা বিদেশে সর্বত্র তিনি নারীচরিত্রের মহত্ত্ব কীর্তন করিতেন। তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সদ্ব্যবহার তাঁহার তরুণহৃদয়ে এই নারীভক্তির বীজবপন করিয়া দেয়।······তিনি নিজে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।' (২) বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শৈশবে বিদেশে রাইমণির মাতৃস্নেহের আশ্রয়লাভ করিয়া বঙ্গললনাগণের চিরসুহৃদরূপে গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের পরবর্তী ঘটনাসকল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি নারীজাতির বিশেষ কল্যাণসাধনের জন্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়, উপার্জনের অধিকাংশ অর্থ, এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও শাস্ত্রালোচনার প্রায় সমগ্র ফল, অবলাকুলের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় সামাজিক ইতিহাসে এই অবলাবন্ধুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দেবীপ্রকৃতি রাইমণির কোমলতাময় মধুর বাৎসল্যই ঈশ্বরচন্দ্রকে নারীজাতির কল্যাণসাধনার্থ চিরদিনের জন্য ক্রয় করিয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পূর্বে আট টাকা পাইতেন, এক্ষণে দশ টাকা বেতনের কর্মে নিযুক্ত হইলেন। যে বাটীতে বাসা ছিল তাহারই নিকটে শিবচরণ মল্লিক নামক একজন ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক বাস করিতেন। তাঁহার সদর বাটীতে এক পাঠশালা ছিল। সেখানে পাড়ার ছেলেরা লেখাপড়া করিত। ঈশ্বরচন্দ্রকে

২ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনচরিত ২১ পৃষ্ঠা (২য় সংস্করণ)।

সেই পাঠশালায় দেওয়া হইল। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ—তিন মাস ঈশ্বরচন্দ্র সেই পাঠশালায় পড়াশুনা করিলেন। গুরুমশাই স্বরূপচন্দ্র দাসও শিক্ষাদান বিষয়ে বেশ নিপুণ লোক ছিলেন। বীরসিংহ ও তৎপরে কলকাতায় তিন মাস পাঠশালায় পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার পাঠ শেষ করিলেন। অতঃপর কোথায় কিরূপ লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, সকলে যখন সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমে ঐ পল্লীর চিকিৎসক দুর্গাদাস কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলিকাতায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ স্থির করিয়া ঠাকুরদাস বাটীতে সংবাদ দিলেন। পিতামহী ঠাকুরাণী ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া বালককে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। বাটী যাওয়াতে জলবায়ু ও স্থান পরিবর্তনে, জননী ও পিতামহীর সহবাসে এবং সমবয়স্কদিগের সঙ্গলাভে সপ্তাহকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। শচী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা নিজব্যয়ে বীরসিংহের উত্তরপ্রান্তে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। এই পুষ্করিণীর নাম 'শচীবামুনী।' এই 'শচীবামুনী'র তীরে গ্রাম্যবালকগণের খেলিবার স্থান ছিল। বাটিতে অবস্থানকালে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদাই সহচরদিগকে লইয়া সেই 'শচীবামুনী'র তীরে খেলা করিতে যাইতেন। তাঁহার গ্রাম্য সহচরদিগের মধ্যে দুই একজন বিশালদেহ ও বলশালী ছিলেন। গদাধর পালের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গদাধর নামে, দেহের আয়তনে, এবং শক্তি সামর্থ্যে নিজনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ক্রীড়াক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্রমণে গদাধর যখন ধরাশায়ী হইতেন, তখন সকল বালকই আনন্দে দিশাহারা হইয়া করতালি ও অট্টহাস্যে পুষ্করিণী ও প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিত। (৩)

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠমাসে পুত্রকে পুনরায় কলিকাতায় আনিলেন। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কতক্ষণ চলিয়া কান্ত হইলে, ঐ ভৃত্য বালককে স্কন্ধে লইয়া চলিত। এবার আসিবার সময় পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখ যদি চলিয়া যাইতে না পার, তাহা হইলে একজন লোক সঙ্গে নিতে হয়।' ঈশ্বরচন্দ্রের দুর্বুদ্ধি ঘটিল, তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, 'না লোক

---

৩ আমরা স্বচক্ষে 'শচীবামুনী' দেখিয়া আসিয়াছি এবং এই বিবরণ বীরসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

নিতে হইবে না, আমি চলিয়া যাইতে পারিব।' তাঁহারই কথাপ্রমাণ এবার আর লোক লওয়া হইল না। পিতাপুত্র কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জননীর মাতুলালয় পাতুল পর্যন্ত ছয় ক্রোশ পথ বালক ঈশ্বরচন্দ্র অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া আসিয়া সে দিন সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন।

প্রাতঃকালে পাতুল হইতে যাত্রা করিয়া তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে পেঁৗছিয়া সেদিন রাত্রি যাপন করিতে হইবে। অর্ধ পথে এক দোকানে ফলাহার করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, 'বাবা আমি আর চলিতে পারিব না। এই দেখুন, আমার পা ফুলিয়া গিয়াছে।' ঠাকুরদাস অনেক বুঝাইয়াও কোনো মতে বালককে আর এক পাও হাঁটাইতে পারিলেন না। কিছুদূর গেলে, তরমুজ কিনিয়া দিবেন বলিয়াও সম্মত করিতে পারিলেন না। শেষে বিরক্ত হইয়া অনেক তিরস্কার করিলেন। ভয় দেখাইবার মানসে কতদূর চলিয়া গেলেন। তবুও পুত্রকে এক পা চালাইতে পারিলেন না। আর কোনো উপায় না দেখিয়া শেষে আবার ফিরিয়া আসিয়া ক্রোধ-ভরে বলিলেন, 'যদি চলতে না পারবি, তবে লোক নিতে দিলি না কেন? লোক নিলে ত আর পথের মাঝখানে এই বিপদ হত না,' এই বলিয়া দুই একটি থাবড়াও দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন পিতা অগত্যা পুত্রকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঠাকুরদাস ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলেন; 'বাবা! এইবার খানিক দূর চল, ঐ সুমুখের দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিব।' কিন্তু তরমুজের প্রলোভনে পা ফুলা কমিল না। বরং পা'দুখানি ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম পাইয়া আরও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে চলৎ শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরদাস বলশালী লোক ছিলেন না। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনিও ভারবহনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে, একবার স্কন্ধে একবার ক্রোড়ে লইয়া এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিয়া অতিকষ্টে সন্ধ্যার পর গম্যস্থানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রসহ রামনগরে ভগিনীর গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বৈদ্যবাটী আসিয়া নৌকাযোগে কলিকাতা পেঁৗছিলেন।

এবার কলিকাতা আসিয়া ঠাকুরদাস পুত্রের লেখাপড়ার নতুন ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলেন; ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরাজী স্কুলে প্রবৃষ্ট করিয়া দিতে সকলেই একবাক্যে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের আন্তরিক ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। বংশের সকলেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনি নিজে সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাই ছেলেটিকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা। তিনি মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত

শিক্ষা করিয়া বাটীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের ও অন্যান্য নানাস্থানের বালকবৃন্দকে সংস্কৃত বিদ্যা দান করিবেন। এই জন্য স্বজনবর্গের কোনো পরামর্শই তাঁহার মনঃপূত হইল না। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃমাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতৃব্য-পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি (৪) কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারই উৎসাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন।

---

৪ সহোদর সম্ভুচন্দ্র-প্রণীত জীবনচরিতে অধ্যাপক গদাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বরচিত শিশুচরিতে কেবল বাচস্পতি মহাশয়ের নামেরই উল্লেখ আছে।

# চতুর্থ অধ্যায়
## বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর

১৮২৯ খৃস্টাব্দের ১লা জুন তারিখে, নয় বৎসর বয়সের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে প্রবৃষ্ট হইয়া ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার সংস্কৃত পাঠের সূচনা হয় নাই। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তাঁহার শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন। হালিশহরের অনতি দূরবর্তী কুমারহট্ট পল্লীনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার ছিল। তিনি বিশিষ্টরূপ আগ্রহসহকারে বালকগণকে শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ পারদর্শিতা ছিল। ছাত্রগণকে পুত্রবৎ স্নেহসহকারে শিক্ষা দান বিষয়ে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কলেজে প্রবৃষ্ট হওয়ার ছয় মাস পরে যে পরীক্ষা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। পূর্বোল্লিখিত মধুসূদন বাচস্পতিও সর্বদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। পিতা প্রতিদিন বেলা ৯টার সময়ে বড়বাজারের বাসা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গায় কালেজ বাটীতে পেঁছাইয়া দিতেন এবং বেলা চারিটার সময়ে নিজে আসিয়া বালককে বাসায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার উপর স্নেহসহকারে দৃষ্টি রাখিবার লোক ছিলেন এবং পিতা নিজে তাঁহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়সে মন্দ বালকদের সঙ্গলাভের সুযোগ পান নাই। অনেক কোমলমতি, সরলচিত্ত ও বুদ্ধিমান বালক অসৎ সঙ্গে পড়িয়া সর্বদাই বিনষ্ট হয়, এবং উত্তরকালে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া আপনার ও আত্মীয়গণের সর্বনাশ সাধন করে। বিশেষত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় ধর্মশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও পুত্রবৎসল পিতার অভাবে বর্তমান বঙ্গসন্তানগণ দুর্নীতি, দুরাচার ও কুশিক্ষার ঘৃণিত পথে বিচরণ করিয়া বঙ্গগৃহের ও বঙ্গদেশের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। ঠাকুরদাসের ন্যায় ক্ষমাশীল, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তানবৎসল পিতার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, আপাততঃ আমাদের সেইদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

ক্রমে ঠাকুরদাস যখন বুঝিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র একাকী পথে যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং একাকী গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, তখন তাঁহাকে একাকী যাইতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে

একাকী একটা ছাতা মাথায় দিয়া পড়িতে যাইতেন, তখন দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইত, যেন পথে একটি ছাতাই যাইতেছে, ছাতার মধ্যে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইত না। ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটি আবার এই ক্ষুদ্র দেহের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। সেই অল্পায়তন দেহের পক্ষে মস্তকটি একটি বৃহৎ ভার বলিয়া বোধ হইত ; এজন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য বালকেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে "যশুরে কৈ" বলিয়া তামাশা করিত, কখন কখন আবার উল্টাইয়া বলিত, "কসুরে জৈ" আর বালক ঈশ্বরচন্দ্র রাগিয়া যাইতেন। তিনি যতই রাগ করিতেন, বালকেরা ততই তাঁহাকে ঐরূপ ক্ষেপাইত। তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধির আর এক কারণ ছিল। তিনি রাগিলে আর কথা কহিতে পারিতেন না। কারণ বাল্যকালে তিনি তোৎলা ছিলেন। (১)

কালেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতে হইত। একটি কথা এদিক ওদিক হইলে আর নিস্তার থাকিত না। যাহা পড়িতেন অবিকল তাহা শুনাইতে হইত। ভ্রমবশতঃ একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে, ঠাকুরদাস অমনি ধরিতেন। ঠাকুরদাস এরূপভাবে বালকের পাঠ লইতেন যে তদ্দর্শনে, ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, পিতা ব্যাকরণে তর্কবাগীশ মহাশয়ের সমান পণ্ডিত। ফলতঃ পিতা, পুত্রের পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার বয়সের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কখন কখন তিনি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা রাত্রিতে কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতেন যে প্রদীপ জ্বলিতেছে আর তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তাহা হইলে আর তাঁহার অব্যাহতি থাকিত না। কোনো কোনো দিন এতই প্রহার করিতেন যে, সে গৃহের স্ত্রীলোকেরা, বিশেষকরে রাইমণি বালকের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিতেন এবং কোনো কোনো দিন প্রহারের অসহনীয় দৃশ্যে কাতর হইয়া ঠাকুরদাসকে বাসা পরিবর্তন করিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এরূপ প্রহারের ভয়ে, নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক সময়ে চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেন। এই উপায়ে রাত্রি জাগরণপূর্বক পড়াশুনা করিতেন, ইহার উপর ঠাকুরদাস শেষ রাত্রে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও উদ্ভট কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রকারে পিতার নিকট প্রায় দুই তিন শত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শিক্ষক তর্কবাগীশ

---

১ পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সূতিকা-গৃহে শিশুর জিহ্বার তলে আলতায় কিছু লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই লেখার জন্য বালক অনেক দিন পর্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিবে না।

মহাশয়ও বালকের আশ্চর্য মেধা দর্শনে, বিশেষ যত্নের সহিত বিবিধ বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেন। এবং তাহার অন্বয় ও অর্থ বলিয়া দিতেন। তিনি তিন বৎসরকাল এই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ করেন। এই দুই বৎসর পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন। একবার উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়াও আশানুরূপ পুরস্কার না পাইয়া একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। বিদ্যালয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হন। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, কেহ তাহা হইতে সহজে তাঁহাকে বিরত করিতে পারিত না। জেদের বশবর্তী হইয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া সার্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করা স্থির করেন। সহজে কেহই তাঁহাকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্নেহানুরোধে ও বাচস্পতির আত্মীয়তায় বাধ্য হইয়া সার্বভৌমের টোলে পড়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পিতার অভিপ্রায়মত কালেজেই পূর্ববৎ পড়িতে লাগিলেন। সেইবারকার পরীক্ষার ফল মন্দ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, সেইবার একজন সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ত্বরিত উচ্চারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত ধীরে ধীরে পরীক্ষা দান ও কথা পরস্পর হইতে পৃথকভাবে বিলম্বে উচ্চারিত হওয়ায় পরীক্ষক সাহেবের নিকট একটা বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং সম্ভবত সাহেব স্থানে স্থানে বুঝিতেও ভুল করিয়া থাকিবেন। এজন্য পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সেবার প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে মনঃক্ষুন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি বিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কোনো বালক শ্রমশীলতায়, দৃঢ়তায় বা বুদ্ধি প্রকাশে তাঁহাকে পরাজয় করে, ইহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না; যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক, ঈশ্বরচন্দ্রের জয়লাভের উত্তেজনা ও আয়োজন সেখানে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইত। এই বালক কি শৈশবে, কি পঠদ্দশায় কি উত্তরকালে কর্মক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোনো বিশেষ ঘটনাতে কোথাও কাহারও পশ্চাতে পড়িতে ঘৃণাবোধ করিতেন। চিরদিন সমভাবে আপনার স্বাতন্ত্র ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা সর্বত্রই তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কখনও কাহারও অনুগ্রহভাজন হইবার প্রবৃত্তি কেহ তাহাতে দেখে নাই। যে আত্মনির্ভরের গুণে তিনি সর্বত্র জয়ী হইয়াছেন, বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই তাঁহার সে গুণ সমধিক স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল।

সংসারেরের অন্য দশজনের অনুগ্রহভাজন না হইয়া, অন্যের সহায়তা লাভ না করিয়া, জীবনেব পথে অগ্রসর হওয়া অতীব কঠিন কাজ। বিশেষতঃ নিরন্ন দরিদ্র বালকের পক্ষে এরূপ আত্মনির্ভর আরও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

উত্তরকালে বহুবন্ধু পরিবেষ্টিত হইলেও, তিনি একাকী জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার মতো গরীব অতি অল্পই হয়। তাঁহার পিতা যেভাবে দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের পথে তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সামান্য আয়ে বহু পরিবারের ভরণপোষণ সংকুলান হইত না বলিয়া, বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক সময়ে উদরান্নের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। তাঁহার নিজের বর্ণিত দুঃখকাহিনী যে কত হৃদয়বিদারক, তাহা সহৃদয় লোক কেবল অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম। লেখনী সে দুঃখের বার্তা বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, কখনো অন্য জুটিত, কখনো জুটিত না; যখন জুটিত, তখনো সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জনের অভাবে কেবল নুন-ভাতে দিনপাত করিতেন; যখন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন, তখন মৎস্যের ঝোল রাঁধিয়া, একবেলা ভাত আর সেই ব্যঞ্জনের ঝোল খাইয়া, বৈকাল বেলার জন্য তরকারী ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন; বৈকালে সেই ব্যঞ্জনের তরকারীর দ্বারা অন্ন উদরস্থ করিয়া মাছগুলি পরদিনের জন্য রাখিয়া দিতেন, পরদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। (২) এইরূপ ক্লেশে পড়িয়া, দিবারাত্রি শ্রম করিয়া যে বালক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে প্রাণপণ যত্ন করে, বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে উত্তরকালে দয়ার প্রতিমূর্তি হইয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধ্য সাধনের প্রথমেই অংকুর বিদ্যালয়ে বাল্যসহচরদিগের পরিচর্যার মধ্যে অংকুরিত হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র, নিজে সর্বদা উদরপূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন, সময়ে সময়ে তাহারও কিছু-কিছু অন্য সহাধ্যায়ীদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। কাহারও পীড়া হইয়াছে, শুনিবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বাড়ির চরকা-কাটা সূতায় প্রস্তুত মোটা চটের মতো কাপড় পরিয়া নিজের অর্থে অন্য দরিদ্র বালকদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন। বালকের কথা দূরে থাকুক, পরিণত বয়সের সুপ্রবীণ ব্যক্তির পক্ষেও স্বার্থত্যাগের এরূপ আশ্চর্য দৃষ্টান্ত লোকসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপে তিনি সেই বাল্যকালেই, নিজের দুরবস্থা বিস্মৃত হইয়া অন্যের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। একদিকে অনাহার ও অনিদ্রা-জনিত দুঃখ-কষ্ট, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, অন্যদিকে ইহার উপর গৃহের পাকাদি কার্যের ভার তাঁহারই উপর ছিল; আবার তাহার উপর অপর দশ জনের সংবাদ লইয়া ও সেবা করিয়া বিদ্যালয়ে

---

২ এই অবস্থাবর্ণন আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ মুখে শুনিয়াছি।

সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিরূপ বালকের পক্ষে সম্ভব, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। সমগ্র সভ্য জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও, এরূপ দরিদ্র বালকের এ প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধার ভিতরে, এরূপ পরসেবা ও স্বার্থত্যাগের ভিতর, আত্মোন্নতি সাধনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একান্ত বিরল—অতি দুর্লভ বলিলেও বোধ হয়,অত্যুক্তি হইবে না।

আপামর সাধারণ লোকের পক্ষে যেটা প্রধান দোষ, প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাবান্ লোকের পক্ষে তাহাই প্রধান গুণে পরিণত হয়। অন্য লোক নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, নিজের জেদের বশবর্তী হইলে, অপর দশজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে, নিন্দাভাজন হয়, কিন্তু সংসারে কখন কখন দেখা যায় যে, দশ জনের বা শত জনের বিদ্যা ও সূক্ষ্মদর্শন একত্র করিলেও প্রতিভাশালী মহাত্মাদের কণামাত্রও হয় না। কাজেই তাঁহারা নিজের উপর অধিক নির্ভর করিতে শিখিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের ঐরূপ আত্মনির্ভরের ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয়ে তিনি সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র হইবেন, সর্বদা এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। সর্বোৎকৃষ্ট বালক হইতে যত প্রকার ক্লেশ ভোগ করার প্রয়োজন, তাহাতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সে বিষয়ে কাহারও বাধা মানিতেন না। অনেক সময়ে অর্ধ রজনী, কোনো কোনো সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করিতেন; এরূপ পরিশ্রমে অনেক সময়ে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় অনেক দিন ধরিয়া শয্যাগত থাকিতেন। কিন্তু তথাপি আত্মোন্নতি সাধনে কখনও এক মুহূর্তের জন্য বিরত ছিলেন না। উত্তরকালে যখন তিনি সম্মান ও সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তিনি জনসমাজের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য-কলাপের সহিত বড় সংস্রব রাখিতেন না, তখনও দেখা গিয়াছে, একাহারে, অনাহারে বা রুগ্ন শরীরে সর্বদা শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। কোনো নতুন বিষয় জানিবার জন্য, কোনো নতুন তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য, কোনো নতুন পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য, সর্বদা মুক্তভাবে অপেক্ষা করিতেন। কেহ কোনো বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে, ইহা তিনি কোনোক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এই দুর্দমনীয় আত্মোন্নতির স্পৃহা ও আত্মাদরের ভাব বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অর্জন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শনলাভাকাঙ্ক্ষায় বহুবার তাঁহার গৃহে গিয়াছি। কিন্তু কখনও তাঁহাকে চেয়ারে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিতে দেখি নাই। সুস্থতায় কি পীড়ায়, আহারে কি অনাহারে, সকল সময়েই তিনি সোজা হইয়া বসিতেন, তাঁহার উপবেশনে ক্লান্তিবোধকচিহ্ন কখন দেখিতে পাই নাই। তাঁহার

লোকান্তর গমনের পূর্বদিনেও তিনি আপনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্যগুলি নিজে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে আত্মনির্ভরের ভাব উত্তরকালে তাঁহাকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করাইয়াছে, বাল্যকালে তাহা বালস্বভাবসুলভ চপলতার অধীন হইয়া তাঁহার বহুবিধ ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছে। সে সম্বন্ধে অনেকগুলি আমোদজনক আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে দিন ঈশ্বরচন্দ্রের স্নান করিবার দিন, ঠাকুরদাস বলিতেন, 'ঈশ্বর, আজ তোমার স্নান করা হইবে না।' ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিতেন, 'না বাবা, আজই স্নান করিতে হইবে, আজই স্নান করিব।' আর দুই একবার বাধা দিতে না দিতে ঈশ্বরচন্দ্র স্নানে অগ্রসর হইতেন। ঠাকুরদাসেরও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। কখন কখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য করিতে জেদ ধরিতেন। স্নান, পরিধেয় ও আহার প্রভৃতি নিজের নিত্যকর্মেই প্রায় এইরূপ ঘটিত। এক এক দিন পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিজের ইচ্ছাসত্ত্বেও তদ্বিপরীতাচরণ করিতেন। কোনো কোনো দিন তেল মাখিয়াছেন, এমন সময় যদি বুঝিলেন যে, না বুঝিয়া পিতরে অভিপ্রায়ে রায় দিয়া ফেলিয়াছেন, তখনই বেঁকিয়া বসিতেন। তখন ঠাকুরদাস তাঁহাকে ধরিয়া গঙ্গার ঘাটে নামাইয়া দিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র জলে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, প্রাণান্তেও ডুব দিতেন না, শেষে অনেক প্রহারের পর অনেক কষ্টে তাঁহাকে বলপূর্বক স্নান করাইতে হইত। (৩) যে দিন একখানি ময়লা কাপড় পরিতে হইবে, ঠাকুরদাস বলিতেন ঈশ্বর, আজ একখানি খুব পরিষ্কার কাপড় পরিয়া যাও; ঈশ্বরচন্দ্র অমনি মনে মনে স্থির করিতেন সে দিন ঐ ময়লা কাপড়খানা পরিয়া যাইবেন, কার্যেও ঠিক তাহাই করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, প্রত্যেক বিষয়ে আপনার ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন; কখন কোনো বিষয়ে কাহারও অধীন হইয়া চলিতেন না। তাঁহার জীবনচরিতে প্রত্যেক ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশবর্ষ মাত্র। সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশকালে তাঁহার উপনয়ন সংস্কারকার্য সম্পন্ন হয়। তিনি যখন সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবৃষ্ট হইলেন, তখন সেই শ্রেণীর শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বালকের বয়সের অল্পতাহেতু তাঁহাকে লইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, এত অল্প বয়সের ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য বুঝিতে পারিবে

৩ এই সকল ঘটনা উপলক্ষে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, তখন বলিতেন, 'বাবা কি সাধে তোকে "এঁড়ে বাছুর" বলিয়াছিলেন?'

না। ঈশ্বরচন্দ্র ভয়ানক অভিমানী ছিলেন। এইকথা শুনিবামাত্র বলিলেন, 'সাহিত্য বিষয়েই আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।' তদনুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভট্টির কয়েকটি কঠিন কবিতার অর্থ করিতে বলিলেন। তিনি সে সকল কবিতায় যেরূপ অর্থ ও অন্বয় করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অপেক্ষা বয়োঃজ্যেষ্ঠ সকলের কেহই সেরূপ সুব্যাখ্যা ও পাঠের সেরূপ অন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া বালককে সাহিত্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিলেন এবং চিরদিন পুত্রবাৎসল্যের সহিত শিক্ষাদান করিতেন। এই শ্রেণীতে পরলোকগত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ছাত্রেরাই তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রথম বর্ষে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া শেষ পরীক্ষায় সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে তাঁহার পরীক্ষার ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

সেকালে এখনকার মতো রবিবারে সংস্কৃত কালেজ বন্ধ হইত না; প্রতিপদ ও অষ্টমীতে সংস্কৃতচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য প্রতিপদ ও অষ্টমীতে কালেজ বন্ধ থাকিত। দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নূতন পাঠ বন্ধ থাকিত, এ কারণ ঐ কয়েকদিবস সংস্কৃত রচনা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল; কোনো কোনো দিন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই সর্বপ্রকার অনুশীলনেই সকল বালক অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইতেন বলিয়া শিক্ষক তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সর্বদা তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার রচনা ও অনুবাদে বর্ণশুদ্ধি কিংবা ব্যাকরণ ভুল হইত না, তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল এবং যাহা কিছু পাঠ করিতেন, তাহা সম্যক্ স্মরণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া, কখনও তাঁহাকে কোনো বিষয়ে পরাস্ত হইতে হইত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের অধিকাংশ ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিতে পারিতেন। আমরা অনেক সময়ে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার বর্ণিত বিষয় হইতে অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

তিনি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং নানাবিষয়ক সংস্কৃত পদাবলী সংগ্রহ ও স্মরণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া অনর্গল

সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষায় লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন। সে সময়কার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে বলিতেন, 'ঈশ্বর শ্রুতিধর, এ বালক দীর্ঘজীবী হইলে, অদ্বিতীয় লোক হইবে।'

এই সময় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুকে সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার মানসে কলিকাতায় আনিলেন। কলিকাতার বাসায় ক্রমে পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গৃহকার্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা রন্ধনকার্য সমাপন করিতে হইত। বাসায় দাস-দাসী ছিল না; প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় কাশীনাথবাবুর বাজারে গিয়া মৎস্য ও তরকারী ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় আসিতেন। বাসায় আসিয়া ব্যঞ্জনের ঝাল মসলা নিজেই বাটিতেন, তরকারী ও মাছ নিজেই কুটিতেন; পাকের কার্য নিজে একাকীই সম্পন্ন করিতেন। চারি-পাঁচ জনের আহারের আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, সে সকল ভোজন পাত্র ধৌত করিতেন, আহারের স্থান পরিষ্কার করিতেন। তৎপরে কালেজে যাইতেন। এ সকলের উপর ঠাকুরদাসের নিয়ম ছিল যে, একটি ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিবে না, ভোজন পাত্র ধুইয়া মুছিয়া যাইতে হইত। সে বিষয়ে কখনও ত্রুটি হইলে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইত। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উত্তরকালে নির্ভয়ে ও শান্তচিত্তে সকল বিপদভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে বিপদে বা রোগে অসহিষ্ণু হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

বাল্যকালে এই সকল রীতিনীতির অধীন হইয়া চলিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, পরিণত বয়সেও তিনি কখনও একটি ভাত ফেলিতেন না, কাহাকেও ফেলিতে দিতেন না। কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্যের আয়োজন করিতেন, নিজে নিকটে বসিয়া নিমন্ত্রিতগণকে আহার করাইতেন, কেহ কিছু ফেলিয়া রাখিলে, তাঁহার পিতৃদেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'একটি ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিলে আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতেন, আর তুমি এত জিনিস নষ্ট করিবে? তা কখন হবে না, ওগুলি সমস্ত খাইতে হইবে!'

ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে তাঁহার পিতা কালেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় শ্রমশীল ছিলেন না। অনেক সময় অলসভাবে কাল কাটাইতেন, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বালক ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহাই তাঁহার স্মরণ থাকিত। ঠাকুরদাস রাত্রি

নয়টার পর কর্মসংস্থান হইতে বাসায় আসিতেন, বাসায় আসিয়া দুইটি ভাইকে লেখাপড়া করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আর যদি দেখিতেন যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর দুই ভাই ঘুমাইতেছে, তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিত না। পিতার প্রহারে বালকদ্বয়ের ক্রন্দনে কাতর হইয়া সিংহ মহাশয়ের পরিবারেরা দৌড়িয়া আসিতেন এবং ঠাকুরদাসক অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া অন্যত্র বাসা করিতে বলিতেন, তাহারা বলিতেন 'ছোট ছোট ছেলে এত মার খাইয়া মরিয়া যাইবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মহত্যা করিয়া আমাদিগকে পাতকগ্রস্ত করিবেন না।' এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র সান্ধ্যাদি নিত্যকর্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার ক্রমগুলি এরূপভাবে দেখাইতেন যেন সন্ধ্যা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সন্ধ্যা স্মরণ ছিল না এবং সন্ধ্যা করিতেন না। সন্দেহ প্রযুক্ত খুল্লতাত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে সমস্ত সন্ধ্যার আবৃতি করিতে বলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মহা সংকটে পড়িলেন। ধরা পড়িয়া পিতার নিকট অত্যন্ত নিপীড়িত হইলেন এবং সেইদিন আহারের পূর্বে সন্ধ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এমন আশ্চর্য শক্তিশালী বালক যে ক্ষণকালের মধ্যে সমগ্র সন্ধ্যার আদ্যোপান্ত নির্ভুল আবৃত্তি করিয়া আহার করিলেন।

অনেক দিন হইতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে এই বাসনা ছিল যে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র কালেজের শিক্ষা সমাপন করিয়া বীরসিংহে গিয়া টোল করিবেন, আর গ্রামের অন্যান্য স্থানের নিরাশ্রয় বালকবৃন্দ সমবেত হইয়া সেই টোলে অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া ঠাকুরদাস পুত্রকে বলেন, কালেজে তুমি যে বৃত্তি পাইতেছ, তাহার দ্বারা দেশে কিছু জমি ক্রয় কর, তাহার আয় দ্বারা বিদেশীয় বালকগণের ভরণপোষণের ব্যয় সংকুলান হইবে। তদনুসারে ঈশ্বরচন্দ্রের বৃত্তির টাকা দিয়া কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছিল। কিছুকাল জমি জমা ক্রয় করিবার পর পিতা পুত্রকে বলেন, অতঃপর বৃত্তির টাকায় কিছু উৎকৃষ্টগ্রন্থ ক্রয় কর। তদনুসারে পিতারআদেশমতো অনেক গুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করা হইয়াছিল। অদ্যাপি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিতে সে পুঁথিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে, গ্রামে অনাথ বালকদিগের জন্য টোল করিতে হইবে, পিতা পুত্র উভয়েরই সেরূপ বাসনা ছিল এবং তাঁহারা পূর্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ইতিমধ্যেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অবসরক্রমে যখন বীরসিংহে গমন করিতেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কাহারও কোনো প্রকার নিমন্ত্রণের শ্লোক রচনার প্রয়োজন হইলে, তিনি তাহা রচনা করিয়া দিতেন। একবার এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কৃতী ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা শ্লোক রচনা করাইয়া লন। সমাগত পণ্ডিত-মণ্ডলী সেই শ্লোকের রচনাপারিপাট্য, শব্দবিন্যাস এবং পদলালিত্য দর্শনে

চমৎকৃত হইয়া কবিতাকারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন কর্মকর্তা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতে গিয়া দেখিলেন, বালক অনর্গল সংস্কৃতে কথা কহিতে ও বিচার করিতে পারেন, তখন সভাস্থ সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া নীরব হইলেন। সেই সময় হইতে বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রচার হইল যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। অল্পকাল পরে এদেশে আর কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। সে সময়ে এই শিক্ষানবিশী বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসাবার্তা নানাদিকে প্রচারিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষায় অবাধে কথা কইতে ও যে কোন প্রকার আলোচ্য বিষয়ের বিচার করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে প্রবীণ ও সুবিদ্বান পণ্ডিতগণের পক্ষেও সংস্কৃত ভাষায় সে প্রকার বিচার করা সম্ভবপর ছিল না, তাই সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ ও নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচারিত হওয়ায় নানা স্থান হইতে ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া লোক আসিতে লাগিলেন। অনেক স্থান হইতে প্রস্তাব আসিল বটে, কিন্তু শেষে ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের স্থির হয়। ক্ষীরপাই গণ্ডগ্রাম। সে কালে কলের কাপড়ের এত আমদানী ছিল না। ক্ষীরপাইতে ঐ অঞ্চলের বস্ত্রব্যবসায়িগণের বস্ত্র বিক্রয়ের গঞ্জ ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী মহাজনেরাও ক্ষীরপাই আসিয়া বস্ত্র ক্রয় করিত, অন্য নানা স্থানের নানা দ্রব্য ক্ষীরপাইয়ের গঞ্জে সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকিত। এরূপ সম্পন্ন গ্রামের মধ্যে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ধনে মানে অনেকের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার কন্যা দীনময়ী রূপগুণসম্পন্না ছিলেন। এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার দেহে সর্বপ্রকার সুলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার ধন নাই, তোমার পুত্র বিদ্বান হইয়াছেন, কেবল এই কারণে আমার প্রাণসমা তনয়া দীনময়ীকে তোমার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম।' ঈশ্বরচন্দ্রের সে সময় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। যাবজ্জীবন লেখাপড়া শিখিবেন, দেশের লোকের হিতসাধন করিবেন, বিপন্নের দুঃখ দূর ও রোগীর সেবা করিবেন, এইরূপ বিবিধ কল্যাণকর শুভচিন্তা সে সময়ে তাঁহার অন্তরকে আন্দোলিত করিত; কিন্তু পাছে পিতা মনঃক্ষুন্ন হন, এই ভয়ে সেই অল্প বয়সে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেন। যখন তাঁহার বয়ক্রম কেবল চতুর্দশ বর্ষ মাত্র, তখন পিতৃআজ্ঞায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের অষ্টমবর্ষীয়া, সুলক্ষণা ও সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার—এই তিন বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয় সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিত। অলঙ্কার শ্রেণীতেও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কাজের বেলা সকলের অপেক্ষা ওজনে ভারী হইতেন। এই জন্য শিক্ষক, দর্শক ও অন্যান্য সকলে তাঁহার বালকত্ব ও প্রবীণত্বের মিলন দেখিয়া তাঁহাকে অদ্ভুতকর্মা বালক মনে করিয়া অবাক হইতেন। তিনি এক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময় পরীক্ষার জন্য অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত; সঙ্গে সঙ্গে আবার বাসার সর্বপ্রকার কার্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায়, তিনি পরীক্ষার পরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অনবরত রক্তভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবনেও পীড়ার কিছুই হ্রাস হইল না। অগত্যা কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া বীরসিংহে গেলেন। সেখানেও প্রথমে নানা প্রকার ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। শেষে একজন ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ওল ঘোলের সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন খাওয়াইয়া সেই কঠিন পীড়া হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন। সেই দারুণ পীড়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে না পাইতেই তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্বের ন্যায় শ্রমকর কার্যগুলির ভার নিজেই লইলেন। এই সময়ে এক দিন সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময়ে বাজারে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু রাত্রি একাদশ ঘটিকা অতীত হইতে যায়, তখনও দীনবন্ধু ফিরিল না দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত ভয় ও ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অন্যান্য সকলের পরামর্শ মতো কাশীনাথবাবুর বাজারে গিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেখানে কোনো সন্ধান না পাইয়া তাঁহার আশঙ্কা আরও দৃঢ়মূল হইল। তিনি অতি ব্যাকুলভাবে বড়বাজার হইতে নূতন বাজারে দীনবন্ধুর সন্ধানে গেলেন। সেখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, এক দেওয়ালে ঠেস দিয়া বালক নিদ্রা যাইতেছে। তখন ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে বাসায় লইয়া গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভাই-ভগিনীগুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্বদা তাঁহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই প্রতিমাপূজার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আস্থাবান হিন্দুগণ যেরূপ ভক্তিসহকারে দেবপূজা করিতেন, তিনি সেইরূপ ভক্তিসহকারে নিজ জনকজননীর পূজা করিতেন। তিনি বলিতেন, সংসারে পিতামাতা জীবন্ত দেবতা। পিতৃ-মাতৃ-পূজা ত্যাগ করিয়া বা পিতা-মাতার প্রীতি—তাঁহাদের

নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের প্রতি উদাসীন হইয়া দেব পূজায় ধর্ম হয় না। যাঁহাদের দুঃখ কষ্টে আমরা লালিত পালিত, যাঁহাদের স্নেহ মমতায় আমরা সুরক্ষিত, সেই পিতামাতাই পরম দেবতা-স্থানীয়। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার পূজায় ধর্ম হয় না। বস্তুতঃ আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো, পিতৃমাতৃভক্ত লোক সচরাচর দেখিতে পাই না। তিনি যখন কোনো প্রকার কার্যোপলক্ষে বীরসিংহে গমন করিতেন, সর্বাগ্রে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় গুরু-মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিতে যাইতেন। গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ লোকবিরল অনুরাগপূর্ণ ভক্তি দর্শনে স্নেহবিগলিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেন। দেশের কি ইতর, কি ভদ্র সকল লোকেই তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার ও করুণ-রস-পূর্ণ মিস্ট-কথায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিত। বাটী অবস্থানকালে তিনি ছোট ছোট বালকগণকে লইয়া কপাটি খেলিতেন, সমবয়স্কদিগকে লইয়া লাঠি খেলিতেন ও কুস্তি করিতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সম্মান করিয়া চলিতেন। এরূপ সুপ্রকৃতি-সম্পন্ন যুবককে যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্নেহ-নয়নে দেখিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্র তাস, পাশা প্রভৃতি অলস ক্রীড়া ও আমোদের পক্ষপাতী ছিলেন না। চঞ্চল বালকের প্রকৃতি, উদ্যমশীল যুবকের স্বভাব এবং কর্তব্যপরায়ণ তেজস্বী পুরুষের লক্ষণ পর্যায়ক্রমে তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছে। তিনি সর্বদা সেইরূপ প্রকৃতির অনুগত হইয়া চলিতেই প্রয়াস পাইতেন ও ভালবাসিতেন।

ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার অনতিদূরে পূর্বদিকে এক বাসায় সংস্কৃত কালেজের কয়েকজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাস করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এইজন্য প্রায় প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর তিনি ঐ বাসায় উক্ত ছাত্রগণের নিকট বেড়াইতে যাইতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া সাহিত্যদর্পণ দেখিতেন। এক দিবস সুপ্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'ল' কমিটির পরীক্ষা দিয়া জজ পণ্ডিতের কর্ম লইবার মানসে তারকনাথ তর্কবাচস্পতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্য-দর্পণ আবৃত্তি করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত অল্পবয়স্ক বালক সাহিত্য দর্পণের কি বুঝিবে ?' তর্কবাচস্পতি মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, 'বালক কিরূপ শিখিয়াছে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না।' তর্কপঞ্চানন মহাশয় বালকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, বালক এক অসাধারণ পণ্ডিত! আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বিদ্যাবিষয়ে, জ্ঞানের বিস্তৃতিতে সুপ্রবীণ বটবৃক্ষের ন্যায় বহুদূর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি প্রীতিপূর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন, 'এ বালক কালে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন লোক আমার দৃষ্টি-

গোচর হয় নাই।' ইহা শুনিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, 'আমরা এই বালককে কালেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করি।' জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তদবধি সর্বদা সর্বত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ গুণপনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

এই সময়ের নিয়মানুসারে বালকগণকে অগ্রে অলংকার, ন্যায় ও বেদান্ত এবং তৎপরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, ছাত্রেরা জজ পণ্ডিতের পদপ্রাপ্ত হইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তৎপরিবর্তে অলংকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে করিতে কালেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বিদ্যালয়ের সকল পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা 'ল' কমিটির পরীক্ষা দিবার জন্য স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতেন এবং সকল বালককেই দুই-তিন বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম সহকারে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হইত। তৎপরে পরীক্ষা দিয়া কেহ বা উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা বিফলমনোরথ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেন, কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র অনন্য-কর্মা হইয়া, দিবারাত্রি শ্রম করিয়া, ছয় মাসের মধ্যে সেই সুকঠিন ও দুর্বোধ্য গ্রন্থ সকল আয়ত্ত করিয়া কমিটির পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক দিকে নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যদিকে বঙ্গীয় বালকগণের সমক্ষে শ্রমশীলতা, একাগ্রতা ও বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ প্রদর্শনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

কিশোরবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু বালক ঈশ্বরচন্দ্র 'ল' কমিটির পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই একবারে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইল। এ ঘটনা এতই বিস্ময়কর হইয়াছিল যে, সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যখন ঈশ্বরচন্দ্র উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপ্রদ সার্টিফিকেট পাইলেন, তখন সকলের সংশয় দূর হইল, তাঁহার 'ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অল্প দিন পরে ত্রিপুরার জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। সপ্তদশবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পদ প্রাপ্তির মানসে আবেদন করেন, তদুত্তরে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার নিয়োগ পত্র আসিল। কিন্তু পিতার অসম্মতি নিবন্ধন তিনি উক্ত কর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অন্যান্য পরীক্ষা শেষ করিয়া ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ও বালক ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের সন্দেহ হইত বা পাঠের যে সকল স্থল অসংলগ্ন বোধ হইত, সে সকল বিষয়ে শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেন অনেক সময়ে এরূপ

আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া বাচস্পতি মহাশয় বালকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন, 'তুমি ঈশ্বর'।

এই সময়ে নিয়মানুসারে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনা করিতে হইত। সর্বোৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার প্রত্যেক বিষয়ে একশত টাকা পুরস্কার ছিল। যে বিষয়ে যাঁহার রচনা সর্বাপেক্ষা উত্তম হইত, তিনি উক্ত পুরস্কার পাইতেন। উভয় পরীক্ষা এক দিনে হইত। দশটা হইতে একটা পর্যন্ত গদ্য রচনার এবং একটা হইতে চারিটা পর্যন্ত কবিতা রচনার সময় নির্ধারিত ছিল। পরীক্ষার্থী বালকেরা সমাগত হইয়াছে, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, এমন সময় অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে অন্যত্র অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে তথায় বলপূর্বক বসাইয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র রচনা বিষয়ে নিজের অনুপযুক্ততার কথা উল্লেখ করিয়া অব্যাহতি পাইবার জন্য বার বার মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, 'যা পার লিখ. নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব রাগ করিবেন।' ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন'—'কি লিখিব?' শিক্ষক বলিলেন, 'সত্যংহি নাম আরম্ভ করিয়া লিখ' সেবার 'সত্য কথনের মহিমা' গদ্য রচনার বিষয় নির্দিষ্ট ছিল। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশ-মতো ঈশ্বরচন্দ্র রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলাবাহুল্য পরীক্ষকগণের বিবেচনায় তাঁহার প্রবন্ধই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর পদ্য রচনা বিষয়েও তাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হওয়াতে তিনি আর একটি পুরস্কারও প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি ইহার পর বেদান্তের পরীক্ষা দিয়া ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রেণীতে এক বৎসর কাল অধ্যয়নের পর পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে একশত টাকা পুরস্কার পাইলেন এবং সেবারের কবিতা রচনায় তাঁহার পরীক্ষাদানও অপর সকলের অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হওয়াতে আর একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুরবিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঠাকুরদাস ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধন কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বীরসিংহের বাটীতে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া কোনো ফল দর্শিত না। তখন কলিকাতায় অল্প ব্যয়ে বাসাখরচ চালাইতে লাগিলেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থে ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পরীক্ষায় ফল ভাল হওয়াতে যে দুই শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন. তদ্দ্বারা ঋণ পরিশোধের পক্ষে আনুকূল্য হইয়াছিল।

উক্ত সময়ে কলিকাতার বাসায় সকলেই আহারাদি বিষয়ে যৎপরোনাস্তি

ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুগ্ধ, মৎস্য ও উৎকৃষ্ট তরকারী প্রভৃতি কিছু কালের জন্য সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। বৈকালে জলখাবারের জন্য আধ পয়সার ছোলা ভিজান থাকিত, আধ পয়সার বাতাসা আনিয়া সকলে মিলিয়া ঐ ছোলা আর বাতাসায় বৈকালের জলযোগের কার্য সমাধা করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ছোলার কিয়দংশ রাত্রিতে কুমড়ার তরকারীতে দেওয়া হইত। দুইবেলা কুমড়ার তরকারী আর ভাতে উদরপূর্ণ করিয়া, বাসায় পাচক ও দাসদাসীর সমস্ত কাজ একাকী সমাপন করিয়া বিদ্যালয়ের সমগ্র পাঠ সুন্দর রূপে প্রস্তুত করাতেই যে কেবল তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও আগ্রহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিবা-রাত্রি এইরূপ ক্লেশকর শারীরিক পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদা প্রসন্ন মনে কালাতিপাত করিতেন, কেহ কখন তাঁহাকে এই সকল বহুশ্রমের কার্য সম্পাদনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতে কিংবা এ সকল কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে শুনেন নাই। সর্বদা প্রসন্নতার পরিচায়ক হাস্যপূর্ণ মুখে সকলের সহিত কথা কহিতেন। তিনি যে এরূপ দুঃসহ দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে,সেবার পূজার সময় যখন বাটী গিয়াছিলেন তখন অন্যান্য বারের ন্যায় নিজের ছোট ছোট সহোদর ও পাড়ার বালকবৃন্দকে লইয়া পূর্ববৎ খেলা করিতে লাগিলেন। গ্রামের অন্নক্লিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রতিবেশিগণের মধ্যে যাহারা বস্ত্রাভাবে জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ করিতেছিল, তাহাদিগের কাহাকেও দেখিবামাত্র, গামোছা পরিধানপূর্বক নিজের পরিধেয় দান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, নিজের দুঃখ কষ্টের চিন্তায় কিংবা ঘোরতর অভাবের অবস্থায় তাঁহার চিত্তবিপর্যয় ঘটিত না। প্রসন্ন মনে সর্ববিধ ক্লেশই সহ্য করিতে পারিতেন। এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা এই স্থানেই উল্লেখযোগ্য এবং তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্রের মনের দৃঢ়তা ও নির্বিকার ভাবের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যে সময়ের কথা, বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতায় এক্ষণ-কারমতো মিউনিসিপ্যালিটীর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। তখন শহরের চারিদিকই দুর্গন্ধপূর্ণ ছিল। পুষ্করিণী ও ডোবা সকল পচা ময়লা জলে পূর্ণ থাকিত, ইহাদের এক একটাকে এক একটা নরককুণ্ড বলিলেই ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের অনাবৃত জল-প্রণালীগুলি দিবারাত্রি নরককুণ্ডের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। শতকরা নিরানব্বইখানি গৃহস্থের বাটীতে মলমূত্র ও কৃমিপূর্ণ পূতিগন্ধময় এক একটা নরককুণ্ড প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকার কলিকাতা আর এখনকার কলিকাতা কত প্রভেদ, যাঁহারা সে দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহারা বহুবর্ণনায়ও তাহার বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিবেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা যে গৃহে থাকিতেন, সে গৃহেও এইরূপ নরককুণ্ডের অভাব ছিল না। পায়খানা, পাতকুয়া ও তন্নিকটবর্তী স্থানগুলিই এইরূপ অবস্থাপন্ন থাকিত। যে ক্ষুদ্র গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা পাক করিতেন, সেই ক্ষুদ্র কুটীর এইরূপ নরককুণ্ডের অতি সন্নিকটে সংস্থাপিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন কৃমি সকল দলেদলে তাঁহার ভোজন-পাত্র আক্রমণ করিতে আসিত। তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র আহারের সময়ে প্রতিদিনই এক ঘটি জল লইয়া বসিতেন। সেই সকল কৃমি নিকটস্থ হইলেই ঘটী হইতে জল ঢালিয়া দিতেন, আর তাহারা সেই প্রক্ষিপ্ত জলস্রোতের সহিত দূরে পড়িত। দুর্গন্ধের ত কথাই ছিল না। যে ন্যক্কার-জনক গরলকণা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে লোক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, ঈশ্বরচন্দ্র সেই পরিমল-পয়োধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে ভোজন-পাত্র শূন্য করিতেন। এইরূপ বিবিধ শত্রু-সমাকুল স্থানে নেপোলিয়নের ন্যায় নিশ্চিন্ত-চিত্তে উপবেশন পূর্বক রন্ধনাদি কার্য সমাপন করিয়া, অপর সকলকেআহার করাইয়া, পরিশেষে নিজের জঠরানল নির্বাণ করিতেন। এই সংস্রবে আর একটি বিশেষ ঘটনা এই স্থানেই উল্লেখযোগ্য, সেটি এই যে, এই পাকশালা-গৃহ এমন স্থানে স্থাপিত ছিল যে, মধ্যাহ্ন সূর্যের একটি কিরণও কোন দিন ভ্রমক্রমেও গৃহের সে অঞ্চলে উঁকি মারিত না। সুতরাং ঘন অন্ধকার নীরবে নির্বিবাদে তথায়রাজত্ব করিত। অনেক সময় দিনের বেলায় তথায় প্রদীপ জ্বালিয়া পাককার্য সমাপন করিতে হইত। এজন্য সে কুটীরে আরসলাকুল পরম সুখে বাস করিত। কেবল বাস করিত তাহা নহে, সময়ে সময়ে বড় দৌরাত্ম্যও করিত। সুযোগমতো যাহা কিছু পাইত তাহাই ভক্ষণ করিত। কখন কখন অন্ন ব্যঞ্জনে পড়িত। এজন্য সর্বদাই তাঁহাকে খুব সাবধানে রন্ধন ও ভোজন-কার্য সমাপন করিতে হইত। একদিবস একটু অসাবধান হওয়াতে ভোজনের সময়ে তরকারীর মধ্যে একটা আরসোলা দেখিতে পাইলেন। তখন সে কথা প্রকাশ করিলে কিংবা ভোজনপাত্রের নিকট সে পোকা ফেলিয়া রাখিলে, পাছে ঘৃণা-প্রযুক্ত অপর সকলের আহারের ব্যাঘাত জন্মায়, এই ভয়ে নিরুপায় হইয়া ব্যঞ্জন সহ সেই আরসলাটিকে মুখ-গহবরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত তাহাকে উদরস্থ করিয়া উপস্থিত হইতে আপনাকে ও অপর সকলকে রক্ষা করিলেন। সকলের ভোজনের পর যখন আরসলা খাওয়ার ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, তখন সকলে তাঁহার এইরূপ বিস্ময়কর আচরণে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আমরাও তাঁহার সে সময়ের উপস্থিত বুদ্ধি ও কার্যের দৃঢ়তা স্মরণ করিয়া অবাক হইতেছি। তিনি অতি অল্প বয়সে এতদূর আত্মশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে যাহা ধরিয়াছেন তাহাই সম্পন্ন করিতে—তাহাতেই কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কি এক আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার তাঁহাকে দেখিতেন, একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, যিনি কয়েকদিন তাঁহার সহিত বাস করিতেন, তিনি আর তাঁহাতে (ঈশ্বরচন্দ্রেতে) আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না! সে সময়ে সংস্কৃত কালেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সমসাময়িক তাঁহার পূর্ববর্তী ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছাত্র জানিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইহা ছাড়া যখনই কোনো সম্ভ্রান্ত লোক কিংবা কোনো অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁহার সহিত পরিচিত হইতেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দুশ্ছেদ্য প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন। (৪) বেদান্ত শ্রেণীতে পাঠকালে অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়, বয়সে প্রবীণ হইলেও, ঈশ্বরচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন নিরতিশয় স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ কেন, প্রায় স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজের স্নান, আহার, আচমন ও শৌচ প্রস্রাবের জন্য লোকের সহায়তা আবশ্যক হইত। স্নেহানুগত ও উপযুক্ত ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পুত্রস্থানীয় হইয়া অনেক সময়ে বাচস্পতি মহাশয়ের সেবা করিতেন। এইজন্য তাঁহার প্রতি গুরুর পুত্রাধিক বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। সংসারের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্যে উপযুক্ত সন্তানের সহিত পিতা যেরূপ পরামর্শ করিয়া থাকেন' বাচস্পতি মহাশয়ও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তদ্রূপ আচরণ করিতেন। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া অধ্যাপক মহাশয় প্রায় কোন কাজই করিতেন না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যখন এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন বাচস্পতি মহাশয় পুনরায় দারপরিগ্রহের মানস করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন' দেখ, সংসারে আমার কেহই নাই। বড় কষ্ট পাইতেছি। লোকে বলে এত কষ্ট ভোগ না করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেই সকল অসুবিধার অবসান হয়, বিশেষতঃ অনেকগুলি বড়লোক এ কার্যে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং একটি সুস্বভাবা, বয়ঃস্থা ও সুন্দরী পাত্রীও পাওয়া গিয়াছে। এখন তোমার মত হইলেই বাবা, আমি এ কার্যে অগ্রসর হইতে পারি। ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে সমস্ত কথা শুনিলেন এবং মনে মনে বৃদ্ধ শিক্ষকের এই অসঙ্গত প্রস্তাবের, এই ধর্ম-বিগর্হিত সঙ্কল্পের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি না, তাহাই চিন্তা

৪ এই বিবরণ সংগ্রহে শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুর এই নির্মম ও স্বার্থান্ধ প্রস্তাবের অনুকূলে সামান্য প্রয়োজনীয়তাও দেখিতে পাইলেন না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন প্রকৃতির অনুযায়ী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে আর নতুন সংসার করা কখনই কর্তব্য নহে। আপনার আর অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। বিবাহ করিয়া একটি নিরপরাধ বালিকাকে চিরদুঃখিনী করিবেন না। বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহের চিন্তাতেও আপনাতে পাপ স্পর্শিবে।' সর্প দর্শনে প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি যেমন দূরে পলায়ন করে, বাচস্পতি মহাশয়ও ঈশ্বরচন্দ্র হইতে সেইরূপ দূরে পলায়ন করিতে করিতে বলিলেন 'লাটুবাবুর চেয়ে উনি বেশী বুঝেন।' ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান। গুরু পুনরপি অগ্রসর হইয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে নিজের অসুবিধার কথা বার বার বলিলেও হিমালয়সদৃশ অটল বিদ্যাসাগর স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে পূর্ববৎ নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, তৎপরে তিনিও বার-বার মিনতি পূর্বক অনুরোধ করিয়া কোনো ক্রমেই বাচস্পতি মহাশয়কে এরূপ অন্যায় অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। বাচস্পতি মহাশয় পরলোকগত রামদুলাল সরকারের বংশধর ছাতুবাবু ও লাটুবাবুদের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং ছাতুবাবু ও লাটুবাবু ও নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রামরতন রায়ের উদ্যোগে বারাশতনিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরমা-সুন্দরী বালিকার সহিত বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের দার পরিগ্রহ কার্য সম্পন্ন হইল। ঈশ্বরচন্দ্র এই ঘটনায় দারুন মর্মপীড়া পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্নেহাধিক্য নিবন্ধন একেবারে সম্বন্ধচ্ছেদ হয় নাই। একদিন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ 'ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখিতে গেলে না?' ঈশ্বরচন্দ্র এই বাক্য শুনিয়া অজস্রধারে অশ্রুপাত করিলেন। কোনো উত্তর করিলেন না। পরে বাচস্পতি মহাশয় একদিন বলপূর্বক ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। যাইবার সময়ে তিনি সংস্কৃত কালেজের দ্বারবানের নিকট হইতে দুটি টাকা লইয়া গেলেন। উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বালিকার চরণপ্রান্তে টাকা দুটি রাখিয়া সত্বরপদে বাহিরবাটীতে আসিতেছিলেন, এমন সময় বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন, তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননী-স্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়াও সেই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়, 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহির বাটীতে আসিলেন এবং নানা-

প্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন: 'এ ভিটায় আর, কখনও জলস্পর্শ করিব না।' বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার কিছুকাল পরে বাচস্পতি মহাশয় অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা পত্নীকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। (৫)

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় কেমন কোমল ও কিরূপ পরদুঃখকাতর ছিল তাহা এই একটি ঘটনার দ্বারা সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারা যায়। তিনি যে উত্তরকালে বালিকা বিধবাগণের বিবাহের জন্য তাহার সবস্ব পণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, কে বলিতে পারে যে বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের এই অনুষ্ঠান তাঁহার অন্তরে অবলাকুলের কল্যাণ কামনার উদ্রেক করিয়া দেয় নাই? যে ব্যক্তি একটি বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, সে সময়ের ঐ প্রকার শত শত অনুষ্ঠান যে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহায়া অবলাগণের পরম বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মতো হৃদয়বান লোকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার কর্মক্ষেত্র গঠনের পক্ষে এই ঘটনা এবং এইরূপ আরও অনেক ঘটনা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

পরলোক গমনের কিছুকাল পূর্বে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, পঠদ্দশায় যখন সময়-সময় বাটী গমন করিতেন, তখন বিধবা-জীবনের শোকপূর্ণ হৃদয়বিদায়ক ঘটনা সকল শ্রবন করিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। একবার গৃহে গিয়া শুনিলেন, তাঁহাদের পরিচিত কোনো সম্ভ্রান্ত গৃহের বিধবা কন্যা সকলের অজ্ঞাতসারে কলঙ্কের পথে পদার্পণ করে। ইহার ফলস্বরূপ যখন তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা (৬) হইল, তখন পিতা মাতা, মানসম্ভ্রম ও জাতিরক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এরূপ অবস্থায় সচরাচর সে সকল উপায় অবলম্বিত হওয়ার সম্ভবনা, এখানে তাহার বিধিমতো চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো চেষ্টায় আশানুরূপ ফললাভ

---

৫ এই বিবরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তরগমনের অব্যবহিত পরবর্তী হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয় ঐ বিবরণের সংকলক। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্রের সংগ্রহেও ইহার উল্লেখ আছে।

৬ এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

না হওয়াতে, যথাকালে সেই হতভাগিনী বিধবা এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল এবং আত্মীয় স্বজন ও সামাজিকগণের উৎপীড়ন ভয়ে ভীত গৃহকর্তা ও গৃহিণী, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে হত্যা করিয়া কুল মান রক্ষা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছিলেন, যখন তিনি বলিতেছিলেনযে রাক্ষসী গৃহিনী সূতিকা-গৃহে স্বহস্তে সেই নিরপরাধ শিশুকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিল। তখন তাঁহার চক্ষের জল ও মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। সহসা মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মনের গ্লানি ও যন্ত্রণার পরিচায়ক উত্তেজনা তাঁহার সমগ্র শরীরে প্রকাশ পাইল। অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রুজল মোচন করিয়া শেষে পরিধেয় বস্ত্রে মুখমুছিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। একি মানুষের দেশ? মানুষের দেশ হইলে, এতদিন ইহার প্রতিবিধান হইত।'

ইহা হইতে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এই সকল কঠিন সামাজিক প্রশ্ন ও নানা প্রকার দেশহিতকর কার্যের সংকল্প তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্থান পাইতেছিল বলিয়া, তিনি সে সময়ে আদৌ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবল পিতা পাছে ক্ষুন্ন হন, এই ভয়ে দ্বিরুক্তি না করিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এ ঘটনা হইতেও আমরা অতি পরিষ্কাররূপে অনুভব করিতে পারিতেছি যে, পঠদ্দশাতেই এই সকল সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারের দৃশ্য তাঁহার কোমল অন্তরে আঘাত করিত এবং তিনি এই সকল অনিষ্টের প্রতিনিধানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

যাঁহারা সমাজের প্রবহমান স্রোতের গতি ফিরাইতে, সমাজের মন্দীভূত গতি খরতর করিতে, সমাজ-স্রোতের আবর্জনা সকল উত্তোলন পূর্বক দূরে নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাবী কার্যকলাপের দীক্ষাগুরুরূপে এক, দুই, তিন বা ততোধিক ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতেপাওয়া যায়।

সংসারজীবনের অসারতা, মানবদেহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও দুর্বিষহ দারিদ্র্য সন্দর্শনে মহাযোগী শাক্যসিংহের বৈরাগ্যের সূচনা হইতে এইরূপ একাধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্যের ধর্মজীবনের সূচনায় জন্য একাধিকবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। ধর্ম ও সমাজসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায় যে সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে প্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হইলে পর, তাহার ফলাফল স্বচক্ষে দর্শন করিতে এবং প্রয়োজন হইলে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে শাস্ত্রের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে এবং অন্য বিবিধ উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থন মানসে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার অঙ্কুর কিশোরবয়স্ক রামমোহনের প্রাণে স্থান

পাইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে তাঁহার অল্পবয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহমরণের ভীষণ দৃশ্যে, সেই বালিকার আর্তনাদ ও প্রাণরক্ষার আকিঞ্চন দেখিয়া তাঁহার প্রাণে গভীর ক্ষোভ ও দারুণ যন্ত্রণার আগুন জ্বলিয়াছিল। তিনি সেই নিষ্ঠুরাচরণ দর্শনে কাতর হইয়া এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, এই কুপ্রথার প্রতিবাদ করিতে এবং সুবিধা হইলে, ইহা রহিত করিবার চেষ্টা করিতে প্রাণপন করিবেন। (৭)

ঈশ্বরচন্দ্রের যৌবন সমাগম হইতে না হইতে, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইতে না হইতে, তাঁহার কোমল প্রাণে বালবৈধব্যের ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল এবং তিনি উত্তরকালে যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সমগ্র বঙ্গসমাজ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহার প্রথম অঙ্কুর এই বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের বালিকা পত্নীর অকাল বৈধব্য ও তাহার আনুষঙ্গিক পরিণাম চিন্তায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনা সকল কেবল তাহার সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। ইহাই সম্ভব ও সঙ্গত বোধ হয়। অনেকের এরূপ ধারণা যে তাঁহার জননীর অনুরোধ ক্রমে তিনি প্রথমে এ বিষয়ের চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ লেখকের 'মা ও ছেলে' নামক গ্রন্থে তাঁহার সেই পুণ্যবতী জননী ভগবতী দেবীর পবিত্র চরিত-কাহিনী সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে সেগুলির প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ে তাঁহার জননীর কতটুকু সম্বন্ধ ছিল, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জননীর অনুরোধের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনি নিজ হৃদয়ের উত্তেজনা-প্রণোদিত হইয়াই এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারই পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে তিনি জনকজননীর পূর্ণ উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন।

ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে যখন তিনি পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুই মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের উপযুক্ততা স্মরণ করিয়া কালেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকেই দুই মাসের জন্য সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক চল্লিশ টাকার হিসাবে দুই মাসে আশি টাকা পাইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই অর্থব্যয়ে আপনি তীর্থ পর্যটনে গমন করুন।' পুত্রের এতাদৃশ পিতৃভক্তি ও তীর্থ পর্যটনে অনুরাগ দেখিয়া পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরাপর সকলে

---

৭ শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত রামমোহন রায় বিষয়ক আখ্যায়িকা। ২৬ পৃষ্ঠা।

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পিতা, পুত্রের অনুরোধ মতো ঐ অর্থ ব্যয়ে পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়া যাত্রা করিলেন।

পিতৃদেব তীর্থ পর্যটনান্তর জলপথে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া একশত টাকা, সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য একশত টাকা, আইন পরীক্ষার পুরস্কার পঁচিশ টাকা এবং উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষরের পুরস্কার আট টাকা, সর্বসুদ্ধ মোট ২৩৩ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই টাকা পিতার হাতে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বলিলেন। চারি বৎসর দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীর শেষ ষড়্‌দর্শনের পরীক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া প্রতিপত্তিভাজন হইলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'এতাদৃশ মেধাবী ও অদ্ভুতকর্মা ছাত্র আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। ইহাকে পড়াইবার জন্য দর্শনশাস্ত্রে আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত, পড়াইবার সময় বোধ হইত যেন ঈশ্বর কতকাল পূর্বে ঐ সকল শাস্ত্র বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন।' এক্ষণে পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্ররূপে কিরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন! তাঁহার গুণপনা এবং বিদ্যানুশীলন শক্তির বিচিত্রতা দর্শন করিয়াই তাঁহার শিক্ষক অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঐরূপ মহামূল্য অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অনেকের এরূপ ধারণা যে, পাণ্ডিত্যবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িকদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম হইতে শেষ পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া পরিশেষে সর্ববিদ্যায় বিশারদ হইতে এইরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার সকল বিভাগেই সমানভাবে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কোনো এক বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হন নাই। কোনো একবিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী হওয়ার অর্থ এই যে, অন্যান্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে এরূপ যুক্তি প্রযুজ্য হইতে পারে না। তাঁহার ছাত্রজীবনের কীর্তিকলাপ লোকের পরিজ্ঞাত না থাকায় বোধ হয় সাধারণ লোকে ঐরূপ মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ পর্বতপ্রমাণ বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া, সকল বিষয়ে সমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে ও প্রত্যেক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারা, কেবল লোকবিরল গুণসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভাবিতে পারে। কেহ ব্যাকরণে, কেহ সাহিত্যে, কেহ ন্যায়ে কেহ বা দর্শনশাস্ত্রে, আর কেহ বা ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া নিজ নিজ অধীত বিদ্যায় গণনীয় ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সকল বিষয়ে সমভাবে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোনো প্রকার মতামত দিবার পূর্বে বিশিষ্টরূপে চিন্তা করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়

সেরূপ সতর্কতাসহকারে চিন্তা করিয়া এরূপ গুরুতর বিষয়ে মতামত দেওয়ার অভ্যাস আমাদের নাই। বুঝি, আর না বুঝি, অল্প সময়ে অধিক কথা বলিয়া বহুদর্শিতার পরিচয় দিবার আকাঙ্খা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই আমরা অনেক অনভিজ্ঞ লোকের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের ধারণার পক্ষে তদানীন্তন সংস্কৃত কালেজের কর্তৃপক্ষগণ ও শিক্ষকমণ্ডলী সমবেত হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন। কতৃপক্ষীয়েরা বিদ্যাসাগর উপাধিসহ যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল। অধ্যাপকগণ সকলে মিলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে যে প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এখানে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইতেছে:

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসা-পত্র দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুক্ত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্যাকরণম্ | ... | ... | শ্রীগঙ্গাধর শর্মভিঃ |
| কাব্যশাস্ত্রম্ | ... | ... | শ্রীজয়গোপাল শর্মভিঃ |
| অলঙ্কারশাস্ত্রম্ | ... | ... | শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্মভিঃ |
| বেদান্তশাস্ত্রম্ | ... | ... | শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মভিঃ |
| ন্যায়শাস্ত্রম্ | ... | . | শ্রীজয়নারায়ণ শর্মভিঃ |
| জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ | ... | ... | শ্রীযোগধ্যান শর্মভিঃ |
| ধর্মশাস্ত্রঞ্চ | ... | ... | শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মভিঃ |

সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।

১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতি দিবসীং।।

10 December, 1841. (sd.) RASOMAY DUTTA Secretary.

সকল শ্রেণীর অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালকের শিক্ষকপদবাচ্য হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধ্যাপিত বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত এবং ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া যে একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবককে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান পূর্বক সাদরে বরণ করিয়াছেন, ইহার দ্বারা এইরূপ বুঝায় যে, প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, সকল বিষয়েই তিনি সুগভীর সাগরসদৃশ অতলস্পর্শ ছিলেন। পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নের সহিত বীরোচিত সংগ্রাম সহকারে অধ্যয়নে এতাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন, দরিদ্র বঙ্গের প্রত্যেক ছাত্রের অনুকরণীয়। অদ্ভুতকর্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষ্ঠাসহকারে ব্রহ্মচর্যব্রতধারী হইয়া ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন কঠোরতা সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও ত্যাগস্বীকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এতাদৃশ গুণবান্ বালক যে গৃহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন সে গৃহে প্রত্যেকেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, যে দেশীয় বালকমণ্ডলী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের অনুসরণ করিয়াছে, সে দেশের সৌভাগ্যের সীমা নাই। যে বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা

প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সফল হইয়াছে। বীরসিংহের কালীকান্ত গুরুমহাশয় হইতে মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পর্যন্ত সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাগুরু বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ছাত্রজীবনের উচ্চতম শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে!

১৮২৯ খৃস্টাব্দে যখন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করেন তখনও ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচার সাধিত হয় নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণে এদেশীয় বালকগণকে শিক্ষা দিবার সূচনা করিতেছিলেন। ১৮১৭ খৃস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী সোমবার দিবস গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার, হ্যারিংটন্ ও স্যার হাউড্ ইস্ট প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাজ-মণ্ডলী ও বহুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আগ্রহে হিন্দু কালেজের সূত্রপাত হইলেও, ইহার স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল, কারণ তখনও গভর্নমেণ্ট ইহার উন্নতিকল্পে কোনো প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই এবং উদ্যোগকর্তারাও সে পক্ষে কোন চেষ্টা করেন নাই। এক সময়ে অর্থাভাবে হিন্দু কালেজ যখন অতীতের স্মৃতিমাত্রে পরিণত হইতে যাইতেছিল, অথচ অপরপক্ষে গভর্নমেণ্ট কেবল সংস্কৃত কালেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা বিষয়ে আপনাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি সাধনে উদ্যত হন, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আবেদনে ও ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের চেষ্টায় গভর্নমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে নূতন ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য হেয়ার, রঙ্গভূমির পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধ উপায়ে সাহায়তা করিতে-ছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও উদ্যম না থাকিলে, বর্তমান শিক্ষার স্রোতঃ বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে ১,২৪,০০০ টাকা ব্যয়ে, হেয়ারপ্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে সংস্কৃত ও হিন্দু-কালেজের বাটীর নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু স্কুলের বাটীর নির্মাণকার্য শেষ হইলে পর, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ বিদ্যালয়ই ঐ বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তখনও অর্থাভাবে হিন্দু কালেজ সময়ে সময়ে নির্বাণপ্রায় হইয়া পড়িতেছিল। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া কালেজের অভিভাবকগণ গভর্নমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রেরণ করিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল গভর্নমেণ্ট-প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিবার অধিকার দিয়া, কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য লওয়া স্থির হইল। সুতরাং এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচার কেবল আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে। (৮)

---

৮ Accounts taken from the Biography of David Hare by Pyari Chand Mitra.

ঘনঘটাচ্ছন্ন মধ্যরজনীর ঘোর অন্ধকারে সুষুপ্তির সুমিষ্ট ক্রোড়ে শায়িত লোকমণ্ডলী সহসা বন্যার জলে ভাসিলে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম বন্যা-প্রবাহেও ঠিক তদনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নূতন ভাব ও নূতন চিন্তার স্রোতঃ বিদ্যুতের ন্যায় তীব্রতেজে চারিদিক চমকিত করিয়া ছুটিল, নবালোকে নব্যসম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। যুবক ফিরিঙ্গি শিক্ষক ডিরোজিও এই নব্য বঙ্গের দীক্ষা-গুরু। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দ বসাক প্রভৃতি সে সময়ের যুবকমণ্ডলী চিন্তা ও ভাব বিষয়ে বর্তমান বঙ্গের পিতৃস্থানীয়। ডিরোজিওর সহৃদয়তা, বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের মধুর আকর্ষণে বহুসংখ্যক যুবক সমবেত হইয়া, একাডেমি নামক সভায়, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব ও অন্য নানাবিধ আলোচনায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ডেভিড্ হেয়ার সর্বদা ঐ সকল আলোচনায় যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে গভর্নর জেনারেল বেণ্টিক মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্নেল বেন্‌সন্‌ও সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেশ ও উৎসাহদানে সভ্যদিগকে অনুগৃহীত করিতেন। সে সময়ের প্রবীণ সামাজিক-গণের ভয় ও ভাবনাজনিত উৎপীড়নে, এই নূতন চিন্তাস্রোতঃ ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকে ইহার গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাহারা তদ্দ্বারা তাঁহাদের আশার বিপরীত ফলদর্শনে ভীত হইয়া ক্রমে নীরব হইলেন। সর্বপ্রথমে যাঁহারা এই নূতন শিক্ষার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। তিনি যখন বিদ্যালয়ে, তাঁহারাও তখন বিদ্যালয়ে। তিনি সংস্কৃত কালেজে এবং উপরোক্ত মহোদয়গণ হিন্দু কালেজে লেখাপড়া শিখিতেছিলেন। সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু কালেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইঁহাদের অনেকের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সখ্য জন্মিবে, ইহাই স্বাভাবিক। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৮৪২ খৃস্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাঙ্গালী ছাত্রমণ্ডলীর পরম সুহৃদ্ ডেভিড্ হেয়ার লোকান্তরিত হন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র কলিকাতাবাসী লোকমণ্ডলী শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্মরণার্থে যত প্রকার আয়োজন হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে প্রতিবৎসর তাঁহার মৃত্যুদিনে শিক্ষিতমণ্ডলীর একটি সভা একাল পর্যন্ত আহূত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক সময়ে, হেয়ার স্মরনার্থ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার

সময়ে, উৎকৃষ্ট ইংরাজী ভাষা, তাঁহার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হইলেও, বহুল পরিমাণে ইংরাজী ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে এবং নিজেও ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। এক দিকে অন্ধ বিশ্বাসের অধীন হইয়া আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে লোক অলসভাবে দিন যাপন করিতেছিল, আর এক দিকে নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের খরতর স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সে সময়ের বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীকে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিয়াছিল, বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নব্য বিদ্যাসাগর দেখিলেন, এক পার্শ্বে আবর্জনাপূর্ণ জঙ্গলময় বনভূমি বহুরত্নের আকর হইযাও অজ্ঞতা ও কু-সংস্কারের দৃঢ় নিগড়ে পরিবেষ্টিত, অপর পার্শ্বে বিচিত্র দৃশ্য তাবকাবলী প্রতিবিম্বিত সলিলোচ্ছাসপূর্ণ বারিধিবক্ষঃ সুপ্রসারিত হইয়া তাঁহাব হৃদয় মন আকৃষ্ট করিতেছে, কিন্তু কত ভীষণকায় তিমি ও মকর সে জলতলে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উভয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দিব্য নেত্রে তাঁহার ভাবী সঙ্কল্পেব পথ দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মানস-নেত্র তাঁহাকে এই উভয়বিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যে সর্বদা সুপথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকাব করিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তিনি প্রাচ্য কুসংস্কার ও পাশ্চাত্য আড়ম্বর পরিহার করিয়া নিষ্ঠাবান্ ও কর্তব্যপরায়ন বীরপুরুষেব উপযোগী পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষাব সংযোগে যে কি মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারা যায়, বিদ্যাসাগব মহাশয তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি উভয় শিক্ষার মন্দ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া, রত্নোত্তোলন দ্বারা তাঁহার জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সম্মুখে বর্তমান সময়ের জীবন-সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ বিবিধ গুণের অধিকারী হইয়া কর্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হন, তৎসম্বন্ধে বহুসম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস. সি. আই. ই. মহাশয় যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই উধৃত করিয়া আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়চরিত পরিসমাপ্ত করিলাম:

'ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় ওজস্বিতা মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজাপথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি,—একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি। যেটি সমাজের উপকারী, যেটি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অভিমত, সে প্রথাটি যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি।"(৯)

৯ নব্যভারত, বিদ্যাসাগর সংখ্যা।

## পঞ্চম অধ্যায় ॥ কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর

এতদিন আমরা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। তাঁহাকে বাল্যকালে ভয়ানক দুরন্ত দেখিলাম, বিদ্যালয়ে ছাত্রবেশে তাঁহাকে আদর্শ বালক দেখিলাম। তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণায় পরিতুষ্ট হইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছেন! কিন্তু এতাবৎকাল তাঁহার জীবনলীলার কেবল প্রথমাঙ্কমাত্র দেখিতে পাইয়াছি, এখনও তাঁহার জীবন-পুষ্প অপ্রস্ফুটিত মুকুলসদৃশ। কিন্তু সেই স্ফুটনোন্মুখ পুষ্প-কোরক-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইলেও, তিনি তখনও বালক। বিদ্যার্থী বালক যাহা করিতে পারে, তিনি তাহার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়া জীবনের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার জীবনের যে বিভাগে ঘটনার বৈচিত্র, ত্যাগস্বীকারের অভাবনীয় দৃষ্টান্ত, লোক-সেবার অক্ষয়কীর্তি ও দেবদুর্লভ প্রেমের ঘনবর্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছে, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও নির্ভিকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিতের সেই দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছি। এই অংশেই বাঙ্গালী-জীবনের অমূল্য রত্ন সকল লুক্কায়িত আছে। ইহারই মধ্যে বর্তমান মুহ্যমান ও মৃতকল্প বাঙ্গালী জীবনের মৃতসঞ্জীবনী অমৃতকণা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দুঃখ এই যে, আমাদের ন্যায় অনুপযুক্ত লোকের অকিঞ্চিৎকর আকিঞ্চনে সেই সকল রত্নকণা সংগৃহীত ও সুন্দররূপে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। আমাদের অপেক্ষা উপযুক্ততর লোকের হস্তে এই দেববাঞ্ছিত পারিজাত-পরিমলপূর্ণ কুসুম চয়ন-ভার ন্যস্ত হইলে, জানি না তদ্দারা তাঁহারা কি চিত্তমুগ্ধকর পুষ্পমাল্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতেন! বঙ্গসন্তানদের কণ্ঠে সে অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার রত্নহার কি সুন্দর, সুখময় ও তৃপ্তিপ্রদ হইত, ভাবিলেও অন্তরে সুখোদয় হয়; তাই এই বিদ্যাসাগর-বিয়োগকাতর বঙ্গসন্তানদের অন্তরে বিন্দুপ্রমাণ তৃপ্তি সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কেবল এই ভরসায় আমরা পূর্ণবিয়বসম্পন্ন বিদ্যাসাগর-চরিত অঙ্কনে অনুপযুক্ত হওয়াও, এই গুরুতর কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে মার্শেল সাহেবের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম চাকরি আরম্ভ করেন। মধুসূদন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে তথাকার প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। উক্ত পদ প্রত্যাশায় অনেকে লালায়িত হইয়াছিলেন। এ দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠসমাপিমাত্তে কিছুদিনের জন্য বীরসিংহে গমনপূর্বক বাটীতে জননীর নিকট সুখে কালাতিপাত করিতে-ছিলেন। ইতিপূর্বে যৎকালে মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ

ছিলেন, তখন তিনি ছাত্র বিদ্যাসাগরকে বিশেষরূপে জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা, দুর্দমনীয় অধ্যবসায়, আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা, সুন্দর হস্তাক্ষর, রচনা-নৈপুণ্য এবং সর্ববিষয়ে সমান অনুরাগ দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এই শূন্যপদে নব্য বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার মানসে সংস্কৃত কালেজে আসিয়া জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট বালক ঈশ্বরচন্দ্রের সংবাদ লইয়া শুনিলেন যে, তিনি কলিকাতা হইতে বহুদূরে বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। মার্শেল সাহেব তখনই কোনো প্রকারে তাঁহাকে সংবাদ দিবার উপায় করিতে বলিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বড়বাজারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে গমন পূর্বক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কলিকাতায় আনিলেন। ঐ ১৮৪১ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে, পরলোকগত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শূন্যপদে নিযুক্ত হইলেন। বিলাত হইতে আগত সিভিলিয়ানগণ এখানে দেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা করিয়া পরীক্ষাদানান্তর কার্য প্রাপ্ত হইতেন। যাঁহারা দেশীয় ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। বিলাতে সিভিলিয়ানদিগের জন্য, এখনকার মতো সেকালে প্রতিযোগী পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। তখন সিভিলিয়ানগণ হালিবরি কালেজে পাঠ করিয়া এখানে চাকরি করিতে আসিতেন। ইঁহাদিগের পরীক্ষার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই কালেজের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি যেরূপ দৃঢ়তা ও আগ্রহাতিশয় সহকারে কর্ম করিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেব দিন দিন তাঁহার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া যাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত, তাঁহাদিগের মনঃক্ষোভের সীমা থাকিত না, তাই মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরীক্ষার আঁটাআঁটি ভাবটা একটু কম করিতে বলিয়াছিলেন। তদুত্তরে যুবক বিদ্যাসাগর অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রবীণ কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। না হয় চাকরি ছাড়িয়া দিব, তবুও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিব না।' উত্তর কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অদ্ভুতকর্মা বীরপুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার সূচনা এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গরিবের ছেলে, কল্পনাতীত দারুণ অভাবের মধ্যে, জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটিয়াছে, তাহার পর সেকালের পঞ্চাশ টাকার চাকুরি অন্যের পক্ষে এক মহামূল্য সম্পত্তি হইলেও, তাঁহার নিকট ভগ্ন কাচখণ্ড অপেক্ষা অধিক মূল্যের বস্তু ছিল না। তিনি সাহেবকে অসঙ্কোচে বলিয়া দিলেন, বিন্দু প্রমাণ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবার পূর্বে 'ও ছাই ভস্ম' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। মার্শেল সাহেব অতি সজ্জন লোক ছিলেন; কেবল

বিলাত হইতে চাকুরির প্রত্যাশায় এখানে আসিয়া ইংরাজের পক্ষে বিফলমনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠা সন্দর্শনে তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া পাড়িয়াছিলেন।

বিজিত ভারতবাসী প্রজামণ্ডলী ইংলণ্ডে গিয়া এরূপ কোনো পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, নৈরাশ্যের অন্ধকারে তাহার প্রাণমন মলিন হইয়া যায়, আমাদের দেশের লোকের আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ হইয়া যায়, আর আমরা ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষগণকে কতই না তিরস্কার করি। সাহেবরা রাজার জাতি হইয়া, সেকালে আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ পূর্বক 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' হইয়া ভারতে আসিয়া পরীক্ষায় একজন হিন্দু অধ্যাপকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবেচনায় অনুপযুক্ত হইয়া সময়ে সময়ে সাহেবদিগকে সিবিলিয়ানী সুখে বঞ্চিত হইতেও হইত। ইংরাজ, বাঙ্গালীদিগের পরীক্ষা গ্রহণে ন্যায়ের অধীন হইয়া চলিতে পারেন, ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়ের সমবেত পরীক্ষায় বাঙ্গালীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে পারেন, কিন্তু কতটা সাহসী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হইলে সদাশয় মেকলে বর্ণিত অধম বাঙ্গালী এরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিতে পারেন, পাঠক! একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। যে স্বাধীন ভাব তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াকৌতুকে, বাল্যকালের চপলতা ও দৌরাত্মে মুকুলিত হইয়াছিল, যাহা ছাত্ররূপে তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল, সেই স্বাধীন-চিত্ততাই তাঁহার কর্মক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

'কর্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা।' এই মহামন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া তিনি সংসারের পথে এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন আমরা দেখি, তিনি এই নীতির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়া উপস্থিত হন।

কর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হইল। তিনি ইংরাজী ও হিন্দী উভয় ভাষা এককালে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কলিকাতার তালতলানিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি সর্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আসিয়া নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে দুর্গাচরণবাবুর নিকট ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত গভীর আত্মীয়তার সূচনা হয়; এবং সেই আত্মীয়তা চিরদিন অক্ষুন্ন থাকিয়া পরস্পরের হৃদয় সরস করিয়াছে। ইহার পর কিছুদিন নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে

ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন। পরে তিনি রাজনারায়ণ গুপ্ত নামক জনৈক যুবককে ১৫ টাকা বেতনে ইংরাজী শিখিবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হিন্দি শিখিবার জন্য ১০ টাকা মাসিক বেতনে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণবাবু তখনও ডাক্তার হন নাই। তিনি সে সময় হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে হেড্ রাইটারের পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া দুর্গাবাবুকে ৮০ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া দুর্গাচরণবাবু মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া শেষে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, তাঁহাকে কলিকাতায় স্থায়ী করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুও তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার লোক সেবাব্রত পালনে চিরদিন সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। নীলমাধববাবুও ডাক্তার হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের জন্মগ্রহণে জনসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহাদের বিচরণে ধরণীবক্ষ টলমল করিয়াছে, যাঁহাদের আবির্ভাবে সংসারের অবসন্নতা ও আবিল ভাব বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই সামান্যতর অস্থায়ী জীবননাট্যের প্রথম অঙ্ক অতিবাহিত করিয়াছেন। সামান্য অবস্থায় সামান্য আয়োজনে, জীবনের মহৎ কার্যের সূচনা করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মহাত্মা গারফিল্ড, কৃষকসন্তান। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি কৃষিকার্যে কাষ্ঠ আহরণে ও জাহাজের সামান্যতর কার্যে অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্, অবস্থাবৈগুণ্যে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভার নিজেই বহন করিয়াছেন। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন সামান্য সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশীয় দৃষ্টান্তের বা উল্লেখের প্রয়োজন কি? ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক বাগ্মিবর কেশবচন্দ্র সেন প্রথমে ২০ টাকা বেতনে কেরানীর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বীর প্রকৃতিসম্পন্ন স্বাধীনচেতা পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথমে সামান্য কেরানীর কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, কার্য-কুশলতাগুণে আপনার প্রতিভার পরাক্রমে সমগ্র বঙ্গসমাজ চমকিত করিয়াছেন, তিনি সামান্য ৫০ টাকা বেতনের কর্মে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের প্রথম আয়োজন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান বলিয়াই আমাদের এত আদরের ধন। তিনি বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্টের দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হইয়াও শান্তভাবে জীবনের পথ অতিক্রম করিয়া

অতুল কীর্তির সুদৃঢ় স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ গৌরবের কথা। যে সকল পুণ্যবান সাধুগণের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া আমরা আনন্দে দিশাহারা হই, নিশ্চয় তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম। ইহাই আমাদের পরম শ্লাঘার বিষয় মনে করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম গ্রহণ, করিয়া সর্বাগ্রে পিতাকে সেই কঠোর শ্রমকর চাকুরি হইতে অবসর লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরদাস অন্যান্য লোকের পরামর্শের অধীন হইয়া একটু ইতস্তত করিতেছিলেন। নিজের শক্তি সামর্থ থাকিতে এরূপে পুত্রের অধীন হইতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শেষে পুত্রের নিরতিশয় অনুনয় ও অনুরোধের বশবর্তী হইয়া কর্মত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করেন। কর্মত্যাগের সময়ে তাঁহার বেতন দশ টাকা (১) ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসে মাসে কুড়ি টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকুরিতে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বাগ্রে পিতার বহুদিনের ক্লেশ নিবারণে যে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার পিতৃভক্তির বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠাকুরদাসের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, ছাত্রাবস্থায় পিতার নিকট থাকিয়া কত প্রকার ক্লেশকর ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, পুত্রদের মল-মূত্রও পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তিনি যে সর্বাগ্রে পিতাকে সর্বপ্রকার ক্লেশকর ও বহু শ্রমকর কার্য হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয়। ইহার অন্যথা হইলে বিদ্যাসাগর-চরিতের সঙ্গতি রক্ষা হইত না। পিতাকে প্রতিমাসের প্রারম্ভে ২০ টাকা পাঠাইয়া অবশিষ্ট ৩০ টাকায় কলিকাতার বাসায় আপনারা তিনটি সহোদর, দুইটি পিতৃব্যপুত্র, দুইটি পিসতুতো ভাই, একটি মাসতুতো ভাই ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম—মোট নয়-জনের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিতে লাগিলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উপার্জনক্ষম্ হইয়াও পর্যায়ক্রমে রন্ধনাদি কার্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বড়বাজারের বাসায় বহু পরিবারের স্থান সংকুলান না হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে বহুবাজারে বিখ্যাত হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সদরবাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃকালে নয়টা পর্যন্ত শিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন; এবং অপরাহ্নে এক সময়ে হিন্দি পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া কালেজের কার্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সুতীক্ষ্ম বুদ্ধিশালী ও অধ্যবসায়শীল পণ্ডিতের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কার্য নহে। এই সময় ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাবু শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন

---

১ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন, পিতার বেতন ১০ টাকার অধিক কখনই ছিল না। তাঁহার কথামতো ২০ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকার উল্লেখ করিলাম।

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি সমবয়স্ক বন্ধু সংস্কৃত শিক্ষার মানসে তাঁহার নিকট আসিতেন। বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আপনার প্রকৃতি গুণে এই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি ইংরাজী পড়াশুনা এক প্রকার শেষ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গলাভে, তাঁহার প্রতি দিন দিন হৃদয়ের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু বেশ মিষ্ট স্বরে মেঘদূত পড়িতেছিলেন; সেই বাল-কণ্ঠ নিঃসৃত সুমিষ্ট কবিতাপাঠ শ্রবণ করিয়া রাজকৃষ্ণবাবুর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে সম্মত হইলেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ-বাবুর বয়োধিক্য নিবন্ধন প্রচলিত প্রথায় ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা ভয়ে তিনি নির্বোধ্য ও বহুকালব্যাপী মুগ্ধবোধ শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে অল্পায়াসসাধ্য কোনো নূতন উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না, এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, 'তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে। এই বলিয়া সে দিন তাঁহাকে বিদায় দিলেন; পরদিন রাজকৃষ্ণবাবু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এক নূতন ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সেই হস্তলিপির সাহায্যেই রাজকৃষ্ণবাবুর ব্যাকরণ শিক্ষার সূত্রপাত হইল। পরিশেষে ইহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া 'উপক্রমণিকা'র সৃষ্টি হইয়াছিল। 'উপক্রমণিকা' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তির আশ্চর্য প্রমাণ প্রদান করিতেছে, ইহার সমগ্র ব্যবস্থাই নূতন ব্যাপার, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার ফল সরল ও সুগম্য হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে।

রাজকৃষ্ণবাবু নিজ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালীর গুণে শীঘ্রই মুগ্ধবোধ পাঠ শেষ করিলেন। অনধিক ছয় মাস কাল মধ্যে রাজকৃষ্ণবাবু মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন, এই অশ্রুতপূর্ব ঘটনা শ্রবণে সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই কৃতকার্যতা দর্শনে লোকে বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'এও কি কখনও সম্ভব?' ইতিপূর্বে মার্শেল সাহেব কর্তৃক সংস্কৃত কালেজে জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণবাবুকে জুনিয়ার পরীক্ষা দিতে বলিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুও তাঁহার উপদেশ মতো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সহসা একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন, এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষায় রাজকৃষ্ণবাবুও উত্তীর্ণ হইলে, পরবৎসর হইতে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে ও সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। সদয় হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় হইল, তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা হইতে অগত্যা বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ার ফলে যখন এক ব্রাহ্মণের অন্ন মারা যায়, তখন আর তোমার জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। রাজকৃষ্ণবাবুও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া জুনিয়ার বৃত্তি লাভের উদ্যোগ পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় দুই বন্ধুরই সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণবাবুকে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তদুত্তরে রাজকৃষ্ণবাবু সঙ্কোচসহকারে বলিলেন, 'আমি কি পারিব? তাঁহার উৎসাহদাতা বন্ধু অমনি বলিলেন, 'কেন পারিবে না? তবে একটু বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। তুমি প্রতিদিন আহারান্তে আমার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে যাইতে পার?' রাজকৃষ্ণবাবু তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে গিয়া সমস্ত দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে লেখাপড়া করিতে ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাত্রিতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পড়িতে লাগিলেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আরও অনেকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সন্ধ্যার পর সমবেত হইতেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু অনেক সময়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনায় নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে দিবানিশি শ্রম করিয়া আড়াই বৎসরে সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকৃষ্ণবাবু প্রথম বারে মাসিক ১৫ টাকা ও দুইবৎসর পরে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২০ টাকা প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাপক মহলে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ৫।৬ বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াও যাহাতে কৃতকার্য হওয়া কঠিন, কেবলমাত্র আড়াই বৎসরে তাহাই সাধিত হইয়াছে শুনিয়া, দলে দলে ছাত্র ও শিক্ষক রাজকৃষ্ণবাবুকে ও তাঁহার গুরুকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সকলে এই ঘটনাকে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করিলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা প্রণালীর গুণে ও রাজকৃষ্ণবাবুর আগ্রহে ও শ্রমশীলতায় এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর আর একবার রাজকৃষ্ণবাবুর শেষ পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই গুরুতর পরিশ্রমে রাজকৃষ্ণবাবুর শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। স্বাস্থ্য লাভের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। এই জন্য আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। (২)

---

২ এই সকল বিবরণ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

ঈশ্বরচন্দ্রের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত কালেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন পরস্পরে আকৃষ্ট হন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শুভানুষ্ঠানের সূচনা করিতেন, মদনমোহন তাহার প্রত্যেকটিতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। অনেক অনুষ্ঠানে উভয়ের এরূপ আগ্রহ দেখা যাইত যে, কে পরিচালক আর কে পরিচালিত তাহা বুঝায় উঠা কঠিন হইত। যাঁহার প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার আকৃষ্ট হইতেন, তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সহোদর নির্বিশেষে ভালবাসিতেন ও সর্বদা তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে যখন তিনি প্রায় বৎসরাধিক কালের জন্য বারাশত গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য করিতেছিলেন তখন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে সাহেবদিগকে (Civil) সম্পত্তিবিষয়ক আইন পড়াইবার জন্য ৪০ টাকা বেতনে এক পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় মদনমোহণ তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। (৩) সহাধ্যায়ী ছাত্রগণের গুণানুসারে পদমর্যাদা ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া দেওয়া তাঁহার একটি প্রধানকার্য ছিল। তিনি চেষ্টা ও যত্ন পরতন্ত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকেরই কর্ম কাজের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় বন্ধুদিগের জন্য সর্বদা চিন্তা করিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বন্ধুদিগের উন্নতিকল্পে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, মাসিক ২০ টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়া পিতৃদেবকে বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া, অবশিষ্ট ৩০ টাকায় কলিকাতার বাসায় ৯।১০ জনের ভরণপোষণ নির্বাহ করিয়া রন্ধনের দিন উপস্থিত হইলে বাসার অন্য সকলের সহিত সমান অংশে রন্ধনের ভার লইয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। ইহার

৩ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত-প্রণেতা তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার কাহিনী বর্ণনায় সর্বত্রই তর্কালঙ্কার মহাশয়কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছুমাত্র অগৌরব না হইলেও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গৌরবও তাহাতে বৃদ্ধি পায় নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় জ্ঞানে ও গুণে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি নিজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি সর্বদা যে আনুগত্যের ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, বিদ্যাভূষণমহাশয়ের লিপিচাতুর্যে সেটুকু অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছি।

উপর নিজের বিদ্যাচর্চা ছিল এবং সর্বদাই কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেবের কার্যে সহায়তা করিতে হইত। সংস্কৃত কালেজের সিনিয়ার ও জুনিয়ার পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করিবার ভার মার্শেল সাহেবের উপর অর্পিত হইত; তিনি আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সে কার্যের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই উপর ভার দিতেন। প্রশ্ন সকলও যেমন তেমন নয়। ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সকলেরই প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। তিনি যে সকল প্রশ্ন দিতেন, সংস্কৃত কালেজের বড় বড় অধ্যাপকগনও সে সকল প্রশ্নের কোনো দোষ ধরিতে পারিতেন না। তিনি যাহা করিতেন তাহাই এত সুন্দর করিয়া করিতেন যে, কেহ অনুসন্ধান করিয়াও সহজে কোনো খুঁত ধরিতে পারিত না। তিনি পথে চলিতে পটু ছিলেন, পাকশালায় উৎকৃষ্ট পাচক ছিলেন, গৃহকার্যে শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবারও উপায় জানিতেন, লোকের সেবায় পিতামাতা অপেক্ষাও অধিক আত্মীয় হইতে পারিতেন, বিদ্যালয়ে সুদক্ষ শিক্ষকরূপে বিরাজ করিতেন। তিনি যে উত্তরকালে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন তাহার প্রধাণ কারণ এই যে, তিনি যাহা ধরিতেন তাহা সর্বান্তঃকরণে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। যে কার্য গ্রহণ করিতেন, তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। যে কার্য পারিবেন না বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, প্রাণান্তেও সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার পূর্ণতা সম্পাদনে প্রাণপণ যত্ন করিতেন। কর্তব্যজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে ইহাই তাঁহার ভাবী জীবনাভিনয়ের মূল ভিত্তি হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি জীবনে সফলকাম হইয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব, ইহাতেই তাঁহার পুরুষকারের সূত্রপাতও বিকাশ হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর-জীবনে পরিশ্রমের এখন কি হইয়াছে? এই পরিশ্রমের সূচনা হইয়াছে মাত্র। যখন এইরূপ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে কর্ম করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর কালেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করেন। কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে, গভর্নমেণ্ট, সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি মনোযোগ করেন না। একমাত্র জজ পণ্ডিতের পদ ছিল, তাহাও সম্প্রতি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এজন্য সংস্কৃত শিক্ষায় লোকের অনুরাগ হ্রাস হইতেছে, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইয়া যাইতেছে। অতএব গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের জন্য কিছু না করিলে চলিতেছে না। মহামতি লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবমতো ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে সমগ্র বঙ্গদেশে একশত একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (৪) করিয়া

৪ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত বাঙ্গালার ইতিহাস, ৭৭ পৃষ্ঠা।

সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যের ভারার্পণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে-সঙ্গে একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের গুরুত্ব ও পরিশ্রমের ভার বৃদ্ধি পাইল, আর এক দিকে সংস্কৃত কালেজের প্রবীণতর শিক্ষকমণ্ডলীর ঈর্ষার পাত্র ও অন্যান্য পণ্ডিত-গণের অপ্রিয় হইবার নানাপ্রকার কারণ উপস্থিত হইল। ঐ একশত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিযুক্ত করণের ভার মার্শেল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। ঈর্ষার কারণ এই যে, তাঁহার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ও অভিজ্ঞ শিক্ষক সকল সংস্কৃত কালেজে থাকিতে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই পরীক্ষা গ্রহণের ভার কেন দেওয়া হয়? অন্যান্য পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হইবার কারণ এই যে, তিনি আত্মপর নিরক্ষেপ হইয়া কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করিতেন। গুণানুসারে পদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলে, অনেককেই নিরাশ হইতে হয়। যাঁহারা সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কেবল তাঁহারাই কর্ম পাইতেন। সুতরাং অনেকে ব্যর্থকাম হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিন্দা রটনায় নিজ নিজ রসনাকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সাহেব ছাত্রগণকে দয়া করিবার প্রস্তাবে,কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়াছেন 'ওটি আমাকে দিয়ে হবে না', সেই বীর প্রকৃতি, ন্যায়পরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈর্ষাপ্রকাশে ও নিন্দা প্রচারে ভয় করিবেন কেন? লোকনিন্দার ভয়ে কর্তব্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকা, কিংবা অন্যায় জানিয়াও তাহার প্রশ্রয় দেওয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে বড়লাট হার্ডিঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয় এখনও কোনো কোনো স্থানে বিদ্যমান আছে এবং তাহা হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এ সকল ত হইল। এইরূপ নানাপ্রকারের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করা ও তৎসমুদায় যথারীতি সম্পন্ন করিতে যত্নবান থাকাই একজনের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অদ্ভুতকর্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। তিনি দৈনিক নানাপ্রকার অবশ্য সম্পাদ্য কার্যগুলি সম্পন্ন করিয়া তৎপরে দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে ও পীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতে, রণসজ্জায় সজ্জিত অশ্বারোহী নেপোলিয়নের ন্যায় দিবারাত্রি প্রস্তুত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার অস্ত্র সকল অন্যবিধ ছিল। সাগুদানা, মিছরি, বেদানা, কিসমিস্—বাহিরের অস্ত্র; আর স্নেহ-মমতা সেবা-শুশ্রূষা; ছুটাছুটি, ডাক্তার ডাকাডাকি—তাঁহার মনের অস্ত্র; এই উভয়বিধ আয়োজন তাঁহার নিত্য যুদ্ধের সম্বল ছিল, ইহাতেও তাঁহার পরিশ্রম, শক্তি-সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল না। এখনও বাকি আছে। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে সাহেবদিগকে বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত পড়াইতেন। সংস্কৃত পুঁথি রচনার প্রয়োজন নাই, যাহা আছে তাহা অনন্ত সমুদ্রবিশেষ

অনুসন্ধান করিয়া লইলে অনেক অমূল্য রত্ন সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু পড়াইবার মতো বাঙ্গালা পুস্তক সে সময়ে ছিল না। যাহা ছিল, দুই একখানি ভিন্ন প্রায় সমস্তই অপাঠ্য। ইহার উপর আবার একশত একটি 'হার্ডিঞ্জ-বঙ্গবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গালা পুস্তক রচনার চিন্তাও এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই সুবিস্তৃত মানস-রাজ্যে স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার প্রথম মানস-পুত্র বাসুদেব-চরিত সূতিকাগৃহেই অপহৃত হইয়াছিল, এ পর্যন্ত কেহ সে শিশুর মুখাবলোকন করে নাই। সম্প্রতি সেই অপহৃত সন্তানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়ে সংস্কৃত কালেজে ব্যাকরণের ১ম ও ২য় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। প্রথম পদের বেতন ছিল ৯০ টাকা। শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেব উক্ত পদে একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার জন্য মার্শেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে যান। পরামর্শে স্থির হইল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করা কর্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইল, তিনি উক্ত পদ গ্রহণে নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া মার্শেল সাহেবকে বলিলেন, 'মহাশয়! টাকার প্রত্যাশা করি না। আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি নূতন নূতন উপদেশ পাইব।' (৫) যুবক বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবীণ মার্শেল সাহেবের নিকট নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার প্রত্যাশা করিতেন এই কথাটা মন্দ নহে, কিন্তু 'আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব।' এরূপ আত্মসম্মান-শূন্য তোষামোদ-বাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে দিয়া সহোদর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার গৌরব হানি করিয়াছেন। যিনি বিদ্যালয়ে এক বৎসর পরীক্ষায় প্রথম হইতে না পারায় বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ইহার পর দুইবার কর্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি যে সহজে 'অনুগ্রহ প্রার্থী' হইবেন এবং 'অনুগ্রহ' লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, আমাদের অন্তর ইহাতে সায় দেয় না। তিনি হয়ত এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য মার্শেল সাহেবকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখনীর গুণে সেই কৃতজ্ঞতা কৃতার্থতায় পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ দুই পদের জন্য লোক নির্বাচন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনপ্রাপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সহজেই ৯০ টাকা বেতনের কর্ম গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া অন্য লোক আনিতে চাহিলেন। স্বার্থত্যাগের এরূপ উদার প্রস্তাবে মার্শেল সাহেব এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যান্য বন্ধুগণ যে

৫ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র প্রণীত জীবন চরিত, ৫৮ পৃষ্ঠা

আশ্চর্যান্বিত হইবেন ইহা বলাই বাহুল্য। মার্শেল সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত করিতে পারিলেন না, অগত্যা শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহাকে উক্ত পদপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র মনে কর?' বিদ্যাসাগর মহাশয়, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'ইনি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। প্রথম পদ তাঁহারই প্রাপ্য, আপনিই তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বলুন।' শুনা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাচস্পতি মহাশয়ের কর্মকাজের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় সে সময়ে কলিকাতা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে কালনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে দিন এই কথা হয়, সে দিন শনিবার, লোকের প্রয়োজন সোমবার। পত্র লিখিলে উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে। বাচস্পতি মহাশয় কর্মগ্রহণ করিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ দিবস রজনীযোগে এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কালনা যাত্রা করিলেন। সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া পর দিবস মধ্যাহ্নে কালনায় উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ ভাবে পদব্রজে এত পথ অতিক্রম করিয়া কালনায় আসিবার কারণ অবগত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের প্রশংসা-পত্রগুলি ও আবেদনপত্র লইয়া, সেই দিনই পূর্ববৎ পদব্রজে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। পথ চলিতে অসমর্থ সঙ্গীকে নৌকায় আসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ চলিতে বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন নিয়ত অক্ষুণ্ণ প্রীতির প্রস্রবণরূপে প্রতীয়মান হইত। পরদুঃখ কাতর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশস্ত হৃদয় নির্মলনীর সরোবরের ন্যায় ঢল ঢল করিত; পরদুঃখের তৃণকণা সে হৃদয়-সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তাহাতে কাতরতার উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যাইত, আবার তাঁহার মনের শক্তি ও সাহস তদনুরূপ প্রবল ছিল। এমন কোনো কর্তব্য ছিল না, যাহা করিতে তিনি ভীত হইতেন। বোধ হয় কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়া সর্বস্বান্ত হইতে আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ হৃদয় ও মনের অনুরূপ বলশালী দেহও তাঁহার ছিল। তাঁহার মনের সঙ্কল্প, তাঁহার প্রীতির বারিবিন্দু পাইয়া অঙ্কুরিত হইলে, তাহা যত বড় দুরূহ কার্য হউক না কেন, তাঁহার দেহ তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য ধারণ করিত এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার সুবিস্তৃত জীবন ক্ষেত্রে বহুল পরিমানে দৃষ্টিগোচর হইবে। এরূপ লোকবিরল পরোপকার সাধন, এই অধঃপতিত বঙ্গদেশে কেবল মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব। প্রায় দ্বিগুণ অর্থোপার্জনের সুযোগ পাইয়া তাহা গ্রহণ না করা এবং সেই কর্ম অন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিবার জন্য প্রস্তাব,

করা, তৎপরে দিবারাত্রি পথ চলিয়া ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ব্যক্তিকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া, সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই একটি ঘটনাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের উচ্চতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার পূর্ণ পরিচায়ক। এইরূপ বিবিধবিষয়ক অসংখ্য ঘটনাবলীর সমাবেশে বিদ্যাসাগর-চরিত এক অমূল্য রত্নখনিতে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার অসাধারণ গুনপনায়, তাঁহার অমানুষিক ক্রিয়াকলাপে তাঁহাকে আমাদের স্বজাতীয় জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। উচ্চভাবও উচ্চচিন্তা সর্বদাই তাহার মানস রাজ্যে বিচরণ করিত। পবিত্র সদনুষ্ঠান-স্রোতে তাঁহার হৃদয় নিয়ত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত, তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নিয়ত কোনো অজ্ঞাত উচ্চ লোকে বাস করিতেন।

ইহার পর ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের পদ এবং পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় নানাস্থানের বড় বড় সুপারিশওয়ালা আবেদনকারীর সংখ্যা নিতান্ত অধিক হইয়া পড়িল দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরীক্ষা দ্বারা লোক নির্বাচন করিতে বলিলেন। ময়েট সাহেব তাহাই করিলেন। পরীক্ষায় তাহারই অভীষ্ট সিদ্ধি হইল। পদপ্রার্থীগণের মধ্যে ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্রমান্বয়ে উক্ত দুই পদে ৫০ ও ৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারই দুইজন বন্ধু সংস্কৃত কালেজে শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃমাতৃবৎসল ছিলেন। তাঁহার পিতৃপূজার সূচনা আমরা ইতিপূর্বে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উল্লেখ করিয়াছি, একটি অদ্ভুত ঘটনায় তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠক! এক্ষণে একবার স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। দেখিবে তাঁহার লোকসেবা যেমন লোক-বিরল ব্যাপার, তাঁহার বন্ধুসেবার অন্তরালে দুর্লভ মিত্রতার সৌম্যমূর্তি যেমন চির অঙ্কিত রহিয়াছে, পিতৃপূজায় তাঁহার পিতৃদেব যেমন চিরসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহার পাগলিনী মাও তাঁহার প্রতি যে কারণে চিরপ্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে তাহার একটু আভাস উপহার দিতেছি। যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাটী যাইতে আদেশ করিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিলেন। কিন্তু সে সময়ে এত বেশী কাজ যে, বিশৃঙ্খলাভয়ে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না; সুতরাং তাহার আর বাটি যাওয়া হইল না। কলিকাতার বাসার সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল তিনিই আছেন। সহোদরের বিবাহ, জননী গৃহে যাইতে বলিয়াছেন, তিনি ছুটি

পাইলেন না, জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া, মনে দারুণ ক্লেশের সঞ্চার হইল। বর্ষার ঘন মেঘাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশও গভীর বিষাদ মেঘে আবৃত হইল! অন্তর্দাহ ও উৎকণ্ঠা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি অনিদ্রায় বহুকষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাতঃকালে মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'আমার মা আমাকে বাড়ি যাইতে বলিয়াছেন, আমাকে বাড়ি যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ি যাইব।' সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি তুমি বাড়ি যাও।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষা-সমাগমে পথ অতি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহুকষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্লেশে কতদূর অগ্রসর হইয়া সে দিন দামোদরের পূর্বপারেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। পরদিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহাকে বাড়ি যাইতে বলিলেন। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর আদেশমতো বাড়ি গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন যে কোন উপায়ে হউক বাটি পৌঁছিতেই হইবে। সেইদিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ি না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়ণায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণকলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। পূর্ণকলেবর দামোদর, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, নৃত্য করিতে করিতে তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে, নৌকা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলে, সেদিন আর গৃহে যাওয়া হয় না। কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন, পাঠক! শুনিতে চাও? ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে, উপন্যাসে কবিকল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব, কিন্তু সত্য সত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, বিদ্যাসাগর মহাশয় আবদারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা-দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন! যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল। কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোনো বাধাই মানিলেন না; সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পরপারে উঠিলেন। যাহারা তাহার আয়োজন দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া মনে করিতেছিল, তাঁহার শমন-সদন সন্নিকট ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার সাহস ও শক্তি-

সামর্থ দেখিয়া বিস্মিত হইল ও শত প্রকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল। পথে, পাতুলে জননীর মাতুলালয়ে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। অপরাহ্নে দারকেশ্বর নদও পূর্ববৎ পার হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। যেখানে সন্ধ্যা হইল, সেখানে আরও দস্যুভয়। সুবিধামতো কোনো পথিককে একাকী পাইলে প্রায় গৃহে ফিরতে দেয় না! ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে পৌঁছিলেন। সেই সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া, 'মা—মা, আমি আসিয়াছি' বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। বর ও বরযাত্রী চলিয়া গিয়াছে, জননী এক ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মর্মাহত হইয়া অনাহারে রোদন করিতেছিলেন। পুত্রের গলার শব্দ পাইয়া জননী অশ্রু মোচন করিতে করিতে দ্বার খুলিয়া পুত্রের নিকট আসিলেন। তখন মা ও ছেলেতে ক্ষণকাল একত্র ক্রন্দন করিয়া শেষে নানা প্রকার সুখ দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে দুজনে আহার করিতে বসিলেন, পিতামাতার প্রতি সন্তানের এতাদৃশ অনুরাগ ও ভক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। জননীর আদেশ পালন করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহেন, এরূপ অকৃত্রিম ভক্তির স্বর্গীয় চিত্র, এরূপ পিতৃমাতৃ পূজার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত পৌরাণিক অখ্যায়িকা-বলীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। দূরদর্শী বাঙ্গালী এরূপ ঘটনাকে বাতুলতা বলিয়া মনে করে। পিতামাতাতে ভক্তিশূন্য হইয়াই এ জাতি অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গসন্তান! বিদ্যাসাগর চরণে বসিয়া পিতৃমাতৃ পূজা শিক্ষা কর। এমন জীবন্ত সদ্দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাইবে না।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে যে সকল সাহেব দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে সিটনকার, কস্ট, চ্যাপম্যান, গ্রে গ্র্যাণ্ট, হ্যালিডে, বিডন, লর্ড ব্রাউন, ইডেন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সিভিলিয়ানগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও সম্মান করিতেন। রবার্ট কস্ট নামে একজন সিভিলিয়ান ছাত্র এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে পড়িতেন। তিনি অবসর পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট থাকিতে ও তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা-বৃদ্ধি হইলে পর, কস্ট সাহেব একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, 'আপনি আমার নামে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দিলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকালের জন্য সাহেবকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তখনই নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন ঃ

শ্রীমান্ রবার্টকস্টোহদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ ।। ১।।

স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী ॥২॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় মুহূর্ত মধ্যে ঐ দুটি শ্লোক রচনা করিয়া সাহেবকে দিলেন। তিনি শ্লোক ও শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টহইলেন এবং দুইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে টাকা নিজে না লইয়া, সংস্কৃত কালেজের যে ছাত্র রচনায় সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সাহেবকে ঐ টাকা কালেজের অধ্যক্ষের নিকট জমা রাখিতে বলিলেন। সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শমতো কার্য করিলেন। তদনুসারে চারি বৎসরকাল সংস্কৃত রচনার পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট বালক পঞ্চাশ টাকা করিয়া কস্ট সাহেবপ্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছে। যেখানে যে কোনো প্রকার সদুপায়ে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হউক না কেন, অর্থের পরিমাণ যতই হউক না কেন, তাহাতে দরিদ্র বিদ্যাসাগরের মন টলিত না। প্রায় অন্য লোকের সে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিতেন। এই জন্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান করিতেন। এই বর্তমান বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক-মণ্ডলীর সমক্ষে নির্লোভ বিদ্যাসাগরচরিত্র মহামূল্য আদর্শ!

উপরোক্ত কস্ট-প্রদত্ত-বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বৎসরে বিদ্যাসাগব মহাশয়ের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হন। রচনা দুই জনেরই সমান সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রের ব্যাকরণ ভুল ছিল, দীনবন্ধুর তাহাও ছিল না। দীনবন্ধুর দুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ ও পুরস্কার দানের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। দীনবন্ধু সর্বপ্রকারে সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও পুরস্কার পাইলেন না। প্রবল কারণ এই যে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর, তিনি পুরস্কার পাইলে, পাছে লোকে বলে দুজনেই সমান হইল, তবে শ্রীশচন্দ্র না পাইয়া দীনবন্ধু কেন পাইবে? ইহাও এক প্রকার বিচার-বিভ্রাট সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিচার বিভ্রাটে নিঃস্বার্থভাব, ন্যায়ানুষ্ঠান ও মনুষ্যত্বের ভাব অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারে শ্রীশচন্দ্রই পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া নির্ধারিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, দীনবন্ধুকে পুরস্কার দিলে পাছে অজ্ঞাতসারেও স্বার্থপরতা দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে, পাছে স্নেহানুরোধের অধীন হইয়া তিনি দীনবন্ধুর প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ দেখান, ইহাই তাঁহার বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল। স্বার্থে ও পরার্থে সংগ্রাম হইলে, সাধু ব্যক্তি সর্বদাই পরার্থের পক্ষপাতী হইয়া আপনার ক্ষতি করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই শ্রেণীর সাধু মাহাত্মা ছিলেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কস্ট সাহেব পাঞ্জাব প্রদেশে কর্ম করিতে যান।

বেশ সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া শেষে স্বদেশে ফিরিবার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কলিকাতায় আগমন করেন, সাক্ষাৎকালে কষ্ট সাহেব তাহাকে বলিলেন, 'যদি আপনার পূর্বের ন্যায় কবিতা রচনার অভ্যাস থাকে, তবে আমার বিষয়ে আর কয়েকটা কবিতা রচনা করিয়া দিলে আমি বিশেষ সুখী হইব।' সাহেবের অনুরোধে ক্রমান্বয়ে সুললিত ভাবময় অতি সুন্দর পাঁচটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। নিজে ইচ্ছা করিয়াও তিনি কখন কখন কবিতা রচনা করিতেন। গদ্যপদ্য উভয় রচনাতেই তাঁহার শক্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি দেশ ভ্রমন, সন্তোষ, ক্রোধ, মেঘ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পৌরাণিক নামানুসারে শাল্মলীদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাকদ্বীপ প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য মতে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আফ্রিকা ও এশিয়া দেশ সম্বন্ধে ৪০৮টি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, তিনি সে সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অসাবধানতা বশতঃ সে সকল কবিতা হারাইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা সন ১২৯৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জন মিয়র নামক একজন সিভিলিয়ানের প্রস্তাবে পুরাণ ও সূর্যসিদ্ধান্তের নির্দেশমতে এবং পাশ্চাত্য গণনানুযায়ী ভূগোল খগোল প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া একশত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই সকল কবিতাতে তাঁহার রচনাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পরলোক গমনে সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষা সমিতির কর্তা ডাক্তার ময়েট সাহেব উক্ত শূন্যপদে একজন যোগ্যতর লোক নিযুক্ত করিবার মানসে মার্শেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে যান। তিনি বলিলেন ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন এবং কালেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, এরূপ একটি লোকের প্রয়োজন। পরামর্শে স্থির হইল যে, ঐ পদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু মার্শেল সাহেবকে বলিলেন, যদি সেখানে কর্মকাজে মতান্তর হয়, কিম্বা কোনো প্রকার কথান্তর ঘটে, তাহা হইলে আমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া চাকরি করিতে পারিব না; সেরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে আমাকে কর্মত্যাগ করিতে হইবে। আমি আমার জন্য ভাবি না। আমি কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে পাছে আমার পিতার কোনো প্রকার অসুবিধা হয়, এই ভাবনায় আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছি।

আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুও অতি পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে আপনি যদি আমার এই কর্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে পারি।' মার্শেল সাহেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উক্ত পদে পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

আমরা আজকাল যে সংস্কৃত কালেজ দেখিতেছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের পূর্বে ইহা এরূপ ছিল না। তখন পল্লী-গ্রামের অধ্যাপকগণের প্রতিষ্ঠিত টোলের ন্যায় প্রায় এক প্রকার বে-বন্দোবস্তী আমল ছিল। সে কালে অধ্যাপক মহাশয়গণের সকলে না হউন, অনেকে চেয়ারে বসিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন, আর তাঁহাদের বালক-শিষ্যগণ তালবৃন্তের দ্বারা ব্যজন করিয়া তাঁহাদের সুষুপ্তিজনিত তৃপ্তি বৃদ্ধি করিতেনিযুক্ত থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়েরা অনেক সময়ে নিদ্রা সুখ সম্ভোগান্তে অপরাহ্ণে ছাত্রগণকে পড়াইতেন। পূর্বে সময়ের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে কে কখন আসিত, কে কখন যাইত, তাহার কোনোরূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন যাঁহার ইচ্ছা হইত তিনি তখন আসিতেন, যখন যাঁহার যাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি তখন চলিয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কালেজের কার্যভার গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে অধ্যাপক মহাশয়ের নিদ্রা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের যাওয়া-আসার সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন। পূর্বে যে কোনো বালক ইচ্ছা করিবামাত্র, যে কোনো সময়ে, কালেজের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত। তিনি কাষ্ঠখোদিত পাস লইয়া বাহিরে যাইবার নিয়ম প্রবর্তিত করেন। পূর্বে যাহার যাহা ইচ্ছা করিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলে সকলেই সেক্রেটারীর অনুমতি লইয়া কাজ করিতে হইত। মোট কথা সংস্কৃত কালেজে তাঁহার সহকারী সম্পাদকরূপে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার স্বেচ্ছাচারিতার স্থানে বিধিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। তবুও কিছু-কিছু অবশিষ্ট রহিল। পরীক্ষাগ্রহণবিষয়েও তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সে বৎসর অধিকতর সন্তোষজনক ফললাভ হওয়াতে সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেব বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবেচনায় যে সকল কবিতা অশ্লীল বোধ হইয়াছিল, পাঠ্য পুস্তক হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া দিয়া-ছিলেন। ব্যাকরণ পাঠে পূর্বে বহু সময় ব্যয় হইত ও শিক্ষার জটিলতাও নিতান্ত কম ছিল না। তিনি অল্প সময়ে সরলভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাঁহার চেষ্টা ও আকিঞ্চনে ব্যাকরণ শিক্ষা বালকগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সাহিত্য শ্রেণীর বালকগণের অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফল কথা, তিনি দিন-দিন নূতন-নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন দ্বারা সংস্কৃত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হইয়া-

ছিলেন, এবং তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মাবলী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সকল অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

এই সময়ে এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ কার্যোপলক্ষে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব বোধ হয়, বাঙ্গালীর প্রতি তত অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন না। অধ্যক্ষ কার সাহেব টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া অর্ধশয়নাবস্থায় চেয়ারে বসিয়া সমাগত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিনা অভ্যর্থনায় দাঁড় করাইয়া রাখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপভাবে অপমানিত হইয়াও স্বকার্য সাধন করিয়া নীরবে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তিনি কার সাহেবের এই অভদ্র ব্যবহার ও অসম্মান প্রদর্শনের কথা সহজে বিস্মৃত হইলেন না। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই অধ্যক্ষ কার সাহেবকে সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কার্যোপলক্ষে আসিতে হইল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবের অভদ্রোচিত ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইলেন। কার সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সুবঙ্কিম চটুরাজ পরিশোভিত সুশ্যাম চরণদ্বয় টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া, সাহেবের ন্যায় চেয়ারে হেলান দিয়া অর্ধশয়নাবস্থায় অবস্থিত হইয়া, সাহেবকে গৃহ মধ্যে আসিতে বলিলেন। বসিবার আর দ্বিতীয় আসন নাই। সাহেব গৃহে প্রবেশ করিয়া তদবস্থাপন্ন বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া, অপমানিত মনে করিয়া কুপিত হন। বহুকষ্টে আপনার কার্য শেষ করিয়া সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অশিষ্ট ব্যবহারের বিষয় কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেবের গোচর করেন।

ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ত তলব করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কৈফিয়ত দিয়াছিলেন, তাহা একদা প্রসঙ্গক্রমে আমাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা অতীব আমোদজনক। তিনি কৈফিয়তে বলিয়াছিলেন 'আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরা অসভ্য, সুসভ্য ইংরাজীমতে লোকের অভ্যর্থনা করিতে হইলে, বুঝি ঐরূপই করিতে হয়। আমি হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের নিকট ঐরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং অবসর পাইয়া সাহেবের প্রতি সে সম্মান দেখাইতে কৃপণতা করি নাই। এটি যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, তবে এরূপ ব্যবহারের শিক্ষাদাতা কার সাহেবই সে জন্য দায়ী। ঐ ঘটনায় আমার বিন্দুমাত্র দোষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।' শিক্ষাসমিতির কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মসম্মান-বোধ ও তেজস্বিতা সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই গোলযোগ মিটাইবার জন্য কার সাহেবকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে অধ্যক্ষ কার সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোষে মকদ্দমা মিটাইয়া লন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই স্বাধীনচিত্ততাই

তাঁহাকে সর্বত্র জয়ী করিয়াছেন। তাঁহার নির্ভীক হৃদয় কোথাও কখন কোনো কারণে নত হইত না।

এই সময়ে সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কালেজের সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। উক্ত পদের অধিক বেতন হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে আর কোনো প্রকার সুযোগ পাইবেন না, এই আশঙ্কায় উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন; কিন্তু উক্ত পদে যাহাতে একজন সুযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন, সে বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছিলেন। ৺মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয় যাহাতে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন। সর্বানন্দ বিদ্যাবাগীশ নামে একজন অধ্যাপক সে সময়ে প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতেছিলেন। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, উক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শেষদশায় স্থায়ীরূপে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার অসম্মতির প্রধান কারণ এই যে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয় অধিকাংশ সময় চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা যাইতেন। বহুবার নস্য গ্রহণ করিয়াও তাঁহার নিদ্রানিমীলিত চক্ষু পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইত না। সুতরাং তাঁহার অধ্যাপনায় বালকগণের শিক্ষালাভের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ৺মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়কে তিনি সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপকের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিতেন। এই দুই কারণে তিনি উক্ত শূন্য পদে ৺মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয় যাহাতে নিযুক্ত হন, সে বিষয়ে ময়েট সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া কর্তৃপক্ষ ৺মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়কেই উক্তপদে নিযুক্ত করিলেন। ৺মদনমোহন তখন কৃষ্ণনগর কালেজে ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।। তাঁহার আসিতে যে কয়েক দিন বিলম্ব হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে সে কয়দিন পড়াইবার ভার লইয়াছিলেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকের ৭২ পৃষ্টায় বলিতেছেন যে মদনমোহন কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ও পাঠ্য বিষয়ের যে-যে স্থানে সন্দেহ ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে তাহা ভঞ্জন করিয়া তবে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৬)

৬ এই সময়ে তর্কালংকার মহাশয়ের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিশেষভাবে কি করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্বেও সুযোগমতো কিছু-কিছু করিয়াছিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, পণ্ডিত সমাজের সম্মানিত সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ. মহাশয় প্রণীত তর্কালংকার-জীবনীতে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবংবিধ সাহায্যদানের

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থে কলিকাতায় আনীত হয়। সে বালক সহোদরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া জ্যেষ্ঠের সমধিক স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময়ে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন যে, হরচন্দ্রকে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখাইয়া স্বদেশের নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে ও পরোপকারে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহার আশা ছিল, হরচন্দ্রকে দেশে রাখিয়া দরিদ্র বালকগণের সুশিক্ষালাভের ও শাস্ত্রচর্চার উপযোগী টোল করিয়া দিবেন। কিন্তু দারুণ কালের তীক্ষ্ণধার কুঠারাঘাতে তাঁহার সে সদনুষ্ঠানের শুভসঙ্কল্প অকালে ভূতলশায়ী হইল। হরচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে, বিসূচিকারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার অকাল মৃত্যুতে ভ্রাতৃবৎসল বিদ্যাসাগর বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহাকে এত অধীর করিয়াছিল যে, কয়েক মাস লেখাপড়া ও শাস্ত্র-চর্চা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। যথারীতি আহারাদি করিতেন না। রজনীতে সুনিদ্রা হইত না। শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অধিকাংশ সময় একাকী রোদনে কালাতিপাত করিতেন। এই দুর্ঘটনার পর জননী আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিয়ত রোদন করিতেন শুনিয়া, তাহার সান্ত্বনার জন্য সহোদরগুলিকে কিছুদিনের জন্য বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কয়েকমাসের বিদায় লইয়া অন্যান্য সহোদরগুলিকে লইয়া জননী সদনে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে কিছুকাল চলিয়া যায়, শোকের তীব্রতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরগুলিকে পুনরায় কলিকাতায় আনিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, সংস্কৃত কালেজের কার্য-প্রণালী লইয়া সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের সহিত তাঁহার বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছিল। স্বকীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইল দেখিয়া স্বাধীনচেতা ও পুরুষপ্রকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষা-সমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব এত অনুরোধ করিলেন, এত বুঝাইলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পণ আর ভাঙ্গিল না। তিনি সেই যে বিমুখ হইলেন, আর কিছুতেই পরিত্যক্ত পদ গ্রহণে সম্মতি হইলেন না। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন অনেক বুঝাইলেন, কেহ-কেহ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'চাকরি ছাড়িয়া দিলে খাবে কি?'' নির্ভীক বীরপুরুষ তীব্র কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, 'কেন, আলু পটল বেচিব, মুদির দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে

---

কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সুমার্জিত ও সুললিত লেখনীর অযথা পরিচালনার দ্বারা পরলোকগত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হৃদয়ের সদ্ভাব ও মিত্রতার চিত্রঅংকনে অত্যধিক নিষ্ঠুরা-চরণ করিয়াছেন লিপিকার্পণ্যে উদারতা লুক্কায়িত হইয়াছে।

চাই না।' স্বাধীনচিত্ততার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় না। লোকের অধীন হইয়া চলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কাহারও তাঁবেদারি করা, কাহারও মুখাপেক্ষা করা, কাহারও কৃপা-দৃষ্টি লাভাকাঙ্ক্ষা মনে-মনে পোষণ করা, তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি মুক্তভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য, এই স্বর্গীয় উচ্চ আদর্শ আমাদিগকে দেখাইবার জন্য আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, এক দিনের জন্য তিনি চিন্তিত বা বিষণ্ণ হন নাই। সর্বদায় প্রসন্নভাবে কালাতিপাত করিতেন। বাসায় যে সকল অনাথ ছাত্র আহার করিত, তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিয়া দেন নাই। বাটীতে গিয়া সকলের সহিত, পূর্বের ন্যায় বেশ সদ্ভাবে ও নিশ্চিন্তভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে কোনো প্রকার বিষাদের ভাব দেখা যায় নাই। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু যে বেতন পাইতেন, তাহাতে কলিকাতার বাসাখরচ চালাইয়া প্রতি মাসে ৫০ টাকা ঋণ করিয়া গৃহে পিতার নিকট পাঠাইতেন। এইভাবে কিছুকাল কাটিল। এই অবসরকালে গ্রন্থ প্রণয়নের দিকে আরও অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই অবসর সময়ে কয়েক মাস ময়েট সাহেবের অনুরোধে, কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামক একজন ইংরাজকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাহেবের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, সাহেব পঞ্চাশ টাকার হিসাবে কয়েক মাসের বেতন এককালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেন। কিন্তু এরূপ অনটনের অবস্থায়ও নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর, সাহেব প্রদত্ত বেতন গ্রহণ করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আপনি ময়েট সাহেবের পরম বন্ধু, তিনি আমারও পরম আত্মীয়, আমি বন্ধুর অনুরোধে আপনাকে পড়াইতে আসিয়া টাকা লইব কিরূপে?' বর্তমান সময়ে একদিকে ব্রাহ্মণ বংশের যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, অপরদিকে অর্থলালসা যেরূপ প্রবলভাবে লোকের মনের উপর রাজত্ব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে এরূপ ত্যাগ স্বীকারের কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কলিকাতার বাসায় প্রতিদিন দুই বেলায় প্রায় ৬০।৭০ খানি পাত পড়িত। প্রতি মাসে ঋণ করিয়া পিতাকে ৫০ টাকা করিয়া পাঠাইতেন; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত অভাবের ভিতর পড়িয়াও সাহেবের প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিলেন না। সে সময়ে ৩০০।৪০০ শত টাকায় তাঁহার বিস্তর আনুকূল্য হইত, এবং এই টাকা গ্রহণ করিতে, সামান্য শিষ্টাচারের অভাব ভিন্ন, অন্য কোনো দোষে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইত না; তবুও বিপন্ন বিদ্যাসাগর লোভের সুমিষ্ট প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও মনের দৃঢ়তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কর্ম পরিত্যাগ করার পর ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনো কাজকর্ম করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু তালতলা নিবাসী

৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড্ রাইটারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম করিতে করিতে মেডিকেল কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি ঐ বৎসর ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করায়, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের উক্তপদ শূন্য হয়। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টাতেই দুর্গাচরণবাবু উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মার্শেল সাহেবের নিরতিশয় আকিঞ্চন ও অনুরোধের বশবর্তী হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ৮০ টাকা বেতনের উক্ত পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন উক্ত পদে থাকিতে হয় নাই। সংস্কৃত কালেজের যে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই পদ শূন্য হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় দুরারোগ্য উদরাময় পীড়ার প্রকোপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন! (৭) ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়; ভারতবন্ধু বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং কোনো প্রকারে তাহার হিতসাধন করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার পরম বন্ধু বেথুনের সাহায্যে উক্ত জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫০ খৃস্টাব্দের শেষভাগে তথায় গমন করেন। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগে সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত শূন্য পদ গ্রহণ করিতে বলায়, প্রথমে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাকে পুনরায় সংস্কৃত কালেজে আনিবার জন্য, কর্তৃপক্ষীয়ের অত্যধিক আকিঞ্চন দেখিয়া, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ ও তৎপরে কি সূত্রে সেখানকার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন, প্রসঙ্গক্রমে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামক গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কথাগুলি উদ্ধৃত করাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়, তিনি বলিতেন ঃ

তিনি (৮) ১৮ পৃষ্ঠায় (৯) লিখিতেছেন ঃ

সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন।'

'তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায় বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

---

৭ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ. প্রণীত তর্কালঙ্কার জীবনী ১৯ পৃষ্ঠা।

৮ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ.

৯ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত, ১৮ পৃষ্ঠা।

এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।'

'গ্রন্থকর্তার কল্পনা শক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইংরাজী ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েন; ইংরাজী ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগ সময়েও তিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান সময়েও তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ তর্কালঙ্কার যতদিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, একদিনের জন্যও ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষর পদ শূন্য হওয়াতে বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার ঔদার্যগুণের আতিশয্য বশতঃ আমাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা যোগেন্দ্রবাবুই বলিতে পারেন।'

'আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুর্শিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত ডাক্তার ময়েট আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। (১০)

'আমি নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমত অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম যদি শিক্ষা-সমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমিই রিপোর্ট

১০ এই সময়ে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটার নিযুক্ত ছিলাম।

সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্য সেক্রেটারি ও এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রোহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল।'

'১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।'

'যোগেন্দ্রবাবুর গল্পটির মধ্যে "জনশ্রুতি যদি সত্য হয়" এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা বহুকাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা কোনওরূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ জনশ্রুতি কর্ণগোচর করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি কোনওসূত্রে যোগেন্দ্রবাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে অনায়াসে তাঁহার সংশয় ছেদন করিতে পারিত! কারন, আমার নিয়োগ বৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ-সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্রবাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয় তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন।

'যদি সবিশেষ জানিয়া যথার্থ ঘটনা নির্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।'

'ইংরাজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। (১১) আমি বিশিষ্ট হেতু বশতঃ অধ্যাপকের পদ গ্রহনে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করি। (১২) তদনুসারে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত যোগেন্দ্রবাবুর কল্পিত গল্পটির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।'

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা।

১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩০।

---

১১ এই সময়ে আমি সংস্কৃত কালেজে এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত ছিলাম।

১২ এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ কথাগুলির প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন হইলেও ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস (দে) মহাশয়কে বন্ধুবিচ্ছেদজনিত শোকে অভিভূত হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করিব ঃ

'ভ্রাতঃ! ক্রমশ পদোন্নতি ও ডেপুটী মাজেস্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলই বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে। অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন, তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই ঃ আমার এখনই ইহাতে ইস্তফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত; শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব; আমি এই সার্ভিভবনে আসিয়া অবধি যেন মহা সাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্তিহীনচিত্তে কর্ম-কাজ করিতেছি। অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা-মুণ্ডু জানাইব, আমার বাল্যসহচর একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই। আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এইজন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মরক্ষায় চিরদিনই সক্ষম ছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুই নাই, কেবল দুঃখ এই যে, 'এরূপ শুনিতে পাই' ও 'এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়' ভিন্ন অন্য কোনো বিশিষ্টরূপ প্রমাণ না পাইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন যে এমন একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিলেন, ইহাই আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত।

যাহা হউক ১৮৫১ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে ১৫০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষের নূতন পদের সৃষ্টি হইল। এক্ষণে তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষরূপে ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের সুযোগ পাইয়া কি-কি কার্য করিলেন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

এই পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুবিস্তৃত হৃদয়ে গভীর দায়িত্ব-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে. সংস্কৃত কালেজের ও সমগ্র শিক্ষা বিভাগের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়, সেই গুরুতর প্রশ্নের বিশদ মীমাংসার জন্য নিজের সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধির নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং শয়নে, স্বপনে, স্বজনে ও নির্জনে সর্বদা এই একই চিন্তা তাঁহার মনের উপর রাজত্ব করিত। উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে অতি আবশ্যকীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তকগুলির কলেবর পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের আমলের হস্তলিখিত পলিত-গলিত পুঁথিগুলি প্রায় দেহত্যাগ করিতেছিল, তিনি সর্বাগ্রে তাহার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করাইয়া শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ও অধ্যয়নকারী সমভাবে তাঁহার এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দর্শন-শাস্ত্রের পুঁথিগুলিও পুনর্মুদ্রিত করাইয়াছিলেন।

শিক্ষকমণ্ডলী অধিকাংশই তাঁহার শিক্ষক। এই জন্য তিনি সর্বদাই একটু কুণ্ঠিত থাকিতেন, সম্মুখে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। কালেজের শিক্ষকগণ যাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হন, সে বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন বহু চিন্তা করিয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময় সংস্কৃত কালেজের উপর তালায় বাস করিতেন। সাড়ে-দশটার পর হইতে একটু দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। যখনই দেখিতেন, কেহ বিলম্বে আসিতেছেন, অমনি সত্বরপদে বিদ্যাসাগর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সমাগত অধ্যাপককে বলিতেন, 'এই এলেন নাকি?' সপ্তাহকাল এইরূপ করিতে না করিতে সকল শিক্ষকই যথাসময়ে আসিতে আরম্ভ করিলেন। (১৩) ক্রমে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হওয়া এক প্রকার প্রচলিত হইয়া গেল। কেবল অধ্যাপক ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে 'এই এলেন নাকি' একথাও বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি আবার সকলের অপেক্ষা অধিক বিলম্বে আসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুর আগমন প্রতীক্ষায় কালেজের দ্বারদেশে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ক্রমাগত এইরূপ করায়, বৃদ্ধ শিক্ষক একদিন মার্তণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া ছাত্র-অধ্যক্ষকে বলিলেন, 'তুমি যে কিছু বল না, এতেই সর্বনাশ করিলে। কথা কহিলে একটা জবাব দিতে পারিতাম, কি জন্য দেরি হয় তাও বলিতে পারিতাম, এমন করে জব্দ করিলে আর উপায় কি? আচ্ছা, মরি আর বাঁচি, কাল হইতে ঠিক সময়ে আসিব।' (১৪) তৎপূর্বে অধ্যাপকগণের আসিবার সময়ের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি ছিল না।

তিনি সহসা এক মহা আন্দোলনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। সংস্কৃত কালেজের সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সন্তানেরা শিক্ষালাভ করিত, বৈদ্যেরা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন অপর সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিকেই দেওয়া যাইবে। কলিকাতা ও অন্য নানা স্থানের অধ্যাপকমণ্ডলী এই প্রস্তাবে ধর্মলোপের আশঙ্কা করিয়া দেবভাষা সংস্কৃতের চর্চায় সকলকে অধিকার দিতে অসম্মত হইলেন এবং প্রাণপণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধপক্ষ প্রবল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা ধরিতেন, তাহাই করিতেন। সে কার্য বাধা পাইলে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বন্যার জলের ন্যায়, বাত্যাতাড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়ের

---

১৩ বর্ধমাননিবাসী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগত বন্ধু ডাক্তার ৺গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

১৪ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসর্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তর্কপঞ্চানন বিষয়ক ঘটনাটি শুনিয়াছি।

আবেগ ও মনের উৎসাহ শতগুণে উথলিয়া উঠিত। বিরোধী অধ্যাপকমণ্ডলীকে তিনি এ কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যদি শূদ্রের সংস্কৃত চর্চার অধিকার না থাকে, তবে সর্বজন সমাদৃত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়া সংস্কৃত চর্চায় কিরূপে অধিকারী হইলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীই বা সে প্রকার অনধিকারীর শাস্ত্রালোচনার প্রতিরোধ করেন নাই কেন? তিনি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের পোষকতা করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, আপনারা (বিরোধী অধ্যাপকমণ্ডলী) যদি শূদ্রাদি নীচজাতীয় ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে এতই অসম্মত, তবে কোন্ ধর্মবুদ্ধি অনুসারে আপনারা বেতন লইয়া সাহেবদিগকে সংস্কৃত পড়াইয়া থাকেন? এবংবিধ নানা প্রকার প্রবল যুক্তিযোগে বিদ্যাসাগর মহাশয় একাকী হইয়াও শত জনের বলবিক্রম দেখাইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি সংস্কৃত কালেজে অন্য জাতি সকলের প্রবেশ লাভ ও শিক্ষাপ্রাপ্তির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শিক্ষাবিস্তার ও লোকের জ্ঞানবুদ্ধির পরম বন্ধু ছিলেন। এই এক ঘটনাই তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রমানস্থল।

১২৫৬ সালের ৩০শে কার্তিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম সন্তান পুত্র নারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পত্নীর সন্তান সম্ভাবনার কাল অতীত হয়য়ায় সকলে চিন্তিত হইয়া পড়েন। নারায়ণের ঔষধ সেবনে সন্তান হওরায় পুত্রের নারায়ণচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রমান্বয়ে চারিটি কন্যা হইয়াছে।

ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদর হরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইবার মানসে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। সে বালক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন দুর্ভাগ্যবশতঃ কুক্ষণে অপর সহোদর হরিশচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইবার মানসে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, সে বালকও পূর্ববৎ অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃবিয়োগ শোকে ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সর্বদায় অতি বিষন্নভাবে কালাতিপাত করিতেন, একদিকে কালেজের সমগ্র দায়িত্বভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন করিতে তিনি সদা প্রস্তুত; সেই সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে এরূপ স্নেহের আধার কনিষ্ঠ সহোদরগুলি এক একটি করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে তাঁহার মানসিকশক্তি ও প্রকৃতিগত সহিষ্ণুতা ক্ষীণ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? কর্ম-কাজের অত্যধিক ব্যস্ততা ও এবংবিধ মানসিক অশান্তির মধ্যে পড়িয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তাঁহার সুকঠিন শিরঃপীড়ার সূচনা হইল। এই পীড়ায় তিনি অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বহুকালব্যাপী সুচিকিৎসায়ও তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রকোপের হ্রাস

হইল বটে, কিন্তু একেবারে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। যখনই বহু শ্রমসাধ্য কার্যে দীর্ঘকালের জন্য ব্যাপৃত হইতেন, তখনই সে রোগ-বহ্নি অল্পে অল্পে দেখা দিত। এবার ভাইগুলিকে বাড়ি না পাঠাইয়া পুত্রশোকদগ্ধা জননীকে কলিকাতায় নিজের নিকট আনিয়া রাখিলেন। অনেক সময়ে মা ও ছেলেতে একত্র হইয়া রোদন করিতেন। জননী নিজহস্তে রন্ধনাদি করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন এজন্য এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন এবং জননীর সান্ত্বনা বিধানার্থে বহু অর্থব্যয়ে বিবিধ আয়োজন করিয়া মায়ের রন্ধন ও পরিবেশনে সকলকে আহার করাইতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, যখন জননীর শোকের তীব্রতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, তখন জননীকে পুনরায় দেশে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিনই পিতামাতা, সহোদর সহোদরা ও আত্মীয় কুটুম্বের সেবা শুশ্রূষায় সুখানুভব করিতেন, তাই এই সকল প্রকার বিপদে আপনাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিতেন।

এতাবৎকাল সংস্কৃত কালেজের ছাত্রবৃন্দের বেতন লাগিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নূতন প্রবেশার্থিগণের পক্ষে বেতনের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবমতো নূতন প্রবেশার্থীর বেতন ধার্য হয়। কেহ কেহ এই কার্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ করিয়াছেন। সেইরূপ কটাক্ষপাতের নিষেধার্থে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে, অসমর্থ ছাত্রগণের সুবিধার্থে নিয়ম করা হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক দরিদ্র বালক বিনাবেতনে বিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে এবং সে নিয়ম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। আর কটাক্ষকারী উদারচেতা ও দরিদ্র-বন্ধু মহাত্মাদের কাহারও অপেক্ষা তিনি যে দয়াদাক্ষিণ্যে ও সহৃদয়তায় নূন্য ছিলেন না, তাহা বোধ হয় সর্ববাদিসম্মত। তিনি দূরদর্শী লোক ছিলেন, তিনি জানিতেন, বেণ্টিক, মেটকাফ্, ক্যানিং, সার হাইড, হেয়ার, বেথুন প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় লোক বিদেশীয়দের মধ্যে অধিক পাওয়া যায় না। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, ব্যয় সঙ্কোচের দিকে রাজ-কর্মচারীদের যখন দৃষ্টি পড়িবে, তখনই বিনা বেতনে শিক্ষা দান উঠিয়া যাইবে। কেবল উঠিয়া যাইবে তাহা নহে, রাজ-সংসারের অভাব হইলে, সুদসমেত দ্বিগুণ ত্রিগুণ আদায় হইবে। তিনি ইহা বুঝিয়াই, অল্পে অল্পে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। "বুদ্ধিমান" লোকমাত্রেই ইহাতে তাঁহার "কুনাম" না গাইয়া "সুনাম"ই গান করিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজে সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনকল্পে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং সর্বদা চিন্তা করিতেন কোথায় কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, শিক্ষা সুপ্রণালীসঙ্গত ও সহজ হইবে। দেবভাষা সংস্কৃতে প্রবেশদ্বার, ব্যাকরণস্বরূপ সুদৃঢ় লৌহময় কবাট দ্বারা সুরক্ষিত। এই দ্বার অতিক্রম

করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সুরম্য কাননে পরিভ্রমণ করিতে ও কাব্যের সুমন্দ মলয়ানিল বাহিত সুরভি-ভার সম্ভোগ করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম্। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই লৌহ-কপাট সহজে মুক্ত করিতে পারা যায়, তিনি সেই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পানিনি ও বোপদেব ব্যাকরণ রচনা করিয়া যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল সেই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, পূর্ব পূর্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণেতারা সংস্কৃত চর্চার যে দুরূহত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সুকৌশল-সম্পন্ন সহজদ্বার উপক্রমণিকা রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষাদান সরল ও সুগম করিয়াছেন এবং তদ্দারা সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পরম বন্ধু হইয়াছেন এবং সর্বাপেক্ষা নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে নিজের মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নূতন কিছু করিতে পারেন, তাঁহার রচিত উপক্রমণিকাই তাহার প্রথম ও সর্বপ্রধান দৃষ্টান্তস্থল। সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোতঃ এদেশে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও পরবর্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পরিমাণে কার্য করিয়াছে। আবার যখন জানা গেল যে, সেই পাণ্ডুলিপি (১৫) এক রজনীর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এ হেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক শ্রেণীর লোক কেবল সংকলক ও অনুবাদক বলিয়া অনাদর করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, স্বাধীন চিন্তাযোগে নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন: 'বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্বে অনেক দিন হইতে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্যাদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণ মূর্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর—সর্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—সকলেই যে কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকা দ্বারা ব্যাকরণের দুর্গমপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূল কারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, এক্ষণকার সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের মধ্যে কয়জনের

---

১৫ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার সোপানরূপে উক্তগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছিলেন।

ভাগ্যে সংস্কৃতশিক্ষা করা ঘটিয়া উঠিত? ফলতঃ বিদ্যাসাগরের যদি আর কোনো কার্য না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃত ভাষায় পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, এই একমাত্র কার্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেন সন্দেহ নাই। (১৬) বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যে, ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে রঘুবংশ প্রভৃতি সুকঠিন গ্রন্থ পাঠ করান বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। কোমলমতি বালকগণ সহজে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে না। বিদ্যালয়ের এই গুরুতর অভাব মোচনার্থে তিনি সহজবোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থ—পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলন করিয়া ঋজুপাঠ নাম দিয়া তিনখানি পুস্তক প্রচার করেন। এতদ্দ্বারাও সংস্কৃত শিক্ষার্থী বালকগণের শিক্ষা লাভের পথ সহজবোধ্য হইয়াছিল। ঋজুপাঠের অনুকরণে অনেকে সরল সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহার সেই ঋজুপাঠ ভাগত্রয় এতাবৎকাল বহুল পরিমাণে বালকগণের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গদেশে সর্বত্র বিদ্যালয়ে যে গ্রীষ্মাবকাশ হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে ইহার প্রথম প্রবর্তক অনেকেই তাহা অবগত নহেন। কলিকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপে লোক ছট্‌ ফট্‌ করে এরূপ প্রখর তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন সময়ে অত্যধিক পরিশ্রমে বালকগণের শরীর ও মন নিস্তেজ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে, এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা সমাজকে অনুরোধ করিয়া দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ মঞ্জুর করাইলেন। এই হইতে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ক্রমে ক্রমে গ্রীষ্মের ছুটি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্যে নিযুক্ত হইয়া যখন এই সকল নূতন পরিবর্তন দ্বারা কালেজের ও সমগ্র শিক্ষাবিভাগের বিবিধ উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার কার্যকলাপের যশঃসৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। কালেজে অধ্যাপকগণ ও শহরে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যকুশলতা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহলে রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এক অসাধারণ লোক মনে করিতে লাগিলেন। মার্শেল এবং ময়েট সাহেব বহুপূর্ব হইতেই তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, এক্ষণে ইহার কিছু পূর্ব হইতে শিক্ষাসমিতির প্রেসিডেণ্ট ভারতবন্ধু সহৃদয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮৫০ খৃস্টাব্দের ও তৎপরবর্তী কালের বিদ্যা-সাগরমূর্তি এতই সুন্দর, এতই চিত্তমুগ্ধকর যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী যিনি

---

১৬ বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

দেখিতেন, তিনি আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। তাঁহার কোমলতাময় বীরত্ব-ব্যঞ্জক, সে মুখমণ্ডলে প্রতিভার পরাক্রম পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার সে মধুর লাবণ্যভরা মূর্তি সন্দর্শনে একদিকে যেমন হার্ডিঞ্জ, ড্যাল-হাউসি, কানিং ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজমণ্ডলী সম্মানসহকারে নত হইতেন, অপর দিকে আবার দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বঙ্গীয় লক্ষপতি জমিদারগণ তাঁহার আত্মীয়তা ও স্নেহদৃষ্টির অনুগত হইয়া চলিতে সুখানুভব করিতেন। এক-দিকে বেথুন, বিডন, গ্রে, গ্রাণ্ট, হ্যালিডে প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ, অপর দিকে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলালা, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, পাইক-প্যাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ তাঁহার আত্মীয়তা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ের মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ই তাঁহার অত্যধিক স্নেহ মমতা ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। জজ দ্বারকানাথ বক্তা রামগোপাল এবং হরচন্দ্র, রামতনু, কালীকৃষ্ণ, কালীচরণ, দুর্গাচরণ, শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, প্যারীচরণ ও রাজ-নারায়ণ প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহার সুবিস্তৃত হৃদয়ে নিরুদ্বেগে বাস করিতে পাইতেন। নিরন্ন দরিদ্র নরনারীমণ্ডলীর সহিত তাঁহার এতদপেক্ষাও দৃঢ়তর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় লাট ও ছোট লাট ভবনে বহুসমাদরে উপবিষ্ট, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহারাজা স্যার যতীন্দ্র-মোহনের পাথুরিয়াঘাটা "প্রাসাদে" বহু সম্মানে গৃহীত ও সমাদৃত, যিনি পাইকপাড়া রাজভবনে পূজিত, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দরিদ্রের পর্ণকুটীরে মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রাতঃ সন্ধ্যা সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত! কি অপূর্ব দৃশ্য! কি মধুর চিন্তা!! ভাবিতেও কি প্রাণে সাগরতরঙ্গ সদৃশ আন্দোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হয় না? তবে একটা ঘটনা শুন। যখন তিনি অত্যধিক অসুস্থ হইয়া পড়িতেন, তখন কিছুদিন 'বিশ্রাম লাভার্থে খরমাটারে যাইতেন। কিন্তু স্বভাব ত আর পরিবর্তিত হইবার নহে। লোকের দুঃখ কষ্টের সংবাদ শ্রবণমাত্র তাহার উদ্দেশে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন। একদিন প্রাতঃকালে এক মেথর কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল: 'আমার ঘরে মেতরাণীর কলেরা হইয়াছে, বাবা তুমি কিছু না করিলে ত আর উপায় নাই।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কি করিলেন পাঠক শুনিতে চাও? এক ভৃত্যদ্বারা কলেরার ঔষধের বাক্স আর একটা বসিবার মোড়া লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অস্পৃশ্য ব্যক্তির অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন পূর্ণকুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সমস্ত দিন সেই মলরাশির মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময়ে সে রোগীকে এক প্রকার নিরাপদ করিয়া গৃহে আসিয়া স্নানাহার করিলেন। (১৭) পাঠক! একবার চিন্তা কর দয়াদাক্ষিণ্যের অনন্ত

১৭ আমরা খর্মাটারে গিয়া এই ঘটনাটি এবং এইরূপ বহুবিধ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি সে সকল যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

পারাবার না হইলে, স্নেহ মমতার জীবন্ত মূর্তি না হইলে কি কখন এরূপ সম্ভাবিতে পারে? বিধাতার চন্দ্রসূর্যই ঘরে ঘরে কিরণ বিতরণ করে, বিধাতার বরপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রও চন্দ্রসূর্যের ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেন। এক্ষণে কথা এই যে, লাটদরবারে অনেকেই যায়, বড়লাটের বাড়িতে অনেকে যায়, কিন্তু যারা যায়, তারা আর গরীবের সংবাদ রাখে না। বিদ্যাসাগর-চরিতের মহত্ত্ব ও মাধুর্য এই দারিদ্র্য নিপীড়িত নরনারী-মণ্ডলীর সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপনে মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এই গুণেই তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁহার এতাদৃশ লোকবিরল ও দেবপ্রকৃতিসুলভ উদার আচরণেই তিনি বঙ্গের চিরপ্রিয় হইয়া থাকিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কালেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনোপযোগী এক রিপোর্ট প্রদান করেন। তদ্দৃষ্টে কর্তৃপক্ষ ময়েট্ সাহেব গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন ১৫০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা করিয়া দেন এবং তাঁহার পরামর্শমতো কালেজের বহুবিধ আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের উন্নতি সাধনের জন্য যেমন চিন্তা করিতেন সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে শিক্ষাবিস্তারের সদুপায় সকলও চিন্তা করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন এবং সেই সকল বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুতকরণ জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবও উল্লিখিত হইয়াছিল। তদনুসারে ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে ২০০ শত টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া গভর্নমেণ্ট তাঁহার উপর নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারি জেলার নানা-স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার পরিদর্শনভার অর্পণ করেন। ঐ উভয় পদের মোট বেতন হইল ৫০০ টাকা। তাঁহারই অনুরোধ মতো কলিকাতায় সর্বপ্রথম নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইল, এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। বহু পূর্বে শোভাবাজার রাজবাটীতে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা বাবু শ্রীনাথ ঘোষ ও দৌহিত্র বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট যাতায়াত উপলক্ষে অক্ষয়বাবুর সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সূচনা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবুর মধ্যে গভীর প্রীতি ও আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের প্রীতি ও আত্মীয়তা অক্ষুন্নভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুরক্ষিত হইয়াছিল। বহু পরিশ্রম নিবন্ধন অক্ষয়বাবুর দুরারোগ্য শিরঃপীড়ার সূচনা হইল। প্রথমে কিছুকাল বিদায় লইয়া রোগ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোনও প্রকার ত্রুটি না হইলেও, তিনি আর সে কঠিন পীড়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি

পাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া কর্ম পরিত্যাগ করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার প্রিয়পাত্র ও স্নেহের পাত্র রামকমল ভট্টাচার্য উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্য সহচর মধুসূদন বাচস্পতিও উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ইতি-পূর্বে সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী পড়ার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু কোনো প্রকার বাঁধাবাঁধি ছিল না; যাহার ইচ্ছা হইত পড়িত, যাহার ইচ্ছা না হইত সে পড়িত না। বর্তমান অধ্যক্ষ নিয়ম করিলেন, প্রত্যেক বালককেই অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া যেরূপ নম্বর রাখিতে হয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে ইংরাজীতে পরীক্ষা দান এবং সে পরীক্ষার নম্বরও বিশেষ রূপে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় বিদ্যালয়ে সকল বালকই আগ্রহ সহকারে ইংরাজীও শিখিতে লাগিল। হিন্দু কালেজের মেডেল প্রাপ্ত ও ৪০ টাকা টাকা বৃত্তিধারী বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়কে সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী শিক্ষকের অগ্রণীরূপে নিযুক্ত করাইলেন। সর্বাধিকারী মহাশয় কাজকর্ম চেষ্টা করিতে গিয়া প্রথমে অল্প বেতনে ঢাকায় এক কর্ম প্রাপ্ত হন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা পাইয়া, ঢাকায় গমন করেন, কিন্তু আশু উন্নতির আশা-ভরসার আভাস না পাইয়া, কর্তৃপক্ষের বিনানু-মতিতে ঢাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। এই অপরাধের জন্য তাঁহার শীঘ্র আর কাজকর্ম জুটিয়া উঠে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে হিন্দু কালেজের নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্যে পুনরায় নিযুক্ত হন। সেখানে ৪০ টাকা বেতন পাইবেন শুনিয়া প্রথমে কোনো মতেই ঐ কর্ম করিতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক বুঝাইয়া এবং কর্তৃপক্ষের বিরক্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত করেন। শেষে তিনি সংস্কৃত কালেজে একশত টাকা বেতনে ইংরাজী পড়াইবার জন্য প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুতা ও আত্মীয়তার স্নিগ্ধ বারি-ধারা প্রাপ্ত হইয়া সর্বাধিকারী মহাশয় শ্যামদেহ নবীন বৃক্ষের ন্যায় ত্বরায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিত্যক্ত অধ্যক্ষ পদেই নিযুক্ত হইয়া নিজের শক্তি, সামর্থ ও কার্যকুশলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত কালেজের নূতন বন্দোবস্তে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেণ্টের অনুমোদিত হইলে, সর্বাধিকারী মহাশয়ের নিয়োগের পর ক্রমে বাবু শ্রীনাথ দাস, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার রায় ক্রমান্বয়ে পরবর্তী ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐরূপ নিয়ম হইবার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রবর্গ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর সহিত সমকক্ষতায়

কৃতকার্য হইয়াছিল। এই সুফল দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দারুণ শোকাবহ বন্ধুবিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরম বন্ধু ও বঙ্গীয় ললনাকুলের চিরসুহৃদ বেথুন লোকান্তর গমন করেন। (১৮) বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাহার দুশ্চেদ্য স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশা ছিল, বেথুনের দ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। স্বদেশহিতৈষণা-ব্রতধারী বিদ্যাসাগর, ভারত-সহৃদের বিয়োগে কাতর হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? প্রসঙ্গক্রমে যখনই বেথুনের কথা উত্থাপিত হইত, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতলগৃহে বাস করিতেন, সেই সময়ে দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ৺দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আলাপে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া নব্য মিত্র মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বারিকবাবুকে (১৯) বলিয়াছিলেন, 'এ কা'কে এনেছিলে হে, এ চোখে মুখে কথা কয়, আমাকে "থ" করিয়া দিল। আমি ত জানিতাম, যেখানে আমি সেখানে আর কেহ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপর যায়।' এই সময় হইতে দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়।

এই সময়ে বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। বয়স অল্প হইলেও তাঁহার যোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের কোনো এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষার ভারার্পণ করেন। শিক্ষকের বয়সের অল্পতা হেতু বালকেরা তাঁহাকে আপনাদের সমবয়স্ক মনে করিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে সম্মত হয় নাই। কেহ কেহ দল বাঁধিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার ও তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কোন কোন ছাত্র এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠাতা ও উৎসাহদাতা তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে কেহই ধরা পড়িল না, কেহই দোষ স্বীকার করিল না। তিনি এইরূপ মিথ্যাচরণের ঘোর শত্রু ছিলেন। যখন কেহই দোষ স্বীকার করিল না, তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত বালককে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বালকেরা দল বাঁধিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের

---

১৮ ইহার বিস্তারিত বিবরণ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

১৯ অবসর প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ ভালবাসার পাত্র। ইঁহারই নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি। শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। আমি এই সুপরিচিত ও সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের লিখিত পত্রাংশ পরিশিষ্টে দিলাম।

নিকট অভিযোগ করিল। কর্তৃপক্ষ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। তদুত্তরে তিনি সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, ক্যালেজের আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে অধ্যক্ষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এরূপ বিষয়ে বালকেরা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিবার সুযোগ পাইলে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, আর তাহাদিগকে শাসনে রাখা যাইবে না। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া সমস্ত কাগজপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফিরাইয়া দেন এবং বালকদিগকে বলিয়া দেন যে, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।

বালকেরা তাহার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'এবার চাকরি ত যায়, উপায় কি হবে? 'দাঁড়িপাল্লা, ধরতে হবে যে।' কিন্তু যখন শুনিল যে, কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিযোগপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন মাথার উপর "আকাশ" ভাঙ্গিয়া পড়িল, সর্বনাশ হইল চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণে শরণাপন্ন হওয়াই স্থির করিল। স্থির করিল বটে, কিন্তু 'ম্যাও ধরে কে' কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করে না। সে ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞার সুকঠিন বর্মাবৃত মূর্তির সম্মুখে অগ্রসর হয় কে? তাঁহার সম্মুখস্থ হইবার সাহস কাহারও হইল না। বালকদের আত্মীয় স্বজনগণ ক্রমে বালকদের এই সকল দুর্বৃত্ততা জানিতে পারিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকদিগকে বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে বলিলেন। বালকেরা পরিশেষে কালীচরণবাবুর শরণাপন্ন হইয়া পড়িল এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া বিধিমতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কালীচরণ বাবু বালকগণকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর-সদনে উপস্থিত হইলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় দলের পাণ্ডা দুই-এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, দাঁড়ীপাল্লা কে ধরবে? তোরা না আমি?' "পালের গোদা"রা দলের পুরোভাগে নতমস্তকে দণ্ডায়মান। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কালীচরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, ইহারা তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছে ত?' তিনি বলিলেন, 'আমি আসিতে সম্মত হই নাই, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, তাই সঙ্গে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তুমি ইহাদিগকে মাপ করিতে বলিলে, মাপ করিব, নতুবা করিব না।' তখন কালীচরণবাবু ভীষন বিপদে পড়িলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, 'ইহারা আমার নিকট যে পরিমাণে অপরাধী, তদপেক্ষা অধিকতর অপরাধী আপনার নিকট, আপনি যাহা ইচ্ছা করুন। আমার উপর ভার দিবেন না।' তখন বালকেরা নিরুপায়

( Education Council ) নামের পরিবর্তে ডাইরেক্টর অব্ পব্লিক ইন্‌স্‌ট্রক্‌সন্ এই নূতন নামে আফিস সংস্থাপন করিয়া, ডাক্তার ময়েট সাহেবের স্থানে ডব্লিউ, গর্ডন ইয়ং নামে একজন যুবক সিভিলিয়ানকে উক্ত বিভাগের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরকে একজন পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ লোককে উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মাননীয় হ্যালিডে সাহেব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিজেই সমস্ত করিব, মিস্টার ইয়ং কেবল উপলক্ষ মাত্র। আপনি তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগের কাজকর্ম ভাল করিয়া শিখাইয়া দিবেন।' তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আফিসে গিয়া ইয়ং সাহেবকে কাজকর্ম বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়া ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন, অতি ত্বরায় সে আশঙ্কার বীজ অঙ্কুরিত হইল।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষীয়েরা ভারতবর্ষবাসী সাধারণ লোকমণ্ডলীর শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং সেই অর্থব্যয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়েও কতকটা আভাস দিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে মেকলে ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রবর্তিত শিক্ষানীতির অনুসরণে তদানীন্তন মন্ত্রিসভা আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক জেলায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইংলণ্ডীয় কর্তাদের মন্তব্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার ছোট প্রভু ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের মতান্তর হইল। ডাইরেক্টর অপর দুইজন ইংরাজ ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবেচনামতো বিদ্যালয় স্থাপন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপূর্বে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তখনও বিদ্যালয় স্থাপনে প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া উক্ত নিষেধবাক্য কর্তৃপক্ষ ছোট লাটের গোচর করিলেন। এর মতান্তর হইতে মনান্তরের সূচনা হইল। উভয়পক্ষ হ্যালিডে সাহেবকে নিজ নিজ বক্তব্য জানাইলে পর, মাননীয় ছোট লাট কিছুকালের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন স্থগিত রাখিতে বলিয়া বিলাতে কর্তাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এই শিক্ষা-সংগ্রামে বিলাতী কর্তৃপক্ষদের মতে স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই জয় হইল। তিনি দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ ইন্‌স্পেক্টর পরিচালিত ও বুদ্ধি-বিভ্রাটগ্রস্ত ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দারুণ তীব্রভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ সুবিবেচনা সহকারে কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিতেন যে, সহজে কোনো প্রকার ত্রুটী পাওয়া যাইত না। তবুও সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে ভয়ানক মতভেদ উপস্থিত হইত। উভয় পক্ষই ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সহায়তায় আত্মপক্ষ রক্ষা

করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবিচারসঙ্গত মীমাংসাই ছোট লাটের অনুমোদিত হইত। এই ভাবে তিনি ছোট লাটের পৃষ্টপোষকতায় ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের প্রতিপক্ষতা উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্তব্য পালন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া নানাস্থানে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন; মডেল স্কুল স্থাপন লইয়াই ছোট প্রভু ইয়ং সাহেবের সহিত অনাত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষা বিস্তার কার্যে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষীয়দের বিশেষ সহানুভূতি থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের পোষকতা হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে সহসা ইংলণ্ডীয় মন্ত্রীসভার পরিবর্তনে ভারতবর্ষীয় শিক্ষাবিষয়ক নীতিও পরিবর্তিত হইল। ছোট লাট হ্যালিডে মহোদয়ের বাচনিক আদেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরোক্ত চারি জেলায় বহুসংখ্যক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ক বিল মঞ্জুর করিলেন না। শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ অর্থব্যয় বর্তমান শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন। (২৩) ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব এই এক ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কষ্ট দিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টরের কার্যে সহায়তার জন্য তাঁহার অধীনে চারি জেলায় চারি জন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত চারি জেলায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কালেজের স্থায়িত্ব লইয়া সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষদের মধ্যে লড়াই তর্ক-বিতর্ক হইত, এবং কখন কখন কালেজ উঠাইয়া দেওয়া প্রায় স্থির হইয়া যাইত। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আকিঞ্চনে এবং বঙ্গদেশীয় লোকমণ্ডলীর ভাগ্যগুণে এই দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়াছে। শিক্ষার্থী বালকগণের উৎসাহ বিধানার্থে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল, সেই সকল বৃত্তিদানে গভর্ন-মেণ্টের যথেষ্ট ব্যয় হইত; গুণবান্ দরিদ্র বালকদের দুরদৃষ্টবশতঃ সেগুলি উঠিয়া গেল! তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু আকিঞ্চনে কালেজের মূলোৎ-পাটন স্থগিত রহিল।

সংস্কৃত ও হিন্দু কালেজের স্থান সঙ্কুলান হইয়াও উপরে দুটি ঘর পড়িয়া থাকিত। পূর্বে তাহা হিন্দু কালেজেরই ছিল। সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করায় ঐ দুটি ঘরের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। বিদ্যাসাগর

---

২৩ ইহার বিস্তারিত বিবরণ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

মহাশয় কর্তৃপক্ষ ইয়ং সাহেবকে উক্ত অভাব জানাইয়া ঘর দুটি প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে প্রভু তাঁহাকে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ ঘর চাহিয়া লইতে বলিলেন। সাট্‌ক্লিফের সহিত পূর্ব হইতে ঘর লইয়া একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'আপনি হিন্দু কালেজের সাট্‌ক্লিফের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে ডাকাইলে আমি তথায় গিয়া সাক্ষাৎ করিতে ও আপনার সমক্ষে আমার প্রয়োজন জানাইতে পারি। কিন্তু আমি একাকী এই জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।' ইয়ং সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কার্যকালে সাহেব অন্য প্রকার করিলেন। তিনি নিজে সাট্‌ক্লিফেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকান নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে সাক্ষাৎ না করিয়া সাহেবের বাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাট্‌ক্লিফের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারবার অনুরোধ করিলেও, তিনি পুনঃ পুনঃ অসম্মত হওয়ায় একটু অগ্ন্যুৎপাত হইল। সাহেব তাহাকে পাঠাইতে জেদ্ ধরিলেন, তিনিও যাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। রেশারেশি আরও বদ্ধমূল হইল। ইয়ং সাহেব বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া সপ্তরথিসহযোগে অভিমন্যুবধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

স্যার চার্লস উডের ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। লর্ড ড্যালহাউসি এই শুভানুষ্ঠানের সর্বপ্রকার আয়োজন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ভারতসুহৃদ লর্ড ক্যানিং-এর রাজত্বের প্রারম্ভে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতপ্রস্তাবে কলেবর পরিগ্রহ করে। যে সকল মহোদয়কে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মোট সংখ্যা ৩৯ জন মাত্র ছিল। ঐ সদস্যগণের মধ্যে ছয় জন মাত্র দেশীয় সভ্য ছিলেন, এবং তন্মধ্যে দুই জন মুসলমান। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺রমাপ্রসাদ রায় ও ৺রামগোপাল ঘোষ,—এই চারি মহোদয় হিন্দু সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক সভায় (কনভোকেশনে) সভাপতি গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের এক পার্শ্বে লর্ড বিশপ ও অন্য পার্শ্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন। (২৪) উহার গঠন কার্যে তাঁহার পরামর্শও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ২৮শে নভেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে একটি পরীক্ষকসমিতি (Board of Examiners) সংগঠিত হয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষার প্রশ্ননির্ধারণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার

২৪ কোন্নগর নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

উপযুক্ততা নির্ধারণ করিবার ভার, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। (২৫) এনট্রেন্স ও বি. এ. পরীক্ষার সমগ্র কার্যভার ইঁহাদের উপর অর্পিত হওয়ায় ইঁহাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত, সেই জন্য প্রত্যেককে বৎসরে ছয়শত টাকা পারিশ্রমিক বলিয়া দেওয়া হইত। অনার্স (Honours) পরীক্ষার্থী থাকিলে, সে বৎসর অতিরিক্ত আর একশত টাকা পরীক্ষকদিগকে দেওয়া হইত। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে পর, পরীক্ষক সমিতির পুনর্গঠনের সময়ে বহুচেষ্টা করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ সকল কার্যে লিপ্ত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ইহার পর কেবল ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের এম. এ. পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষক হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহার পরেও সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বি. এ. ও এম. এ.-র সংস্কৃত পরীক্ষক হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি আর ঐ সকল কার্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইলে পর, ইহার কোন এক অধিবেশনে শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রকার আলোচনার মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। বহুসংখ্যক ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহুবিধ যুক্তি ও তর্ক সহযোগে প্রতিপক্ষগণকে একেবারে নীরব করিয়া দেন। তাঁহারই বিশিষ্টরূপ অধ্যবসায় ও আকিঞ্চনের ফলস্বরূপ সংস্কৃত কালেজ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি ও আমাদের শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে।

সিভিলিয়ানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে সকল সাহেব কর্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল সেনট্রাল কমিটি নামে এক কমিটি স্থাপন করেন। সিভিলিয়ান সাহেবদিগের পরীক্ষা গ্রহনই এই কমিটির কার্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কমিটির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

---

২৫ Resolved : That the following gentlemen be requested to form a Board and that as a body, such Board should be responsible as well for the questions set, as for the valuation of the answers, and that each member 'should be ready, if called upon, to assist so far as he is abel as well in the other subjects of the examination as in those to which he has been specially appointed...Sanskrit, Bengali, Hindi and Oorya—Pundit Iswar Chandra Bidyasagar, Principal, Sanskrit College. Minutes of the provisional Commitee, 28th Nov. 1857 and confirmed by the Senate, 12th Dec. 1857.

বিলাতি কর্তৃপক্ষের আদেশ মতো যখন বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন হইতে লাগিল, তখন ঐ সকল বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পণ্ডিতের বেতন অল্প বলিয়া সহজে লোক পাওয়া যাইত না, এজন্য দক্ষিণ বাঙ্গালার তদানীন্তন ইন্‌সপেক্টর প্রাট্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি পণ্ডিত চাহিয়া পাঠান। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ উক্ত পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে, কিন্তু বেতনের অল্পতা-নিবন্ধন তাহাদের কেহই ঐ সকল কর্ম গ্রহণে সম্মত নহে। অন্যূন পঞ্চাশ টাকা বেতন হইলে, কেহ কেহ যাইতে পারে কিন্তু সেরূপ ছাত্রের সংখ্যাও বড় অল্প, বিশেষতঃ বৎসরের শেষে ভিন্ন ঐরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র পাওয়া যাইবে না। (২৬)

ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে এরূপ আত্মীয়তা অল্পই হয়। বিশেষতঃ প্রভু ও ভৃত্যে এরূপ সৌহার্দ্য অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখেন, কলিকাতার অন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংবাদ পাঠাইয়া বঙ্গেশ্বরের দর্শন মানসে বহুক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া ছোট লাট হ্যালিডে তৎক্ষণাৎ উপরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। এই ঘটনায় মর্মাহত হইয়া উপরোক্ত মহোদয়গণের কেহ কেহ ঐরূপ উপেক্ষা সম্বন্ধে হ্যালিডে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ছোট লাট তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'আপনারা নিজের নিজের বৈষয়িক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলাপ করিতে আসিয়া থাকেন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকার্যে আমাকে সুপরামর্শ দিবার জন্য আসিয়া থাকেন, সুতরাং উদ্দেশ্যের প্রভেদে অধিকারেরও প্রভেদ হইয়া থাকে। আপনারা আসেন আপনাদের জন্য, আর তিনি আসেন আমার জন্য। এমন স্থলে যদি তাঁহাকে সর্বাগ্রে উপরে আসিতে বলিয়া থাকি, তাহাতে কি কোনো দোষ হইয়াছে?' (২৭)

অপর ঘটনা এই ঃ হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধমতো তিনি বৃহস্পতিবারে

---

২৬ No. 1107. From the principal, Sanskrit College, to Hodgson Prat, Esq. Inspecton of Schools, South Bengal, dated 13th March 1857. In reply to his letter No. 174, dated 10th February.

২৭ এ ঘটনাটি অন্য নানা স্থানে শুনিলেও একদা প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিলাম।

নানা বিষয়ে কথোপকথনের জন্য ছোট লাট-ভবনে যাইতেন। কিন্তু সেই দরিদ্রের চিরপ্রিয় বিদ্যাসাগরী চাদর গায়ে দিয়া, আর তালতলার চটি পায়ে দিয়া যাইতেন। ছোট লাট বহু অনুনয় বিনয় করিয়া অনুরোধ করায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকবার পেণ্টুলন, চোগা, চাপকান ও পাগড়ী পরি-শোভিত হইয়া অতি গোপনে শহর অতিক্রম করিয়া আলিপুরে বেল্‌ভেডিয়ারে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কার্যটা তাঁহার নিকট একটা অপকর্ম বলিয়া মনে হইত। এই সভ্যতাসঙ্গত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনি মনে করিতেন, যেন সঙ্‌ সাজিয়াছেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ ও অসুবিধা হইত। দুই-তিন বার এইরূপ অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া ছোট লাট-ভবনে যাতায়াত করার পর, বোধ হয় চতুর্থ দিবসে, তিনি সাহেবকে বলিলেন 'এই আপনার সহিত আমার শেষ দেখা।' সাহেব চমকিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'কেন পণ্ডিত, কি হইয়াছে যে আর দেখা হইবে না?' স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে ছোট লাটের মুখের উপর বলিলেন; 'কয়েদীর মতো যমযন্ত্রণাদায়ক পোশাক পরিয়া সঙ্‌ সাজিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কার্য আমার দ্বারা হইবে না।' সাহেব ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত, যে পোশাকে আসিলে, আপনার সুখ ও সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন, এ বিষয়ে আমার পছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই।' (২৮) এই ঘটনার পর আর কখনও চটি জুতা, থান ধুতি, আর তাঁহার প্রবর্তিত বিদ্যাসাগরী চাদর পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল শেষ দশায় অত্যধিক অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসকের অনুরোধে সেকেলে ফ্যাসানের ফ্লানেলের অঙ্গরাখা ব্যবহার করিতেন।

হ্যালিডে সাহেব অনেক বার অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াও, সর্বদা তাঁহাকে ইয়ং সাহেবের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে, তাহা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য ইয়ং সাহেবের জেদের বশবর্তী হইয়া চলা ক্রমে ক্রমে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। পরিশেষে একবার তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যের বিবরণ প্রদান করিলে পর, ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব সেই রিপোর্ট বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিতে বলেন। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, বিবরণটি দেখিতে শুনিতে বেশ জাঁকজমক বিশিষ্ট হয়; উপরিতন কর্মচারীরা দেখিয়া বুঝিবেন যে বেশ

---

২৮ অন্যত্র শুনা থাকিলেও, আমরা এ ঘটনাটিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম।

কাজ-কর্ম হইতেছে। উন্নতমনা ও ন্যায়পরায়ণ বিদ্যাসাগর এইরূপ অনুরোধে অপমানিত বোধ করিলেন, তিনি যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কোনো স্থানের একটি বর্ণও পরিবর্তন করিতে সম্মত হইলেন না। অধিক পীড়াপীড়ি করায় শেষে কর্মত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার কর্ম পরিত্যাগ-কাহিনী নিম্নে যথাযথ বর্ণিত হইল। পাঠক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সামান্য নীচতা স্বীকারের পরিবর্তে পাঁচশত টাকা বেতনের চাকরিটি কত সহজে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই কর্ম-পরিত্যাগ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য কতদূর পর্যন্ত অনুরোধ হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবকে এই সংস্রবে প্রথম যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহাতে প্রধূমিত বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা এই:

প্রথম পত্র

মহাশয়,

বিগত শনিবার যখন আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখন দক্ষিণ বাঙ্গালা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ সম্বন্ধে আমি দুই-এক কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করায়, আপনি আমাকে ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় মন্তব্য লিপিবন্ধ করিয়া আপনার নিকট অর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি সেই অনুমতিপ্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ পূর্বক জানাইতেছি যে, যদি আমাকে উপরোক্ত ইন্‌স্পেক্টরের পদে বদলী করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার স্থানে সংস্কৃত কালেজ কাহাকে নিযুক্ত করিলে কালেজের কল্যাণ হইবে, সে বিষয় আমার সহিত পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করিলে ভাল হয়, কারণ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কাহাকেও নিযুক্ত করিলে, সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইবে, তাহা বহুদিনের অভিজ্ঞতা সূত্রে আমিই ভাল বলিতে পারিব। গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল কালেজ সম্বলিত জেলাসমূহের বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের পদে আমাকে স্থাপন করা যদি বিবেচনা সঙ্গত না হয়, অন্ততঃ হুগলী' মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার মডেল স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। সরকারী স্কুল কালেজের ভার বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের উপর দিলেই চলিতে পারে, বাঙ্গালা শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে আমি আপনাকে এত বেশী বিরক্ত করিয়াছি যে, আর ইহার পুনরুল্লেখ দ্বারা আপনার বহুমূল্য সময় ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করি না।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

দুঃখের বিষয় প্রতিলিপিতে তারিখ দেওয়া ছিল না। কিন্তু উক্ত পত্রের উত্তরে ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব যে উত্তর দেন, সাহেবের সে পত্রের তারিখ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত পত্র লিখিত হইয়াছিল।

প্রত্যুত্তরে হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই ঃ

দ্বিতীয় পত্র

দার্জিলিং
২৭শে মে, ১৮৫৭

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে
কলিকাতা

পণ্ডিত মহাশয়,

আপনি হয়ত জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনার পত্র পাইবার পূর্বেই আমি মিস্টার লজকে উক্ত শূন্য পদে নির্বাচন করিয়াছি। ইহার পূর্বে উক্ত পদ লেফটেনেন্ট লিজ্‌কে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি ইংলণ্ডে আছেন এবং উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

আমি আশা করি, শীঘ্রই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কারণ আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি, এবং এই প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে (যাহার উন্নতিকল্পে আমরা উভয়েই আগ্রহশীল) আলাপ করা যাইবে।

(স্বাক্ষর) ফ্রেড্‌. জে· হ্যালিডে

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেবকে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রথম পত্র লেখেন তাহা এই ঃ

তৃতীয় পত্র

সংস্কৃত কালেজ,
২০শে আগস্ট, ১৮৫৭

মাননীয় ডব্লিউ. গর্ডন ইয়ং
শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় সমীপে

মহাশয়,

আপনি প্রায় তিন মাসের জন্য শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এরূপ স্থলে ইহাকেই সুসময় বোধে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে আমি কর্ম পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, আমার এরূপ ত্বরায় কর্মত্যাগ করিবার উদ্দেশ্য সাধারণের জানিবার উপযোগী নহে, তাহা অন্যের জানিবার অনুপযোগী বলিয়াই, সেসকল কারণ উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

সংস্কৃত কালেজের শিক্ষা বিষয়ক নূতন পদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, তাহা সুসম্পন্ন করিতে আরো দুই তিন মাস লাগিবে। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি আমার এই বর্তমান কর্ম করিব। ডিসেম্বরে আমি আমার কর্মত্যাগ পত্র যথারীতি প্রেরণ করিব।

আপনাকে এত পূর্ব হইতে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার তাৎপর্য এই

যে, আমার অবসর গ্রহণে, শিক্ষা বিভাগে যে পদ শূন্য হইবে, তাহার পূরণার্থে সুবিচারে জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

চতুর্থ পত্র

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ
৩১শে আগস্ট ১৮৫৭

মাননীয় এফ. জে. হ্যালিডে মহাশয় সমীপে
মহাশয়,

কিছুদিন গত হইল, একবার বাঙ্গালা শিক্ষাদানের বর্তমান পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনি আমাকে এক মন্তব্য-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, এবং আমিও নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক সে সময়ে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি যে, আমারই সহযোগী কর্মচারীগণের ও অন্যান্য সকলের কার্যকলাপের সমালোচনা-সম্বলিত মন্তব্য-পত্র প্রদান অতীব কঠিন কার্য, আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনাপুরঃসর মন্তব্য-পত্র প্রদান প্রতিজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

এ স্থলে আমি আপনার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক জানাইতেছি যে, আমি আগামি জানুয়ারি মাসে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি। এবং আমার সে অভিপ্রায় এক 'আধা' সরকারী' পত্রে মিষ্টার ইয়ংকে জানাইতেছি এবং তাহার এক খণ্ড প্রতিলিপি আপনার পাঠের জন্য এতৎসহ প্রেরণ করিলাম।

সসম্মান শ্রদ্ধাবনত,
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

পত্রোত্তরে ছোট লাট মাননীয় হ্যালিডে সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই:

পঞ্চম পত্র

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে

৩০শে আগস্ট

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

আমি আপনার এই সংকল্প শুনিয়া সত্য সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আগামী বৃহস্পতিবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল কারণ কি, আপনি আসিয়া আমাকে বলিবেন।

আপনার,
ফ্রেড. জে. হ্যালিডে

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভেই কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুর নগরে প্রথমে সিপাহীগণের বিদ্রোহ দেখা দেয়, অতি অল্প চেষ্টায় সে উদ্যোগ

নিবারিত হইয়াছিল, এবং গভর্নমেণ্টও তন্নিবারণে সফলকাম হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু মার্চ, এপ্রেল, মে ও জুন মাসে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কলিকাতা রাজধানী, সুতরাং যেখানে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ফলাফলজনিত ভয়ে কলিকাতাবাসী ইংরাজ ও বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ আপামর সাধারণ সকলেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। নগর রক্ষার জন্য দিবারাত্রি গোরা পাহারার প্রয়োজন হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে শহরের লোক দ্বার বন্ধ করিত, আর প্রভাতে সূর্যোদয়ের অনেক পরে দ্বার খুলিত। সে সময়ে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসিতে সাহস করিত না। সংস্কৃত কালেজে গোরাদিগকে স্থান দিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দিনের জন্য কালেজের কার্য বন্ধ রাখেন, এরূপ তাড়াতাড়ি কালেজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষকে জানাইবার অবসর পান নাই। কালেজ বন্ধ করিয়া ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের নিকট অন্যত্র কার্যারম্ভের জন্য রিপোর্ট করেন। সাহেব বিনানুমতিতে কালেজ বন্ধ করার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিদ্রোহের সময়ে সহসা সরকারী কার্যে প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কালেজের বাটী ছাড়িয়া দিয়া একবিন্দুও অন্যায় করেন নাই, এই ভাবে ইয়ং সাহেবের পত্রের উত্তর দেন; কর্তৃত্ব-পরায়ণ সাহেব এ কথায় মনে মনে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু এ ব্যাপার কর্তাদের গোচর করিতে সাহস করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, কর্তৃপক্ষের নিকট এ ঘটনায় তিনি পরাজিত হইবেন। কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পক্ষে এ ঘটনাটিও একটি প্রবল কারণে পরিণত হইয়াছিল।

ইহার পর ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব অনেক মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রায় এক বৎসরকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শান্তভাবে কর্মে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট, ছোট লাট পত্রের দ্বারা তাঁহাকে বেলভেডিয়ারে যে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান, সেইখানেই সেবারকার উদ্যোগের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, তিনি বন্ধুভাবে অনেক বুঝাইয়া সে যাত্রা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিরস্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল তাঁহারই আত্মীয়তার অনুরোধে বাধ্য হইয়া সেবার সে সংকল্প হইতে বিরত হন। কিন্তু যখনই ইয়ং সাহেবের আত্মীয়তার অভাব প্রকাশ পাইত, তখনই কর্মত্যাগের সংকল্প নূতন করিয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। শেষে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে সেই যে কর্ম ত্যাগ করিলেন, আর বহু চেষ্টাতেও সে কর্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ছোট লাট সেই সময় একবার বুঝাইবার মানসে বলিয়াছিলেন, আপনি এত বড় সমাজসংস্কার কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, মহাশয় যদি বা আপনার অনুরোধে একটু চিন্তা করিতাম, যখন বিপদের ভয় দেখাইতেছেন, তখন আর ও "ছাই ভস্ম"

## ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর

জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষণ দুটি,—ধর্ম ও ভাষা; যে জাতি এক ধর্মাক্রান্ত নহে—যাহার ধর্মালোচনায় সমাজ দেহের আপাদমস্তক উচ্ছ্বসিত না হয়, যাহার ধর্মান্দোলনের তরঙ্গে-তরঙ্গে সমাজদেহে সজীবতা পরিস্ফুট হইয়া না উঠে, সে জাতি মৃত—তাহার ধর্ম মৃতধর্ম; সে জাতির দ্বারা জাতীয় জীবন গঠনের সহায়তা হইতে পারে না। সেইরূপ, জননীর ক্রোড়ে স্তন্যপান করিতে মানুষ যে ভাষায় সর্বপ্রথম "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখে, যাহার সরল ও সুমিষ্ট শব্দ সকল উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বার প্রথম জড়তা কাটিয়া যায়, ক্ষুদ্র জীবনের শোক ও দুঃখপ্রকাশ করিয়া শিশু যে ভাষায় কাঁদিয়া থাকে, আনন্দে দিশাহারা হইয়া বালকবালিকা যে ভাষায় আপনার জয় ও পরের পরাজয়ের পরিচয় দিয়া থাকে, বাল্যকালের ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে লোকে যে ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে, মানুষ যে ভাষায় হাসিয়া আটখানা হয়, কাঁদিতে কাঁদিতে যে ভাষায় মানুষ হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেয়, আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া অন্তরের তীব্রজ্বালা জুড়াইয়া থাকে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা। মা ও মাতৃভাষা একই বস্তু, যে জাতি গ্রহবৈগুণ্য-বশতঃ মাতৃপূজা শিখে নাই, সে মাতৃভাষার আদরও জানে না। যে জাতির মাতৃভাষা এক নয়, যাহাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইলে, শব্দ ও স্বর ভিন্ন হইয়া যায়, তাহাদের জাতীয় জীবনের অভিনয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে।

এক একটি শিশু বিধাতৃ-প্রদত্ত রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সামান্য কুটিরে সামান্য লোকদের মধ্যে তাহার সমাগম হয় বটে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী লোক তাহার লক্ষণ সকল দেখিয়া তাহার ভাবী কার্যকলাপের অঙ্কপাত করিয়া থাকেন; কিন্তু সর্ববিধ সুলক্ষণ বিদ্যমান থাকিতেও অনেক সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ যেমন ত্বরায় শুভদিন সমুপস্থিত হয় না, বিলম্ব হইয়া পড়ে, বাঙ্গালা ভাষার দগ্ধভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। প্রবল শক্তিশালিনী দেবভাষা সংস্কৃতের আওতায়, ইহাকে ইহার শৈশবকাল কাটাইতে হইয়াছে। বাঙ্গালী-জীবনের প্রথম অবস্থায়, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের শৈশকালে, স্মৃতিশাস্ত্র-সংস্কারক ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও গীতগোবিন্দ রচয়িতা ৺জয়দেব গোস্বামী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই দেবভাষা সংস্কৃতের আলোচনায় জীবনাতিপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীও সাধারণের অপরিজ্ঞাত দুর্বোধ্য সংস্কৃতেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের স্নেহমমতা আকিঞ্চন ও উদাম সকলেই দেবসেবায় নিয়োজিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল

অনধিকারিগণের সেবার্থে, তাহাদের তৃপ্তিবিধানের জন্য প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনে কিছুমাত্র মনোযোগী হন নাই! সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য বঙ্গসমাজের শৈশবকালের নীতিকুশল ও সুনিপুণ লেখকগণের সেবা হইতে বঞ্চিত। (১) বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে বাঙ্গালার আপামর সাধারণ লোকমণ্ডলীর পাঠোপযোগী গ্রন্থ রচনাতে যাঁহারা সর্বপ্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বরণীয় নামাবলীর পুরোভাগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও তৎপরে চৈতন্য ভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অতি স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়ের বহুপূর্বে, বাঙ্গালা ভাষা, ভারতবর্ষে আর্যজাতির প্রথম অভ্যুদয় কালের ভাষার ন্যায় মুখে মুখেই থাকিত; গ্রন্থ রচনা করিয়া মানবের উক্তি সকল স্থায়ী করিবার কোনো চেষ্টাই ছিল না। সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের পথপ্রদর্শক ও গুরুমহাশয় বলিয়া একাল পর্যন্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এবিষয়ে সম্প্রতি মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, বিদ্যাপতি বহুকাল হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অগ্রণীরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিলেও "বেহার ডায়লেক্ট" নামক গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী কবি ছিলেন না। তাঁহার কবিতা সকল মৈথিলী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর, ঐ সকল কবিতা বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালা আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে, এবং ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদি গ্রন্থকার ও পথ-প্রদর্শক বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্যসুহৃদ ও যৌবনসখা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষাবিষয়ক বক্তৃতার প্রথমেই লিখিয়াছেন, 'খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পর্যটক হিউয়েন্‌সাঙ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়া বাঙ্গালা বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতক অংশের একই ভাষা দেখিয়া গিয়াছেন। কেবল আসাম ও উড়িষ্যার ভাষা উক্ত ভাষা হইতে কিছু পৃথক ছিল। ইহা মাগধী-প্রাকৃত ভাষোৎপন্ন একপ্রকার পুরাতন হিন্দী ভাষা ছিল। হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই ঐ এক ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, তাই ইহার প্রাচীন কবিগণের ভাষা অত্যধিক হিন্দী মিশ্রিত। বিদ্যাপতি মৈথিলী-হিন্দী কবি।

১ যাঁহারা তৎকালে বিদ্যালাভ করিতেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদি রচনা করিবার সামর্থ জন্মিত, তাঁহারা সেই শক্তি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনে প্রযুক্ত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন; সুতরাং কৃতবিদ্যদিগের কর্তৃক বাঙ্গালা অনাদৃত ও উপেক্ষিত হওয়াতে বহুকাল পর্যন্ত ইহার বিলক্ষণ দুরবস্থা ছিল।' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ১৪ পৃষ্ঠা।

তাঁহার ভাষা না প্রাকৃত-হিন্দী না বাঙ্গালা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণের দ্বারা বিদ্যাপতি রচিত কবিতা সকল বাঙ্গালা আকার ধারণ করিয়াছে।' (২) গ্রিয়ার্সন সাহেবের উক্তি ও বিজ্ঞবর রাজনারায়ণবাবুর উক্তি, ফলে প্রায় এক প্রকারই দাঁড়াইতেছে। প্রভেদ এই যে, গ্রিয়ার্সন সাহেব বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিতেছেন না, আর রাজনারায়ণবাবু বলিতেছেন, বিদ্যাপতির অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ভাষা ছিল না, মৈথিলী ভাষাই তখন বাঙ্গালীর ভাষা ছিল। উক্তি দুটি বিভিন্নতর হইলেও, ফল হইল এক। এরূপ মতবিরোধের স্থলে দলবল সহ বিদ্যাপতিকে সিংহাসনচ্যুত করা আমাদের মতে নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। আমরা এরূপ কঠোর ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি, তবে বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ভাষার সূচনা হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণের রচনা বর্তমান বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন হইলেও এবং বহুল পরিমাণে হিন্দী মিশ্রিত হইলেও উহা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি, তাহা গ্রিয়ার্সন সাহেব এবং রাজনারায়ণবাবু উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বেহার অঞ্চলের লোক, (৩) তাহাতে মৈথিলী কবি; বাঙ্গালায় তাঁহার কোনো রচনার প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা আছে তাহা তাঁহার মৈথিলী ভাষায় রচিত কবিতার বাঙ্গালা সংস্করণ মাত্র। এরূপ স্থলে যদি তাঁহাকে বাঙ্গালী কবিগণের অগ্রণী এবং বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের পথ-প্রদর্শক বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কি বিশেষ কিছু দোষ হয়? আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসই বাঙ্গালার সর্বপ্রথম গ্রন্থকার। যাহা হউক বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারা যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। মহাপ্রভু তাঁহাদের রচিত গীতাবলী শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। (৪)

চারিশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। লোকসকল নির্জীব জড়প্রায়, আহার বিহার প্রভৃতি দৈনিক ইতর কার্যেই জীবনের মহামূল্য সময় কাটাইতেছিল। সে সময়ে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হইলে, সমাজ-দেহের প্রাণবায়ু অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইত। মানবের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত সূক্ষ্ম পথে বিধাতা তাঁহার বৃহদ্ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূত্র পরিচালিত করেন। ১৪০৭ শকে

---

২ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু-কৃত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১ পৃষ্ঠা।

৩ পণ্ডিত ন্যায়রত্ন-কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২১ পৃষ্ঠা।

৪ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ১৫ পৃষ্ঠা, বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত।

(১৪৮৫ খৃস্টাব্দে), বাঙ্গালার ভূতপূর্ব রাজধানী ও ধর্মক্ষেত্র নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আলোসামান্য সুঠাম দেহ ও গৌরকান্তি সুমধুর লাবণ্যে ঢল ঢল করিত। শুনিয়াছি তাঁহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে, তাঁহার সঙ্গে থাকিতে স্বতঃই লোকের ইচ্ছা হইত। এতাদৃশ গুণবান্ পুরুষ, মৃতকল্প বাঙ্গালী জীবনে নবজীবন সঞ্চার করিতে আত্মবলি দিলেন। জননী শচীদেবীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির দুশ্ছেদ্য বন্ধন বীরবলে ছিন্ন করিয়া লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন, ধর্মের প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া তাহাতে আপনি ডুবিলেন, দেশের বহুসংখ্যক লোককে ডুবাইলেন। এই আন্দোলনেই দুই সম্প্রদায় লেখকের অভ্যুদয় হইল। একদল, বৈষ্ণব ধর্মের মধুর ভাব প্রচারে, কাব্য রচনা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই আন্দোলনের একাংশ। বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচারে যখন চারিদিক বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল, যখন জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উচ্চধর্ম লাভের অধিকারী বলিয়া বিঘোষিত হইতে লাগিল, যখন বৈষ্ণবগণ 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' 'মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে' প্রভৃতি উচ্চভাবের ধর্মকথা সকল প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন আর একদল শাক্ত লেখক আবির্ভূত হইয়া স্বপক্ষে সমর্থনার্থে বহু গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। এই শাক্ত ও বৈষ্ণব সংঘর্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রকৃতপ্রস্তাবে গঠিত হইয়া উঠে। এই সময়ের বাঙ্গালা ভাষা এই উভয় দিক হইতে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। একদিকে চৈতন্যভাগবত চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীজীব গোস্বামীর করচা ও ভক্তমাল প্রভৃতি, বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; অপর দিকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার কাব্য-প্রসূনের মধুপানে প্রমত্ত হইয়া সুপ্রবীণ রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন' 'অনেকের মতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীবাঙ্গালার প্রধান কবি। স্বকপোল রচনাশক্তি বিষয়ে মোটা ধুতি ও দোপুজো পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোটপেণ্টুলন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।'(৫)

মুকুন্দরামের কোমল কবিতাকলাপ এতই সরল যে, আপামর সাধারণ সকল লোকেই বুঝিতে পারে। ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ, তাঁহার রচনা পরিপাটি এবং কবিতা মিষ্ট তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্য

৫ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু-কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, ১৪ পৃষ্ঠা।

মুকুন্দরামের কাব্য 'গজদন্ত কনকে জড়িত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই 'গজদন্ত কনকে জড়িত' মুকুন্দরামের নিজের উক্তি। মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে ঐ উক্তি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই কোনো সুপ্রবীণ সমালোচক মহাশয় উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে বঙ্গের অমর কবি শ্রীকৃত্তিবাস ও শ্রীকাশীরাম রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া আমাদিগকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের ঋণ পরিশোধ প্রয়াস বাঙ্গালীর পক্ষে মূঢ়তা, এই দুই মহাত্মা তাঁহাদের অগ্রণী। বঙ্গের গৃহে গৃহে স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা, যে রামায়ণ ও মহাভারতের অমূল্য উপদেশাবলীর আবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহার জন্য আমরা বিশেষভাবে ইহাদিগকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিয়া থাকি। এদেশের নিম্ন-শ্রেণীর লোক যে অন্যান্য দেশের তদবস্থাপন্ন লোকদের অপেক্ষা নম্র ও ধর্মশীল, কৃত্তিবাসের অক্ষয়কীর্তি ও কাশীরাম দাসের ভারত-রত্নখনিই তাহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ভারতে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণসমূহের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় নাই, বাঙ্গালাদেশে তাহা এই দুই মহাকাব্য গ্রন্থ দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বহুবিধ বিভিন্নতা ও বিচিত্রতার মধ্যে ভারতে জাতীয়তার শেষ রেখা, সমাজ-দেহের ভিত্তিমূলে যে দেখিতে পাওয়া যায়, রামায়ণ ও মহাভারত তাহা নীরবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম, ভারতের বাল্মীকি ও ব্যাস। (৬) ইহার পর বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় পক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থ রচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ মাত্রও এখানে সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরবর্তী কালে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ কতকগুলি শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়া বঙ্গে অমর কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ সরল গীতগুলি সুমিষ্ট মধুর প্রসাদীসুরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গাইতে পারে এবং সে গানে সাত্ত্বিক প্রীতি ও তৃপ্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রায়গুণাকর কৃত অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দরই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রায়-গুণাকর, ভ্রমরবেশে নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া, যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই সরস থাকিয়া বাঙ্গালী পাঠকমণ্ডলীকে মধু বিতরণ করিবে। বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্র শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া

---

৬ সম্প্রতি তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত নাম রক্ষার জন্য বাঙ্গালী হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সদনুষ্ঠান আর কি হইতে পারে? সাধু সঙ্কল্পের চিরসহায় বিধাতা ইহাদের সদনুষ্ঠানে শুভদৃষ্টি করুন।

অন্যায় করিয়াছেন। এতাবৎকাল যে সকল গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, এ সকলেই সে কালের ব্যাপার। গ্রন্থকার বহুকষ্টে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বহুযত্নে তাহা রক্ষা করিতেন। আজকাল লোকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি ও নানাবিধ ধনরত্ন যেরূপ সন্তর্পণে রক্ষা করে, সেকালে হস্তলিখিত পুঁথিগুলি তদপেক্ষা অধিকতর সাবধানতা সহকারে রক্ষা করিতে হইত। যাহার প্রয়োজন হইত, সে ব্যক্তি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বহু সময় ক্ষয় করিয়া, বহু সাধ্যসাধনার পর তবে একখানি গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে সুযোগ পাইতেন। সুতরাং গ্রন্থপ্রচার ও পাঠ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছিল; গ্রন্থকারগণ এবং তাঁহাদের গ্রন্থ থাকিলে কি হইবে? গ্রন্থের প্রচার ও পাঠের সুযোগ ছিল না। এরূপ স্থলে যাঁহারা পুস্তক রচনা করিতেন, তাঁহারা যে অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া এ কার্যে অগ্রসর হইতেন না, তাহা বেশ স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। সেকালের গ্রন্থকারগণ আত্মতৃপ্তি সাধনোদ্দেশে নিজ নিজ রুচি ও প্রকৃতির অনুরূপ পথে এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেন। গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি যাঁহার প্রবল ছিল, তিনিই কেবল নিজের তৃপ্তিলাভ ও বন্ধুমণ্ডলীর তৃপ্তিবিধানের জন্য গ্রন্থ রচনা করিতেন। কিন্তু তদ্দ্বারা লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইত না। তবে সেকালের এই মুদ্রা-যন্ত্রবিহীন দেশে গ্রন্থকারগণের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষিগণের অভীষ্টসিদ্ধির এক উপায় ছিল। গ্রন্থকারগণ কৃষ্ণচরিত, রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্য নানা প্রকার দেবদেবীর ক্রিয়া কলাপ অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিতেন। এক শ্রেণীর গায়কগণ চামর ও মন্দিরা সহযোগে সাধারণ লোকের নিকট ঐ সকল গ্রন্থগত বিষয় গান করিয়া বেড়াইত। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের পক্ষে কথক ঠাকুরেরা, কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাগণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব ও বাল্যলীলা সম্পন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে কোন্ শুভমুহূর্তে, কোন্ মহাত্মা দ্বারা, কি উপায়ে এই লোক-শিক্ষার পথ সুপরিষ্কৃত হইয়াছে, কি কি অনুষ্ঠান অবলম্বনে আধুনিক কালের বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সহসা কি এক দৈবশক্তি লাভ করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য ইহার কিশোরকাল অতীত হইবার পূর্বে এত শক্তি সামর্থ, এত বিচিত্রতা, এত বিস্তৃতি লাভ করিয়া প্রবলবেগে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাই আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর হইল, বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে। কোনো নূতন স্থানে পদার্পণ করিতে না করিতে, সেস্থানের অভাব সকল দূর করিতে, এবং সে স্থান সর্বতোভাবে মানবের বাসোপযোগী করিতে যত প্রকার সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, ইংরাজ-জাতি সে বিষয়ে চিরাভ্যস্ত ও আগ্রহশীল। অনুসন্ধান করিলে যেমন সকল জাতির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজেরও দোষ

খুঁজিলে পাওয়া যাইবে; কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, তাহা ইংরাজ-জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। রাজদণ্ড-প্রাপ্ত অপরাধী ইংরাজগণ অস্ট্রেলিয়াতে নির্বাসিত হইত। রুশিয়া সাইবেরিয়াতে অপরাধীকে নির্বাসিত করে, ভারতবর্ষবাসী আন্দামানে নির্বাসিত হয়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত ইংরাজগণ ও তাহাদের বংশধরেরা যেমন সভ্য জগতের সুখবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। যে জাতির অপরাধিগণও এরূপ আশ্চর্য উন্নতি সাধন করিতে পারে, শতদোষ সত্ত্বেও সে ইংরাজ জাতি বরণীয় ও সম্মানের পাত্র। এতাদৃশ পূজার যোগ্য ইংরাজ-জাতির সেই বিচিত্র জাতীয় উন্নতির একটি প্রবল তরঙ্গ আটলান্টিক ও ভারত মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া বন্যার জলের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নানা পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। সেই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যে ধবল ফেনপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাই সমগ্র ভারতকে ধবলাকার করিয়া রাখিয়াছে। এই ইংরাজ সমাগমে যে সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের শুভ সূচনা হইয়াছিল, মুদ্রাযন্ত্র তাহাদের প্রধানতম একটি। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে চার্লস্ উইল্কিন্স নামক একজন ইংরাজ সর্বপ্রথম বহুক্লেশ ভোগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী এক প্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরের সাহায্যে হালহেড্ নামক জনৈক ইংরাজ কর্তৃক রচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। এই দুই জন চিরকৃতজ্ঞতাভাজন বিদেশীয় মহাত্মার নিকট বাঙ্গালাভাষা ও ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী মহাশয়গণ চিরঋণে আবদ্ধ। উইল্কিন্স ও হালহেড্ বর্তমান ত্বরিতগতিসম্পন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ; সুতরাং আমাদের পূজনীয়। যাঁহারা কোনো অনুষ্ঠানের কেবলমাত্র সুফল সম্ভোগ করেন, তাঁহারা সে অনুষ্ঠানের সূচনাকর্তাদের অধ্যবসায় ও আকিঞ্চন, ত্যাগ-স্বীকার ও কষ্টসহিষ্ণুতার এক রেণুমাত্রও মনে ধারণা করিতে পারেন না। ঐ দুই বিদেশীয় মহাত্মা ইংরাজ বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ অসাধ্য সাধনে সাহসী হইয়াছিলেন এবং প্রায় ছয় বৎসর কাল এদেশীয় নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ সকল ভাষার অক্ষর সংগ্রহ করিয়া পরস্পর মিলাইয়া তবে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ইংরাজ প্রেম প্রণোদিত হইয়া নগণ্য ও উপেক্ষিত বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার সাধন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ আমরা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক, অসংখ্য সংবাদ পত্র এবং রাশি রাশি গ্রন্থের প্রচার দেখিতে পাইতেছি। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস্ মহোদয়ের সংগৃহীত ও অনুমোদিত আইন সকল এইচ. পি, ফর্স্টার নামক জনৈক ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহাতেই বাঙ্গালা মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের প্রথম আভাস প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই ফর্স্টার সাহেবই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব প্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। (৭)

সকৌন্সেল্ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস বাহাদুরের অনুমোদিত আইন সমূহের বাঙ্গালা অনুবাদের নমুনা পাঠকবর্গের প্রীতিবর্ধনার্থে এখানে প্রদত্ত হইল। ইহাই মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থসমূহের আদি পুস্তক ঃ '২ ধারা ইশতেহার নামার ১ প্রথম দফা। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক করসম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির ১০ সনী বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ১৫ নভেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারীতে নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ভূম্যধিকারিদিগের জানান যাইতেছে যে, যে সকল অধিকারী ঐ সকল আইনের মতে আপনারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত স্বয়ং কিম্বা আপনারদিগের পক্ষের লোকদিগের দ্বারা সরকারে করিবেক তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য ঐ বন্দোবস্তের কালে হইবেক তাহা বিলায়তের কর্মকর্তা সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে দশ সনের পরেও অস্থির ও ফেরফার না হইয়া চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।'

'৮ ধারা। ইশতেহারনামার ৭ সপ্তম দফা।...১ প্রথম এই যে। হাকিমের উচিত যে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরীবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফঃসলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাষী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করা উচিত জানেন সে কালে তাহাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমত সকল আইন নির্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী-দিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।'

আর এক স্থানে লিখিত আছে ঃ 'যে যে কালে অংশ ক্রমে ভূমি বিক্রয়াদি হয় অথবা অংশীদিগের সহিত অংশ করা যায় সেই ২ কালে সকল অংশের মোকররী জমার ধার্য যে অনুসারে হইয়া চিরকাল অটল ক্রমে থাকিবেক। তাহার কথা।'(৮) ইহাই বাঙ্গালা গদ্য রচনার প্রথম পথ-প্রদর্শক; সুতরাং ভাল হউক আর মন্দ হউক, পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যাক, আর নাই যাক্, এই পুস্তকেই বাঙ্গালা গদ্য রচনার সূচনা হইয়াছে। আমরা যে পুস্তক হইতে উপর্যুক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম, উক্ত পুস্তক ১৮২৬ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে।

খৃস্টধর্ম প্রচার শ্রীরামপুরের পাদরী মহাশয়গণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও

---

৭ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৮ ইংরেজী ১৭৯৩ সালের আইন সমূহের ফর্স্টার-কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ।

সেই প্রচার কার্যের সৌকর্যার্থে তাঁহারাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুতকরণের উৎসাহদাতা এবং বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও গ্রন্থ রচনার পথপ্রদর্শকরূপে ইহারা আমাদের চির-কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। 'যেরূপ চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্য রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃস্টধর্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্য রচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।' (৯) কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত যে সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়া বঙ্গের গৃহে-গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও ঐ খৃস্টীয় পাদরী মহোদয়গণের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফল মাত্র। 'আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, ঐ সময়ে পূর্বোল্লিখিত হালহেড্, উইল্কিন্স, ফর্স্টার, কেরি, মার্সম্যান, কোলব্রুক্ এবং স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজ মহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষা সকলের অনুশীলনে ও উন্নতি বিধানে সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন।,(১০)

খৃস্টীয় মিশনারী মহোদয়গণের কার্যারম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে এবং মহাত্মা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে, ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয়ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত কালেজে সাহেব ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকখানি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আইনের গদ্য রচনা, যেমন তেমন হইলে চলিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল পাঠ্যপুস্তকের বাঙ্গালা রচনা এক অদ্ভুত জিনিস। স্থানে স্থানে হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব। ১৮০৫ খৃস্টাব্দে রাজীবলোচন কৃত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৮০৬ খৃস্টাব্দে রামরাম বসু কৃত 'প্রতাপাদিত্য চরিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃস্টাব্দে "রাজবলী" ও ১৮১৩ খৃস্টাব্দে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' উৎকল নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। (১১) আমরা রাজীবলোচন-কৃত সে কালের পাঠ্য পুস্তক 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' হইতে একটু প্রীতিপ্রদ উপহার প্রদান করিতেছি ঃ

'ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত

---

৯ পণ্ডিত ন্যায়রত্ন-কৃত বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

১০ পণ্ডিত ন্যায়রত্ন কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১১৫ পৃষ্ঠা।

১১ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

হইলেন। পরে এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত জহানগীর সা বাদসাহের নিকট গমন করিলেন। বাদসাহের নিকট সংবাদ বিস্তারিত রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন। গমন এবং আগমন পর্যন্ত কিন্তু ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তর বিস্তর প্রশংসা বাদসাহের নিকট করণে বাদসা আজ্ঞা করিলেন তাহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আহ্বান করিলেন। রায় মজুমদার বিস্তর ২ নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাদশা ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন উপযুক্ত মনুষ্য বটে। পশ্চাৎ মানসিংহকে নানা প্রকার রাজ প্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার যদি আজ্ঞা হয় তবে মজুমদারকে রাজ প্রসাদ কিছু দিউন। বাদসা হাস্য করিয়া কহিলেন উহার নিবেদন কি। তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহার জমিদারীর হউক। বাদশা হাস্য করিয়া কহিলেন জমিদারির লিপি করিয়া দেহ। আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারির লিপি বাদসাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সংভ্রান্ত করিলেন।, (১২)

আর একস্থানে এইরূপ আছেঃ রাজা পরমাহ্লাদে শত ২ সুবর্ণ এক ১ ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ আতুরে এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন। যাবদীয় নগরস্থ লোকদিগের সন্তোষের সীমা নাই। কিঞ্চিৎ-কাল পরে পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয় নগরে লোকের বাটীতে মৎস্য ও দধি এবং সন্দেশ ভারে ভারে প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গেরদিগের ও বাসনা রাজপুত্র দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্তব্য বটে। রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেনপশ্চাৎদাসীরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্র প্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে সকলকে দেখাও।' (১৩) বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা ইহার পরবর্তী গ্রন্থগুলির কোনোখানিই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ সকল গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। আর কয়েক বৎসর পরে আমাদের দেশের কোথাও আর এ সকল গ্রন্থ পাওয়া যাইবে না; কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরের রাজকীয় সুবিস্তৃত পুস্তকালয়ে ঐ সকল পুস্তক অতি যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে। এই জন্যই বর্তমান সময়ে ইংরাজ

---

১২ রাজীবলোচন-কৃত কৃষ্ণচন্দ্র চরিত, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা।

১৩ রাজীবলোচন-কৃত কৃষ্ণচন্দ্র চরিত, ২২ পৃষ্ঠা।

আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠজাতি। আমরা আমাদের মূল্যবান সামগ্রী যত্নে রক্ষা করিতে জানি না, তাহারা, আপনাদের সম্পদ রক্ষা করে, আবার অন্য জাতির সম্পদও রক্ষা করিতে নিশ্চেষ্ট নহে। যে 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত হইতে দুই একস্থল উদ্ধৃত করা গেল, সকলে শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, উক্ত গ্রন্থ ১৮১১ খৃস্টাব্দে রাজধানী লণ্ডননগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতপূর্বে ইংলণ্ডে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রণের ভারগ্রহণ করিবার এবং তাহার প্রুফ দেখিবাব লোকাভাব হয় নাই!

ইংরাজ এইরূপ উদ্যমশীল ও কার্যতৎপর বলিয়াই বীরবেশে দেশে দেশে বিচরণ করিতেছে, ও সর্বত্র সিদ্ধিলাভ করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে; আর আমরা এই গুণের অভাবেই মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছি। ইহার পর আর একখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার শিরোনামা পৃষ্ঠায় ( Title Page) এইরূপ লিখিত আছে:

শ্রী
॥ তোতা ইতিহাস ॥
॥ বাঙ্গালা ভাষাতে ॥
শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সীতে রচিত ॥
লন্দনরাজধানীতে চাপা হইল।
১৮২৫

এই পুস্তকের রচনা ও শব্দ যোজনার নমুনাস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল: 'কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্তা সূর্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ্ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্তে পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহবান পূর্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্যে খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সুপ্ত বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্ সুলতান একজন বিদ্যান্ লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন।' (১৪) ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ১৮২৫ খৃস্টাব্দে মহাত্মা রামমোহন রায়-কৃত অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর গদ্য রচনার পদ্ধতি প্রচলিত হইলেও উপরি উক্ত উৎকট গদ্য গ্রন্থ সকল আদৃত ও বিদ্যালয়ে পঠিত হইত।

অনেকেরই ধারণা যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য রচনার পথ-প্রদর্শক। এরূপ ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং ইহার মূলে যে কিছু পরিমাণে সত্যও নিহিত আছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। রামমোহন রায়

---

১৪ তোতা ইতিহাস, ১-২পৃষ্ঠা।

বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৭৩৬ শকে ( ১৮১৪ খৃস্টাব্দ ) কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন ১৮১৫ খৃস্টাব্দে যখন তাঁহার বেদান্ত সূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও বাঙ্গালা ভাষার অতীব শোচনীয় অবস্থা। উপরেই তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে পাঠার্থে রচিত ঐ সকল পুস্তক ভিন্ন, কেবল গ্রন্থ প্রণয়ণ ও প্রচারের উদ্দেশে তখনও কেহ বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচিত ও যত্নে রক্ষিত হইত বলিয়া বোধ হয়। এই সম্বন্ধে সকল প্রকার সংশয়ের অপনোদন মানসে আমি বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি অনুগ্রহ প্রকাশে আমার পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

নৈহাটী

১৯শে জুন ১৮৯৪

বিহিত বিনয়ানুনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

মহাশয়, অনেকের ধারণা এই যে, মহাত্মা ৺রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা। যিনি সর্ব প্রথমে বাঙ্গালা ভাষার বহুতর গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, একথা সত্য হইলেও গদ্য লেখার প্রণালী যে ইহার পূর্বে ছিল না একথা বলা যায় না। গদ্য লেখায় রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ৺গৌরীশঙ্করও বহুতর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন জন্মদাতা হইলে গৌরীশঙ্কর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে শিখিলেন কোথায়? এই কথার উত্তর করিতে গেলেই গদ্য রচনা প্রণালী যে রামমোহনের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। গদ্য রচনার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে বৈষ্ণব গ্রন্থের সহায়তা পাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চৈতন্য সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করি, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীচৈতন্যের সময় পত্রাদি প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত; আমি একখানিও বাঙ্গালা পত্র খুঁজিয়া পাই নাই। মহারাজ নন্দকুমারের কারাবাসকালে লিখিত পত্রই বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম গদ্য রচনা; অন্ততঃ ইহার পূর্ববর্তী কোনও গদ্য রচনা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নন্দকুমারের বাঙ্গালাও উর্দুবহুল ও এখানকার দলীলের প্রাপ্ত ভাষার ন্যায়। নন্দকুমারের বহু পূর্ব হইতেই দলীলাদি গদ্যে লিখিত হইত। বোধ হয় তাহা হইতে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা করায় নন্দকুমারের ভাষা ঐরূপ হইয়াছিল।

কিন্তু দলীল ও পত্রাদি গদ্যে লিখিত হইলেও যতক্ষণ গদ্যে লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ বাঙ্গালা গদ্য যে প্রাচীন ইহা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না; এইজন্য সংস্কৃত পুস্তক অনুসন্ধানের সময় আমি

বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থেরও অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। নিজ বাটীতে আমার পৈতৃক হস্তলিখিত পুস্তকাবলী অনুসন্ধান করিতে করিতে স্মৃতিকল্পদ্রুম নামে একখানি বাঙ্গালা লিখিত স্মৃতিগ্রন্থ প্রাপ্ত হই। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নহে, উহাতে কয়েকটি মাত্র মঞ্জরী আছে, যথা তিথিমঞ্জরী, প্রায়শ্চিত্তমঞ্জরী, শুদ্ধি-মঞ্জরী ইত্যাদি। বর্ষীয়ান্ খুল্লতাত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম উহা তাঁহার পিসামহাশয়ের হস্তলিখিত এবং তিনি যশোহর জিলা হইতে আনীত আদর্শ দেখিয়া গ্রন্থখানির প্রতিলিপি করেন। খুল্লতাত মহাশয়ের সংস্কার, খানাকুলের বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের বংশীয়গণের রচনা। একথা কতক সত্য বলিয়াও বোধ হয়; কারণ বাড়ুর্যে ঠাকুর ও তাঁহার বংশীয়েরা স্মৃতির ব্যবস্থা দেওয়া যাহাতে সহজ হয়, তজ্জন্য বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টাচার্য গোষ্ঠির কোনো সন্তান সংস্কৃত না জানিলেও ব্যবস্থা দিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ই বাঙ্গালা স্মৃতিকল্পদ্রুম লেখা হয়।

খুল্লতাত মহাশয় যে সময়ের কথা উল্লেখ করিলেন, সে সময়ে খানাকুলের ভট্টাচার্যগণ অনেকেই আমাদের বাটীতে পড়েন, এবং তাঁহাদের মুখে অবগত হইয়া একজন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ খুড়ামহাশয়ের পিসামহাশয় যে ঐ গ্রন্থ নকল করিয়া পাণ্ডিত্য খ্যাতি লাভ করিতে চেষ্টা পাইবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। ঐ সময়ে গৌরীশঙ্করও আমাদের বাটীতে অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং তিনি যে এই গ্রন্থের বিষয় অবগত হইবেন, এবং এরূপ লিখিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? আর একখানি বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত স্মৃতি গ্রন্থ সেরপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে, উহাও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় নাই।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে আমাদের বাটীতে স্মৃতিকল্পদ্রুম গ্রন্থ নকল হইয়াছিল, তখন আদর্শ গ্রন্থ প্রাচীন, সুতরাং উহা যে ১০০ বৎসরেরও পূর্বে লিখিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। বরং তাহারও পূর্বে হওয়াই সম্ভব, কারণ নারায়ণ বাঁড়ুয্যে ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র ইহারই গ্রন্থকার। ইহারা প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী এই শতাব্দীর ১৪।১৫ বৎসর অতীত হইয়া গেলে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং বাঙ্গালা স্মৃতিকল্পদ্রুম তাহা অপেক্ষা প্রাচীন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে দেখা যায় তিনি নিজেই বলিতেছেন: ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম।' ঐ গ্রন্থ যে গদ্যে লিখিত হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার কাল ১৮১৫

খৃষ্টাব্দ (১৭৩৭ শক) হয় না। ১৭৯০ খৃস্টাব্দেই (১৭১২ শক) তাঁহার গদ্য রচনার প্রকৃত কাল স্থিরীকৃত হয়।

এক্ষণে ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ের অনেক পূর্ব হইতে আমাদের দেশে নানা স্থানে লুক্কায়িত রত্নের ন্যায় হস্তলিখিত অল্পাধিক গদ্য গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইলেও মহাত্মা রামমোহন রায় সে সকল গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হন নাই, কারণ সাত-আট বৎসরকাল পাটনায় ও তৎপরে কাশীধামে অধ্যয়নার্থে অবস্থিতি করিয়া, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গৃহে আসিয়া প্রথম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচনার সময়ে অন্যত্র গদ্য গ্রন্থের বিদ্যমানতা তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণ অতীত ছিল। এ কথা বলিবার আরও বিশেষ তাৎপর্য এই যে, তিনি শাস্ত্র প্রচারার্থে যে সকল গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষা তাঁহার নিজের প্রতিভা-প্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। রামমোহন রায় স্বরচিত গদ্যের প্রণালী বিষয়ে কাহারও নিকটে ঋণী ছিলেন না। বেদান্ত গ্রন্থের অনুষ্ঠানপত্রে তিনি বাঙ্গালা গদ্য পাঠের নিয়ম বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐরূপ গদ্যপাঠ লোকের অনায়ত্ত ছিল। আমরা তাঁহার অনুষ্ঠানপত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে তাঁহার গদ্য রচনার প্রণালী ও তৎপাঠের উপদেশ উভয়বিধ বিষয়ই জানা যাইবে। তিনি লিখিতেছেন : ওঁ তৎসৎ।—প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই-তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু-ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে, তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্ট না পাইবেন! কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখনো কখনো কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না

জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর 'যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি, তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাঁহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে।' (১৫) এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক পদের অন্বয় করিয়া দেখাইয়াছেন কিরূপে গদ্য রচনা পড়িতে হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এদেশে সে সময়ে গদ্যের প্রচলন তাদৃশ আদৃত হয় নাই এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার উপযোগী গদ্য রচনার প্রবর্তক বলিলে, বোধ হয় কাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার হস্তক্ষেপের বহু পূর্বে গদ্য রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে, অপরদিকে রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরীশংকরও (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য) গদ্য রচনায় নিতান্ত অপারগ ছিলেন না তথাপি রামমোহন রায়ের রচনার মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং পাঠের পদ্ধতি প্রবর্তন ও উপদেশ দ্বারা তিনি গদ্য রচনাকারীদের মধ্যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাচারার্থে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ধর্মালোচনার প্রবল প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, রামমোহন রায়ই ইহার পথপ্রদর্শক বা পিতৃপুরুষ। বাঙ্গালা ভাষায় যিনি যে ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মালোচনা করুন না কেন, তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐ মহাপুরুষের নিকট তিনি ঋণী। ভীষ্মের ন্যায় তিনিও এদেশবাসী মাত্রেরই তর্পণের জল-গণ্ডুষ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়ের সময়ে আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গালা সাহিত্য যেমন পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারকালেও ইংরাজ পাদরীগণ এবং সে সময়ের ক্রিয়াকলাসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার বাদ-প্রতিবাদে, বাঙ্গালা সাহিত্য সেইরূপ জীবনের পথে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। 'রামমোহন রায় রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও পৌত্তলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানা শাস্ত্র বিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়ন করিলে চমৎকৃত

---

১৫ রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, ১৩ পৃষ্ঠা।

ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়।' (১৬) কিন্তু যে সুমধুর ও সুললিত ভাষা আজ বঙ্গবাসীর কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে, যে ভাষার প্রবল শক্তি ও বহুবিস্তৃতি দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আজ আনন্দিত, যাহার শ্রী সম্পাদনে অতুল প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তুলিকাগ্রহে যে ভাষা অনুপম সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে, যে ভাষায় গম্ভীর্যসম্ভূত গৌরব বর্ধনে পূর্ববঙ্গের সুপ্রবীন লেখক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, আজ যাঁহার সেবায়, বঙ্গের বহুসংখ্যক সুসন্তান নিযুক্ত, সেই মাতৃভাষার গঠনকার্যে, তাহার পারিপাট্য সাধনে তাহার অবশদেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য আমরা কাহার নিকট ঋণী? নিজের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া বহু চিন্তা ও বহু শ্রম স্বীকার করিয়া নিজের কন্যা-নির্বিশেষে কোন্ মহাত্মা ইহাকে লালন-পালন করিয়াছেন? সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি সমস্বরে বলিলেন, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সেই ব্যক্তি; তাঁহারই মমতাময় শান্তিজল লাভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছে। তিনি মহর্ষি কণ্বের ন্যায় কন্যা শকুন্তলাকে পালন করিয়াছেন—তিনি মহর্ষি বাল্মীকি হইয়া বনবাসে সীতার অশ্রুজল মোচন করিয়া আশ্রয়দান করিয়াছেন, তাঁহার সুকোমল পিতৃক্রোড়ে সীতা ও শকুন্তলা পরিশোভিত বাঙ্গালাভাষা কিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনো নবীন কবি লিখিয়াছেন ঃ

> একদিন এই মহামুনিবর, ভ্রমিতে গভীর বিজন বনে,
> কি জানি সহসা, কেমন করিয়া মিলন হইল বালার সনে'
> পরম যতনে, আনি ঘরে তারে, স্বীয় তপোবলে সৃজন করি,
> বিমল বসনে, সাজা'ল বালায়, অহো! কি মাধুরী হ'য়েছে মরি।
> মৃত প্রাণে তার, নবীন জীবন, করেছে প্রদান এ মহা ঋষি,
> বালিকার স্নেহে মগন তাপস, বালিকা তাপসে রয়েছে মিশি।
> কত ভালবাসে, কত কথা কয়, চাহে কত কিছু বালিকা তায়,
> একে একে দিয়ে, নানা অলঙ্কার, সাজায়েছে ঋষি বালার কায়।
> আখ্যানমঞ্জরী, তুলি সযতনে, পরাল গলায় চিকণ মালা।
> বালবিধবার, অশ্রুবিন্দু-দিয়ে, দিল সাজাইয়ে বরণ ডালা।
> মহাপুরুষের জীবনচরিতে, দিল করে নব কঙ্কণ তার।
> মস্তকের মণি, করি সাজাইল, সীতাবনবাস-স্নেহোপহার।
> এইরূপে কত, বসন ভূষণে, সাজা'ল বালার নবীন দেহ।
> নব বেশ পরি, নব আশা তার, আগ এত শোভা দেখিনি কেহ। (১৭)

---

১৬ পণ্ডিত ন্যায়রত্ন-কৃত বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৬২ পৃষ্ঠা।

১৭ 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক, ৪ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ বাসুদেব চরিত। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে, সেই অপ্রকাশিত বাসুদেব চরিতেই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়। আমরা তাঁহার অপ্রকাশিত প্রথম পুস্তক হইতে কোনো কোনো স্থান উদ্‌ধৃত করিলাম ঃ 'এক দিবস কৃষ্ণ বলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকেরা একত্র মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে আমরা বারণ করিলাম শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা অস্তব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গন্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন রে দুষ্ট, তুই মাটি খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটি খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।' (১৮) আর এক স্থানে ঃ 'এইরূপে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-বাসীরা গোবর্ধন পর্বতের অর্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং মূর্তিমান দেব দর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ ভাই আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলাম কখন দর্শন পাই নাই কিন্তু অদ্য একবার মাত্র অর্চনা করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইলাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতার উপেক্ষা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন এবং নিত্যগীতাবসানে পুনরায় পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।'

'ত্যজিয়া ইন্দ্রের পূজা পর্বতে পূজিল
শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল ॥' (১৯)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বপ্রথম রচনা যে এইরূপ সুন্দর হইবে আমরা ইহাই আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার কবিতা রচনারও অভ্যাস ছিল, শেষ দুইটি চরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৎপরে ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে বেতাল পঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহাই তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক সকলের আদি গ্রন্থ। উত্তর কালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে সফল মনোরথ হইয়াছিলেন, সে সময়ের সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতমণ্ডলী উক্ত গ্রন্থের রচনার পারিপাট্য সন্দর্শনে তাহার পূর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত গ্রন্থ রচনার পর উহা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে পাঠ্যরূপে গৃহীত

---

১৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসুদেব চরিতের হস্তলিখিত পুঁথি, ৩৩ পৃষ্ঠা।

১৯ বাসুদেব চরিত, হস্তলিখিত পুঁথি, ৬৪ পৃষ্ঠা।

হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে প্রথম মন্তব্য প্রকাশের ভার পরলোকগত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার নিকট উক্ত গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় তিনি আপত্তি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেব মহাশয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাদরী মার্সম্যান সাহেব সে সময়ে প্রচলিত সমস্ত গদ্য গ্রন্থের মধ্যে উক্ত নব প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া এক প্রশংসা পত্র দিলেন। বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ এইরূপ দুই-এক ধাক্কা খাইয়া শেষে পাদরী সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়। এই ঘটনাটি কেবল আমাদিগকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, জগদ্বিখ্যাত সেক্সপিয়রের রচিত মহামূল্য রত্ন সকল বহুকাল অপরিজ্ঞাত ও অনাদৃত ছিল, মিল্‌টনের জীবদ্দশায় তাঁহার প্যারাডাইস্‌ লস্টের মূল্য কেহ অনুভব করে নাই। জন্‌সন্‌ ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদের অভাবে লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। গোল্ডস্মিথ্‌ চিরজীবন দারিদ্র-পীড়ায় নিপীড়িত ছিলেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর আদর থাকিলেও সম্যক্‌রূপে সমাদৃত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। তাহা না হইলে তাঁহাদের আর্থিক অসচ্ছলতা অত অধিক হইত না। প্রমাণের জন্য বিদেশই বা কেন ছুটাছুটি করিতেছি। বাঙ্গালার অমর কবি শ্রীমধুসূদন জীবদ্দশায় অনাদৃত ও মৃত্যুকালে পরিত্যক্ত। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রথম উদ্যমে দু-একবার নাড়াচাড়া খাইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? তবে শীঘ্র যে তাঁহার বিপদজাল কাটিয়া গিয়াছিল এবং সহজে যে তিনি তাঁহার গম্যপথ পরিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনা একাল পর্যন্ত সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। এখনও লোকে আদর করিয়া সে পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করে।

এখানে আবার আমরা আর একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনী প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম. এ. মহাশয় উক্ত মহাত্মার জীবনচরিতের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক নূতন সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমণ্ট ও ফ্লেচর লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।' এ বিষম কথা। এ কথার কিছু মূল আছে কি না দেখা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রণয়নে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে এতদূর অপ্রীতিকর ও ক্লেশকর ঘটনা সকলের উল্লেখ করিতে হইবে, আমরা পূর্বে তাহা ভাবি নাই, কিন্তু এক্ষণে ন্যায়ের অনুরোধে আমরা

ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ বিষয় লইয়া কোনো প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া আমরা পূজনীয় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্রখানি উদ্‌ধৃত করিয়া পাঠকগণের সন্দেহ অপনয়ন করিলাম ঃ

'পরম শ্রদ্ধাস্পদ,

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-প্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতাল পঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম! তিনি লিখিয়াছেন, 'বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।' এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত, আমার বিবেচনায় এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথবাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই-একটি শব্দ পরিবর্তিত হইত। বেতাল পঞ্চবিংশতি-বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোনো সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি—

সোদরাভিমানিনঃ
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্মণঃ

সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার পক্ষে এই পত্রখানি পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট, ইহার উপর আমাদের আর বলিবার কিছু নাই।

একশত খণ্ড বেতাল পঞ্চবিংশতি তিন শত টাকায় মার্শেল সাহেব ক্রয় করেন। এই তিনশত টাকায় মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় সংকুলান হইল। অবশিষ্ট পুস্তকগুলি বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রথম সংস্করণের ভাষা তাদৃশ প্রাঞ্জল হয় নাই। সংস্কৃতমূলক কঠিন শব্দ সকল ঐ পুস্তকের অঙ্গাভরণ রূপে বিরাজিত ছিল, উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ 'উত্তালতরঙ্গমালাসংকুল উৎফুল্লফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমিমকরনক্রচক্রভীষণ স্রোতস্বতীপতিপ্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল।' এরূপ বহুসমাসসমন্বিত পদাবলী যে পাঠকের রুচিকর হইবে না, তাহা তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য বেতালের পরবর্তী সংস্করণ সকলে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ স্থানগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণের ভাষা প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ। যে কোনো স্থান পাঠ করিলে পাঠকের তৃপ্তিলাভ হইবে, যথা : 'এই সময়ে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী রাজার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল ; এবং তদীয় সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল, মহারাজ ! আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন তাহাই শিরোধার্য করিব।' আর একস্থানে : 'রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন, এবং রাজধানীর অনতিদূরে, যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন।' এইরূপ সুমধুর পদাবিন্যাস, ভাষা ও ভাবের সমাবেশ ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় নাই। রচনা বিষয়ে বেতাল সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব প্রথম গ্রন্থ। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সম্যান সাহেব কৃত ইতিহাস অবলম্বনে বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া, ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সে সময়ের শেষ গভর্নর জেনারেলের রাজত্বকাল পর্যন্ত সন্নিবেশিত করিয়া একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোহর। আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখনও তাহার সুমিষ্ট পদাবলীপূর্ণস্থান সকল কণ্ঠস্থ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে চেম্বার্স বিওগ্রাফি নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া 'জীবন চরিত' প্রণয়ন করেন। জীবন চরিতে বিদেশীর বীরকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে পাশ্চত্য জাতিসমূহের জাতীয় গৌরব বর্ধিত হইয়াছে, যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের জন্মগ্রহণ ও সেবায় পৃথিবীর সমগ্র মানবমণ্ডলী উপকৃত ও লাভবান হইয়াছেন, তাঁহাদের কীতিকলাপ ও সুপবিত্র নামাবলী কেবল গ্রীসের, কেবল রোমের, কিম্বা কেবল ইংলণ্ডের সম্পত্তি নহে, সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল মহাত্মার কীর্তিগাথাই উক্ত পুস্তকের বিষয়ীভূত হইয়াছে। পদমাধুর্য বিষয়ে বেতাল যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ভাষার ওজস্বিতা বিষয়ে জীবনচরিত সেইরূপ উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ হইলে সুন্দর, সুমধুর ও সুশ্রাব্য হয়, বেতাল, বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ ও জীবন চরিত গ্রন্থই সে সময়ে তাহার আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। জীবনচরিত, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী প্রভৃতি পুস্তক রচনার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদেশীর চরিতের পক্ষপাতী বলিয়া কেহ কেহ কটাক্ষপাত করিতে পারেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বালকগণের পাঠোপযোগী সহজবোধ্য দেশীয় আখ্যায়িকা সে সময়ে সংগৃহীত হওয়া, সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইলে, তিনি কখনই উপেক্ষা করিতেন না। আর উদারহৃদয় বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের নিকট ঃ 'অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্' এ বিচার ছিল না। 'উদারচরিতানাম্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'। দানে যেমন মুক্তহস্ত সাধু চরিতের সমাদরেও তিনি প্রকৃত হিন্দুভাবে পরিচালিত হইয়া উদারতার উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হিন্দুর চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহাতে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে চেম্বার্স রুডিমেণ্টস অব্ নলেজ নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে বালকদিগের পাঠোপযোগী করিয়া শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা বোধোদয় রচনা করেন। এই পুস্তকে সহজ ও সরল ভাষায় পদার্থ বিভাগ, বস্তুবিচার, কাল বিভাগ ও সংখ্যাদি নির্দেশ করা হইয়াছে। বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সরলভাবে বালক বালিকাদিগকে বুঝাইবার উপযোগী এরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থ অতি বিরল।

ইহার পর ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকের উপন্যাস ভাগ অবলম্বনে এক অতি উপাদেয় সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন, ইহার নাম "শকুন্তলা"। শকুন্তলার সমাগমে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব নূতন শ্রী ধারণ করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদ্গম দেখা দিল। শকুন্তলায় তাঁহার লিপিচাতুর্য, রচনামাধুর্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠক মাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বৎসরেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক' রচনা ও প্রচার করেন। উক্ত পুস্তক প্রচারে কিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বিধবা-বিবাহ বিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং কালেজের কাজকর্ম যথারীতি সম্পন্ন করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুগ্রন্থ রচনায় নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। যে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে বিধবাবিবাহের আন্দোলনে সমগ্রদেশ টলটলায়মান, যে সময় বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা বিদ্যাসাগরকে লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত, তিনি সেই বৎসরে সেই গণ্ডগোলের মধ্যে, সেই সমাজতরঙ্গের ফেনপুঞ্জের মধ্যে, বিধবাবিবাহ প্রস্তাবরূপ ঘোর বাত্যাতাড়িত বিপদসঙ্কুল সমাজবক্ষে উপবেশনপূর্বক শিশুদের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় নিবিষ্টচিত্ত। দুই-ভাগ বর্ণপরিচয়, কথামালা ও চরিতাবলী এই বৎসরেই রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে তাঁহাকে লইয়া চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, আর তিনি সংযতচিত্তে, নিশ্চিন্ত মনে, বঙ্গীয় বালকগণের পাঠোপযোগী বর্ণপরিচয়দ্বয় রচনা শেষ করিয়া কথামালা ও চরিতাবলী প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থিরচিত্ততা ও শান্তভাব, তেজস্বী উদ্ধতপ্রকৃতি বিদ্যাসাগরে কি বিচিত্রতার সমাবেশ নহে?

ডেভিড্ হেয়ারের ন্যায় বেথুনের মৃত্যুতেও কলিকাতাবাসিগণ যারপরনাই

কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু লোকের উদ্যোগে বেথুনের স্মৃতি রক্ষার্থে বেথুন সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠা কার্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সভায় এতাবৎকাল বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে এবং এখানে বক্তৃতা করিয়া ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের যে বক্তৃতায় বিশ্ববিজয়িনী প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় সেই "যীশুখৃস্ট, ইউরোপ ও এশিয়া" বিষয়ক বক্তৃতার রঙ্গভূমি বেথুন সোসাইটি। এই সভার সে কালের এক অধিবেশন দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব" পাঠ করেন। ইহা একখানি সমালোচনা গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত অথচ সঙ্গত সমালোচনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য, কিন্তু উক্ত পুস্তিকায় বাল্মীকি ও ব্যাসের অমূল্য গ্রন্থদ্বয়ের সম্বন্ধে কোনো কথারই উল্লেখ নাই। এই দুই মহাত্মা ও তাঁহাদের রচিত মহাকাব্যের অনুল্লেখের কারণ নির্দেশ করা সুকঠিন ব্যাপার। বোধ হয় প্রবন্ধের আয়তনের দীর্ঘতা ও প্রবন্ধ পাঠের সময়ের অল্পতাই ইহার একমাত্র কারণ; তাহা হইলেও ইহাদের গ্রন্থের নামোল্লেখ না করা অন্যায় হইয়াছে।

ইহার বহুপূর্বে হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের পরিচয় হয়। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু রাজনারায়ণ বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে প্রচারিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্যের সহায়তায় তিনি ব্রতী ছিলেন। নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তত্ত্ব-বোধিনীর শোভা ও গৌরব বৃদ্ধির পক্ষে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে উক্ত সংবাদ পত্রের উৎপত্তি, তিনি সে সভার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রাহ্ম সমাজেরও কল্যাণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বাঙ্গালা গদ্য মহাভারত রচনার সূচনা হয়। তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারত রচনার সূচনা হয়। তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাব ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৮৬০ খৃস্টাব্দে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, উক্ত গ্রন্থের রচনাও অতি মনোরম। ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের অনুরূপ হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য মহাভারত হইতে কোনে কোনো স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, হে মহর্ষিগণ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশাসনপর্ব। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মের নিকট ধর্মনির্ণয় শ্রবণ করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্বে ধর্ম ও অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন, অশেষবিধ দানের পৃথক পৃথক ফল নির্দেশ, সদসৎ পাত্র বিবেক, দানবিধি কথন, আচারবিধি নির্ণয়, সত্যস্বরূপ নিরূপণ, গো ব্রাহ্মণের মহাত্ম্য কীর্তন, দেশকালানুসারে ধর্মরহস্য মীমাংসা ও

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ কীর্তন আছে। ধর্মনির্ণয়যুক্ত বহুবৃত্তান্তালঙ্কৃত অনুশাসন নামক ত্রয়োদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। তৎপরে পর্বসংগ্রহের শেষভাগে আর একস্থানের রচনা এই ঃ—'তৎপর অলৌকিক অত্যাশ্চর্য স্বর্গপর্ব। মহা প্রাজ্ঞ ধর্মরাজ দয়ার্দ্রহৃদয়তা-প্রযুক্ত সমভিব্যাহারী কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকাগত দিব্যরথে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির তৎসমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধর্ম ও ইন্দ্র তাঁহার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে স্বধর্মার্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।" গভীর পরিতাপের বিষয় যে এরূপ সুললিত পদবিন্যাস সম্পন্ন ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত গদ্য মহাভারত গ্রন্থ তাঁহার লেখনীতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার বিচারশক্তি ও বহুজ্ঞানপ্রসূত সমালোচনা সহ মহাভারত গ্রন্থ যে এক অতি উপাদেয় বস্তু হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ কেবল তাহারই আভাস প্রদান করিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিতে অধীনতার ভাব ছিল না। তিনি উগ্র প্রকৃতির লোকের আচরনেই সর্বদা আপনাকে পরিচিত করিতেন। এইরূপে পুস্তকাদি রচনাদ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আয়ের সূচনা হইলেও, তিনি সে সময়ে যে সকল বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষপতির অক্ষয় ভাণ্ডারও ত্বরায় শূন্য হইয়া যায়, সুতরাং অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সামান্য অর্থে কি হইতে পারে? সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ তাঁহার পুস্তকের আয়, তাঁহার সে সময় ব্যয়-বারিধি-বক্ষে লুক্কায়িত হইল। তথাপি তাঁহার সৎসাহসের অভাব ছিল না। ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব যখন প্রবোধ দিবার মানসে বলিয়াছিলেন যে বিধবাবিবাহরূপ সুবৃহৎ আন্দোলনে প্রস্তুত হইয়া এবং বিধবাবিবাহ কার্যে লিপ্ত থাকিয়া, এরূপ বহুবেতনের কর্ম পরিত্যাগ করা কি সুবিবেচনার কার্য হইতেছে? তখন বন্ধুবর হ্যালিডে সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে স্বাধীন প্রকৃতির পরিচায়ক প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন বুঝিয়াছি, এক পোয়া চাউল হইলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দিনপাত হইবে, তখন আর অর্থের লালসায় পরিচালিত হইয়া আত্মসম্মান বিনাশ করিব কেন?"

ইহার পর ১৮৬২ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় "সীতার বনবাস" রচনা করেন। সীতার বনবাসে তাঁহার বাঙ্গালা রচনার শোভা ও সৌন্দর্য পূর্ণরূপে

প্রস্ফুটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ প্রাণময়তার পরিচায়ক প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। ইহা প্রকৃত অনুবাদ নহে। অনুবাদের ছায়া পড়িলেও ইহাকে এক প্রকার মূলগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের বিষয়গত মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার না হইলেও, ভাব ও ভাষা বিষয়ে তিনিই ঐরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের পথ-প্রদর্শক। 'রামবনবাস,' 'রামের বনগমন,' 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রভৃতি রামায়ণের ছায়াবলম্বনে যে বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসই এই সকল গ্রন্থের পথ প্রদর্শক। সীতার বনবাস বহুকাল ধরিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। একনিষ্ঠতা, সহিষ্ণুতা এবং দুঃখকষ্টের নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াও পতির প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শনই সীতার বনবাসের অমূল্য সম্পদ। শিলাসংঘর্ষণে চন্দন যেমন তরল হইয়া মধুর গন্ধ বিতরণ করে, দেহের স্নিগ্ধতা ও মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে, বনবাসে দেবীপ্রকৃতি সতীর অপূর্ব চরিতমাধুরীও তদ্রূপ শোভা ও সৌন্দর্যের মলয়মিষ্ট সুবাস বিতরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। বিন্দু প্রমাণ মৃগনাভি যেমন বহুবৎসর ধরিয়া তাহার বাসস্থানকে সুগন্ধপূর্ণ করিয়া রাখে—যখনই তাহার আঘ্রাণ লইবে, যখনই তাহার আধারের নিকটস্থ হইবে, তখনই তাহার স্বাভাবিক সৌরভে শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠিবে, বাল্মীকির আশ্রম-বাসিনী সীতার স্ত্রীস্বভাবসুলভ অলৌকিক গুণাবলীর অনুশীলনে স্বতঃই হৃদয়ে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই দেবীচরিত্রের অনুধ্যানে মন আপনা আপনি উচ্চতর লোকে অবস্থিত করিতে অভ্যস্ত হয়। সেই অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের যে অংশই পাঠ কর না কেন, সেই বনদেবীর মধুর মূর্তি হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তরে স্বর্গসুখ বিতরণ করিবে। সীতার বনবাসে বিদ্যা-সাগর মহাশয় বঙ্গীয় নারীসমাজের সমক্ষে নিষ্কাম সংসার ধর্মের আদর্শপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গরমণীগণ সীতাচরিতের অনুকরণে আত্মোন্নতি সাধন করিতে প্রয়াস পাইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত অমূল্য গ্রন্থ রচনার উপযুক্ত পুরস্কার হইবে। সীতার বনবাস সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন 'বিদ্যাসাগর রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে "কান্নার জোলাপ" কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতির প্রণীত উত্তর চরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয় ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমন একটি পত্রও নাই যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে বিদ্যাসাগরের লেখনী মধুময়ী, উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই

মধুবর্শী হইয়া পড়ে। বলিতে কি সীতার বনবাস পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে এইরূপ কার্যে ব্যবহারের নিমিত্ত তাহার স্বনামাঙ্কিত একটি স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারা অপ্রকাশ্যভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল ; লেখনী নির্মাণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিলাম, অপর কোনো সুযোগে উহা প্রদান করিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না।' (২০)

সীতার বনবাস রচনা করিয়া তিনি রামের রাজ্যাভিষেক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, উক্ত গ্রন্থের কয়েক ফর্মা যখন মুদ্রিত হইয়াছে, পুস্তক শেষ হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, এমন সময় সহচর-সম্পাদক বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "রামের রাজ্যাভিষেক' একখণ্ড বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপহার দিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যে, শশীবাবু ঐ পুস্তক একখানি রচনা করিয়াছেন, এবং সে পুস্তকখানি দেখিয়া যখন বুঝিলেন যে, সেখানি মন্দ হয় নাই, অমনি নিজের সেই অর্ধমুদ্রিত গ্রন্থ প্রচারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। সাহিত্য-সংসারে এরূপ উদারতা অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে আখ্যানমঞ্জুরী, ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ব্যাকরণ কৌমুদীর অপরাংশ, ১৮৭০ খৃস্টাব্দে সটিক মেঘদূত এবং পীড়িতাবস্থায় বর্ধমানে অবস্থান কালে জগদ্বিখ্যাত সেক্সপিয়ার রচিত কমিডি অব্ এররস (Comedy of Errors) নামক গ্রন্থাবলম্বনে 'ভ্রান্তি বিলাস' রচনা করেন। আমরা এই শেষোক্ত গ্রন্থ পাঠে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। ইহার উপন্যাস ভাগ এত অধিক হাস্যরসোদ্দীপক যে, হাস্য সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ক্ষণকালের জন্য পাঠ বন্ধ করিয়া পুস্তকহস্তে হাস্যের শেষ তরঙ্গ সম্ভোগান্তে বিশ্রাম লাভ করিয়া তবে পুনরায় পাঠারম্ভ করিতে হয়। অবিমিশ্র নির্মল হাস্য সম্ভোগের উৎসস্বরূপ 'ভ্রান্তি বিলাস' বাঙ্গালী পাঠকের পরম আদরের জিনিস। ইহাতে উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আছে, কিন্তু মলিনতা নাই, ভাঁড়ের রহস্য আছে, কিন্তু ভাঁড়ামি নাই। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার লিপিচাতুর্যের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার লেখনীর গুণে, তাঁহার রসিকতার পারিপাট্যে ইহা একখানি সুখপাঠ্য ও নির্মল আনন্দদায়ক গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। উপন্যাস পাঠকদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ অতীব উপাদেয়।

ইহার পর বঙ্গীয় কুলকন্যাগণের পরম সুহৃদরূপে আর একবার তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যারা যে পতি বর্তমানেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে এবং সমাজের অন্ধতাজাত নিষ্ঠুরাচরণের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, ইহা সাময়িক লোকাচার মাত্র। শাস্ত্রের

২০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

কোথাও এরূপ অসদনুষ্ঠানের অনুমোদন নাই। ভারতবর্ষীয় কোনো শাস্ত্রকার এরূপ অকারণ দুই, দশ বা ততোধিক দারপরিগ্রহ-বিধির পক্ষপাতী হন নাই। ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এবং সম্ভব হইলে, রাজবিধির দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ পশুবৎ নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকা সকলের সুবিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র হইবে।

এতদ্ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার্থী বালকগণের শিক্ষালাভের সুবিধার জন্য বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাকে সর্বদায় নানা প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকিতে হইত বলিয়া, তিনি গ্রন্থ রচনার জন্য অবসর অতি অল্পই পাইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বসমেত ৫২ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ উপক্রমণিকা ও তৎপরবর্তী ব্যাকরণগুলি তাঁহার নিজের পরিশ্রমের ফল। সংস্কৃত নানা গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া ঋজুপাঠ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপাল বধ, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া যতদূর সম্ভব মূল গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। সটিক অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রকাশের সময়ে ভারতবর্ষের নানা দেশীয় হস্তলিখিত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া পরস্পর মিলাইয়া মূল পাঠ নির্ণয় পূর্বক, অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, আর সেই কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁহাকে বহুক্লেশ ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পাঁচখানি ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ইংরাজীতে বিধবাবিবাহ তাঁহার নিজের রচনা, অপরগুলি সংগ্রহ মাত্র; অবশিষ্ট ৩০ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ। তন্মধ্যে ১৪ খানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। এই ১৪ খানির মধ্যে বর্ণপরিচয় প্রভৃতি কয়েকখানি তাঁহার নিজের রচনা; তদ্ভিন্ন সকলগুলিই হয় ইংরাজী, না হয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার দ্বারা অনুবাদিত কিংবা ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ভাবাবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৩ খানি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ। বহুপরিশ্রমে ও আকিঞ্চনে কৃষ্ণনগর রাজবাটী হইতে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট ১৩ খানি গ্রন্থ সাধারণ পাঠ্যপুস্তক। ইহার মধ্যে শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি কয়েকখানি অন্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ, বা ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি তাঁহার নিজের রচিত। সে সকল গ্রন্থে তাঁহার রচনার পারিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ তাঁহার মৌলিক রচনা শক্তির প্রচুর পরিচয় দিতেছে। তিনি ঐ

সকল গ্রন্থ রচনা বিষয়ে কাহারও নিকট ঋণী নহেন। অনন্ত বিস্তৃত পয়োধিবক্ষ যেমন বিন্দু বিন্দু বারিপাতে উপকৃত হয় না, বিচিত্রকর্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেমপ্রণোদিত-হৃদয়-পয়োধিও তদ্রূপ ঐ সকল গ্রন্থ রচনার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হয় নাই। সে হৃদয়ের সুগভীর তলদেশে যে অমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত ছিল, তৎ সমুদায় উত্তোলন করিয়া তিনি স্বরচিত ঐ সকল গ্রন্থের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শক্তি সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহার বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করুন। সামাজিক আগ্নেয়গিরির সেরূপ অগ্ন্যুদগীরণ ভারতে অতি অল্পই হইয়াছে। যে গ্রন্থের প্রবল প্রভাবে অধ্যাপকমণ্ডলী পরাভূত ও নতমস্তক, আপত্তিকারীদের জটিল প্রশ্ন মীমাংসিত ও কূটতর্ক নীরব, এবং যে গ্রন্থের ক্ষুরধারে সমাজনীতিজালের দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্নভিন্ন, সেই গ্রন্থেই তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক প্রতিভার পরিচয়, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও লোকসমাজ রক্ষার সদুপায় বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক, যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতে চাও, তাঁহার হৃদয়ের অপরিমেয় গভীরতায় যদি ডুবিতে চাও তবে, তাহার সেই বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ গ্রন্থ পাঠ কর।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী সাধারণের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্য, সাহিত্য নামের প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করে নাই। আমরা কয়েকখানি পুরাতন গ্রন্থ হইতে কোনো কোনো স্থান উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্যের যে কি দুরবস্থা ছিল, এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। বেতাল সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন: 'এক্ষণে যে সুশ্রাব্য সংস্কৃতশব্দসংশ্লিষ্ট বাঙ্গালা গদ্য রচনার বিশুদ্ধ রীতি প্রচলিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতিই তাহার মূল, কারণ, বেতাল পঞ্চবিংশতির পূর্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালা রচনা ছিল না। বিদ্যাসাগরই উহার সৃষ্টিকর্তা।' (২১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমৃত বর্ষিণী লেখনীর সুমিষ্ট ধারাসিঞ্চিত হইয়া সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা এই বলিয়া গর্ব করিয়াছেন:

'কি কারণ তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান।
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥'

২১ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

বাস্তবিকই সুধীরঞ্জন প্রাণের কথা বলিয়াছেন। বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচর্যাতে পরিতুষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবতী জননীর গৌরবস্ফীত উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষাসেবী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার ও প্রতিষ্ঠা সপ্রমাণ করিতেছে।

ইহার পূর্বে যে বঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা কেবল অনুস্বার বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত মাত্র। তাহার প্রমাণ এই ঃ

'অনেক বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা রচনা কালে কেবল অনুস্বার বিসর্গ শূন্য সংস্কৃত শব্দাবলীর যোজনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সেই 'উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্নবৎ' বিভীষিকাময়ী ভাষায় হৃদকম্প উপস্থিত হয়।' (২২) সত্যসত্যই যে ইহাতে কেবল হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাহা নহে, এইরূপ ভয়ঙ্কর পাঠ বিভ্রাট হইতে দূরে-সুদূরে থাকিতে পারিলেই রক্ষা, নতুবা ইহার চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। আর একটি প্রমাণ 'আজিও সংস্কৃত শাস্ত্রে পরম প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য মহাশয়দিগকে একপাতা বাঙ্গালা লিখিতে দিলে তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে কঠিন, জটিল ও দুর্বোধ্য রচনাতেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। আমাদের শুনা আছে যে এক সময় কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোনো বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্বক কহিয়াছিলেন —'এ কি হয়েছে! এ যে "বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা" হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!' (২৩) ইহাতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের আক্ষেপ করিবারই কথা। কারণ আচার বিচারে, শাস্ত্রে ও ব্যবহারে তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া লোকসমক্ষে দুর্বোধ্য হইয়া আছেন, এখন আর সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন না, সকল বিষয়ে সরল হওয়া সহসা সম্ভবপর নহে, এবং সংগতও বোধ করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর লোক হইয়াও সহজ কথা কহিতে ও সরল ভাষায় লিখিতে গিয়া স্বশ্রেণীচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চিন্তা ও শ্রম স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা নৈপুণ্যের বিশেষত্ব এই যে, একদিকে তিনি সীতার বনবাস, শকুন্তলা ও ভ্রান্তি বিলাস রচনা করিয়া ভাষার কোমলতা ও মধুরতার সৃষ্টি করিয়াছেন; আর একদিকে বিধবাবিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসঙ্গত সমালোচনা গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। আবার আর এক দিকে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়,

---

২২ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়', ১৯।

২৩ শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

কথামালা প্রভৃতি রচনা করিয়া শিশুদিগের পাঠোপযোগী সরল গদ্য গ্রন্থ রচনায় অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহার লেখনী এক দিকে বর্ণপরিচয়ের সরলতা অর্জন করিয়াছে, অন্যদিকে বেতালের লালিত্য ও জীবনচরিতের গাম্ভীর্যের পরিচয় দানে সফলতা লাভ করিয়াছে শত শত সাধুবাদে সে লেখনীর প্রশংসা পরিসমাপ্ত হয় না। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় এই সারল্য—গাম্ভীর্যের বিচিত্র মিলনমধ্যে অঙ্কুরিত রহিয়াছে। এইজন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বর্ণনির্মিত লেখনী উপহার দিবার মানস করিয়াছিলেন। বর্ণপরিচয়ের রচনার আর একটু সামান্য রকমের ইতিহাস আছে। সুপ্রসিদ্ধ ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। যাঁহারা অকৃত্রিম প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্যকলাপের সহিত অক্ষুন্ন যোগ রাখিয়া চলিয়াছেন সরকার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক জন। প্যারীবাবুর সদর বাটীর বৈঠকখানা ঘরে সর্বদায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সমাগমে মজলিস হইত। একদিনকার ঐরূপ মজলিসে বঙ্গদেশীয় বালকবালিকাগণের শিক্ষা লাভের সদুপায় সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠে। সেদিনকার বৈঠকের কথাবার্তায় স্থির হয় যে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ইংরাজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিকের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক রচনা করিবেন; আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের উপযোগী কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার পর উভয় বন্ধু ঐ উভয় ভাষায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া পথে পাল্কিতে বসিয়া বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবার বহুপূর্বে শিশুবোধ ও তৎপরে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশুশিক্ষাই একমাত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বর্তমান ছিল। এই শিশুপাঠ্য রচনাতে বর্ণযোজনা ও শব্দ নির্বাচনে তিনি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় স্বনামখ্যাত বান্ধব-সম্পাদক ও প্রভাতচিন্তা প্রণেতা শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ভিন্ন অপর কেহই তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও কয়েকখানি অতি সুন্দর ও সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়া শিশুদের বিবিধ সুবিধা সাধন করিয়াছে, তথাপি বর্ণবিন্যাস শব্দসংস্থাপনে আমাদের বিবেচনায় অনুপ্রাস থাকিলে কোমলমতি বালকগণের শিক্ষার সুবিধা হয় এবংইহাই কতকটা বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত। বর্তমান বর্ণমালা রচয়িতারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সেদিকে বেশী দৃষ্টি রাখেন বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের বিবেচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া রায় বাহাদুর মহাশয় শিশুদিগের পাঠ্য রচনায় বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার পুস্তকের ভূমিকার শেষভাগে লিখিয়াছেন, 'পুস্তক ক্ষুদ্র

কিন্তু বিষয় গুরুতর। আমি যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই।' আমরা অকপটে বলিতে পারি, শিশুশিক্ষার উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর তিনিই প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা প্রথম যখন উক্ত "বর্ণপাঠ" দেখিয়াছিলাম, আমাদের মনে শৈশবের পিতৃসহবাস, পিতার উপদেশ ও চাণক্যের শ্লোক সকলের আবৃত্তির কথা স্মরণ হইয়াছিল। কালসহকারে তাহার রচিত এই অপূর্ব "বর্ণপাঠ"-এর আদর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বালকগণের পক্ষে শিক্ষা লাভ যাহাতে সহজ ও প্রীতিকর হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উপযোগিতা অর্জন করিয়া ও সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল বিষয়ে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত বহুদর্শী ব্যক্তিকেও কেহ কোনো পরামর্শ দিলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করতেন, এবং গুণানুরাগী বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না, বোধোদয়ের ভূমিকাই তাহার চিরস্থায়ী প্রমাণ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার আর এক কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্বে অন্য কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। আমরা তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণের রচনা হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তৎসমুদায়ে, ; ঃ ! ? বিরাম, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা চিহ্ন নাই; এ সকলের কিছুই সে কালে ব্যবহৃত হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ঐ চিহ্ন স্বপ্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ও বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন. ঐ সকল বিরাম চিহ্নের অভাবে পূর্ব রচনা পাঠ যে কতদুরূহ হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে সহজেই অনুভূত হয়, এ বিষয়ও বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে উপকৃত ও ঋণী।

সাহিত্যচর্চায় লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার ও লোক-শিক্ষার পথ সুগম ও সহজসাধ্য করিবার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে সংবাদ পত্র প্রচার প্রধানতম একটি। ইহার দ্বারা অতি অল্প দিন মধ্যে এদেশে জাতির উন্নতি সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে সাহিত্যচর্চার সহায়তা হয়, তাহা নহে, সংবাদপত্রে উপন্যাস, গল্প, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় লোক সর্বদা পরবর্তী সংখ্যা দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া থাকে। যে সংবাদ পত্র পাঠের জন্য লোক যত অধিক ব্যস্ত হয়, জনসমাজের উপর সেই সংবাদ পত্রের প্রভুত্বও তত অধিক। ইংলণ্ডে টাইমস্, ডেলি নিউজ্ প্রভৃতি সংবাদ পত্রই রাজত্ব করে। রাজশক্তি বিশিষ্ট হাউস্ অব্ কমন্সের পরেই এই সকল সংবাদ পত্রের স্থান। এদেশেও সমাজতত্ত্ব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পত্র সকল কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী, প্রভাকর এবং স্মৃতিমাত্রে পরিণত বঙ্গদর্শন, তৎপরে বান্ধব, বামাবোধিনী ভারত সংস্কারক তাহার

অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। বর্তমান সময়ে যে সকল সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র উপরোক্তরূপ শক্তিলাভ করিয়া বঙ্গের পরিচর্যা-ব্রতে নিযুক্ত, শ্রীরামপুরের খৃস্টীয় মিশনারী মার্সম্যান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত "সমাচার দর্পণ" তাহাদের পূর্বপুরুষ। ১৮১৮ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে মার্সম্যান সাহেব কর্তৃক "সমাচারদর্পণ" প্রকাশিত হয়। সমাচারদর্পণ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। সেকালের একখানি সংবাদপত্র ২৩ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া দেশের সেবা করিয়াছে, ইহাই সমাচার দর্পণের যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া গভর্নর জেনারেল মারকুইস অব হেস্টিংস ও তৎপরে লর্ড আমহার্স্ট রাজসরকার হইতে অর্থব্যয় করিয়া ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃস্টাব্দে মহাত্মা রামমোহন রায় পরিচালিত কৌমুদী, তৎপরে ১৮২২ খৃস্টাব্দে কৌমুদীর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সতীদাহের পক্ষ সমর্থনার্থ ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সমাচার চন্দ্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার পর ১৮৩০ খৃস্টাব্দের মাঘ মাস হইতে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তমহাশয় 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। প্রভাকরের প্রভায় পূর্ববর্তী সংবাদ পত্রগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রভাহীণ হইয়াছিল। চন্দ্রিকা ম্লানভাবে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছিল, তদ্দর্শনে কৌমুদীও বিলুপ্ত। প্রভাকরই বহুকাল ধরিয়া বহুগুণের আধার হইয়া করবিস্তারে চারিদিক আলোকিত করিয়াছিল, কিন্তু এ সকল ত হইল, সে সময়ে গদ্য রচনার যেরূপ দুর্দশা ছিল, সংবাদ পত্রের প্রবন্ধ সকলও সেইরূপ কদর্য ও কষ্টার্থপূর্ণ শব্দ সহযোগে রচিত হইত, সুতরাং তাহা পাঠকের পক্ষে তৃপ্তিবিধায়ক হইত না; কিন্তু পদ্যাংশ প্রায়ই হৃদ্য হইত। ক্রমে অল্পায়ু ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বহু সংখ্যক সংবাদপত্র নানা প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বজনপ্রিয় সংবাদ পত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। সে সংবাদ পত্রের নাম "সোমপ্রকাশ"। সারদাচরণ নামে সংস্কৃত কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ একটি ছাত্র বধির ছিলেন। তাঁহার রচনা-শক্তিরও বিশেষ প্রশংসা ছিল তাঁহার অন্য কোথাও কর্মকাজের সুবিধা হইবে না বলিয়া, তাঁহাকেই সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় ভার দেওয়া হইল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে ইহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংস্রব, উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়া সোমপ্রকাশ ত্বরায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল। বর্ধমান রাজবাটীতে মহাভারত অনুবাদ কার্যে সারদাচরণ নিযুক্ত হওয়ায়, সোমপ্রকাশ অল্পদিন পরেই প্রাতনামা ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনে উন্নতিপথে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহানুভূতি ও উৎসাহ হইতে সোমপ্রকাশ কখনও বঞ্চিত হয় নাই। ইহার প্রথম শ্রী সম্পাদনে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়া ইহাকে সর্বাবয়ব সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বেতাল যেমন বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচনার পথপ্রদর্শক, সোমপ্রকাশ সেইরূপ সুরুচিসঙ্গত উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্র প্রচারের পথপ্রদর্শক। সোমপ্রকাশ প্রচার ও তত্ত্ববোধিনীর সহায়তা করা ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও কোনো কোনো সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে লিখিয়াছেন। তিনি যখনই যাহাতে লিখিতেন, সেই সংবাদ পত্রই লোকের আদরের জিনিস হইত।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা রচনার শিক্ষানবিশী কালে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" গ্রন্থের আদ্যোপান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিয়া দিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসাগরের সহিত এই সংস্রবাধীন অক্ষয়বাবু আপনাকে উপকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" (২৪) বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়বাবুর স্থান অতি উচ্চে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালা ভাষার গঠনকার্যে একজন প্রধান উদ্যোগী। দারিদ্র নিপীড়িত ও রুগ্ন অক্ষয়কুমারের মাতৃভাষার পরিচর্যায় প্রীত হইয়া সুধীরঞ্জন লিখিয়াছিলেন ঃ

> 'কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
> পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয় কুমার ॥
> তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
> অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায় ॥'

আমাদের বক্তব্য এই যে, অক্ষয়বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক হইলেও বঙ্গসাহিত্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং সেই অগ্রসর হওয়ার পথে মহর্ষি ও বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর জীবনচরিতে লিখিত আছে ঃ 'গ্রন্থ সম্পাদক অক্ষয়বাবু সম্বন্ধে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রবন্ধগুলি রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত বসিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন···আনন্দবাবুর (রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু) নিকট অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধগুলি প্রেরিত হইত, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (তথায়) যাতায়াত ছিল। তিনি উহাঁকে ঐ প্রবন্ধগুলি দেখিতে বলিলে, উনি উহাঁর কথানুযায়ী দেখিয়া দিতেন। এই প্রকারে কিছু দিন যায়, পরে একদিন আনন্দবাবু পণ্ডিতবরকে বলেন, 'অক্ষয়বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।' ইনি বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁহাকে আসিতে বলিবেন,' তদনুযায়ী অক্ষয়বাবু ইহার পর একদিন আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'মহাশয় আমার প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিয়া আমাকে

---

২৪ বিদ্যানিধি প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, ৫৬ পৃষ্ঠা।

উপকৃত করেন। অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ করিলে বড় ভাল হইবে; চিরবাধিত ও বিশেষ উপকৃত হইব।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজার এই প্রথম আলাপ পরিচয়।' (২৫) বিজ্ঞবর রাজনারায়ণবাবু বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনাকালে বিদ্যাসাগব সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল:

'এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জন্‌সন স্বরূপ বিজ্ঞাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে অবগত নহেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয়বাবু কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্ত পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র; কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ বিচার পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল রচনাশক্তি নাই, এমন কথনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় ও তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগরের রচিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোনো কোনো অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার এক প্রকার স্বকপোল রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গ ভাষার অনেক পরিমাণে নির্মাণ ও পরিমার্জন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ আছে।' (২৬)

৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সি. আই. ই. মহাশয় লিখিয়াছেন: 'প্রবাদ আছে যে, রাজা রাম-মোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধু-ভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদের ব্যবহার্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায়

২৫ অক্ষয় চরিত, ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা।

২৬ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু-কৃত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ২৬ পৃষ্ঠা।

কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের, বলিতেন না খদির বলিতেন। কদাচ 'চিনি' বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্যই' বলিতেন, কদাচিৎ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' বলিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোনো গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত কেননা কেহই তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যে কোনো শ্রীবৃদ্ধি হইত না এই সংস্কৃতানুরাগিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদের ভাষা সংস্কৃতানুরাগিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।' (২৭)

শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু আমাদের নিকটও ঠিক ঐরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,ঃ 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।' এ কয়টি কথায় বিনয় এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত 'স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—বিদ্যাসাগর আর কোনো কার্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত গ্রন্থাবলীর গুণে তিনি চিরকাল বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উহার পুষ্টিকর্তা ও সৌন্দর্য-বিধাতা, তাঁহার যত্নে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য সাধিত হয়। দশভুজা দুর্গার প্রতিমার খড় বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল, তিনি ঐ মাটি যথাস্থানে বিনস্ত করেন এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্তি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত ও চিত্রিত বেশে সজ্জিত করিয়া

২৭ ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভুমিকা।

দেবমণ্ডপ শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন।...তাঁহার মহাভারত ওবেতাল পঞ্চবিংশতিতে যেরূপ ওজস্বিতা শব্দপ্রয়োগ-বৈচিত্র্য দেখা যায় তাঁহার সীতার বনবাসে ও শকুন্তলায় সেইরূপ ললিত পদবিন্যাসের সহিত অসামান্য মাধুর্যগুণের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। সীতার বনবাস ও শকুন্তলা গদ্য রচনা তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শনস্থল।'(২৮)

তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন বহুসংখ্যক পুস্তক রচনার সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশের অভাবে শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই সকল অসম্পূর্ণ পুস্তকের রচনার ভার বন্ধুদিগকেও দিতেন। নীতিবোধ রচনা আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, 'তোমার ত সময় আছে, বসিয়া না থাকিয়া বইখানা লেখ না।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ও পরামর্শে রাজকৃষ্ণবাবু নীতিবোধের অবশিষ্ট ভাগ রচনা করিয়া পুস্তকখানি প্রচার করেন। এইরূপে আরও কোনো কোনো গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিয়া নিজে শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; ঐ সকল গ্রন্থ হয় অসম্পন্ন থাকিয়া গিয়াছে, না হয় কোনো বন্ধু তাঁহার অনুমতিক্রমে সে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু দিন হইতে ইচ্ছা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা করেন। এই অনুষ্ঠানের উপযোগী আয়োজনও করিয়াছিলেন। শেষদশায় যখন নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন সেই সময়ে একদিন স্বকৃতনামা শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম. এ, মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি আর্তভাবে বলিয়াছিলেন, 'বড় ইচ্ছা ছিল আর কিছু করিব, কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে, আমার দ্বারা যে আর কিছু হইবে এমন বোধ হয় না। তুই ত কর্মকাজ ছাড়িয়া দিয়া আসিলি, লেখা পড়া শিখিয়াছিস, আমি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, তুই আমার সে কাজের ভার নে দেখি।' আমরা সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নীলাম্বরবাবুর প্রস্থানের পর, ভয়ে ভয়ে কথাটা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। অমনি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'একখানা বই লিখিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু শরীরের এমনই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে কোনো মতেই আর সে কাজে হাত দিতে পারিতেছি না।' ব্যাপারটা জানিবার জন্য কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল, আস্তে আস্তে বলিলাম, 'আপনার কি লিখিবার সাধ এখনও মিটে নাই? এমন কি বই লিখিবার ইচ্ছা আছে, যাহার জন্য এত পূর্ব হইতে আয়োজন করিতেছেন?' তখন আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, 'ভারতবর্ষের

---

২৮ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রবন্ধ, ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা।

একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার জন্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কেবল শরীর ভাল নয় বলিয়া আজ কাল করিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।' প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধের অসুস্থ শরীর লইয়া সমগ্র ভারতের পূর্ণাবয়বসম্পন্ন ইতিহাস লিখিবার আয়োজন ও উদ্যম ভারতবর্ষে এক বিচিত্র ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন নীলাম্বরবাবুকে উক্ত কার্যের ভারার্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ত কর্মকাজ ছাড়িয়া দিয়া আসিলি, লেখাপড়াও শিখিয়াছিস্‌ তুই আমার সে কাজের ভার নে দেখি।' তখন সত্য সত্যই আমাদের মনে হইয়াছিল, ঐ মধুমাখা "তুই" সম্ভাষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে একবার ডাকুন। তাঁহার সে মিছরির দানা অপেক্ষা মিষ্ট ছোট ছোট "তুই", "তোর" ইত্যাদি উপহার যে পাইয়াছে, সে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অধিক সম্মান দেখান কিংবা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল বলিয়া মনে করি না। ক্ষুদ্র শিশির কণাতে প্রকাণ্ড মার্তণ্ডের পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ন্যায়, অথবা ক্ষুদ্র বালুকনাতে পৌর্ণমাসী যামিনীর দিগন্তপ্রসারিত আকাশের পরম সম্পদ পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হওয়ার ন্যায় তাঁহার সেই মধুমিষ্ট "তুই" সম্ভাষণের মধ্যে সমগ্র বিদ্যাসাগর-হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইত। তাঁহার সেই মমতার অনন্ত পারাবারে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'তুই' 'তোর' গুলি কোমলতার জীবন্ত বিন্দু সদৃশ বোধ হইত। তিনি তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক সুমিষ্ট সম্ভাষণে নীলাম্বরবাবুকে যখন আদর করিলেন, আমরা সেই অজ্ঞাতনামা পুরুষকে মনে মনে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলাম এবং তাঁহাকে নীলাম্বরবাবু বলিয়াই আমাদের প্রত্যয় জন্মিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। গুণের আদর করিতে কখনও কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। বহুকাল হইতে তিনি ৺মতিলাল শীলের গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া কত সময়ে আমাদের নিকট তাঁহার পৌরুষ ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ক আখ্যায়িকার বর্ণনা করিতেন। তিনি এই দুই মহাত্মার দুইখানি জীবনচরিত লিখিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নাই। তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, সেই জন্য আমরা যতই দুঃখ করি না কেন, তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই অক্ষয় কীর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গুণের গভীরতার পরিচয় দিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি সহকারে নূতনতর স্তরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য বিষয়ক মহীয়সী কীর্তি আরও উজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাইয়া বিদ্যার পরিসমাপ্তি করেন নাই। তাঁহার বিদ্যালাভাকাঙ্ক্ষা জীবনব্যাপী ব্যাপার ছিল।

শেষ দশায় নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও সর্বদা বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কিছু না কিছু সর্বদাই করিতেন, আর সর্বদাই কিছু করিবার সুবিধাও তাঁহার ছিল। তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকালয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দী পুস্তকে সে পুস্তকাগার পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চেষ্টায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, সে সকল পুস্তক ভিন্ন অসংখ্য সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে যেরূপ সংগৃহীত ও যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ইংরাজী গ্রন্থ সকলের সমাদরও যথেষ্ট করিতেন। সুপরিচিত ও গণনীয় ইংরাজ গ্রন্থকার রচিত সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পুস্তকাগারে পাওয়া যায়। কি সংস্কৃত কি ইংরেজী, কোনো নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা আনাইতেন; কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকে যে তাঁহার সংগ্রহ যেরূপ ছিল, তিনি সেরূপ বিদ্বান ছিলেন না। তাহা যদি হয়, তবে কোনো গ্রন্থে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা আছে এবং তাহার ভাষা কেমন ও কি কি তত্ত্ব তাহা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, তিনি প্রয়োজনমতো কিরূপে বলিতে পারিতেন? যে কোনো বিষয়ে যখনই কেহ কোনো কথা বলিয়াছেন তাহার উত্তরে তৎক্ষণাৎ কোনো সুপ্রবীন লেখকের অভিমত উল্লেখ করিয়া তদীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছি—স্কট্, সেক্সপিয়ায়, মিলটন, হক্‌স্‌লি, টিণ্ডেল, মিল্, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাজ কবি, উপন্যাসকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থগত বিষয়ের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। কথা এই যে সময়ের তিনি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, আধুনিক কালে তাহার দৃষ্টান্ত দিতে বিরল। তিনি পুস্তকাগারের শোভাবর্ধনার্থ কোনো পুস্তক ক্রয় করেন নাই, যাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পাঠ করিয়াছেন, পরে সে পুস্তক নিজের পছন্দমতো বাঁধাইয়া তবে তুলিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পুস্তক সকল বহু ব্যয়ে সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সুন্দররূপে বাঁধাইতেন।

একবার কোনো একজন সম্ভ্রান্তলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার পুস্তকাদি দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকগুলি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এরূপ বহুব্যয়ে এই পুস্তকগুলি বাঁধান কি ভাল?' তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, 'কেন, দোষ কি? প্রত্যুত্তরে বাবু বলিয়াছিলেন 'ঐ টাকায় অনেকের উপকার হইতে পারিত।' বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, শেষে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার এ শাল জোড়াটি কোথায় কত টাকায় খরিদ করিয়াছেন? জিনিসটি ত বেশ হইয়াছে।' বাবু একটু অসাবধান হইয়া শালের নানাবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'এ জোড়াটি পাঁচশত টাকায়

খরিদ ছিল।' বিদ্যাসাগর মহাশয় অমনি বলিলেন, 'পাঁচ সিকার কম্বলেও ত শীত ভাঙ্গে, তবে এত টাকার শাল জোড়াটা গায়ে দিবার প্রয়োজন কি? এ টাকায়ও ত অনেকের উপকার হইতে পারিত; আমি ত মোটা চাদর গায়ে দিয়া থাকি।' বাবুর সুবর্ণ মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল, ক্ষণকাল লজ্জায় মাথা হেট করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, 'আমি বড় অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।' রহস্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন, তাঁহার যেন কিছুই হয় নাই, কিন্তু বাবুটি যতক্ষণ রহিলেন তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা আর ফিরিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরল সহজ উক্তি তাঁহার মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।

পূর্বে তাঁহার লাইব্রেরি হইতে প্রয়োজনমতো বন্ধুবান্ধবদিগকে পুস্তক লইতে দিতেন। কোনো এক বন্ধু আবশ্যক মতো একখানি বহুমূল্য পুস্তক লইয়া যান। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পুস্তকখানি চাহিয়া পাঠাইলে, উক্ত বাবু বলিয়াছিলেন, 'সে বই আমি ফেরত দিয়া আসিয়াছি।' তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত ও মর্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কাহাকেও কখনো বই লইয়া যাইতে দিবেন না। যে বই এরূপে হারাইল সেখানি একখানি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ; জর্মানি ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আবার তাহাও পুনর্মুদ্রিত না হইলে, আবার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, ঐ বহুমূল্য গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো পরিচিত পুস্তক বিক্রেতা (Hawker) তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে আনিল। তিনি সেই বইখানি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল বিস্ময়বিজড়িত নীরবভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরক্ষণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এ বই কোথায় পেলে?' সে বলিল, '— বাবুর বাড়ি হইতে কিনিয়া আনিয়াছি।' নাম শুনিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বিক্রেতা যাঁহার নাম করিল, তিনিই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'সে বই আমি ফেরত দিয়া আসিয়াছি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুস্তকবিক্রেতা যে মূল্য চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া পুস্তকখানি ক্রয় করিলেন। যিনি নিজের পুস্তক অন্যকে পড়িতে দিয়া, পুনরায় সেই পুস্তকখানিই নিজে ক্রয় করিতে বাধ্য হন, মানুষের আচরণে ক্ষুব্ধ হইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই ঘটনার পর আর কখনও কাহাকেও এক টুকরা কাগজও পুস্তকালয় হইতে লইয়া যাইতে দিতেন না।

সাহিত্য বিষয়ক আরও দু-এক কথা অন্য বিষয় উপলক্ষে বলিবার প্রয়োজন হইবে।

## সপ্তম অধ্যায় ॥ স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সাহায্যে ও ভারত-বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় জে. ই. ডি. বেথুন মহোদয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা মহানগরীতে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইলেও, ইহার অনেক পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮২০ খৃস্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের পাঠশালার পরীক্ষা গ্রহণ কালে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০টি বালিকা পরীক্ষা দিয়া নানাবিধ পারিতোষিক পাইয়াছিল। বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া হিন্দুপ্রধান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেনঃ 'মহিলা শিক্ষা সমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া বানান অতিশয় সন্তোষজনক।' (১) ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, ঐ বৎসরের পূর্ব হইতে কলিকাতায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের সন্তোষজনক ফল দর্শনে উৎসাহিত হইয়া উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইণ্টালিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর উক্ত সমিতির হস্তে স্বরচিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য এবং উহা যে উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসন্তানদের রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া সুশিক্ষিতা আর্য মহিলাগণের নামোল্লেখ দ্বারা তিনি স্ত্রীশিক্ষার গৌরব বর্ধন করিয়া উক্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, এবং আরও বলিয়াছিলেন যে 'যদি এই স্ত্রীশিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে ইহার দ্বারায় প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।' (২) আমরা এই 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' এক খণ্ড সংগ্রহ

---

১ Raja Radhacaunt in his Report says, 'Several native girls educated by the Female Society were also examined whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure.' Biography of David Hare by Pyary Chand Mittra, Page 53.

২ 'Raja Radhacaunt offered the Society, the manuscript of a pamphlet in Bengali the 'Stri Siksha Vidhayaka' on the subject of female education the object of which was to show that female education was customary among the higher classes

করিয়াছি, এবং তাহা হইতে দুই-একটি আধুনিক অত্যাশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না ; 'আর এইক্ষণকার স্ত্রীদিগের মধ্যেও দেখ। মুরশিদাবাদে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণী রানী ভবানী ছিলেন, তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন রাজ্যের তাবৎ বিষয়কর্মের হিসাব আপনি দেখিয়া ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতেন।...আর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি বাল্যকালে নিজ গৃহ-কার্যের অবকাশে অধ্যয়নাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিত হইলেন যে, সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া গৌড়দেশীয় ও তদ্দেশীয় অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার সুখ্যাতি দেদীপ্যমানা হইয়া সেখানকার সকলে তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণাদি করিতেন এবং তিনিও সভায় আসিয়া সকল পণ্ডিত লোকের সহিত বিচার করিতেন। এবং জেলা ফরিদপুরের কোটালীপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীও মহামহোপাধ্যায়। ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। এবং কলিকাতার রাজবাটীর (৩) সকলেই প্রায় লেখাপড়া জানেন।' (৪) এইরূপ উৎসাহ পাইয়া তিন-চারি বৎসর এই মহিলা শিক্ষা-সমিতির কার্য বেশ চলিয়াছিল।

অনেকগুলি বালিকা বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে উপস্থিত হইত। কিন্তু পরিশেষে এই শুভানুষ্ঠানের প্রথম অঙ্কুর অর্থাভাবের উত্তপ্তক্ষেত্রে পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যায়। সকলের সমান আগ্রহ না থাকায় এবং যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে না পারায়, ইহা সূচনাতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিসমাপিত হইলে, পরবর্তী ২৫ বৎসর কাল ইহা শ্মশানভস্ম রূপে জনসাধারণে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। শাপগ্রস্তা অহল্যা যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পাষাণ কলেবরে কালাতিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে স্বমূর্তি পরিগ্রহ করিল ও নিজ কর্তব্য সাধন মানসে আপনার পথে চলিয়া গেল, তেমনি মানব-কুলের মুকুটস্বরূপ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে শ্মশানভস্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন উৎসাহে নূতন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হইল। বেথুনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে বঙ্গীয়

---

of Hindus, that the names of many Hindu females celebrated for their attainments were known, and that female education, 'if encouraged will be productive of most beneficial effects.' Page 55, Biography of David Hare.

৩ শোভাবাজার রাজবাটী

৪ স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, ১৫/১৬ পৃষ্ঠা।

অবলাকুলের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে কাজে যেমন গুরু, সেকাজে তেমনি শিষ্যও জুটিয়া থাকে। বেথুন বড় [ লাটের ] দরবারের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। বেতন পাইতেন অনেক টাকা। মান সম্ভ্রমে বড় লাটের প্রায় তুল্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারে সরল অমায়িক লোক—বালকসদৃশ ছিলেন। তাঁহার নিকটস্থ হইলে তাঁহার সহিত কথা কহিলে বোধ হইত না যে, বড় লাটের বড় দরবারের ব্যবস্থা সচিবের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি, বোধ হইত যেন আপনাদের কোনো প্রবীণ আত্মীয় কিম্বা গুরুজনের সহিত আলাপ করিতেছি। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন মহাত্মা না হইলে কি এই নিগ্রহগ্রস্ত কৃষ্ণকায় জাতির প্রতি তাঁহার এমন গভীর প্রেমের সঞ্চার হইত? পরোপকারপরায়ণ বেথুন বঙ্গীয় ললনাগণের সুশিক্ষা সাধনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আর একজন কৃষ্ণকায় মহাপুরুষ পশ্চাৎ হইতে বেথুন-হৃদয়কে বঙ্গীয় কুলকন্যাদের কল্যাণ সাধনে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; ইনিই অমরকীর্তিসম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই সময়ে একবার হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কালেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণের পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা' রচনার বিষয় নির্ধারিত করেন। পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কালেজের নীলকমল ভাদুড়ী সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন। উক্ত প্রবন্ধ সে সময়ের সংবাদ পত্রে ও শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। পারিতোষিক বিতরণ সভায় স্ত্রীশিক্ষার পরম বন্ধু বেথুন উপস্থিত ছিলেন, এবং উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় অবলম্বনের জন্য এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদাই বেথুন-ভবনে গমন করিতেন। এই যাতায়াতে পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

বেথুন সে সময়কার শিক্ষা সমিতির সর্বাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপূর্বে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনপূর্বক বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল, ময়েট প্রভৃতি শিক্ষাবিভাগীয় সম্ভ্রান্ত কর্মচারিগণের এতই শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের কোনো কর্মই প্রায় তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হইত না। অতি অল্প দিনের মধ্যে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সহোদরাধিক ভ্রাতৃভাবের সূত্রপাত হইবার ইহাও একটি কারণ। ক্ষুদ্রকায়া তটিনী যেমন পর্বতদেহ অতিক্রম করিয়া নিম্ন দিকে অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তনা হইয়া প্রবল আবর্তে সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, বেথুন-বিদ্যাসাগর সৌহার্দও সেইরূপ ত্বরিতগতিসম্পন্না স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবলতর ও গভীরতর আকার ধারণ করিল, সেকালে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সখ্যই বঙ্গমহিলাগণের সৌভাগ্যাকাশে

মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, সেই বন্ধুতার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা এই, যেন সেই মণিকাঞ্চন-যোগ-প্রসূত অমৃতধারা চির-প্রবাহিত থাকিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার সিদ্ধিকামনায় তিনি নিজের শরীর, মন ধন, মান, সুখ ও সম্পদ—সকলই উৎসর্গ করিতে সর্বদা মুক্তহস্তে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা, তাঁহার এতাদৃশ গুণাবলীর চিরপক্ষপাতী ছিলেন। গুণময় বিদ্যাসাগর-বন্ধুমণ্ডলী শত শত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর হইলেন। এই কার্যে সহায়তা করিতে গিয়া, সে সময় যাঁহারা সমাজকর্তৃক নীপিড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ৺রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বহুসম্মানাস্পদ মহোদয়গণের নামাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এরূপ ভাবে এই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের প্রত্যেকেই বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্য সে সময়ে ইঁহাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সে উপদ্রবকে উপদ্রব বলিয়া মনে করেন নাই। দৌরাত্ম্যের ভাগটা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরেই কিছু অধিক হইয়াছিল। কারণ সকলের মধ্যে তিনিই আবার তাঁহার ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য লোকের বিদ্বেষের পরিমাণটা তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। এ কার্যের জন্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই নানা প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল; এমন কি সে সময়ে সংবাদ পত্র সকলও ইঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বেথুন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ও উন্নতি সাধন কল্পে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। বেথুন বিদ্যাসাগর সমভিব্যাহারে সর্বদায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিতেন। ডেভিড্ হেয়ারের ন্যায় বেথুনও আসিবার সময়ে বালিকাদিগের জন্য নানা প্রকার খেলিবার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। বিদ্যালয়ে আসিয়া বালিকাদিগকে ঐ সকল খেলনা দিতেন এবং বালক সাজিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। প্রমাণ: 'তিনি প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকাসুলভ জুগুপ্সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্লাদপূর্বক সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা

বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হওয়াতে লেডী ড্যালহৌসি প্রভৃতিও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন।' ৫) এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য বেশ সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। বেথুনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে অল্প দিন মধ্যে বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এতদিন বিদ্যালয়ের পৃথক আলয় ছিল না। বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোগী ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানাভাব নিবন্ধন কিছুদিন পরে, সেখান হইতে গোলদীঘির দক্ষিণপূর্ব কোণের বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। বালিকাদিগকে বিনা বেতনে ও তৎপরে অল্প বেতনে পড়ান হইত। শিক্ষকগণের বেতনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইত, তাহাও অধিকাংশ বেথুন আহ্লাদ সহকারে নিজ হইতে ব্যয় করিতেন। বালিকাদিগকে বাড়ি হইতে গাড়ি করিয়া আনিতে হইত, সেজন্যও মাসে মাসে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সমগ্র ব্যয়ের অধিকাংশই বেথুন সাহেব নিজে গ্রহণ করিয়া এই বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

১৮৫১ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালে বেথুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন। পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদূরব্যাপী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। সহৃদয় বেথুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাঁহার শেষ কার্য হইল। সহসা তাঁহার দুরারোগ্য জ্বরের সূচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় লোকলীলা সংবরণ করিলেন। বেথুন-বিয়োগে বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। ভারতের পরম বন্ধু বঙ্গমহিলাগণের চিরসুহৃদ বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া অতি বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তৎপরে বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক চিন্তা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শেষে নানা প্রকার মতদ্বৈধ নিবন্ধন তিনি বেথুন-বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পরিত্যাগ করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে বিদ্যালয়ের নাম ছিল হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়। বেথুন নিজের উইলের দ্বারা এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হয় এবং তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থে তাঁহারই নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে।

বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যালয় লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিপন্ন হন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর পত্নী সদাশয়া লেডী ক্যানিং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে অগ্রসর হন, এবং ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন।

৫ বিদ্যাভূষণ প্রণীত ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত, ২৩ পৃষ্ঠা।

লেডী ক্যানিং-এর চেষ্টায় রাজসরকার হইতে বিদ্যালয় রক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা হইয়াছিল। সেইজন্য পরবর্তী অনেক ঘটনাসূত্রে উক্ত বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে বেথুনের নামের দোহাই দিয়া এবং লেডী ক্যানিং-এর সহকারিতার উল্লেখ করিয়া বিদ্যালয়ের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সেকালে বেথুন বিদ্যালয়ের যে গাড়ীতে বালিকারা পড়িতে আসিত, তাহার গাত্রে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' এই শাস্ত্রবচন লিখিত থাকিত। এরূপ লিখিয়া দিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে বুঝিবে যে স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত ও সদাচারানুমোদিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সহজে কিছু বুঝিতে চায় না, অনেক স্থলে বুঝিয়াও বুঝে না, ষোল আনা বুঝিলেও তদনুসারে কাজ করিতে পারে না। এই স্ত্রীশিক্ষার স্রোত এত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। সে কালের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মাহাত্মাদের সহায়তায় যেরূপ সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিল, বর্তমান কালেও মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়, রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহায়তা ও সংস্রবে যে যথাবিধি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এক শ্রেণীর লোক চিরদিনই সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও তাহার দোষ প্রচার করিতে নিত্য ব্যস্ত। অন্যে ভাল খাইলে, ভাল পরিলে অন্যকে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে, যাহাদের চক্ষু টাটায়, সেরূপ উন্নতিকাতর লোকমণ্ডলী চিরদিনই কোনো প্রকার সদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে না হইতেই, তাহার সর্বনাশ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। ছায়া যেমন মনুষ্যের চিরসঙ্গী হইয়া সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করে, কোনো প্রকার শুভানুষ্ঠানের সূচনাতে বিরোধীদলের অভ্যুদয়ও চিরসহচররূপে বিরাজিত থাকা তদনুরূপ অপরিহার্য। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ত একটা অতি বৃহৎ ব্যাপার, গোল আলু প্রচলন সময়ে সুসভ্য ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে একটা ছোট খাট যুদ্ধ হইয়াছিল। কয়েকটা লোক সে বিরাট ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল, অনেকে জখমও হইয়াছিল। যে গোল আলু ভারতে নির্বিবাদে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথম প্রচলনে যখন সুসভ্য ইংরাজমন্ডলীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, তখন আর স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রচলনে কেন যে ভারতে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণ প্রকটিত হইবে না, ইহা আমাদের বোধাতীত। তবে একটা কথা এই যে, যাঁহারা গোল করেন তাঁহারাই আপনাদিগকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মনে করেন তাঁহারাই যেন ভারতের সুপবিত্র নামের মহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। এতাদৃশ্য সুসন্তানগণ যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে খড়্গহস্ত হন, তবে তাঁহারা তদ্দ্বারা আপনাদেরই অপদার্থতার

পরিচয় দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খনা ও লীলাবতীর নামে, সীতা ও সাবিত্রীর নামে, পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নামে গৌরবস্ফীত বক্ষে ও উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাওয়া তাহাদের ভাল দেখায় না। যে দেশ গার্গী ও আত্রেয়ীর নামে গৌরবান্বিত, যে দেশের শাস্ত্র বিশেষের গঠন কার্য রমণীর মুখনিসৃত ও পবিত্র উক্তি সকলের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, যে দেশে আধুনিক কালেও স্ত্রীলোক বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইয়া অধ্যাপক-মণ্ডলীর সভায় সমাদৃত, সে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ দেশে অধঃপতনের পরিচয়স্থল।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষা ত এক প্রকার প্রচলিত হইয়াছে, তবে আর এ সকল কথার অবতারণা কেন? অবতারণার কারণ এই যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশের লোকের অবজ্ঞা জন্মাইবার জন্য স্ত্রীশিক্ষার সংস্রবে এখনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুবুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সত্য সত্যই কি স্ত্রীশিক্ষা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার, না সাময়িক দেশাচারবিরুদ্ধ সংস্কার? হিন্দু সমাজের অভিভাবক স্থানীয় রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়াছেন ঃ

'অতএব তাহাদিগকে যেমন গৃহকার্যাদি শিক্ষা করান তেমনি বাল্যকালে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত হয়।...আর দ্বিতীয়তঃ কোন শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্ত্রীলোককে বিদ্যাভাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই।...নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্ত্রীলোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক, ইহাতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান অবশ্য কর্তব্য হয়।...এখন সকলের উচিত হয় যে আপন আপন পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতীস্ত্রীকে আনাইয়া বাটীতে রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং যাহারা নির্ধন তাহাদিগকে অনুমতি দিয়া যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎকাল পাঠশালায় পাঠান। (৬) তাঁহার বেলায় 'সাত খুন মাপ'। যখন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, নিজে বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন দোষ হয় নাই; দোষ হইল, যখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! এখন সেই চিরনীরব ও পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নামে নিন্দার দাগ পাড়িতে অগ্রসর হওয়া কি ভাল দেখায়? আমরা বুঝিতে পারি না দুরদৃষ্ট কোনটি? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের ঐরূপ অসঙ্গত সমালোচনা, না বিদ্যাসাগর মহাশয়েরন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রীশিক্ষা

৬ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রণীত স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৮।২০।২১।২২ পৃষ্ঠা।

প্রচারে সহকারিতা? জনৈক বিদুষী বঙ্গ-মহিলার কাব্য-কানন পরিভ্রমণ উপলক্ষে হিন্দুপ্রধান মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন: 'এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।' আর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন: 'একটি খাঁটি মন, একটি ঋজু হৃদয়, একটি সত্ত্বগুণের মূর্তি দেখিলাম।...মনে হইয়াছে আমাদের স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে।' (৭) বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধীদলের অসার ও ভ্রান্ত মতের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে?

নারিকেলের জল উত্তম বস্তু, কিন্তু কাংস্য পাত্রস্থ হইলে তাহার উৎকৃষ্টতা লোপ পাই—তাই বলিয়া কি ডাবের জল চিরনিষিদ্ধ, কেহ আর ডাবের জল পান করিবে না? পাত্রদোষে স্ত্রীশিক্ষার ফল মন্দ হইতে পারে, তাই বলিয়া জনসমাজের অর্ধাধিক লোককে নিরক্ষর করিয়া রাখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ? সে হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বোধ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাই মনুষ্যোচিত কার্য করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যাঁহারা বেথুন-বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাদৃশ কোনো ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেথুন-স্কুলের সংবাদ লইতেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির বৎসরাধিকাল পূর্বে, একদিন, তাঁহার প্রাচীন বন্ধু বোলপুর নিবাসী ৺প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনা নিবন্ধন পুত্রবধূ শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহকে বেথুন কালেজে স্থায়ীভাবে ভর্তি করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লেখেন, তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেমেন্দ্রবাবুর পত্নী সুশীলাবালাকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে গিয়া, বালিকা ও শিক্ষয়িত্রী দিগকে দেখিয়া আনন্দে অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। সত্যযুগের একটি ঝি তখনও জীবিত থাকিয়া পুরাতন কীর্তি কাহিনীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছিল, সে সম্মুখে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে যখন প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল এবং সেই পুরাতন কথা সকল স্মরণ করাইতে লাগিল, তখন মধুর প্রকৃতি বিদ্যাসাগর-হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সাগরে তুফান দেখা দিল, বানের জলের ন্যায় চক্ষু হইতে সবেগে জলধারা প্রবাহিত হইল। স্কুলের দালানে বেথুনের প্রস্তরমূর্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বহুক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। সেই পুরাতন দাসীকে নূতন বস্ত্র দিয়া আর সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া গৃহে আসিলেন।

---

৭ শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত কাব্যকুসুমাঞ্জলির সমালোচন-পুস্তিকা।

শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, দালান হইতে প্রাঙ্গণে অবতরণকালে দেখিলেন যে ৩/৪টি শিক্ষক মাত্র তাঁহার স্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিত হন, তখন সঙ্গে পালকি বেহারাদের জন্য একটি টাকা ছিল, তাহাই তাঁহাদের একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, তোমরাও এই যৎকিঞ্চিত জলযোগ করিও, বাদ যাওয়া বিধেয় নহে।' গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুনির্মল নীলাকাশসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয় বিশাদ মেঘে আবৃত হইল। তাঁহাকে অনেক সময়ে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন সে মুখমন্ডল যে ঘোর বিষাদের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম (৮) সেরূপ অতি অল্পই দেখিয়াছি। অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনার অসুখ কি খুব বাড়িয়াছে?' কোনো জবাব নাই। ক্ষণকাল পরে অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা আমাকে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে বসিলাম। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, 'না আমার অসুখ বাড়ে নাই। যেমন তেমনি আছে।' আমি বলিলাম, 'তবে আপনাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন?' তিনি বলিলেন, 'বেথুন স্কুলে গিয়াছিলাম, সব দেখে শুনে বড়ই সুখ হইল।' আমি হতভাগ্য, সাগরের তরঙ্গভঙ্গির তলদেশে কি অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাতে দুঃখ কি?' সেই বীরপুরুষ বিরোচিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, 'এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল, সে দেখিল না। নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া যে ব্যক্তি বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিত, আর নিজে ঘোড়া হইয়া, হামা দিয়া, বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়ায় চড়াইত। যাহার পিঠের উপর বালিকারা বসিয়া খেলা করিত সে দেখিল না।' এই বলিতে বলিতে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি নিজের পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, বেথুন-স্মৃতিই বিদ্যাসাগর-হৃদয়ে শোক-প্লাবন প্রবাহিত করিয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সন্দর্শনে তাহার উদার হৃদয়ে আনন্দের যে বিজলী- লীলা বিকশিত হইতেছিল সুহৃৎশোকজনিত ঘন অন্ধকারে তাহা অচিরে লুক্কায়িত হইল। তিনি গভীর বিষাদভরা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কি লোকই আসিয়াছিল!

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল কলিকাতার বেথুন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কার্যে সহায়তা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে মেদিনীপুর, বর্ধমান হুগলী ও নদীয়া জেলার নানাস্থানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সেই সকল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লইয়াই শিক্ষা-

৮ তিনি বেথুন-স্কুল হইতে আসিয়া যখন একাকী কালাতিপাত করিতে-ছিলেন ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত স্থায়ী মনান্তরের সূচনা হইয়াছিল। ( ১০০ পৃষ্ঠা ও কর্ম পরিত্যাগ বিষয়ক ১৩শ ও ১৪শ পত্র, ১১৬-১৭ পৃষ্ঠা ) বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ সকল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ছোট লাট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ সম্বন্ধে কোনো সরকারী কাগজপত্র কিংবা লিখিত আদেশ ছিল না। কাজে কাজেই অনাত্মীয়তা স্থলে ইয়ং সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। ঐ চারি জেলার নানাস্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমুদায় ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইজন পণ্ডিত ও একটি করিয়া দাসী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহাদের বেতন ভিন্ন অন্য ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক, লিখিবার কাগজ, শ্লেট, পেনসিল সমস্তই দিতে হইত। এই বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া কর্ম পরিত্যাগ করায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

বালিকাবিদ্যালয় বিষয়ক বিল মঞ্জুর না হওয়াতে, ছোট লাট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে অভিযোগ করিব, ঐ টাকা আমি নিজে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিব।' ৯) বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কর্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণে মর্মাহত হইয়া কেবল ঋণভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন তাহা নহে, পাঁচশত টাকার চাকুরিটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়েও তৎপরে বহুদিন পর্যন্ত আগ্রহসহকারে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্যে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের কেহ কেহ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। স্যার সিসিল বিডনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্যার সিসিল বিডন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশঃ 'প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,...এই বৎসরের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের ফণ্ডের মাসিক চাঁদা হিসাবে, এতৎসহ ১৬৫ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি।' (১০)

---

৯ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ১২৮ পৃষ্ঠা।

১০ My dear Pundit...I enclose a cheque for Rs: 165 on account of my subscription to your Female School Fund for April. May & June 1863—Yours very truly, C. Beadon.

দার্জিলিং, ১৭ আগস্ট, ১৮৬৬

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে।

প্রিয় মহাশয়,

এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে আমি বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য স্যার সিসিল বিডনের ১৮৬৬ সালের প্রথম অর্ধেকের মাসিক চাঁদা হিসাবে ৩৩০ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি। চেক্ বইখানি কলিকাতায় ফেলিয়া আসায় এইরূপ বিলম্ব হইয়াছে। (১১)

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
( স্বাক্ষর ) এইচ্ রাবান্

এই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। এই সমুদায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের বেতন ও বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকাদি হিসাবে মাসে মাসে অন্যূন ৩০ টাকা ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্যার বার্টল ফ্রেয়ারকে যে সুবৃহৎ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষ্যাবিষয়ক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল : "আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া সুখী হইবেন যে মফঃস্বলের যে সকল বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, সে সকল বিদ্যালয়ের কার্য বেশ চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা সমূহে স্ত্রীশিক্ষার আদর ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং এক একটি করিয়া বালিকা বিদ্যালয়ও সময়ে সময়ে স্থাপিত হইতেছে।' (১২)

---

১১ Pundia Iswarchandra Sarma, Derjeeling, August 1866

My dear sir...I have now the pleasure to enclose a cheque for Rs. 330 on account of Sir Cecil Beadon's subscription to the Female Schools for the first half of 1866. This would have been sent before but the cheque book was accidentaly left behind...Belive me, Yours very truly, [ H. Raban. ]

১২ The Hon. Sir Bratle Frere. Calcutta 11th Oct, 1863.

My dear Sir···You will, no doubt, be glad to hear that the mufusil Female Schools, to the aupport of which you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female Education has begun to be gradually appreciates by the people

তিনি কোনো কর্যের ভার লইয়া প্রতিকূল ঘটনা নিবন্ধন তাহা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, করিতে বসিয়া না করা, আশ্বাস দিয়া নিরাশ করা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। শত শত বাধা বিঘ্ন, অভাব ও অসুবিধায় পড়িয়াও যখন তিনি এইরূপে নিজ ব্যয়ে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রাণ রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের শেষভাগে পরহিতৈষণাব্রতধারিণী কুমারী কার্পেণ্টার ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। বালিকা কার্পেণ্টার মহাত্মা রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, 'রাজা রামমোহন রায়ই তাঁহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।' (১৩) তিনি জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতা বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষব্যাপী নরনারী মণ্ডলীকে আরও অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টারের শুভপদার্পণে ভারতের নানাস্থানে অভ্যর্থনা ও সমারোহের বহুবিধ আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতাও তন্নিকটবর্তী উপনগর সকলেও সেরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই। বরাহনগর ও উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারী কার্পেণ্টার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া বেথুন-সুহৃদ্ ও অবলাবান্ধব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তদনুসারে তদানীন্তন ডিরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখেন, সেই পত্র এই :

২৭শে নভেম্বর, ১৮৬৬

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

মিস্ কার্পেণ্টারের নাম অবশ্যই আপনি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আলাপ ও সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চাহেন। আপনি কি আগামী বৃহস্পতি বার সাড়ে এগারটার সময় বেথুন স্কুলে আসিতে পারেন? আমি তাঁহাকে সেই সময়ে বেথুন বিদ্যালয় প্রথম দেখাইবার জন্য লইয়া যাইব। একটু গোপন ভাবেই যাওয়া হইবে, আমাদের সঙ্গে অপর কেহ থাকিবে না, সেই জন্য আপনার সহিত আলাপ করাইয়া দিবার বেশ সুবিধা হইবে। ইহার পর আর এক সময়ে বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্ভবতঃ তিনি

---

of districts contiguous to Calcutta and schools are being opened from time to time...I remain, with great respect and esteem

Yours sincerely.

Iswarchandra Sarma.

১৩ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ২২২ পৃষ্ঠা।

খুব সম্মত। মিস্টার সিটনকার যতদিন কলিকাতায় ফিরিয়া না আসেন, ততদিন ঐরূপ প্রকাশ্যভাবে সকলের সহিত আলাপ স্থগিত রাখাই ভাল। (১৪)

একান্ত আপনারই
ডব্লিউ. এস. এট্‌কিন্‌সন্‌

মিস্‌ কার্পেণ্টারের সহিত পরিচয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল। আলাপ পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন কি মিস্‌ কার্পেণ্টার যেখানে যখন যাইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেন। সকল স্থানে না হইলেও, কোনো কোনো স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্‌ কার্পেণ্টারের সঙ্গী হইতেন। উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্‌ কার্পেণ্টারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। উড্রো ও এটকিন্‌সন্‌ সাহেবও সেই সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগিগাড়িতে বালী স্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়িখানি উল্টাইয়া পড়ে, সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ি হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। গুরুতর আঘাতে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রাজপথের অনতিদূরে তিনি একস্থানে পতিত হইলেন, ঘোড়াও গাড়ি সমেত অন্যত্র পতিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া পথের লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই। মিস্‌ কার্পেণ্টারের গাড়ি আসিলে পর, তিনি সেই লোকারণ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সত্বরপদে নিকটে গেলেন এবং তিনি

---

27th Nov., 1866.

১৪ My dear Pundit,

Miss Carpenter, whose name you are no doubt acquainted with, is anxions to make your acqaintance and to talk to you about her projects for furthering Female Education in India. Could you come at the Bethune School to meet her on Thursday morning about half past 11 o'clock? I am going to take her there at that time for a first visit which is intended to be quite of a private character and it would be a good opportunity to introduce you to her. On another occasion I think she will probably be glad to meet the gentlemen of the Committee but it will be better to defer this till Mr. Seton Kerr has returned to Calcutta.

Yours very truly. (Sd). W. S. Atkinson

সেই পথের পার্শ্বে নিম্নভূমিতে বিদ্যাসাগরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিলেন এবং রুমাল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন ঃ 'যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। স্বশরীরে সেই একবারে স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম। সে দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মিস্ কার্পেণ্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।' বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখের ভাবে ও অশ্রুজলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গভীর ভক্তির চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই শকট হইতে পতনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সবল শরীরে দুর্বলতা এবং শান্ত চিত্তে অশান্তির সূত্রপাত করিল। তাঁহার যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁহার দেহ অপটু হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য নাশ হইল। মধ্যাহ্ন সূর্যের তীক্ষ্ন তেজ ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যাওয়াতে সে সময়ে চারিদিকে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়াছিল এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত গায়ক ধিরাজ এই ঘটনা অবলম্বনে এক গীত রচনা করিয়াছিলেন।

( 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর' গানের সুর )

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
করে তুলেছে তোলাপাড়ি, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কার্পেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মাদ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকেতাতে ( এবার ) বাঙ্গালীদের নে' পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এট্‌কিন্‌সন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ি উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে॥ (১৫)

সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যকৃতে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, ঐ স্থানের বেদনায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সুযোগ্য চিকিৎসকগণ যকৃতস্ফোটক ( লিবার এবসেস্ ) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, এবং সর্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংবাদ লইতেন। কলিকাতা ত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই ঃ

১৫ শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-বিষয়ক পুস্তিকা, ১৬ পৃষ্ঠা।

প্রিয় মহাশয়,—আপনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ; এবং সেইজন্য আমার ভয় হইতেছে, যে আগামী বুধবার প্রাতঃকালে আমার কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমি আগামী কল্য অপরাহ্ণ চারিটার সময়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিলে, আশা করি, আপনিও আসিবেন। (১৬)

আপনার চিরবিশ্বাসভাজন,
মেরি কার্পেণ্টার

বেথুন স্কুলে স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, মিস কার্পেণ্টারের এইরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং যাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা কার্যে পরিণত হইয়াও স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ী হইলে ফল কিরূপ হইত বলা যায় না।

স্যার উইলিয়ম গ্রে, মিস্টার সিটনকার, মিস্টার এট্‌কিন্‌সন্‌ প্রভৃতি সাহেবগণ এবং বাঙ্গালীদেরও কেহ কেহ মিস্‌ কার্পেণ্টারের উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাবে বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থায়ী সহানুভূতির অভাবেই, প্রধানতঃ উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্য মিস্‌ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবমতো বেথুন বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্যার উইলিয়ম গ্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং সেই কার্যের ঔচিত্যানৌচিত্য অবধারণের জন্য ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সে পত্রে তিনি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের পক্ষ সমর্থন ও তদভাবে বেথুন বিদ্যালয়ে বহু অর্থ ব্যয় যে বৃথা হইতেছে, তাহার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজের মত প্রবল রাখেন এবং যে বৃহৎ পত্রখানির চাপে সে সময়ের সে প্রবল আয়োজন বিফল হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

---

১৬ Dear Sir—I am very sorry that you are again ill, and fear therefore that I shall not have the pleasure of seeing you before I leave on Wednesday morning.

I asked several native friends to meet at my room tomorrow at 4 P. M. on Female Education and if you are well enough, I hope, you would come·

Believe me to remain,
Yours truly,
Mary Carpenter.

Government House,
Jany. 7. 1867.

সেই পত্র পাঠে দেখা যায় যে, তিনি কেমন সুন্দর উপায়ে সকল দিক বজায় রাখিয়া উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এত অধিক মাত্রায় অনুভব করিতেন বলিয়া, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম অবস্থায় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অতিমাত্রায় অগ্রসর হওয়ায় পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা সতর্ক হইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সুবিবেচনা-পরিচালিত পথে স্ত্রীশিক্ষার শৈশবকাল কাটিয়াছিল বলিয়াই আজ স্ত্রীশিক্ষার স্রোত কথঞ্চিৎ প্রবল গতিতে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বনে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পত্রে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই পত্রখানি এই ঃ

কলিকাতা
১লা অক্টোবর, ১৮৬৭

মাননীয় স্যার উইলিয়ম গ্রে
প্রিয় মহাশয়,

আপনার সহিত শেষ দেখা হওয়ার পর আমি বিশেষ সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছি, এবং বিশেষভাবে চিন্তাও করিয়াছি কিন্তু মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত হিন্দুসাধারণের গ্রহণোপযোগী একজন শিক্ষয়িত্রী, বেথুন স্কুলের হউক, বা অন্যত্রই হউক, প্রস্তুত করার পথে বিষম অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমার যে ধারণা আছে, সে ধারণার পরিবর্তন করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমার দৃঢ়রূপে এই প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, হিন্দুভাব ও হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; ইহার দ্বারা কোনোও শুভফলের প্রত্যাশা নাই বলিয়াই, আমি গভর্নমেণ্টকে সাক্ষাৎভাবে এই কার্যের ভার লইতে ন্যায়তঃ কোনো পরামর্শ দিতে পারি না। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু তাঁহার বয়ঃস্থা আত্মীয়াগণকে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে রত হইতে দিবেন না। তাঁহারা বর্তমান সময়ের সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া ১০।১১ বৎসরের বিবাহিতা বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে দেন না। একমাত্র আত্মীয়-স্বজনশূন্য অসহায়া বিধবাদিগকে এরূপ কার্যে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এদেশীয় পুরনারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উপযুক্ত কিনা, সে প্রশ্ন না তুলিয়া, আমি কেবল এই বলিতে চাই যে তাহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেই লোকের মনে আপনা আপনি নানা প্রকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ উপস্থিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা গভর্নমেণ্টের এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য সহজেই বিনষ্ট হইবে।

এই বিষয়ের সফলতা সাধনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সরকারী বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইয়াছে—এবিষয়ে (Grant-in-aid) অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি হওয়ায় লোকসাধারণের মনের ভাব বুঝিবার সুন্দর উপায় বলিয়াই বোধ হয়। যদি

এদেশের লোক মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করে, তাহা হইলে অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলে, গভর্নমেণ্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তখন তাহাদের কার্যের সহায়তা করিতে পারেন। যদিও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এদেশের অধিকাংশ লোকই ঐরূপ সাহায্যের প্রার্থী হইবে না, তথাপি যে সকল লোক ইহার সফলতায় অতিমাত্র আশা স্থাপন করিতেছেন, সত্য সত্যই যদি তাহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, গভর্নমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই অনুষ্ঠানের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

আমি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছি যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী তাঁহাদের কার্যে আমার বিশেষ আস্থা নাই। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের প্রচারিত নিয়ম বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাদের আর অনুযোগ করিবার কোনো সুযোগ থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে আমি স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি এবং যদ্যপি আমার স্বদেশীয়দিগের সামাজিক সংস্কার এরূপ দুরতিক্রমণীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে সকলের অগ্রে আমি এই কার্যের পোষকতা ও সহকারিতা করিতে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে কোনোমতেই এ কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং গভর্নমেণ্ট এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপনারাই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অপদস্থ হইবেন, তখন আমি কোনো মতেই এ কার্যে সহকারিতা করিতে সম্মত নহি।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই। এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি যে, তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া আমার মতে কোনো প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভারতে স্ত্রীজাতীর জ্ঞানোন্নতির চিহ্নরূপে, যে পরসেবাব্রত-পরায়ণ মহাত্মার নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্নমেণ্টের সাহায্য করা নিতান্ত কর্তব্য। তৎপরে ইহাও বাঞ্ছনীয় যে, এদেশের রাজধানীতে একটি সুপরিচালিত বালিকাবিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিয়া মফঃস্বলের নানাস্থানের বালিকা বিদ্যালয়সমূহের আদর্শরূপে কার্য করিতে পারে। হিন্দুসমাজের উপর বর্তমাণ বিদ্যালয়টির নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই বিদ্যালয়টি ইহার নিকটবর্তী জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিয়াছে। এইজন্য আমার বিবেচনায় বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই বিদ্যালয়টি রক্ষা করাতে যে লাভ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু বোধ হয় চেষ্টা করিলে ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতি সাধন উভয়ই করা যাইতে পারে। সুবিবেচনা

সহকারে চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি না করিয়া বোধ হয় অর্ধেক ব্যয় কমান যাইতে পারে।

আমি স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার মানস করিতেছি। যদি আপনি বেথুন স্কুলের নূতনরূপ ব্যবস্থা করিতে চান, আর সে বিষয়ে আমার মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কলিকাতায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে এবং এ বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে সানন্দে সম্মত আছি। (১৭)

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
( স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
সুন্দরবন, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৬৭

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে
প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১লা অক্টোবরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম। পত্রখানি বহুবিধ জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, আশা করি, আপনি কোনো কারণেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া স্থগিত রাখিবেন না। আমার বিশ্বাস এই যে স্থান পরিবর্তনে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবেন।

যদি আমি আর কয়েকদিন পরে কলিকাতা গিয়া আপনার সাক্ষাৎকাব লাভ করিতে পারি, বেথুন বিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারকার্য বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরম সুখী হইব, নতুবা আপনি অবসর মতো পত্রের দ্বারা আপনার অভিপ্রায় আমাকে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে লিখিয়া জানাইবেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোনো সাহেবসুভার নিকট পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন হইলে আমি সেজন্য আপনার একটু প্রয়োজন সাধন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিব। ১৫ই হইতে আমি বেলভেডিয়ারে থাকিব।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
( স্বাক্ষর ) ডব্লিউ· গ্রে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী তর্কবিতর্কের পর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য দান স্থির হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে। এক দিবস প্রয়োজনোপলক্ষে ভূতপূর্ব অবলা-বান্ধব-সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন ডেপুটী ইনস্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, প্রসঙ্গক্রমে উক্ত রায় বাহাদুর মহাশয় 'স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব

---

১৭ এই পত্রখানি অতি বৃহৎ, এজন্য আসল ইংরাজী পত্রখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম পরিত্যাগ বিষয়ক ইংরাজী পত্রাদির সহিত পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

দুই বৎসর ধরিয়া মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া আছে,' এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, যদি সম্ভব হয়,এখনও চেষ্টা করিতে পারেন। দ্বারিকবাবু এই উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং নিজেই ছাত্রী সংগ্রহের ভার লইলেন। তাঁহারই সংগৃহীত ৫।৬টি ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। প্রায় দেড় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়ের কার্য চলিয়াছিল। পরে সহসা সেই সময়ের বঙ্গীয় ছোট লাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বিদ্যালয় উঠাইয়া দেন। বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার কোনো বিশিষ্ট কারণের উল্লেখ নাই। (১৮) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিপথের এই অন্তরায় দূর হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। এখনও সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই।

মতভেদ নিবন্ধন, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুদের কাহারও কাহারও অত্যধিক উৎপীড়নে, শেষে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন হইত, তাহাতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হৃদয়ের পূর্ণ যোগ ছিল। কোথাও ঐরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইলে, তাহাতে সাহায্য করিতে কখন বিরত থাকিতেন না। পুরনারিগণের শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সম্মিলনী স্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিতেছে, সে সকলের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। উত্তরপাড়া হিতকারী, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতির কার্য-বিবরণ শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমরা কোনো সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার নিকট পুস্তকাদি সাহায্য প্রার্থনার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া যাইতাম। সে সময়ে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল সম্মিলনীর বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ঐরূপ কোনো সম্মিলনীর দ্বারা বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা হইতে শুনিলে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন। চলিত কথায় লোকে বলে 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী,' কিন্তু তিনি অল্প, অধিক সকল প্রকার বিদ্যারই উৎসাহদাতা ছিলেন। আজকাল মেয়েদের অল্প লেখা পড়া শিখায় বড় একটা আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষায় লোকের বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ-বহ্নি অত্যধিক মাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, বেথুন বিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম. এ. মহোদয়া যখন বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর আনন্দের

---

১৮ স্ত্রীশিক্ষার চিরসুহৃদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

পরিচায়ক এক প্রস্থ সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলী (১৯) উপহারসহ তাঁহাকে যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা সেই পত্রখানিকে সর্বাবয়বে অমর করিবার মানসে এখানে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। এবং উক্ত পারিতোষিকের প্রথম গ্রন্থে যেটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও যথাবৎ তুলিয়া দিলাম ঃ

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU,
The first Bengali Lady,
Who has obtained the Degree of Master of Arts,
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.
From her sincere Well-wisher
ISVARACHANDRA SARMA

তৎপরে অন্য সময়ে প্রয়োজন বশতঃ আরো একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এখানে প্রদত্ত হইল।

শ্রীহরিঃ শরণম্

সস্নেহসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার পিতৃব্যের (২০) প্রণীত যে দুইখানি পুস্তক পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু অনেক দিন অবধি আমার শরীরের যেরূপ মন্দ অবস্থা চলিতেছে, তাহাতে এক্ষণে ঐ পুস্তক পাঠ করি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই। কিঞ্চিত সুস্থ না হইলে, পুস্তক পাঠ করিতে ও তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বাটীর মেরামত হইতেছে ; এজন্য আমার পরিবারবর্গ অন্য এক বাটীতে আছেন। আমি অতি কষ্টে আপন বাটীতেই অবস্থিতি করিতেছি। আর দশ বার দিনে মেরামত শেষ হইবে। শেষ হইলে তোমাকে সংবাদ লিখিব। তখন তুমি ও রাধা উভয়ে আসিবে। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, দেখিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব, ইহা বলা বাহুল্য। আমার পরিবারবর্গ ভাল আছেন। ইতি ২৪ শ্রাবণ, ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

পুনশ্চ—৫।৬ দিন অতিশয় অসুস্থ ছিলাম। এজন্য এই পত্র লিখিতে এত বিলম্ব হইল, মনে কিছু করিও না। শ্রী ঈঃ

স্ত্রীশিক্ষার সংস্রবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের

---

১৯ Cassel's Illustrated Shakespeare—Edited and Annotated by Charles and Mary Cobden Clarke.

২০ পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বসু, এম. এ.

পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গললনাগণ, সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর, সকলে সমবেত হইয়া ১৬৭০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐ টাকা বেথুন বিদ্যালয়ের কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুগৃহের কোনো বালিকা তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে অগ্রসর হইলে, পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য তাহাকে উক্ত সঞ্চিত অর্থের আয় হইতে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসিনী রমণিগণের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির পরম সুহৃৎ; ভারতসন্তানদের মধ্যে বর্তমান যুগের প্রারম্ভে যুগপ্রবর্তক মহাত্মা রামমোহনের সহায়তা লাভ করিয়া যাঁহারা নানা বিপদে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ক্ষেত্রে, সেই পুণ্য কার্যে, মহাত্মা রামমোহনের পদাঁচহ্ন অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অধিকতর সুখের অবস্থায় স্থাপিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নারীসেবার সুবৃহৎ কীর্তিস্তম্ভ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অবলা রমণিগণ যাহা করিয়াছেন, আক্ষেপের বিষয় যে শতপ্রকারে উপকৃত সুশিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ তদনুরূপ কিছুই এ পর্যন্ত করিলেন না; বঙ্গরমণিগণ ধন্য! তাঁহারা দেবসুলভ গুণালঙ্কৃত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিন্দুপ্রমাণ কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। (২১)

২১ In the presence of His Excellency the Viceroy and Governor General of India – Lord Elgin, and many other notable European and Indian gentlemen—Bethune College – 5th March 1894—Report. The Committee beg to announce that they have recently received the sum of Rs. 1,670 from the Secretary to the Ladies' Vidyasagar Memorial Committee in Calcutta, for the establishment of an annual Scholarship tenable for two years to be awarded to a Hindu girl who after passing the Annual Examination in the Third Class of the School, desires to prepare herself for the University Entrance Examination. The late Pundit Iswar Chandra Vidyasagar was the co-adjutor and fellow-worker of Mr Bethune, when the School was founded and since then continued so long as he lived, to take the keenest interest in its welfare. It therefore a source of great gratification to the Committee to find that a body of Hindu Ladies in Calcutta should have interested themselves in this manner to perpetuate the memory of the late Pundit Vidyasagar, who during his life time, in addition to the philanthropic work to which he devoted his whole life, had done so much to promote Female Education in Bengal.

M. Ghose
Secretary.

## অষ্টম অধ্যায় ।। সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আদেশে সমগ্র ভারতব্যাপী প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত হয়। সেইদিন হইতেই বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে বৈধব্যজীবনের দুর্বিসহ ভারবহনের সূচনা হয়। ভারতললাটে যে সতী-বহ্নি চিরদিন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, যে হুতাশনে অসংখ্য হিন্দুরমণী স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতেছিলেন, যে জীবন্ত নারীভস্ম ভারতাকাশকে মলিন করিয়া রাখিয়াছিল, রামমোহনের সহকারিতায় ও বেণ্টিঙ্কের অঙ্গুলি সঞ্চালনে সেই বহ্নি চিরনির্বাপিত হইল—রামমোহনের আযৌবন সাধনায় ও বেণ্টিঙ্কের শুভদৃষ্টিপাতে সেই ভস্ম আকাশক্রোড় হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। চিতানলে পতিপার্শ্বে আত্মসমর্পণ করায় হিন্দুরমণী-চরিতের স্বর্গীয়-শোভা প্রতিভাত হইলেও—নারী-চরিতে অদ্ভুত সহিষ্ণুতার প্রকাশ পাইলেও, ভারতবাসী পুরুষগণ যে এই নির্মম ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং ইহাকে অক্ষুন্ন রাখিবার প্রয়াসী হইয়া আত্মগ্লানি ও নিন্দা-ভাজন হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার এতাদৃশ নারীচরিতে যাঁহারা দুর্বলহৃদয় ও তরল প্রকৃতির দোষারোপ করেন, তাঁহাদের ন্যায় অবিবেচক লোক পৃথিবীতে অধিক আছে বলিয়া বোধ হয় না। সহমরণে স্ত্রীজাতির বীরত্বের বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে আবার যহারা স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে ও সহাস্য বদনে সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় অনল-প্রবেশ করিতেন এবং ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে করিতে ভস্মে পরিণত হইতে প্রস্তুত হইতেন, জিজ্ঞাসা করি, তাদৃশ দেবীপ্রকৃতি সাধ্বী মহিলাদের পতিভক্তির ঋণ পরিশোধার্থে কয়জন সাধু পুরুষ পত্নীর অনু-গমন করিয়াছেন? পরলোকে পতিপার্শ্বে স্থানলাভের আকাঙ্ক্ষা পত্নীর পক্ষে যেমন বাঞ্ছনীয় পতির কি পত্নীর পার্শ্বে স্থান পাইবার আকাঙ্ক্ষা তদ্রূপ স্বাভাবিক হওয়া উচিত নহে? অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন যে, বনবাসিনী সীতার স্বর্ণময়ী মূর্তি নিকটে রাখিয়া শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। এতাদৃশ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে জন্মদুঃখিনী সীতার ন্যায় অগ্নিপ্রবেশই স্ত্রীজাতির পক্ষে ব্যবস্থা! আর দারান্তরগ্রহণ পতির পক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রসম্মত ও সদাচারানুমোদিত! এরূপ বিধিবৈষম্যের চিরপক্ষপাতী হওয়া কি মানবধর্মের অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে? পুরুষশক্তি প্রধান জনসমাজের পক্ষে অসহায়া রমণীকুলের জন্য বেদ, বিধি, ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া আপনারা যে সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল লোকের ন্যায় পথে পথে বিচরণ

করেন, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত ? যাহা হউক, পুণ্যনামা বেণ্টিঙ্কের বহু চেষ্টায় ভারতে অবলাজাতির জীবন্ত চিতানল নির্বাপিত হইল বটে, তৎপরিবর্তে তুষানলের সৃষ্টি হইল ! দুষ্কর ব্রহ্মচর্য আসিয়া পূর্ণমাত্রায় সতীদাহের স্থান অধিকার করিল। অনল আকারান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহের পরিবর্তে হৃদয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বালিকা, বৈধ্যব্যের সূচনা হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, রেণু-রেণু করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। সতীদাহে একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইত, এ আর চিরজীবনেও ফুরায় না। গৃহে যখনই আত্মীয়স্বজনগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে বর্ষীয়সী সীমন্তিনীর সকল প্রকার সুখসম্ভোগের পার্শ্বে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা সন্ন্যাসিনীর বেশে কালিমা-ময় বিষাদের জীবন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। সুপ্রবীণ পিতা নিজের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার বৈধব্যানুষ্ঠানের বিষাদরাশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। কোমলপ্রাণা কন্যা ও ভগিনীকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কি এইরূপই হইবে ? আর যে ব্রহ্মচর্যে চারিদিক্ অন্ধকার করে, সকলের হৃদয়-ভার বৃদ্ধি করে, যাহাকে দেখিবামাত্র অন্তরের জ্বালা শত সর্পদংশনের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়ে, তাহা কি ব্রহ্মচর্য ? ৺শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিয়া অচিরকাল মধ্যে যে ব্রহ্মচর্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং প্রবলের আত্মসুখের অনুরোধে দুর্বলের প্রতি যে সর্বদায় ঐরূপ ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই কি ব্রহ্মচর্য বলে ? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিতে না করিতে এই নীতি-বৈষম্য, এই আচার-বিভ্রাট দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাই বৃদ্ধ বাচস্পতির বালিকা স্ত্রীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বাহির বাটীতে আসিয়াছিলেন; জলযোগ করিতে বলিলে পর দারুণ মনস্তাপের সহিত বলিয়াছিলেন, 'এ ভিটায় আর জলস্পর্শ করিব না।' তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাজীবনের নানা প্রকার দুরবস্থা অবগত হইয়া, এই বিধবাজীবনে ব্রহ্মচর্যের একটানা স্রোতের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পতির স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া যাঁহারা কালাতিপাত করিতে সক্ষম ও সম্মত, তাঁহারা তাহাই করুন; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই সকল নারীমূর্তিধারিণী দেবতারা আত্মনিগ্রহ ও পরসেবায় পরম সম্পদ সম্ভোগ করিয়া চিরদিনই মানব-সমাজের সমক্ষে নিঃস্বার্থ প্রেমের ও পরমার্থপরায়ণতার আদর্শরূপে পূজা প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু যাঁহাদের পতিধর্মবিষয়ক কোনো জ্ঞানই নাই, অথবা যাঁহারা এই দুরূহ পথের পথিক হইতে অসমর্থ, লোকরক্ষা ও সমাজশৃঙ্খলার পক্ষপাতী নীতিকুশল মহাত্মারা সেরূপ অবস্থায় জীবন যাপনের জন্য ভিন্ন নিয়ম নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই নিয়ম নির্দেশের জন্য প্রভূত জ্ঞান, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও অপরিমেয় সহৃদয়তা থাকা আবশ্যক, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমাণ ছিল। তিনি বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, বিবিধ তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এবং বহুলোকের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপযোগী শক্তি সামর্থ্য অর্জন করিয়া সমাজসংস্কারের আয়োজন করিলেন। এইবার তিনি তাঁহার সেই বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজনে বদ্ধপরিকর হইলেন, যাহাতে তাঁহার মনুষ্যত্ব পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যে আয়োজনের ভারে সমগ্র দেশ টলমল করিয়াছে, তাহার যে সমরসজ্জায় ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সংকীর্ণতা-সম্বল লইয়া দূরে—সুদূরে পলায়ন করিয়াছিল, এইবার তাঁহার সেই বিরাট ব্যাপার, সেই মহাযজ্ঞের আয়োজন, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারতের সুপবিত্র ক্ষেত্রে অনেক মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, ঋষিরা কতশতবার বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতীয় সম্রাটগন বহুবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই মৃতপ্রায় অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভ্যুদয়িত হইয়া সমগ্র ভারতব্যাপী যে মহা আন্দোলনপূর্ব মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছি, যাহা কিছু গুণ-গরিমার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা লোপ পাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান লুকাইতে কাহারও সামর্থ্য হইবে না। দরিদ্রের গৃহে, পর্ণকুটীরে ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ভুলিতে পারে, দরিদ্র ঠাকুরদাস বহুকষ্টে তাঁহাকে লালন পালন করিয়া ছিলেন লোকে তাহা ভুলিতে পারে, বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া সংস্কৃত কালেজ হইতে বহির্গত হন, লোকে তাহাও ভুলিতে পারে লোকে একথাও ভুলিতে পারে যে, তিনি নিজের স্বাধীন প্রকৃতির অধীন হইয়া পরাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে ঘৃণা করিতেন বলিয়া ৫০০ টাকা বেতনের কর্মটি অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কর্মত্যাগ হইতে বিরত করিতে ছোটলাটের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধও ফলপ্রদ হয় নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সজীবতা ও শ্রী সম্পাদনে তিনি যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোকে ভুলিতে পারে, তিনি যে দুঃখীজনের দুঃখ মোচনে, আর্ত ও বিপন্নজনের সহায়তায় সদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণও জনসমাজ ভুলিতে পারে, কিন্তু ভারতে হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রচলন ভারতবাসী কোনো দিন ভুলিতে পারিবে না। হিন্দু সংসারের ইতর-ভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ চিরদিন এই অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে চিনিবে, তাঁহাকে জানিবে, তাঁহার কার্যকলাপ শুনিবার জন্য উৎকর্ণে অপেক্ষা করিবে। এই বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে তিনি জনসমাজ সমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে কত শক্তি ছিল, তাঁহার মনের বল কত অপরিমেয় ছিল, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং এতাদৃশ জটিল সামাজিক প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও

তাঁহার রণনৈপুণ্য কতদূর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে, তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল হইয়া থাকিবে। এই যে এক কার্য তিনি করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সমগ্র দেশবাসীর নিকট পরিচিত।

নিন্দা ও প্রশংসা, তিরস্কার ও পুরস্কার, অনাদর ও সম্মান, ইহারা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়াছে, এমন এক ভয়ঙ্কর আন্দোলনের ব্যাপার হইয়াছিল যে, আদালতে বিচারপতি ও উকিলগণ, দেবালয়ে তীর্থযাত্রী ও পুরোহিতগণ, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ, অন্তঃপুরে পুরাঙ্গনারা, মাঠে কৃষকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া আলোচনা করিয়াছে, আর 'বিদ্যাসাগর'-এর হয় নিন্দা নয় প্রশংসা করিয়াছে। সংবাদ পত্রের ত কথাই ছিল না। তাঁহার যে এত প্রতিপত্তি, তাঁহার যশ ও খ্যাতির যে এত বহু বিস্তৃতি তাহার পবিত্র নামে যে দেশের সমগ্র লোক মুগ্ধ বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা ও বিধবাদের বিবাহ দেওয়া তাহার প্রধান কারণ। বিধবাবিবাহের সপক্ষসমর্থন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা, এবং বিধবাবিবাহ দেওয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত। সেই ব্রত পালন ও উদ্‌যাপন করিতে তিনি জীবনের বহুমূল্য সময় ক্ষয় করিয়াছেন, উপার্জিত অর্থের প্রায় সমগ্র অংশ ব্যয় করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির সামাজিক ইতিহাসে বিধবা-বিবাহের চিন্তা কি এই প্রথম উপস্থিত হইল? না ধারাবাহিকরূপে প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, পূর্বেও এই বিধবাবিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এদেশীয় সামাজিক আচার ব্যবহারের যে অর্থবোধ হয়, তাহাতে শেষোক্তটিই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই সঙ্গতির পক্ষে বহুতর বিজ্ঞজনের গবেষণার ফল সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বিধবাবিবাহ-গ্রন্থই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অপর কোনো মহাত্মা কোনো উপলক্ষে ইহার স্বপক্ষে কোনো কথা বলিয়াছেন কি না, তাহাই আমরা সর্বাগ্রে আলোচনা করিব। এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকাতে ভারতে হিন্দুজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ক প্রবন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইত এবং তাহার মন্ত্র সকল কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা স্থলে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সেকালে মৃত পতির অনুগমন কালেও অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর কিংবা তদ্রূপ অপর কোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চিতায় অগ্নি প্রদানের পূর্বে তাহার বিধবার বাম হস্ত ধারণ পূর্বক চিতা হইতে নামাইয়া লইত এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া বিবাহ করিত। ঐ বিধবাও দ্বিতীয়বার বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার-ধর্ম পালন করিত। এইরূপে চিতা হইতে বিধবাকে তুলিয়া আনিবারও মন্ত্র ছিল, মন্ত্র থাকিলে অবশ্য ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাপার হইয়া

দাঁড়াইল। লোকে স্বেচ্ছামতো যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই সংস্রবে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদধৃত করা গেল '...এই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাক্য 'দিধিষু' আরণ্যক এই বাক্যের অভিধানসঙ্গত যে সহজ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে 'দিধিষু' অর্থে 'যে ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করে' কিম্বা কোন এক স্ত্রীর দ্বিতীয়বারে স্বামী; (১) বৈদিক কালে বিধবার বিবাহ যে আর্যজাতীয় রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত ছিল, ইহা বিভিন্নতর প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। অতি পুরাকাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় বিধবা-বিবাহকারী 'দিধিষু' পত্যন্তর গ্রহণকারিণী 'পরপূর্বা' দ্বিতীয় পতির ঔরসজাত 'পৌনর্ভব' প্রভৃতি শব্দের বিদ্যমানতাই বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকা সপ্রমাণ করিতেছে।' (২)

বিধবা বিবাহের চেষ্টা যে ভারতবর্ষে, কিংবা বঙ্গদেশে এই নূতন নহে, তাহার প্রমাণ আরও বহুবিধ উপায়ে সংগৃহীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে রাজা রাজবল্লভের বর্তমান বংশধর মহোদয়গণের কয়েকজন একত্র হইয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

'মহাশয়!

রাজা রাজবল্লভ তদানীন্তন সমাজ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নানাদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাও আনাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরনিবাসী কয়েকজন স্মার্ত ভট্টাচার্য রাজবল্লভের এ কার্যে

---

১ এই ব্যাখ্যার শেষভাগ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সে সময়ে কেবল বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল না, স্বামী বর্তমানে কোনো কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এরূপ স্ত্রীরও বিবাহ হইত।

২ The most important word in the mantra is didhishu. In the Aranyaka, he accepts it in its ordinary well-established dictionary meaning of a man 'who marries a widow, or the second husband of a woman twice married,...That re-marriage of widows in Vedie time was a national custom be easily established by a variety of proofs and arguments. The very fact of the Sanskrit language having from ancient times such. word as didhishu 'a man that has married a widow' parapurva 'a woman that has taken a second husband paunarbhava 'son of a woman by her second husband' are enough to establish it.'—On the funeral ceremonies of the ancient Hindsus. The J. A. S. B. 1870.

বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকমণ্ডলীর অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্র পাইবার জন্য রাজা রাজবল্লভ কয়েকজন অধ্যাপককে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সদনে প্রেরণ করেন। তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী অন্যান্য প্রদেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রদত্ত ব্যবস্থার শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রণাজাল ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ সে ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিতে সাহসী হন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে, বহু যত্ন সত্ত্বেও রাজা রাজবল্লভের প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। সার্বভৌম, বিদ্যাবাগীশ ও সিদ্ধান্ত, রাজবল্লভের এই তিন সভাপণ্ডিতের প্রথম দুইজন সহকারিতা করেন এবং শেষোক্ত পণ্ডিতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হস্তগত করিয়াছিলেন। এইজন্য সার্বভৌম ও বিদ্যাবাগীশ ও তাঁহাদের বংশধরেরা আজ পর্যন্ত রাজনগরসমাজে যেরূপ সমাদৃত, সিদ্ধান্ত ও তাঁহার বংশধরগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।'

'তৎপরে এই বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রসঙ্গে ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতে লিখিত আছে: বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্রসমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বিক্রমপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকায় প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব। তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তর সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা ইহা পাঠ করণান্তর কহিলেন, 'এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত।' ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন, 'এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া রাজবল্লভকে নিরাশ করিতে হইবেক। একজন বৈদ্যজাতীয়, এই যে চির অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করিয়া যাইবে, ইহা কোনো মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু এক্ষণে রাজ-বল্লভের যেরূপ প্রভাব তাহাতে আমি তাঁহাকে কোনোমতেই বিরক্ত করিতে পারি না; অতএব তাঁহার সন্তোষার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত, যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করিব এবং আপনারা অসম্মত হইলে,

আপনাদিগের প্রতি তাড়নাও করিব আপনারা এই কহিবেন যে মহারাজ বা কাহারও অনুরোধে আমরা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না।'

'অনন্তর পরদিবস রাজবল্লভের পণ্ডিতেরা রাজার সভাস্থ হইলে রাজা নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, রাজা রাজবল্লভ ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হইবেক। যদি শাস্ত্রসম্মত নাও হয় তথাপি যখন তিনি আমাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে এ ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিতে হইবেক। পণ্ডিতেরা রাজার পূর্ব নির্দেশানুসারে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, উক্ত ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রতিগমণ করিলেন। রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া এই মহৎ অনুষ্ঠান সাধনে ক্ষান্ত হইলেন। এই ঘটনার উল্লেখকালে গ্রন্থকার নানা প্রকারে আক্ষেপ করিয়া ফুটনোটে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আচরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন··· 'মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভ-এর প্রেরিত ব্যবস্থা পাঠ করিয়া বহু আক্ষেপ করিয়া কহেন, 'হায়, আমি কেন ইতিপূর্বে এ বিষয় সাধনে যত্নশীল হই নাই।' (৩)

আমাদের নীরবে অরণ্যে রোদন করাই ভাল। ভারতের দগ্ধভাগ্য ঈর্ষা পরায়ণতার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে চিরনিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাজায় রাজায় বিবাদ করিয়া ভারতের রাজশক্তি ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছে; যে সামাজিক জীবন একতাসূত্রে অধিকতর সজীব হইয়া উঠিবে, ঈর্ষাপরায়ণতার উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরস্পরের সংগ্রামে সেই একতাজাত-সমাজ শক্তির ক্ষয়ে পরস্পরের চিরবিচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ ও অনুতাপ উভয়ই তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। রাজা রাজবল্লভের সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহকারিতায় যে শতগুণে প্রবল হইত এবং এই অশেষ কল্যাণকর অনুষ্ঠান অনতিবিলম্বে সামাজিক পদ্ধতিতে পরিণত হইত, তাহাতে সন্দেহ কি আছে? প্রবল শক্তিপুঞ্জের পরস্পর সহকারিতায় যে কি অমৃত ফল উৎপন্ন হয়, বর্তমান ইংলণ্ড তাহার অধীন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজশক্তিনিচয়ের মিলিত উদ্যমও তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল, আর তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষণে কি বিষময় ফল ফলিয়া থাকে, বর্তমান ভারতসমাজ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে এ প্রশ্ন লইয়া বিব্রত তখন দেশে অধ্যাপক মণ্ডলী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও সাধারণ গৃহী লোকেরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিশিষ্টরূপ আবশ্যকতা সর্বদাই অনুভব করিত। যখনই কোথাও কাহারও বালিকা কন্যা বিধবা হইয়াছে, তখনই সেই স্নেহের পুতুল ক্ষুদ্রকায়া

---

৩ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত ৫৫, ৫৬ ও ১৪৫ পৃষ্ঠা

কোমলাঙ্গীর ভাবী দারুণ দাবদাহ স্মরণ করিয়া কোমল-হৃদয় স্ত্রীপুরুষ অশ্রু-বারি মোচন করিয়াছে এবং তাহার বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু সৎসাহস ও উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কেহ এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিত না। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় লোকমণ্ডলী অদৃষ্ট-বাদের অধীন হইয়া অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোনো প্রকার কাজে দীর্ঘকালব্যাপী আগ্রহ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনো কাজে, প্রথম দিনের আগ্রহ দ্বিতীয় দিবসে বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয় দিবসে নির্বাপিত হয়। এই জন্যই আমরা স্থিরভাবে কোনো কার্য করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার দশবৎসর পূর্বে এই কলিকাতার বহুবাজার নিবাসী ৺নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়ী লোক বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনকে লইয়া বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান চেষ্টায় দলবদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু কার্যকালে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। (৪)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের প্রয়াসী হন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পাইবার জন্য নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সভা অহ্বান করেন এবং পণ্ডিতগণ বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিয়াও সহসা লিখিত ব্যবস্থাপত্র দিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে রাজার বিশিষ্টরূপ আগ্রহে অনুরুদ্ধ হইয়া ব্যবস্থা দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থাপত্র পাইবার অতি অল্পই বিলম্ব ছিল, এমন সময় বাবু ব্রজনাথ মুখো-পাধ্যায়ও বারাসত নিবাসীবাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহোদয়দিগের কর্তৃক পরিচালিত হইয়া কৃষ্ণনগরের নব্য সম্প্রদায় সভাসমিতি করিয়া বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার কার্যে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সেই আন্দোলন স্রোতে সমগ্র নবদ্বীপ সমাজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। বীরনগর (উলা) নিবাসী জমিদার বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদলবলে এরূপ বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিলেন যে, সহজে সকল কার্য সুসিদ্ধ হইয়া উঠা কঠিন হইল। তাঁহার প্রতিপক্ষতায় কৃষ্ণনগরে বিধবাবিবাহ প্রচলনচেষ্টা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল ইত্যবসরে কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন প্রথম উপস্থিত করিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গৌরব-রবি যখন মধ্যাকাশ অতিক্রম করিতেছিল, যখন বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী তত্ত্ববোধিনী প্রকাশের দিন গণনা করিতেন, সেই সময়ে বিধবার বিষাদময়ী মূর্তি সন্দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়-নির্গত তরল অনলস্রোতে সেই মধ্যাহ্নসূর্যের প্রদীপ্ত-রশ্মিজাল-পরিশোভিত তত্ত্ব-

৪ সহোদর শম্ভুচন্দ্র প্রণীত জীবন চরিত, ১১২ পৃষ্ঠা

বোধিনীর ক্রোড় প্লাবিত হইয়াছিল। যে সকল প্রবন্ধ সে সময়ে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত মণ্ডলীমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সময় কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া কৃষ্ণনগরের এক সভায় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলের বৈধ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় কৃষ্ণনগরে নূতন করিয়া আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। এদিকে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথমে শিক্ষিতমণ্ডলী মধ্যে তৎপরে ক্রমে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমরঘোষণা প্রচারিত হইল।

অদৃষ্টবাদী ভারতবাসীর অবসাদ কুম্ভকর্ণের নিদ্রার ন্যায় যদি সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অনেক ফলপ্রদ শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক সময়েই অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে উদ্যম ও আগ্রহের ক্ষীণ রেখা সমাজ-সংগ্রামের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে অদৃশ্য হয়। সংস্কারপ্রার্থী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর-সজ্জা সেরূপ অকাল-নিদ্রাভঙ্গে আরম্ভ হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া চিন্তা করিয়া, বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া, বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, তৎপরে তিনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বালিকা বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত বোধ হইলেও, তিনি যতদিন শাস্ত্রের প্রমাণ পান নাই, ততদিন সাধননিরত হইয়া কেবল শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে, শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিতেই নিযুক্ত ছিলেন। এই শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া, কোনো সত্য নিরূপণ করা কি ভয়ানক কঠিন কার্য, তাহা সহজে অনুমিত হইবার নহে বহু পুরাতন কীটদস্ট অপরিচ্ছন্ন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রার্থ উদ্ধার করা, বোধ হয় রাবণের প্রহরিবেষ্ঠিত অশোককাননবাসিনী সীতার উদ্ধারসাধন অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার; কিরূপ ধীরপ্রকৃতি হইলে, কি পরিমাণ সহিষ্ণুতা থাকিলে একজন দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এইরূপ মহাসাধনে নিরত নিযুক্ত থাকিতে পারেন, আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারি না।

শুনিয়াছি, এই সময়ে তিনি দ্বিপ্রহর সময়ে কেবল একবার বন্ধুবর রাজকৃষ্ণবাবুর গৃহে আহার করিতে যাইতেন। কালেজের কার্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থ-কীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন। সন্ধ্যার পর কালেজের নিকটস্থ তাঁহার পরমবন্ধু শ্যামবাবুর বাটী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার আসিত, কোনো দিন বা ক্ষণকালের জন্য নিজে গিয়া শ্যামবাবুর বাটীতে জলযোগ করিয়া আসিতেন। এইরূপে বহুদিন কাটিয়াছে। শাস্ত্রালোচনায় এইরূপে নিয়ত নিযুক্ত থাকার সময়ে

একদিন রাত্রি শেষে একটা বিষয়ে শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে বাসায় যাইতেছিলেন, পথে সহসা প্রজ্ঞা দেবীর কৃপা হইল, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঐ শ্লোকের অর্থ কিরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ও ক্লিষ্ট মনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। তিনি গৃহে না গিয়া সংস্কৃত কালেজে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত শ্লোকের অর্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শাস্ত্র চর্চা করিতে করিতে রজনী শেষ হইল। প্রভাত সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া যখন তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল, প্রাতঃসূর্যের কোমল কিরণ রেখা সকল যখন গোপন পথে তাঁহার পাঠাগারে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। এতাদৃশী ঐকান্তিকতা না থাকিলে-'মন্ত্রের সাধন 'কিংবা শরীর পাতন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবন উৎসর্গ না করিলে কি কেহ কখন কোনো কার্যে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাজীবনের অবসাদ সন্দর্শনে মর্মাহত হইয়া তাঁহাদের কল্যাণার্থে শরীর ও মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন উৎসর্গের অমৃতময় ফল ত্বরায় ফলিল, তিনি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতে করিতে পরাশর সংহিতায়ঃ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

তিস্রঃ কোট্যোহর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥

এই শ্লোক তিনটি দেখিতে পাইলেন। এই শ্লোক দেখার সঙ্গে সঙ্গে—ইহার অর্থ সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ও মনে এক বিচিত্র উল্লাস প্রকাশ পাইল। আনন্দে দিশাহারা হইলেন, গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'পাইয়াছি পাইয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুদের কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি পাইয়াছ?' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মুখভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন, 'যাহার জন্য এতদিন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম আজ তাহা পাইয়াছি—পাইয়াছি'

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

আজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর আনন্দ ধরে না! আজ আনন্দে ডগমগ! আজ তাঁহার সে বিশাল হৃদয়-বারিধি-বক্ষে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে, সে লহরীলীলায় আজ তিনি নিজে মাতোয়ারা। তিনি যে রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ন্যায় আপনি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বালবিধবার দুর্দশা-মোচনের উপায় করিবেন, আজ তাঁহার সেই লুক্কায়িত সংকল্পের পূর্বাকাশে প্রতিজ্ঞাপালনের আশা-সূর্যের প্রথম আভাস দেখা দিয়াছে। শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থনে যে সত্য-রত্ন উদ্ধৃত হইল, অচিরকালমধ্যে তাহার দিগন্তব্যাপী আলোকচ্ছটা সন্দর্শনে লোক মুগ্ধ হইবে, ইহার প্রবল পরাক্রমে লোক নির্বাক হইবে এবং ভারতবাসী শাস্ত্রাদেশে অনুবর্তী হইয়া তাঁহার হৃদয়ের গভীর তৃপ্তি বিধান করিবে।

যখন শাস্ত্র সংগ্রহ হইল, যখন শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই শাস্ত্রাদেশকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর সহজ জ্ঞান ও সুযুক্তি মার্গ অবলম্বনে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। সেই প্রথম গ্রন্থ তত বৃহদায়তন হয় নাই। অল্পের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি দিয়া বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিলেন। পুস্তক রচনা করিলেন বটে, কিন্তু এখনও প্রচার করেন নাই। পুস্তক রচনা করিয়া সর্বাগ্রে পিতার নিকট গেলেন, পিতাকে গিয়া বলিলেন, 'দেখুন, আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিবাহের পক্ষসমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে, আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।' ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, 'যদি আমি এ বিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?' ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি আপনকার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার দেহত্যাগের পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিব।' পিতা পুত্রকে বলিলেন, 'আচ্ছা কাল একবার নির্জনে বসিয়া মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।' পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন: 'তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে?' পুত্র অমনি বলিলেন, 'হ্যাঁ তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' উদার-হৃদয় ঠাকুরদাস বলিলেন, 'তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।' পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পুলকপূর্ণ হৃদয়ে জননীসদনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মা, তুমি ত শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এই বইখানি লিখিয়াছি কিন্তু তোমার মত না পেলে এ বই আমি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি আছে।' সরলতার সৌম্যমূর্তি উন্নতমনা সহৃদয়া জননী ভগবতীদেবী অমনি বলিলেন, 'কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুশূল

মঙ্গলকর্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হইয়া, নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, যাহাদের দিন কাটিতেছে তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবার উপায় করিবে, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে (কর্তাকে) বলিও না।' পুত্র বলিলেন, 'কেন মা বলিব না?' জননী বলিলেন, 'তাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'বাবা মত দিয়াছেন।' করুণারূপিনী দেবী ভগবতী এই সংবাদ শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'তবে বেশ হয়েছে—তবে আর ভয় কি?'

এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন পিতা মাতার অনুমতি ও সহানুভূতি লাভ করিয়া বীরবেশে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, ঠিক সেই সময়ে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস (কর্মকার) নিজের বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়গণের নিকট ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলে পর ৺কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতিপয় স্মার্ত ভট্টাচার্য মিলিত হইয়া বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করিয়া যে ব্যবস্থা পত্র প্রদান করেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি ও অনুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

ব্যবস্থা ॥ শ্রীশ্রীদুর্গা

পরম পূজনীয় শ্রীযুত ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়গণ সমীপেষু

প্রশ্ন। নবশাখজাতীয় কোনো ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম ব্রহ্মচর্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষম দেখিয়া পুনর্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে ঐরূপ বিধবার পুনর্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না, আর এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিত আজ্ঞা হয়।

উত্তর। মন্বাদিশাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণানন্তরং ব্রহ্মচর্যসহমরণ-পুনর্ভবনানামন্যতরোপকর্ষেণ বিধবাধর্মতয়া বিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য-সহমরণ-রূপাদ্যকল্পদ্বয়েহসমর্থায়া অক্ষতযোন্যাঃ শূদ্রজাতীয়মৃতভর্তৃকবালায়াঃপাত্রান্তরেণ সহ পুনর্বিবাহঃ পুনর্ভবনরূপবিধবাধর্মত্বেন শাস্ত্রসিদ্ধ এবং যথাবিধি সংস্কৃতয়াশ্চ তস্যা দ্বিতীয়ভর্তৃভার্যাত্বং সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্মশাস্ত্র বিদ্বান্মতম্।

অত্র প্রমাণম্। মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণং বেতি শুদ্ধিতত্ত্বাদি ধৃতবিষ্ণুবচনম্। যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ইতি সা ছেদক্ষতযোনি স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি

বা। পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি চ মনুবচনম্। সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃসত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতীতিকুল্লূকভট্টব্যাখ্যানম্। নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্কচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনরিতি বচনন্তু দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ইতি নিয়োগমুপক্রম্য লিখনান্নিয়োগাঙ্গবিবাহনিষেধপরং ন সামান্যতো বিধবাবিবাহ-নিষেধকমন্যথাপুনর্ভবপ্রতিপাদকবচনয়োর্নির্বিষয়ত্বাপত্তি - রিতি-দত্তা-য়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চেত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতবৃহন্নারদীয়বচনং দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে ইতি তধৃতাদিত্যপুরানীয়বচনঞ্চ সময়ধর্ম-প্রতিপাদকতয়া ন নিত্যবদনুষ্ঠাননিষেধকম্। সত্যামপ্যত্র বিপ্রতিপত্তৌ প্রকৃতেক্ষতযোন্যাঃ পুনর্বিবাহস্য প্রস্তুতত্ত্বাৎ দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রম-গ্রহঃ। দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দান পরস্য বৈ॥ ইতি মদনপারিজাতধৃত-বচনেন সহ তয়োরেকবাক্যত্বেহক্ষতযোন্যা বালায়াঃ পুনর্বিবাহং ন তে প্রতিষেদ্ধং শক্নুতঃ প্রত্যুত ক্ষতযোন্যা বিবাহনিষেধকতয়া ব্যতিরেকমুখেনা-ক্ষতযোন্যাঃ পুনর্বিবাহমেব দ্যোতয়ত ইতি।

| | |
|---|---|
| জগন্নাথঃ শরণম্ | রামচন্দ্রঃ শরণং |
| শ্রীকাশীনাথ শর্মণাম্ | শ্রীমুক্তারাম শর্মণাম |
| শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি | শ্রীহরিঃ শরণং |
| শ্রীভবশঙ্কর শর্মণম্ | শ্রীঠাকুরদাস শর্মণাম্ |
| শ্রীরামঃ শরণম্ | কাশীনাথ শরণং |
| শ্রীরামতনু দেবশর্মণাম্ | শ্রীমধুসূদণ শর্মণাম্ |
| শ্রীরামঃ | শ্রীশঙ্করো জয়তি |
| শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্মণাম্ | শ্রীহরনাথ শর্মণাম্ |
| শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্মণাম্ | |

### ব্যবস্থার অনুবাদ

প্রশ্ন—নবশাখজাতীয় কোনও ব্যক্তির এক কন্যা, বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম ব্রহ্মচর্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে, ঐরূপ বিধবার পুনর্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কিনা; আর পুনর্বিবাহানন্তর, ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্তার শাস্ত্রানুমত ভার্যা হইবেক কি না; এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—মনু প্রভৃতির শাস্ত্রে, স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগের পর, ব্রহ্মচর্য, সহমরণ ও পুনর্বিবাহ, বিধবাদিগের ধর্ম বলিয়া বিহিত আছে। সুতরাং, যে

শূদ্রজাতীয় অক্ষতযোনি বিধবা ব্রহ্মচর্য ও সহমরণরূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক, অন্য পাত্রের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ; এবং যথাবিধানে বিবাহ সংস্কার হইলে, সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হওয়াও সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। ধর্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের এই মত।

এ বিষয়ে প্রমাণ—মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণং বা।

শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি ধৃত বিষ্ণুবচন।

পতিবিয়োগ হইলে ব্রহ্মচর্য কিংবা সহগমন।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্ গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

মনুবচন।

যে নারী, পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা, অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি, অথবা গত প্রত্যাগতা হয়, অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, পুনরায় পতিগৃহে আইসে, তাহার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে।

সা স্ত্রী যদ্যাক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতি।

কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যা।

সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি হইয়া, অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় পতির সহিত সেই স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

মনুবচন।

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে, কোন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাহ বিধি স্থলে বিধবার বিবাহের উল্লেখ নাই।

এই যে বচন আছে, তাদ্দ্বারা, নিয়োগের অঙ্গ যে বিবাহ, তাহাই নিষেধ হইতেছে; কারণ, নিয়োগ প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, এই বচন লিখিত

হইয়াছে ; নতুবা, সামান্যতঃ বিধবাবিবাহের নিষেধক নহে। যদি বিধবা-বিবাহের নিষেধক বল, তাহা হইলে, যে দুই বচনে স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহের বিধি আছে, সেই দুই বচনের স্থল থাকে না।

দত্তারাশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্যচ

উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বৃহন্নারদীয় বচন।

দত্তা কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান।

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে।

উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত আদিত্যপুরাণ বচন।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার দান।

এই দুই বচন সময়ধর্মবোধক, একেবারেই বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে। যদি এই মীমাংসায় আপত্তি থাকে, তথাপি মদন পারিজাত ধৃত—

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ।

দত্তক্ষতয়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য বৈ।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, বাণপ্রস্থাশ্রমগ্রহণ, বিবাহিতা ক্ষতযোনি কন্যার অন্য পাত্রে পুনর্দান।

এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে, ঐ দুই বচন অক্ষতযোনি কন্যার পুনর্বিবাহ নিবারণ করিতে পারে না ; বরং মদনপারিজাত ধৃত বচন, ক্ষতযোনির বিবাহ নিষেধ দ্বারা, অক্ষতযোনির পুনর্বিবাহের বোধকই হইতেছে।

উক্ত ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত স্বহস্তে লিখিত। কিছুদিন পরে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে আহূত এক সভায় বহুসংখ্যক অধ্যাপক সমক্ষে নবদ্বীপাগত স্মার্ত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত বিচারে স্বাক্ষরকারীদিগের অন্যতম ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে জয়ী হইয়া রাজবাটীতে এক জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিন্তু কাজের বেলায় ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় পুরস্কার প্রাপ্ত সালের জোড়া গায়ে দিয়া বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সহায়তা করিয়াছেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও বিদ্যারত্ন প্রদর্শিত পথে এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে অধিক বিলম্ব করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন : শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তিনি শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পূর্বোক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়-দিগকে ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসক জানিয়া তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও সেই প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাদের বোধ

থাকে, অথচ,...শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ ভদ্রের কর্ম করা হয় নাই। আর যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া বোধ থাকে, এবং সেই বোধ অনুসারেই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে এক্ষণে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও যথার্থ ভদ্রের কর্ম হইতেছে না।' -

'যাহা হউক আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহাদের এইরূপ রীতি সেই মহাপুরুষেরাই এদেশে ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসাকর্তা এবং তাঁহাদের বাক্যে ও অবস্থায় আস্থা করিয়াই এদেশের লোকদিগকে চলিতে হয়।'(৫)

ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার অধ্যাপকগণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর দুঃখের সহিত বলিতেন, 'আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি, আমার বিশ্বাস ছিল যে, এদেশের লোক শাস্ত্রানুগত, কিন্তু শেষে দেখিলাম. এদেশের লোক শাস্ত্র মানিয়া চলে না, লোকাচারই ইহাদের ধর্ম।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃদেব বলিয়াছিলেন, 'বাবা, ধরিবার পূর্বে ভাবা ও বুঝা উচিত, যখন বুঝে ধরেছ, তখন ছেড় না; কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে।' যেমন বাপ তেমনি ছেলে, কোনো কাজে হাত দিয়া ঠাকুরদাস কখনো পশ্চাৎপদ হইতেন না। ছেলেটিকেও ঠিক সেই ধরনের মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এমন বাপের এমন ছেলের সংখ্যা বাড়িবে না কি?

১৮৫৩ খৃস্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রচার করিবামাত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। সৈন্যসহ নেপোলিয়নের বিচরণে সমগ্র ইউরোপ যেমন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সমগ্র ভারতবর্ষও সেইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সংস্কার-সংগ্রামে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সর্বত্র বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহের আলোচনা হইতে লাগিল। কতদিক্ হইতে প্রতিবাদ আসিতে লাগিল, কত লোক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের ভ্রমপ্রমাদ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভাপ্রসূত সুসঙ্গত শাস্ত্রব্যাখ্যার ক্ষুরধারে প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ঐ সকল বিপক্ষপক্ষের কূট তর্কের মীমাংসা ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের শেষভাগে দ্বিতীয়বার বৃহদাকারে বিধবাবিবাহ গ্রন্থ প্রচার করেন।

উল্লিখিত বিধবাবিবাহ গ্রন্থের নানা স্থানে যে বিচার-নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার কোনো কোনো স্থান পাঠকের তৃপ্তিবিধানের জন্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

> 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।
> মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
> সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।

৫ বিধবাবিবাহ গ্রন্থ বিজ্ঞাপন, ৫ পৃষ্ঠা।

তিস্রঃ কোট্যোহর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥'

'স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম-পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্ধত্রিকোটী লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে।'

পরাশরসংহিতা কলিকালে লোকযাত্রা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রমার্গাবলম্বী গৃহীদিগের পক্ষে এই পরাশর সংহিতাই প্রধান অবলম্বন। ভারতচূড়ামণি মহাত্মা ব্যাস পরাশর সংহিতাকেই কলিযুগের সহজ ধর্ম পালনের প্রধান সহায় রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের যে সকল সংহিতা আছে,তৎসমুদায় পূর্ব পূর্ব যুগের জন্য রচিত। কলিযুগের সহজসাধ্য ধর্মপথ-প্রদর্শক মহাত্মা পরাশর। উপরোক্ত শ্লোকের যে স্বাভাবিক সহজ ও সরল অর্থ সাধিত হইতে পারে, তাঁহার বিপর্যয় ঘটাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক অনেকগুলি অধ্যাপক এমন কি, কোনো কোনো বিষয়ী লোকও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে যেরূপে পরাজিত করিয়াছেন, যেরূপ শ্লোকের পর শ্লোক ধরিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে কোন্ শ্লোকের সৃষ্টি এবং ঐ সকল মহাশয়ের দ্বারা সে সকলের কিরূপ অন্যায়ার্থ সংসাধিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার বুঝাইবার পদ্ধতি এত সহজ ও সুন্দর যে, যে ব্যক্তি লেখা পড়া কিছুই জানে না, তাঁহাকেও উক্ত গ্রন্থাবলম্বনে সমস্ত কথা বেশ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরাশর সংহিতায় বিবাহবিধি নির্দেশের সময়ে উপরোক্ত যে শ্লোকের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার ভিন্নার্থ সাধনের জন্য এবং সাধারণ লোককে উহার অন্য প্রকার তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য যিনি যত অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তত অধিক মাত্রায় কটূক্তি প্রয়োগ ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও মলিন রহস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচারস্থলে যেরূপ ধীরতা ও শান্ত ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা হইতে বিন্দু মাত্র বিচলিত হন নাই। প্রমাণ স্থলে একস্থান উদ্ধৃত করা গেল ঃ

'কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়েরা উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এইরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত নহেন। কেহ কেহ 'বিধবাবিবাহ' শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য হইয়াছেন এবং বিচার কালে ধৈর্য লোপ হইলে, তত্ত্বনির্ণয়কালে যে অল্প দৃষ্টি থাকে, অনেকের উত্তরেই

তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপূর্বক, যথার্থ অযথার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অভিপ্রায়ে তদ্রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক। যেহেতু এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন; সুতরাং শাস্ত্রীয় কথা উপলক্ষ্যে দুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে,উভয়পক্ষীয় প্রমাণ প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করিয়া তথ্যাতথ্য নির্ণয়েও সমর্থ নহেন। তাঁহারা যে কোনো প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; পরে কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই ঐ বিষয়কে একেবারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অধিকন্তু বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃতজ্ঞ নহে; সুতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থ-গ্রহ ও তাৎপর্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাহাদের বোধার্থে ভাষায় অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারা তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া অনেক মহাশয়ই স্বীয় অভিপ্রেত সাধনার্থে, অনেক স্থলেই স্বস্বধৃত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাদৃশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ কোনোও ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ছল ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক, মুনিবাক্যের বিপরীত ব্যাখ্যা লিখিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্থে অনায়াসে ও অক্ষুব্ধচিত্তে প্রচার করিবেন, কেহ আপাততঃ এরূপ বোধ করিতে পারেন না।'

'অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়; এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না। যাহা হউক সকলের এক প্রকার প্রবৃত্তি নহে; সুতরাং সকলেই এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য প্রবৃত্তিভেদের প্রধান কারণ। কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালী ভেদ অবলম্বন না করিয়া, যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহার উত্তরে যে পরিমাণে পরিহাস বাক্য ও কটূক্তি আছে, তাঁহার উত্তর সেই পরিমাণে অনেকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। অনেকের এবংবিধ উত্তরদান-প্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু একটি উত্তর পাঠ করিয়া, আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরীভূত হইয়াছে। উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাই; এক বর ঐ উত্তর লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই বর বয়সে বৃদ্ধ ও সর্বত্র সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও উত্তরপুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাসরসিকতা ও কটূক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন

করিয়াছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এ দেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে, যাঁহাকে দেশসুদ্ধ লোক একবাক্য হইয়া, সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সেই মহানুভব বৃদ্ধ মহাশয় কখনও ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু যিনি যে প্রণালীতে উত্তর প্রধান করুন না কেন, আমি উত্তরদাতা মহাশয়দিগের সকলের নিকটেই আপনাকে যৎপরনাস্তি উপকৃত স্বীকার করিতেছি, এবং তাহাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উত্তরদানে প্রবৃত্ত না হইলে, ইহাই প্রতীয়মান হইত, এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ও প্রধান মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরদান দ্বারা অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে, একেবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, আমি কত ক্ষোভ পাইতাম, বলিতে পারি না। তাহারা আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান সহকারে স্ব-স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন নানা ব্যক্তিতে নানা প্রণালীতে যতদূর পারেন, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক। এক্ষণে সেই কয়েকটি আপত্তির মীমাংসা হইলেই কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না, সে বিষয়ের সকল সংশয় নিরাকৃত হইতে পারিবেক।'

এক্ষণে পরাশর সংহিতার শ্লোক তিনটির যত প্রকার বিভিন্ন পাঠ দেওয়া হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান-সমূহের দশ জন অধ্যাপক মিলিত হইয়া এই মীমাংসা প্রচার করেন যে, পরাশর সংহিতায় বিবাহ-বিষয়ক বচনের অভিপ্রায় এই যে, যদি বাগদত্তা কন্যার বরের অনুদ্দেশাদি হয়, তাহা হইলে তাহার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইতে পারে, নতুবা বিবাহিতা, বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আপত্তি খণ্ডন স্থলে বলিয়াছেন: 'বিবাহিতার পঞ্চ প্রকার বিপৎপাতে পুনর্বিবাহের বিধানই উক্ত শ্লোকের স্বাভাবিক সরল অর্থ। কষ্টকল্পনা দ্বারা শব্দের অর্থান্তর কল্পনা না করিয়া অভিপ্রায়ান্তর প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকার মাধবাচার্য বিধবাবিবাহের বিদ্বেষী হইয়াও পরাশরের উপর্যুক্ত বচনকে বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ বিষয়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা:

'পরিবেদন ও পর্যাধানের ন্যায় প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীদিগের

পুনর্বার বিবাহের বিধি দেখাইয়াছেন, (৬) পুনর্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইয়াছেন, (৭) সহগমনে ব্রহ্মচর্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইয়াছেন, (৮) পরাশর বচন মাধবাচার্যের মতে বিধবাপ্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ বিধায়ক না হইলে, তিনি বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানে অধিক ফল, পরবচনের এরূপ আভাস দিতেন না; কারণ, পূর্ব বচন দ্বারা বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধি প্রতিপন্ন না হইলে, বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিলে, অধিক ফল, পর বচনের এই আভাস কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?'

'তৎপরে বাগ্‌দত্তার বিবাহবিধি না হইয়া বিবাহিতা, বিধবা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে ঐ শাস্ত্রবচন প্রযুজ্য তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইতেছেন ঃ নারদ সংহিতা দৃষ্টি করিলে, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে,' এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্‌দত্তা বিষয়ে কোনো ক্রমে সম্ভবিতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। যথা ঃ স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, ধর্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। স্বামীর অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রী আটবৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, স্ত্রীর যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর ইত্যাদি। (৯)...এই বচনে স্বামীর অনুদ্দেশ হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্বার বিবাহের যে বিধি আছে, তাহা কোনোও মতে বাগ্‌দত্তা বিষয়ে সম্ভবিতে পারে না। কারণ অনুদ্দেশ স্থলে সন্তান হইলে এক প্রকার কাল নিয়ম, আর সন্তান না হইলে, আর একপ্রকার কাল নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। বাগ্‌দত্তা বিষয়ে এই বিবাহবিধি হইলে, সন্তান হওয়া না হওয়া, এ কথার উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?'

'নারদ সংহিতা ও পরাশর সংহিতা এক সময়ের শাস্ত্র নহে, একখানি সত্যযুগের অপরখানি কলিযুগের শাস্ত্র। এরূপস্থলে যে আপত্তি উত্থাপন

---

৬ পরিবেদনপর্যাধানায়োরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ কীচদভানুজ্ঞাং দর্শয়তি 'নষ্টে মৃতে' ইত্যাদি।

৭ পুনরুদ্বাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্যব্রতানুষ্ঠানে শ্রেয়োহতিশয়ং দর্শয়তি 'মৃতে ভর্তরি যা নারী' ইত্যাদি।

৮ ব্রহ্মচর্যাদপ্যধিকং ফলমনুগমনে দর্শয়তি 'তিস্রঃ কোট্যোহর্ধকোটী চ যানি লোমানি' ইত্যাদি। বিধবাবিবাহ গ্রন্থ, ২২ পৃষ্ঠা।

৯ 'নষ্টো মৃতে' ইত্যাদির পর

অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥

ইত্যাদি বিধবাবিবাহ গ্রন্থ, ২৩ পৃষ্ঠা।

হইতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার খণ্ডনার্থে বলিয়াছেন : 'এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারদ সংহিতা সত্যযুগের শাস্ত্র যথার্থ বটে। কিন্তু নারদ বচনে যে, কয়েকটি শব্দ আছে, পরাশর বচনেও অবিকল সেই কয়েকটি শব্দ আছে, সুতরাং নারদ বচন দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, পরাশর বচন দ্বারাও অবশ্য সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইবেক। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, যুগভেদে অর্থভেদ হয়। সত্যযুগে যে শব্দের যে অর্থ ছিল, কলিযুগেও সেই অর্থই থাকিবেক, সন্দেহ নাই। সুতরাং, নারদ বচনে ও পরাশর বচনে যখন শব্দাংশে বিন্দুবিসর্গও ব্যত্যয় নাই, তখন অর্থাংশেও কোনো ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। ফলতঃ 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' এই বচন উভয় সংহিতাতেই একরূপ আছে, সুতরাং উভয় সংহিতাতেই নিঃসন্দেহে একরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবেক, তদ্বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি করিতে উদ্যত হওয়া কেবল অপ্রতিপত্তি-লাভ-প্রয়াস মাত্র। অতএব 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্দত্তা কন্যা বিষয়ে ঘটিতে পারে না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে।'

আমাদের এক বন্ধু একবার কোনো এক সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠকালে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর একটি গল্প করিয়াছেন। এক ব্যক্তি পথে বসিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে দেখিয়া এক পথিক তাহাকে জিজ্ঞাসিল 'ভাই কাঁদিতেছ কেন?' সে বলিল, 'আমার গরীব হোসেন মরিয়াছে।' আগন্তুক যেই এই কথা শুনিল, অমনি নিজের কোনো অন্তরঙ্গের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে যেন কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে চলিল। পথে আর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর, সে ব্যক্তি কাতরস্বরে গরীব হোসেনের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিল, সে ব্যক্তিও তখন কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন অনেকগুলি লোক কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কোনো এক বুদ্ধিমান লোক গরিব হোসেনের মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র 'হা হুতাশ'না করিয়া, ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, যাহার শোকে তুমি এত কাতর হইয়াছ, সে ব্যক্তি তোমার কে হয়?' তখন শোকার্ত ব্যক্তি বলিল, 'আমার কেহই নহে,' তখন প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কার কে হয়?' উত্তরদাতা পুনরপি বলিল, 'তাও জানি না'। তখন প্রশ্নকর্তা বলিল, 'তবে কাঁদিতেছ কেন?' তখন সেই ব্যক্তি কান্না থামাইয়া বলিল 'ভাই তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমার কাঁদিবার আগে জানা উচিত ছিল যে, যে মরিয়াছে সে কে? এখন জানিয়া আসিতেছি।' তখন ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শেষ সেই পথ প্রান্তে উপবিষ্ট শোকার্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তাহার অতি আদরের গরিব হোসেন তাহার পোষ্যবর্গভুক্ত একটি বলিবর্দ! তদ্রূপ বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু আচার-ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী বহুসংখ্যক লোক, ধর্মশাস্ত্র

সদাচারের বিপরীত পথে চলিয়াও, গর্বভরে ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসক ও ব্যাখ্যাকার বলিয়া সম্মানিতও স্বধর্মনিরত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকদিগের সমক্ষে নতমস্তক হওয়া এবং ইহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করা কি তাঁহাদের পক্ষে গরিব হোসেনের বিচ্ছেদে বিহ্বল হওয়া নহে ?

শাস্ত্র ত অনেক। ব্যাকরণ শাস্ত্র, কাব্য শাস্ত্র, সাহিত্য শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, পুরাণ শাস্ত্র, সংহিতা শাস্ত্র, উপনিষদ শাস্ত্র, বেদ শাস্ত্র দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সমস্ত শাস্ত্র। হউক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ভাবে গদ গদ হইবার পূর্বে কি একটিবার কোনো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা উচিত নহে, কোন্‌টি প্রামাণ্য আর কোন্‌টি অপ্রমাণ্য, কোন্‌টি সঙ্গত আর কোন্‌টি অসঙ্গত, কোনটি শাস্ত্রসম্মত আর কোন্‌টি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ? অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ও নিষ্ঠাবান্‌ সজ্জনের পক্ষে এই সকল বিষয়ের বিশদজ্ঞান লাভ এবং তদ্দ্বারা লোক-সমাজে-পরিচালন চেষ্টা বিধিসঙ্গত। আত্মকীর্তি ও আত্মতৃপ্তিবিরহিত হইয়া যাঁহারা শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে ও তদ্দ্বারা লোকরক্ষা ও সন্নীতিসংস্থাপনে প্রয়াসী হন, অবনীমণ্ডলে তাঁহারাই মানবের পথ-প্রদর্শক বলিয়া পরিগৃহীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই শ্রেণীর মহাজন। তিনি আত্মকীর্তি বিস্মৃত হইয়া, কেবল শুভ-সাধনার্থ মুক্তভাবে শাস্ত্রচর্চা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং এইজন্য শাস্ত্রবিশেষকে শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, বিশেষ ও সাধারণ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিতে এবং তাঁহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদান করিতে সাহস করিয়া ছিলেন। যাঁহারা লোক রক্ষা অপেক্ষা, জনসমাজের হিতসাধন অপেক্ষা, গূঢ়তা ও কূটত্ব রক্ষায় সমধিক আগ্রহশীল, তাঁহাদের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য নির্দেশ দ্বারা লোকযাত্রা নির্বাহ করিতে যাঁহারা সহায়তা করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সকল সুধী-মণ্ডলীর বরণীয় মহাত্মা লোক, কারণ তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থের নির্দেশ দ্বারা লোকসমাজ-পরিচালনের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অপর এক স্থানে বলিতেছেন ঃ

'বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ বচনের যেরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইল, তদনুসারে ঐ সকল বচন কোনো মতে কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষেধবাধক হইতেছে না। যদি নিষেধবাদীরা ঐ ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন, অর্থাৎ বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের ঐ সকল বচনকে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া আগ্রহপ্রদর্শন করেন, তবে এক্ষণে এই কথা বিবেচ্য হইতেছে যে, পরাশর সংহিতাতে বিধবাবিবাহ বিধি আছে, আর বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে, বিধবাবিবাহের নিষেধ আছে, ইহার মধ্যে কোন্‌ শাস্ত্র বলবৎ হইবেক ; অর্থাৎ পরাশরের বিধি অনুসারে বিধবাবিবাহ কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক, অথবা বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের

নিষেধ অনুসারে বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলিয়া স্থির করা যাইবেক। এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইলে, এই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ স্থলে তদীয় চলাচল বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভগবান বেদব্যাসের প্রণীত ধর্মসংহিতাতেও এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা, যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ। (১০) বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে না চলিয়া বেদ অনুসারে চলিতে হইবেক ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। পুরাণকর্তা স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়াছেন, স্মৃতি ও পুরাণে পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক, সুতরাং বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে যদিই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় তথাপি তদনুসারে না চলিয়া পরাশর সংহিতাতে বিধবাবিবাহের যে বিধি আছে তদনুসারে চলাই কর্তব্য স্থির হইতেছে।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিয়া কোনো কথা উপেক্ষা করিতে কিংবা কোনো প্রশ্ন গোপন করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি পুনরপি বলিতেছেন : অতএব কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম, তাহা নির্বিবাদে সিদ্ধ হইল। এক্ষণে এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র অনুসারে কর্তব্য কর্ম হইলেও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, ইহারই অনুসন্ধান করিতে হইবেক শিষ্টাচার কেমন স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত। ভগবান বশিষ্ট স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা :—কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম অবলম্বনীয় ; শাস্ত্রে বিধান না পাইলে, শিষ্টাচার প্রমাণ (১১) বশিষ্টশাস্ত্রে বিধির অসম্ভাব স্থলেই শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করার ব্যবস্থা আছে। অতএব কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম, এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না।

আদিপুরাণ, পরাশর ভাষ্যধৃত ক্রতু, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, আদিত্য পুরাণ

---

১০ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥
বিধবাবিবাহ, ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা।

১১ লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। বিধবাবিবাহ, ১৫ পৃষ্ঠা।

প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে বিবাহিতার পুনর্বিবাহের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। আর কলিযুগের বিশেষ ধর্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতার 'নষ্টে মৃতে' প্রভৃতি বচন দ্বারা বিবাহিতার পত্যন্তর গ্রহণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আবার কাত্যায়ন, বশিষ্ট ও নারদ যুগবিশেষ নির্দেশ না করিয়া সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছাচারী, চিররোগী, সগোত্র, দাস ও অন্য জাতীয় স্থির হইলে অথবা মরিলে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন। এই সকল বিসম্বাদী, কূট তর্কের সংশয় ছেদনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থির লক্ষ্য ও শরচালনা অতীব প্রীতিপদ। আমাদের একটু ভয় হইতেছে যে, যাঁহারা সেই সুবিস্তৃত সমালোচনা গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই, তাঁহারা হয়ত আমাদের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় বিশেষ তৃপ্তি লাভের সুযোগ পাইবেন না, স্থানের অল্পতা ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার বহুদর্শন ও শাস্ত্র জ্ঞানের আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। এই সমালোচনাপাঠে যদি কাহারও মনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত 'বিধবা-বিবাহ গ্রন্থ পাঠের আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বোল্লিখিত শাস্ত্র বিরোধের স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই: 'এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন: প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতাকর্তা মুনিদের বচনে, কয়েক স্থলে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল; তৎপরে আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। তদনন্তর পরাশর সংহিতাতে, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থল ধরিয়া কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে; সামান্য ও বিশেষ স্থলে, বিশেষ বিধি ও নিষেধই বলবান হয়, অর্থাৎ যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ খাটে। প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা সামান্যতঃ কোনো যুগের উল্লেখ না করিয়া, কয়েক স্থলে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন। ঐ বিধি সামান্যতঃ, সকল যুগের পক্ষে খাটিতে পারিত। কিন্তু আদি পুরাণ প্রভৃতিতে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া নিষেধ হইয়াছিল; সুতরাং ঐ নিষেধ কলিযুগের পক্ষে বিশেষ নিষেধ। এই নিমিত্ত, কাত্যায়ন প্রভৃতির সামান্য বিধি, কলিযুগে না খাটিয়া, কলিযুগ ভিন্ন অন্য তিন যুগে খাটিয়াছে এবং সকল স্থলেই বিবাহিতার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। কিন্তু পরাশর, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থল ধরিয়া কলিযুগের বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন; পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি হইতেছে। এই নিমিত্ত আদি পুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য অন্য স্থলে খাটিবেক; অর্থাৎ স্বামী পতিত, ক্লীব, অনুদ্দিষ্ট, কুলশীলহীন,

যথেচ্ছাচারী, চিররোগী অপস্মাররোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, মৃত, সগোত্র, দাস ও অন্য জাতীয় ইত্যাদির মধ্যে অনুদ্দিষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব, পতিত এই পাঁচ স্থলে পরাশরের বিশেষ বিধি খাটিবেক, তদতিরিক্ত স্থলে অর্থাৎ কুলশীলহীন, যথেচ্ছাচারী, চিররোগী অপস্মাররোগগ্রস্ত, সগোত্র, দাস অন্য জাতীয় ইত্যাদি স্থলে আদি পুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ খাটিবেক।

সামান্য ও বিশেষ বিধির নিষেধ স্থলে সচরাচর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন করিবেক। (১২) এস্থলে বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও স্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম করিবেক না, অশৌচান্তে পুনরায় করিবেক। (১৩) এস্থলে, জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন। দেখ, বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা অশৌচকালের দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে; অর্থাৎ জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসম্মত ও হিন্দু আচারানুমোদিত; পরাশর সংহিতার বচনত্রয়ের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল এবং আরও যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে, তৎসমুদায়ের শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা করিয়া তিনি পরাশর বচনের তাৎপর্য প্রবল ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সম্পূর্ণসক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহার উক্ত পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ প্রদান করিয়াছেনঃ ১। পরাশর-বচন বিবাহিতাবিষয়ক, বাগ্‌দত্তাবিষয়ক নহে। ২। পরাশর-বচন কলিযুগ বিষয়ক, যুগান্তর বিষয়ক নহে। ৩। পরাশরের বিবাহ বিধি মনুবিরুদ্ধ নহে। ৪। পরাশরের বিবাহ বিধি বেদবিরুদ্ধ নহে। ৫। বিবাহ বিধায়ক বচন পরাশরের, শঙ্খের নহে। ৬। বিবাহ বিধায়ক বচন পরাশরের, কৃত্রিম নহে। ৭। পরাশরের বচন বিবাহ-বিষয়ক, বিবাহ-নিষেধক নহে। ৮। দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন বিধবা-বিবাহের নিষেধ বোধক নহে। ৯। বৃহৎ পরাশর সংহিতা বিধবাবিবাহের নিষেধিকা নহে। ১০। পরাশর সংহিতা কেবল কলিধর্ম নির্ণায়ক, অন্যান্য যুগের ধর্মনির্ণায়ক নহে। ১১। পরাশর সংহিতা আদ্যোপান্ত কলিধর্ম-

---

১২ অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।

১৩ সন্ধ্যাং পঞ্চমহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম চ। তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া।

নির্ণায়ক, কেবল প্রথম দুই অধ্যায় কলিধর্ম নির্ণায়ক নহে ১২। পরাশর কেবল কলিধর্মবক্তা, অন্য যুগধর্ম লিখেন নাই। ১৩। পরাশর সংহিতায় চারি যুগের ধর্মোপদেশ প্রদান সপ্রমাণ হয় না। ১৪। কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ এই পরাশর বাক্য প্রশংসাপর নহে। ১৫। মনুসংহিতাতে চারিযুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিরূপণ করা নাই। ১৬। পরাশর সংহিতাতে পতিতভার্যা ত্যাগ নিষেধ ও পতিত প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নাই। ১৭। স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রমাণ্য আছে। ১৮। বাগ্দানের পর বরের অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার পুনর্দানের নিষেধ নাই। ১৯। পরাশরের বিবাহবিধি নীচজাতি বিষয়ে নহে। ২০। পিতা বিধবা কন্যাকে পুনরায় দান করিতে পারেন। ২১। বিধবার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক। ২২। প্রথম বিবাহের মন্ত্রই দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত্র। ২৩। বিবাহিত স্ত্রীবিবাহ বিবাহিত পুরুষবিবাহের ন্যায় অপ্রশস্ত কল্প। ২৪। দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ নহে।

তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত ভাবে শাস্ত্রের প্রমাণসহ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ যোল আনা শাস্ত্রসম্মত। কেবল আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিতে যে এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহা নহে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়ও আমাদের এই ধারণার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রমাণ ঃ 'এই পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দুসমাজে একবারে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্রাচীন হিন্দুরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক খৃষ্টিয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। অনেক ভট্টাচার্য মহাশয় এবং অনেক ধনবান লোক ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের সাহায্যে বিধবাবিবাহ-নিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাসাগর লিখিত পুস্তকে উত্তরস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো পুস্তকে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ গালি বর্ষণেরও ত্রুটি ছিল না। প্রায় সকল সংবাদ পত্র হইতেই বিদ্যাসাগরের উপর অনবরত প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু মহামনা বিদ্যাসাগর অবিকৃতচিত্তে সে সমুদায় সহ্য করিয়া ঐ বৎসরেই বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিলেন। ঐ পুস্তকে এরূপ পাণ্ডিত্য ও এরূপ গাম্ভীর্য সহকারে প্রতিপক্ষদিগের প্রদত্ত সর্ববিধ আপত্তির খণ্ডন করিলেন, এরূপ নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রার্থের মীমাংসা করিলেন ও দুর্বিগাহ শাস্ত্র বিচার সকল এরূপ সরল ও মধুর ভাষায় রচনা করিয়া জলবৎ সহজ করিয়া দিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই বিদ্যাসাগরকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হইল। ফলতঃ এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা, বুদ্ধি কৌশল, বহুদর্শিতা, সারগ্রাহিতা, মীমাংসকতা, বিনয়, গাম্ভীর্য প্রভৃতি অনেক গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের একজন সুবিজ্ঞ আত্মীয় কহিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ পুস্তকের শীর্ষস্থ পঙ্‌ক্তিগুলি যথা ঃ 'পরাশর বচন বিবাহিতা

বিষয়ক বাগ্‌দত্তা বিষয়ক নহে,' ইত্যাদি অক্ষরগুলি ইংরাজির ইটালিক অক্ষরের ন্যায় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইমাত্র উত্তর করেন, 'ইংরাজি জিওমেট্রির প্রতিজ্ঞাগুলি ইটালিক অক্ষরে আছে।' তাঁহার অভিপ্রায় এই যে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি যেরূপ অভ্রান্ত, অকাট্য যুক্তিপরম্পর দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, বিধবাবিবাহ পুস্তকের শীর্ষস্থ পঙ্‌ক্তিগুলিও তৎপরবর্তী বিচারের দ্বারা সেইরূপে নিঃসংশয়িত রূপে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় পুস্তকেরই শীর্ষস্থ প্রতিজ্ঞাগুলি একবিধ অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত। (১৪)

তৎপরে সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৫) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ; 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্বে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবধি ঐ প্রস্তাব লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও প্রধান বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এক এক পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার ঐ মতে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্প্রতি ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় এক পুস্তক প্রকটন করিয়া প্রতিবাদিগণের সমুদায় পুস্তকের একত্র উত্তর দিয়াছেন। ...তন্মধ্যে উপক্রম ভাগ পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিচার প্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাঁহার তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে সবিশেষ মনোযোগী না হইয়া অমূলক আপত্তি উপস্থিত করিতেই উদ্যত থাকেন। আর দেশাচার ও কুসংস্কার যে এতদ্দেশের কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, ঐ পুস্তকের উপসংহার ভাগে তাহা সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবৃত্তি করিলে, পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়।

বিধবা স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ নিরবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্বতোভাবেই কর্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারেও সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা ও ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে।

যাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধিশূন্য হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিস্তৃত

---

১৪ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৯২।৮৯৯ পৃষ্ঠা।

১৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৪র্থ কল্প, ১০৪ পৃষ্ঠা।

বিধবাবিবাহগ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারা কেবল বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা ও শাস্ত্রীয়তা সম্যক্ অনুভব করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া, কটূক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গ্রন্থ সমূহের যেরূপ শান্ত ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া. তাঁহাকে অসাধারণ ধৈর্যশীল, ক্ষমতাশালী, ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বোধে অবনতমস্তকে প্রণাম করিবেন।'

যখন বিধবাবিবাহ সর্বাংশে শাস্ত্রসিদ্ধ ও সদাচারসঙ্গত বলিয়া তিনি তাঁহার অনুরাগী বন্ধুমণ্ডলীর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, তখন কার সাধ্য, আর সে আগ্রহ ও উৎসাহের স্রোতঃ রোধ করে। বিধবাবিবাহ দিবার জন্য চারিদিকে আয়োজনের সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে বিধবাবিবাহ-পক্ষীয় লোকদের সমক্ষে আর এক গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। প্রশ্ন এই যে, বিধবার বিবাহান্তে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানেরা পাছে বর্তমান দায়ভাগ অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বত্ববান না হয়, এই আশঙ্কার নিরাকরণ জন্য সর্বাগ্রে গভর্নমেণ্টের নিকট হিন্দু দায়ভাগের সঙ্গতি রক্ষার জন্য আবেদন প্রেরণ করা হইল। কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক ভিন্ন অপর সকলেই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সেই আবেদন পত্রের অনুবাদ এবং সেই অসংখ্য স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্য হইতে সুপরিচিত মহোদয়গণের নামের তালিকা এতৎসহ প্রদান করা গেল ঃ (১৬)

বহুসম্মাস্পদ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা সমীপে

নিম্নস্বাক্ষরকারী বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের বিনীত নিবেদন এই যে—

১। বহুদিনের সামাজিক প্রথার দ্বারা হিন্দুসমাজমধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২। আবেদনকারীদিগের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই বিধবাবিবাহ নিষেধরীতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক। সমাজনীতি রক্ষার পক্ষে প্রবল অন্তরায় এবং সমাজের পক্ষে অন্য নানা প্রকারে বিবিধ বিষময় ফলোৎপাদক।

৩। অতি শৈশবকালে বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত থাকায়, বালিকারা অনেকস্থানে হাঁটিতে, কিংবা কথা কহিতে শিখিবার পূর্বেও বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য বিধবার জীবনভার অধিকতর ক্লেশদায়ক হইয়া পড়ে।

৪। আবেদনকারীদের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই বিধবাবিবাহ নিষেধ প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের কিংবা হিন্দুব্যবস্থাদর্শনের অনুমোদিত নহে।

৫। আবেদনকারীরা এবং অপর বহুসংখ্যক হিন্দু, বিধবাবিবাহে ধর্ম-

১৬ আসল ইংরাজী আবেদনপত্র পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে।

বুদ্ধির বিরোধ অনুভব করেন না, এবং সামাজিক আচার ব্যবহার কিংবা হিন্দুধর্মের ভ্রান্তব্যাখ্যার জন্য যদি কোনো প্রকার আপত্তি হয়, তাহা, তাঁহারা অবাধে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন।

৬। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং মাননীয়া মহারানীর প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে বর্তমানে হিন্দুদায়ভাগ যেরূপভাবে ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়া থাকে তদনুসারে বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ এবং ঐরূপ বিবাহজাত সন্তান সকল অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা।

৭। যে সকল হিন্দু ঐরূপ বিধবাবিবাহে নিজ নিজ ধর্মবুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুমোদন পাইয়া থাকেন, এবং যাঁহারা ধর্ম সামাজিক সংস্কারজাত বাধা উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ বিধবা বিবাহ করিতে সম্মত, আইনের পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা তাঁহাদের ঐরূপ বিবাহে বাধা জন্মাইতেছে।

৮। আবেদনকারীদের বিবেচনায় এইরূপ বোধ হয় যে, শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ নিবন্ধন যে সামাজিক বাধা গুরুতর আকার ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান, ব্যবস্থাপক সভার সে বাধা দূর করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

৯। বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর করা বহুসংখ্যক নিষ্ঠাবান ও বিশ্বাসী হিন্দুর ইচ্ছা ও ভাবের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং যাঁহারা একার্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং তজ্জন্য যাঁহাদের সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে কিংবা যাঁহারা সামাজিক সোকার্যার্থে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদী, বিধবাবিবাহ প্রচলনে এরূপ লোকমণ্ডলীর কোনো প্রকার অশুভ সাধিত হইবে না।

১০। পৃথিবীর অন্য কোথাও, অন্য কোনো জাতির মধ্যে, বিধবাবিবাহ এইরূপ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ নহে এবং এই অনুষ্ঠান মানবের সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য বলিয়াও বোধ হয় না।

১১। এই সকল হেতু বিদ্যমানে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা এই যে, মাননীয় ব্যবস্থাপক সভা ত্বরায় এই বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করিয়া নিম্নলিখিতরূপে এক ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচার করেন, যাহাতে হিন্দু বিধবা-বিবাহের সর্বপ্রকার বাধা বিদূরিত হয় এবং বিধবাবিবাহজাত সন্তানেরা বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

বিধবাবিবাহের বৈধতাসিদ্ধির উপযোগী এক পাণ্ডুলিপিসহ এই আবেদন পত্র ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়। এইরূপ আরও কয়েকখানি আবেদন পত্র পৃথক পৃথক প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে প্রায় এক সহস্র স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে

সুপরিচিতা সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১৭) উক্ত আবেদন

১৭জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপাড়া )
তারানাথ তর্কবাচস্পতি
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
শ্রীনাথ দাস
বিমলাচরণ দে
হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( পাথুরিয়াঘাটা )
কালিকুমার মল্লিক রায়
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
কালীকৃষ্ণ দত্ত ( নিবাঁধাই )
অক্ষয়কুমার দত্ত ( তত্ত্ববোধিনী )
কৈলাশচন্দ্রমুখোপাধ্যায়(রায়বাহাদুর)
নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( তত্ত্ববোধিনী)
হরিশ্চন্দ্র শর্মা ( ডাক্তার )
রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ( রায়বাহাদুর।
মুরলীধর সেন ( কলুটোলা )
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ( প্রভাকর )
দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য ( রায়বাহাদুর )
তিলকচন্দ্র তর্কালঙ্কার
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ( বিদ্যাসাগর )
দুর্গাদাস চূড়ামণি
কেশবচন্দ্র ন্যায়রত্ন
রাজারাম ন্যায়রত্ন
হীরালাল শীল ও তাঁহার সহোদরগণ
সাগর দত্ত
কানাইলাল দে ( রায়বাহাদুর )
ভোলানাথ চন্দ্র
প্রেমচাঁদ বড়াল ( রায়বাহাদুর )
দুর্গাচরণ লাহা ( মহারাজ )
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশীনাথ দত্ত ( হাটখোলা )
নীলমণি মিত্র ( এঞ্জিনিয়ার )
দ্বারকানাথ মিত্র ( জজ )
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জোড়াসাঁকো)
হরচন্দ্র ঘোষ ( জজ )
সোমনাথমুখোপাধ্যায়(সংস্কৃতকালেজ)
জগন্মোহন শর্মা ( তর্কালঙ্কার )
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ( সংস্কৃত কলেজ )
শ্যামাচরণ বসু ( সুকিয়া ষ্ট্রীট )
কৃষ্ণচন্দ্র রায় ( হিন্দু স্কুল )
রামগোপাল ঘোষ
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ( ডেঃ মঃ )
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যানিধি
অন্নদাপ্রসাদবন্দ্যোপাধ্যায়(ভবানীপুর)
রামরতন বিদ্যালঙ্কার
ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যাভূষণ
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
গোবিন্দচন্দ্র তর্কালঙ্কার
ব্রজমোহন বিদ্যাবাগীশ
প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন
রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার
রাজনারায়ণ বসু ( আঃ সঃ। দেওঘর )
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ( ডেঃ মাঃ )
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
রাধাচরণ বিদ্যারত্ন
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন
দিগম্বর ন্যায়বাগীশ
সীতানাথ সিদ্ধান্ত

পত্রে উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদারবাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালিকৃষ্ণ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয় বহুসংখ্যক স্বাক্ষরপূর্ণ অপর একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এতদ্ভিন্ন বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর স্বতন্ত্র এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, ঢাকার জমিদার ও অন্যান্য ধনী হিন্দুগণ, ময়মনসিংহের জমিদারদের অনেকে সমবেত হইয়া স্বতন্ত্র আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

মহারাজ মহাতাপ চাঁদের সহকারিতা উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য মাননীয় জে· পি· গ্রান্ট সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম এখানে প্রদত্ত হইল ঃ (১৮) "প্রিয় মহাশয়— আপনি অবশ্যই শুনিয়া সুখী হইবেন যে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান এক ব্যক্তি এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা বাস্তবিকই গভীর আনন্দের বিষয়...মহারাজ যেরূপ মার্জিত রুচির লোক, তাহাতে তাঁহার

---

| | |
|---|---|
| শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন | রামশঙ্কর বাচস্পতি |
| জয়গোপাল সিদ্ধান্তশেখর | গিরীশচন্দ্র চূড়ামণি |
| শ্যামাচরণ দে | গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন |
| শ্যামাচরণ লাহা | শ্যামাচরণ মুখো [ গঙ্গো ] পাধ্যায় |
| জয়গোবিন্দ লাহা | ( উত্তরপাড়া স্কুল ) |
| গৌরদাস বসাক | গিরীশচন্দ্র মিত্র ( ঝামাপুকুর ) |

১৮ The Hon'ble J. P. Grant My Dear Sir,—You will no doubt be glad to hear that His Highness the Maharaja of Burdwan has Promised his assistance to the furtherance of the sacred cause of the marriage of Hindu Widows···It is reall a matter for congratulation that the first man of Bengal is going to take up the cause ··He entertains such enlghtened views that we have every reason to hope for substantial assistance from him. The Maharaja is not a hasty man, nor does he consent to be led by others, but always thinks for himself and torms his opinions of things after mature deliberation. Now that His Highness is convinced of the goodness of the cause, I have no doubt that he will be its staunch friend and champion.

( Sd ) Isvara Chandra Sarma.

দ্বারা একার্যে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। মহারাজ চঞ্চলচিত্তের লোক নহেন, এবং অপরের দ্বারা পরিচালিত হইবারও পাত্র নহেন। তিনি স্বাধীনভাবে নিজের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন। এবং কোনো বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য নিজেই স্থির করিয়া থাকেন। এক্ষণে মহারাজ যখন বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এই অনুষ্ঠানের চির-সুহৃদ ও বিশেষ পক্ষপাতী হইবেন।'

প্রায় ২৫ সহস্র লোক সমবেত হইয়া উপরোক্ত আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দেশে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখে বিদ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ। বিধবাবিবাহের চেষ্টা কতদূর অগ্রসর হইল, সে সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারে এমন লোক, এমন সংবাদ পত্র, এমন পুস্তক বা পুস্তিকা লোকের বহু আগ্রহের জিনিস হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহের আন্দোলনের তরঙ্গ-তুফানে ভাসিয়া বিখ্যাত গায়ক দাশু রায় 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ে এক পালা পাঁচালি প্রস্তুত করেন। নানা স্থানে বিধবাবিবাহের গানও সেকালে হইত। এতদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহ নাটকও রচিত হইয়া কলিকাতায় সে কালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। শান্তিপুরের তাঁতিরা বহুমূল্য বস্ত্রের পাড়ের উপর বিধবাবিবাহের গান তুলিতে আরম্ভ করিল। বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক গানবিশিষ্ট শান্তিপুরের কাপড় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তিকলাপ বিশেষভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। কাপড়ের পাড়ে গান উঠা এই প্রথম। শান্তিপুরের তাঁতিরা এ নূতন পন্থা অবলম্বনে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন উপলক্ষে যে সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, সেগুলি এত দূরব্যাপী হইয়াছিল যে বঙ্গদেশের সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোক ঐ সকল গান গাহিয়াছে। আমরা শৈশবকাল 'উঠ গা তোল ওহে নৃপমণি,' 'ওরে রামশশী হবি বনবাসী, কে আমারে ডাকবে মা বলে' প্রভৃতি গানের ন্যায়, বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক গানগুলিও পল্লীগ্রামে, গরুর গাড়ির গাড়ওয়ানদিগকে পর্যন্ত গাহিতে শুনিয়াছি। তাহাদিগেরই মুখে বাল্যকালে শুনিয়াছি।

'বেঁচে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥' ইত্যাদি।

বিধবাবিবাহ বিধিবন্ধ হইবার সময়ে আন্দোলনও যথেষ্ট হইয়াছিল। আইনের পাণ্ডুলিপি প্রথম শুনানির সময়ে আইন প্রস্তাবক মাননীয় জে. পি. গ্রাণ্ট মহোদয় যে যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক উহা উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল: 'বর্তমান আইন দ্বারা ভারতবর্ষের হিন্দুগণের স্বাধীনভাবে সামাজিক জীবন যাপনে অন্তরায় দূর হইবে। অথচ যাঁহারা

এরূপ আইনের আবশ্যকতা অনুভব করেন না, তাঁহারা পূর্বের ন্যায় আপন ইচ্ছামতো কার্য করিতে পারিবেন। বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় কিংবা হিন্দুদিগের পক্ষে এই মতবিরোধ স্থলে কোনটি গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে বর্তমান আইন কিছুই বলিতেছে না। ইহার দ্বারা কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপের বাধা জন্মাইবে না, কেবল যাঁহারা একটু ভিন্ন প্রকারের রীতিনীতি ও উদার সামাজিক ভাবের অনুবর্তী, ইহার দ্বারা তাঁহাদের সামাজিক জীবন যাপনের পথের বাধা ও দুর্নীতি নিবারিত হইতেছে।" (১৯)

মাননীয় গ্রাণ্ট সাহেবের বক্তৃতার আর এক স্থানের কিয়দংশ এই 'তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মাননীয় বন্ধু স্যার জেমস্ কলভিল এখানে না থাকায় এই বিধবাবিবাহ আইন প্রার্থীদিগের ও স্বাক্ষরকারীদের প্রধানতম, সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য ও সুপরিচিত অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই আইনের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন।' (২০)

মাননীয় গ্রাণ্ট তাঁহার বক্তৃতার অপর একস্থানে বলিতেছেন: 'প্রায় তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু 'ল'-এর সার সঙ্কলনকর্তা সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিধবাবিবাহের চেষ্টায় প্রায় সফলকাম হইয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বহুসংখ্যক পণ্ডিতের ব্যবস্থাও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে বিফলমনোরথ হইয়া পড়েন। কোটার রাজাও বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়া শেষে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

---

১৯ The Bill now Presented will wipe out that blot in the Municipal Law of india. At the same·time it will leave all those Hindus who do not agree in the opinion of the petitioners precisely as they are now. It does not pretend to say what is the right interpretation of the directions for conduct in respect of marriage in the text-books; or which of the conflicting authorities ought to be followed by a Hindu. It will interfere with the tenets of no human being; but it will prevent the tenets of one set of men from inflicting misery and vice upon the families of their neighbours who are of a different and more humane persuasion.

২০ After his shonourable and learned friend to his right ( Sir

স্যার টমাস স্ট্রেঞ্জ হিন্দু দায়ভাগ বিষয়ের উল্লেখকালে বলিয়াছেন পুণার জনৈক উচ্চজাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকের বিধবা কন্যার বিবাহে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং সেই ব্যবস্থা অনুসারে বিধবার বিবাহও দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুগণ এই দুরন্ত সামাজিক প্রথার পরিবর্তন জন্য ইদানীন্তন কালে বহুবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নাগপুরের মহারাজা ব্রাহ্মণের প্রবন্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আইন বিষয়ক কমিশনের কাগজপত্র মধ্যে দেখিয়াছেন মাদ্রাজের একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ২০ বৎসর পূর্বে বিধবার বিবাহ বিষয়ক এইরূপ আইন প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন।' (২১)

বিধবাবিবাহ-বিধি প্রণয়নকালে ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার কোনো কোনো স্থান অতীব প্রীতিপদ এবং কোনো কোনো স্থান পাঠ করিতে বিধবা-জীবনের দারুণ দুঃখের প্রতি মানব-হৃদয়ের গভীর সহানুভূতির সঞ্চার হয়। প্রমাণঃ 'যে প্রবন্ধ হইতে তিনি কোনো কোনো স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারই এক স্থানে লিখিত আছে, বিধবার পক্ষে সমস্ত আমোদ আহ্লাদ নিষিদ্ধ, তাহার নৃত্যগীতাদি দেখিতে ও শুনিতে যাওয়া হইবে না, কিংবা কোনো প্রকার পারিবারিক শুভানুষ্ঠানে তাহার যাওয়ার বিধি নাই, কোনো প্রকার উৎসবানুষ্ঠানে বহুলোক-

---

James Colvile) had left Calcutta, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, the learned and eminent Principal of the Sanskrit College, who was thechief mover in the agitation out of which the bill had arisen, and was one of the subscribers to the petition which had been presented to the Council a few weeks ago, praying for the measure, called upon him and consulted him on the propriety of asking the Council for such a law as the Bill now brought in

(২১) Between three and four hundred years ago, in Bengal Raghunandan,, a very learned and celebrated Pandit, who had written a Digest of the Hindu Law, which formed, he believed, in Bengal a text-book to this day, made a resolute attempt of this kind. He had at one time firmly rosolved that his widowed daughter should re-marry; but the attempt failed. Raja Rajbullab of Dacca, about the middle of the last century, made a similar attempt which seems to have been almost successful. He obtained Vyavasta or law opinion of a

সমাগমজনিত আনন্দকর দৃশ্য দেখিতে নিষেধ আছে।' (২২) আমরা জিজ্ঞাসা করি, বালিকা বিধবা কি মানুষ নহে? আর এরূপ ব্যবস্থা কি কেহ কখনও মানিয়া চলে? ইহাই কি শিষ্টাচার?

ইহার পরে আর এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে: 'যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে এই দুরূহ ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে অসমর্থা একটি বালিকাও ব্রহ্মচর্যের গুরুভার হইতে রক্ষা পায়, তবে কেবল তাহারই জন্য এই আইন পাশ করা উচিত হইবে। যদি তাঁহার এই বিশ্বাস হইত, যে (যদিও তিনি ইহার বিপরীত ফলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন) এই আইন পাশ হইয়া কোনো কাজে লাগিবে না, অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে, তাহা হইলেও কেবল ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষার্থে এই আইন পাশ হওয়া উচিত।' (২৩)

---

large body of learned Pandits; but finally his attempt also failed. About the same time, the Chief of Kotah made a similar attempt, with no better success. Sir Thomas Strange, in his work on Hindu Law, alludes to an instance in which a large assembly of Pandits at Poona actually gave Permission to the widow daughter of a Hindu of high caste to re-marry, and the permission was acted upon. Several similar attempts by Hindus to alter this inveterate custom had been made of late years. He had observed amongst the papers of the Law Commission, a paper written by a learned Brahmin of Madras nearly twenty years ago, praying that a law to the effect of the present Bill might be passed. He had already mentioned the essay of a Maratha Brahmin of Nagpur, published about the same time. In Calcutta, there was great agitation on the subject about ten years ago, which was repeated two years ago. It was in consequence of the failure of this last attempt that Iswar Chandra had taken up the subject; and the petition lately presented was the result.

২২ The paper from which he was quoting proceeds to say: All amusements are strictly prohibited to her. She is not to be present where there is singing or dancing or at any family rejoicing; she is not even to witness any festive procession.

২৩ If the knew certainly that but one little girl would be saved from the horros of Brahmacharja by the pasing of this Act, he would pass it for her sake, if he believed, as firmly as he

বহুসংখ্যক লোকের যত্ন ও চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন পাস হইল আমরা বাংলা গভর্নমেণ্ট গেজেট হইতে ঐ বিধবা বিবাহ বিধির ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

'হিন্দু বিধবার বিবাহ আইন সিদ্ধ করা গেল।'

'১ ধারা। স্ত্রীর পূর্বে বিবাহ হওয়া প্রযুক্ত, কিংবা বিবাহ হওন কালে যে মৃত, এমন অন্য ব্যক্তির সহিত পূর্বে বাগদান হইয়াছিল, এই প্রযুক্ত হিন্দুদের মধ্যে কোনো বিবাহ অসিদ্ধ হইবেক না, ও সেইরূপ বিবাহ হইলে যে সন্তানাদি জন্মে তাহারা অবৈধ সন্তান (২৪) হইবেক না। কোনো রীতি ও শাস্ত্রের যে কোনো অর্থ করা যায় তাঁহা ইহার বিরুদ্ধ হইলেও, হইবেক না ইতি।

'৬ ধারা। যে হিন্দু স্ত্রীর পূর্বে বিবাহ হয় নাই, তাহার বিবাহকালে যে যে কথা কহন, কি যে যে ক্রিয়াদি সম্পাদন, কি যে যে নিয়ম কারণ ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবার জন্য প্রচুর হয়, সেই সকল কথা প্রভৃতি হিন্দু বিধবার বিবাহ কালে করা গেলে, কি সম্পাদন হইলে, কি করা গেলে, তাহার সেই ফল হইবেক। আর ঐ কথা, কি বিক্রয়াদি, কি নিয়ম, বিধবার প্রতি লাগে না বলিয়া কোনো বিবাহ অসিদ্ধ করা যাইবেক না ইতি।' (২৫)

রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ হিন্দুগণ এই বিধবাবিবাহ-বিধি মঞ্জুর হওয়ার বিরোধী হইয়া এক স্বতন্ত্র আবেদন পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই আবেদন পত্রে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্য কেহই বেশী ছিলেন না, তবে অন্য নানা স্থানের অন্যূন ত্রিশ সহস্র লোক সে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে সে আবেদন পত্রের যুক্তি সকল যে কেবল তত প্রবল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা নহে; উহার কোনো কোনো স্থান নিতান্তই আমোদজনক হইয়াছিল এবং ব্যবস্থাপক সভায় একটি স্থান নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক ( ludicrous ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। গ্রাণ্ট মহোদয় বলিয়াছিলেন বিরোধিগণের ত্রিশ সহস্র স্বাক্ষরের তুলনায় বিধবা-বিবাহ পক্ষীয় লোকদের অল্পসংখ্যক স্বাক্ষরেরও মূল্য অনেক অধিক। কারণ এরূপ সংস্কারের পথে সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া কিরূপ কঠিন কার্য, তাহা

---

believed the contrary, that the Act would be wholy a dead letter he would pass it for the sake of the English name.

২৪ এই স্থানে একটি শব্দ পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া গেল।

২৫ 'Act XV of 1856, dated 26th July, 1856, I No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by the reason of the woman having been previously married or betrothed to another person, who was dead at the time of such marriage,

ভাবিলে প্রত্যেককেই আমার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অপরপক্ষে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ও নবদ্বীপ সমাজের অধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সহকারিতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়াতে বিধবাবিবাহের আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় জে. পি. গ্রান্ট মহোদয়ের সবিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রমেই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী দল সমবেত হইয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-সূচক এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। উক্ত অভিনন্দন পত্রে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সমাজপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র স্বহস্তে উক্ত অভিনন্দন-পত্র গ্র্যান্ট সাহেবকে প্রদান করেন। এই আইন পাশ হওয়াতে, 'দিদি, ফিরেছে কপাল' ইত্যাদি আর একটি সঙ্গীত রচিত, দেশে দেশে প্রচারিত ও গীত হইতে লাগিল।

বিধবাবিবাহের পথে দায়ভাগ ঘটিত যে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলোচ্ছেদ হইল। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ দিবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে সময়ে তিনি এই কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পূজনীয় অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু সুপরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই কথোপকথন নিম্নে যথাবৎ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

'প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সময়ে কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য করিতে যে সময় পাইতেন, তাহার মধ্যে সুবিধামতো এক দিন তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর! বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে

---

any custom and interpretation of Hindu Law to the contrary notwithstanding.'

"VI. Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements made on the marriage of a Hindoo female, who has not been previously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have the same effect, if spoken performed a made on the marriage, of a Hindoo widow; and no marriage shall be declared invalid on the ground that such words, ceremonies or engagements are inapplicable to the case of a widow.'

Government Gazette, 1856.

বলিয়া প্রবল জনরব, কতদূর কি হইয়াছে জানি না, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে কি না?' প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন: 'আপনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া যাহা কহিতেছেন ইহাতে কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কিনা? আমি উঁহাদের অনেক উপাসনা করিয়াছি। অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, সকলেই ক্ষীণবীর্য ও ধর্মকণ্ঠকে সংবৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। যাহারা মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয়! আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন আমার আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা না হয়!' তর্কবাগীশ মহাশয় পুনরপি বলিলেন: 'ঈশ্বর বাল্যাবধি তোমার প্রকৃত অদম্য মানসিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমার ভগ্নোদ্যম ও প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সঙ্কল্প নহে। তুমি যে কার্যটিকে লোকের হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াছ, সে কার্যের মূলবন্ধন সম্যক্‌রূপে দৃঢ়তর হয় এবং তাহা অর্ধসম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। কেবল কলিকাতায় কয়েকটি বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নহে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম প্রচলিত, ততদূর দৌড়িতে হইবে। ধর্মলোক ও লোকমর্যাদার অতিক্রম করা হইতেছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাহাদিগকে সম্যকরূপে বুঝাইতে হইবে। বিধবার গর্ভজাত সন্তান দায়ভাগ হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে, তাহাই পর্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে যখন তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এ বিধি প্রচলিত করাইতে সমর্থ হইয়াছ. তখন পূর্বকথিত দেশবিভাগের সমাজপতি-দিগের সহায়তা লাভে কৃতকার্য হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না।' (২৬) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পরম পূজনীয় তর্কবাগীশ মহাশয়ও যে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার ও বিধি প্রচলনে সম্মত ছিলেন, উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কেবল বঙ্গদেশে না হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে যাহাতে এক সময়ে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, তাই তিনি সে বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। পিতা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ ও প্রপিতামহ উভয়েই সুপরিচিত অধ্যাপক ও সুবিদ্বান ছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষিবংশে, বেদবেত্তা পূজনীয় গুরুবংশে কিংবা

---

২৬ শ্রীযুক্ত রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিত, ৬১।৬২ পৃষ্ঠা।

তত্তুল্য সাধু সজ্জন বংশে জন্মগ্রহণ করা যে পরম গৌরবের বিষয় ও বহু পুণ্যের কথা তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, বর্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী আর সে তপঃপ্রভাব ধারণ করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও আচার আচরণ বিভিন্নতর আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব পুরুষাগত ধর্মতৃষ্ণাজাত বিপুল বিভব আর তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করে না, ন্যায় নিষ্ঠার সুদৃঢ় শৈলশিখরে আর তাঁহারা বাস করেন না। সত্যবাদিতার সুতীব্র রশ্মিজাল আর তাঁহাদের মহিমময় মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন করে না। আজ তাঁহারা হীনপ্রভ, ম্লান অতীতের স্মৃতিকথা বক্ষে ধারণ করিয়া ছায়ার ন্যায় ভারতের নির্জন প্রান্তে লুক্কায়িত হইতেছেন। আর জ্ঞানপিপাসু অনুসন্ধানপ্রিয় একনিষ্ঠ জার্মান পণ্ডিতগণ সেই সকল প্রাচ্য ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতেছেন। আমাদের আস্ফালন ও আড়ম্বরের অন্তরালে আমাদের সমাজদেহের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িতেছে; জাতীয় জীবন-বৃক্ষের মূল অধ্যাপকমণ্ডলী রসশূন্য ও মৃতপ্রায়, সর্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলেই প্রায় সম্পন্ন লোকদের ষোল আনা তাঁবেদার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিপুল শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং পরানুগত্য পরিহার পূর্বক আত্মনির্ভর ও তদ্দারা লোকসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া অধ্যাপক মণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে জীবনের উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দেশের সমগ্র লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে প্রবল উদ্যম ও বিপুল আয়োজনসহ তিনি এই সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন, এইবার তাহা বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হইতে চলিল। ত্বরায় বিবাহার্থী পাত্র-পাত্রী মিলিল। পাত্র খাঁটুরা গ্রামনিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। এই বিধবাবিবাহ বিষয়ে ৺মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংস্রব ছিল। তাঁহার জীবনচরিতে লেখা আছে; 'পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তর্কালঙ্কার পরিত্যক্ত জজপণ্ডিতের পদে মনোনীত হন। তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। তর্কালঙ্কার তাঁহার বিবাহের সম্পূর্ণ যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম পরিণীতা বিধবা বালিকার সংযোজন-কর্তা। ঐ বিধবা বালিকা মাতার সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শশুরালয়ে প্রায় সততই গমনাগমন করিত, তাঁহারই বিশেষ প্রযত্নে মাতা ও কন্যা কলিকাতায় প্রেরিত হয়।' (২৭)

১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচারিত হয়, আর মাসত্রয় অতীত হইতে না হইতেইঐ বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে

২৭ ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত তর্কালঙ্কারের জীবনী ২১।২২পৃষ্ঠা।

বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিরূপ আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত কার্য করিলে জীবন উৎসর্গ করিয়া কিরূপে সদনুষ্ঠানসাধনে অগ্রসর হইলে, ত্বরায় এরূপ দুরূহ কার্য সুসিদ্ধ হইতেপারে, তাহা আমরা এক্ষণে সম্যক্‌রূপে ধারণাই করিতে পারিব না। শত প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে, রাজা রাধাকান্তের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষতাচারণ উপেক্ষা করিতে, কত শত লোকের তীব্র বিদ্রূপ সহ্য করিতে, যে কিরূপ সুকঠিন সহিষ্ণুতা ও কর্তব্য পরায়ণতার প্রয়োজন; তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনুধাবন করা সম্ভবপর নহে। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তিই এরূপ কার্যের প্রকৃত গুরুত্ব ও ইহার অনুষ্ঠানকারীর উপযুক্ততা ও প্রকৃত মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। ক্ষুদ্র ব্যক্তির মহৎ কার্যের মূল্য বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়? টিকা, টিপ্পনি করিতে, খুঁত ধরিতে আমরা সর্বাংশে মজবুত। উচ্চ উদার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বজনীন ভাবপ্রণোদিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিলে, অন্তরে যে ধর্মভাব-প্রসূত কর্তব্য জ্ঞানের মৃদুমন্দ বিজলী লীলা প্রতিভাত হয় এবং সেই আলোকজ্জ্বল মানস নেত্র-পথে বিধাতার যে অঙ্গুলি-সঙ্কেত নিপতিত হয়, যাঁহারা তাহা দেখিতে এবং সেই পথে চলিতে যত্নশীল হন, কেবল তাঁহারাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যকলাপের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম! বিধবাবিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হইলে পর, বিবাহের সম্যক্‌ আয়োজন তাঁহার হৃদয়ে যে কি গভীর তৃপ্তির সঞ্চার হইয়াছিল, যিনি তাহার কণামাত্রও বুঝিতে পারেন, তিনিই ধন্য। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্রের আবর্তনে যে আবর্জনারাশি স্তূপীকৃত হইয়াছিল এবং যাহার বিনাশ সাধনে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামতি রামমোহন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং যাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইবার পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, সেই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিধাতার সোনানীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শকাব্দাঃ ১৭৭৮, সন ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গারণ্যে বিজয়ী বিদ্যাসাগরের ভেরীরব নিনাদিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে এই দিন, চিরদিন অক্ষয় প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত থাকিবে। ভবিষ্য বংশ মানস-পটে দেখিবে দিব্যকান্তি-পরিশোভিত সমুজ্জ্বল বিদ্যাসাগর-মূর্তির সুপ্রসারিত দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগে '১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণের ত্রয়োবিংশ দিবস' আলোক-রেখায় লিখিত রহিয়াছে। কন্যা কালীমতি দেবী জননীসহ সুকিয়া স্ট্রীটে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে বাস করিতে-ছিলেন। বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতায় আসিয়া সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উঠিয়াছিলেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে নানা স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ বিবাহবাটীতে সমবেত হইলেন, পুরাঙ্গণারা কন্যাকে সময়োপযোগী বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুকিয়া স্ট্রীট

ও তান্নিকটবর্তী রাজপথসমূহ লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, মনুষ্যমূর্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পরিচিত অপরিচিত ইতর ভদ্র গায়ে গায়েমাথায় মাথায় দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ জনতা ও বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব হইতে পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদানুসারে সুকিয়া স্ট্রীটে এবং যে পথে বর আসিবে সে পথে, পত্যেক দুই হস্ত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়। যখন বর ও বরযাত্রীরা বিবাহবাটীতে আসিলেন, তখন বর দেখিবার জন্য পথে এত জনতা হইল যে, বরের পাল্কী লইয়া অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। নূতন ব্যাপারের পথপ্রদর্শক হইতে গিয়া বরের সদাচিন্তিত ও চমকিত চিত্তে এই জনতাজাত যে আশঙ্কার উদয় হইতেছিল, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, প্রভৃতি বিদ্যাসাগর-বন্ধুমণ্ডলী বরের দক্ষিণে ও বামে পাল্কী ধরিয়া উৎসাহ ও আনন্দবর্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। (২৮) এইরূপ সমারোহ ও জনতার মধ্য দিয়া বর ও বরযাত্রী বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করেন। বিবাহ সভায় সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য টোলের অধ্যাপকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। (২৯) বিবাহ সভা, বিবাহের নিমন্ত্রণ আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী' হইতে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

বিধবাবিবাহ

আমরা পরমাহ্লাদেব সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত পটলডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার যখন ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইঁহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহনভট্টাচার্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল; ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইঁহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতিকুলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভকার্য সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইঁহাব মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্রে ইঁহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবর্গের

---

২৮ শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

২৯ সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ১২৩ পৃষ্ঠা।

বিবাহ উপলক্ষে এ দেশে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদি যে-যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এ বিবাহ সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোনো প্রকার অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। এই বিবাহে ন্যূনাধিক আটশত নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্যদিগের নিমন্ত্রণের জন্য কতকগুলি পত্র পৃথকরূপে সংস্কৃত কবিতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ঐ দুই প্রকার পত্রই পশ্চাতে অবিকল সঙ্কলন করিলাম।

'শ্রীলক্ষ্মীমণিদেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলিয়ার সুকেস্ স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকার্য সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দঃ ১৭৭৮।

অস্ত্যে ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরাং পদ্মিনী প্রাণকান্তে
স্বাহাকান্তে ক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে শাস্ত্রমার্গানুসারী।
ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিণয়নবিধির্ভর্তৃহীনাত্মজায়াঃ
পূর্বৈবর্যার্যবর্জ্যৈরিহ সদসি গতৈর্মৎকৃপাপারতন্ত্র্যাৎ॥'

ইহার পরদিবস পানীহাটী গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কায়স্থ কুলীনবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যাকে ইহার পিতাই সম্প্রদান করেন। ইহা কায়স্থবর্গের নির্দিষ্ট কুলাচারানুসারে সম্পন্ন হয়।

উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পাদন উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শুভ বিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্র পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্র সন্তান কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া উক্ত কর্ম সমাধা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পর্বে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল যে, সকল লোক সুন্দররূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং কন্যা সম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনো কোনো ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতেছেন এবং কোনো কোনো লোক শোকে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; কেহ বা এই ঘটনাকে স্বদেশের চির-কল্যাণের কারণ জানিয়া ইহার প্রয়োজক ও প্রবর্তকদিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন কেহ বা ইহাকে নিশ্চয় ভারতবর্ষের কলঙ্কস্বরূপ ও হিন্দুধর্মের উচ্ছেদের হেতু মনে করিয়া ইহার উদ্যোগকর্তা ও উৎসাহদাতাদিগকে

নানাপ্রকার অশ্রাব্য কটু-কাটব্য কহিতেছেন। যে সকল জ্ঞানসম্পন্ন দেশহিতৈষী বুদ্ধিমান লোক এই পরম কল্যাণকর শুভ ঘটনা সম্পন্ন হইবার প্রতি বহুকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছিলেন, যাঁহারা এই শুভদিন উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিদিন দিনগণনা করিতেছিলেন, যাঁহারা এই আনন্দময় সুখের দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য দূরবলম্বিনী আশালতার মূলে নিয়ত যত্ন-বারি সেচন করিতেছিলেন, এবং যাঁহারা এই বিধবাবিবাহরূপ পুণ্যতরুকে স্নেহাস্পদ জন্মভূমিতে রোপণ করিবার জন্য নানাপ্রকার মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক স্বদেশীয় অনেক বন্ধুবান্ধবের মানসক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগেরই মনে আনন্দের উদয় হইয়াছে। এই চিরবাঞ্ছিত ও দূরলক্ষিত সুখময় শুভদিন উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারাই আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছেন এবং এই কল্যাণকর পুণ্যতরু সত্বরে সফল হওয়াতে তাঁহারাই আপনদিগের সকল অশ্রু ও সকল যত্নকে সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, জগদীশ্বরের অসদৃশ করুণা-প্রসাদে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে জ্ঞান-সূর্যের উদয় হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক সন্তান জননী জন্মভূমিকে নানা প্রকার অধর্ম কণ্টকে বিদ্ধ দেখিয়া তাহা উত্তোলন করিবার জন্য ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়াছেন এবং তাহাকে পুণ্যকর্মরূপ পরম শোভনীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইয়াছেন, তাহারা দেখিতেছেন যে, পাপভারে প্রপীড়িত ভারতভূমি অনেক সাধু ব্যক্তির যত্ন হেতু এতদিনে এই সকল পাপের ভার হইতে পুনর্বার মুক্ত হইতেছে, ভুবনবিখ্যাত হিন্দুজাতির বহুকালের গাঢ় কলঙ্ক ক্রমে অপনীত হইবার উপায় হইতেছে এবং অবনত হিন্দুস্থান মস্তক পুনর্বার উন্নতগ্রীব হইয়া আপনার মহত্ব প্রকাশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারা এই সমস্ত শুভ চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া হিন্দুস্থানের শ্রীবৃদ্ধির ও হিন্দুজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য আশালতাকে নিয়ত বলবতী করিতেছেন। কিন্তু যে সকল জ্ঞানহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী দ্বেষপরবশ লোক আপনাদিগের দৃঢ়সংবদ্ধ কুসংস্কার হেতু এই সকল শুভ ব্যাপারকে অকারণে নিন্দিত কর্ম মনে করিয়া,ইহা সম্পন্ন হইবার প্রতি নানাপ্রকার ব্যাঘাত করিয়াছে, যাহারা ধর্মাধর্মের কোনো বিচার না করিয়া এই শুভ দিন উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় নিয়ত শঙ্কিত হইয়াছে এবং যাহারা এই শুভানুষ্ঠানকর্তা সাধুদিগের আশালতার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহারা জ্ঞানচক্ষুকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া এবং বুদ্ধি, যুক্তি ও বিচারের পথে এককালে কণ্টক প্রদান করিয়া দেশপ্রচলিত ব্যবহার-পরম্পরাকেই সর্বসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া, তাহা নিরাকৃত হইবার নাম শ্রবণ করিলে স্তব্ধবুদ্ধি ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছে, এই নিত্যবাঞ্ছিত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হওয়াতে তাহারাই শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছে, এই সন্তাপহারক শীতলতল

ধর্মবৃক্ষ ফলবান হওয়াতে তাহারাই হতাশ ও হতচেতন হইয়া অনর্থক হাহাকার করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে যে, ক্রমে কলি প্রবল হওয়াতে ধর্মের স্রোত এককালে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, ধর্মশাস্ত্র লোকসমাজে অমান্য হইয়া উঠিল এবং ভারতবর্ষে অধর্মের অধিকার দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিতেছে যে, এত দিনের পর হিন্দু নাম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ভারতভূমি ক্রমে পাপভরে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল এবং হিন্দুজাতির যশ, শ্রী, সৌভাগ্য সকলই অন্তরিত হইয়া গেল। তাহারা এই সকল অমূলক আশঙ্কা কল্পনা করিয়া আপনাদিগের ভাবী সৌভাগ্যের আশা ভরসাকে এককালে ক্ষীণ করিতেছে। এই বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে যে ভারতবর্ষের কি পর্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষবাসী হিন্দুজাতির কতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইবার পথ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ ক্রমে যদি ভারতবর্ষের সকল কুপ্রথা নিরাকৃত হয় এবং এখানে সুপদ্ধতি সকল প্রচলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতভূমি পৃথিবীর মধ্যে পুনর্বার সর্বাগ্রগণ্য ধর্মক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হিন্দুজাতি সম্যক্‌রূপে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বিধবাবিবাহ কার্যতঃ প্রচলিত হওয়াতে যাঁহারা মনে মনে বিষণ্ণ হইয়াছেন, এবং এদেশের অদৃষ্টকে অকারণ নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহাদিগের সে বিষাদ দূর হইবেক, এবং তাঁহারা স্বদেশকে সৌভাগ্যশালী দেখিতে পাইবেন। এ দেশে পতিহীনা অনাথাদিগের পুনরুদ্বারের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে এখানে ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা ব্যাভিচার প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকট উৎকট পাপের পথ পরিষ্কৃত ছিল, তাহা নানা পণ্ডিত বারংবার নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং যাহার অতি সামান্য বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে; অতএব সেই প্রথা প্রচলিত হইলে যে, ঐ সমস্ত পাপের পথ অবশ্যই রুদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই এবং তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলেরই বা সম্ভাবনা কি? ইহাতে হিন্দুধর্মাভিমানী প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা কি জন্য যে উৎসাহান্বিত না হইয়া বিষণ্ণ হইবেন তাহা আমাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই; তবে তাঁহারা যদি কেবল অভিমান পরবশ হইয়া এবং যথার্থ ধর্মাধর্মের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, বহুকাল প্রচলিত বংশপরম্পরাগত দেশ-ব্যবহারের উচ্ছেদ ও অপ্রচলিত আধুনিক প্রথার প্রচার দেখিয়া দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে আর আমাদিগের কোনো উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্মপালক বলিয়া দম্ভ করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এ প্রকার আনন্দের স্থলে তাহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোনো ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘকালের পর শারীরিক কোনো চিররোগের আরোগ্য হইলে

তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ দেশপ্রচলিত কোনো প্রাচীন কুপ্রথার উচ্ছেদ দেখিয়া খেদ করাও অন্যায়। যাহা হউক প্রতিপক্ষীয় মহাশয়দিগের চিত্ত যখন কিঞ্চিৎ স্থির হইবে, দ্বেষানল নির্বাপিত হইবে, এবং অভিমান দূরে গমন করিবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই দেখিতে পাইবেন যে, এখানে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হওয়াতে এ দেশের কিরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে।

এক্ষণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্নে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, যাঁহাদিগের উৎসাহে এই চিরবাঞ্ছিত সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্য গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোনো মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহাব্যাপার যে কতিপয় অসামান্য ধী-সম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামাণ্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন-সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। এই মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধিবলে হিন্দুদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং বিধবা বিবাহ যে হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচার কৌশলে তাহা সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহারই প্রভাবে হিন্দুশাস্ত্রের এ কলঙ্ক দূর হইল তাঁহারই প্রসাদাৎ হিন্দু বিধবারা অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। তিনি এই শুভসংকল্প সিদ্ধকরণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই. এবং কটুকাটাখ্য ও উপহাসাদির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি যখন বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচার করেন তখন প্রতিবাদিগণ তদুত্তরে তাঁহাকে কটু কহিতে অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা করিতেও ত্রুটি করে নাই, এবং নানা শত্রু নানা মতে বৈরসাধন করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার ভূধরনিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্বতের উপর পতিত হইয়া আপনিই তেজোহীন হয়, শত্রুগণের নিন্দাবাদ ও কটুবাক্য সকলও সেইরূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞানহীন অবোধ লোকের বৈরব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ করিতে কোনরূপে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় বিধবাদিগের প্রজ্বলিত বৈধব্য-যন্ত্রণানল নির্বাপিত হইবার আর কোন উপায় হইত না এবং দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচারাদি পাপভার হইতে কস্মিন্

কালেও পরিত্রাণ পাইত না,—অনাথা বিধবাদিগের হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি নিঃসৃত নিঃশ্বাসানলে ভারতবর্ষ চিরদিনই দগ্ধ হইত।

হা জগদীশ! এ সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি যে কোনো সূত্রে ও কোনো কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর, কাহার সাধ্য তাহা বোধগম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীনা অবলাদিগের অনিবার্য শোকাগ্নি নির্বাণ করিবে, কে মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দুশ্চেদ্য শাস্ত্রের শাসন ছেদ করিয়া আপনাদিগের দুঃখরাশিকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? আহা! তাঁহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা স্মরণ হইলে এখনও আমাদের অশ্রুপাত হয়। তাহারা যে আবার এ শুভ দিন প্রাপ্ত হইবে, আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এ সকলের মূল। ভারতভূমি পূর্বাবধি ধর্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দু জাতি চিরদিনই ধর্মপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ-ব্যবহারে সে সকল সম্পত্তিই হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্যযন্ত্রণাকে এ দেশের স্ত্রীলোকে অনিবার্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল, যাহা হইতে তাহারা কস্মিন্‌কালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না, এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই যন্ত্রণার শেষ হইল, সেই রোগের ঔষধ স্থির হইল, এবং তাহা হইতে এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মুক্তি পাইল, তাঁহার এই অসামান্য কীর্তি যেন নিত্যকাল পৃথিবীর মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা। (৩০)

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

আমি ৬ই পৌষে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া ৯ই পৌষে কীটগঞ্জে লালা বংশীধরের দরুণ শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই যাইতেছে না। অম্লরোগ ( acidity ) অতিশয় প্রবল, সুতরাং সুচারুরূপ আহারাদি করিতে পারি না। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত

---

৩০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯ই পৌষ সোমবার, সম্বৎ ১৯১৩।

আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্‌কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবাবিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। প্রাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন এই শুভসংবাদ সমূলক কি না, অনুগ্রহপূর্বক লিখিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সসম্প্রীত সাদর নমস্কার অবগত করিবেন। ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানা প্রকারে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, যত প্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে, সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, বিধবাবিবাহের সূচনা হইতে কলিকাতায় কেহ কেহ গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃদ্ধ পিতা ঠাকুরদাস, বীরসিংহের বাটীতে বসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার অশেষ গুণের আধার প্রিয়তম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণসংহারের জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীমন্ত নামে যে এক সর্দার বাড়িতে দ্বারবান ও পাকের কার্য করিত, তাহাকে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কোথাও যাইতেন, পথে সেই শ্রীমন্ত সর্বদা সঙ্গে থাকিত; বিধবাবিবাহের আন্দোলনরূপ বৃহৎ বন্যায় যখন সমগ্র দেশ ভাসিয়াছে, সেই সময় একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, সংস্কৃত কালেজ হইতে বাসায় আসিবার সময় ঠনঠনিয়ার কালীতলায় দেখিলেন, কয়েকজন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত কালের মধ্যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের এক মহাপুরুষের অকালে গোপনে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ভীমকায় শত্রুদিগের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না, কেবল একটিবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস্ কি?' শ্রীমন্ত পশ্চাৎ হইতে বলিল, 'তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও, চাকর সঙ্গে আছে।' শ্রীমন্ত যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া আক্রমণকারীরা তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন, আর একটি পাও অগ্রসর হইল না; যে যতদূর আসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইল। এই সময়ে রাত্রিতে শ্রীমন্তকে সঙ্গে না লইয়া তিনি কোথাও যাইতেন না। সিপাহীবিদ্রোহের সময়েও শ্রীমন্ত কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল; ঐ সময়ে সংস্কৃত কালেজে ইংরেজ সৈন্যদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এক দিন শ্রীমন্ত

দিনের বেলায় প্রয়োজনবশতঃ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, সে কালেজ-গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, গোরারা আসিয়া বাধা দিল, তাহারা পথ ছাড়িয়া দিবে না, ছিরেও জোর করিয়া গোরার বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সেই পথে প্রভুর নিকট যাইবে। শ্রীমন্তের যেমন শক্তি ছিল, তেমনি সর্দারিগিরিও জানিত ভাল, সাহসও ছিল অসীম। শ্রীমন্ত একবার সাহেবদের বল পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বাধাপ্রাপ্ত পথে লাঠি হাতে অগ্রসর হইল, গোরারা প্রথমে নিষেধ করিল, শেষে ধরিয়া সরাইয়া দিতে গেল; কিন্তু শ্রীমন্তকে সরাইতে পারিল না। শ্রীমন্ত সম্মুখ হইতে দুই হস্তে দুই দিকে সাহেব সরাইয়া পথ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া অপদস্থ হইয়া গোরারা বন্ধুক ধরিয়াছে, তখন শ্রীমন্ত লাঠি ধরিয়াছে। লাঠি খেলিয়া বন্দুকের গুলি নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে গোরা-সৈন্যের কর্তৃপক্ষ সাহেব সেইখানে আসিয়া পড়িলেন। তিনি গোরাদিগকে ঐরূপ ব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া সন্ত্রাসিত চিত্তে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গোরাদিগকে বলিলেন, 'কি করিতেছ? ও যে পণ্ডিতের লোক!' গোরারা 'জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো' ভয়ে জড়সড় হইয়া দশ হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া শ্রীমন্তকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমন্ত গর্বভরে বলিল, দেশের লোক সবই ত এক একবার নাড়াচাড়া দিয়া দেখিয়াছি, সুবিধা পাইয়া একবার সাহেব পরখ করিয়া দেখ্‌ছিলুম।' প্রভু বলিলেন, 'এখনি যে গিছ্‌লিরে বেটা!' শ্রীমন্ত বলিল, 'আজ্ঞে আমার হাতে যে লাঠি ছিল, কার সাধ্য আমার গায়ে হাত দেয়!' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তোর গায়ে কি হাত দিত? বন্দুকের গুলি মারিয়া তোকে সাবাড় করিত।' শ্রীমন্ত তাহার সুশ্যাম তনুখানিকে উৎসাহরাগে রঞ্জিত করিয়া বলিল, 'যদি গুলিতে মরিব, তবে লাঠিগাছা ধরি কেন? ওদের বন্ধুক ভ'রতে হয়, আমার লাঠি সমানে চলে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীমন্তের বীরত্বকাহিনী জানিতেন, তবুও একবার নাড়াচাড়া দিয়া দুটা কথা শুনিলেন।

১২৬৩ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র ৺দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু ক্রমান্বয়ে এক একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই উভয় বিবাহেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

এতাদৃশ অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া এই বৃহৎ ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা শুক্লপ্রতিপদের চাঁদের মতো উদয় হইতে না হইতে অদৃশ্য হইলেন। দরিদ্র ঈশ্বরচন্দ্রের সমক্ষে নিরাশা-অমাবস্যার ঘন অন্ধকার পূর্ণমাত্রায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃহদাকার নক্ষত্রের

ন্যায় তাঁহার কোনো কোনো ইংরাজ বন্ধু তাঁহার বিষাদপীড়িত আশার আকাশে উদিত হইয়া উৎসাহের আলোক বিতরণ করিতেছিল; দৈবাৎ পূর্ব গগনে উদিত হইয়া নক্ষত্রের ন্যায় কোনো কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর কিছু কিছু সহায়তা পাইয়া উপকৃত হইতেন, এবং তাহাতেই অতিকষ্টে সে সময়ে বিধবাবিবাহ-কার্য চালাইতে সক্ষম হন, কিন্তু নিজের অভাব ও অসুবিধার কথা এক দিনের জন্যও ভাবেন নাই; এইরূপ অর্থব্যয় ও তজ্জন্য নানা প্রকার অসুবিধা ও অনটনের মধ্যে তিনি যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দিন যাপন করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। শতবিধ অসুবিধার মধ্যে যখন তিনি এই বৃহৎ কার্যে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার এই সমাজসংস্কার ব্যাপারে যাঁহারা বিশেষভাবে সহকারিতা করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজনারায়ণবাবুর সহায়তা লাভে, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাসূচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল: 'আপনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি…যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অবধি আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আপনি অতি মহাত্মার কর্ম করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনার মনের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।'

হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বরিশালে অবস্থানকালে তাঁহার বালিকা বিমাতার বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর বিখ্যাত উকীল ৺কালীমোহন দাস মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতায় প্রথমবারে বিফলমনোরথ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে গভীর আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বিষাদ ও বিপদের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও নিরাশার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, দুর্গামোহনবাবুকে যে সান্ত্বনা ও গভীর অনুরাগপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, সে সুন্দর পত্রখানি এই:

'অশেষ গুণাশ্রয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়
পরমকল্যাণভাজনেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্ —

অন্নদাচরণকে যে দিন শেষ পত্র লিখি, ঐ দিনই আপনাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পরদিন লিখিব, কিন্তু পরদিন অধিকবার ভেদ হওয়াতে কয়েকদিন এরূপ দুর্বল ছিলাম এবং তৎপরে আর কয়েকদিন কোনো বিশেষ কারণ বশতঃ এরূপ ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাকে এত দিন পত্র লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না;

আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সংকলিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এ বিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায় সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' শুভ কার্যের নানা বিঘ্ন। আমি যে অবধি এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম সর্বদা এই আশংকা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম, এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম সম্পন্ন হউক, আর নাই হউক, আপনার সাহস, মানসিক মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম সম্পন্ন হইত। আপনি যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনি দীর্ঘজীবী হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অশেষবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক।

আমি অনেকবার অনেক প্রামাণিক লোকের মুখে আপনকার গুণানুবাদ শুনিয়াছি এবং আপনি সদাশয়, সরলহৃদয় অকুতোভয়, উদারচরিত ও সর্বদা পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

আমি অদ্যাপি শারীরিক সম্যক্ স্বচ্ছন্দ হইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে আপনকার মঙ্গল সংবাদ পাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিব, ইতি।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

যখন অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, তখন বিধবাবিবাহ হওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল এবং চারিদিকে লোক বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল,

দৈবযোগে দুই-একটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর হইবে না। আর এই বিধবাবিবাহের ব্যাপারে সমগ্র দেশ যখন আন্দোলিত, ঠিক সেই সময়ে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা হয়, নানা প্রকার জনরবের মধ্যে বিধবাবিবাহ-বিরোধী দল এই গুজব প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হিন্দুধর্মের মর্ম না বুঝিয়া বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপ করিয়া ইংরাজরা বিপদে পড়িয়াছেন। বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা সিপাহীগণের কোপানলে পড়িয়াছেন। ফলতঃ সিপাহী যুদ্ধে যাহারা লিপ্তছিল, তাঁহাদের কেহই বিধবাবিবাহ ব্যাপারের কিছুমাত্র অবগত ছিল না। যাহা হউক এই রাজবিপ্লব উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ কার্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত ছিল; আবার প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে যখন সমগ্র দেশ স্থির ও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, তখন বিধবাবিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, সিপাহী-যুদ্ধের গোলযোগে বিধবাবিবাহেরও গোলযোগ বাধিয়াছে, কিন্তু যখন বিরোধী দল দেখিলেন, 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী' তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া বিরোধিতার রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া নীরব ভাব ধারণ করিলেন। বিধবাবিবাহ আবার একে একে আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা এইখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

'গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কন্যার পিতা বর্তমান, তিনি স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছেন। বর সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত; বয়ঃক্রম আঠার বৎসর মাত্র। কন্যাটি অতি বালিকা, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যে তিনি বিবাহসংস্কার লাভ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বৈধব্য সংগঠন হইয়াছিল। এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ হইলে বিবাহ প্রকৃত বিবাহসংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কি না, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐরূপ বিবাহ বিবাহসংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নাম মাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কন্যাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং আদৃশ বিধবা কন্যাকে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিজীবী জীবের বিধেয় কিনা এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা চির প্ররূঢ় কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। পুরুষানুক্রমে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা নানা অনর্থের মূল ও নানা উৎপাতের হেতু হইলেও, তাঁহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া তদনুসারেই চলিয়া

থাকেন। এই প্রথা প্রবল প্রচলিত থাকাতে কত প্রকারে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তথাপি কেবল কুসংস্কার দোষে এতদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞান হয় না। ফলতঃ কুসংস্কার মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে এক কালে অনেক অনর্থ নিবারণ হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু বিধবা-বিবাহ বহুকাল প্রচলিত ছিল না। কতিপয় পূর্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। সুতরাং এক্ষণকার লোকদিগের চিত্তে ক্রমে ক্রমে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে, বিধবাবিবাহ অতি অসৎ কর্ম। বিধবাবিবাহ যে যথার্থ শাস্ত্রানুগত কর্ম, সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু এতদ্দেশে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারের অধিক সম্মান। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত হইলেও দেশাচারপরিগৃহীত নয় বলিয়া এক্ষণ পর্যন্ত বিধবাবিবাহের তাদৃশ আদর হইতেছে না। কিন্তু যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহা কোনো মতেই অসম্ভাবিত নহে যে, এই শ্রেয়স্কর ব্যবহার অনধিক কালমধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিবেক।

অনেকে এই আপত্তি করিয়া থাকেন যদি এই ব্যবহার যথার্থ শ্রেয়স্কর হইবেক তাহা হইলে আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই কেন? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই ব্যবহার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কিছুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, স্মৃতি ও পুরাণে তাহার অসংশয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবহার রহিত হইয়া আসিয়াছে। রহিত হইবার এই এক প্রধান কারণ লক্ষিত হইতেছে যে, পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা কলিযুগে সহমরণের ও অনুগমনের প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অনেক অথবা প্রায় সকল বিধবাই স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতায় কিংবা বিদেশস্থ স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বতন্ত্রে চিতায় আরোহন করিয়া জীবনযাত্রা সমাপন করিতেন। সুতরাং এক্ষণকার ন্যায় পূর্বে বিধবার সংখ্যা এত অধিক ছিল না এবং সকলকে স্ব-স্ব কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতির দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ এবং বৈধব্য নিবন্ধন পরিবার মধ্যে নানা অনর্থ সংঘটন অবলোকন করিতে হইত না। যদি বিধবার সংখ্যা বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ ও বৈধব্য নিবন্ধন অনর্থ সংঘটন মাত্রা অল্প হইল, তাহা হইলে আর বিধবাবিবাহের তাদৃশী আবশ্যকতা রহিল না। বোধ হয়, এই হেতুবশতঃই ক্রমে বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজশাসনে সহমরণ ও অনুগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বিধবার সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের পরিমাণও উত্তরোত্তর অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব যে কারণের অসদ্ভাবে বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, যখন ঐ কারণ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিধবাবিবাহের

প্রথা অবলম্বন ভিন্ন অনর্থ নিবারণের আর কোন উপায় হইতে পারে না। কি আহ্লাদের বিষয়, গত ১১ই ও ২৮শে আষাঢ় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি বিধবা বিবাহের সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিধবার উদ্বাহ ব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রীতিমতো বিধবাবিবাহের এই সূত্রপাত হইল।

অনেকে মনে করিতেন, যদিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এ বিষয়ের আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সহসা হওয়া কোনো মতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কুসংস্কার বিমোচন হইয়াছে। এমত স্থলে এরূপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই অদ্যাপি অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে নিতান্ত বশীভূত। এমত স্থলে এরূপ ব্যাপার হিতকর বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি যথার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এই মাত্র ফল লক্ষিত হইতেছে যে, অনেকেরই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্য বোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোনো বিশেষ ফল নাই। যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সহসা দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন তাহা হইলে এত দিনে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না। যৎকালে যুবকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের তৎকালীন ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করেন, ইহাদিগের দ্বারা অনেকাংশে দেশের দুরবস্থা বিমোচন হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ সকল যুবক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-কর্মে ও সংসার ধর্মে প্রবিষ্ট হইলেই,সে সকল ভাবের এককালে অভাব হইয়া উঠে।' (৩১)

এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারিতা করিয়াছিলেন, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। সুতরাং তাহার আত্মচরিতে এই সংস্রবে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এইস্থলে উদ্‌ধৃত করা গেল: '১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুরে যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহের আন্দোলন উঠে।

---

৩১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৪ পৌষ, শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৪।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল ; এই চটী বাহির হওয়াতে মহা আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল, বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগদোন অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অতীব সন্তোষজনক। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কালেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাহার মনঃপুত হইল না। কালেজ হইতে বহুবাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্দ্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সন্তোষজনক মীমাংসার ভাব মনে উদিত হইল। কালেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। সমস্ত ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন। পুনর্বিবাহিত বিধবার গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জন্য তাঁহারা গভর্নমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন। স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট, যিনি পরে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গভর্নর হইয়াছিলেন, তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, 'অপর পক্ষীয়েরা যেমন হিন্দু, ইঁহারাও তেমনই হিন্দু।' (৩২) আর এই বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে, 'যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন বিধবাবিবাহ দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা পুড়িয়া মরা ভাল।' যেমন বিধবা-বিবাহের আইন করা হইল, অমনি কার্য্যারম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যের গতিকই এইরূপ।…যে দিন বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতায় লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টোনোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবা-বিবাহ পাণিহাটির মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন, এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লিখেন যে, যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন

৩২ They are as much Hindoos as the other party.

তত্তুল্য সাধু সজ্জন বংশে জন্মগ্রহণ করা যে পরম গৌরবের বিষয় ও বহু পুণ্যের কথা তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, বর্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী আর সে তপঃপ্রভাব ধারণ করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও আচার আচরণ বিভিন্নতর আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব পুরুষাগত ধর্মতৃষ্ণাজাত বিপুল বিভব আর তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করে না, ন্যায় নিষ্ঠার সুদৃঢ় শৈলশিখরে আর তাঁহারা বাস করেন না। সত্যবাদিতার সুতীব্র রশ্মিজাল আর তাঁহাদের মহিমময় মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন করে না। আজ তাঁহারা হীনপ্রভ, ম্লান অতীতের স্মৃতিকথা বক্ষে ধারণ করিয়া ছায়ার ন্যায় ভারতের নির্জন প্রান্তে লুক্কায়িত হইতেছেন। আর জ্ঞানপিপাসু অনুসন্ধানপ্রিয় একনিষ্ঠ জার্মান পণ্ডিতগণ সেই সকল প্রাচ্য ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতেছেন। আমাদের আস্ফালন ও আড়ম্বরের অন্তরালে আমাদের সমাজদেহের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িতেছে; জাতীয় জীবন-বৃক্ষের মূল অধ্যাপকমণ্ডলী রসশূন্য ও মৃতপ্রায়, সর্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলেই প্রায় সম্পন্ন লোকদের ষোল আনা তাঁবেদার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিপুল শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং পরানুগত্য পরিহার পূর্বক আত্মনির্ভর ও তদ্দারা লোকসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া অধ্যাপক মণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে জীবনের উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দেশের সমগ্র লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে প্রবল উদ্যম ও বিপুল আয়োজনসহ তিনি এই সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে ব্রিব্রত ছিলেন, এইবার তাহা বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হইতে চলিল। ত্বরায় বিবাহার্থী পাত্র-পাত্রী মিলিল। পাত্র খাঁটুরা গ্রামনিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। এই বিধবাবিবাহ বিষয়ে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংস্রব ছিল। তাঁহার জীবনচরিতে লেখা আছে; 'পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তর্কালঙ্কার পরিত্যক্ত জজপণ্ডিতের পদে মনোনীত হন। তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। তর্কালঙ্কার তাঁহার বিবাহের সম্পূর্ণ যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম পরিণীতা বিধবা বালিকার সংযোজন-কর্তা। ঐ বিধবা বালিকা মাতার সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শশুরালয়ে প্রায় সততই গমনাগমন করিত, তাঁহারই বিশেষ প্রযত্নে মাতা ও কন্যা কলিকাতায় প্রেরিত হয়।' (২৭)

১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচারিত হয়, আর মাসত্রয় অতীত হইতে না হইতেই ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে

২৭ ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত তর্কালঙ্কারের জীবনী ২১।২২পৃষ্ঠা।

বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিরূপ আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত কার্য করিলে জীবন উৎসর্গ করিয়া কিরূপে সদনুষ্ঠানসাধনে অগ্রসর হইলে, ত্বরায় এরূপ দুরূহ কার্য সুসিদ্ধ হইতেপারে, তাহা আমরা এক্ষণে সম্যক্‌রূপে ধারণাই করিতে পারিব না। শত প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে, রাজা রাধাকান্তের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষতাচারণ উপেক্ষা করিতে, কত শত লোকের তীব্র বিদ্রূপ সহ্য করিতে, যে কিরূপ সুকঠিন সহিষ্ণুতা ও কর্তব্য পরায়ণতার প্রয়োজন; তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনুধাবন করা সম্ভবপর নহে। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তিই এরূপ কার্যের প্রকৃত গুরুত্ব ও ইহার অনুষ্ঠানকারীর উপযুক্ততা ও প্রকৃত মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। ক্ষুদ্র ব্যক্তির মহৎ কার্যের মূল্য বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়? টিকা, টিপ্পনি করিতে, খুঁত ধরিতে আমরা সর্বাংশে মজবুত। উচ্চ উদার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বজনীন ভাবপ্রণোদিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিলে, অন্তরে যে ধর্মভাব-প্রসূত কর্তব্য জ্ঞানের মৃদুমন্দ বিজলী লীলা প্রতিভাত হয় এবং সেই আলোকজ্জ্বল মানস নেত্র-পথে বিধাতার যে অঙ্গুলি-সঙ্কেত নিপাতিত হয়, যাঁহারা তাহা দেখিতে এবং সেই পথে চলিতে যত্নশীল হন, কেবল তাঁহারাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যকলাপের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম। বিধবাবিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হইলে পর, বিবাহের সম্যক্‌ আয়োজন তাঁহার হৃদয়ে যে কি গভীর তৃপ্তির সঞ্চার হইয়াছিল, যিনি তাহার কণামাত্রও বুঝিতে পারেন, তিনিই ধন্য। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্রের আবর্তনে যে আবর্জনারাশি স্তূপীকৃত হইয়াছিল এবং যাহার বিনাশ সাধনে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামতি রামমোহন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং যাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইবার পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, সেই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিধাতার সোনানীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শকাব্দাঃ ১৭৭৮, সন ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গারণ্যে বিজয়ী বিদ্যাসাগরের ভেরীরব নিনাদিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে এই দিন, চিরদিন অক্ষয় প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত থাকিবে। ভবিষ্য বংশ মানস-পটে দেখিবে দিব্যকান্তি-পরিশোভিত সমুজ্জ্বল বিদ্যাসাগর-মূর্তির সুপ্রসারিত দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগে '১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণের ত্রয়োবিংশ দিবস' আলোক-রেখায় লিখিত রহিয়াছে। কন্যা কালীমতি দেবী জননীসহ সুকিয়া স্ট্রীটে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে বাস করিতে-ছিলেন। বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতায় আসিয়া সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উঠিয়াছিলেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে নানা স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ বিবাহবাটীতে সমবেত হইলেন, পুরাঙ্গণারা কন্যাকে সময়োপযোগী বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুকিয়া স্ট্রীট

ও তন্নিকটবর্তী রাজপথসমূহ লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, মনুষ্যমূর্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পরিচিত অপরিচিত ইতর ভদ্র গায়ে গায়েমাথায় মাথায় দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ জনতা ও বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব হইতে পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদানুসারে সুকিয়া স্ট্রীটে এবং যে পথে বর আসিবে সে পথে, প্রত্যেক দুই হস্ত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়। যখন বর ও বরযাত্রীরা বিবাহবাটীতে আসিলেন, তখন বর দেখিবার জন্য পথে এত জনতা হইল যে, বরের পাল্কী লইয়া অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। নূতন ব্যাপারের পথপ্রদর্শক হইতে গিয়া বরের সদাচিন্তিত ও চমকিত চিত্তে এই জনতাজাত যে আশঙ্কার উদয় হইতেছিল, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, প্রভৃতি বিদ্যাসাগর-বন্ধুমণ্ডলী বরের দক্ষিণে ও বামে পাল্কী ধরিয়া উৎসাহ ও আনন্দবর্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। (২৮) এইরূপ সমারোহ ও জনতার মধ্য দিয়া বর ও বরযাত্রী বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করেন। বিবাহ সভায় সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য টোলের অধ্যাপকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। (২৯) বিবাহ সভা, বিবাহের নিমন্ত্রণ আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী' হইতে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল:

বিধবাবিবাহ

আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত পটলডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার যখন ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইঁহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহনভট্টাচার্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল; ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইঁহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতিকুলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভকার্য সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইঁহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্রে ইঁহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবর্ণের

---

২৮ শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

২৯ সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ১২৩ পৃষ্ঠা।

বিবাহ উপলক্ষে এ দেশে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদি যে-যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এ বিবাহ সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোনো প্রকার অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। এই বিবাহে ন্যূনাধিক আটশত নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্যদিগের নিমন্ত্রণের জন্য কতকগুলি পত্র পৃথকরূপে সংস্কৃত কবিতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ঐ দুই প্রকার পত্রই পশ্চাতে অবিকল সঙ্কলন করিলাম।

'শ্রীলক্ষ্মীমণিদেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলিয়ার সুকেস্ স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকার্য সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দঃ ১৭৭৮।

অন্ত্যে ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরাং পদ্মিনী প্রাণকান্তে
স্বাহাকান্তে ক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে শাস্ত্রমার্গানুসারী।
ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিণয়নবিধির্ভর্তৃহীনাত্মজায়াঃ
পূর্বোবর্যাৰ্বিজ্ঞৈরিহ সদসি গতৈর্মৎকৃপাপারতন্ত্রাৎ॥'

ইহার পরদিবস পানীহাটী গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কায়স্থ কুলীনবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যাকে ইহার পিতাই সম্প্রদান করেন। ইহা কায়স্থবর্গেব নির্দিষ্ট কুলাচারানুসাবে সম্পন্ন হয়।

উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পাদন উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শুভ বিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্র পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্র সন্তান কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া উক্ত কর্ম সমাধা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পর্বে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল যে, সকল লোক সুন্দররূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং কন্যা সম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনো কোনো ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতেছেন এবং কোনো কোনো লোক শোকে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; কেহ বা এই ঘটনাকে স্বদেশের চির-কল্যাণের কারণ জানিয়া ইহার প্রয়োজক ও প্রবর্তকদিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন কেহ বা ইহাকে নিশ্চয় ভারতবর্ষের কলঙ্কস্বরূপ ও হিন্দুধর্মের উচ্ছেদের হেতু মনে করিয়া ইহার উদ্যোগকর্তা ও উৎসাহদাতাদিগকে

নানাপ্রকার অশ্রাব্য কটু-কাটব্য কহিতেছেন। যে সকল জ্ঞানসম্পন্ন দেশহিতৈষী বুদ্ধিমান লোক এই পরম কল্যাণকর শুভ ঘটনা সম্পন্ন হইবার প্রতি বহুকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছিলেন, যাঁহারা এই শুভদিন উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিদিন দিনগণনা করিতেছিলেন, যাঁহারা এই আনন্দময় সুখের দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য দূরবলম্বিনী আশালতার মূলে নিয়ত যত্নবারি সেচন করিতেছিলেন, এবং যাঁহারা এই বিধবাবিবাহরূপ পুণ্যতরুকে স্নেহাস্পদ জন্মভূমিতে রোপণ করিবার জন্য নানাপ্রকার মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক স্বদেশীয় অনেক বন্ধুবান্ধবের মানসক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগেরই মনে আনন্দের উদয় হইয়াছে। এই চিরবাঞ্ছিত ও দূরলক্ষিত সুখময় শুভদিন উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারাই আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছেন এবং এই কল্যাণকর পুণ্যতরু সত্বরে সফল হওয়াতে তাঁহারাই আপনাদিগের সকল অশ্রু ও সকল যত্নকে সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে জগদীশ্বরেব অসদৃশ করুণা-প্রসাদে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে জ্ঞান-সূর্যের উদয় হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক সন্তান জননী জন্মভূমিকে নানা প্রকার অধর্ম কণ্টকে বিদ্ধ দেখিয়া তাহা উত্তোলন করিবার জন্য ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়াছেন এবং তাহাকে পুণ্যকর্মরূপ পরম শোভনীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইয়াছেন, তাহারা দেখিতেছেন যে, পাপভারে প্রপীড়িত ভারতভূমি অনেক সাধু ব্যক্তির যত্ন হেতু এতদিনে এই সকল পাপের ভার হইতে পুনর্বার মুক্ত হইতেছে, ভুবনবিখ্যাত হিন্দুজাতির বহুকালের গাঢ় কলঙ্ক ক্রমে অপনীত হইবার উপায় হইতেছে এবং অবনত হিন্দুস্থান মস্তক পুনর্বার উন্নতগ্রীব হইয়া আপনার মহত্ব প্রকাশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারা এই সমস্ত শুভ চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া হিন্দুস্থানের শ্রীবৃদ্ধির ও হিন্দুজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য আশালতাকে নিয়ত বলবতী করিতেছেন। কিন্তু যে সকল জ্ঞানহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী দ্বেষপরবশ লোক আপনাদিগের দৃঢ়সংবদ্ধ কুসংস্কার হেতু এই সকল শুভ ব্যাপারকে অকারণে নিন্দিত কর্ম মনে করিয়া,ইহা সম্পন্ন হইবার প্রতি নানাপ্রকার ব্যাঘাত করিয়াছে, যাহারা ধর্মাধর্মের কোনো বিচার না করিয়া এই শুভ দিন উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় নিয়ত শঙ্কিত হইয়াছে এবং যাহারা এই শুভানুষ্ঠানকর্তা সাধুদিগের আশালতার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহারা জ্ঞানচক্ষুকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া এবং বুদ্ধি, যুক্তি ও বিচারের পথে এককালে কণ্টক প্রদান করিয়া দেশপ্রচলিত ব্যবহার-পরম্পরাকেই সর্বসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া, তাহা নিরাকৃত হইবার নাম শ্রবণ করিলে স্তব্ধবুদ্ধি ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছে, এই নিত্যবাঞ্ছিত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হওয়াতে তাহারাই শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছে, এই সন্তাপহারক শীতলতম

ধর্মবৃক্ষ ফলবান হওয়াতে তাহারাই হতাশ ও হতচেতন হইয়া অনর্থক হাহাকার করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে যে, ক্রমে কলি প্রবল হওয়াতে ধর্মের স্রোত এককালে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, ধর্মশাস্ত্র লোকসমাজে অমান্য হইয়া উঠিল এবং ভারতবর্ষে অধর্মের অধিকার দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিতেছে যে, এত দিনের পর হিন্দু নাম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ভারতভূমি ক্রমে পাপভরে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল এবং হিন্দুজাতির যশ, শ্রী, সৌভাগ্য সকলই অন্তরিত হইয়া গেল। তাহারা এই সকল অমূলক আশংকা কল্পনা করিয়া আপনাদিগের ভাবী সৌভাগ্যের আশা ভরসাকে এককালে ক্ষীণ করিতেছে। এই বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে যে ভারতবর্ষের কি পর্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষবাসী হিন্দুজাতির কতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইবার পথ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ ক্রমে যদি ভারতবর্ষের সকল কুপ্রথা নিরাকৃত হয় এবং এখানে সুপদ্ধতি সকল প্রচলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতভূমি পৃথিবীর মধ্যে পুনর্বার সর্বাগ্রগণ্য ধর্মক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হিন্দুজাতি সম্যক্‌রূপে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বিধবাবিবাহ কার্যতঃ প্রচলিত হওয়াতে যাঁহারা মনে মনে বিষণ্ন হইয়াছেন, এবং এদেশের অদৃষ্টকে অকারণ নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহাদিগের সে বিষাদ দূর হইবেক, এবং তাঁহারা স্বদেশকে সৌভাগ্যশালী দেখিতে পাইবেন। এ দেশে পতিহীনা অনাথাদিগের পুনরুদ্ধারের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে এখানে ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা ব্যাভিচার প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকট উৎকট পাপের পথ পরিষ্কৃত ছিল, তাহা নান্য পণ্ডিত বারংবার নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং যাহার অতি সামান্য বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে; অতএব সেই প্রথা প্রচলিত হইলে যে, ঐ সমস্ত পাপের পথ অবশ্যই রুদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই এবং তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলেরই বা সম্ভাবনা কি? ইহাতে হিন্দুধর্মাভিমানী প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা কি জন্য যে উৎসাহান্বিত না হইয়া বিষণ্ন হইবেন তাহা আমাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই; তবে তাঁহারা যদি কেবল অভিমান পরবশ হইয়া এবং যথার্থ ধর্মাধর্মের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, বহুকাল প্রচলিত বংশপরম্পরাগত দেশ-ব্যবহারের উচ্ছেদ ও অপ্রচলিত আধুনিক প্রথার প্রচার দেখিয়া দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে আর আমাদিগের কোনো উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্মপালক বলিয়া দম্ভ করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এ প্রকার আনন্দের স্থলে তাহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোনো ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘকালের পর শারীরিক কোনো চিররোগের আরোগ্য হইলে

তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ দেশপ্রচলিত কোনো প্রাচীন কুপ্রথার উচ্ছেদ দেখিয়া খেদ করাও অন্যায়। যাহা হউক প্রতিপক্ষীয় মহাশয়দিগের চিত্ত যখন কিঞ্চিৎ স্থির হইবে, দ্বেষানল নির্বাপিত হইবে, এবং অভিমান দূরে গমন করিবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই দেখিতে পাইবেন যে, এখানে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হওয়াতে এ দেশের কিরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে।

একণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্নে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, যাঁহাদিগের উৎসাহে এই চিরবাঞ্ছিত সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্য গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোনো মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহাব্যাপার যে কতিপয় অসামান্য ধী-সম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামাণ্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন-সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। এই মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধিবলে হিন্দুদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং বিধবা বিবাহ যে হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচার কৌশলে তাহা সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহারই প্রভাবে হিন্দুশাস্ত্রের এ কলঙ্ক দূর হইল তাঁহারই প্রসাদাৎ হিন্দু বিধবারা অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। তিনি এই শুভসঙ্কল্প সিদ্ধকরণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটুকাটাব্য ও উপহাসাদির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি যখন বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচার করেন তখন প্রতিবাদিগণ তদুত্তরে তাঁহাকে কটু কহিতে অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা করিতেও ত্রুটি করে নাই, এবং নানা শত্রু নানা মতে বৈরসাধন করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার ভূধরনিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্বতের উপর পতিত হইয়া আপনিই তেজহীন হয়, শত্রুগণের নিন্দাবাদ ও কটুবাক্য সকলও সেইরূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞানহীন অবোধ লোকের বৈরব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ করিতে কোনরূপে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় বিধবাদিগের প্রজ্বলিত বৈধব্য-যন্ত্রণানল নির্বাপিত হইবার আর কোন উপায় হইত না এবং দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচারাদি পাপভার হইতে কস্মিন্‌

কালেও পরিত্রাণ পাইত না,—অনাথা বিধবাদিগের হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি নিঃসৃত নিঃশ্বাসানলে ভারতবর্ষ চিরদিনই দগ্ধ হইত।

হা জগদীশ! এ সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি যে কোনো সূত্রে ও কোনো কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর, কাহার সাধ্য তাহা বোধগম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীনা অবলাদিগের অনিবার্য শোকাগ্নি নির্বাণ করিবে, কে মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দুশ্ছেদ্য শাস্ত্রের শাসন ছেদ করিয়া আপনাদিগের দুঃখরাশিকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? আহা! তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা স্মরণ হইলে এখনও আমাদের অশ্রুপাত হয়। আহারা যে আবার এ শুভ দিন প্রাপ্ত হইবে, আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এ সকলের মূল। ভারতভূমি পূর্বাবধি ধর্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দু জাতি চিরদিনই ধর্মপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ-ব্যবহারে সে সকল সম্পত্তিই হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্যযন্ত্রণাকে এ দেশের স্ত্রীলোকে অনিবার্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল, যাহা হইতে তাহারা কস্মিনকালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না, এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই যন্ত্রণার শেষ হইল, সেই রোগের ঔষধ স্থির হইল, এবং তাহা হইতে এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মুক্তি পাইল, তাঁহার এই অসামান্য কীর্তি যেন নিত্যকাল পৃথিবীর মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা। (৩০)

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—
সবিনয় নিবেদন মিদং—

আমি ৬ই পৌষে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া ৯ই পৌষে কীটগঞ্জে লালা বংশীধরের দরুণ শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই যাইতেছে না। অম্লরোগ (acidity) অতিশয় প্রবল, সুতরাং সুচারুরূপ আহারাদি করিতে পারি না। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত

---

৩০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯ই পৌষ সোমবার, সম্বৎ ১৯১৩।

আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্‌কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবাবিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। গ্রাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত-যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন এই শুভসংবাদ সমূলক কি না, অনুগ্রহপূর্বক লিখিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সসম্প্রীত সাদর নমস্কার অবগত করিবেন। ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানা প্রকারে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, যত প্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে, সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, বিধবাবিবাহের সূচনা হইতে কলিকাতায় কেহ কেহ গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃদ্ধ পিতা ঠাকুরদাস, বীরসিংহের বাটীতে বসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার অশেষ গুণের আধার প্রিয়তম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণসংহারের জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীমন্ত নামে যে এক সর্দার বাড়িতে দ্বারবান ও পাকের কার্য করিত, তাহাকে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কোথাও যাইতেন, পথে সেই শ্রীমন্ত সর্বদা সঙ্গে থাকিত; বিধবাবিবাহের আন্দোলনরূপ বৃহৎ বন্যায় যখন সমগ্র দেশ ভাসিয়াছে, সেই সময় একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, সংস্কৃত কালেজ হইতে বাসায় আসিবার সময় ঠনঠনিয়ার কালীতলায় দেখিলেন, কয়েকজন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত কালের মধ্যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের এক মহাপুরুষের অকালে গোপনে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ভীমকায় শত্রুদিগের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না, কেবল একটিবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস্‌ কি?' শ্রীমন্ত পশ্চাৎ হইতে বলিল, 'তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও, চাকর সঙ্গে আছে।' শ্রীমন্ত যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া আক্রমণকারীরা তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন, আর একটি পাও অগ্রসর হইল না; যে যতদূর আসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইল। এই সময়ে রাত্রিতে শ্রীমন্তকে সঙ্গে না লইয়া তিনি কোথাও যাইতেন না। সিপাহীবিদ্রোহের সময়েও শ্রীমন্ত কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল; ঐ সময়ে সংস্কৃত কালেজে ইংরেজ সৈন্যদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এক দিন শ্রীমন্ত

কালেও পরিত্রাণ পাইত না,—অনাথা বিধবাদিগের হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি নিঃসৃত নিঃশ্বাসানলে ভারতবর্ষ চিরদিনই দগ্ধ হইত।

হা জগদীশ! এ সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি যে কোনো সূত্রে ও কোনো কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর, কাহার সাধ্য তাহা বোধগম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীনা অবলাদিগের অনিবার্য শোকাগ্নি নির্বাণ করিবে, কে মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দুশ্চেদ্য শাস্ত্রের শাসন ছেদ করিয়া আপনাদিগের দুঃখরাশিকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? আহা! তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা স্মরণ হইলে এখনও আমাদের অশ্রুপাত হয়। তাহারা যে আবার এ শুভ দিন প্রাপ্ত হইবে, আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এ সকলের মূল। ভারতভূমি পূর্বাবধি ধর্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দু জাতি চিরদিনই ধর্মপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ-ব্যবহারে সে সকল সম্পত্তিই হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্যযন্ত্রণাকে এ দেশের স্ত্রীলোকে অনিবার্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল, যাহা হইতে তাহারা কস্মিন্‌কালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না, এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই যন্ত্রণার শেষ হইল, সেই রোগের ঔষধ স্থির হইল, এবং তাহা হইতে এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মুক্তি পাইল, তাঁহার এই অসামান্য কীর্তি যেন নিত্যকাল পৃথিবীর মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা। (৩০)

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—
সবিনয় নিবেদন মিদং—

আমি ৬ই পৌষে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া ৯ই পৌষে কীটগঞ্জে লালা বংশীধরের দরুণ শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই যাইতেছে না। অম্লরোগ (acidity) অতিশয় প্রবল, সুতরাং সুচারুরূপ আহারাদি করিতে পারি না। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত

---

৩০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯ই পৌষ সোমবার, সম্বৎ ১৯১৩।

আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্‌কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবাবিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। গ্রাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত-যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন এই শুভসংবাদ সমূলক কি না, অনুগ্রহপূর্বক লিখিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সসম্প্রীত সাদর নমস্কার অবগত করিবেন। ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানা প্রকারে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, যত প্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে, সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, বিধবাবিবাহেব সূচনা হইতে কলিকাতায় কেহ কেহ গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৃদ্ধ পিতা ঠাকুরদাস, বীরসিংহের বাটীতে বসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার অশেষ গুণের আধার প্রিয়তম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণসংহারের জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীমন্ত নামে যে এক সর্দার বাড়িতে দ্বারবান ও পাকের কার্য করিত, তাহাকে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কোথাও যাইতেন, পথে সেই শ্রীমন্ত সর্বদা সঙ্গে থাকিত; বিধবাবিবাহের আন্দোলনরূপ বৃহৎ বন্যায় যখন সমগ্র দেশ ভাসিয়াছে, সেই সময় একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, সংস্কৃত কালেজ হইতে বাসায় আসিবার সময় ঠনঠনিয়ার কালীতলায় দেখিলেন, কয়েকজন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত কালের মধ্যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের এক মহাপুরুষের অকালে গোপনে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ভীমকায় শত্রুদিগের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না, কেবল একটিবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস্‌ কি?' শ্রীমন্ত পশ্চাৎ হইতে বলিল, 'তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও, চাকর সঙ্গে আছে।' শ্রীমন্ত যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া আক্রমণকারীরা তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন, আর একটি পাও অগ্রসর হইল না; যে যতদূব আসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইল। এই সময়ে রাত্রিতে শ্রীমন্তকে সঙ্গে না লইয়া তিনি কোথাও যাইতেন না। সিপাহীবিদ্রোহের সময়েও শ্রীমন্ত কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল; ঐ সময়ে সংস্কৃত কালেজে ইংরেজ সৈন্যদিগকে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এক দিন শ্রীমন্ত

দিনের বেলায় প্রয়োজনবশতঃ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, সে কালেজ-গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, গোরারা আসিয়া বাধা দিল, তাহারা পথ ছাড়িয়া দিবে না, ছিরেও জোর করিয়া গোরার বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সেই পথে প্রভুর নিকট যাইবে। শ্রীমন্তের যেমন শক্তি ছিল, তেমনি সর্দারিগিরিও জানিত ভাল, সাহসও ছিল অসীম। শ্রীমন্ত একবার সাহেবদের বল পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বাধাপ্রাপ্ত পথে লাঠি হাতে অগ্রসর হইল, গোরারা প্রথমে নিষেধ করিল, শেষে ধরিয়া সরাইয়া দিতে গেল; কিন্তু শ্রীমন্তকে সরাইতে পারিল না। শ্রীমন্ত সম্মুখ হইতে দুই হস্তে দুই দিকে সাহেব সরাইয়া পথ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া অপদস্থ হইয়া গোরারা বন্ধুক ধরিয়াছে, তখন শ্রীমন্ত লাঠি ধরিয়াছে। লাঠি খেলিয়া বন্দুকের গুলি নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে গোরা-সৈন্যের কর্তৃপক্ষ সাহেব সেইখানে আসিয়া পড়িলেন। তিনি গোরাদিগকে ঐরূপ ব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া সন্ত্রাসিত চিত্তে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গোরাদিগকে বলিলেন, 'কি করিতেছ? ও যে পণ্ডিতের লোক!' গোরারা 'জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো' ভয়ে জড়সড় হইয়া দশ হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া শ্রীমন্তকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমন্ত গর্বভরে বলিল, দেশের লোক সবই ত এক একবার নাড়াচাড়া দিয়া দেখিয়াছি, সুবিধা পাইয়া একবার সাহেব পরখ করিয়া দেখ্‌ছিলুম।' প্রভু বলিলেন, 'এখনি যে গিছ্‌লিরে বেটা!' শ্রীমন্ত বলিল, 'আজ্ঞে আমার হাতে যে লাঠি ছিল, কার সাধ্য আমার গায়ে হাত দেয়!' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তোর গায়ে কি হাত দিত? বন্দুকের গুলি মারিয়া তোকে সাবাড় করিত।' শ্রীমন্ত তাহার সুশ্যাম তনুখানিকে উৎসাহরাগে রঞ্জিত করিয়া বলিল, 'যদি গুলিতে মরিব, তবে লাঠিগাছা ধরি কেন? ওদের বন্ধুক ভ'রতে হয়, আমার লাঠি সমানে চলে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীমন্তের বীরত্বকাহিনী জানিতেন, তবুও একবার নাড়াচাড়া দিয়া দুটা কথা শুনিলেন।

১২৬৩ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র ৺দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু ক্রমান্বয়ে এক একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই উভয় বিবাহেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

এতাদৃশ অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া এই বৃহৎ ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা শুক্লপ্রতিপদের চাঁদের মতো উদয় হইতে না হইতে অদৃশ্য হইলেন। দরিদ্র ঈশ্বরচন্দ্রের সমক্ষে নিরাশা-অমাবস্যার ঘন অন্ধকার পূর্ণ-মাত্রায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃহদাকার নক্ষত্রের

ন্যায় তাঁহার কোনো কোনো ইংরাজ বন্ধু তাঁহার বিষাদপীড়িত আশার আকাশে উদিত হইয়া উৎসাহের আলোক বিতরণ করিতেছিল; দৈবাং পূর্ব গগনে উদিত হইয়া নক্ষত্রের ন্যায় কোনো কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর কিছু কিছু সহায়তা পাইয়া উপকৃত হইতেন, এবং তাহাতেই অতিকষ্টে সে সময়ে বিধবাবিবাহ-কার্য চালাইতে সক্ষম হন, কিন্তু নিজের অভাব ও অসুবিধার কথা এক দিনের জন্যও ভাবেন নাই; এইরূপ অর্থব্যয় ও তজ্জন্য নানা প্রকার অসুবিধা ও অনটনের মধ্যে তিনি যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দিন যাপন করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। শতবিধ অসুবিধার মধ্যে যখন তিনি এই বৃহৎ কার্যে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার এই সমাজসংস্কার ব্যাপারে যাঁহারা বিশেষভাবে সহকারিতা করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজনারায়ণবাবুর সহায়তা লাভে, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাসূচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল:
'আপনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি···যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অবধি আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আপনি অতি মহাত্মার কর্ম করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনার মনের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।'

হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বরিশালে অবস্থানকালে তাঁহার বালিকা বিমাতার বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর বিখ্যাত উকীল ৺কালীমোহন দাস মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতায় প্রথমবারে বিফলমনোরথ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে গভীর আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বিষাদ ও বিপদের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও নিরাশার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, দুর্গামোহনবাবুকে যে সান্ত্বনা ও গভীর অনুরাগপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন. সে সুন্দর পত্রখানি এই:

'অশেষ গুণাশ্রয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়

পরমকল্যাণভাজনেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্ —

অন্নদাচরণকে যে দিন শেষ পত্র লিখি, ঐ দিনই আপনাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পরদিন লিখিব, কিন্তু পরদিন অধিকবার ভেদ হওয়াতে কয়েকদিন এরূপ দুর্বল ছিলাম এবং তৎপরে আর কয়েকদিন কোনো বিশেষ কারণ বশতঃ এরূপ ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাকে এত দিন পত্র লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না;

আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সঙ্কল্পিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এ বিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায় সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' শুভ কার্যের নানা বিঘ্ন। আমি যে অবধি এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম সর্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম, এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম সম্পন্ন হউক, আর নাই হউক, আপনার সাহস, মানসিক মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম সম্পন্ন হইত। আপনি যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনি দীর্ঘজীবী হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অশেষবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক।

আমি অনেকবার অনেক প্রামাণিক লোকের মুখে আপনকার গুণানুবাদ শুনিয়াছি এবং আপনি সদাশয়, সরলহৃদয় অকুতোভয়, উদারচরিত ও সর্বদা পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

আমি অদ্যাপি শারীরিক সম্যক্ স্বচ্ছন্দ হইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে আপনকার মঙ্গল সংবাদ পাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিব, ইতি।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

যখন অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, তখন বিধবাবিবাহ হওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল এবং চারিদিকে লোক বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল,

দৈবযোগে দুই-একটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর হইবে না। আর এই বিধবাবিবাহের ব্যাপারে সমগ্র দেশ যখন আন্দোলিত, ঠিক সেই সময়ে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা হয়, নানা প্রকার জনরবের মধ্যে বিধবাবিবাহ-বিরোধী দল এই গুজব প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হিন্দুধর্মের মর্ম না বুঝিয়া বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপ করিয়া ইংরাজরা বিপদে পড়িয়াছেন। বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা সিপাহীগণের কোপানলে পড়িয়াছেন। ফলতঃ সিপাহী যুদ্ধে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাঁহাদের কেহই বিধবাবিবাহ ব্যাপারের কিছুমাত্র অবগত ছিল না। যাহা হউক এই রাজবিপ্লব উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ কার্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত ছিল; আবার প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে যখন সমগ্র দেশ স্থির ও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, তখন বিধবাবিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, সিপাহী-যুদ্ধের গোলযোগে বিধবাবিবাহেরও গোলযোগ বাধিয়াছে, কিন্তু যখন বিরোধী দল দেখিলেন, 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী' তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া বিরোধিতার রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া নীরব ভাব ধারণ করিলেন। বিধবাবিবাহ আবার একে একে আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা এইখানে উদ্ধৃত করা গেল:

'গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কন্যার পিতা বর্তমান, তিনি স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছেন। বর সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত; বয়ঃক্রম আঠার বৎসর মাত্র। কন্যাটি অতি বালিকা, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যে তিনি বিবাহসংস্কার লাভ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বৈধব্য সংগঠন হইয়াছিল। এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ হইলে বিবাহ প্রকৃত বিবাহসংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কি না, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐরূপ বিবাহ বিবাহসংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নাম মাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কন্যাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং আদৃশ বিধবা কন্যাকে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কেমন ভয়ংকর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিজীবী জীবের বিধেয় কিনা এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা চির প্ররূঢ় কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। পুরুষানুক্রমে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা নানা অনর্থের মূল ও নানা উৎপাতের হেতু হইলেও, তাঁহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া তদনুসারেই চলিয়া

থাকেন। এই প্রথা প্রবল প্রচলিত থাকাতে কত প্রকারে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তথাপি কেবল কুসংস্কার দোষে এতদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞান হয় না। ফলতঃ কুসংস্কার মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে এক কালে অনেক অনর্থ নিবারণ হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু বিধবা-বিবাহ বহুকাল প্রচলিত ছিল না। কতিপয় পূর্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। সুতরাং এক্ষণকার লোকদিগের চিত্তে ক্রমে ক্রমে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে, বিধবাবিবাহ অতি অসৎ কর্ম। বিধবাবিবাহ যে যথার্থ শাস্ত্রানুগত কর্ম, সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু এতদ্দেশে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারের অধিক সম্মান। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত হইলেও দেশাচারপরিগৃহীত নয় বলিয়া এক্ষণ পর্যন্ত বিধবাবিবাহের তাদৃশ আদর হইতেছে না। কিন্তু যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহা কোনো মতেই অসম্ভাবিত নহে যে, এই শ্রেয়স্কর ব্যবহার অনধিক কালমধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিবেক।

অনেকে এই আপত্তি করিয়া থাকেন যদি এই ব্যবহার যথার্থ শ্রেয়স্কর হইবেক তাহা হইলে আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই কেন? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই ব্যবহার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কিছুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, স্মৃতি ও পুরাণে তাহার অসংশয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবহার রহিত হইয়া আসিয়াছে। রহিত হইবার এই এক প্রধান কারণ লক্ষিত হইতেছে যে, পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা কলিযুগে সহমরণের ও অনুগমনের প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অনেক অথবা প্রায় সকল বিধবাই স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতায় কিংবা বিদেশস্থ স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বতন্ত্রে চিতায় আরোহন করিয়া জীবনযাত্রা সমাপন করিতেন। সুতরাং এক্ষণকার ন্যায় পূর্বে বিধবার সংখ্যা এত অধিক ছিল না এবং সকলকে স্ব-স্ব কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতির দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ এবং বৈধব্য নিবন্ধন পরিবার মধ্যে নানা অনর্থ সংঘটন অবলোকন করিতে হইত না। যদি বিধবার সংখ্যা বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ ও বৈধব্য নিবন্ধন অনর্থ সংঘটন মাত্রা অল্প হইল, তাহা হইলে আর বিধবাবিবাহের তাদৃশী আবশ্যকতা রহিল না। বোধ হয়, এই হেতুবশতঃই ক্রমে বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজশাসনে সহমরণ ও অনুগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বিধবার সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের পরিমাণও উত্তরোত্তর অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব যে কারণের অসদ্ভাবে বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, যখন ঐ কারণ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিধবাবিবাহের

প্রথা অবলম্বন ভিন্ন অনর্থ নিবারণের আর কোন উপায় হইতে পারে না। কি আহ্লাদের বিষয়, গত ১১ই ও ২৮শে আষাঢ় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি বিধবা বিবাহের সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিধবার উদ্বাহ ব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রীতিমতো বিধবাবিবাহের এই সূত্রপাত হইল।

অনেকে মনে করিতেন, যদিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এ বিষয়ের আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সহসা হওয়া কোনো মতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কুসংস্কার বিমোচন হইয়াছে। এমত স্থলে এরূপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই অদ্যাপি অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে নিতান্ত বশীভূত। এমত স্থলে এরূপ ব্যাপার হিতকর বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি যথার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এই মাত্র ফল লক্ষিত হইতেছে যে, অনেকেরই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্য বোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোনো বিশেষ ফল নাই। যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সহসা দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন তাহা হইলে এত দিনে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না। যৎকালে যুবকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের তৎকালীন ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করেন, ইহাদিগের দ্বারা অনেকাংশে দেশের দুরবস্থা বিমোচন হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ সকল যুবক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-কর্মে ও সংসার ধর্মে প্রবিষ্ট হইলেই,সে সকল ভাবের এককালে অভাব হইয়া উঠে।' (৩১)

এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারিতা করিয়াছিলেন, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন। সুতরাং তাহার আত্মচরিতে এই সংস্রবে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এইস্থলে উদ্‌ধৃত করা গেল: '১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুরে যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহের আন্দোলন উঠে।

---

৩১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৪ পৌষ, শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৪।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এই চটী বাহির হওয়াতে মহা আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল, বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগ্‌দান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অতীব সন্তোষজনক। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত কালেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাহার মনঃপূত হইল না। কালেজ হইতে বহুবাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সন্তোষজনক মীমাংসার ভাব মনে উদিত হইল। কালেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। সমস্ত ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন। পুনর্বিবাহিত বিধবার গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জন্য তাঁহারা গভর্নমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন। স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট, যিনি পরে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গভর্নর হইয়াছিলেন, তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, 'অপর পক্ষীয়েরা যেমন হিন্দু, ইঁহারাও তেমনই হিন্দু।' (৩২) আর এই বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে, 'যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন বিধবাবিবাহ দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা পুড়িয়া মরা ভাল।' যেমন বিধবা-বিবাহের আইন করা হইল, অমনি কার্যারম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের গতিকই এইরূপ।...যে দিন বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতায় লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টোনোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবা-বিবাহ পাণিহাটির মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন, এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লিখেন যে, যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন,

---

৩২ They are as much Hindoos as the other party.

শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, বেদবেদান্তের অনুবাদ করিয়া এবং বহুল পরিমাণে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদ এদেশের প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। আপনারা কেন সে পথ পরিত্যাগ করিলেন? আপনারা কেন শাস্ত্রীয় বচনগুলি উদ্ধার করিয়া আপনাদের মত সকল স্থাপন করেন না?' তখন তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহা এই—'শাস্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইতে যে সময় ও যে শ্রমের প্রয়োজন তাহা ব্যয় করিতে বিশেষ উৎসাহ হয় না, কারণ যদি জানিতাম দেশের লোক শাস্ত্রীয় বচনের অপেক্ষাতে বসিয়া আছেন, শাস্ত্রীয় বচন প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারা আপনাদের পুরাতন ভ্রম বর্জন করিয়া নবীন সত্য গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে না হয় ক্লেশ স্বীকার পূর্বক শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিতাম ও ভূরি ভূরি ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের নিকট ধরিতাম; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, বিচারকালে লোকে শাস্ত্রের দোহাই দিক্, আর যাহাই করুক, ফলে কার্যকালে দেশাচারকেই মান্য করিয়া চলে, তখন আর শাস্ত্রীয় বচন অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিধবার পুনর্বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি কি না ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত বিধবাবিবাহ প্রতিপাদক গ্রন্থ তাঁহার অদ্ভুতপরিশ্রম ও অদ্ভুত শাস্ত্র-বিচার শক্তি, এই উভয়েরই প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। এমন শাস্ত্রীয় মীমাংসা রামমোহন রায়ের পরে আর কেহ কখনও দেখে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের যেরূপ প্রাচীন শাস্ত্রে অনুরাগ, তাহাতে তিনি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপাদন করিলেই লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিবে। কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্যকালে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। অতএব দেখিতেছি, কেবল শাস্ত্রীয় বচনে কুলাইতেছেনা; আরও এমন কিছু দিতে হইবে, যাহাতে লোকে লোকভয় অতিক্রম করিতে পারে।'

এই কথোপকথনের পর অনেকবার এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারের নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি চক্ষে পড়িল,; 'ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া একাধিপত্য করিতেছিস্।...'

দেশাচারের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে এই গভীর মর্মভেদী আক্রোশ ইহার কারণ এই যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করিলেন, 'দেশাচারই তাঁহার পথে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় পথ আবরণ করিয়া দণ্ডায়মান।'(৪৮)

---

৪৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ। নব্যভারত, বিদ্যাসাগর সংখ্যা।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো সমাজ মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনিতে হইলে সমাজের প্রবহমান স্রোতে নিজের চেষ্টাকে ছাড়িয়া দিলে, তাহা ভাসিয়া যায়, কারণ যাহাদের বহুকালের অভ্যাস-প্রসূত প্রকৃতিগত আলস্য ও অনুদারতা সমাজ-দেহের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আগ্রহ ও উৎসাহের নূতন শোণিত স্রোতঃ প্রবাহিত করিতে না পারিলে, সে সমাজ ক্ষেত্রে নূতন চিন্তার প্রবল প্লাবন প্রবাহিত করিতে না পারিলে, সে ক্ষেত্রে নূতন ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ নূতন বন্যার বিশাল তরঙ্গ তুলিতে হইলে, কেবল শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যাতে তাহা সুসিদ্ধ হয় না। যেমন সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় তাম্র শলাকা বিদ্যুতের সুতীব্র আলোকের পরিচালকরূপে কার্য করিতে থাকে, তদ্রূপ ধর্মকে মধ্যবিন্দু করিয়া, ধর্মকে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজসংস্কারের সূচনা করিতে হয়। ধর্মরূপ ভিত্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, সেই সংস্কারকার্যই বাস্তবিক সুসিদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কার কার্য সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র ও শাস্ত্রগত ধর্ম ব্যাখ্যাসম্মত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সংস্কার ব্যাপার ধর্ম সংস্কার প্রসূত হয় নাই বলিয়া বিশেষভাবে স্থায়িত্বলাভ করিল না। এই সম্বন্ধে বোম্বাই হাইকোর্টের মাননীয় জজ মহাদেব গোবিন্দ রাণাদে মহোদয় মালবারি মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ প্রমাণরূপে প্রদত্ত হইল: 'কাল সহকারে কর্মসূত্রে আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের যাহাতে সর্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, সেই জটিল সামাজিক প্রশ্ন, ধর্মান্দোলনের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে সুমীমাংসিত হইতে পারে না। সুবিধা কিম্বা লাভা লাভের চিন্তা সমাজদেহে সংস্কার-সাধনোপযোগী বল বিধান করিতে পারে না, বিশেষতঃ আমাদের এ সমাজ শাস্ত্রাদেশ ও দেশাচারের ষোল আনা দাস হইয়া রহিয়াছে।... প্রকৃত কথা এই যে রক্ষনশীল সমাজের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার দ্বারা কোনো সংস্কারকার্য সাধিত হইতে পারে না এবং সেরূপ কার্যে ইহার সহানুভূতিও নাই। বাহিরের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন সাধন হয় না, কিন্তু জীবন্ত অনুরাগরঞ্জিত নূতন ধর্মজীবনের স্রোতে এই সকল সংস্কারকার্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।'(৪৯)

এদেশে একটি চলিত কথা আছে 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ,' কিন্তু মিলে মিশে কাজ করা আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে। ধর্মশাস্ত্রবেত্তা মহাজনগণের কেহ কাহারও সহিত মতে মিলিতেন না

---

৪৯ Our deliberate conviction, however, has grown upon us with every effort, that it is only a religious revival that can furnish sufficient moral strength to work out the complex

বলিয়াই এক এক করিয়া বিংশতিখানি ধর্মশাস্ত্র রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে (৫০) এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান আছে। এই সকল ধর্মশাস্ত্রের বিধি সাধারণতঃ লোকযাত্রা নির্বাহ সহায়তা করিলেও, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়াছে। সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে এইরূপ মতভেদ যে সাংঘাতিক অন্তরায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতবর্ষে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য এবং নানক ও কবীরপন্থী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টিই সামাজিক জীবন-ক্ষয়ের প্রধান কারণরূপে কার্য করিয়াছে। আমাদের ভাগ্যে, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ', এ দৃশ্য আর দেখিতে পাওয়া গেল না। ইহার পরিবর্তে এদেশে 'নানান্ মুনির নানান্ মত' সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। রাজা রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ চেষ্টায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্তরায় হইয়াছিলেন, স্মার্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়া লোক মজাইয়া পরে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া বিপক্ষের সহকারিতা করিয়াছিলেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণগত চেষ্টা কথঞ্চিৎ ফলবতী হইলেও বিপক্ষপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ বহু-পরিমাণে অন্তরায় হইয়াছিল। এইটি তৃতীয় কারণ।

চতুর্থ কারণ এই যে, তিনি যেরূপ আগ্রহ সহকারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনের সময় এদেশে সেইরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া এ কার্যে রত থাকিবার লোক ছিল না। তবে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত

---

social problems which demand our attention. Mere consideration of expediency or economical calculations of gains or losses can never a community to undertake and carry through social reforms, especially with a community like ours, so spellbound by custom and authority···The truth is, the orthodox society has lost its power of life, it can initiate no reform, nor sympathise with it. Only a religious revival, a revival not of forms, but of sincere earnestness which constitute true religion, can effect the desired end.'—The Hon'ble Justice M. G. Ranade of Bombay High Court wrote in reply to Mr. Malabari's note.

৫০ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ১। ৪
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ। ২। ৪

সাক্ষাৎকালে বলিয়াছিলেন যে, 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম প্রচলিত, তত দূর দৌড়িতে হইবে।' তিনি বিধবাবিবাহ গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টাই কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তরিত হইলেও বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের অন্য নানাস্থানে বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য এই যে, বাঙ্গালায় প্রায় সকল প্রকার হিতানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য এই যে, সূত্রপাত হইতে না হইতেই অনুষ্ঠানের সেই চারাগাছগুলি উঠাইয়া ভারতের অন্যান্য উর্বরক্ষেত্রে রোপিত হয়। উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, বম্বে ও মাদ্রাজে বিধবাবিবাহ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে, নিম্নলিখিত বিবরণ তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদান করিবেক: বরদার অধিপতি মহারাজ সায়াজি রাও গাইকোয়াড় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখের পত্রে মালাবারি মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন 'আমার বোধ হয় প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং এইরূপ আলোচনার একটি সীমা থাকা আবশ্যক। এই সকল সামাজিক দুর্নীতি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে, এবং কার্যতঃ এ সকলে অগ্রসর না হইলে ইহার প্রতিকার হইবে না। সুশিক্ষিত যুবকগণ সর্ববিধ সুযোগ থাকিতেও কাজের সময়ে যদি এরূপ শুভানুষ্ঠানে অগ্রসর না হন, উপদেশ দেওয়া ছাড়িয়া আপনারা কিছু ক্ষতিস্বীকার করিয়া এই সকল সংস্কার কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াস না পান এবং সেই সকল কার্যে সহায়তা না করিয়া যদি নির্লিপ্ত থাকিয়া চিন্তাবিষয়ে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে সমাজের সেরূপ অবস্থা চিন্তা করিতে প্রাণে আনন্দের উদয় হয় না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৎসাহসের অনুগত হইয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে জীবনের সর্বপ্রকার দায়িত্বভার বহন করা অপেক্ষা সংসারে উচ্চ সম্পদ আর কি হইতে পারে। (৫১)

৫১ "I think there has already been too much writing and lecturing on the subject and that such activity however useful and necessary, must have a limit. Evils like these call loudly for action, and action alone can remedy them. It is not very pleasant to reflect that so many of our learned young men who have such ample opportunities of doing good to their country, do not, when occasion offers, show the truth of the old adage "example is better than precept" by boldly coming forward, may be, at some personal sacrifice, to respond to what

মহীশূরের হিন্দু অধিপতি নিজ রাজ্য মধ্যে এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পুরুষ চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। বাল্যবিবাহ নিবারণ ও বিধবার সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পক্ষে এই শুভ সংস্কার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেক। বরদারাজ ও মহীশূরের অধিপতি প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যখন এই সকল সংস্কার কার্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন এবং ঐ অঞ্চলের বহুতর মধ্যবিত্ত পরিবার (৫২) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সকল মঙ্গলকর পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তখন আশা করা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণগত চেষ্টা কালে ফলবতী হইবে। তাঁহার লোকান্তর গমনের কিছুদিন পূর্বে নলডাঙ্গার হিন্দু রাজা প্রমথ ভূষণদেবরায় বহু অর্থ ব্যয়ে বিধবাবিবাহের আয়োজন করেন এবং একে একে কয়েকটি বিধবার বিবাহও দিয়াছিলেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী নিজ সম্প্রদায় মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই সকল কার্যে অগ্রসর হওয়ার পথে যে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন শত্রুরূপে দণ্ডায়মান' সুশিক্ষাগুণে সেগুলি কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইলে বিধবাবিবাহ প্রচলন কথঞ্চিৎ সহজ হইয়া পড়িবে। সম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তির গৃহে যখনই এরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহা বিনা ওজর আপত্তিতে সম্পন্ন হইবে। তাহার প্রমাণ এই যে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মালাবারি মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন : বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে আমি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহি'। কিন্তু সামাজিক সর্ববিধ দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওয়ার আশঙ্কায় বিধবাবিবাহ দেওয়া অপেক্ষা আমি বিধবার ব্যক্তিগত অধিকারের অধিক পক্ষপাতী...আমার কন্যা নাই। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার গৃহে আমার বিধবা কন্যা থাকিত, আমি নিশ্চয়ই তাহার বিবাহের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতাম।' (৫৩)

---

they, from their otherwise secure position, would lend weight and like to be recognised as the aristocrecy of intelligence. Nothing is rarer in this world than the courage which accepts all personal responsibilities and carries burden unbending to the end'—Maharaja Gaekwar of Baroda,

৫২ I had invited to the wedding all the Gujrati Hindoos who had contracted widow remarriage since my own, and a number of them had come from Gujrat and Kattyawar to take part in the marriage festivities (on the occasion of hisdaughter's marriage.)'—Taken from the story of widow remarriage of Madhowdas Raghunathdas, Merchant of Bombay, Page 76.

৫৩ 'I yield to none in advocating widow marriage, but I

দেশাচার শাস্ত্র হইতে ভিন্ন পথে চলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার কার্যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে, তাঁহার বিপুল আয়োজনেও সুপ্রতুল হয় নাই,ধর্ম ও শাস্ত্র উভয়ই তাঁহার স্বপক্ষে ছিল বলিয়া শতাধিক বিধবাবিবাহ তিনি নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবার। বিধবাবিবাহের এই দুইখানি তালিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতেই প্রায় একশত বিধবার বিবাহ সংবাদ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি বিধবাবিবাহ হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্রব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠান সকলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেও বহুসংখ্যক বিধবার বিবাহনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। সেগুলির অধিকাংশই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তালিকা ভুক্ত নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তালিকায় হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান-গুলিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। দেশাচারের সুতীব্র শরজালে তাঁহার সংস্কার কার্যের গতিরোধ করিয়াছিল এবং তিনি তাহা বিলক্ষণ অনুভব পারিয়াছিলেন; সেই জন্যই বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের শেষভাগে তাঁহার হৃদয়ের গভীর আক্ষেপোক্তির পরিচায়ক অশ্রুজল বিসর্জন করিয়াছেন, আমরা সাগরের অশ্রুকণায় পাঠকগণকে স্নান করাইয়া এই ক্ষেত্র হইতে ক্রমে অন্যত্র গমন করি। সেই উত্তপ্ত অশ্রুপ্রবাহের কিয়দংশ এই:

'ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিয়াছিস্। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন অধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্; ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মানা হইতেছে; ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব ধর্ম বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষণাগুণে সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরা তোর অনুগতনা হইয়া, কেবল লৌকিক-রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয়ওনিন্দনীয় হইতেছেন।

---

advocate it on the broad ground of individual liberty of choice and not on account of immorality, possible or contigent... I have no daughter, but if I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried utmost to get her remarried.'—Ragendra Lala Mitra.

তোর অধিকারে, যাহারা জাতিভ্রংশকর, ধর্মলোপকর অধর্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম লোপ হয় না ; কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিকরক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহারব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্মের লোপ হইয়া যায়।—

হা ধর্ম ! তোমার মর্ম বুঝা ভার ! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।

হা শাস্ত্র ! তোমার কি দুরাবস্থা ঘটিয়াছে ! তুমি যে সকল কর্মকে ধর্মলোপের জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে তাহারা ত সর্বত্র সাধু ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে ; আর তুমি যে কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, অর্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপ প্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই পতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ ! তুমি কি হতভাগ্য ! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্য ভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে ! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য ও যথার্থ মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই, স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচনকরিতেপারিবে। কিন্তুদুর্ভাগ্যক্রমে,তোমরাচিরসঞ্চিতকুসংস্কারেরযেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না,তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন,দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক ব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ

কলুষিত হইয়া গিয়াছেও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তাহাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যা সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপ কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনা-দিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ঃ যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসার তরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরমধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পার না।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়,

৪ঠা কার্তিক। সংবৎ ১৯১২। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'

বিধবাবিবাহের আন্দোলন ও আইন পাস লইয়া যে সময়ে সমগ্র দেশবাসী বিব্রত, কেহ বা স্বপক্ষতা কেহ বা বিপক্ষতা করিতে বদ্ধপরিকর, ঠিক সেই সময়েই বঙ্গদেশীয় কুলীনগণের অনুষ্ঠিত বহুবিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গভর্নমেণ্টের সদনে প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের মধ্যে যে বহুবিবাহ প্রচলিত, হিন্দুশাস্ত্র সেরূপ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের অনুমোদন করেন না। শাস্ত্রে যে সকল বিশেষ অবস্থায় পুরুষের ভার্যান্তর গ্রহণের নির্দেশ আছে, সে বিশেষ আবশ্যকতা অতি অল্প লোকের জীবনেই ঘটিয়া থাকে, সেরূপ বহুবিবাহে বহুবিস্তৃত হিন্দুসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইত না, এবং তাহাতে বহুলোকের দুই, দশ, বিশ, ত্রিশ বা ততোধিক বিবাহের প্রয়োজন হয় না। এরূপ কার্য যে সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয়, সুবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধির নিতান্ত বিরোধী, তাহাতে

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধির অননুমোদিত নিন্দার কার্যে বহুবিবাহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কতদূর স্থান পাইয়াছে এবং ইহার দ্বারা এদেশের কিরূপ সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত বহুবিবাহ বিষয়ক বহুবিস্তৃত গ্রন্থে তাহা অতি পরিষ্কৃতভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি উক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উৎপত্তি, উন্নতি ও অবনতির ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন, যে মধ্যকালে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে গৃহ পালিত পশু অপেক্ষা অধিক যত্নের পাত্রী বলিয়া মনে করেন নাই। কোনো কোনো স্থলে তদপেক্ষাও হীনভাবে স্ত্রীলোকদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে এবং, এখনও যে তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইয়াছে এরূপ মনে হয় না।

সর্বশ্রেষ্ঠ সংহিতাকার মহাত্মা মনু দারান্তর গ্রহণের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ অসদাচরণের প্রশ্রয় পায় না। বিবাহবিধিস্থলে মনু বলিতেছেন।

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা॥

স্ত্রী যদি সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীত কারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টমবর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক। এই হইল বিবাহ বিষয়ক তৃতীয় বিধি। উপর্যুক্ত কারণগুলির কোনো একটি উপস্থিত হইলে, স্ত্রী বর্তমান থাকিতেও স্বশ্রেণী ও স্ববর্ণের মধ্যে দারান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা এই দুই শ্লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনুর সময়ে বঙ্গদেশীয় কুলীনগণের অভ্যুদয় হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সংহিতায় সে বিষয়ের বিধিব্যবহার প্রয়োজন হয় নাই। তাহা হইতে পারে, কিন্তু সংসারযাত্রা নির্বাহের পক্ষে সাধারণতঃ যে সকল অভাব ঘটিতে পারে, এবং সেরূপ স্থলে সেরূপ ব্যবস্থা করিলে, জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে মহাত্মা মনু তাঁহার ধর্ম শাস্ত্রে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে আর এক কথা এই যে মনু প্রণীত সনাতন সুব্যবস্থার অনুগত হইয়া চলিতে চলিতে সমাজস্রোত বিপথগামী হইয়াছে, তাহা না হইলে বল্লালের কৌলীন্য প্রথা ও দেবীবরের

মেলবন্ধন কিরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও আচার ব্যবহারের উপর রাজত্ব করিতে পাইল? মনুসংহিতা প্রভৃতির নির্দেশ অতিক্রম করিয়া যদি এই কথা প্রচলিত করিতে ব্যাঘাত না জন্মিয়া থাকে, তবে, অশেষ অকল্যাণ, অনাচার ও অন্যায়াচরণের নিদানস্বরূপ বহুবিবাহ প্রথা কেন রহিত হইবে না? নারী-সুহৃৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় তাই স্ত্রীজাতির সুখসাধনে আমরণ নিযুক্ত ছিল। তিনি বহুবিবাহ রহিত হওয়া বিষয়ক সূচনায় লিখিয়াছেন:

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ও সামাজিক নিয়ম দোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতির কতিপয় অতি গর্হিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া হতভাগা স্ত্রীজাতিকে, অশেষ প্রকারে, যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা, এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ এতন্মূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র হিতাহিত বোধ ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা, এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। অধুনা এদেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই। এজন্য অন্যকে উদ্যুক্ত হইয়া, অশেষদোষাস্পদ বহুবিবাহ প্রথার নিবারণের নিমিত্ত রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে, কোনো কোনো পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ বিষয়ক সুবিস্তৃত গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত এবং কৌলিন্য প্রথা নিবন্ধন যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং সেই সকল অনাচারকে সদাচারে পরিণত করিতে সমাজকে কতদূর খর্ব ও হীনবল হইতে হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, বহুদর্শন ও লোকহিতৈষণার প্রচুর

পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান হইতে তিনি বহুবিবাহকারীদের যে সকল তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে গভীর বিষাদ ও অবসাদে হৃদয়মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গললনাগণের ভাগ্যাকাশ সুপরিষ্কৃত হইল না! বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টার প্রথম উদ্যম বিধবাবিবাহের প্রথম আন্দোলনের চাপে মারা যায়। বিদেশীর রাজা এককালে এই দুইটি বৃহৎ সংস্কার-কার্যে অগ্রসর হইতে সম্মত হন নাই। বিধবাবিবাহের বাধাবিদূরিত করিয়া তাঁহারা সে সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও তৎপরে তদীয় পুত্র সতীশচন্দ্রের আবেদনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ মহাতাপ চাঁদের সুতীব্র সমালোচনাপূর্ণ ও বহু বিস্তৃত আবেদনপত্রের অত্যল্প অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল: কুলীনেরা টাকার লোভে বিবাহ করে. বৈবাহিক জীবনের কোনো কর্তব্যই সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প তাহাদের নাই। দাম্পত্যসুখের প্রত্যাশায়, সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়া যে সকল স্ত্রীলোককে এই নাম মাত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, তাহারা হৃদয়ের প্রীতি অর্পণের পাত্র না পাইয়া, হয় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়, নতুবা সুশিক্ষার অভাবে প্রবৃত্তিকুলের প্রবল উত্তেজনার অধীন হইয়া পাপের পথে পদার্পণ করে।...'

'এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার যদিও সহজবোধ্য এবং শাস্ত্রসম্মত, তথাপি হিন্দুসমাজের বর্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে, আইনের সহায়তা ভিন্ন জনসাধারণের এই দুর্নীতি নিবারণেচ্ছা কিংবা অন্য কোনো সদুপায় কোনো মতেই ফলপ্রদ হইবে না।' (৫৪)

৫৪ The Coolines marry solely for money and with no intention to fulfil any of the duties which marriage involves. The women who are thus nominally married without the hope of ever enjoying the happiness which marriage is calculated to confer particularly on them, either pine away for want of object on which to place the affections which spontaneously arise in the heart or are betrayed by the violence of their passions and their defective education into immorality,...

That the remedy though obvious and perfectly consistent with the Hindu law, cannot, in the present disorganise state of Hindu society, be applied by the force of public opinion, or any other power than that derived from the Legislature. 27th December, 1855.

বহুবিবাহ রহিত করিবার নবদ্বীপাধিপতি, দিনাজপুরের রাজা বাহাদুর ও কলিকাতা, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি নানা স্থানের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক আবেদন করিয়াছিলেন। ঢাকার জমিদার বাবু রাজমোহন রায় বহুবিবাহ ও সাধারণভাবে বিবাহ বিষয়ক নানাবিধ কুসংস্কার নিবারণের পক্ষে যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে বহু সংখ্যক অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই আবেদন পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে: 'বালিকারা পূর্বোল্লিখিত বন্ধ, অসমর্থ উপায়হীন ও হীন চরিত্র লোকের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে আজীবন পিতৃগৃহে কায়ক্লেশ জীবনধারণ করে, নাম মাত্রে শ্রুত স্বামিগণ ইহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং ইহাদের কোনো প্রকার সংবাদও লয় না। কিন্তু এইরূপ কিম্বদন্তী-সূত্রে শ্রুত অপরিজ্ঞাত স্বামীর মৃত্যুতে ঐ সকল স্ত্রীলোক আইন ও সমাজশাসন ভয়ে বৈধব্যজীবনের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয়। (৫৫)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুবিবাহকারী কুলীনগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, মোট ৮৬ খানি গ্রামের (৫৬) ১৯৭ জন কুলীন সন্তান সে সময়ে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহারা সর্বসমেত ১২৮৮ জন বঙ্গ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ইহাদের অধিকাংশকেই চিরদুঃখানলে দগ্ধ করিয়াছেন! হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলীর বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ জনাই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন মহাশয় ১৬২টি বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে যিনি সংখ্যায় অধিক বিবাহ করিয়াছিনেন, সেরূপ দুই মহাত্মার প্রত্যেকের গৃহিণীর সংখ্যা ১০। এতদ্ভিন্ন সমগ্র হুগলী জেলায় বহুবিবাহে বিপন্না স্ত্রীর সংখ্যার তুলনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহাশয় গড়ে ১১টির অধিক পরিমাণ কৌলিন্য রক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৫৫

---

৫৫ That female children married under the circumstances commonly continue after marriage to live with their parents, their nominal husbands generally taking no notice of them and having no communication with them ; but that, in the event of death of their husbands they are subject to all the disabilities which law and custom impose upon Hindu widows. 22nd July, 1856.

৫৬ অবশ্য এই অনুসন্ধানে যে কোনো গ্রাম কিংবা কোনো লোক বাদ পড়ে নাই এরূপ বলা যাইতে পারে না।

বৎসর তখন তিনি কুড়ি গণ্ডা বিবাহ করিয়া অক্ষয়কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জানি না তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে আর ৮০টি বিবাহ করিতে অবসর পাইয়াছিলেন কি না! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকান্তর্গত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ সে যুবক অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একাদশে পদার্পণ করিয়াছিল, অপর জন বিশ বৎসরের সময়ে ষোড়শাঙ্গনার পরিচর্যায় পরম পরিতুষ্ট! পাঠক মহাশয়, যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট হন ভালই, নতুবা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের যে দুখানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বিচিত্র বিবরণ বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। সে বিবরণ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমরা সেই তালিকা হইতে কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এই তালিকাভুক্ত ১৭৭ খানি গ্রাম ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত, ঐ সকল গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়দের মোট সংখ্যা ৬৫২। ইঁহারা সর্বসমেত ৩৫৪৮ টি বঙ্গবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গড়ে প্রত্যেকের হিসাবে ৫।। সাড়ে পাঁচটি পড়ে। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৌলীন্যমর্যাদা রক্ষা করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী কলসকাটি গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যে সময়ে উল্লিখিত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১০৭টি মাত্র প্রাণীর স্বামিত্বে বৃত হইয়াছিলেন! বোধ হয় তৎপরবর্তী কালে জীবনের শেষদিন এই সুপবিত্র বিবাহ-সাধন পথে দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন!

একবার লক্ষ্ণৌ অবস্থান কালে, মেটিয়াবুরুজ-প্রবাসী নবাব মৃত ওয়াজেদ আলী সাহেব পরিত্যক্ত লক্ষ্ণৌ-এর রাজভবন 'কেইশর বাগ' দেখিতে গিয়াছিলাম। বহুদূরব্যাপী সুবিস্তৃত হর্ম্যাবলী মরকত বিনির্মিত শিল্প শোভায় চতুর্দিক সুশোভিত করিয়া সমাগত দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছে দেখিয়া স্পন্দরহিত ভাবে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া সহচর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এতগুলি সুগঠিতসুন্দর গৃহ স্বতন্ত্রস্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থাপিত কেন? সঙ্গের বন্ধু বলিলেন, গননা করিয়া দেখুন, দেখিবেন ৩৬৫টি গৃহ এই রাজ ভবনের সুবিস্তৃতি বৃদ্ধি করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বন্ধু বলিলেন, ঐগুলি নবাবের বেগম-নিকেতন ছিল। প্রত্যেক গৃহে এক একটি বেগম বাস করিত। এই কথা শুনিয়া সে সময়ে আমার নবীন জীবনে যে গভীর বিষাদের ভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আজিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আর আজ এই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে স্বদেশে নিজ সমাজে, আত্মীয় স্বজনগণের অনুষ্ঠিত এই গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান ও পরিণাম

চিন্তা করিয়া আমার এই স্বার্থপর হৃদয়েও গভীর ক্ষোভ ও গ্লানির উদয় হইতেছে। আজ বুঝিতেছি যে নবাবের মার্জনা আছে, কারণ তিনি নবাব। নবাবী ব্যাপারই স্বতন্ত্র। ঐশ্বর্য ও সম্পদ তাঁহার সুখভোগের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। যাঁহাদিগকে পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, যাঁহারা বিবাহ করিয়া ধর্মবোধে কিংবা সুখলালসায় কোনোদিন ভ্রমক্রমে যাহাদের আলয়ে পদার্পণ করিবেন না, তাঁহাদের এইরূপে সুকোমল বালিকা-হৃদয়ে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দারুণ মনস্তাপ ও যন্ত্রণার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিবার কি অধিকার আছে? স্ত্রী বা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের ভিক্ষালব্ধ অর্থে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া পদপ্রক্ষালনে সম্মত হওয়া, অথবা ভিক্ষার্জিত অর্থ অল্প হইলে সমাগত স্বামীর, প্রতিপদের নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য হওয়া যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, সেরূপ পাষাণহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিষ্ণুতার জীবন্ত মূর্তি নারীহৃদয়ে নিরাশার বজ্র নিক্ষেপ করিবার কি অধিকার আছে? এই অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণ স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াই অবলা-সুহৃৎ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশব্যাপী আন্দোলন তরঙ্গে ভাসিয়া বজ্ররবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. এক দিনের জন্য পতি-সন্দর্শন লাভ যাহার সমগ্র জীবনে ঘটিবে না, তাহার দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যদি দৈবক্রমে একজন মাত্র লোক ১০৭টি বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে সে ভিন্ন কথা ছিল, কিন্তু যখন দেখিতেছি ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অপর একজন ৫০টি বিবাহ করিয়াছেন, আর এক ব্যক্তি ৩৫ বৎসর বয়সের সময়ে ৪০টি বিবাহ করিয়াছেন, আর এক ব্যক্তি ৩৫ বৎসর বয়সের সময়ে ৩৫টি বিবাহ করিয়াছেন, আর একজন ২৭ বৎসর বয়সের সময়ে ১৪টি বিবাহ করিয়াছেন, এই পর্যন্ত হইলেও না হয় মনের ক্লেশ মনে লুকাইয়া রাখিয়া শত মুখে সমাজসুখের স্তুতি বন্দনা করিতাম। কিন্তু হায়! আরও যাহা আছে তাহা লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু দেশাচারের সুতীক্ষ্ন শক্তিশেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ের কোন্ মর্মস্থান ভেদ করিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য এবং তাঁহার সেই 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না', এই মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তির প্রকৃত পরিচয় দিবার জন্য বলিতে হইতেছে যে একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক কুলমর্যাদার অনুরোধে দুটি কন্যার ভার গ্রহণ করিয়াছে! ভালই, ইহার উপর আর বলিবার কিছু আছে কি? আর একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক পঞ্চ কন্যার পানিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছে। আর একটি বার বৎসরের বালক ষড়ঙ্গনার সেবা শুশ্রূষায় পরিতৃপ্ত! দেশাচার কি লোক-লজ্জার মাথায় পদাঘাত করিয়া এতদূর অগ্রসর হইতে পারে? হউক, উহার উপর যে আরও আছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। বিশ্বাস হয় না, বলিতেও বাধ বাধ করিতেছে, কিন্তু সেই তালিকায় নামধামসহ অতি স্পষ্টাক্ষরে

লিখিত আছে যে, এক পঞ্চবর্ষীয় বালক হাতে খড়ি দিতে না দিতে, বহুবচনে না হউক দ্বিবচনে পদার্পণ করিয়াছে। এত অল্প বয়সে উপনয়ন সংস্কার হয় কি না বলিতে পারি না, তবে একাধিক স্থলে যখন দুগ্ধপোষ্য বালকের বহুভার্যার উল্লেখ আছে, তখন কোনো না কোনো প্রকারে উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার একত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। আর একটি কথা এই যে 'গরজ বড় বালাই'। বঙ্গীয় কুলীন সমাজ এই গরজের অধীন হইয়া এমন সকল ধর্মবিরুদ্ধ ও নীতি-বিগর্হিত কার্য করিয়াছেন যে, তাহার চিন্তামাত্রে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, ক্ষোভ ও অভিমানে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করিতে এবং জনসমাজের মুখাবলোকন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। দেবনিবাস পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে এরূপ কল্পনার অতীত নিদারুণ নির্মম ব্যবহার সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে, বিশেষতঃ সেই ঃ 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' মহাত্মা মনুর নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অনুগত ধর্মমণ্ডলীর বাসভূমি ধর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে নারী জীবনের এরূপ দুর্দশা স্মরণ করিলে, হৃদয় ও মন আপনা হইতেই অবশ হইয়া পড়ে। উঠিতে, বেড়াইতে, হাসি তামাশায়, আমোদ প্রমোদে সময়ক্ষেপ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। হয় না বলিয়াই বুঝি অশেষ গুণের আধার ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতি-হতরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া হৃদয়ের আর্তভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার লেখনী-নিঃসৃত সেই বিষাদচিত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

'ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে, এ স্থলে, একটি অপূর্ব আখ্যান কীর্তিত হইতেছে। কোনো ব্যক্তি (৫৭) মধ্যাহ্নকালে, বাটীর মধ্যে আহার করিতে গেলেন; দেখিলেন যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে, তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা ইঁহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়া আছেন?' জননী বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চট্টরাজের স্ত্রী, এবং অল্প বয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এটি তাঁহার কন্যা। ইঁহারা তোমার কাছে, আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন।'

'চট্টরাজ দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীন; ৫।৬টী বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান; এজন্য, তাঁহার যথেষ্ট খাতির রাখেন।

---

৫৭ আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এই আখ্যায়িকাটি শুনিয়াছিলাম। উল্লিখিত 'কোনো ব্যক্তি' তিনি নিজেই। বীরসিংহের বাটিতে তাঁহারই আহারের সময় ঐ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকেন; তাঁহার কোনো স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিত করিতে দেখেন নাই।'

'সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি আহার বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট্টরাজের ভার্যা, এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছুদিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা, আমি তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি বলিলাম, বাছা বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী; তুমি অন্ন না দিলে, আমরা কার কাছে যাইব। তুমি একজনকে অন্ন দিবে, আর একজন কোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে? এই কথা শুনিয়া, পুত্র কহিল, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি দিব, উহার ভার আমি লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে...হইতে বল? পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানি না; তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া পুত্রের সহিত আমার কি বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে, আমায় কন্যা সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

'কিছুদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তুত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্ম করিব মনে মনে এই স্থির করিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ২/৪ দিন পূর্বে, তাঁহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান চটের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দয়া ও ধর্মও আছে। ভাবিলাম যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয়া ভগিনী; কিন্তু তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া অবশেষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম, বাবা তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।'

'আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নী-পুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন এবং কহিলেন, যতদিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণ-পোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, আমি আহ্লাদে গদ্‌গদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। 'এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল' এই বলিয়া তাঁহারা যারপরনাই অনাদর ও অপমানিত করিতে লাগিলেন। সপত্নী-পুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত

অবগত হইলেন কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। একদিন আমি তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু কোনো উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনো স্থানে গিয়া থাকুন; মাসে মাসে আমার নিকট লোক পাঠাইবেন, আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।'

'এইরূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই এবং দুরবস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া পাঁচ সাত দিন হইল এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে বা অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে, কোনো উপায় হইতে পারে, এজন্য এখানে আসিয়া বসিয়া আছি। ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি চট্টরাজের বাটীতে গিয়া, যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি কোন্ বিবেচনায়, তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন? তাঁহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কি না স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন এবং কহিলেন, তুমি বাটীতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া পরে তোমার নিকট যাইতেছি।'

'অপরাহ্ণকালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া কহিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাসে মাসে কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন এবং তিন মাসের দেয়, তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এইরূপে তিন-তিন মাসের টাকা আগামী দিব; এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভারর আমার উপর রহিল। আর কোনো ওজর করিতে না প্যারিয়া নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা দুর্দান্ত দস্যু; তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ঘাত জবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন। চট্টরাজ, কখনও কোনো স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরাও খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে তিনি, কস্মিন্‌কালেও আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পরিবার স্থলে পরিগণিত, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনো সংস্রব থাকে না।

'যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি সেই হতভাগা নারীর বিষয়ে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে; আর তাহা কোনো কারণে রহিত হইবার নহে; তদনুসারে চট্টরাজ, ভগিনীদের উপদেশের অনুবর্তী হইয়া স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারাও গত্যন্তর বিহীন হইয়া স্থানান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুশ্রী ও বয়ঃস্থ,...!! এবং জননীর সহিত, স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।'

এই সকল চিন্তা করিয়া মনে হয়, এতদূর দুর্দশা হইল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই তাহার কারণ দেখাইয়াছেন এবং তাহার সদুত্তরও দিয়াছেন, আমরা সেইটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম;

'কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে; এবং কুলীনদিগের মধ্যে, নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সুতরাং পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া বল্লালসেন, উহার নিবারণের অভিপ্রায়ে কৌলীন্যমর্যাদা স্থাপন করেন। তৎপরে কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর উহার নিবারণের আশায়, মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে, যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, অমূলক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা সুবোধ, ধর্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিতকর কুলাভিমান বিসর্জন দিয়া কুলীন নামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে, কোনো নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ অবস্থায়, বোধ হয় পুনরায় সর্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্যাকে যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল, অবিবাহিতা অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে কোণো ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্তব্য। অনর্থকর—অধর্মকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়,

সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষবশতঃ কুলীনদিগের ধর্ম্মলোপ ও যারপরনাই অনর্থ সংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন পক্ষে যত্নবান হইলে কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করা হইবেক।'

এ সকল ত হইল কিন্তু আরও যে কিছু বাকি রহিল! মানুষের দ্বারা এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা কিছুতেই প্রত্যয় হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কুলীনব্রাহ্মণগৃহে নিম্নলিখিত ঘটনা সকলও সংঘটিত হইয়াছে। স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে কিনা সন্দেহ, এরূপ চারি বৎসর বয়সের সুকুমার শিশুর কোমল কণ্ঠে দোদুল্যমান পদকের ন্যায় বিবাহালঙ্কার শোভা পাইয়াছে। এরূপ একটি শিশুর কণ্ঠে দুখানি রত্নালঙ্কার! অপর এক শিশু ভাগ্যগুণে চারিবৎসরেই পঞ্চালঙ্কারে ভূষিত! অনেক পূর্বে গল্পের আকারে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণভাবে এত দিন এতদূর অধঃপতন চিন্তা করিতেও পারি নাই। একথা একাকী নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে কি আপনাদের উদাসীনতার প্রতি ঘৃণা ও সমাজের স্বার্থপরতার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয় না? দেশাচারের শিরশ্ছেদ করিতে প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয় না? পাঠক, একটিবার মনে মনে চিন্তা কর, লাবণ্যের বিজলীবিকাশে চারিদিকে আলোকিত করিয়া পূর্ণযৌবনা সুন্দরী যখন ঘৃণা ও অভিমানের অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া পঞ্চমবর্ষীয় বালকের কোমল কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে, তখন কি তাহার সেই উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে সমাজদেহ সন্তাপিত ও পাপভারাক্রান্ত হয় নাই? যে বলিতে পারে যে, চারি বৎসরের শিশুর পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী পূর্ণযৌবনা ছিল না? এবং তাহার সন্তপ্ত হৃদয়ের অভিসম্পাদজাত অশ্রুকণায় তাহার জন্মভূমি সিক্ত হয় নাই? দেশাচার-সেবক সহৃদয় বঙ্গসন্তান কি অবগত নহেন যে, নারীহৃদয়-সুলভ সংসারসুখ সম্ভোগের বাসনার কুসুমগুলি যখন পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত তখন সেই সুখ-স্মৃতির মলয়-হিল্লোলে বিষাদ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পূর্ণযৌবনা বঙ্গললনা অশীতিপর বৃদ্ধের লোকলীলা-সম্বরণ শয্যায় বাসর-গৃহ রচনা করিয়াছে! সুপ্রবীণ বৃদ্ধ কুলীন মহাশয় মৃত্যুর করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে অনেক কন্যার আশা ভরসার বরমাল্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন! রমনীহৃদয়-সম্ভূত এই নিদারুণ মর্মবেদনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাই তিনি এই রমণী-হৃদয়-সুলভ সহিষ্ণুতার অন্তরালে লুক্কায়িত তুষানল নির্বাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, যে সময়ে ঐ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল সে ত বহু পূর্বের কথা, তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল। এরূপ পুরাতন আচার আচরণের আলোচনা করিতে গেলে, জীবনের সুখ শান্তি লোপ পায়, গৃহ-পরিজন লইয়া সুখে বাস করা ভার হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

সংগৃহীত তালিকা পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু বহুবিবাহের নূতন তালিকাও আছে। অতি অল্প দিন হইল—সন ১২৯৮ সালে সঞ্জীবনী পত্রিকায় যে অসংখ্য বঙ্গ রমণীর দুঃখকাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা সেই বিবরণের সার সংগ্রহ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় ২৭৬ খানি গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়গণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে ঐ সকল গ্রামবাসী ১০১৩ জন কুলীন মহাশয় ৪৩২৩টি কুলীন-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং গড়ে প্রত্যেকের হিসাবে ৪৷৷০ সাড়ে চার পড়ে। পূর্বোল্লিখিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিলেও, ১০, ১২, ১৫, ২০, ২৫, ৩০ ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০টি বিবাহের ত অভাব নাই। ৬০, ৬৫, ৬৭ও আছে, এইরূপ বিবাহকারী তালিকার উল্লেখ করিতে গেলে স্থান সঙ্কুলান হয় না। কেবল এইমাত্র বলিতে চায় যে, পূর্বেও যেমন, এখনও সেইরূপ অল্পবয়স্ক বালক-দিগেরও বহুভার্যা গ্রহণকার্য নির্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে লোকের রুচি বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হয় নাই। একজন ৩৪ বৎসর বয়সে ৩৫টি স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২৭ বৎসরে ১২টি, ২৫ বৎসরে ৭টি, ২২ বৎসরে ৮টি, এবং ২০ বৎসরের যুবকের ৮টি বিবাহ কার্য সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে। এরূপস্থলে আর আর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে কিরূপ বলিব? ভাল, এ পর্যন্ত হইলেও কথঞ্চিৎ পরিবর্তন বলা যাইতে পারিত, কিন্তু এইখানেই শেষ হয় নাই। এতদপেক্ষা গুরুতর চিন্তার বিষয় আছে! বর্তমান সময়ের সামাজিকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনে অবসর গ্রহণ না করিয়া, যদি দয়া করিয়া এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে এবং প্রতিবিধানে প্রাণপাত করেন, বঙ্গ ললনাগণের দুঃখ দূর করিতে, তাহাদের যন্ত্রণা ও বিষাদের অশ্রুজল মুছাইতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। আজ বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তরিত, এই তালিকা দৃষ্টে অশ্রু মোচন করিবার কি কেহ নাই? এখনও যে ১৪, ১৫, ১৬ বৎসরের বালকগণের বহুভার্যার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। একটি ষোল বৎসরের বালক তিনটি বালিকার স্বামী হইয়াছে, দুটি ১৫ বৎসরের বালকের একটির দুটি বিবাহ হইয়াছে, অপরটি ৩টির সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। আর পূর্বে যে দুগ্ধপোষ্য শিশু বরের বিবাহের উল্লেখ করিয়াই নিজেই চিন্তিত ছিলাম, ১২৯৮ সালের সঞ্জীবনীর তালিকায় সেইরূপ চারি বৎসরের এক শিশুর কণ্ঠে তিনটি স্ত্রী-রত্ন লম্বমান! আমরা খরগোসের ন্যায় পত্রাবরণে মুখ লুকাইয়া মনে করি, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমাদের সমস্তই ঠিক চলিতেছে। কিন্তু হায়, এ দুঃখ-কাহিনী শুনিবার, শুনিয়া ভাবিবার এবং

প্রয়োজনমতো সদুপায় অবলম্বন করিবার লোকের যে অভাব হইয়া পড়িয়াছে, স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ কি একটি বার এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? অমিতপরাক্রম রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের পুনরভিনয় কি ত্বরায় সংঘটিত হইবে না? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাতর ক্রন্দন কি বাঙ্গালী হৃদয়ে দ্রব বহ্নি ঢালিয়া দিবে না? তিনি যে নয়ননীরে প্লাবিত হইয়া বলিতেন 'আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি' তাঁহার সেই মনস্তাপপূর্ণ আক্ষেপোক্তি কি তবে সত্য সত্যই, সত্য হইবে? আজ আসুন, সকলে প্রাণপণ করিয়া এই সকল দুর্নীতি নিবারণে অগ্রসর হই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকবাসী পবিত্র আত্মা আমাদের উদ্যম ও আগ্রহ দেখিয়া পুলকপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আশীর্বাদ করিবেন। আক্ষেপ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারীদের ১০।১২টি শিক্ষিত মহোদয় এই গর্হিত অনুষ্ঠানের প্রশ্রয়দাতা হইয়াছেন। তাঁহাদের ৩ জন এম. এ. একজন বি. এল. অপর কয়েকজন বি. এ. উপাধিধারী। ইঁহারাই যদি এরূপ কার্যে অগ্রসর হন, তবে আর দাঁড়াইব কোথায়? তবে দুঃখের আবরণে মুখ আবৃত করিয়া বলি — মা বঙ্গজননি! তোমার ভাগ্যে এখনও অনেক দুঃখ ভোগ বাকি আছে। তুমিই তোমার কোনো যোগ্য সন্তানকে ডাকিয়া তোমার প্রিয় সাধনে নিযুক্ত কর, আমরা সহজে উঠিয়া দাঁড়াইবার পাত্র নহি। হয়ত তোমার ডাকে আমরা পুনরায় সম্মিলিত হইতে পারিব।

বল্লাল ইষ্ট সাধনোদ্দেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য দোষে সে আশা ফলবতী হয় নাই। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে কৌলিন্য মর্যাদা সুরক্ষিত ও কল্যাণকর হইত, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই, যেরূপ ঘটিয়াছে তাহারই উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য। দেবীবর মেল বন্ধন করিয়া বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের আরও যে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কৌলিন্য প্রথা ঘটক দেবীবর ঠাকুরের হাতে আরও অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুলীন-গণের মধ্যে সর্বদ্বার বিবাহ প্রথা রহিত হওয়াতেই এই বিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কৌলিন্যসঙ্কীর্ণতা দূর করিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, আর সেই আন্দোলন বিবিধ আকারে বিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। রাজদ্বারে দ্বিতীয়বার আবেদন প্রেরণ সময়েও প্রায় ২১০০০ লোক স্বাক্ষর করিয়া কৌলিন্য প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রার্থনাপত্রে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র (৫৮) প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং ২১০০০

---

(৫৮) মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, নদীয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সত্যশরণ ঘোষাল, ভূকৈলাস | রামগোপাল ঘোষ
প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কান্দী | হীরালাল শীল

সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত এই দ্বিতীয় আবেদন পত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৯ মার্চ তারিখে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার সিসিল বিডন মহোদয়ের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য যে মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাহার সভ্যগণ যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলির মর্ম এই : 'এই অতি ঘৃণিত ও অনিষ্টকর বহুবিবাহ প্রথা রহিত করণোদ্দেশে প্রায় নয় বৎসর পূর্বে ২৫০০০ লোকের

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপাড়া )
পূর্ণচন্দ্র রায়, সেওড়াফুলি
সারদাপ্রসাদ রায়, চকদীঘি
যজ্ঞেশ্বর সিংহ, ভাস্তাড়া
রাজকুমার রায় চৌধুরী, বারীপুর
শিবনারায়ণ রায়, জাড়া
উমাচরণ চৌধুরী, রাধানগর
রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী ,ঢাকা
বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া
শম্ভুনাথ পণ্ডিত
মাধবচন্দ্র সেন
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
কৃষ্ণকিশোর ঘোষ
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়
দ্বারকানাথ মি'
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দয়ালচাঁদ মিত্র
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ
প্যারীচাঁদ মিত্র
দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজ
দ্বারকানাথ মল্লিক
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
শিবচন্দ্র দেব
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
ভরতচন্দ্র শিরোমণি, সংস্কৃত কলেজ
তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঐ ঐ

শ্যামাচরণ মল্লিক,
রাজেন্দ্র মল্লিক, রাজা
রাজেন্দ্র দত্ত
নরসিংহ দত্ত
কালীপ্রসন্ন সিংহ
কালিদাস দত্ত
রাজেন্দ্র দত্ত
গোবিন্দচন্দ্র সেন
হরিমোহন সেন
রামচন্দ্র ঘোষাল
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, নবদ্বীপ
প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন
শ্যামাচরণ সরকার
দবেন্দ্র মল্লিক
মুরলীধর সেন
রামনাথ লাহা
মাধবকৃষ্ণ শেট
শ্যামাচরণ দে
প্রিয়নাথ শেট
কালীকৃষ্ণ মিত্র
প্যারীচরণ সরকার
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
কৃষ্ণদাস পাল
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
এবং অন্য ২০৮৪১ জনের স্বাক্ষর

স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র সে সময়ের মাননীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই জঘন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা বিষয়ে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি পূর্বে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে সে সকল কথার আলোচনা হইয়াছে এবং আমরা অনেকেই সে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। সুযুক্তি এবং ধর্মশাস্ত্রের অননুমোদিত এই সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদসাদন পক্ষে যে আপনি যত্নবান্ হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ এইরূপ সংস্কারকার্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া যখন এত লোক প্রার্থনা জানাইতেছে, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তিযুক্ততা আরও প্রবলরূপে প্রমাণিত হইতেছে।'

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর এই আবেদন পত্র এবং মহারাজ মহাতাপ চাঁদের প্রেরিত স্বতন্ত্র আবেদন পত্র বঙ্গেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের বাছা বাছা আরও ২০।২২ জন সম্ভ্রান্ত লোক সঙ্গে ছিলেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল আবেদনকারীগণের অগ্রণীরূপে আবেদনপত্র পাঠ করিলে পর ছোট লাট্ স্যার সিসিল বিডন বাহাদুর সেই আবেদনের উত্তরে আশাপ্রদ প্রত্যুত্তর দিয়া বলিয়াছিলেন, '১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ না ঘটিলে স্যার জন গ্রাণ্ট মহোদয়ই একার্য সম্পন্ন করিতেন। আমি সে সময়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখনও করিব।' কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে এবারেও বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টায়ও বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ করিতে বিফলমনোরথ হইয়া অন্য উপায়ে এ কার্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। কুলীনগণ অগ্রসর হইয়া এই প্রথার পরিবর্তন করিতে সম্মত হন কিনা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় সকলই সম্ভব হইত এবং তিনি সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তারপাশা নিবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দেবীবরের মেলবন্ধন ভঙ্গ করিয়া সর্বদ্বারী বিবাহে সম্মত হইলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ের সম্ভ্রান্ত সামাজিকগণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল ঃ

নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহাশয় মদনমোহনকেষু জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা।

বিনয়বহুমাননমস্কার পুরঃসরং নিবেদন মিদম্—তারাপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম কুলীনদিগের মধ্যে সর্বদ্বারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের যত্ন, উৎসাহ ও মনোযোগ

আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য সমাধা কালে আমি উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি। কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক পত্র না পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরেই কার্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই যাইবার পূর্বে মহাশয়ের অভিপ্রায় সূচক অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হই।

আমি আষাঢ় মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ১৯শে পৌষ ১২৮২ সাল।

অনুগ্রহ কাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

জাজিপাড়া নিবাসী বাবু তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়কে, মাহুতটুলী (ঢাকা) নিবাসী বাবু রাসবিহারী রায় মহাশয়কে, কালীপাড়া (ঢাকা) নিবাসী বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়কে উল্লিখিত পত্রের এক প্রতিলিপি প্রেরণ করেণ। ঐ সকল পত্রের পাঠ ও স্বাক্ষর একই রূপ। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বদ্বারী প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কুলীন কন্যারা এখনও অনেক স্থলে অত্যধিক মাত্রায় পূর্বোল্লিখিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অশেষ প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার যদি কোনো ভাগ্যবান সহৃদয় পুরুষ অভ্যুদিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং এই অশেষ দুঃখের আকর স্বেচ্ছামতো বহু-বিবাহের পথরোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গের অসংখ্য বালিকা জীবনে ও যৌবনে সংসারধর্মের অধিকারিণী হইয়া সেই মহাপুরুষের পূজায় নিযুক্ত হইবে এবং হৃদয়ের অন্তরতম স্তরে প্রবাহিত কৃতজ্ঞতার পুণ্য-তোয়ায় স্নান করিয়া জোড়করে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং কোটি কোটি কণ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তদীয় পদাঙ্কানুসরণকারীর স্তুতি বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইবে।.

এই সকল সামাজিক বৈষম্য ও তন্নিবন্ধন স্ত্রীজাতির অশেষ ক্লেশ নিবারণে বিদ্যাসাগব মহাশয়ের কোমল হৃদয় যে সর্বদায় ব্যাকুল হইত, তাহার দৃঢ় কারণ তিনি তাঁহার সূচনায় পরিসমাপ্ত ক্ষুদ্র আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি রায়মণির দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভাগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার

তুল্য পামর ভূমণ্ডলে নাই।, তিনি স্ত্রী হৃদয়সুলভ সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও পরদুঃখ কাতরতার ক্রোড়ে শৈশব ও বাল্য জীবন অতিক্রম করিয়া চিরকৃতজ্ঞ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যেখানে যে, আকারে যে পরিমাণে স্ত্রীজাতি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, সেই সেইখানে, সেই মহাপুরুষ সেই পরিমাণ পরাক্রমের সহিত দুর্বলের বলরূপে, অবলার আশ্রয়রূপে, সমাজ রঙ্গভূমে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের একস্থানে তিনি যে গুরুতীর আক্ষেপোক্তি পূর্ণ কোমল মিষ্ট অশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ মুক্ত হৃদয়ে আকুল কণ্ঠনিনাদ অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, সেই আক্ষেপোক্তির পশ্চাতে, স্বপ্নে অনুভূত যে সুখস্মৃতি লুক্কায়িত, নিম্নোধৃত কয়েক ছত্রে তাহার আভাষ অতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হইবে ;

'এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল মহাত্মা লর্ড বেণ্টিঙ্ক অতি নৃশংস সহগমন প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, কৃতসংকল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্পষ্টবাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইবেক। এবং নিঃসন্দেহ, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিবেক। মহামতি, মহাসত্ত্ব গভর্নর জেনারেল এইসকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি এই প্রথা রহিত করিয়া, একদিন আমাদের রাজ্য থাকে, তাহা হইলেও ইংরেজ জাতির নামের যথার্থ গৌরব ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার দুঃখ দর্শনে, দয়ার্দ্রচিত্ত ও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া, এই মহৎকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ইংরেজ জাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্তন হইয়াছে। যে ইংরেজ জাতি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংসভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন। এক্ষণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। হায়!'

'তে হেহপি দিবসা গতাঃ'— সে দিন গিয়াছে।

'যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গভর্নমেণ্ট এ প্রদেশের মুসলমান, বা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন ; অথবা, প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন একথা কোনো মতে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ইংরেজ জাতি তত নির্বোধ, তত অপদার্থ, তত কাপুরুষ নহেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহারা রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এদেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই। সর্বাংশে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য।'

'এ স্থানে, একটি কুলীন মহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীন মহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার নাকি বহুবিবাহ নিবারনের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বছর কৃতকার্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোনো জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে না। কুলীনের মেয়ের নিতান্ত পোড়া কপাল, সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে তা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্বক, কিয়ৎক্ষণ ক্রোড়স্থিত শিশুকন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, অনন্তর সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনো লাভ নাই; আমরা এখনও যে সুখভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখভোগ করিব। তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে যদি তাহারা, আমাদের মতো চিরদুঃখিনী না হয় তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। এরূপ আক্ষেপ করিয়া সেই কুলীন মহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা; কিন্তু আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না; স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রীজাতির এত দুরবস্থা হইবে কেন? এই কথা বলিবার সময়ে তদীয় ম্লান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্য এরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, আমি দেখিয়া শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম।'

'হা বিধাতা,' তুমি কি কুলীন কন্যাদের কপালে নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উল্লিখিত কুলীন কন্যার হৃদয় বিদারুণ আক্ষেপ বাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন সন্দেহ নাই।'

'এই দুই কুলীন মহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই : ইঁহারা দুপুরুষিয়া ভঙ্গ কুলীনের কন্যা এবং স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের বনিতা। জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০৷২১ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬৷১৭ বৎসর। জ্যেষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এ পর্যন্ত ১২টি মাত্র বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫৷২৬ বৎসর; তিনি এ পর্যন্ত ২৫টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই।'

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ সংকল্প ছিল যে, বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবেন এবং একটিবার ইংলণ্ডে গমন পূর্বক কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের জননীস্থানীয়া মহারানী ভিকটোরিয়া সদনে বঙ্গের অসংখ্য রমণীর কাতরতাপূর্ণ অশ্রুজল অঞ্জলি পুরিয়া রাজ্ঞী সম্ভাষণার্থে অর্পণ করিবেন, এবং ভারতেশ্বরীকে তাঁহার একথাও জিজ্ঞাসা করিবার বড় সাধ ছিল যে, যে দেশে পুণ্যশ্লোকা সাধ্বী রমণীর মণি ভিকটোরিয়া রাজত্ব করেন সে দেশে নারীজাতির এত দুর্দশা

কেন ; ভগবানের কৃপায় শক্তিশালী অবলা কি দুর্বলার দুঃখ দূর করিতে বিমুখ হইয়াছেন। (৫৯) বঙ্গদেশের দুরদৃষ্ট, বঙ্গসমাজ আরও কতকাল এই বৈষম্য-বিভ্রাটে নিপীড়িত হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, অসংখ্য বঙ্গীয় বালিকাগণের অদৃষ্টলিপি-দোষে এমন সুব্রত, সাধন নিরত ও পরাক্রমশালী মহাত্মার সাধু সংকল্প কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই কাল আসিয়া সেই মহামূল্য রত্নাধার বিদ্যাসাগর-দেহ হরণ করিল! এশুভ সংকল্প কল্পনায় রহিয়া গেল—মুকুল কীট-দংশনে বিনষ্ট হইল। আমরা অশ্রু মোচন করিয়া বলি, যতদিন না বিধাতার কৃপা হয়, যতদিন না আর কোনো মহাপুরুষ অভ্যুদিত হন, ততদিন হে বঙ্গীয় রমণীগণ! তোমরা তোমাদের অশেষবিধ দুঃখের গীত বন্ধ কর, হৃদয়ের সন্তাপ হৃদয়ে লুকাইয়া রাখ, প্রাণের অশেষ ক্লেশ-রাশি অন্তঃপুরের নির্জন প্রান্তে, আবর্জনারাশির ন্যায় স্তুপীকৃত কর—যাহাদের হৃদয় নাই—যাহারা সে মর্ম বেদনার কিছুমাত্র বুঝিবে না, বরং উচ্চকণ্ঠে নিজেদের সংকীর্তি ও তোমাদের সুখ সমৃদ্ধির পরিচয় পাড়িতে সদা ব্যস্ত, তাহারা যেন জানিতে না পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল বিধবাবিবাহের প্রচলন ও বহুবিবাহের নিবারণ চেষ্টা করিয়াই ক্ষ্যান্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি কল্পে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃত সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খার পরিচয় পাওয়া যায় :

## প্রতিজ্ঞা পত্র

আমরা ধর্ম-স্বাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি :

১. কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব।

২. একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে ( কন্যার ) বিবাহ দিব না।

৩ কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণণা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যা দান করিব।

৪. কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিব।

৫. অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।

---

৫৯ বিদ্যাসাগর পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি, এবং তাঁহার বহুবিবাহ গ্রন্থেও আক্ষেপোক্তিতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। নারায়ণবাবু বলেন, বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বহুবিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করিয়া ছাপাইয়া মহারানীর হাতে দিয়া বলিব যে, 'মেয়ে রাজার দেশে মেয়েদের দুঃখ ঘুচে না কেন?'

৬. এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে আর বিবাহ করিব না।

৭. যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্যাদান করিব না।

৮. যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা করিব না।

৯. মাসে মাসে স্ব-স্ব মাসিক আয়ের পঞ্চমাশত্তম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব।

১০. এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া কোনো কারণে উপরি নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

উল্লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে ১২৫ লোকের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের কেহ কেহ আমাদের দেশে বিশেষভাবে সুপরিচিত। সেই মহোদয়গণের কেহ কেহ লোকান্তরিত, অপর কেহ কেহ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহারা উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন কিনা বলিতে পারি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্মানুযায়ী কার্য করিয়াছেন, তাঁহার আচার আচরণই চিরকাল তাহার প্রমাণ প্রদান করিবে।

ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে অধিক মাত্রায় সুরা পান করিতে শিক্ষা করেন। এই গরল সেবন করিয়া মত্ততা জনিত অলীক আমোদে লোক যখন উন্মত্ত এবং সেই সেই আমোদের প্রলোভনে আকৃষ্ট লোকের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন সুরাসেবনে অর্থ, মান, সম্ভ্রম, পরিশেষে জীবন নাশ হইতে লাগিল, যখন বঙ্গজননীর রত্নসম পুত্রধন সকল অকালে অতীতের অন্ধকারে লুকাইতে লাগিল, তখন বঙ্গীয় সমাজের আর এক সুহৃৎ ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় মাদক সেবন নিবারণে অগ্রসর হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোক ছিলেন, তাহার উদ্যোগে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে "বঙ্গদেশীয় মাদক সেবন নিবারণ সভা" ( Bengal Temperence Society ) স্থাপিত হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশের অনেকগুলি বড় বড় লোক সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর সভার সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন : 'এরূপ সভার প্রতিষ্ঠায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং ইহার উন্নতি কামনায় এবং এই ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান সকলের আশ্রয়স্বরূপ সুরাপান নিবারণের চেষ্টায় এবং যাহারা এই বিষ ভক্ষণে আত্মনাশ করিতেছে, তাহাদিগকে এই বিষম বিপদ হইতে মুক্ত করিতে আমি সর্বদা সহায়তা করিতে প্রস্তুত। (৬০)

---

৬০ 'Hailed with joy the inaguration of their Society, promished to take the deepest interest in its progress, and to give his cordial concurrance to all measures it may adopt

এই মাদক-সেবন-নিবারণ সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে বহু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া চিরজীবন বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সভার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠান সভায় পাদরী ডাল সাহেব ইন্‌স্পেক্টর উড্রো প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হওয়ার পর বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় গোপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপনে ইঙ্গিতে অনিচ্ছাজ্ঞাপন করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে ডাল সাহেব, উড্রো সাহেব, শেষে মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে স্থির প্রতিজ্ঞ পুরুষের ইচ্ছার পরিবর্তন হইল না; তিনি প্রত্যেকের নিকট অব্যাহতি পাইবার জন্য হাসিমুখে নীরব প্রার্থনা জানাইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহই তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না! (৬১) এতগুলি লোক অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না। ইহার তাৎপর্য এই যে, অন্যে তাঁহাকে যতটুকু বুঝিতেন, তদপেক্ষা তিনি আপনাকে আপনি অধিক জানিতেন, সভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা তাঁহার কার্য নহে, তাহা বেশ জানিতেন, জানিয়া শুনিয়া সে কার্যে অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে, যাহা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন না বলিয়া বুঝিতেন, সে কার্যে অগ্রসর হইয়া অন্য উপযুক্ত লোকের প্রাপ্য হরণ করিতে ও নিজের অনুপযুক্ততার পরিচয় দিতে কখনও প্রয়াস পান নাই। উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত স্থানেবসাইতে ও উপবিষ্ট দেখিতে, সর্বদাই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তাঁহার এই নীতিজ্ঞানে মাইকেল মধুসূদনের শতত্রুটি উপেক্ষিত, তাঁহার এই সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার ফলে ৺রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার এই সুবিবেচনায় বহুসংখ্যক লোক উপযুক্ত সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে আজও বিরাজিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার মহাশয় আমরণ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্যারীবাবুই ঋণ-দায়ে বিপন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঋণমুক্ত করিবার জন্য

---

for the eradication of the dreadful vice and the reclaiming of those who have succumbed to its influence'. Taken from Raja Radhacanta Deb's Letter to the Secretary, Bengal Temperence Society.

৬১ মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সভায় থাকিয়া সমগ্র ব্যাপারটি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

সাধারণ সমক্ষে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া স্বসম্পাদিত সেকালে এডুকেশন গেজেটে একটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু ধনকুবের ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার যাহা ছিল, তাহা দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার সম্মান ও সম্ভ্রম ছিল, তাহারই সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধ করিতে দেশের লোক চাঁদা দিবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সবলদেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয়। তাই তিনি সেই মন্তব্য বাহির হইবামাত্র বন্ধুবর প্যারীবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধের জন্য দেশের লোককে বিব্রত হইতে হইবে না। আমার ঋণভার অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, কেহ যেন সেজন্য ব্যস্ত না হন; তবে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ প্রকাশ ও আপত্তি উত্থাপনে বাধ্য হইয়া প্যারীবাবু শেষে সাহায্য প্রার্থনায় বিরত হইলেন। মহাত্মা প্যারীচরণের মৃত্যুতে কাতর হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, সেই বন্ধুজনোচিত পত্রখানির বাংলা অনুবাদ এই: (৬২)

২৭ নভেম্বর, ১৮৫৭

'প্রিয় ভুবনমোহন,

আমার গভীর দুঃখ এই যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, আমি বেঙ্গল টেম্পারেন্স সভায় অদ্যকার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিব না। আমার এই অভিন্নহৃদয় সুহৃদের শোকপূর্ণ মৃত্যুতে আমার প্রাণে যে কি দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা তুমি ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সামর্থ নাই। আমরা যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই পরস্পরকে জানিতাম। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে প্যারীবাবুর মৃত্যুতে আমি আমার প্রিয়তম ও স্নেহভাজন সহোদর হারাইয়াছি। তাহার লোকান্তর-গমনে সাধারণ জনগণের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। এক দিকে তাঁহার উপযুক্ততা, আদর্শ চরিত্র, আর একদিকে জনসমাজের হিত-সাধনে

---

27th November, 1857

৬২ My dear Bhooban Mohan,

I regret exceedingly that in the present state of my health, of which you are aware. I am unable to attend this evening's meeting of the Bengal. Temperance Society. None knows better than yourself the profound grief with the lamented death of my beloved friend Babu Pyari Charan Sircar has filled me. We knew each other from early youth, and we

তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ একাগ্রতা, অপরদিকে মাদক-সেবন-নিবারণে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকা, সদনুষ্ঠানপ্রিয় ও নীতিমান্ লোকমণ্ডলীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার শ্রমশীলতার ফলস্বরূপ বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি, ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্তির পরিচয় দিবে।

তোমার স্নেহশীল
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা'

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরাপান প্রভৃতি অসদনুষ্ঠানের পরম শত্রু ছিলেন। ইহার নানাবিধ প্রমাণ বিদ্যমান সত্ত্বেও কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে এইরূপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের কাহারও কাহারও প্রতি তাঁহার বিরূপ ভাব ছিল, আবার কোনো কোনো ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞাতসারে ঐরূপ আচরণে তাঁহার স্নেহমমতা ও সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইত না। ইহার তাৎপর্য কি? সংস্কার-প্রিয় সজ্জনের পক্ষে এরূপ ব্যবহার-বৈষম্যের মীমাংসা কোথায়? সকলের পক্ষে সন্তোষজনক না হইলেও ইহার উত্তর আছে। প্রথমতঃ আমাদের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তির অল্পবুদ্ধিতে তাঁহার সকল কার্য সুন্দররূপে বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন। দ্বিতীয়তঃ তিনি হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, শৈশবে, বাল্যকালে ও যৌবনে হিন্দুভাবে লালিত পালিত হইয়া হিন্দুসংস্কারেই গঠিত হইয়া উঠেন। হিন্দু শাস্ত্রালোচনাও তাঁহার হিন্দুভাবে গঠিত হইয়া উঠিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল; তাই তাঁহার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। তিনি যোগ্যতা অনুসারে লোকের অধিকার-ভেদ বুঝিতেন, এক শ্রেণীর লোক আমোদ, প্রমোদ, মত্ততা ও বিলাসপরবশ হইয়া চলিবে, তদতিরিক্ত কিছু তাহারা বুঝে না, সহজে বুঝিতেও পারে না। এরূপ লোকের মুখাবলোকন না করিলে, তাহাকে চিরদিনের জন্য সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত করিলেই যে সে

---

were so closely attached that in him I have lost a dear and affectionate brother. To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and single minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, which his devotedness to the cause of temperance, which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the publication of very many valuable tracts in English and Bengali and in other acts, will doubtless be long cherished in greatful remembrance by all lovers and promoters of temperance in this country.

I remain, yours affectionately,
(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

ব্যক্তি সংশোধিত হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন, সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সংশোধিত হইলেও হইতে পারে, তাহাও বুঝিতেন, তাই দয়াপরবশ হইয়া অনেকের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতেন। এই জন্য সেরূপ করিতেন যে তাহাদের নিকট হইতে তদতিরিক্ত কিছু আশা করিতেন না। আর যাহাদের কার্য-কলাপ, আচার-আচরণ হইতে তিনি সমাজের নানাবিধ কল্যাণ প্রত্যাশা করিতেন, তাহাদের কেহ সৎসঙ্গ সদ্ভাব ও উচ্চ আদর্শের অনুবর্তী হইয়া চলিতে গিয়া বিপথগামী হইলে, তাঁহার দুঃখ, অভিমান ও ক্রোধের সীমা থাকিত না। সেরূপ স্থলে তিনি নিতান্তই বিরূপ হইয়া বসিতেন। পাছে এইরূপ বিরূপ হন, এই ভয়ে, তাঁহার কোনো প্রিয়তম বন্ধু, দেশের জনৈক সুসন্তান, সম্ভ্রান্ত মহোদয় নিজের অসদনুষ্ঠানের সংবাদ বহুবিস্তৃত আকারে বিদ্যাসাগর-সন্নিধানে বিবৃত হইয়াছে, এবং তিনি তাহা শুনিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন শুনিয়া, নিজের অপরাধের লঘুতা প্রতিপন্ন করিতে এবং তাঁহার বিরক্তির বিলোপ করিতে যে মার্জনা-প্রার্থনা-সূচক পত্র প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ এখানে দেওয়া যাইতেছে : (৬৩) অমদার সহিত আপনার গতকল্যকার কথাবার্তা শুনিয়া আমার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে আমি পূর্বরাত্রিতে ৮টার সময় বাবুর ··সহিত বাগানে উপস্থিত হয়, আমার কোনো কোনো বন্ধু সুরাপানের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; আমি অসুখের দোহাই দিয়া অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া শেষে দুইবার একটু একটু খাইয়াছিলাম, যাহা পান করিয়াছিলাম, তাহার মোট পরিমাণ এক কাঁচ্চার অধিক নহে। অবশিষ্ট অংশ সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরের মেজেতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সে দিন রাত্রিতে আমার মদ খাওয়া ও মাতলামি করার সত্য ঘটনা এই। পরদিন প্রাতে আমাকে পুনরায় পীড়াপীড়ি করায় আমি একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলাম আর খাই নাই।'

৬৩ 'Having heard of the conversation you had with my friend yesterday evening it becomes indispensably necessary for me to give you a detailed account of my conduct in the garden party complained of ··

The fact was that I accompanied by Babus···. ... . and··· reached the appointed place at 8 P. M. on the night previous, some of my friends pressed me to drink, I protested, pleaded ill health but finding too importunate to be refused did at length take two sips. The quantity imbibed was literally not more than a kutccha, the remainder of the liquid in the glass being somehow managed to be poured down upon the

'এক্ষণে এই সম্প্রবে আমার বিরুদ্ধে আরও যে গুরুতর অভিযোগ আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে...... সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে সেই রাত্রিতে কোনো রকমে সেইখানে পড়িয়া থাকা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। এত রাত্রিতে বাটীতে ফিরিয়া আসা নিতান্তই অসুবিধার কথা, আর যদিও তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও অকারণে সুরুচি রোগের বাড়াবাড়ি করিতে তত ইচ্ছা ছিল না। আমি বহুবার মজলিস্ হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিলাম, আমাকে সকলে পাড়িয়া জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। আমার যদি কোনো অপরাধ হইয়া থাকে সে অপরাধ এই যে, আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি নাই, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কাজে কিংবা কথায় কিংবা ভাবভঙ্গীর দ্বারা, সেখানকার সে বীভৎস ব্যাপারের পক্ষসমর্থন করি নাই। আমি সমগ্র সময় দূরে দূরে কাটাইয়াছি। রাত্রি সাড়ে বারটা-একটার সময় আহার প্রস্তুত হইলে, আহারাদি করিয়া সর্বাগ্রে বৈঠকখানায় আসিয়া একটা স্বতন্ত্র ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম...।' ইনি

---

floor. This was the actual extent of my drunkeness on that night, The following morning I was again pressed to drink, I steadfastly refused. Now as to the other and more serious part of the charge that has been brought against me ··, circumstanced as I was I had no other alternative but to remain where I was. To return home at that hour of the night would have been exceedingly inconvenient and even if it were otherwise I did not like to play the Puritan unnecessarily. Several times I attempted to run away into an adjoining room but was on each occasion compelled to come back by sheer physical force. That I did not quiet the company, that very instant, is the only impropriety I have been guilty of, but beyond that I can most solemnly aver that I did not by my act, word or even gesture in any manner encourage or even countenance the proceedings...I whiled away my time as best I could tell. About half past 12 or 1 o'clock when dinnar was ready I finished my meal as hastily as possible, rang to the Bytuckana before every other member of the party and locked myself up alone in a separate room for the rest of the night.'—Taken from a Private letter addressed to Vidyasagar Mohashaya by a very particular and influential friend.

বঙ্গদেশের একজন সুপরিচিত সুসন্তান। বিদ্যাসাগর মহাশয় চরিত্র ও আচরণ বিষয়ে কত উচ্চ ভূমিতে বিচরণ করিতেন, তাহা উল্লিখিত পত্রাংশে প্রকাশ পাইতেছে। সজ্জনের সচ্চরিত্রতার বিপর্যয় সন্দর্শনে তাঁহার প্রাণে গভীর ক্লেশের সঞ্চার হইত, সেই জন্যই বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানগণও তাঁহার নিকটে নিজ নিজ দুর্বলতা ও ভ্রম-প্রমাদজনিত অসদাচরণের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যকলাপ যে কেবল সমাজ-সংস্কারে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, বন্ধুবান্ধবগণের আচরণের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে এবং আত্মশাসনে কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না, যদি তিনি আপনি উচ্ছৃঙ্খল লোক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার তুল্য সম্মানিত ব্যক্তিগণ কখনই তাঁহার নিকট আত্ম-দোষ ক্ষালনের জন্য এত ব্যস্ত বা বিব্রত হইয়া পড়িতেন না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাঁহার সমাজ-সংস্কার কার্য তাঁহার বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টা, তাঁহার বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টা, তাঁহার সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঈর্ষাপরায়ণ লোক তাঁহার নানা প্রকার দুর্নাম রটনা করিয়াছে। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি আধুনিক কালে কি পূর্বকালে, সমাজ-জীবনের প্রবাহমাণ স্রোতের বিরুদ্ধে মহামনা সক্রেটিসের ন্যায় যখনই কেহ কোনো প্রকার পরিবর্তন আনিতেপ্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই সেইমহাপুরুষের যশোদীপ্ত সুমহান প্রতিষ্ঠার প্রতি অপ্রীতি জন্মাইবার জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা নানা বর্ণের কলঙ্ক-রেখা পাত করিতে মহা ব্যস্ত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পান নাই। সর্দার শ্রীমন্তকে সর্বদা সঙ্গে রাখিয়া আততায়ীর হস্তে প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ওষ্ঠাগ্রেঅবস্থিত নিরাকার নিন্দার লেপন হইতে তাঁহার আত্মরক্ষা সম্ভব হয় নাই। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার জীবনী প্রণেতারাও এ বিষয়ে কল্পতরু। যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বন্ধুমণ্ডলী (৬৪) সমক্ষে সর্বদাই এই বলিয়াই আক্ষেপ করিতেন যে, 'আমার সর্বত্র সমান সুখ। লোকমুখে শুনিতে পাই যে এমন কোনো অপকীর্তি নাকি নাই, যাহা আমি করিতে পারি না। বর্ধমান নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ও গভীর আক্ষেপোক্তিসহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমায় বলিয়াছেন যে, 'কতদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্জনে মনের দুঃখে এই সকল কথা আমাকেও বলিয়াছেন।' কালীচরণবাবু ও গঙ্গানারায়ণবাবু উভয়েই বলিয়াছেন যে, যে বিদ্যাসাগর সর্ববিধ বিপদের মধ্যে অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান, ন্যায় বিচারে আত্মপর জ্ঞানবিরহিত,

৬৪ কালীকৃষ্ণ মিত্র, ৺কালীচরণ ঘোষ, শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি বহুজন সমক্ষে বহুবার গভীর আক্ষেপ সহকারে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

সদনুষ্ঠানে উৎসাহদাতা, অসদনুষ্ঠানে পরমাত্মীয়কে পরিত্যাগ করিতে অকুণ্ঠিত তাঁহার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের অকিঞ্চিৎকর নিন্দার লেশ মাত্রও স্পর্শিবে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিনই সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণসাধন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল, তাঁহার পরলোক গমনের অতি অল্পদিন পূর্বে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনে হিন্দুসমাজ যখন টলটলায়মান, যখন লোক আইনের আবশ্যকতা বুঝিয়া ও না বুঝিয়া কেবল 'আইন চাই না, আইন চাই না' বলিয়া, রাজপ্রতিনিধির রাজভবনের চারিদিকে চীৎকার করিয়াছিল, তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ ও ভগ্নদেহ এবং অবসন্ন মন লইয়া ধর্মবুদ্ধির তাড়না ও বহুলোকের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বয়ং স্যার ফিলিপ হচিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সম্মতি-আইন সম্বন্ধে তিনি যে ক্ষুদ্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুরোধে ফল হয় নাই, তাহাতে আধুনিক কালের ভারতীয় রাজকার্য পরিচালনের ব্যবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধও হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের নূতন পরিবর্তন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সুযুক্তি ও ধর্মবুদ্ধি উভয়েরই সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আমরা তাঁহার সেই শেষ সামাজিক কল্যাণ সাধনোপযোগী উক্তিপূর্ণ—অসহায় স্ত্রীজাতির প্রতি সমবেদনার পরিচায়ক ব্যবস্থাপত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ (৬৫)

'এই সমস্ত কারণ বিদ্যমানে যদিও আমি বর্তমান আকারে উপস্থিত আইনের পক্ষসমর্থন করিতে পারিতেছি না; আমি ইচ্ছা করি যাহাতে হিন্দুর ধর্মে-কর্মে হস্তক্ষেপ না করিয়াও বালিকা স্ত্রীদিগকে উপযুক্তরূপে নিরাপদ করা যাইতে পারে, এই আইন সেইরূপভাবে বিধিবদ্ধ হউক। আমি প্রস্তাব

৬৫ 'Though on these grounds I cannot support the Bill as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are theirteen, fourteen or fifteen the measure I suggest would give large, more real, and more extensive protection than the Bill At the some time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.'

করিতে চাই যে, দ্বিতীয় সংস্কার কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে কোনো স্বামীর বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করিতে পাওয়া আইনানুসারে দণ্ডনীয় হউক। অধিকাংশ স্থলেই ১৩।১৪।১৫ বৎসর পূর্বে বালিকাদিগের দ্বিতীয় সংস্কার কাল উপস্থিত হয় না। আমার পরামর্শমতে আইন বিধিবদ্ধ হইলে, ইহার দ্বারা অধিকাংশস্থলে, অনেক অধিক পরিমাণে বালিকাদিগকে বিপদ হইতে বাস্তবিকই রক্ষা করা হইবে। অথচ ধর্মলোপ হইল বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।'

ইহার পর শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শনপূর্বক বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষে বলিয়াছেন: 'সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে বালিকাদিগের দ্বিতীয় সংস্কারকালে উপস্থিত হইবার পূর্বের সম্বন্ধকে অপরাধ বলিয়া গণনা করিলেই সর্বতোভাবে সঙ্গত হইবে বলিয়াই বোধ হয়।'

'এইরূপ বিধি প্রণয়ণে যে কেবল বালিকাদিগকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া জনসমাজের কল্যাণ সাধন করা হইবে তাহা নহে, শাস্ত্রে যেরূপ নির্দেশ আছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শাস্ত্রে এরূপ অন্যায়ানুষ্ঠানের যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা আধ্যাত্মিক এবং তাহা সহজেই লোক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আমার প্রস্তাবমতো ব্যবস্থা করিলে দণ্ডবিধি আইন দ্বারা ধর্মনির্দেশ অধিকতর ফলপ্রদ হইবে। আমি এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে গভর্নমেণ্টের মনোযোগদান প্রার্থনা করিতেছি।' (৬৬)

---

৬৬ 'From every point of view, therefore the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has first menses.'

'Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child-wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would be made more effective if it was embodied in a penal law. I may be permitted to press this consideration most earnestly on the attention of the Government.…'

—Note on the Bill to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1882.

The 16th February, 1891.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

তিনি এই সংপ্রবে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এখানে আর সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমাদের বোধ হয়, আধুনিক কালের রাজকর্মচারীদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আদৌ পরিচয় ছিল না; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী সমাজ-সংস্কার ও লোক সেবার গুরুত্ব ও বিস্তৃতি অবগত থাকিলে, এক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহ ও পরামর্শেই রাজকর্মচারীগণ আপনাদের সংকল্প কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া আইনের উপকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিতে পারিতেন। সেরূপ ব্যবস্থা না করায়, আইন প্রণয়ণের উদ্দেশ্য সম্যক্ সুসিদ্ধ হয় নাই। ঐ আইন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণ সহানুভূতির অভাব এবং পরিবর্তিত আকারে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন তখন, যেমন-তেমন পরিবর্তনের প্রার্থী হইয়া কখনও সংস্কারক্ষেত্রে কিংবা রাজদ্বারে উপস্থিত হন নাই। সুযুক্তি ও সমাজ-ধর্মের সীমার মধ্যে থাকিয়া যত দূর পরিবর্তন সম্ভব, তিনি স্বদেশবাসিগণের ততদূর মঙ্গল সাধনেই আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ সংস্কার প্রার্থনাও সেই ভাবের পরিচয় দিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ২৯শে জুলাই লোকান্তর গমন করেন, আর ঐ বৎসরের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত মন্তব্য-পত্র রাজ-প্রতিনিধি সদনে প্রেরণ করেন, সুতরাং তাঁহার পরলোক গমনের অত্যল্পকাল পূর্বেও যে তিনি লোকহিতসাধনে সমান ভাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার সম্যক্-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুভাব হিন্দু-বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। ঘটিয়াছিল কি না, সম্মতি-আইন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুভাব ও হিন্দুসংস্কারের রক্ষাকল্পে তিনি অপর কোনো আস্থাবান হিন্দু অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কেহ কেহ দয়া করিয়া তাঁহাকে ভ্রান্ত হিন্দু বলিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা অপেক্ষা জাতীয় অপদার্থতা ও অধোগতির আর কি অধিক পরিচয় হইতে পারে? জাতীয় অধঃপতনের পরাকাষ্ঠা না হইলে আর, লোকের মুখে ও লেখনীতে এরূপ লজ্জাকর কথা প্রকাশ পায় না। আমাদের পোড়া কপাল যে, এরূপ মহাত্মা লোকের আবির্ভাব ও কার্যকলাপ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে এবং সে সকলের উপযুক্ত মূল্য নির্দেশ করিতে পারিতেছি না। তিনি আহারে ব্যবহারে চিরদিন সম্পূর্ণ হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। কখনও ভ্রমক্রমেও অখাদ্য ও অপেয় গ্রহণ করেন নাই। এরূপ স্থলে যাঁহারা অখাদ্য ভোজনে ও অপেয় পানে পুষ্টদেহ, তাঁহারা অবশ্যই নিজ নিজ অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুসমাজ কলঙ্কিত করিয়াছেন, ও অদ্যাপি ঐরূপ কার্যে নিয়ত রত রহিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি পরম হিন্দু নহেন? যাঁহারা সর্বদা বহুবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া পুষ্পোদ্যানের প্রজাপতির ন্যায়

জনসমাজের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন,' এমন কি, যে দেশে অধ্যাপকসমাজও তসর, গরদ প্রভৃতি পট্টবস্ত্র ও শাল বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত সে দেশের লোকের পক্ষে মোটা ধুতি চাদরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি মনু ও পরাশর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি মহাত্মাদের ন্যায় পূজনীয় ব্যক্তি নহেন? বর্তমান সময়ের সম্মান ও সম্পদশালী মহাশয়গণের সাক্ষাৎকার লাভ সুদুর্লভ ব্যাপার, তাঁহাদের দর্শন-লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির, বহুতর বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মহা-সমারোহপূর্ণ রাজধানী কলিকাতায় বাস করিয়াও তিনি নির্জন অরণ্যপ্রান্তস্থ তপোবনের পর্ণ-কুটীরবাসী ব্রাহ্মণের ন্যায় সকলেরই সুলভদর্শন ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কেহ কখনও কাহারও দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার আড়ম্বরবিহীন পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত নির্জন ক্ষুদ্র ভবনে যিনি যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, অবসরে ও ব্যস্ততায় কখন তাঁহাদের কাহাকেও তিনি ফিরাইতেন না। সম্পদ ও সম্মানের আওতায় তাঁহার জাতীয় ভাবের ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুষ্ঠেয় লক্ষণ সকলের বিলোপ সাধন হয় নাই। আমরা নিকটে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যত সামান্য লোক হউক না কেন, যে কোনো সময়ে উপস্থিত হউক না কেন, অবাধে গৃহের উপরতলে তাঁহার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইতে পারিত। বহু দূরের লোক, আলাপ পরিচয় কিছুই নাই, যেন চির অভ্যস্ত পথে তাঁহার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আপনার সুখ দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিল, কেহ বা তাহার সদনে দারুণ মনস্তাপের দ্রববহ্নির অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া দাঁড়াইল। কোথায় তাহার বাড়ি ঘর, কিছুই নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগর অশ্রুজল ঢালিয়া তাহার সন্তাপানল নির্বাপিত করিতেন এবং তাহার শোকের কারণ নিবারণ করিবার সাধ্য থাকিলে, তখনই তাহা করিতেন। এরূপ ঘটনা আমরা উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, সেই সকলের সংখ্যাই নিতান্ত অল্প নহে। বর্তমান সময়ে হিন্দু সন্তানের জীবন যাপন বিষয়ে এতদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর কোথায় পাওয়া যায়? সম্পন্ন ও সম্ভ্রমশালী হিন্দুগণ কি বিদ্যাসাগর সমীপে বাস্তবিকই এই উচ্চ নীতি শিক্ষা করিবেন না? শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, একথা বলি না, তবে তিনি যেমন ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা নির্ভীকতা সহকারে শাস্ত্রার্থ নির্দেশ করিতে এবং তদনুরূপ পথে চলিতে পারিতেন সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষতা করিয়াছেন এরূপ লোক অল্পই দেখিতে পাই। বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ও সর্বত্র সমাদৃত কোনো অধ্যাপক মহাশয় কোনো এক সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে ব্যবস্থাদান লইয়া বিদ্যাসাগর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি দুই বিপরীত পক্ষকে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দিয়াছেন শুনিয়া

বিদ্যাসাগর মহাশয় বজ্রগম্ভীর রবে বলিয়াছিলেন : 'আপনি চান কি ; আপনি ত বড় মজার লোক ; পূর্বে যে ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন, এখন আবার ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, মহাশয় আপনিও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছেন, আমিও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি ; আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি। কিন্তু এতদ্রূপে পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়। বলিতে কি আপনাদের আচরণের জন্য ব্রাহ্মণজাতির মান একেবারে গিয়াছে।' ব্রাহ্মণের সর্বপ্রধান গুণ মুক্তভাব ও স্বাধীনতা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলী কি মহাত্মা বিদ্যাসাগরে তাঁহাদের লুপ্ত সম্পদের পুনরভ্যুদয় দেখিয়া আনন্দিত হইবেন না ? তাঁহার সদনে জীবনের এই উচ্চনীতি শিক্ষা করিবেন না ? যে হিন্দুত্ব সংসার যাত্রা নির্বাহের উপযোগী উচ্চ আদর্শের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সে হিন্দুত্ব তাঁহাতে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজকালকার লোক সে হিন্দু ভাবের উপযুক্ত সমাদর করিতে সক্ষম কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কার ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ধর্মশাস্ত্র সকলের অনুমোদিত। এইটি সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে, ব্রাহ্মণজনোচিত শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজন। সেরূপ শাস্ত্রচর্চা না করিয়া যাঁহারা কেবল প্রচলিত আচার আচরণের অধীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং যাঁহারা এরূপ অবস্থা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াসী, তাঁহারাই দেশের সমূহ অনিষ্ট করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে।

যিনি যাহাই বলুন, চিন্তাশীল ও আস্থাবান হিন্দুগণ বিদ্যাসাগর সমক্ষে চিরদিনই সম্মানসহ নতমস্তক ছিলেন। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান কি শাস্ত্র বিষয়ক জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহার ব্যবস্থাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিত। পাইকপাড়া রাজপরিবারে মহাসমারোহপূর্ণ এক শ্রাদ্ধ বাসরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা মতে ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার নির্দেশ মতে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক মণ্ডলী যথাযোগ্য সম্মানে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ কার্যে তাঁহার প্রধানতার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ একখানি পত্র উদ্‌ধৃত করা গেল :

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া

বিনয়-নমস্কার পুরস্কৃতং নিবেদনমিদম্‌

এক্ষণে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এ বিষয়ের

আন্দোলন হইয়াছিল, পরিশেষে তাঁহারাই প্রাধান্য নির্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অতএব আপনকারদের সংসার হইতে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িককে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ই ঐ বৃত্তির যথার্থ অধিকারী। আমি পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছি, এজন্য উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল। ইতি ২৯শে আশ্বিন ১২৯০ সাল।

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ'

সাতক্ষীরার জমীদার বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় দুই মৃত পুত্রের এক জনের দত্তক ও অপরের ঔরস পুত্র—এই দুয়ের ( বৃদ্ধের পৌত্রদিগের ) মধ্যে কে শ্রাদ্ধের অধিকারীহইবে, এই প্রশ্ন লইয়া বিলক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কুলগুরু জানকীজীবন ন্যায়রত্ন জ্যেষ্ঠ ও উপনীত দত্তককে শ্রাদ্ধের অধিকারী স্থির করেন, নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বপক্ষতায় প্রবল হইয়া অপর পক্ষ তাহাতে আপত্তি করেন, কুলগুরু জানকীজীবন প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র দত্তক পক্ষীয়ের মীমাংসার ভার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। তিনি কুলগুরু জানকীজীবন প্রদত্ত ব্যবস্থারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। এবং শ্রাদ্ধের ব্যয়ভূষণ সমস্তই তদনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

তাঁহার লোকান্তর গমন কালে বহুসম্মানস্পদশ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস. সি আই. ই. মহোদয় যে শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ 'অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল. সহজে অনুভব করা যায়। সামান্য লোকে এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে, নির্জীব, নিশ্চল, তোজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'

'আমাদিগের নির্জীব বঙ্গসমাজে এরূপ ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই; পবিত্রনামা রামমোহনের সময়ের পর, এরূপ তীব্র যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক দ্বন্দ্ব; এরূপ সঙ্কল্প, এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপসিংহবীর্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষ সিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা ও স্বার্থপরতা হটিয়া গেল, সামাজিক যোদ্ধা অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আইন জারি করাইলেন; বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিদ্যাসাগরের বিজয় লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইলেন।'(৬৭) এত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও

৬৭ নব্যভারত, বিদ্যাসাগর সংখ্যা।

তাঁহার কোনও জীবনী প্রণেতা তাঁহাকে অহিন্দু প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া কলঙ্ক অর্জনে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। (৬৮)

আজ সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্র নীরব। অশ্ব সংযোজিত রথ যেমন সারথি-বিহীন হইয়া বিপথে বিচরণ করে, পরিচালকবিহীন সৈন্যগণ যেমন পরস্পরের প্রতি অস্ত্রচালনা করিয়া আত্ম-নাশ ও জাতীয় বলের ক্ষয় করে— আজ বঙ্গ-সমাজ সেইরূপ রামমোহণের ন্যায় সুযোগ্য সারথির অভাবে ইতস্ততঃ বিপর্যস্ত সমাজ সংস্কারকগণ ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী সেনাপতির অভাবে উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যমণ্ডলীর ন্যায় চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। অবসরপ্রাপ্ত দেবেন্দ্রনাথ ও লোকান্তরবাস। কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী পরিচালকের অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশেব ধর্মচিন্তা, ধর্মতৃষ্ণা, সমাজ সংস্কার এবং লোকের অন্য নানাবিধ হিতসাধন স্রোতঃ যেন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। নানাদিকে গুণবান ও কর্মঠ লোকের সংখ্যা অধিক না হইলেও এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহাবা জীবনের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়া সমাজের নির্বাণপ্রায় জীবনপ্রদীপ কায়ক্লেশে রক্ষা করিতেছেন। ইহা সত্য কথা, কিন্তু ইহাও সত্য যে রাজার কার্য প্রজায় করিলে, যেমন ভাল দেখায় না,—কাজও ভাল হয় না, বীরের কার্য ভীরুতে করিলে, যেমন বীরত্ব বিলুপ্ত হয়—কেশরীর কার্য শৃগালে করিলে তাহা যেমন কেবল চতুরতায় পরিণত হয়, আমাদের দশা প্রায় তাহাই হইয়াছে। আজ ধর্মকর্মে বল, সমাজ সংস্কারেই বল, অন্য নানাবিধ সদনুষ্ঠানেই বল, আত্ম-বিসর্জন করিয়া কৃতার্থ হইবার লোক অতি অল্প। আত্মোৎসর্গ করিয়া শেষদিন পর্যন্ত জীবনের মহাব্রতপালন করিতে, ঈশ্বরচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে অগ্রসর হন, এরূপ সুকঠিন মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সতেজ ও সবল লোক সহসা উপস্থিত হইতে এবং আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারেন, এই আশার আকাশে আভাসের আলোক দেখিতেছি না। সর্বজীবের আশ্রয়রূপী ভগবান যে বিধানে কৃপা করিয়া রামমোহনের লোকান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের অভ্যুদয় করিয়া আমাদিগের সমক্ষে আদর্শ-পথ সুপরিষ্কৃত রাখিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই কেশবচন্দ্রের অভিনয়ের সূত্রপাত ও পরিসমাপ্তি সম্পাদিত হইয়াছিল; আজ তাঁহার সেই বিধানই কি আমাদের আশ্রয়রূপে, অবলম্বনরূপে, পথপ্রদর্শকরূপে, সমাজ দেহের পুরোভাগে বিজয়পতাকা ধারণ করিয়া বীরবেশে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত পুরুষসিংহকে পাঠাইবেন না? সঙ্কীর্ণতা ও স্থিতিশীলতায় সমাজ-জীবন রক্ষা পায় না। গৃহের গৃহসজ্জা সর্বদা মাজা ঘসা করিতে হয়, বস্ত্রাদি ধৌত করিতে হয়, দেহের সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিতে, দেহের মলিনতা দূর করিতে হয়, মনের ময়লা—আত্মার আবর্জনারাশিও দূরে

৬৮ সাহিত্য—১৩০৬।

নিক্ষেপ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে আবর্জনারাশি স্তূপীকৃত হইবে অথচ আমরা সর্ববিধ উন্নতি-পথে দিন দিন অগ্রসর হইব, ইহা কিরূপে বিধিসঙ্গত হইতে পারে? সকলেই সংস্কার ও উন্নতি পথে অগ্রসর, কেবল সমাজ স্থিতিশীল ও উন্নতিবিমুখ হইয়া থাকিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? সমাজের আবর্জনাতেও অগ্নি প্রদান কর—মলিনতা দগ্ধ হইবে, সমাজ-প্রাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ, আপনার উজ্জ্বলতায় সকলের মন হরণ করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আবর্জনারাশি দগ্ধ করিয়া সমাজ-জীবনের প্রাণরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণকণা সকল সংগ্রহ করিতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গসমাজ যাঁহাদের ঋণে আমরণ ঋণী থাকিবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন। তাঁহার জীবনের সমগ্র সময়—উপার্জনের প্রায় সমস্ত অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল, তাঁহার স্বদেশবাসীগণের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিতে নিয়োগ করিয়া মানবজীবনের মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বিধাতার কৃপায় সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধীকারীর শুভ সমাগম অপেক্ষায় আমরা আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টায় পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে প্রবন্ধের সার সঙ্কলন পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

## নবম অধ্যায় ॥ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে

আজ যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেতর জাতি, হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন, মানসিক তৃপ্তিলাভ ও প্রভূত জ্ঞানোপার্জন করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, ইহার সূচনা ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরেই স্থান লাভ করিবেন। বঙ্গের চির গৌরবস্থল রামমোহন যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া বৈদিকধর্ম —উপনিষদের ধর্ম, পরম পূজনীয় ঋষিগণের সাধনলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। তিনি সর্বাগ্রে বেদান্ত সূত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করেন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণের জন্য তিনি শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করেন নাই। তিনি সাধারণ লোকমণ্ডলীর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই কার্যেই তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া পরিশেষে অর্থাভাবে ইংলণ্ডে যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সেই লোকান্তরবাসী মহাপুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে আজীবণ জীবনক্ষয় করিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ক্ষেত্রেই বহুবিস্তৃতভাবে লোকশিক্ষার পথ সুপরিষ্কৃত ও সুপ্রশস্ত করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্যই বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা, তাঁহার অক্ষয়কীর্তিরূপে ইহা চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের শোভা বর্ধন করিবে, কিন্তু লোক শিক্ষার পথে, তিনি কেবল এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার জ্ঞানবিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বহুদূর অধিকার করিয়াছিল। তাহার শিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার তুলনা তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র সে সাধু দৃষ্টান্তের তুলনা মিলে না। তিনি যে আপামর সাধারণ লোকের সুশিক্ষা লাভের কিরূপ সুহৃদ ছিলেন, তাঁহার প্রথম কর্ম গ্রহণের সময়েই তাহার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জকে অনুরোধ করিয়া ১০১টি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সংস্কৃত কালেজে সাধারণ লোকের সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, বিরোধীগণের সর্বপ্রকার বাদ প্রতিবাদের সদুত্তর দিয়া তাহাদিগকে নীরব করেন, এবং তাঁহারই চেষ্টায় ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা ব্রাহ্মণেতর জাতির বালকগণ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি যখন মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়া—এই চারি জিলার অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর ছিলেন, তখন ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে শতাধিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, শেষে ইহাই মনোমালিন্যের কারণ হইয়া তাঁহাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করে।

তাঁহার অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহের সমগ্র লোকমণ্ডলীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন। তিনি স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া জন্মভূমি বীরসিংহে উপস্থিত হন। গৃহে উপস্থিত হইয়া সর্বাগ্রে তাঁহার পিতৃদেব ও জননীদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া এক সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বাল্যকালে পঠদ্দশা হইতেই ছাত্রবৃত্তির টাকা হইতে গ্রামের টোলের জন্য হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুঁথি ও কিঞ্চিৎ বিত্ত সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছিল।' এ পর্যন্ত উপযুক্তরূপ সচ্ছলতার অভাবে সে অভিপ্রায় কার্যে পরিণত হয় নাই। গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতাকে বলিলেন 'বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী, অন্যান্য গ্রামের বালকদিগের সুশিক্ষা লাভের জন্য নিজ গ্রামে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিবার মানস করিয়াছি।' ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামাতা উভয়েই এই সংবাদ শ্রবণে প্রীতিপূর্ণ অন্তরে অগ্রসর হইয়া পুত্রকে স্নেহচুম্বন (১) দিয়া পুত্রের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যে দিন সন্ধ্যার সময়ে এই প্রস্তাব হইল, তাহার পরদিন বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং ত্বরায় বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হইল। বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবার দিনে মজুর পাওয়া যায় নাই। সদনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমন গভীর অনুরাগ ছিল যে, লোকাভাবে কার্যারম্ভ স্থগিত রহিল না। তিনি নিজেই সহোদরদিগকে সঙ্গে লইয়া মৃত্তিকা খনন কার্য আরম্ভ করিলেন! বীরসিংহ বিদ্যালয়ের পরম সৌভাগ্য যে, যে মহাত্মার উপস্থিতি ও শুভদৃষ্টি লাভার্থে কত দেশ-বিদেশের লোক সদনুষ্ঠান ক্ষেত্রে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার জন্য লালায়িত হইত, সেই মহাত্মা স্বহস্তে বিদ্যালয়ের বাটীর নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিকে গৃহ প্রস্তুত ও অন্যদিকে বিদ্যালয়ের কার্য অন্যত্র আরম্ভ হইল, নিকটবর্তী বহুতর গ্রামের বালকগণ সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়া দিন দিন অভ্যোন্নতি সাধন করিতে আরম্ভ করিল। ৫।৭ দিনের মধ্যেই শতাধিক বালক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহে বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন—বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি এই পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী পল্লীসমূহের শ্রমজীবী, রাখাল ও কৃষক বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়ের বালকেরা দিনের বেলায় ক্ষেত্রের কার্য করিয়া ও মাঠে গরু চরাইয়া সন্ধ্যার সময় বিদ্যালয়ে আসিয়া লেখা পড়া শিখিত। বালক-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, রাখাল-স্কুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বারগুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্বত্র বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিল! এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রিগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেনসিল প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় ৩০০ টাকার অধিক ব্যয় হইত।

---

১ সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ৬৯ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর-সুহৃদ ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি বিনামূল্যে বীরসিংহের বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থে বিতরণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ সর্বসমেত ৩০০।৪০০ টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উদ্যোগে এডেড্ স্কুল সমূহের (Grant-in-Aid) সৃষ্টি হইল, তখনই কিছুকালের জন্য বীরসিংহ স্কুলও গভর্নমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় এক্ষণে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর নামে পরিচিত। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যামন্দির "ভগবতী বিদ্যালয়" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাপি জীবিত আছে এবং বীরসিংহ অঞ্চলের বালকগণের শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণবাবু সে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বালকবালিকাগণের বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহার ধর্ম-বুদ্ধির নিকট অব্যাহতি পান নাই। তাঁহার কোনো অনুষ্ঠান কোনো প্রকারে অসম্পূর্ণ কিংবা অঙ্গহীন থাকিত না। যখন যাহা ধরিতেন তাহাই করিতেন,যাহা করিতেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়াই করিতেন। বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, বিনা বেতনে বালকদের পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুস্তকাদির প্রয়োজন হইলে নিজ ব্যয়ে সে সকল ক্রয় করিয়া দিতেন, অন্ন সংস্থান না থাকিলে নিজ গৃহে স্থান দিয়া তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া নিজেই চরিতার্থ হইতেন। পিতা ঠাকুরদাস গৃহে থাকিয়াই কর্তৃত্ব করিতেন, জননী ভগবতীদেবী অন্নপূর্ণাবেশে স্বয়ং পাককার্য সমাপন করিতেন এবং নিজে সকলকে সস্নেহে ভোজন করাইতেন। গৃহে আহারের ব্যবস্থা সকলেরই একরূপ ছিল। নারায়ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে তিনি পিতামহ ও পিতামহীর অতি আদরের পাত্র হইয়াও আশ্রিত দরিদ্র বালকদিগের সঙ্গে সমভাবে আহার বিহার করিয়াছেন। বর্তমান বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থ! একটিবার চিন্তা কর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র, গৃহের প্রত্যেকের আদরের ধন, নিজের ঘরে আশ্রিত পরের ছেলেদের সঙ্গে সমান সমাদরে লালিত পালিত হইয়াছেন। এইরূপ করিতে পার? যদি না পার, তবে ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছ! নারায়ণবাবু যখন গৌরবভরে বলিয়াছিলেন, 'দুই বেলা বহুসংখ্যক দরিদ্র বালকের সহিত সামান্য অন্নব্যঞ্জনে উদরপূর্ণ করিয়া পরম সুখে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ক্রোড়ে নিদ্রা গিয়াছি।' তখন তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ মুখের শোভা দর্শনে ও হিন্দুগৃহের নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধন স্মরণে সত্যসত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলাম। বীরসিংহ অঞ্চলে ডাক্তার পাওয়া যাইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ উৎকৃষ্ট বালকগণকে নিজ ব্যয়ে

কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া জন্মস্থান বীরসিংহের ও তন্নিকটবর্তী বহুতর স্থানের লোকমণ্ডলীর এই গুরুতর অভাব মোচন করেন। এই বিদ্যালয়ের অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শেষে সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইয়া এক্ষণে সুখে কালযাপন করিতেছেন।

কিন্তু আজকালকার লোক এরূপ অসার যে, বিদ্যাসাগর হেন লোকের উৎসাহ দান ও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। অনেক লোকের আপত্তি না থাকিলে, এবং তাঁহাদের নাম-ধাম প্রকাশে আমাদের অপ্রিয় হইবার ভয় না থাকিলে, আমরা দেখাইতে পারিতাম যে কেবল বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের কেন বঙ্গদেশীয় অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার স্নেহপূর্ণ উৎসাহ লাভে তাঁহার অর্থসাহায্য ও উপদেশ প্রাপ্তিতে উপকৃত ও কৃতার্থ হইয়াছেন এবং এক্ষণে গণনীয় ব্যক্তিগণের তালিকা বৃদ্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন। বিদ্যাদান ও জ্ঞান বিস্তারে তিনি যে এদেশীয় জনমণ্ডলীকে কিরূপ অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার বর্ণনা হয় না, এবং সহজে লোক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। জন্মভূমি বীরসিংহের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে মনোনিবেশ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যখনই যেখানে গিয়াছেন, সে স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারা কিছু কিছু সদনুষ্ঠান সাধন করাইয়াছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনে বহির্গত একবার বৈঁচি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পর বালকদের জন্য একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তথাকার সম্ভ্রান্ত ও গণনীয় জমিদার বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ও বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আগ্রহ জন্মাইয়া দিলেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় অদ্যাপি সেই বিদ্যালয় বিহারীবাবুর ব্যয়ে জীবিত থাকিয়া নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁদি গ্রামে তাঁহাদের আত্মীয়তা সূত্রে কিছুকাল অবস্থান করেন, সেই সময়ে সেখানে রাজব্যয়ে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করান। এইরূপ যখন যে স্থানে গিয়াছেন ; এবং যখনই সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানে তখনই জ্ঞানবিস্তারের সুব্যবস্থা করিয়া আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রশস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাঁহার লোকহিতৈষণা জনসমাজের অজ্ঞতা দূরীকরণেচ্ছা এবং মানবসাধারণের উচ্চতর অধিকার লাভের পক্ষপাতিতা, তাহার সুবৃহৎ জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে কার্য করিয়াছে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ কিরূপ সংযত, নির্লোভ,পরহিতাকাঙ্ক্ষী ও লোকবৎসল হইলে আমাদের এত অধঃপতন সহজে নিবারিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার আদর্শস্থল তিনি জ্ঞানবিস্তারকেই কুসংস্কার দূরীকরণের একমাত্র

মহৌষধ বলিয়া জানিতেন, এবং সর্বত্র তাহারই প্রয়োগে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন : 'স্বদেশীয় জনগণের সুশিক্ষা লাভ—এবং তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহিত. যদিও আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে' তখন তিনি জানিতেন না যে, স্বদেশীয় শিক্ষাবিস্তারে কতদূর ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে। বিধাতা যে তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এক সুমহৎ কার্য সাধন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে রাজসরকার হইতে—পরের তাঁবেদারী হইতে—বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই। তা পারিবেনই বা কেমন করিয়া? শিশু কি যৌবনের ভাবী বলবীর্যের জ্ঞান ধারণ করে? বর্ণপরিচয়-নবিশী বালক কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পুরস্কার প্রাপ্তির তৃপ্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কর্মত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প, তখন তাঁহার সম্মুখে কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্যাই এক বৃহৎ অনুষ্ঠান বলিয়া বোধ ছিল এবং সে সময়ে সে ক্ষেত্রে অতি অল্প লোকই নিযুক্ত ছিলেন, তাই সেই কার্যই তখন তাঁহার বিশেষ কার্য ছিল। কালচক্রের সুপরিবর্তনে তিনি যে মেট্রপলিটনের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বদেশীয় ঐরূপ অসংখ্য বিদ্যালয়ের পিতৃস্থানীয় হইবেন, তাহা তখন চিন্তা করেন নাই, এবং তখন তাহা চিন্তা করিবার অবসরও ছিল না। তিনি যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার অপ্রস্ফুটিত আকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত হইয়া বলিয়াছিলেন : 'আমি জীবনেব অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানে নিয়োগ করিব এবং সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে, আমার চিতাভস্মে উদ্‌যাপিত হইবে।' তাঁহার সেই আপনা হইতে পরিব্যক্ত উক্তির পূর্ণ সফলতা সন্দর্শনে আজ লোকসকল মুগ্ধ ও চমৎকৃত।

১৮৪৮।৪৯ খৃস্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিতেন, সেই সময়ে উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। আপনাদের রচিত গ্রন্থ ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত হইবে, আপনাদের পছন্দমতো পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের যন্ত্র স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন : 'যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি উভয়েই সমাংশভাগী ছিলাম।' এই সংস্কৃত যন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনোপযোগী একটি প্রেস বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে শুনিয়া, বিদ্যাসাগর সেটিকে দেখিতে গেলেন, দেখিয়া পছন্দ হইল কিন্তু টাকা নাই। বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার উভয়ের কাহারও টাকা ছিল না। অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ৬০০ টাকা কর্জ

করিয়া প্রেসটি ক্রয় করিলেন। নীলমাধববাবুকে যে সময়ের মধ্যে টাকা দিবার কথা, সে সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া কিছু ব্যস্ত হইয়া পাড়লেন, এমন সময়ে একদিন মার্শেল সাহেব কথায় কথায় প্রেস ক্রয় ও ঋণের কথা জানিতে পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন যে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদের জন্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ভাল কাগজে সুন্দর করিয়া যদি ছাপাইতে পার, তাহা হইলে আমি উহার ১০০ খণ্ড ক্রয় করিয়া তোমার মুদ্রাযন্ত্রের ৬০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব। এই আশা পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগর রাজবাটী হইতে পুরাতন ও মূল অন্নদামঙ্গল আনিয়া তাহারই এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তাহারই একশত খণ্ড পুস্তক বিক্রয়ের অর্থে প্রেসের ছয়শত টাকা ঋণ পরিশোধ হইল। (২) এইরূপে সংস্কৃত যন্ত্রের ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন। অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রয়ে যে অর্থ হইল, তদ্দ্বারা প্রেসেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মিলিত চেষ্টায় সংস্কৃত যন্ত্র ত্বরায় আত্মপোষণে সক্ষম ও ক্রমে সচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

কিছুদিন এইরূপ উভয়ের যত্ন ও চেষ্টায় যখন ছাপাখানাটি বেশ চলিতে লাগিল, ঠিক সেই সময়ে উদরাময় রোগের দারুণ আক্রমণে বাধ্য হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের পরেও ইহার কাজ অনেকদিন বেশ চলিয়াছিল। পরিশেষে প্রেসসংক্রান্ত কার্যকলাপ লইয়া বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কারের মধ্যে মনোমালিন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ উপস্থিত হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই বলিতেছেন: 'ক্রমে ক্রমে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনো বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে। এজন্য উভয়ের আত্মীয় পটলডাঙ্গা-নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দে দ্বারা তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি আমার প্রাপ্য আমায় দিয়া ছাপাখানায় সম্পূর্ণ স্বত্ববান হউন, না হয় তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ত্যাগ স্থির করেন। অনন্তর উভয়ের সম্মতিক্রমে, বাবু শ্যামাচরণ দে, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিন ব্যক্তি, হিসাবনিকাস ও দেনাপাওনা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত সালিস নিযুক্ত হয়েন এবং খাতাপত্র দেখিয়া, হিসাবনিকাশ ও দেনাপাওনার মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহাদের মীমাংসা পত্রের প্রতিলিপি তর্কালঙ্কারের নিকট প্রেরিত হইল, তিনি পত্র দ্বারা শ্যামাচরণ-বাবুকে জানান, আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না। আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু

২ নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস, ৫৬ পৃষ্ঠা।

হওয়াতে তাঁহার পত্নী কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।' (৩)

বন্ধুগণের মীমাংসার ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্ধাংশের মূল্য দিয়া সমগ্র স্বত্বের অধিকারী হইলেন। এবং প্রেসের কার্য নিজের পছন্দমতো চালাইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকগুলির বিক্রয়কার্যের সৌকর্যার্থে 'সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়' নামে একটি পুস্তকাগার স্থাপন করেন। ইহার ইংরাজী নাম 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী'। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপজিটারী তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। ঐ উভয় সম্পত্তি কি কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া এবং সুবিধা ও সুযোগ মতো কোনো কোনো সম্পন্ন লোক দ্বারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। সেই সকল পুস্তক যাহাতে সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় এবং সেই সকল গ্রন্থ পাইবার জন্য লোকের কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জন লোকও প্রতিপালিত হয়, এই উদ্দেশ্যে "সংস্কৃত যন্ত্র" ও "সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়" স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখনও দেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার সাধিত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচারের সূচনা হইয়াছিল মাত্র। সে সময়ে গভর্নমেণ্ট যে সকল ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে বালকগণকে পড়াইবার দুইটি প্রধান অন্তরায় ছিল, ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধন বালকগণের দেয় বেতনের পরিমাণ অধিক ছিল। এত অধিক ছিল যে, দরিদ্রের পক্ষে সে শিক্ষা লাভের কোনো আশা ছিল না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অতি কষ্টেও সেইরূপ বহু ব্যয়ে নিজ নিজ বালকগণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতে পারিতেন না। সুতরাং তৎকালে গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সকল সাধারণ লোকের পক্ষে থাকিয়াও ছিল না বলিলেই হয়। দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে, এখানে ধর্মবিহীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। ভিন্নধর্মাবলম্বী রাজার পক্ষে ধর্ম শিক্ষাদান বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল, কিন্তু এই নিরপেক্ষতা ও সমগ্র প্রজামণ্ডলীর ধর্মোন্নতি বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন একই কথা। জনসমাজ শিক্ষালোলুপ বালকবৃন্দকে যদি শৈশবে ও বাল্যকালে ধর্মোপদেশ হইতে বঞ্চিত করে, পরমেশ্বরে প্রীতি ও গুরুজনে ভক্তি শিক্ষা না দেয়,

৩ নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস, ৫।৬ পৃষ্ঠা।

নানাবিধ পাপ প্রলোভনের মধ্যে উত্তরকালে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবার উপযোগী শিক্ষাদানে বিরত হয়, তাহা হইলে অচিরে তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করে। বর্তমান সময়ে শিশু জীবনে বিশৃংখলা ও বালকগণের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন তাহার পূর্ণ পরিচয় স্থল।

একদিকে গভর্নমেণ্টের এদেশীয় লোকের জাতীয় ধর্মোন্নতি বিষয়ে নিশ্চেষ্টভাব, অপরদিকে ইংরাজ জাতির পরম গৌরবস্থল খৃষ্টীয় মিশনারী মহোদয়গণ ইংরাজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নানাস্থানে ধর্ম প্রচার ও জনসাধারণের নানাবিধ হিতসাধন মানসে বহুবিধ সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের কৃত অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান কার্য দুটি: প্রথম, দেশীয় ভাষার চর্চা ও শ্রীবৃদ্ধি, দ্বিতীয়, ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক এদেশীয় লোকমণ্ডলীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার। এই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার কল্পে তাঁহারা দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিলেন। কলিকাতায় এরূপ মিশনারী স্কুলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার ডফের স্কুল আজ পর্যন্ত "ডব্ সাহেবের স্কুল" বলিয়া পরিচিত আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে অল্প ব্যয়ে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল, কিন্তু লোকের সংস্কার নিবন্ধন গুরুতর বিঘ্নও ছিল। যে বিদেশীয় রাজা ভিন্ন জাতীয় প্রজামণ্ডলীর ধর্মোন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেই বিদেশীয় জাতির পুরোহিত ও ধর্মযাজকগণ ষোল আনা খৃষ্টীয় ধর্মভাব এদেশীয় লোকদের মধ্যে প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া এখানে কার্য আরম্ভ করিলেন। সুতরাং এদেশীয় সাধারণ লোক আপন আপন সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার বিশিষ্টরূপ সুবিধা কোথাও পাইলেন না। এদেশীয় লোকের পক্ষে হইল উভয় সংকট "ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুম্ভীর"! লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিল যে, গভর্নমেণ্ট স্কুলে পড়িলে নাস্তিক হয়, আর মিশনারী স্কুলে পড়িলে খৃস্টীয়ান্ হয়।

বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ৺গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে কালে সে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করান বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সে পূর্ব গৌরব অস্তমিত হইয়াছে। সেইরূপ ভাববৈপরীত্য ও সুশিক্ষা প্রাপ্তির নানা প্রকার অসুবিধা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক (৪) উদ্যোগী হইয়া সিমলার ৺শংকর ঘোষের লেনে "কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইঁহারা এবং অন্য

---

৪ বাবু ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, বাবু মাধবচন্দ্র ধর, বাবু পতিতপাবন সেন, বাবু গঙ্গাচরণ সেন, বাবু যাদবচন্দ্র পালিত ও বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য।

কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত লোক যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠপোষকরূপে বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল উপরিউক্ত মহাশয়গণ ইহার পরিচালন ও ব্যয়ভারবহন করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসরকাল অতীত হইলে পর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা বিদ্যালয়ের বিশিষ্টরূপ উন্নতির প্রত্যাশায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদ্যালয়ের কার্য পর্যবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে—মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা ও ইনস্পেকটারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া বিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাই উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার সহায়তা লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজকৃষ্ণবাবুকে লইয়া কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ একটি কার্যনির্বাহক সভা গঠন করিলেন, এই সভার তত্ত্বাবধানে কয়েকমাস কাজকর্ম বেশ চলিল, সহসা কোনো এক অনুপযুক্ত শিক্ষকের পদচ্যুতি লইয়া কমিটির সভ্যগণের গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইল। এই বিরোধের ফলে বিদ্যালয়টি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও বাবু মাধবচন্দ্র ধর উভয়ে পৃথক স্থানে 'ট্রেনিং একাডেমি' নামে আর একটি পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, সে বিদ্যালয়টি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের পূর্ব নামই রহিয়া গেল। বিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য ও অনাত্মীয়তা সংঘটনে ও তন্নিবন্ধন গৃহবিচ্ছেদে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান কার্য পরিত্যাগ করেন। নানা কারণে তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এ দেশের লোক এখনও স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থের সেবা করিতে আপনাদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ কিংবা কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া সাধারণের হিতসাধন করিতে শিখে নাই। এদেশে দশ জনে মিলে মিশে কাজ করিবার সময় এখনও হয় নাই। অতি অল্প বয়সে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার সুবৃহৎ জীবনের বহুতর ঘটনায় তাহার শত প্রকার প্রমাণ পাইয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণার অনুবর্তী হইয়া চলিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে পাঁচজনের সহিত একত্র হইয়া কোনো কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মন হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

এইরূপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া যখন তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন স্বত্বাধিকারীদের কয়েক জন (৫)

---

৫ After the said disruption, the remaining founders namely—Patitpabun Sen, Ganga Charan Sen, Jadab Chandra Palit and

মিলিত হইয়া কিছুকাল বিদ্যালয়ের কার্য চালাইলেন। পরিশেষে আপনাদের অবসর ও অভিজ্ঞতার অভাবে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রব ছিন্ন হওয়াতে বিদ্যালয় প্রথমে অবসন্ন এবং তৎপরে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষগণ আপনাদের অক্ষমতা অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন এবং বিদ্যালয়ের সমগ্রভার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিতে চাহিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হইলে পর, তাঁহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন; বিদায়কালে একটি কমিটি গঠনপক্ষে বিদায় প্রাপ্ত স্বত্বাধিকারিগণের বিশেষ অনুরোধ ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহাদের কোনো প্রকার সংস্রব রহিল না জানিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কার্যে শেষে অগ্রসর হইলেন। তিনি বিদ্যালয়ের সমগ্র ভার গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ের সুনাম প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন মানসে একটি কমিটি গঠন করিলেন। সে কমিটির সভাপতি হইলেন—রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা রমানাথ ঠাকুর, বাবু হীরালাল শীল, বাবু রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর মেম্বর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাদক হইলেন। (৬) এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যখন বিদ্যালয়ের কার্য চালাইতে লাগিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অনুরাগের উর্বর ক্ষেত্রে যেমন অপর দশটি কার্য সফল হইয়াছিল, এ কার্যও সেইরূপ দ্রুতবেগে উন্নতিপথে অগ্রসর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আসিবার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি সুন্দর হইতে লাগিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন যে কাজ করিতেন, তখন তাহা যে নিঃস্বার্থ ভাবে করিতেন, সে সম্বন্ধে প্রমাণের প্রয়োজন নাই, তিনি পরার্থে এত কার্য করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কোনো কার্যের উদার ভাব প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক। তথাপি কেবল প্রমাণসহ ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়াই বলিতেছি যে, কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের কার্য পরিচালনের

---

Baishnva Charan Adhya, who had other works to do, having found by experience that Pundit Iswar Chandra Vidyasagar was highly public sprited and thoroughly disinterested, and was best competent to manage the school, entrusted the management thereof to the said Pundit.

৬ In April 1861···a Committee of Management of which Raja Pratap Chandra Singha was the president; and Ramanath Tagore, Hiralal Sil, Ram Gopal Ghose and Rai Hara Chandra Ghose Bahadur were members and the Pundit its Secretary, was formed.

জন্য কেবল একটি কমিটি করিয়া দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না ; বিদ্যালয় পরিচালনের উপযোগী কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিয়া কমিটির দ্বারা মঞ্জুর করাইলেন। নিয়মাবলীর তালিকায় সর্বসমেত ৩৫টি নিয়মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তৃতীয়, ত্রিংশ, একত্রিংশ, দ্বাত্রিংশ, ত্রয়ত্রিংশ নিয়মই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। হিন্দু বালকগণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাথমিক শিক্ষায় যাহাতে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, তৎসাধনের জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

৩০। অবসর সময়ে বালকগণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্ততঃ এক এক জন শিক্ষক সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৩১। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তিনটি বালক প্রেসিডেন্সী, মেডিকেল কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে যাহাতে পড়িতে পারে, তাহার উৎসাহ বিধানার্থে দুই বৎসর ১০ টাকা করিয়া পাইতে পারে, এরূপ তিনটি ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে দেওয়া হইবে।

৩২। বিদ্যালয়ের উদ্‌বৃত্ত অর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে সম্পাদক ও অপর একজন মেম্বরের জমা থাকিবে।

৩৩। উদ্‌বৃত্ত অর্থ বিদ্যালয়েরই কল্যাণার্থে ব্যয় করা হইবে। (৭)

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্তবিদ্যালয়ের নাম ছিল কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল। ঐ বৎসরের প্রারম্ভেই হিন্দু মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউসন এই নূতন নামে নামান্তরিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক আবেদন পত্রে উক্ত বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরবর্তী পরীক্ষা দানের অধিকার

---

৭. Taken from the old Records of the Metropolitan Institution, published by the present Authorities of the Institution :

3. The object of the Institution is to give an effecient elementary education to Hindu youths in the English as well as the Bengali language and literature.

30. One teacher at least shall be present on each play ground during the time of recreation to watch over the conduct of the pupils.

31, Scholarships of ten rupees each shall be awarded to three of the most meritorious pupils for two years to enable them to prosecute their studies in a higher educational institution, such as the Presidency, the Medical, or the Civil Engineering College.

32. The funds of the school shall be deposited in the Bank

পাইবার প্রার্থনা করা হয়। এই আবেদন পত্রে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং ঐ আবেদন পত্রে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষা দানের উপযোগী শিক্ষা দিবার আর্থিক ও অন্যবিধ সমগ্র দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সম্ভ্রান্ত সদস্য রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ মহোদয়দ্বয় ইহাতে সেনেটের সদস্যরূপে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে বিদ্যালয়ের বাটী ভাড়া লইয়া একটা গোলমাল হয়। যে বাটীতে বিদ্যালয়ের কার্য হইত, তাহার মালিক ত্রৈলোক্যচন্দ্র ঘোষ নির্ধারিত ৫০ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে ১০০ টাকা মাসিক ভাড়ার দাবি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দিতে অসম্মত হন, এই সূত্রে মকদ্দমা হয়। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অপর সকল সভ্যই ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ শূন্য হইয়া পড়েন। ক্রমে ইহার ভালমন্দ সকল ভারই বিদ্যসাগর মহাশয়কে দিয়া তাঁহারা অবসর গ্রহণ করেন। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববান হইয়া ইহার উন্নতি কল্পে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছেন।

পূর্বে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপনের ন্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও একটা পুণ্য কার্য ছিল। অল্পব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে বালকগণ জ্ঞানোপার্জন করিতে পাইবে, এই আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত হইয়াই অনেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতিও ঐ প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ বহুব্যয়শীল কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আজকাল বিদ্যালয় স্থাপন এক প্রকার ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, স্বদেশীয় বালকগণকে বিদ্যাদান একটা উপার্জনের দ্বার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ব্যবসায়ে বিভ্রাট যেমন সর্বত অপরিহার্য। এখানেও সেইরূপ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সকলে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদন প্রেরণ করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, লোক ইহার দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া ধনবান হইবে। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিদ্যাদানের স্থলে বিদ্যা-ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও এ ব্যবসায় বেশ চলিতেছে, তিনি যথা-সর্বস্ব পণ করিয়া এ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজ কাল লোকে এই পথে যথাসর্বস্বের সংস্থান করিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

of Bengal or any other Bank, in the name of a Member and the Secretary.

33. Surplus assets shall be appopriated to the benefit of the Institution in such manner as the Committee of Management may decide upon.

সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া পরে সম্ভ্রান্ত সদস্যগণের কাহারো সহায়তা পাইবার যথেষ্ট আশা পাইয়া বিনা বেতনে কালেজ ক্লাশ খুলিয়া ছিলেন। কার্যও আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ঘোর পরিতাপের বিষয় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। এইরূপে ব্যর্থকাম হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পশ্চাদপদ হইবার লোক ছিলেন না, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রতি বৎসরই আশাতীত সন্তোষজনক হওয়াতে কালেজ খুলিয়া বালকগণের উচ্চ শিক্ষালাভ সুলভ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়তই তাঁহার মনে জাগরূক রহিল। তিনি কর্মক্ষেত্রে ও বিশ্রামে, স্বজনমণ্ডলীতে ও নির্জনে সর্বদাই ইহার সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর ক্রমে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের লোকান্তর গমনে মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউসনের সমগ্র দায়িত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর পতিত হইল। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একাকী মেট্রপলিটনের সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সর্ববিধ কল্যাণ-সাধন করিয়া আসিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ও বাৎসরিক পরীক্ষার ফল সর্বদাই বেশ সন্তোষজনক হইলেও ইহার সম্যক্‌ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদায় নিজ হইতে অর্থব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যালয়ের এত অধিক অর্থ সর্বদা থাকিত না, যে তাঁহার মনের মতো কার্যগুলি সে অর্থে সুসম্পাদিত হয়। মেট্রপলিটনের শিক্ষকগণ অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক অধিক বেতন পাইতেন, তিনি বিদ্যালয়ের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত বা ক্রয় করাইতেন, সে সকল দ্রব্য তাঁহার পছন্দমতো করাইতে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সেকালে ও একালে অনেক সময় নিজ হইতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে একদিন এক মুহূর্তের জন্যও বিদ্যালয়ের সঞ্চিত অর্থে আত্মোদর পূরণ চেষ্টার কল্পনাও করেন নাই। কত সময়ে হাজার হাজার টাকা বিদ্যালয়ের তহবিলে মজুত থাকিত, কিন্তু পারিশ্রমিক বলিয়া একটি পয়সা কখনও বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে আত্মসাৎ করেন নাই। তিনি যে লোভশূন্য ব্যক্তি ছিলেন, এই ঘটনাই তাহার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (৮)

১৮৭২ খৃস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই বিদ্যালয়ের কার্যের সম্যক সুবিধা সাধনের জন্য মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ও আপনাকে লইয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি

৮ The present authorities say in their printed declaration that, 'He (the Pundit) never made any profit out of the income of the Institution. He did, however, take loans occasionally from the fund of the Institution, but the same was always repaid.'

গঠন করেন এবং এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবার জন্য উপরিউক্ত তিন জনের স্বাক্ষরিত আর একখানি আবেদন পত্র দ্বিতীয়বার প্রেরণ করেন। এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সুপরিচিত সদস্য, রাজা রমানাথ ঠাকুর ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই আবেদন পত্র (৯) প্রেরণ করিয়া তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিশ্চিন্ত না থাকার কারণ এই যে তাঁহার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাঙ্গালী উভয় পক্ষই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরাজ সদস্যগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই উদ্যম সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সহকারী সভাপতি ( Vice Chancellor ). ই. সি. বেলি মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহাতে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সে পত্রখানি এই:

ই. সি. বেলি মহোদয় সমীপে—

প্রিয় মহাশয়,

আপনাকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে আমাদের বিদ্যালয় হইতে এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবার প্রার্থনাসূচক পত্রখানি সিণ্ডিকেটের অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। একথা বলা বাহুল্য যে, আপনার সহায়তা লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে, কখনই আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হইতাম না। গত বৎসর আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই বলিয়া এ বিষয়ে গত বৎসর কোনো চেষ্টাই করি নাই, আমি জানি না, সেনেটের অন্যান্য সদস্যগণ এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করেন, কিন্তু আপনাকে জানাই যে আমাদের পক্ষীয় একজন মিস্টার সটক্লিফ ও মিস্টার এটকিনসন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এটকিনসন সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে যদিও প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার আপত্তি আছে, তথাপি তিনি আমাদের প্রার্থনাপত্র মঞ্জুর হওয়ার পথে বাধা জন্মাইবেন না। যদি সদস্যগণ উচ্চশিক্ষা দান বিষয়ে দেশীয় অধ্যাপকগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে অসম্মত হন, সেরূপ স্থলে আমি আপনাকে এইটি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে সংস্কৃত কালেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে, কিন্তু তথায় দেশীয় শিক্ষকগণের দ্বারাই এ পর্যন্ত সে কার্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, আমরাও আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য ঐ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। আমার এই বিশ্বাস যে, সুবিবেচনা ও বিশেষ সতর্কতা সহকারে নির্বাচন করিলে, দেশীয় শিক্ষক-গণ উচ্চশিক্ষা দানে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা সূত্রে যদি জানা যায় যে, ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য ইংরাজ অধ্যাপক নিযুক্ত করা ভিন্ন উপায় নাই, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তদ্রূপ কোনো উপযুক্ত

৯ এই সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পরিশিষ্টে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ইংরাজ অধ্যাপক নিযুক্ত করিব, বিদ্যালয়টির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই আমাদের একমাত্রলক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য সিদ্ধিরপথে কোনোপ্রকার সদুপায় অবলম্বনে ত্রুটি হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কিরূপ বেতন দেওয়া হইবে, আমার বোধ হয়, কেহ কেহ তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর আমি যেরূপ অর্থ বুঝি, তাহাতে এই সকল আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। নিয়োগকারী ও নিযুক্ত ব্যক্তিগণের উপর সে বিষয়েরমীমাংসা করিবার ভারথাকাই উচিত। শিক্ষকদিগের উপযুক্ততা ও বিদ্যালয়ের অর্থের উপযুক্ত ব্যয় এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কার্য করিব। আমি আমার জীবনে প্রায় সমগ্র সময় বিদ্যালয় পরিচালন কার্যে নিয়োগ করিয়া আসিতেছি। এরূপ স্থলে আমি আশা করি, শিক্ষক নিযুক্ত করা এবং তাঁহাদের বেতন নির্ধারণ করিবার ভার আমার উপর থাকিলেই ভাল হয়।

আমাদের এই বিদ্যালয়টিকে হাই স্কুলে পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাকে অধিক আর কি বুঝাইব। মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থগণ ১২ টাকা মাসিক বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে ছেলেদের পড়াইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্য দিকে ধর্ম বিষয়ে মত পরিবর্তনের আশঙ্কা নিবন্ধন তাঁহারা মিশনারী কালেজে বালকদিগকে পাঠান না। তদ্রূপ উভয় সংকটস্থলে অধিকাংশ বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালেজে প্রবেশ করিবার ষোল আনা ইচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও পড়িতে পায় না। তাহাদের পক্ষে এই বিদ্যালয় মহোপকার সাধন করিবে।

এই বিদ্যালয়ের পরিচালনভার জজ দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং আমার উপর ন্যস্ত আছে। উচ্চশিক্ষা দিবার উপযোগী সুব্যবস্থা করিবার শক্তি সামর্থ্য বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সুবিধা আছে, কিন্তু তথাপি যদি কোনো প্রকার অভাব উপস্থিত হয়, আমরা নিজ হইতে তাহা পূরণ করিব। আমি বিশ্বাস করি, ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য বিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ক এই দায়িত্ব গ্রহণ করাতে বিশ্ববিদ্যালয় সন্তুষ্ট হইয়া কালেজ ক্লাসে খুলিবার অনুমতি দিবেন। নিবেদন ইতি তারিখ ২৭শে জানুয়ারি ১৮৭২।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন,

( স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

যাহা হউক বহু বাগবিতণ্ডার পর এই বৎসর হইতে মেট্রপলিটন ইন্‌স্টিটিউসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া এফ্‌. এ. পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণ করিবার অনুমতি পাইল। তদনুসারে ১৮৭৩।৭৪ দুই বৎসরে, কালেজের পাঠ সমাপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পাইয়া কালেজ ক্লাস খোলা হইল বটে, ছাত্রও অনেকগুলি হইল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়পদে পদে বাধা পাইতে লাগিলেন।

প্রথম বাধা সর্বসাধারণের ধারণা যে এ চেষ্টায় কোনো ফল হইবে না। কারণ এই যে, মেট্রপলিটনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযুক্ত শিক্ষক সে সময় পাওয়া সুকঠিন ব্যাপার ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টাতেও যে মেট্রপলিটন প্রবল হইয়া উঠিতে পারিবে এ বিশ্বাস তাঁহার বন্ধুগণেরও ছিল না। সুতরাং ছাত্রগণের মন ভাঙ্গিয়া যাওয়া অপরিহার্য। ছাত্রদিগের মনে কৃতকার্য হইবার পক্ষে সন্দেহ হওয়াতে, তাহারা আপনা হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে কালেজ ক্লাসের বালকগণের অভিভাবকগণও চিন্তিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অনেকে সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনাদের আশঙ্কার কথা জানাইয়াছেন। বিদ্যাসাগর জনরব উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু, স্বার্থ-সংসৃষ্ট লোকের কেহ আসিয়া বিরক্ত করিলে, তিনি চিন্তিত হইতেন। সকলকেই আশ্বাস বচনে বিদায় করিয়াও নিজে সর্বদা সভয়ে সদুপায় অবলম্বন করিতেন। এই অনুষ্ঠানের সিদ্ধি কল্পে তাঁহাকে যে পরিমাণ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, যেরূপ আগ্রহ সহকারে প্রতিদিন কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতে হইত, তাহার উপর তাঁহাকে প্রতিদিন এত নিরাশার কথা শুনিতে হইত, যে, তাহাতে তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে ঐরূপ বিভিন্ন প্রকার বিপদ ও নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যে তিল তিল করিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইত না। আকাশ-পথে ব্যবস্থাপিত মৎস্য চক্ষু ভেদ করিতে অনেক বীরবেশধারী রাজপুত্র গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণবেশধারী ভিখারী পার্থই কেবল সে দুরূহ কার্যে কৃতকার্য হইয়া দ্রুপদনন্দিনীর বরমাল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন ও বহুসংখ্যক রাজকুমারকে রণে পরাজিত করিয়া সুদুর্লভ নারীরত্ন দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভবিষ্যতের অন্ধকারময় আকাশ-পথে ব্যবস্থাপিত লক্ষ্যভেদ করিয়া—বহুসংখ্যক প্রবল পক্ষের প্রতিপক্ষতা উপেক্ষা করিয়া—বহু লোকের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, কীর্তি মন্দিরের পরম প্রিয়তমা কন্যা বিজয়-লক্ষ্মীকে লাভ করিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি তারিখে বিজয়লক্ষ্মী-লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যে প্রীতির উপহার বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের শেষভাগে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্যাসাগর পরিচালিত মেট্রপলিটন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের এফ্. এ. পরীক্ষার ফল যখন বাহির হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না। স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে খড়মাটাড়ের বিশ্রাম ভবনে বাস করিতেছিলেন। গেজেট বাহির হইলে পরীক্ষার ফল দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া অবিলম্বে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আনন্দ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বাদুড় বাগানে স্বগৃহে না উঠিয়া ঝামাপুকুরে পরীক্ষোত্তীর্ণ গুণবান্ যুবকের পিতৃগৃহে

উপস্থিত হইলেন। যুবক ও যুবকের পিতাকে ডাকাইলেন। সস্নেহে যোগেনবাবুকে বলিলেন, 'কি রে, ভয় পাইয়াছিলি যে.' তাঁহার পিতার পূর্ব উৎকণ্ঠার জন্য মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া যোগেনবাবুকে বলিলেন, 'তুই আমার বাড়ি যাস্' এই বলিয়া তিনি বাড়ি গেলেন। যোগেনবাবু উপস্থিত হইলে তিনি কি করিলেন শুনিতে চাও? সে ঘটনাটিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসের পরিচায়ক। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া নিজের বহুমূল্য পুস্তকের আলমারি খুলিলেন। বহু অর্থব্যয়ে স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত ও সুবর্ণ-লতাপাতা-মণ্ডিত উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান স্যার ওয়াল্টার স্কটের সমগ্র 'ওয়েভার্লি' উপন্যাসাবলী, যোগেনবাবুকে উপহার দিলেন। গ্রন্থাবলীর প্রথম পুস্তক ওয়েভার্লির প্রথম পৃষ্ঠায় যে কথাকয়টি তাঁহার হৃদয়ের গভীর আনন্দের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, আমরা তাহা তাঁহারই হস্তাক্ষরে যথাবৎ তুলিয়া দিলাম। তাঁহার কার্যকলাপের বিশেষত্ব এই যে, তিনি যখন যাহা করিতেন তাহাতে তাঁহার সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ঢালিয়া দিতেন বলিয়াই নিজের পছন্দমতো বাঁধান স্কটের গ্রন্থাবলী নিজের পুস্তাকাগার হইতে বাহির করিয়া গুণবান যুবককে উপহার দিলেন। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিদ্যাসাগর প্রদত্ত পুরস্কার প্রণতমস্তকে গ্রহণ করিয়া নিজেই অমর হইয়াছেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি কালেজ ক্লাস খোলা হইলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় পদে পদে বাধা পাইয়াছিলেন। দৃঢ়প্রকৃতি বিদ্যাসাগর একবার নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কালেজের সমস্ত বালককে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ, রোজ রোজ গোলমালে আবশ্যক নাই, তোরা কে কে চলে যেতে চাস্ বল, এখনই যা, আমি কালেজে ক্লাস চাই না। কেউ না থাকে সেও ভাল, তবু গোলমাল চাই না। আজ বলু, কে কে যাবি?' সকল বালকই নীরবে দণ্ডায়মান। কেহ কোনো কথা বলে না। তখন তাহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথম বালককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 'আমি আর কোথাও যাব না। একে একে সকল বালক তখনই সাহসে ভর করিয়া বলিল, 'আমরা পাস হই আর ফেল হই এখানেই থাকিব, অন্য কোথাও যাব না।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় খুশি হইয়া বলিলেন, 'তোদের জন্য আমার কি ভাবনা নাই, অন্য কালেজে পড়িলে যেমন পড়া হইত, এখানেও যাতে তা হয়, সে পক্ষে কোনো অভাব হবে না, তোরা লোকের কথায় নাচিস্ না।' (১০)

সটক্লিক সাহেব মেট্রপলিটনের আশ্চর্য কৃতকার্যতা সন্দর্শনে অবাক

---

১০ ভূতপূর্ব সুরভি ও পতাকা সম্পাদক ও হিতবাদীর ভূতপূর্ব সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি. এ. মহাশয় নিজে এই ঘটনা-সংসৃষ্ট ব্যক্তি। তাঁহারই নিকট মেট্রপলিটন কালেজের শৈশব ইতিহাস শুনিয়াছি।

হইয়া বলিয়াছেন, 'পণ্ডিত তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন।' (১১) কালেজের প্রথম বৎসরের পরীক্ষাতেই এমন সুফল ফলিল মেট্রপলিটন ত্বরিত গতিতে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহাতে মেট্রপলিটন কালেজের অক্ষয় কীর্তির সূত্রপাত হইয়াছে, যাহাতে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষার সুপ্রচার সাধিত হইয়াছে, যে কার্য সাধন দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্তমান শিক্ষাস্রোতকে বহু বিস্তৃত আকারে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, মেট্রপলিটনের সেই উচ্চ শিক্ষালাভের সর্বোচ্চ দ্বারটি ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে মেট্রপলিটন কালেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম ছাত্র প্রেরিত হয়। এই পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালেজ হইতে যে সকল ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা ও পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল। মোট ১৬ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। (১২) পরীক্ষায় ফল ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহ ও উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিপূর্বে নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন ইন্স্টিটিউসনের লাইব্রেরি করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের উদ্বৃত্ত অর্থে বহুমূল্য ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়, বিদ্যালয়ের অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সুন্দর ও বহুমূল্য করিতে লাগিলেন। শিক্ষকগণের উপর এইরূপ আদেশ ছিল যে তাঁহারা বালকগণকে প্রহার করিতে পারিবেন না। মিষ্ট কথায় শান্তভাবে সকলকে বিদ্যালয়ের নিয়মাধীন করিতে বলিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, স্কুল বিভাগের শিক্ষকগণ সে নিয়ম পালন করিতেন না। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু সেকালে তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। অপর শিক্ষকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ আদেশ পালন করিতেন না, তিনিও করিতেন না, প্রয়োজন মতো বালকগণকে প্রহার করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুসন্ধান করাতে তিনি তাহা স্বীকার করেন। এই অপরাধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়, অন্যান্য শিক্ষকেরা কি বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বলিতে পারি না।

শিক্ষকগণের বেতন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, মেট্রপলিটন্ ইন্স্টিটিউসন তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপায় স্বরূপ ছিল না। তিনি ইহাকে কামধেনুরূপে লালন-পালন করিয়া আত্ম-পুষ্টি সাধন করিতে কোনো দিন প্রয়াস পান নাই, বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি

---

১১ 'Pundit has done wonders.'

১২ বন্দ্যোপাধ্যায়—অন্নদাপ্রসাদ, কালীপদ, কুমুদনাথ, নন্দলাল। ভট্টাচার্য—অক্ষয়কুমার, শিবাপ্রসন্ন। চক্রবর্তী—যদুনাথ, কুঞ্জবিহারী, পূর্ণচন্দ্র। চট্টোপাধ্যায়—গোপালচন্দ্র। দত্ত—যোগেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র। মণ্ডল—প্রাণকৃষ্ণ। মৈত্র—হেমচন্দ্র। রায়—যজ্ঞেশ্বর। রায়চৌধুরী—আশুতোষ।

সাধনে ও তদ্দ্বারা স্বদেশী যুবক ও বালকবৃন্দের সুশিক্ষা লাভের সদুপায় উদ্ভাবনে সমস্ত অর্থই ব্যয় করিতেন, বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মহত্ব এই যে এতদিন একটি পয়সা বিদ্যালয় হইতে নিজে গ্রহণ করেন নাই, এতদপেক্ষা মহত্তর গুণ এই যে ইহার উন্নতিকল্পে কত সময়ে কত টাকা নিজ হইতে ব্যয় করিয়াছেন তাহা পাইবার প্রত্যাশা রাখেন নাই। এই জন্যই শিক্ষকগণের প্রতি সর্বদা যথেচ্ছ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। শিক্ষকগণের কেহ পীড়িত হইয়া কিছুকালের বিদায় প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার অন্ন সংস্থান না থাকিলে, পুরা বেতন ২।৩।৪ কি ৫ মাসের বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এরূপ সদাশয়তার প্রমাণ তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলীর অনেকেই দিবেন। কাহারও কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট হইলে, প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি তাহার পুরস্কারের আকার ধারণ করিত।

বিদ্যালয় পরিচালন কার্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল, কিরূপ লোক নিযুক্ত করিলে, সে সকল লোককে কিরূপ কার্যের ভার দিলে কিরূপ কার্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন এবং কিরূপ উপযুক্ত লোককে কত টাকা বেতন দিলে ভাল দেখায়, এ সকলই তিনি বুঝিতেন, কিন্তু তাঁহার এক প্রধান গুণ বা প্রধান দোষ ছিল, তাহা এই যে তিনি যখন যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহার কথায় তিনি মরিতেন বাঁচিতেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার উপর ষোল আনা কর্তৃত্ব করিতেন, এইরূপ লোকদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সময়ে সময়ে না জানিয়া লোকের প্রতি অল্পাধিক অবিচার করিয়াছেন, এরূপ অবিচার স্থলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও প্রীতি নিবন্ধন দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরবে দণ্ডভোগ করিতেন, অপর কেহ কেহ স্পষ্ট বাক্যে তাঁহার বিবেচনার দোষ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত যে একেবারেই বিরল তাহা নহে। পরলোক গমনের অল্পদিন পূর্বে তিনি কোনো এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার লিখিত মন্তব্যের মধ্যে সে ভাবের আভাস দিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসী ব্যক্তির কথায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে অথবা বিনাদোষে অপরাধী স্থির করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের পক্ষে গভীর আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল। তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন: 'পূর্বে সকল লোককে সৎ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সরলভাবে লোককে বিশ্বাস করিয়া এ জীবনে পদে পদে প্রবঞ্চিত হইয়াছি, শেষে দেখি যে 'ঠিক বাছতে গাঁ ওজড়', কেউ আর বাদ যায় না। আমি আগে ছিলাম মতিলাল শীল, এখন হইয়াছি দ্বারকানাথ ঠাকুর,' অর্থাৎ মতিলাল শীল অপরিচিত স্থলে লোককে ভাল বলিয়াই স্থির করিতেন, আর দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিচিত স্থলে ঠিক তাহার বিপরীত ধরিয়া রাখিতেন, ক্রমে যাহাকে ভাল দেখিতেন, তাহাকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এই কথার মধ্যে তাঁহার লোককে বিশ্বাস করিয়া

পদে পদে বঞ্চিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি দীর্ঘকাল এরূপে লোকের দ্বারা বিপন্ন হইয়াও সহজে সাবধান হইতে পারিতেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি হৃদয়প্রবণ লোক ছিলেন, সহজে লোকের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, এইজন্য তাঁহাকে জীবনব্যাপী ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে, কোনো' দিনই তাঁহার দুঃখের বিরাম 'হয় নাই।

এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে কালেজের কার্য সম্পাদনে কালেজটি উত্তরোত্তর উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন পক্ষে তিনি কয়েকজন শিক্ষাদানে নিপুণ পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাভাজন শিক্ষকের সহায়তা লাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে দলে দলে ছাত্র সমাগম ও তদ্দারা আর্থিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে ১৮৯২ খৃস্টাব্দ (১৩) পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কৃতকার্যতার তালিকা এতৎসহ প্রদান করিলাম। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে মেট্রপলিটন হইতে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রথম ছাত্র প্রেরিত হয়। ১২ বৎসরে ৪৯৮টি যুবক উক্ত বিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ন হইয়াছেন এবং ৩৩টি যুবক এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে গড়েপ্রত্যেক বৎসর৪.৫০টি, বি. এ. এবং ২.৭৫ এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দ হইতে এম্, এ-র পরিবর্তে বি. এ. পরীক্ষাতেই অনার্স (honours) দিবার ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ পর্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে মেট্রপলিটন হইতে মোট ৮৬ জন অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। গুণানুসারে ইংরাজীতে একবার দ্বিতীয়, একবার চতুর্থ ও অষ্টম, একবার পঞ্চম একবার সপ্তম ও আর একবার পঞ্চম স্থান অধিকার করে। অঙ্ক বিদ্যায় একবারদ্বিতীয়, একবারচতুর্থ ও আরএকবার পঞ্চম স্থান অধিকার করে। মনোবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে একবার চতুর্থ, অপর বার পঞ্চম স্থান লাভ করে। ইতিহাসে একবার প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বি. এল্. পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা পত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিগৃহীত হইলে পর, মেট্রপলিটন হইতে ১৮৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে ৫১৩ জন বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গড়ে প্রতি বৎসরে পড়িল ৪২.৭৫, ইহাদের মধ্য হইতে (১৮৮৩, ৮৫, ৮৬, খৃস্টাব্দে) তিনটি ছাত্র পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দৃষ্টে জানা যায় যে, এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী সুফল গভর্নমেণ্ট কালেজঃভিন্ন অন্য কোথাও

---

১৩ ইহার পূর্ব বৎসরে তাঁহার লোকান্তরে গমন হইলেও ১৮৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার পরিশ্রমের ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তরিত। সুতরাং মেট্রপলিটনের জন্য প্রাণপাত করিয়া খাটিবার লোক নাই, উক্ত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যাপক ও সম্প্রতি লোকান্তরিত অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ( N. N. Ghose Esqr. ) বিদ্যাসাগর-বিয়োগে শোক প্রকাশার্থে আহূত সভায় বলিয়াছিলেন, 'তিনি ইদানিং প্রায়ই অসুস্থ ও শয্যাগত থাকিতেন, কিন্তু যদি দৈবাৎ তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য হইত, তবে তাঁহার দুর্ব্বল চরণ দুখানি তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে কালেজ অভিমুখে লইয়া যাইত।' (১৪) এরূপ প্রাণের জিনিস ভাবিয়া স্বদেশের হিতোদ্দেশে বিদ্যালয়ের সেবা কয়জন করিতে পারে? অর্থে স্বদেশানুরাগ জন্মায় না। ঈর্ষাপরায়ণতায় স্বদেশের হিতসাধনেচ্ছার সুকোমল অঙ্কুরের উদ্গম হয় না। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরোপকার সাধনে অগ্রসর হইলেই কেবল উল্লিখিতরূপ সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। স্যার রমেশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু যত্নের বিদ্যালয়টির বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণের অগ্রণীরূপে দণ্ডায়মান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে, তাঁহার অবসরও আছে। তিনি বঙ্গ জননীর সুসন্তান, সুসন্তানের ন্যায় মায়ের অন্যতম সুসন্তানের আরব্ধ কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গতি রক্ষায় যদি যত্নপর হন, তবে মেট্রপলিটন পূর্ব্বের ন্যায় গৌরব-স্ফীত বক্ষে অল্পপরিচয় দানে সক্ষম হইবে।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া অবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় সমান অনুরাগের সহিত ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইবে এই ভরসায় তিনি ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় জামাতা বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী বি. এ. মহাশয়কে মেট্রপলিটনের সম্পাদকের কার্য্যভার অর্পণ করেন, তৎপরে ক্রমে তাঁহার কার্য্যকুশলতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। সূর্য্যবাবু ১৩ বৎসর কাল মেট্রপলিটনের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে কালেজের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এত দিনের পুরাতন কর্ম্মচারী জামাতাকে বিদায় দিবার সময়ে যেরূপ ব্যবহার করিলে ভাল দেখাইত, তাহা করিতে পারেন নাই। তিনি যে ইচ্ছা পূর্ব্বক করেন নাই, তাহা নহে—তাঁহার কালেজের অধ্যক্ষ জামাতাকে এইরূপ নির্ম্মমভাবে বিদায় দিবার সময়েও তিনি আপন প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কোনো কারণে কাহারও উপর বিরক্ত হইবার সময়ে পুত্র, কন্যা, জামাতা কি শ্যালক—এ বিচার করিয়া, পরের বেলা এক রকম ও আত্মীয়ের বেলা আর এক রকম বিরক্ত হওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিরক্ত হইতেন। এবং তাঁহার

---

১৪ আমরা সে সভায় উপস্থিত ছিলাম, তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

কলাও সর্বত্র একরূপেই হইত। অপর কোনো যোগ্য ব্যক্তি কালেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত থাকিয়া বিরাগভাজন হইলে তিনি যাহা করিতেন, জামাতার বেলাও তাহাই করিয়াছেন। তিনি যে আমাদের মতো দশজন লোক হইতে সম্পূর্ণ-রূপে ভিন্ন উপকরণে গঠিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর কেহ কেহ মেট্রপলিটন ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়নচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রাপ্য নহে, এই উপলক্ষ করিয়া বৃহৎ একটি গোলযোগের সূত্রপাত করিলেন। এই গোলযোগের মীমাংসার জন্য গোলযোগকারিগণ আদালতের সাহায্য গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণবাবুর সুবিবেচনায় আদালত পর্যন্ত যাইবার প্রযোজন হয় নাই। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় প্রভৃতি বহুসংখ্যক গণ্যমান্য মহাশয়দিগের হস্তে নারায়ণবাবু বিদ্যালয়ের বর্তমান কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটনকে আপনার সম্পত্তি ভাবিতেন কি না? তিনি যে ভাবে তাঁহার অপরাপর সম্পত্তির ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার কোনো সম্পত্তিকেই তিনি বিশেষভাবে আপনার ভাবিতেন না। যে ভাবে অন্যান্য সম্পত্তি নিজের ভাবিয়াছেন, মেট্রপলিটনকেও ঠিক সেইভাবে নিজের ভাবিয়াছেন। পার্থক্য এই, অন্যান্য সম্পত্তিজাত অর্থে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের দেহধারণে সহায়তা করিয়াছে, মেট্রপলিটনের সম্পত্তিতে তিনি কখনো পুষ্টদেহ হন নাই। মেট্রপলিটন নিজের সম্পত্তিই দশ জনের সেবায় লাগাইয়াছেন। যাঁহারা মেট্রপলিটনের অপর দশ জন স্বত্বাধিকারী উপস্থিত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ত তাঁহাদের মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, মেট্রপলিটনের সুবৃহৎ বাটী নির্মাণের সময়ে যে রাশীকৃত টাকা ঋণ করিয়াছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি উক্ত খতে লিখিয়াছিলেন যে, ঋণ পরিশোধ হইবার পূর্বে, তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বত্বভুক্ত মেট্রপলিটনের জমি ও তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণের সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইবে। তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ—এই দলিলের মর্মানুসারে কার্য করিতে বাধ্য রহিলেন। (১৫) যে ঋণ পরিশোধ করিতে তিনি

---

১৫ 'In this deey Pundit says that he had not created any other encumbrance upon the land, that he is the absolute proprietor of the same and that the creditor will be entitled to realise the debt from the land pledged and from any other property belonging to him, and that he and his heirs will be bound be the deed. Extract taken from the statement published by the present authorities.

এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা চিরজীবন বাধ্য, যে বাটী নির্মাণ করিবার জন্য তিনি আপনাকে ও নিজ উত্তরাধিকারিগণকে দায়ী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ঋণ পরিশোধের জন্য মেট্রপলিটনের ভূমি ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তিও বিক্রয় হইতে পারিত এবং তাহাতেও ঋণ পরিশোধ না হইলে, উত্তরাধিকারিগণ চিরজীবন ঋণভার বহন করিতে বাধ্য হইতেন, সেই সম্পত্তির পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থায় আর পাঁচ জনের দাবী করিতে আসা এবং সেইরূপ দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য ছুটাছুটি করা কি মহতের লক্ষণ? দেহের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া ও জীবনের চিন্তা স্রোতের রেণু রেণু অর্পণ করিয়া যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটনের গঠন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন—যখন বর্ষার ঘনতীক্ষ্ম বারিধারা কেবল তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল, তখন কেহ সুহৃৎ বেশে পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই! যখন তিনি খত লিখিয়া আপনার ও উত্তরাধিকারিগণের সর্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন কেহ অগ্রসর হইতে পারেন নাই! তখন মেট্রপলিটনের নূতন উত্তরাধিকারিগণ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া বিদ্যাসাগর কৃত পর্বত পরিমাণ ঋণভার আপনারা পরিশোধ করিবার ভার লইয়া বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই! যদি সমগ্র সম্পত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর নহে, তবে নারায়ণ-বাবুকে সুবৃহৎ অট্টালিকাসহ ভূমির স্বত্বাধিকারী স্বীকার করিয়া কালেজের বাবদ চিরদিনের জন্য মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি দিবার প্রয়োজন কি? প্রকৃত কথা এই যে, কয়েক জন নূতন স্বত্বাধিকারী উপস্থিত হইলেও ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাদের দাবী তত প্রবল বলিয়া বোধ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটনকে নিজের সম্পত্তি মনে করিতেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, পরলোক গমনের পূর্বে তিনি যে কমিটি করিয়া তাঁহাদের হস্তে কালেজের ভারার্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন অত্যধিক অসুস্থতা বশতঃ সে ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। মেট্রপলিটনের বর্তমান অভিভাবকগণ তাঁহাদের বিবরণীতে সেকথার উল্লেখও করিয়াছেন! সেই কমিটি যদি গঠিত হইত, এবং সে কমিটি গঠিত হইলে, যাঁহাদের উপর কার্যের ভার পড়িত, তাঁহারা যদি নিজ নিজ ধর্মবুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য করিতেন তাহা হইলে কি নূতন স্বত্বাধিকারীদিগের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত? সেরূপ কমিটি গঠিত হইলে পর, তাঁহাদের সমক্ষে কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না, অগ্রসর হইলেও তাহাতে কোনো ফল ফলিত না। এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যালয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ সম্পত্তিই ছিল, তিনিও তাহাই মনে করিতেন কিন্তু চিরদিন ঐ সম্পত্তি পরার্থেই রাখিয়াছিলেন।

এদেশীয় যুবকগণকে শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিলে অধিক

পরিমাণে সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সর্বদাই বলিতেন 'বালকগণের সুশিক্ষা লাভ পিতা মাতা ও গৃহশিক্ষার উপর নির্ভর করে।' এই সম্বন্ধে একবার একস্থানে কথাবার্তা হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে একজন বলিলেন 'জেনারেল এসেম্বলীতে আজ কাল ভাল পড়া হইতেছে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'উ হুঁ, সে কথা ঠিক নহে',—অপর ব্যক্তি বলিলেন, 'কেন মহাশয়?' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন: 'আমি যখন ইন্‌স্পেক্টরি কার্য করিতাম, সেই সময় একবার মেদিনীপুর অঞ্চলে পথে যাইতে যাইতে এক স্থানে নদী পার হইতে হয়। সেখানে পার হওয়ার ব্যবস্থা বড় সুন্দর। একখানি ডোঙা একগাছি লগিতে (বাঁশ) বাঁধা থাকে। ঘাটে পারের পয়সাটি পাটনীকে দিয়া নিজে নৌকায় উঠিয়া লগিগাছি উঠাইয়া নিজে দুই চারি ধাক্কা দিয়া পরপারে গিয়া উঠিতে হইত। পরপারে গিয়া লগিতে নৌকাখানি আট্‌কাইয়া রাখিয়া লোক নিজের কাজে চলিয়া যাইত। আবার যখন ওপার হইতে কেহ আসিত সে ঐরূপ উপায়ে এপারে আসিয়া পাটনীকে পয়সা দিয়া চলিয়া যাইত। আমাদের দেশে এই যে সব কালেজ আছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ পয়সাটি ফেল, নিজে লগি ঠেল, পার হয়ে চলে যাও।' (১৬)

আর এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারিগণের শিক্ষার পরিমাণ ও লাভালাভ বিষয়ে কথাবার্তা হইতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন: 'দেশে শিক্ষা বিস্তার কিছুই হয় নাই। কেমন হয়েছে জান, একবার শুনিয়াছিলাম যে বিলাত হইতে একরকম কল আসিতেছে, তাতে একদিকে একটি বাছুর (গোবৎসা) আর একদিকে কতকগুলো আক (ইক্ষু দণ্ড) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তারপর ক্রমে একদিকে আক হইতে রস—রস হইতে গুড়, গুড় হইতে চিনি প্রভৃতি প্রক্রিয়া, অন্যদিকে গোবৎসার ক্রমোন্নতি হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে ছানা প্রভৃতি প্রক্রিয়া যোগে সন্দেশ তৈয়ার হইতেছে। ১০। ১৫ জন লোক, নানাবিধ ছাপা হাতে কলের মুখে বসিয়া সন্দেশের পাক হইতে নানাবিধ আকারের সন্দেশ প্রস্তুত করিতেছে। সন্দেশের রং ও ছাপ দেখিয়া লোক মোহিত হইয়া যাইতেছে। আর তার ছাঁচই বা কত প্রকার! কেহ বা তালশাঁস, কেহ বা আঁব, কেহ বা আতা, কেহ বা গোলাপজাম প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু চাকিয়া দেখ, সবগুলিরই একই তার, একই স্বাদ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভিয়ানও ঠিক সেইরূপ একপাকে তৈয়ারী মাল, কোনটিতে বা এম. এ. কোনটিতে বা বি. এ. কোনটিতে বা এল. এ কোনটিতে বা এণ্ট্রেন্সের ছাপ দেওয়া আছে,

---

১৬ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট এই গল্পটি শুনিয়াছি।

যখন চাকিতে যাই, তখন দেখি সবই এক পাকের জিনিস।' (১৭) যে শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের দেশের লোক গৌরবে স্ফীতবক্ষ, তিনি সে শিক্ষার অসারতা যথেষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহার পরিবর্তন অসম্ভব বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহাকে গভীর আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি।

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি এই শিক্ষার বিস্তারেই দেশের কথঞ্চিৎ কল্যাণ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং লোকসমাজের সেই কল্যাণসাধন স্মরণ করিয়াই নিয়ত ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইয়া দেশে সুশিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়া, আমরা বিষয়ান্তরে অগ্রসর হইব। বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন ও বালকগণকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার উপযোগী গ্রন্থ প্রনয়নে উৎসাহদান ও উৎকৃষ্ট পুস্তক নির্বাচনমানসে গভর্নমেণ্ট যখন সর্বপ্রথমে সেণ্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটি (Central Text Book Committee) গঠন করেন, তখন সে সময়ের শিক্ষাবিভাগীয় ডাইরেক্টর এটকিন্‌সন্‌ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সে পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই দুখানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

১১ই জুলাই ১৮৭৩

'শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমীপে

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠিত হইতেছে, তাহাতে আপনার নামটি দিবার অনুমতি দিবেন কি? বাঙ্গালা ও ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকের তদন্ত ও পরীক্ষা করাই কমিটির কার্য হইবে, এই জন্যই এই কমিটিতে যোগ্যতর দেশীয় সুপণ্ডিতগণের সহায়তা লাভ নিতান্ত আবশ্যক। এই কারনে আপনি আমাদের এই কার্যের সহায়তা করিতে সম্মত হইলে, আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হইব। (১৮)

আপনার বিশ্বাসভাজন

ডব্লিউ. এস. এট্‌কিন্‌সন্‌'

কলিকাতা ১৩ই জুলাই ১৮৭৩

---

১৭ মেট্রপলিটনের শিক্ষক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র বাবু ব্রজনাথ দে মহাশয়ের নিকট এই গল্পটি শুনিয়াছি।

July 11-73,

১৮ Pundit Iswar Chandra Sarma

My dear Pundit,

Will you allow me to add your name to the Committee upon school books? The enquiries of the Committee are to be extended to Vernacular school books as well as English,

ডব্লিউ. এস. এট্‌কিন্‌সন্‌ মহোদয় সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১১ই তারিখের পত্রোত্তরে জানাইতেছি যে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন কমিটির সভ্য হইবার প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মত হইতাম। কিন্তু দুটি কারণে আমি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অপারগ হইতেছি। উক্ত কমিটি যে সকল পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিবেন, আমি গ্রন্থাকাররূপে সে সকলের ফলভোগী হইব, এরূপ স্থলে ঐ কমিটিতে বিচারকরূপে আমার আসন গ্রহণ করা, কোনো ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হইবে না। এতদ্ভিন্ন আমার এরূপ মনে হয় যে, আমি কমিটির সভ্যরূপে উপস্থিত থাকিলে, আমার পুস্তকাদি সম্বন্ধে অন্যের সম্পূর্ণ মুক্তভাবে মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইবে। এরূপ স্থলে আমি কোনো মতেই আমাকে উক্ত কমিটির সভ্যপদ গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছি না। এবং আমার অনুরোধ যে সে জন্য আপনি আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। (১৯)

আপনার বিশ্বাসভাজন
( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

---

and it is therefore necessary to secure the help of the best native scholars.

I shall be much obliged if you will give us the benefit of your service.

Sincerely yours,
(Sd) W. S. Atkinson.
13th July 1873

১৯ W. S. Atkinson, Esqr, M. A.

My dear sir,

In reply to yours of the 11th instant I beg to inform you that I would have gladly accepted your invitation to serve in the School Book Committee, but on two considerations I feel constrained to decline it. As an author I am directly interested in the decision of the Committee, and I do not therefore think it right to take a part in their deliberations. Besides, I am inclined to think that my presence in the Committee may interfere with a free and unreserved discussion of the merits and demerits of the books. I hope you will therefore kindly excuse me if I cannot persuade myself to comply with your request.

Yours sincerely,
( Sd ) Iswar Chandra Sarma.

এদেশীয় লোকমণ্ডলীর শিক্ষালাভও জ্ঞানোন্নতিসাধনের জন্য তিনি কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে শ্রম করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উল্লিখিত পত্রখানিই তাহার সুন্দর নিদর্শন স্থল। তিনি মেট্রপলিটনের ধনভাণ্ডার হইতে কোনো দিন একটি পয়সা গ্রহণ না করিয়া এবং পাঠ্য নির্বাচন কমিটির (Central Text Book Committee) গঠন কালে ইহার অধিনায়কত্বে নিমন্ত্রিত হইয়াও স্বার্থ ও পরার্থের সংগ্রামে, পাছে অজ্ঞাতসারেও স্বার্থরক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হন, এই ভয়ে ডাইরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি বর্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ নীতিরই খর্বতা, সপ্রমাণ করিয়া ন্যায় ও নিষ্ঠার সুদৃঢ় স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। স্বার্থপরতার সূক্ষ্ম ও সুচিক্কন মসলিন-পরিশোভিত বর্তমান সভ্যতাভিমানী বঙ্গসন্তান বিদ্যাসাগর-চরণে কি আত্মবলি দিতে ও সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইয়া কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে শিখিবেন না? ইহাতেও যদি আমরা না শিখি, তবে আর শিখিব কোথায়? আমাদের সত্য সত্যই দুর্ভাগ্য যে এরূপ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে থাকিতেও স্বদেশের নানাবিধ হিতসাধনের চেষ্টা, বিপাকে পড়িয়া বিপথে পরিচালিত হইতেছে। দুঃখ এই যে, কিশোর কাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপবিত্র নবীন দেহে এত স্বার্থপরতার কলঙ্করেখা পাত হইয়াছে। সহৃদয় সাহিত্য-সেবকমণ্ডলী যদি দয়া করিয়া বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পান তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সুখ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের আগ্রহ কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগ ও উদ্যমের ফলস্বরূপ মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউসন ঐরূপ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ের পিতৃস্থানীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সর্ব প্রথমে সাধারণ ব্রহ্মসমাজের অগ্রণীদল (২০) সিটি কালেজের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে সিটি কালেজ ত্বরায় আত্ম-পোষণে সক্ষম হইয়া উঠে। ক্রমে রিপণ কালেজ ও অন্যান্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কালেজের (২১) অভ্যুদয় ও উন্নতি সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছে।

---

২০ শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাশ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়-গণের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে সিটি কালেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

২১ রিপণ কালেজ একমাত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত আলবার্ট কালেজ, বিলাত প্রত্যাগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু পরিচালিত বঙ্গবাসী কালেজ, মেট্রপলিটনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম বসু প্রতিষ্ঠিত সেনট্রাল ইনস্টিটিউসন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ কলিকাতার বাহিরে ও নানা স্থানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বহু-সংখ্যক কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দরিদ্র বঙ্গের বহুসংখ্যক নিরুপায় ছাত্র মণ্ডলীর উচ্চশিক্ষা লাভ ও জ্ঞানোপার্জনের পথ সুপরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই সকলের মূল। বহুদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও দেশীয়দিগের পরিচালিত কালেজের(২২) অভিভাবকগণ ইহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। ঐ সকল বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য কিছু করেন এরূপ প্রত্যাশা করা কি অন্যায়? বিদ্যাসাগর-স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বয়ং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আধুনিক বাঙ্গালার সর্বপ্রধান সুহৃদ ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষায় যাঁহারা প্রয়াস পাইবেন, তাঁহারা তদ্দারা আত্মপ্রসাদ ও অমরত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। অর্থের সদ্ব্যয় করিবার এরূপ সুযোগ অধিক পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, তাঁহাদের ইচ্ছা থাকিলে স্বদেশবৎসল বঙ্গবীর বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষা অতি সহজ কথা।

---

২২ পুণ্যশ্লোকা মহারানী স্বর্ণময়ী সি. আই. ই. মহোদয়া পরিচালিত বহরমপুর কালেজ, মহারাজাধিরাজ কুচবিহারাধিপতি প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কালেজ, মহারাজ বর্ধমানাধিপের প্রতিষ্ঠিত রাজ কালেজ, ঢাকায় জগন্নাথ কালেজ, উত্তরপাড়া কালেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কালেজ, ভাগলপুর তেজনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত কালেজ, বেহার ন্যাসানেল কালেজ, নড়াইল ভিক্টোরিয়া কালেজ, শ্রীহট্ট এম্. সি. কালেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কালেজ, পাবনা কালেজ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## দশম অধ্যায় ।। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে

১৮৩৫ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পরিণয় পাশে আবন্ধ হন। তাঁহার শৈশব ও বাল্য জীবন যথাবৎ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহে তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সূচনা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে রসজ্ঞ লোক হইবেন, বিবাহ রজনীতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে, কোনো বন্ধুর গৃহে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, নানা প্রকার হাস্যরসের অবতারণায় লোক যখন আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন ঃ 'আজকাল বিবাহে আর তেমন আমোদ নাই। বরকেও তেমন সংকট পরীক্ষায় আজকাল আর পড়িতে হয় না।' ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুদিগের কেহ কেহ সে কালের গল্প এক-আধটা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন ঃ 'এখন আর কি আছে? সে কালে বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক'নে খুঁজিয়া লইতে হইত। ছাদনা তলায় দৃষ্টির সময়ে একটি বার চারিচক্ষে দেখা হয় কিনা সন্দেহ, সেই দেখায় বাসর ঘরে আসিয়া ক'নে খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ কঠিন কাজ! আমার বিবাহের সময়ে বাসর ঘরে পা দিতে না দিতে আমাকে বলিল, 'তোমার ক নে খুঁজিয়া বাহির কর।' ক'নে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে শুনিয়া মহা মুশকিলে পড়িলাম। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে আমার উপর ক'নে খুঁজিয়া লইবার হুকুম হইল; আমি দেখিলাম সেই মেয়ের দঙ্গলের ভিতর থেকে আমার সেই অপরিচিতা অর্ধাঙ্গিনীকে খুঁজিয়া বাহির করা আমার কর্ম নয়—আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে আমারই বয়সের বেশ একটি টুকটুকে ফরসা মেয়েকে ধরিয়া বলিলাম, 'এই আমার ক'নে।' যেমন ধরা অমনি এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোথা দিয়া পলাইবে, তার পথ পায় না। আমি যাকে ধরিছি, তাকে খুবই ধরিছি, তার আর পলাইবার উপায় নাই। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'তুমিই আমার ক'নে তোমাকে হলেই আমার ঘর চলবে। আমি আর অন্য ক'নে চাই না।' সে মেয়েটি ত বাপরে মারে গেলুমরে বলিয়া চীৎকার করুক। গিন্নীবান্নী গোছ দুই-একজন নিকটে আসিয়া বলিল, 'ও তোমার ক'নে নয়, ওকে ছেড়ে দাও।' আমি বলিলাম, 'ছাড়িব কেন? খুঁজে নিতে বলেছ, আমি খুজিয়া এইটিকেই বাহির করিয়াছি এইটি হ'লেই আমার বেশ মনের মতো হবে।' তারপর সেই মেয়েটি হাতে পায়ে ধরিয়া বলিল, 'আচ্ছা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার ক'নে বা'র ক'রে দিচ্চি।' তখন আপনারাই ক'নে আনিয়া হাজির করিল।' বিবাহ-বাসর-সংকটে বিদ্যাসাগর

মহাশয় পরিহাসপ্রিয় আত্মীয়-স্বজনের হাতে এইরূপে নিস্তার পাইলেন আর কেহ বড় তাঁহাকে নাড়া-চাড়া দিল না।

অতি অল্প বয়স হইতেই সুযোগ পাইলেই ঈশ্বরচন্দ্রের রসিকতার তাল ফাঁক যাইত না। কালেজে কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় একবার 'গোপালায় নমোহস্তু মে' এইটিকে চতুর্থ চরণ করিয়া সকলকে শ্লোক রচনা করিতে বলিলে, তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মহাশয়, কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব? এক গোপাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, আর এক গোপাল বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন! এ দুজনের কোনটি?' ছাত্রের এই সুসঙ্গত রহস্যজাত হাস্য-তরঙ্গে যোগ দিয়া পণ্ডিত বলিলেন, 'বেশ বেশ, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহিত জীবণের দীর্ঘ কালের মধ্যে প্রথম চৌদ্দ বৎসর নিরতিশয় অশান্তির মধ্যে কাটিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নবীনা বধূর সন্তানাদি হওয়াতে পরিবারের সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং যে কোনো লোক যখনই কোনো ঔষধাদির কথা বলিয়াছে, প্রবীণারা তাহাই বধূমাতাকেখাওয়াইয়াছেন। পরিশেষে ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের কার্তিক মাসের শেষ দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পিতার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়)। তৎপরে ক্রমান্বয়ে চারিটি কন্যা সন্তান হয়। জ্যেষ্ঠা হেমলতা, মধ্যমা কুমুদিনী, তৃতীয়া বিনোদিনী ও কনিষ্ঠা শরৎকুমারী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত পিতৃমাতৃবৎসল ছিলেন। তাঁহার পিতৃভক্তি ও মাতৃপূজার কিঞ্চিৎ আভাষ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পিতৃমাতৃসেবার যে চিত্র অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক, তাহার তুলনায় সে আভাস কিছুই নহে। জনক জননীকে সুখী করা তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। নিজের নানাবিধ সুখের চিন্তাকে তিনি পিতামাতার তৃপ্তি বিধানের জন্য অবাধে বলি দিতে পারিতেন। একে ত বাল্যকাল হইতেই এরূপভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, নিজের সুখের দিকে কোনো দিনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। চিরকাল আত্মনিগ্রহ ও আত্মশাসনের অধীন হইয়া চলিয়াছিলেন; পরন্তু কোথাও কোনো প্রকার সুখের কারণ বিদ্যমান থাকিলে পিতামাতার অনুরোধে সেটুকুও বিসর্জন দিতেন। এই জন্য অনেক সময়ে তাঁহার পারিবারিক সুখ ভোগের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতামাতাকে চিরদিন দেবতা বোধে পূজা করিয়াছেন। পিতৃমাতৃপূজায় আজ কাল তাঁহার তুল্য অনুরাগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবতার আদেশে, দেবসেবক যেরূপ আত্মনিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি পিতামাতার আদেশে তাহাই করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিরতিশয় নির্বন্ধতায় বাধ্য হইয়া পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহকর্তারূপে গৃহের ও অভিভাবকরূপে প্রতিবেশীগণের তাবৎ কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর জননী গৃহিণীরূপে পরিবারবর্গের ও আত্মীয়রূপে প্রতিবেশীগণের সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় অবস্থান পূর্বক কাজকর্ম করিতেন এবং একান্নবর্তী পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য যখন যত টাকার প্রয়োজন হইত, তাহার সরবরাহ করিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, কখন কখন জননী, পত্নী

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়)
এক পুত্র ও তিন কন্যা

২ জেষ্ঠ্যা কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও
(জ্যেষ্ঠ্য জামাতা বাবু গোপালচন্দ্র সমাজপতি
দুই পুত্র—শ্রীমান সুরেশচন্দ্র, শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র

৩ মধ্যমা কন্যা শ্রীমতি কুমুদিনী দেবী ও
(মধ্যম জামাতা) অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
তিন পুত্র ও চারি কন্যা

৪ তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ও
(তৃতীয় জামাতা) বাবু সূর্যকুমার অধিকারী
তিন পুত্র ও চারি কন্যা

৫ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ও
(কনিষ্ঠ জামাতা) বাবু কার্তিকেয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দুই পুত্র ও এক কন্যা

ও পুত্র কন্যাসহ কলিকাতায় বাস করিতেন, কিন্তু পিতামাতার জীবদ্দশায় ও তৎপরে, বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকাল একাকীকলিকাতায় বাসকরিতেন। তদীয় পত্নীও পুত্রকন্যাসহ বীরসিংহের বাড়িতেই অনেক সময়ে বাস করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের স্ত্রীর ও পুত্রকন্যার সেবা অপেক্ষা অপর দশ জনের সেবাই অধিক করিয়াছেন। কোনো প্রয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটী গমন করিলে পরিবারবর্গের অপেক্ষা প্রতিবেশীবৃন্দের ও অপরিচিত বিপন্ন গ্রাম্য লোকদিগের অধিকতর আনন্দ হইত, কারণ তাহারা স্ব-স্ব অভিপ্রেত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অসুবিধা ও বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিত। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানে ঔষধ, নূতন কাপড়ের বস্তা

আর চকচকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও পয়সা সর্বদাই সঙ্গে থাকিত। দরিদ্রজনের তিনটি অভাব—ঔষধ, অন্ন ও বস্ত্র ; লোকের এই অভাব মোচনে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সদা মুক্তভাবে অপেক্ষা করিত। বীরসিংহ ও তৎসন্নিহিত পল্লী সমূহের কুটীরে এইরূপ ধন বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হইলে পর একবার তথায় তাঁহার অবস্থানকালে, কতকগুলি দুষ্টলোক সমবেত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে ডাকাতি করে। দস্যুদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে অনেক টাকা পাইবে। বাটীতে সে সময়ে অনেক লোক। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সময়ে দলবদ্ধ দস্যুগণের সমাগমে সকলেই ভয়ে জড়সড়। ৪০। ৫০ জন লোক দস্যুবৃত্তির উত্তেজনায় সদরদ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া, সকলেই পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পিতা মাতা ও পরিবার পরিজনসহ বিদ্যাসাগর মহাশয় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। ডাকাইতেরা তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, পাইলে কিছু টাকা আদায় করিত। তাঁহাকে না পাইয়া গৃহের সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বিপন্ন বিদ্যাসাগর সেই রাত্রিতেই ঘাটাল থানায় সংবাদ পাঠাইলেন। প্রাতঃকালে কলির অবতার ধড়াচূড়া বংশীধারী পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া দেখা দিলেন। বীরসিংহে হাজির হইয়াই সর্বাগ্রে দক্ষিণার ব্যবস্থা নাই দেখিয়া তাঁহার মেজাজটা একটু বেশী গরম হইল। প্রবীণ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে বলিলেন 'আপনি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া আপনার মর্যাদা রাখিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু দিতে পারি না। (১) এই বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উদয়গঞ্জ ও খড়ারে সংসারে নিত্য ব্যবহার্য থালা, ঘটি বাটি প্রভৃতি ক্রয় করিতে গেলেন। বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজের সহোদরগুলিকে ও পাড়ার যুবকবৃন্দকে লইয়া বাটীর সম্মুখে সুবিস্তৃত মাঠে কপাটিখেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেমন নিশ্চিন্ত ভাব! সংসারের সর্ববিধ ভার মাথার উপর পড়িলেও বিপদের মধ্যে কেমন বাল্য সরলতা সুরক্ষিত! ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ ধৃষ্টতা দর্শনে যুগাবতার দারোগা সাহেবের সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল, তিনি বলিলেন ঃ 'এ বামুনের (ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের) এত কি জোর যে, আমার মুখের উপর জবাব দেয় যে এক পয়সাও দিব না!' আর ঐ বামুনের অজ্ঞাতনামা জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে আঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন ঃ 'ইহাও অতি আশ্চর্যের বিষয়, ঐ ছোঁড়াটা (বিদ্যাসাগর মহাশয়) কি রকমের লোক ; কাল ডাকাতি হইয়াছে আজ সকালেই বাটীর সম্মুখে কপাটি খেলিতেছে!' নিকটবর্তী গ্রামের ফাঁড়িদার বলিল ঃ 'হুজুর উনি সামান্য লোক নহেন ; উনি বাড়ি আসিলে জাহানাবাদের ডেপুটি বাবু আসিয়া ইহার সহিত সাক্ষাৎ

---

১ সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবন চরিত, ৯৩ পৃষ্ঠা।

করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। শুনা যায় যে বড় লাট ও ছোট লাটের সহিতও ইহার বন্ধুত্ব আছে।' (২) অবতীর্ণ প্রভু তাঁবেদার ফাঁড়িদারের জবানবন্দী শুনিয়া গর্বিত মস্তক নত করিল সে ভীষণ ভ্রূকুটির তরঙ্গরেখা তাঁহার ললাট প্রান্তে বিলীন হইল। মহারাণীর প্রবল প্রতিনিধি-বাবুর সুবঙ্কিম বদনমণ্ডলের উত্তেজনা ঘন কালিমায় পরিণত হইল, বাবুসাহেবের মুখে আর কথা সরে না, বিন্দু বিন্দু ঘর্মও মুক্তামালার ন্যায় সে বিষাদভরা ললাটের শোভা বর্ধন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভীরু না হইলে সুযোগ পাইবামাত্র দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করে না। আবার দুর্বলপীড়ক প্রবলের শক্তি সামর্থ্যের কল্পনাতেও অবসন্ন হইয়া পড়িবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। আমাদের এই অজ্ঞাতনামা বীরকেশরী সভয়ে ও নতমস্তকে বিনা দক্ষিণায় লেজ গুটাইলেন। কায়ক্লেশে কার্য শেষ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন এবং নিজের আড্ডায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এই ডাকাইতির পর হইতেই পাঠকের পূর্ব পরিচিত সর্দার শ্রীমন্ত গৃহ-রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় আসিলে, যখন ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন প্রসঙ্গক্রমে বীরসিংহের বাটীতে ডাকাইত পড়ার কথা উঠিল, ছোট লাট সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'আপনার বাটীতে ডাকাইত পড়িল, আর আপনি তাহাদিগকে বাধা না দিয়া, পরিজনসহ পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন? এ ত ভয়ানক কাপুরুষতা।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেনঃ 'আপনারা মজার লোক, প্রাণ লইয়া পালাইয়াছিলাম তাতে বলিলেন 'কাপুরুষ' আর ৪০। ৫০ জন দস্যুর সম্মুখে একা প্রাণ দিলে, বলিতেন 'তাই ত লোকটা বড় আহাম্মক, এত লোকের সামনে একা এগুয়ে মিথ্যা প্রাণটা দিল!' আপনাদের মনের মতো কাজ করা কঠিন, এগুলেও দোষ, পেছুলেও দোষ।'

বীরসিংহগ্রামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পাঠশালা উঠিয়া যায়, ঐ সকল পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ (৩) উদরান্নের জন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনাদের বিপদের কথা জানাইলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার শৈশব গুরুকে নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে বর্ণপরিচয় পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। অপর সকলের পূর্ব উপার্জন অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অন্য কোনো কোনো স্থানে কাজ কর্মের সুবিধা করিয়া দিলেন আর তাঁহাদিগকে উপক্রমণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ প্রভৃতি শিখাইবার ভার, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের উপর অর্পণ

২ সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবন চরিত, ৯৪ পৃষ্ঠা।

৩ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরচন্দ্র আচার্য, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

করিয়া বলিয়া দিলেন ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হইলে, অধিক বেতনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্যালয় নিযুক্ত করাইয়া দিবেন। (৪)

যে কোন কারণেই হউক, লোক বিপদে পড়িয়াছে শুনিলে, অতি সহজেই তাঁহার সুকোমল হৃদয় বিষাদিত হইত। তাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে পর-দুঃখ মোচন-বাসনার সুবিমল ধারা নিরন্তর কলস্রোতে প্রবাহিত হইত। বিপন্ন ব্যক্তি হস্ত প্রসারণ পূর্বক করুণা-কণার প্রার্থী হইবামাত্র, সেই সুনির্মল ধারায় প্রবাহিত মন্দাকিনীর প্রাণপ্রদ স্নিগ্ধবারি পানে শীতল হইতে পাইত। সেই সাধু প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই গ্রাম্য গুরুমহাশয়গণের বিপদের সংবাদ অবগত হইবামাত্র তাঁহাদের সুখ ও সুবিধা সাধন করিয়াছিলেন।

একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে সর্বদা যে সকল অসুবিধা সংঘটনের সম্ভাবনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃগৃহে সেরূপ অসুবিধার অভাব ছিল না; তবে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবিবেচনায় সে সকল অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমানে নিবারিত হইত। বিশেষতঃ পিতামাতার জীবদ্দশায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংসারের জন্য অর্থব্যয়ের ভার পিতার উপর এবং গৃহে গৃহিণীপনার ভার জননীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কোনো বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা করিতেন, তাহাই অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতেন। কিন্তু পিতামাতা উপযুক্ত জেষ্ঠ পুত্রের অভিপ্রায় না বুঝিয়া, প্রায় কোনো কাজ করিতেন না। পরস্পর পরস্পরের উপর এইরূপ নির্ভর করিলে, সংসারধর্মে সর্বদায় সুফল ফলিয়া থাকে।

ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পরম সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুই জনের সময়ে সময়ে বেশ মিঠেকড়া গোছের 'খুঁটিনাটি' 'টুগরোমুগরি' চলিত। ঠাকুরদাস একটু রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, আর ঠাক্‌রুনটি একটু এক সপ্তরে কলহের পথে পদার্পণ করিতেন। এজন্য সময়ে সময়ে কর্তা গিন্নীতেও মনোমালিন্য ঘটিত। তবে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। বিশেষতঃ গৃহিণীর ধৈর্যচ্যুতি হইলে, ঘনঘটাপূর্ণ আড়ম্বরে তিনি যখন চারিদিক কম্পিত করিয়া একাকিনী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিমানের সয্যায় শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মানভঞ্জনের এক মহৌষধের ব্যবস্থা-পত্র ঠাকুরদাসের পুঁটুলিতে থাকিত; তিনি প্রয়োজন মতো সেই ঔষধ সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করিবামাত্র মানভঞ্জন হইত। পাঠক যেন মনে করেন না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবীণ পিতা ঠাকুরদাস বৃন্দাবন-বিহারী কালাচাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। মানিনী ভগবতী দেবী — অভিমানে অঙ্গ ঢালিয়া নিজের কুঠরীতে প্রবেশ করিলে, ঠাকুরদাস ঔষধ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিতেন। যেমন পীড়া সেইরূপ ঔষধ চাই ত; ঔষধ সংগ্রহ না করিয়া গৃহে ফিরিতেন না। সেই ঔষধ একবার

৪ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ৯৮ পৃষ্ঠা।

মাত্র প্রয়োগ করিলে ঠাকুরানীর মান ভঞ্জন হইত। ঠাকুরদাস যেখানে পাইতেন, একটি সুবৃহৎ রোহিত কি কাতলা মৎস সংগ্রহ করিয়া বাড়ি ফিরিতেন। মাছটাকে আনিয়া গৃহিণীর মান-মন্দিরের দ্বারদেশে কিংবা নিকটবর্তী কোনো স্থানে সজোরে আছাড় মারিয়া নিক্ষেপ করিতেন। মৎস্য-পাতের শব্দ হইতে না হইতে, গৃহিণী অশ্রুমোচন করিতে করিতে দ্বার খুলিতেন এবং বঁটি ও ছাই লইয়া মাছের দিকে অগ্রসর হইতেন। কর্তা মাছটি আছড়াইয়া ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান, গৃহিণী মৎস্যের নিকটস্থ হইতে না হইতে, কর্তা বলিলেন, 'খবরদার, মাছে হাত দিও না বলছি', গৃহিণী বলপূর্বক মাছ কুটিতে যাইতেন। কর্তা বাধা দিয়া বলিতেন, 'আমার হুকুম না পেলে, আমার মাছে যে হাত দেবে, সে টেরটি পাবে।' চোখে জল, মুখে হাসি ঠাকরুন অকুতোভয়ে রণে অগ্রসর হইতেন, আর ঠাকুরদাস, অশ্রুজলে—হাসির তরঙ্গলীলা দর্শনে মুগ্ধমনে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইতেন। নবীনা বধূরা অন্তরাল হইতে এই সুখের সম্মিলনে সন্দর্শনে হাস্যপূর্ণ আস্য অবগুণ্ঠনে লুকায়িত করিতেন। (৫)

ভগবতী দেবী এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন। পরিশ্রমে কখনও কাতর হইতেন না। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক, বা অধিক হউক, গৃহের পরিবারবর্গের সেবার্থে হউক বা অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যাতেই হউক, কখনও বিমুখ ছিলেন না। দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলকে আহার করাইয়াও নিজে সহজে আহার করিতেন না, ঐরূপ অনশনে অপেক্ষা করিবার তাৎপর্য এই যে, যদি কোনো উপবাসী অতিথি কিংবা কোনো দরিদ্র লোক এক মুষ্টি ভাতের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া আহারে বসিতেছেন, এমন সময়ে কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন ব্যঞ্জনে তাহার সেবা করিয়া, হয় নিজে উপবাসে কাটাইতেন, না হয় বধূদিগের কেহ পুনরায় তাঁহার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, তবে অপরাহ্নে আহার করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে নিজের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেন, বাজারের ফেরত লোক স্নানাহার না করিয়া কেহদ্বার অতিক্রম করে কি না। এরূপ লোককে যাইতে দেখিলে, ডাকিতেন, স্নান করিতে বলিতেন, স্নান করিলে পর একমুঠা ভাত খাইয়া, না হয় চারিটি জলপান লইয়া যাইতে বলিতেন।

---

৫ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'ঠাকুরমা বড় মাছ কুটিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। বড় মাছ পাইলে, কুটিতে, রাঁধিতে ও লোককে খাওয়াইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাই বড় মাছ পেলে তাঁহার দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, রাগ, দ্বেষ মুহূর্তমধ্যে সকলই তিরোহিত হইত।

এরূপ পরদুঃখকাতরা ও পরসেবাপরায়ণা রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে বিরাজ করিতেছেন, সেগৃহের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? সত্য সত্যই এইসুগৃহিণীর জীবদ্দশায় ঠাকুরদাসের সুবৃহৎ পরিবার ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভে পরম সুখে কাল কাটাইয়াছেন।

তিনি যে কেবল পতি, পুত্র কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিংবা তিনি যে কেবল গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিয়া দুঃখীজনের দুঃখ হরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে, পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান রোগ ছিল। সকল ঘরের সংবাদ লইতে ও সকলের অভাব মোচন করিতে সর্বদাই উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার এই ধাতটুকু ঈশ্বরচন্দ্র ষোল আনাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে জননীর কথা উপস্থিত করিলেই মাতৃভক্ত সন্তান বলিতেন: 'আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা (Glory) গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।' (৬)

ভগবতী দেবী বড় সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিপন্ন ব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল. যদি কোনো প্রকারে শুনিতে পাইতেন যে, কোনো অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সময়াতিপাত করিতেন। বীরসিংহ গ্রামের অনেক লোক এখনও সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি দিবারাত্রি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বাড়িতে পীড়িত লোকদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; অনেক সময়ে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে, তিনি কোনো অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথ্যের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, নিজে বাড়ি আসিয়া তাহাদের জন্য পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে অতিথি অভ্যাগত ও দরিদ্রের সেবা করিতেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার বাড়ির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বাটীর অন্য কাহারও কাহারও জন্য সেগুলি আসিয়াছিল। প্রতিবেশীগণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শীতে বড় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি

৬ এইটি তাঁহার নিজের উক্তি। মা ও ছেলে, প্রথম ভাগ, ৭৭ পৃষ্ঠা।

নাই যে, শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশী গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া; অবশিষ্ট কয়খানিও শেষে ঐরূপে নিতান্ত অসচ্ছল ও শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন ঃ 'ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীত বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।'

তদুত্তরে পুত্র জননীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'ঐরূপ ভাবাপন্ন লোক দিগকে ও বাড়ির লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখানি লেপ রাখিতে হইলে, সর্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইব লিখিবে। তোমার পত্র পাইলে আবশ্যক মতো লেপ পাঠাব।' ভগবতী দেবীর হৃদয়-পুষ্পোদ্যানে দয়াশীলতা ও পরদুঃখকাতরতার এরূপ কত যে মল্লিকা, মালতী, যূথী, গন্ধরাজ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না এবং তাহার বিস্তৃত উল্লেখের স্থানসঙ্কুলনও সম্ভবপর নহে।

হ্যারিসন সাহেব যখন ইনকম্ ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি একবার বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন। মায়ের নিকট অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেবের আগমন সংবাদ দিবামাত্র জননী বলিলেন, 'তা ছেলেটিকে একবার আমাদের বাড়িতে আনিবি না? তাকে একবার আমাদের বাড়িতে আনিয়া কিছু খাওয়াইলে ভাল হইত।' বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যারিসন সাহেবকে জননীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। সাহেব বলিলেন ঃ 'তিনি নিজে নিমন্ত্রণ না করিলে আমি যাইব না।' তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী স্বনামে যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পত্রখানি এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

অশেষগুণাশ্রয় শ্রীযুক্ত এচ্, এল্, হেরিসন মহোদয়
পরম কল্যাণভাজনেষু

সস্নেহসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শুনিলাম, আপনি সত্বর কলিকাতা প্রতিগমন করিবেন। আমার নিতান্ত মানস, দয়া করিয়া তৎপূর্বে একবার বীরসিংহের বাটীতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হই। প্রার্থনা এই, আমার বাসনা পরিপূরণে বিমুখ হইবেন না। ইতি ২রা ফাল্গুন ১২৭৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীভগবতী দেব্যাঃ।

সাহেবের আবদার পূর্ণ হইলে পর, সাহেব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বড়ই আহলাদিত হইলেন। নিজ হস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া সাহেবকে খাওয়াইতে বসিলেন। সাহেব আসিয়া এদেশীয় প্রথানুসারে ভূমিতে জানু পাতিয়া নত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ভগবতীদেবীও পুত্র-বাৎসল্য সহকারে আশীর্বাদ করিয়া এক্ এক্ করিয়া যেটির পর যেটি খাইতে হয়, তা নিজে নিকটে বসিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের এই উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন: 'আমি আপনার বাটীতে আসিয়া, এখানে আহার করিয়া, সর্বোপরি আপনার মায়ের করুণ স্বভাব ও আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি, চিরদিন এই স্মৃতি আমার মনপ্রাণ অধিকার করিয়া থাকিবে।'

প্রসঙ্গক্রমে হ্যারিসন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কত টাকা?' ভগবতী দেবী কমনীয়তার সলজ্জ আবরণে মুখকমল আবৃত করিয়া মধুমিষ্ট স্বরে বলিলেন: 'কেন, আমার চার ঘড়া ধন।' ঈশ্বরচন্দ্রকে ও সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটি পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, 'আমার এই চারি ঘড়া ধন।' হ্যারিসন সাহেব ভগবতী দেবীর এই সদুত্তর শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন: 'ইনি সামান্য স্ত্রীলোক নহেন। এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয়?' আমরাও বলি এরূপ উপকরণে গঠিত না হইলে কি এরূপ পুত্ররত্ন লাভ যার তার ভাগ্যে ঘটে?

বীরসিংহ অঞ্চলে এক প্রকার মেটে দোতালা ঘর প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মৃত্তিকানির্মিত গৃহ সকলের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হওয়ার উপযোগী বৃহৎ বাটীর মধ্যস্থলে ঐরূপ একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর গৃহ ছিল। হ্যারিসন সাহেব গৃহনির্মাণের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'পাকা বাড়ি এর কাছে হা'র মানিয়াছে।' (৭)

আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন, 'দেখ বাছা! তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ—এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরীব দুঃখী লোক প্রাণে মারা না যায়, তাহারা যেন তোমারে আপনার লোক মনে করিয়া সুখী হইতে পারে। তুমি সর্বদা সকলের কথা ভাল করিয়া শুনিবে—লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তুমি এমন ভাবে এখানে কাজ করিয়া যাইবে যে, তুমি চলিয়া গেলে এখানকার লোকে চিরদিন যেন তোমার নাম করে।

৭ আমরা বীরসিংহ হইতে এ সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

তুমি যাহাতে দুঃখীর বন্ধু হইয়া এখান হইতে যাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।'

হ্যারিসন সাহেব মেদিনীপুরে অবস্থানকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের উপদেশ মতো চলিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাই আজও মেদিনীপুরের লোক ভক্তি সহকারে তাঁহার সুনাম করিয়া থাকে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর শান্তমূর্তি লাবণ্যে ঢল ঢল করিত। আমরা পাঠকপাঠিকাগণের নয়নের তৃপ্তি বিধানার্থে সে দেবীমূর্তির প্রতিকৃতি এখানে প্রদান করিলাম। সেই চিত্র অংকনের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। পাইকপাড়া রাজবাটীতে হড্‌সন নামে একজন সাহেব চিত্রকর কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদাই সেখানে গতিবিধি ছিল। রাজারা তাঁহাকে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেকালের মূর্তি যে কত সুন্দর ও হৃদয় মুগ্ধকর ছিল, তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সে সময় প্রতিভায় উদ্ভাসিত মুখের প্রকৃতি লইবার জন্য হড্‌সন সাহেব বড়ই সাধ্য-সাধনা করেন। তিনি প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, পরিশেষে সাহেবের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া সম্মত হন, সেই চিত্রের প্রতিকৃতি পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হড্‌সন সাহেব চিত্র প্রস্তুত করিয়া পারিশ্রমিক কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও সাহেবকে টাকা লওয়াইতে পারেন নাই। রাজারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা এত অর্থ ব্যয় করিলাম কিন্তু বিনাব্যয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছবি তুলিয়া দিলে কেন?' সাহেব রাজাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'টাকার কাজে আর শখের কাজে অনেক প্রভেদ।' বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন সাহেবকে টাকা লওয়ান বড়ই কঠিন। লোকটি কিছু শক্ত লোক। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ত্বরায় পিতা-মাতাকে কলিকাতায় আনাইলেন এবং হড্‌সন সাহেবকে দিয়া বহু অর্থব্যয়ে তাঁহাদের দুই জনের দুইখানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন।

পিতা-মাতাকে কলিকাতায় আনাইয়া জননীকে বলিলেনঃ 'মা পাইকপাড়া রাজাদের বাড়িতে একজন খুব ভাল প'টো এসেছে তাহার দ্বারায় তোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই।'

মা। দূর্, আমার আবার ছবি কি হবে, ছি—ছি।

ঈ। ছবি কি তোমার জন্যে? ছবি আমার জন্যে; একখানা ছবি থাকিলে যখন যেখানে থাকি, প্রাণটা কেমন ক'র্‌লে একবার দেখবো।

মা (এ কথার আর জবাব নাই দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও) তবে তোর যা ইচ্ছা তাই কর্।

ঈ। সাহেবকে এখানে আনবো, না তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পারিবে?

মা। প'টো সাহেব! না বাপু আমি সাহেবের সামনে ছবি তোলাতে বস্‌তে পার্‌বো না।

ঈ। সে খুব ভাল লোক, আমার একখানা ছবি এঁকেছে, তার দাম নেয়নি, আমাকে খুব ভালবাসে, তার সামনে বস্‌তে দোষ নাই।

মা। তা তোর যা ইচ্ছা কর্‌, তবে আমি অন্য কোথাও যেতে পার্‌বো না বাবা, যা কর্‌বি এখানে কর্‌।

ঈ। সেখানে সব যোগাড় আছে। সে আড্ডা ভাঙ্গিয়া এখানে আন্‌তে গেলে, হয়ত ছবি ভাল হবে না।

মা। তুই যখন ধরিছিস্‌ তোকে এঁটে উঠতে পার্‌বো না। তা তোর যা ইচ্ছা কর্‌গে, গেলেও তোর সঙ্গে যাব ত। নিন্দে হ'লে লোকে ত আর আমার নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে কর্‌বে। বল্‌বে বিদ্যাসাগর মাকে পাক্‌পাড়া রাজবাড়ীতে ছবি তুলাইতে নিয়ে গিয়েছে। তা তোর সঙ্গে যাব। (৮)

কয়েক দিন যাতায়াত করিয়া পিতা-মাতার ছবি প্রস্তুত করাইলেন, প্রাপ্য অপেক্ষা সাহেবকে কিছু বেশীই দিলেন। ছবি দুখানি প্রস্তুত করাইয়া নিজের গৃহে পছন্দ মতো স্থানে বসাইলেন। ফরাসডাঙ্গা ও খরমাটাড়ের জন্য স্বতন্ত্র ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পিতামাতার জীবদ্দশায় ও তাঁহাদের লোকান্তর গমনের পর যখন যেখানে থাকিতেন, আমরণ পিতা মাতার মূর্তি সমক্ষে প্রণত হইয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। আমরা স্বচক্ষে তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াছি এবং ইহার সাক্ষ্য দিতেছি।

এই প্রবীণা গৃহিণী মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন: 'আমার মা বলিতেন, যে দেবতা আমি নিজ হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার কর্‌বে কেমন করে? বাঁশ খড়, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গড়ে পুজো করে কি ধর্ম হয়?' (৯) ইহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার ধর্মজ্ঞান কেমন স্বাভাবিক, কত সরল ও নির্মল ছিল।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্রকে ও জ্যেষ্ঠ পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া ইঁহারা কতকটা অন্যের শাসনের অতীত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার পিতাকে বলিলেন: 'আপনি না নিরামিষাশী? আপনাকে

---

৮ আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণটি শুনিয়াছিলাম।

৯ এই কথা বলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয়বর্গের কেহ আমার উপর কোপ-কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার নিজ মুখে ইহা শুনিয়াছি। তদীয় স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও (নারায়ণবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা) এই ভাবের কথা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছেন।

কে নিরামিষাশী বলে? আপনি দুটিবেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন। তবুও আপনি নিরামিষাশী!' কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পৌত্র উভয়েই বাল্যকালে ঠাকুরদাসের বিশেষ ভাবে চিহ্নিত সৈন্য ছিলেন।

এই ভাবে যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারের দিনগুলি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল, সেই সময়ে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশ জন্মভূমি ও স্বভবন ত্যাগ করিয়া কাশী বাসের মানস করিলেন, এবং শম্ভুচন্দ্রের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পীড়া নিবন্ধন মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ কান্দী গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র পত্রের দ্বারা পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত ভগ্ন ও বিষণ্ণ মনে অতি আকুলভাবে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই ঃ

'তিনি বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন তাহা কোনো ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে। স্বয়ং সমুদায় আহরণ করিয়া আপনার আহারাদি নির্বাহ করিবেন, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইবেক। যে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি এত পরিবার, তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে কাল হরণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? সুতরাং এই অবস্থায় তিনি একাকী কাশীতে বাস করিবেন, ইহা আমি কোনো মতে সহ্য করিতে পারিব না। সেরূপ করিলে তাহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। যদি তাঁহার সেবা ও পরিচর্যার নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলেও আমি কথঞ্চিৎ সম্মত হইতে পারি, নতুবা, তাঁহাকে একাকী পাঠাইয়া দিয়া আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিব, ইহা কোনো ক্রমেই ধর্ম নহে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি কোনো মতে আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না। যদি নিতান্তই তাঁহার যাইবার মানস হইয়া থাকে, এইরূপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। তুমি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে, যে পাছে আমার মনে দুঃখ হয়, এই খাতিরে তিনি অনেকবার অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণেও সেই খাতিরে আর কিছু সহ্য করুন; আমি সত্বর বাড়ি যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। সেখানে পৌঁছিলে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিব নতুবা অকস্মাৎ এরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলে এবং উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিয়া কাশী বাস করিলে, আমি মর্মান্তিক বেদনা পাইব। যাহা হউক যেরূপে পার আপাততঃ তাঁহার এ অভিপ্রায় রহিত করিবে এবং তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন এই সংবাদ সত্বর কান্দীতে আমার নিকট পাঠাইবে, যাবৎ এ সংবাদ না পাই তাবৎ আমার দুর্ভাবনা দূর হইবে না। ২।৪ দিন কোনো মতে এখান হইতে যাইতে পারিব না, নতুবা অদ্য আমি প্রস্থান করিতাম, যাহা হউক যেরূপে পার তাঁহাকে কোনোমতে

ক্ষান্ত করিবে, নিতান্ত ক্ষান্ত না হন, এই রবিবার বাড়ি হইতে আসিতে না দিয়া, আমাকে সংবাদ লিখিলে, আমি যেরূপে পারি বাটী যাইব। আমি কায়িক ভাল আছি, ইতি তারিখ ৩০শে অগ্রহায়ণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন যে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাশীবাসের প্রবল বাসনার মূলে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন বিশেষরূপে কার্য করিয়াছিল। একদিন ঠাকুরদাস রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, অতি ত্বরায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানা প্রকার বিপৎপাত হইবে। বীরসিংহের বাটী শ্মশান হইবে ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদরবিচ্ছেদ ও বন্ধুবিরোধ ঘটিবে। আত্মীয় স্বজন বিরূপ হইবে। এই সকল গ্লানিকর চিন্তার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরদাস ভাবিলেন, চারি দিক সুপ্রসন্ন থাকিতে থাকিতে গৃহ ত্যাগ করিয়া দেবধাম কাশীক্ষেত্রে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। তিনি ত্বরায় গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টা, অনেক সাধ্য সাধনা, বিস্তর কান্নাকাটি করিয়াও পিতার সংকল্পের বিপর্যয় ঘটাইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত বোধোদয়ে লিখিয়াছেন 'স্বপ্ন সকল সত্য নহে, অমূলক চিন্তা মাত্র।' কিন্তু তাঁহার পিতৃদেবের স্বপ্ন দর্শন কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত ঘটনার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পৈতৃক বাসভবন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আত্মীয় ও বন্ধু বিচ্ছেদের ত কথাই ছিল না।

এই পত্র প্রাপ্তি ও উহার সমগ্র অংশ পিতাকে শুনান হইলেও তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া কাশী বাসের জন্য পূর্ববৎ উৎসুক হইয়া রহিলেন। সুতরাং কান্দীতে ত্বরায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কর্তার মনের ব্যগ্রতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখা হইল। তিনিও সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া পিতার চরণ দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। কতক পাল্কীতে কতক পদব্রজে এইরূপে অকাতর পরিশ্রমে সমগ্র পথ অতিক্রম করিয়া গৃহে পেঁাছিলেন। পিতার সংকল্প ত্যাগ করাইতে বিধিমত চেষ্টা করিলেন, অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কান্না-কাটিও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পিতার প্রতিজ্ঞার বিপর্যয় ঘটিল না; অবশেষে নিরুপায় হইয়া ঠাকুরদাসের পরম প্রিয়পাত্র পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে লাগাইয়া দিলেন; নারায়ণচন্দ্রের কান্নাকাটি ও সঙ্গে যাওয়ার আবেদনেও বৃদ্ধের বিষম পণ ভাঙ্গিল না। (১০)

ঠাকুরদাস গৃহে অবস্থান করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিলেন; অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পথে এবং কলিকাতায় অবস্থানকালেও

---

১০ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু কোনো মতেই যখন পিতার অভিপ্রায় পরিবর্তিত হইল না, তখন সুখে স্বচ্ছন্দে কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কাশীতে পাঠান হইল। ঠাকুরদাস জীবনের অবশিষ্টকাল পরম সুখে কাশীতে অবস্থান পূর্বক শেষে বারাণসী ধামেই দেহত্যাগ করেন। পিতাকে কাশীতে পাঠানর পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে একটা স্থায়ী বিষাদের রেখাপাত হয়। তিনি সর্বদাই বিষন্ন ভাবে সময়াতিপাত করিতেন। অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে পিতার দূর দেশে অবস্থান নিবন্ধন একাকী অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতেন। কোনো প্রকার অসুবিধা কিংবা পীড়ার সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হইলেই, হয় নিজে যাইতেন, না হয়, তাঁহার সাহায্যার্থ কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেন। কোনো দিন কোনও কারণে এক মুহূর্তের জন্য পিতা-মাতার সুখ সাধনে উদাসীন হন নাই।

বীরসিংহে অবস্থানকালে ঠাকুরদাসের জননী দুর্গাদেবীর লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে সালিখায় গঙ্গাতীরে আনা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতামহীর শ্রাদ্ধকৃত্য উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পিতার সন্তোষ সম্পাদন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বলিয়া পিতামহীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পাছে কোনো ব্যাঘাত হয়, এজন্য সেইদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ছিলেন, সেরূপ আশঙ্কার কারণও ছিল। অনেকে শত্রুতাও করিয়াছিলেন, কিন্তু শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন, 'শ্রাদ্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সমাগম হইয়াছিল, বরদা পরগণার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব অন্যূন তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন এবং পর দিবস অন্নেও প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। ইহাতে পিতৃদেব পরম আহলাদিত হইয়াছিলেন। পর বৎসর সপিণ্ডন সময়েও দাদা পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা দিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণের নিমন্ত্রণার্থ প্রথম যে কবিতাটি প্রস্তুত হয়, তাহা দুর্বোধ্য দেখিয়া স্বয়ং এই সরল কবিতাটি লিখিয়া দেন—

'পৌষস্য পঞ্চবিংশাহে রবৌ মাতুঃ সপিণ্ডনং
কৃপয়া সাধ্যতাং ধীরৈর্বীরসিংহসমাগতৈঃ ॥'(১১)

বহুপরিবারে একত্র বাস নিতান্ত অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক বিবেচনা করিয়া তিনি সহোদরদের সকলের পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণের বন্দোবস্ত করেন। সকলে একত্র মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পৃথক পৃথক বাস করিয়া পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা ও সমবেদনা রক্ষা করিয়া চলা অশেষ গুণে মঙ্গলকর মনে করিতেন, তাই অশান্তির স্থানে শান্তি স্থাপনের অভিলাষী হইয়া সকলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দরিদ্র ও অসহায় বিদ্যার্থী বালকগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়

---

১১ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র প্রণীত জীবনচরিত, ৯৪৫। ৪৬ পৃষ্ঠা

এই যে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও তিনি কিছুতেই পারিবারিক শান্তি স্থাপনে সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পারিবারিক বিবিধ অশান্তির মধ্যে যখন তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা বিনষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দ ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় অগ্নি লাগিয়া বীরসিংহের পৈতৃক বাসভবন ভস্মীভূত হয়। সেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ কলিকাতায় পেঁাছিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে গমন করেন। সকলের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জননীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলেন। প্রবীণা গৃহিণী দরিদ্র, নিরাশ্রয়, বিদ্যার্থী বালকগণের বিপদ ও ক্লেশের উল্লেখ করিয়া প্রতিবেশীদিগের দুঃখ কষ্টের দোহাই দিয়া, অতিথি অভ্যাগতের অপরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া কলিকাতায় আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সহোদরদিগের কাহাকেও পরিজনসহ কোনো দিন ক্লেশ পাইতে হয় নাই, কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্বদা সমুচিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধহয় না; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ের অংশের প্রার্থী হইয়া আদালতে অগ্রসর হন। বলপূর্বক কিংবা অন্যায় করিয়া কেহ তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, ইহা বিদ্যাসাগর কোনো মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মকদ্দমা করা যখন স্থির হইল, তখন আদালতে না গিয়া শালিসী দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়ে একটাকা মূল্যের একখানি স্ট্যাম্প কাগজে একরার পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। এই একরার পত্রে মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাশ মহাশয়কে শালিসী মান্য করিয়া তাঁহাদিগের উপর সমগ্র বিচারভার অর্পণ করিলেন। মকদ্দমার বিচারের ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা-পত্রের কিয়দংশ: তিনি (বিদ্যাসাগর মহাশয়) দুই শত টাকা কর্জ করিয়া আনিয়া দেন, সেই দুই শত টাকা অবলম্বন করিয়া পুরাতন অক্ষর ও একটি অকর্মণ্য কাষ্ঠের প্রেস ক্রয় করিয়া ৺মদন-মোহন তর্কালংকার ও আমি উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালাবধি বেলা নয় ঘণ্টা পর্যন্ত, অপরাহ্নে পাঁচটার পর রাত্রি দশ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছাপাখানার কার্য নির্বাহ করিয়াছিলাম। (স্বাক্ষর) শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দীর কিয়দংশ:

৫। যে ২০০ শত টাকা কর্জ করিয়া ছাপাখানা করা হয়, তাহা

পরিশোধের দায় কাহার ছিল, বলিতে পারি না। তৎসম্বন্ধে তৎকালে কোনো কথোপকথন হয় নাই এবং সে প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয় নাই।

৬। ঐ ২০০ টাকা পরিশোধ করিবার দায়ীক থাকিবার, কি না থাকিবার ভার তৎকালে আমার মনেও উদয় হয় নাই।

৭। যখন অগ্রজ মহাশয় ঐ টাকা কর্জ করিয়া আনিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহার বাবত মহাজনের নিকট দায়িক থাকা আমার বিশ্বাস ছিল।

৩৪। সামান্য সামান্য ব্যয় তিনি করিতেন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া হইত না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণনা পত্রের কিয়দংশ : . ঐ যন্ত্রের সহিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখন কোনো সংস্রব নাই। তিনি কহিতেছেন সংস্কৃত যন্ত্রের সংস্থাপনে ও উন্নতি সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এজন্য উহাতে তাঁহার অংশ আছে, কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনও উক্তরূপ পরিশ্রম করিতে বলি নাই ও দেখি নাই। ···ইতি ২৫শে আশ্বিন ১২৭৫ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষী বাবু শ্যামাচরণ দে : ...বাদীর (দীনবন্ধু) স্বত্ব থাকা জানি না ও বাদাকে ছাপাখানায় পরিশ্রম করিতে দেখি নাই ও শুনি নাই। বাদী আমার নিকট যাতায়াত করিতেন, কখনও ছাপাখানায় পরিশ্রম করা সম্বন্ধে বলেন নাই।···

(স্বাক্ষর) শ্যামাচরণ দে

সাক্ষী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বাদীকে কখন পরিশ্রম করিতে দেখি নাই এবং বাদীর অংশ থাকা বাদী কি প্রতিবাদী, কি তর্কালঙ্কারের মুখে শুনি নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

মহামহিম শ্রীযুক্ত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয়েষু

শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবীত্যাগ পত্র; গত ১১ই অক্টোবর আপনাদিগের নিকট একবার, বর্ণনাপত্র ও ইসবনবীসির দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলাম কিন্তু সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিরোধ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে, সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার দাবী করিয়াছিলাম আমি সে দাবী পরিত্যাগ করিলাম। উত্তর কালে উক্ত সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমি বা আমার ওয়ারিসন কেহ কখনও কিছুমাত্র দাবী করি বা করে সে বাতিল ও নামঞ্জুর। ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৮

(স্বাক্ষর) শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচার : ...বাদী সংস্কৃত যন্ত্রে ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে তাঁহার স্বত্ব

ও অংশ থাকার দাবী পরিত্যাগ করিলেন। উত্তরকালে তিনি বা তাঁহার ওয়ারিসন কখন কিছুমাত্র দাবী করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ইত্যাদি বিবরণে দস্তবরদারী দাখিল করায় আর অধিক তদন্ত করা অনাবশ্যক হওয়ায় উভয় পক্ষের সাক্ষাতে

চূড়ান্ত আজ্ঞা হইল যে :

বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্‌ হয় এবং উভয় পক্ষকে এই ফয়ছালার এক এক খণ্ড নকল দেওয়া যায়। ইতি ১৮ই অক্টোবর ১৮৬৮

(SD) DWARKA NATH MITTRA
(SD) DOORGA MOHAN DASS'

এই ঘটনাতে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিফল চেষ্ট হইয়া কিছুকাল সহোদরের সাহায্য গ্রহণ স্থগিত রাখেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি গোপনে মধ্যম ভ্রাতৃবধূর অঞ্চলে সংসার খরচের টাকা বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া দিতেন : 'মা—এই নাও, দীনোকে বলো না, আমি জানি তোমাদের ক্লেশ হইতেছে, এই টাকায় সংসার খরচ চালাইবে।' দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন গোপনে এইরূপ সাহায্য গ্রহণের বিষয় অবগত হইয়া ঐ টাকা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফেরত দেওয়াইয়াছিলেন। (১২)

---

১২ ৺দীনবন্ধু সম্পর্কে বিবৃত বিষয়ে—শম্ভুচন্দ্র ও আমাতে বিশেষ মতবৈধ না থাকিলেও কি জন্য জানি না, তিনি সাধারণ সমীপে আমার অনভিজ্ঞতা পাড়িবার জন্য তাঁহার সমালোচনা পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন : 'অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থ একজন দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী পরম দয়ালু ও অমায়িক লোক ছিলেন।' আমি ত কই তাঁহার এই সকল গুণ-গৌরব অপহরণের প্রয়াস পাই নাই, বরং মৎপ্রণীত জীবনচরিতের প্রথম সংস্করণের ৪০৯ পৃষ্ঠার শেষাংশে লিখিয়াছি 'তিনি ( দীনবন্ধু ) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পরোপকার পরায়ণ ছিলেন। কলেরা প্রভৃতি দেশব্যাপী সংক্রামক পীড়ার সময়ে দীনবন্ধুও পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে লোকের সেবা করিয়া বেড়াইতেন। এই সকল গুণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।' কিন্তু শম্ভুচন্দ্র নিজে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে পূর্বোক্ত মকদ্দমা রুজু হইবার পূর্বে ১লা আশ্বিন তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছেন : 'মধ্যম দাদা মহাশয়ের ভয়ানক রাগ দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি ভাগ পাইবার উদ্যোগে আছেন, ভাগ পাইবার কিছু কারণ দেখি না।' তৎপরে ঐ মাসের ৪ঠার পত্রে লিখিতেছেন : 'এখানেও শুনিতেছি প্রেসের ভাগ লইবার অভিসন্ধি আছে, অনর্থক কেন পাগলামী করেন।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠদিগের প্রতি স্নেহাধিক্যের পরিচায়ক অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে লোকান্তরিত দীনবন্ধুর প্রতি অবিচার অতি অল্পই হইবে। কিন্তু কনিষ্ঠের অগ্রজানুরাগ ও তৃতীয়ের ৪২

এই সকল ঘটনার বহু পূর্বে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ডেপুটী মেজেস্ট্রেটী কর্মের জন্য জ্যেষ্ঠকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের সহোদরের চাকরির জন্য কেমন করিয়া ছোট লাটকে বলিবেন, তাই ভাবিয়া অস্থির। ২।৪ বার বলিবার মানস করিয়াও বলিতে পারিলেন না, শেষে সহোদরের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একদিন ছোট লাটকে বলিলেন, 'একটা কথা কয়দিন ধরিয়া বলিব মনে করি তা আর বলিতে পারি না।' ছোট লাট কথাটা জানিবার জন্য যেমন পীড়াপীড়ি করিলেন অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে কথা বলিবার প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। ছোট লাট যতই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাঁহার সে কথা বলিবার প্রবৃত্তি ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাটা কিছুতেই বলিতে পারিলেন না। সে দিন আর সে কথা বলা হইল না। সপ্তাহ কাল পরে যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখন ছোট লাট ঐ কথা শুনিবার জন্য আবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সাহেব বলিলেন, 'আজ আপনাকে আটক করিব।' শেষে বহু কষ্টে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যম সহোদরের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন ছোট লাট বলিলেনঃ 'এই কথাটা বলিতে এত নারাজ হইবার কারণ কি? এত দিনে বলিলেন যে কোন্ কালে চাকুরি হইয়া যাইত, হুগলিতে খালি ছিল।' পরে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, 'কোথাও খালি আছে কিনা জানিয়া আপনাকে লিখিব।' পরবর্তী সপ্তাহে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ডেপুটীর কর্মে নিযুক্ত হইয়া বরিশাল যাত্রা করিলেন। (১৩) দীনবন্ধু ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় পরোপকারপরায়ণ ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অগ্রজের ন্যায় তিনিও পারদর্শী হইয়াছিলেন। কলেরা প্রভৃতি দেশব্যাপী সংক্রামক পীড়ার সময়ে দীনবন্ধুও পাড়ায় পাড়ায়—গ্রামে গ্রামে লোকের সেবা করিয়া বেড়াইতেন। এই সকল গুণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সর্বদাই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

গৃহদাহের পর যখন বাটী গিয়াছিলেন, সেই সময়ে গ্রামের কেহ কেহ তাঁহাকে ইষ্টকনির্মিত বাটী প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন, তিনি স্বাভাবিক

---

বৎসর ব্যাপী জ্যেষ্ঠের সহকারিতার সুবৃহৎ বিজ্ঞাপন বহুবিধ মর্মপীড়াপ্রদ অনুষ্ঠানের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবে। তাই সেই সকল বিবরণের বর্ণন বিষয়ে আপাততঃ বিরত রহিলাম। শম্ভুচন্দ্র জনসমাজে নিজ নিষ্ঠার পরিচয় পাড়িতে পারেন কিন্তু যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংসার জীবনের মর্মস্থান পরীক্ষা করিবার মানদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট শম্ভুচন্দ্র ও অন্য অনেকে কৃপাপাত্র মাত্র।

গ্রন্থকার

১৩ হরিণশিশু সংসৃষ্ট ব্যাপার অসত্য না হইলেও উহা উঠাইয়া দিলাম, কারণ বিদ্যাসাগর জীবনীর সহিত তাহার কোনো সংস্রব নাই।

হাসিভরা মুখে বলিলেন, 'গরীব বামনের ছেলের পাকা বাড়ি লোকে শুনলে হাসবে যে। কোনো রকমে মাথা রাখিবার একটু স্থান হইলেই হইবে।' (১৪)

সেখানে জননীর ও অন্যান্য সকলের বাসের উপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করাইতে যে ব্যয় পড়িল, সে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু পূর্বোল্লিখিত হ্যারিসন সাহেব কর্তৃক প্রশংসিত সুন্দর গৃহখানি আর প্রস্তুত হইল না। সে বাটীর শোভা ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক সেই সুবৃহৎ গৃহখানি ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া এখনও বর্তমান আছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা-মাতা মোটা-মুটি, সাদা-সিধা লোক ছিলেন তাঁহারা পরিশ্রম করিতে, পুত্রের উপকার ও সেবা করিতে এবং সর্ব প্রকারের অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন। অলঙ্কারাদি পছন্দ করিতেন না। ঐ সকলকে দেশে দস্যু ও শত্রু বৃদ্ধির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন। বহুমূল্য অলঙ্কারাদির ব্যবহারে অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, দরিদ্রের প্রতি উপেক্ষার ভাব জন্মায় বলিয়া, অলঙ্কার পরিধানে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনভিমত ছিল। তাই গৃহে বধূরাও অলঙ্কারাদি পাইতেন না। বাবুয়ানা বাড়িবে বলিয়া মিহি সুতার কাপড় পছন্দ করিতেন না, দৈবাৎ কখনও কলিকাতা হইতে ঐরূপ উপাদেয় পরিধেয় আসিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্য লোকের সর্বপ্রকার সুখ ভোগের সুবিধা করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিলেও নিজে ঠিক পিতা-মাতার প্রদর্শিত পথে চিরদিন চলিয়াছেন। সখের জিনিস ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি কখনও তাঁহার মনে স্থান পাইত না। লোককে দিবার সময় ভাল কাপড়, ভাল খাবার, বাজারের বাছা বাছা জিনিস আনিতেন, কিন্তু নিজের বেলায় থান ধুতি, মোটা চাদর চটি জুতা, সামান্য আহার এই সকলেই সদা সন্তুষ্ট! তিনি সমগ্র জীবনে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, অন্যের হইলে সে ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে ধনবান লোকসমাজে গণনীয় ব্যক্তি হইত, কিন্তু তিনি স্বোপার্জিত ধনরাশি দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিয়া, নিজে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন, এবং আমরণ পিতৃপিতামহ প্রদর্শিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। ইহাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষত্ব। তিনি কোনো দিনই উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের উপযোগী পরিচ্ছদের অনুকরণ করেন নাই, গরীবের বন্ধুরূপে জনসমাজে বিচরণ করিতেন।

একবার বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে হুগলী জেলার কোনো এক গণ্ডগ্রামে গমন করেন। এই ঘটনার বহু পূর্বে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম পল্লীগ্রামের প্রান্তরে রাখাল বালকগণের কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত হইয়াছে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা, বৃদ্ধা বালিকা ও যুবতী সকলেই বিদ্যাসাগর-মূর্তি দেখিবার

---

১৪ বীরসিংহ সংলগ্ন পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের নিকট এই উক্তিটি শুনিয়াছি। কলিকাতায় তখন বাটী নির্মাণের কল্পনাও ছিল না।

জন্য লালায়িত। বেলা দশটা হইতে বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী গৃহস্থদের গৃহসকল স্ত্রীলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৃহের জানালায়, দ্বারের পার্শ্বে, ছাদের উপর, এমন কি প্রবীণারা পথের ধারে দণ্ডায়মানা। বিদ্যাসাগর আসিবেন আসিবেন করিয়া বিলম্ব হইয়া গেল। যাঁহারা ছাদে ও পথের ধারে আতপতাপে উত্তপ্ত হইতেছিলেন তাঁহাদের ক্লেশের সীমা ছিল না। বিদ্যাসাগর দেখিবার প্রবল আকাঙ্খা প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্যের সর্বজয়ী কিরণ রেখা সকলও পরাজয় করিয়াছে, এমন সময়ে একটা গোল উঠিল, 'বিদ্যাসাগর আসিতেছেন', চারিদিকে উৎসাহ ও আগ্রহ—স্কুলের ছেলেরা আপন আপন আসনে শান্তভাবে বসিতেছে, শিক্ষকেরা আপন আপন পরিচ্ছদ গুছাইয়া একবার ভাল করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, বাহিরে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান। মেয়েরা যে যেখানে ছিলেন, সেইখান হইতে অবগুণ্ঠন-দ্বার প্রশস্ত করিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর দেখিবার জন্য তাকাইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর আসিলেন, সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেয়েদের কেহই দেখিতে পাইলেন না। কেহই বিশ্বাস করিলেন না যে, বিদ্যাসাগর আসিলেন। কেহ দেখিতে পাইলেন না, কেন তাঁহার আশা বিশ্বাস করিলেন না? এক প্রবীণা অগ্রসর হইয়া সমাগত মণ্ডলীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: হ্যাঁ গা বিদ্দেসাগর কই? তিনি কি এলেন না?' তখন দলস্থ একজন বলিলেন: 'এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়।' বৃদ্ধা বিস্ময়বিষ্ফারিত নেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া বলিলেন: 'আ আমার পোড়া কপাল! এই মোটা চাদর গায়ে উড়ে বেয়ারা দেখিবার জন্য রোদে ভাজা ভাজা হলুম! না আছে গাড়ি, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা চাপকান!'(১৫) তাঁহাকে গরীব দুঃখী হইতে পৃথক করিবার কোনো উপায় ছিল না।

ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি, মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। (১৬) তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বিবাহ সমাপন মানসে বাটী গমন করেন। তিনি বাটী পৌঁছিলে ক্ষীরপাইবাসী হালদার মহাশয়েরা এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজে এরূপ ভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু যাহারা ইতিপূর্বে বহুবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ

১৫ একবার আমার পীড়ার সময়ে আমাকে দেখিতে আসিয়া আমাদের বাটীতেই কথা প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৬ ১২৭৬ সালের আষাঢ়ে এইটি ঘটিয়াছিল।

বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্যের সহায়তায় বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোনো সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী হৃষ্ট-চিত্তে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন: 'বীরসিংহের কয়েকজন প্রাচীন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মধ্যমাগ্রজ রাধানগর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে (বর কন্যাকে) আশ্রয় দিয়া (বিদ্যাসাগরের) বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া উহাদের বিবাহ কার্য সমাধা করেন।' (১৭) আমাদের বক্তব্য এই যে, 'বীরসিংহের কয়েকজন প্রাচীন' কি এক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত প্রাচীন মণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বাটীতে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিবার সাহস বিদ্যারত্ন ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবপর ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমার অগ্রজানুগত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিপ্রেত কার্য বীরসিংহে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে: শম্ভুচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। (১৮) উদ্যোগকর্তাদের অগ্রণী হইয়া, মৃত মধ্যমাগ্রজের স্কন্ধে সমগ্র দোষভাগ অর্পণ করা বিদ্যাসাগর-সহোদরের পক্ষে ভাল হয় নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিতে বলিতেছেন: 'এই বিবাহে অগ্রজ আন্তরিক কষ্টানুভব করেন, তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। (১৯) বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঘটনায় এরূপ দারুণ মর্মবেদনা পাইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রিয় জন্মভূমি,

---

১৭ সহোদর শম্ভুচন্দ্র নিজ প্রণীত জীবন চরিতের ২০৪ পৃষ্ঠায় মৃত দীনবন্ধুর স্কন্ধে ঐ অপ্রিয় ব্যাপারের সমগ্র দোষ ভাগ অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের দেশ ত্যাগের প্রকৃত কারণ ও তাহাতেতাঁহার নিজের পূর্ণ সংস্রবপ্রকাশিতহওয়ায় প্রতিবাদপুস্তকের (৫১ পৃঃ) দীনবন্ধুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পুত্র গোপালচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের উপর সমগ্র ভার চাপাইয়া নিজে দূরে থাকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঠক আমার পরবর্তী অনুসন্ধানের ফল পর পৃষ্ঠায় [ পৃ ৩৩৩ ] দেখিতে পাইবেন।

১৮ পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ মহাশয়ের উক্তি। তিনি নিজে বর্তমান এবং নিজে আমার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন।

১৯ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ২০৪ পৃঃ

সাধের বাড়ি-ঘর চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে সহোদরদিগকে ও সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া আসিলেন, 'তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে!' গদাধর পাল, গোপীনাথ সিংহ প্রভৃতি শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হওয়াও বিবাহে উপস্থিত হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সংবাদে কিঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২০) স্বদেশবৎসল ও জন্মভূমির সুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত ও চিরনির্বাসিত করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি বীরসিংহের যে কি অনিষ্ট সাধনই করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনায় শেষ হইবার নহে। যে দিন তিনি ম্লানবদনে ও অশ্রুপ্লাবিতবক্ষে জননী জন্মভূমির ক্রোড় শূন্য করিয়া প্রান্তর-প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেইদিনই বীরসিংহের সর্বনাশ সাধন হইয়াছিল। এই অপকর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে যে কি তীক্ষ্ম শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার নহে। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহারই উক্তিতে প্রকাশ পাইবে। শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থান কালে যখন ক্ষুদ্র পল্লী বীরসিংহের গ্রাম্য চিত্র সকল তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত, তখন প্রাণটি দেহ ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-শিবিকারোহণে বীরসিংহ অভিমুখে ছুটিত, তখন অজস্র-ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেন. এরূপ অশ্রুজল আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। অশ্রুপাত করিয়া দারুণ মনঃক্ষোভের পরিচায়ক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, 'আর সব শেষ হইয়াছে।' এই সময়ে একবার 'বীরসিংহ-জননীর

---

২০ শম্ভুচন্দ্র প্রতিবাদ পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ 'আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একান্ত বশীভূত।...অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং বিবাহে যাই নাই।' এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। গোপীনাথ সিংহ মহাশয় এখনও বর্তমান। তিনি নিজে আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়াছেন। আরও অনেকে বলিয়া থাকেন, কিন্তু সে সকল আপাততঃ ত্যাগ করিয়া একটি মাত্র উৎকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ

'ওঁ' নমঃ সর্বমঙ্গলায়ৈ ১৩০২—১৩ই ভাদ্র

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং

মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে 'পূজ্যপাদ আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তোমার বিবাহে লিপ্ত ছিলেন কি না।' তদুত্তরে আমি ধর্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি যে কেবল উক্ত মহাশয়েরই সম্পূর্ণ যত্ন এবং অনুগ্রহেই উহা নির্বাহিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরকালেই মনে থাকিবে। ইতি—

বশংবদ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্মা

পত্র' বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (২১)তাঁহার হস্তগত হয়। সেই পুস্তকান্তর্গত কাতরতার ভাবে তাঁহার কোমল হৃদয় আর্দ্র হয়; বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে বাটীর মেরামত কার্যও আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ও জন্মভূমি দর্শনের অবকাশ হয় নাই।

এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক নির্যাতননিবন্ধন কি দারুণ বিষাদ-বিষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় জর-জর হইয়াছিল, এবং তিনি সংসার-সুখে কতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াপড়িয়াছিলেন, বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন পূর্বক নির্জন-বাসের জন্য তাঁহার প্রাণ কিরূপ আকুল হইয়াছিল, নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্র তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। কোনো কোনো পত্র এবং কোনো পত্রের অংশ এখানে প্রদত্ত হইল:

শ্রীশ্রীহরিঃ, শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু—
প্রণতি পূর্বকং নিবেদনমিদম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণ-কালের জন্যেও সাংসারিক কোনো বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনো সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষত ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মতো নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোনো কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয় নির্বাহার্থে বার্ষিক দুইশত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কখন

---

২১ সেই স্বাক্ষরবিহীন পুস্তিকা নারায়ণবাবুর রচিত ও প্রেরিত বলিয়া জানা গিয়াছে। শম্ভুচন্দ্র বলেন, এই পুস্তিকার কথা সত্য নহে। সত্যকে অসত্য করা এবং অসত্যকে সত্য করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ বলিয়াই বোধ হয়, কারণ একখানি রেজিস্টারি মোড়কসহ উক্ত পুস্তিকা আমার নিকট রহিয়াছে। তাহাতে সেখানকার ডাকঘরের ঐ সময়ের সন তারিখ বিশিষ্ট মোহরের ছাপও আছে। শম্ভুচন্দ্র এবং অন্য যে কোনো ভদ্রলোক সত্য নির্ণয়ের জন্য তাহা দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অবাধে আসিয়া দেখিতে পারেন।

কোনো বিষয়ে আমায় কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন পত্রদ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনার শ্রীচরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

( স্বাক্ষর ) ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম

গুণালঙ্কৃত শ্রীমতি দিনময়ী দেবী কল্যাণীনিলয়েষু

শুভাশীর্বাদ পূর্বক মাবেদনমিদম্—

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।...এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখন কোনো দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনা পূর্বক চলিলে, তদ্দারা স্বচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

ক্রমান্বয়ে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃত্রয়কে ঐরূপ এক এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্রের সমগ্র ভাগের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে আমরা সেই সকল পত্রের কেবল বিশেষ বিশেষ অংশের উল্লেখ করিতেছি। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে ঃ 'এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মতো বিদায় লইতেছি, যদি কখন কোনো দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। যদি কখন কোনো বিষয় আমায় জানানো আবশ্যক বোধ কর, পত্র দ্বারা জানাইবে, আর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিক আনুকূল্য গ্রহণ অভিমত হইলে তদর্থে মাসে মাসে ৭০ টাকা পাঠাইতে পারি। এক কালীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।'

তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে ঃ 'এক্ষণে তোমাদের নিকট তোমার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ বিষয়ে যে আনুকূল্য করিতেছি, যতদিন আমার

অনুকূলভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রিয় সাধন করিতেন, তাহা হইলেও তিনি বোধ হয় সংসারে বিন্দুপ্রমাণ শান্তি অংশভাগের স্থান পাইতেন। কিন্তু তিনি কর্তব্যের আহ্বানে ও হৃদয়ের উত্তেজনায়, সংসার মরুভূমিতে,স্বার্থপরতার উত্তপ্ত কঙ্কর ও বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি করিয়াছেন। আর্ত ও বিপন্নের পার্শ্বে, ফোঁটা ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, আর সংসারের প্রবঞ্চনার হাতে নিপীড়িত হইয়া যখন প্রিয় পরিজনবর্গের সুশীতল ক্রোড়ে শান্তি লাভের আশায় ছুটিয়া গিয়াছেন, তখনই বাধা পাইয়াছেন, তখনই তাঁহার পিপাসার জল মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত হইয়াছে, আর অমনি ক্ষুব্ধহৃদয়ে ও ক্লান্তমনে শততাপে উত্তপ্ত সংসার প্রান্তরে বসিয়া পড়িয়াছেন—তাই ভগ্নমনে, শূন্যহৃদয়ে পিতামাতার নিকট, সহধর্মিণীর নিকট, সহোদরদিগের নিকট চির বিদায় চাহিয়াছেন। সে বিদায় প্রার্থনার মধ্যে কত বিনয়! সংসারসংঘর্ষণে কত সময়ে কত অপরাধ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে কেমন ক্ষমা প্রার্থনা!

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া ঐ সকল পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাঁহার সে চিত্তগ্লানির প্রকৃত পরিমাণ ও গুরুত্ব তাঁহার পিতৃদেব ভিন্ন অপর কেহই সুন্দররূপে বুঝিতে পারেন নাই। পিতার পত্রের প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রখানির কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইল ঃ 'আপনি লিখিয়াছেন, তুমি যে চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাও, এ অতি অনুচিত।' 'আর তুমি যে এমন সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, সে কেবল আমার মনে বেদনা জন্মান মাত্র।' এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে, সংসারের সংস্রব পরিত্যাগ করাতে আমার কোনো অংশে অণুমাত্রও ক্ষতি বোধ না হইয়া বরং সর্বাংশে সম্পূর্ণ লাভ বোধ হইয়াছে। এত দিন অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা ভোগ ও অহোরাত্র আন্তরিক যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, এক্ষণে সকল প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছি। অধিক আর কি নিবেদন করিব, আমার যেন নরকভোগের পর স্বর্গবাস লাভ হইয়াছে। এমন স্থলে আমার চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাওয়া হইতেছে, একথা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ে আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। অতঃপর আমি অনেক অংশে মনের সুখে কাল যাপন করিতে পারিব তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি এরূপ করাতে আপনকার মনে বেদনা জন্মান হইয়াছে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি, আমি বহুদিন অবধি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়াছি। তথাপি আমার নিতান্ত মানস ছিল, আপনকার ও জননীদেবীর জীবদ্দশা পর্যন্ত সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কালযাপন করিব। কিন্তু উত্তোরোত্তর সকলেই আমার উপর এত নির্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকল পক্ষ হইতেই এত অত্যাচার হইতে লাগিল যে, আমার ক্ষমতায় আর সে সকল সহ্য করিয়া কাল হরণ করা হইয়া উঠিল না। আমি আপনকার

শ্রীচরণে অকপটহৃদয়ে নিবেদন করিতেছি, নিতান্ত অসহ্য না হইলে, আপনাদিগের জীবদ্দশায় কদাচ সংসারযাত্রায় বিসর্জন দিতাম না। কিন্তু সকল বিষয়ে সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আপনকার ক্ষোভ করিবার তাদৃশ কোনো কারণ নাই। পুত্রের ক্লেশ নিবারণ হইয়াছে এবং পুত্র মনের সুখে কালহরণ করিতেছে, ইহা শ্রবণ করিলে, পিতার অন্তঃকরণে নিঃসন্দেহ আনন্দ জন্মিয়া থাকে। আমি অসহ্য ক্লেশ হইতে নিস্তার পাইয়াছি এবং মনের সুখে কালহরণ করিতে পারিব, তাহার উপায় করিয়াছি সুতরাং এ বিষয়ে আপনার দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদিত হওয়াই সম্ভব।'

শত প্রকার অপ্রিয় সংঘটন নিবন্ধন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তরে যে দুঃখের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং যাহা জীবনের শেষ দিনে তাঁহার চিতাভস্মে নির্বাপিত হয়, পিতা, পত্নী ও সহোদরদিগকে পত্রাদি লিখিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট সবিনয় বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং পিতার নিকট সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়া হৃদয়ের সেই ক্ষোভ ও দুঃখ কিয়ৎপরিমানে স্থির ভাব ধারণ করিল মাত্র। সহোদরদিগের প্রত্যেকেই গভীর আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের পত্রাংশই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখিয়াছিলেন: 'এই লিপি দৃষ্টে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে আমার এ দগ্ধ দেহ ভূমিসাৎ বা ভস্মাবশেষ না হইলে বিদায় লইতে বা দিতে পারি না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিভৃতভাবে থাকিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতের আরও বিস্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া স্বচ্ছন্দমনে আপনকার নিভৃতভাবে অবস্থানের অনুমোদন করিতেছি ...।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে পর, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সন ১২৭৬ সালের ২০শে কার্তিক তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রোত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের অংশ 'মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া অবধি মৃততুল্য হইয়াছি, আপনি যে আর দেশে আসিবেন না ও মৃত্যু কামনা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ও দেশের লোকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ মহাশয় হইতে দেশের লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও দুঃখ নিবারণ হইতেছে। মহাশয় আমাদের প্রতি আক্ষেপ করিতে পারেন, এতাবৎকাল আমাদিগকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, আমরা আপনার অবাধ্য হইলে অবশ্যই দুঃখ হইতে পারে,...যে দাদা আমাকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, যে দাদা আমার মানের জন্য স্ত্রীর সহিত মনান্তর করিয়াছেন, (২২) যে দাদা আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে দাদার

২২ প্রজারঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রই সীতার নির্বাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রসাদে এতাবৎকাল এদেশে (বীরসিংহে) একাধিপত্য করিতেছিলাম, সেই দাদার সহিত যে আমি নানা প্রকার অসদ্ব্যবহার করিয়াছি···।, তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রে বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদুত্তরে সন ১২৭৬ সালের ২রা পৌষ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ : 'আপনার ১২ই অগ্রহায়ণের রেজেস্টারি পত্র ২৮শে অগ্রহায়ণ পাইয়া আমাদের হৃৎকম্প হইল। নানা কারণে মহাশয়ের মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে আর ক্ষণকালের জন্য সাংসারিক কোনো বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারো সহিত কোনো সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়াছি।...এক্ষণে আমার প্রার্থনা, যদি কোনো বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি তাহা হইলে, মহাশয় আমাকে শাসন করিতে পারেন। আমি এতাবৎকাল মহাশয়েরই অনুগত ও আশ্রিত আছি, বোধ করি পিতৃদেব মাতৃদেবী অপেক্ষা মহাশয়ের প্রতি অধিক ভক্তি করিয়া আসিতেছি। বরং এতাবৎকাল দেশে অবস্থিতি করায় পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি কোনো উপদেশ দিতেন, তাহা না শুনায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত আমার মনান্তর ঘটিত। আমি স্বপ্নেও ক্ষণকালের জন্য মহাশয়ের অনিষ্টচিন্তা করি নাই। মহাশয় আমার কথায় বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে অপর লোক ও ভ্রাতৃবর্গ মহাশয়ের পত্নী ও পুত্র কখন কখন মহাশয়ের ও প্রতি বিরক্ত হইতেন।...এক্ষণে মহাশয় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা কেবল আমার দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই।'

এই সকলের দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী, পুত্র ও সহোদরগণের দ্বারা সংসার জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। কেবল সুখী হইতে পারেন নাই তাহা নহে, অনেক স্থলে নিতান্ত অসুখী হইয়া মনের ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল অশান্তিকর ব্যাপারের মধ্যে কখন কাহারও সুখ সাধনে বিমুখ ছিলেন না। সংসারে সাধারণ লোকে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ে প্রভেদ এই স্থানে। তিনি যাঁহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত তাঁহাদেরই সেবায় চিরজীবন নিযুক্ত। কেবল একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র নিজ দোষে দীর্ঘকাল পিতার স্নেহ ও মমতায় বঞ্চিত ছিলেন। পিতা পুত্রের এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের মধ্যে, পুত্র অনেক সময়ে পিতার প্রিয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো চেষ্টাই স্থায়ী ফলের প্রসূতি হয় নাই। শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবু পিতার জীবনী বিষয়ক যে সকল কাগজপত্র অনুগ্রহ করিয়া আমায় দিয়াছিলেন, সেই সকলের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে শত প্রকার অভিযোগপূর্ণ সনামী ও বিনামী পত্রাদি তাঁহার জ্ঞাতসারে আমার হস্তে আসিয়াছে : তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, পুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসন্তোষবহ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। এই

সকলের মধ্যে নারায়ণবাবুরও অনেকগুলি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে সন ১২৯৫ সালের ৩০ শে জৈষ্ঠ তারিখে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যে পত্র পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরক্তির কারণ, তাহার গুরুত্ব, পুত্রের গভীর অনুতাপ ও অনুরাগপূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনার ভাব পিতার নিকট পুত্রের আবদার ও দাবি দাওয়া এবং পিতার প্রতি ভক্তিপূর্ণ পূজার ভাব পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে, তাই এই পত্রের (২৩) প্রায় সমগ্র ভাগই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

শ্রীচরণারবিন্দেষু—প্রণতি পূর্বকং নিবেদনম্—

আপনার চরণ কৃপায় আমার সকলই হইয়াছে। যেমন হউক দশ টাকা উপার্জন করিতেছি, সম্মানেরও অভাব নাই, বাহিরে দেখিতে আমি পরম সুখে আছি। কিন্তু আমার অন্তরে অহরহঃ বিষম কীট দংশন করিতেছে। বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়াছি, অপর কোনো কামনাই মনোমধ্যে উদয় হয় না, কেবল মাত্র আপনার চরণ সেবাই এ দাসের মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্বকৃত পাপগুলি স্মরণ হইতেছে ও মন অনুতাপে বিকৃত হইতেছে, কেবল মনে হইতেছে হায়! যদি সে সকল পাপ কার্য দ্বারা পিতৃচরণে অপরাধী না হইতাম! যেমন পাপ করিয়াছিলাম তেমন প্রতিফলও প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ আপনার চরণতলে থাকিলে কি বলিয়া গণ্য হইতাম, আর এখনই বা কেমন হইয়া আছি। জনসমাজে হেয় হইয়া আছি। এ সকলও সহ্য করিতে পারিয়াছি, কিন্তু আপনার এ বয়সে পীড়ার সময়ে আমি আপনার চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে। আমার জীবনের প্রধানতম কর্তব্য প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। আপনি একবার ৺পিতামহ দেবের চরণ সেবার্থে কাশীধামে গমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় আপনার এক আত্মীয় বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর, এমন গরমের দিনে কাশী যাবে বড় ভয়ের কথা।' আপনি অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, 'Duty (কর্তব্যসাধন,) করিতে যাব, তাতে প্রাণের ভয় করিলে চলিবে কেন,' সেই হইতে মহাপুরুষের উচ্চারিত বেদবাক্যগুলি এ অধমের অন্তরে খোদিত হইয়া আছে। আজ আমি নিজ কর্মদোষে সেই Duty (কর্তব্যসাধন) করিতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

---

২৩ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন গৌরবভরে আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'আমাদের কথা বলিতে গিয়া বাবার প্রতি যেন কোনো অবিচার করিবেন না। তাঁহার প্রকৃত মহত্ব রক্ষা করিতে যদি আমার হীনতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি এখানে নারায়ণবাবুর সেই মহদুক্তির আশ্রয় লইয়া উপরি উক্ত পত্রখানির অধিকাংশ প্রকাশে সাহসী হইলাম।

আমি এখন আপনার নিকটে যাইতে চাই না। যখন আপনি এ অধমের মুখের দিকে তাকাইতেও অনিচ্ছুক, তখন আমি কোন্ সাহসে আপনার নিকটে বা সম্মুখে দাঁড়াইতে যাইব। আমি অন্তরালে থাকিব। চাকরের দরকার হইলে চাকর ডাকিয়া দিব, কোথাও যাইতে হইলে চাকরের মতো যাইব। চাকরের মতো থাকিব, ক্রমে অনুগ্রহ হয়, অনুমতি হয়, নিকটে যাইব। নচেৎ একধারে কুকুরের মতো থাকিব। আমি যেমনই হই আপনার পুত্র। আমারও অর্ধেক বয়স গত হইল। যেমন হউক আপনার একটি পৌত্র আছে। যদি বাঁচিয়া থাকে তাহাকে মহাশয়ের পরিচয় দিতে হইবে। যদি পুত্রকে পা দিয়া ঠেলিয়া গেলেন, তবে পৌত্রটি জনসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে, তাহা অপেক্ষা আমার গলায় পা দিয়াছেনই তাহারও গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলুন। ধিক্ জীবন লইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল' আমি এতদিন মৃত্যুর আশ্রয় লইতাম, তবে মধুরভাষিণী আশা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বাপ-মায়ের নিকট ক্ষমা পাইবার আশা কখনও ছাড়া যায় না। একালে ত আমার অদৃষ্টে এই হইল, কিন্তু আমার পরকালের পথটা রুদ্ধ করিবেন না। যদি আপনার চরণ সেবা করিতে না পাইলাম, তবে কিসে পরকালে উদ্ধার পাইব? আপনি একবার রাগদ্বেষ বর্জিত মনে আপনার ঋষিতুল্য মাধুর্য ও মনের উচ্চতায় তদ্গতচিত্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনার অধম সন্তানকে ভাসাইয়া দিলে মহাত্মার পৃথিবীব্যাপী সুনামে একটু কলঙ্ক স্পর্শিবে কি না? যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতার আধার, যাঁহার দেহ ক্ষমার বাসস্থান, যাঁহার শরীরে মায়াদেবী চির বিরাজিতা, পরের দুঃখ শুনিলে যাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতে থাকে, সেই দয়াশীল মহাপুরুষ নিজের হতভাগ্য অনুতাপানলে দগ্ধ, ভগ্নহৃদয় একমাত্র পুত্রকে অসংকোচে ভাসাইয়া দিবেন একথা ভ্রমক্রমেও মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না।

পিতঃ, এক দিনের জন্যও আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। আমার বিবাহের পর মহাশয় আপনার তৃতীয় সহোদরের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, 'নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, অধিক কি নারায়ণ এই বিবাহ করাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি।' পিতঃ, ইহজন্মে আমার আর ইহা অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য কি বাঞ্ছনীয়? ইহাই আমার স্বর্গসুখ। আপনি রাজাধিরাজ জগন্মান্য বাপ, আর আমি কীটানুকীট ছেলে; আমার কৃতকার্যের দ্বারা একক্ষণের জন্যও যদি মহাত্মার মনে অনুমাত্রও সন্তোষ জন্মাইতে পারিয়াছিলাম, তাহাই আমার পরম সৌভাগ্য, গুরুতর তপস্যার ফল। পিতঃ! হায় আমি এই যে পত্রে বারম্বার পিতঃ পিতঃ পিতঃ বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, ইহাতেই আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, কিন্তু অভাগার জীবনে 'বাবা' এই মধুর শব্দে ডাকা হইল না। প্যারী যখন আমাকে বাবা বলিয়া ডাকে, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, আর পরক্ষণেই সেই আনন্দ

বিষাদ-সাগরে পরিণত হয়, আমারও অমনই তখনই তাহার মতো বাবা বলিয়া ডাকিতে সাধ যায়, কিন্তু ডাকিতে পাইব না, বৃথা আশা, এই ভাবিয়া অমনিই মৃতকল্প হই। আর ভাবি যদি আমি হতভাগা আপনার পুত্র না হইয়া, মনের মত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সেও প্যারীর মতো বাবা বলিয়া ডাকিলে আপনারও কত আনন্দ জন্মিত। কিন্তু আমি হতভাগা জন্মিয়া আপনকার সকল সুখে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি। যদিও হইয়াছিলাম মরিয়া যাই নাই কেন?

মহাশয় একাকী বিবৃত হইয়া পড়িয়াছেন। আজ যদি গোপালও (২৪) থাকিত তাহা হইলেও সকল দিক রক্ষা পাইত। সুতরাং বহু পরিবার পরিবৃত হইয়াও আপনি একাকী; ছেলে, জামাই, ভাই একজনও মনের মতো হইলে, তাহার উপর ভার ফেলিয়া পীড়ার সময় দশ দিন নিভৃতভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন। যখন যখন আপনার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ ও ক্ষীণ স্বরে কথা কহা আমার মনে উদয় হয়, তাহার উপরে সকল ঝনঝাট পোয়ানো মনে পড়ে. অথবা পীড়িত হইয়া একমাত্র চাকর সহায় লইয়া থর্মটাড়ে যাওয়া মনে হয়, তখন ভাবি, এখনও কেন বাঁচিয়া আছি। আর নিজ কর্মদোষের জন্য জিহ্বা টানিয়া মারিতে ইচ্ছা হয়।

এক কালে যে মহাপুরুষ, যে ধৈর্যগুণের আধার, যে great peerless man (তুলনারহিত মহাপুরুষ) যে Demigod (মানব দেবতা) আহারকালে আরশোলা চিবাইয়া গিলিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, কেন না আরশোলা জানিলে অপরের খাওয়া হইবে না, সেই মহাত্মা এমন অমানুষী শক্তি ধরিয়াও নিজের ছেলেকে ক্ষমা করিলেন না! দোষ যত গুরুতর হউক না কেন, ক্ষমার নিকট সকলই তুচ্ছ, তাতে আবার বাপ-মায়ের কাছে। আমাকে চরণে আশ্রয় দিলে কেহ দোষ দিবে না, বরং মহাপুরুষের মহত্ত্বেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। কি আর অধিক জানাইব, আর একবার কৃপা করিয়া অমানুষ ঔদার্য গুণের পরিচয় দিয়া নিজের হতভাগ্য পুত্রকে চরণ-সেবায় নিযুক্ত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, সর্বপ্রকারে পিতৃদেবের মনের মতো হইতে পারি কি না, ভাল হই আর মন্দ হই, সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোকের মধ্যে এ হতভাগ্যই প্রথম। কাহার জন্য কি না করিয়াছেন, আমার জন্য, একবার শেষ পরীক্ষা করুন, সাহস করিয়া বলিতে পারি, একক্ষণের জন্য, কোনো বিষয়ে অণুমাত্রও আপনার অসন্তোষের কাজ করিব না। সংসারে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব, এক মুষ্টি আহার করিয়া আপনার চরণসেবার জন্য রক্ষা করিব। কুকুর যেমন অন্নমুষ্টি খাইয়া নিরন্তর প্রভুর চিত্তানুবর্তন করে. এই হতভাগাও কুকুরের অধম হইয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫। (স্বাক্ষর) মহাশয়ের হতভাগ্য পুত্র

---

২৪ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺গোপালচন্দ্র সমাজপতি। ইঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং ইনি অপর সকলেরই সমান প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এই পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাংসারিক সুখ দুঃখের পূর্ণ আভাষ এবং নিরাশা ও অশান্তির গূঢ় কারণগুলির বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্বের ক্ষুদ্র অথচ সমুজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক, এই পত্রখানি নিবিষ্ট চিত্তে বার বার পাঠ করিলে অনেক ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই পত্রখানি বিচ্ছেদদগ্ধ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে স্থান পাইবার সম্যক উপযোগী। এই পত্র পাঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় একমাত্র পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কিছু-কাল পুত্রকে সপরিবারে কলিকাতায় ও ফরাসডাঙ্গায় আপনার নিকটে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে শেষ পীড়ার সময়েও নিকটে থাকিয়া পরিচর্যা করিতে ডাকিয়াছিলেন। নানা ঘটনা সূত্রে পুত্রের প্রতি অনেক বিরূপ থাকিলেও পুত্রবধূ, পৌত্র ও পৌত্রীগণের প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহের ফল্গুনদী নিয়ত নীরবে প্রবাহিত ছিল, তাহার পরিচায়ক কয়েক খানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইয়াছে (২৫) পাঠক তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে হৃদয় স্বদেশ বিদেশের অসংখ্য দুঃখী লোকের দুঃখ নিবারণে সদা ব্যস্ত ছিল, সে হৃদয়বান পুরুষ পুত্রের পরিবারবর্গের প্রতি একদিন এক মুহূর্তের জন্য উদাসীন ছিলেন না।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্‌

বৎসে ভবসুন্দরী (২৬)

শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণ বশতঃ অনেকদিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সেজন্য বোধ করি তুমি অতিশয় দুঃখিত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আমি এতদিন তোমায় পত্র না লিখিয়া অন্যায় কর্ম করিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই।

আমি কলিকাতায় অতিশয় অসুস্থ হইয়া দশ দিবস হইল কর্মাটাড় আসিয়াছি। কলিকাতায় বিলক্ষণ অসুখ ভোগ করিয়াছি, এখানে আসিয়াও

---

২৫ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয়বর্গের মধ্যে যাহারা আমার বিশেষ বিশ্বাসভাজন, তাঁহাদের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্রের প্রতি যেমন অপ্রসন্ন ছিলেন, পুত্রবধূ, পৌত্র, ও পৌত্রীগণের প্রতিও সেইরূপ বিরক্ত ছিলেন। আমার এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায় হইলেও অতি বিশ্বাস নিবন্ধন এরূপ অন্যায় করিয়া ছিলাম। এইজন্য ঐ সকল পত্রের বিদ্যমানতা বিষয়ে অনুসন্ধানও আবশ্যক বোধ করি নাই। যে সূত্রে আমার এ ভ্রম সংশোধিত হইল, তাহার সহিত সাধারণের ইষ্টানিষ্টের কোনো সম্রব নাই, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

২৬ Sreemati Bhabasundari Devi, Vidyasagar's house, Birshingha,

ভালরূপ আরাম হইতে প্যারি নাই। এখানে আর ৮।১০ দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় যাইব। কলিকাতায় গিয়া যেন তোমার পত্র পাই। কুন্দ বোধ করি এত দিনে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ বাক্যগুলি সর্বদাই মনে পড়ে। ইতি— ১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল।

শ্রী শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরী

এই পত্রের মধ্যে তোমাদের চৈত্র মাসের ৬০ ষাট টাকা পাঠাইতেছি, পঁহুছ সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। মৃণা, কুন্দ, প্যারী ও নুদিকে আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলিবে তাহাদের জন্য আমার বড় মন কেমন করে। আবার কতদিনে তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহারা কেমন আছে লিখিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। ইতি—
১লা চৈত্র ১২১২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদম্ (২৭)

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমার জননী দেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে এবং তোমরা সকলে ভাল আছ আর তুমি বস্তুবিচার ২ পড়িতেছ, কুন্দমালা কথামালা পড়িতেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। ভাল শিখিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে অতিশয় ভালবাসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিবে। আর কুন্দ যদি লিখিতে পারে, তাহাকেও পত্র লিখিতে বলিবে। তোমাদের পত্র পাইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।

প্রায় একমাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। এখনও ভাল হইতে পারি নাই। অতিশয় দুর্বল হইয়াছি। আজ তিন দিন হইল কিছু ভাল আছি। বোধ হইতেছে আর ৪।৫ দিনে ভাল হইতে পারিব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার ঠাকুর মা, পিসিমারা এবং সুরেশ, যতীশ, হরিমোহন, রামকমল প্রভৃতি এবং রানীরা সকলে ভাল আছেন। তোমার জননী কুন্দ প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ স্নেহ সম্ভাষণ বলিবে। দুর্বল আছি বলিয়া তোমার জননীকে পত্র লিখিতে

২৭ জ্যেষ্ঠা পৌত্রী মৃণালিনীকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

পারিলাম না। তোমাকে না লিখিলে হয় ত তুমি রাগ করিবে এজন্য তোমাকে লিখিলাম। আজ আর লিখিতে পারিব না। ইতি—১লা আষাঢ় ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরনম্

বৎসে ভবসুন্দরী

এই পত্রের মধ্যে একশত পঞ্চাশ টাকার নোট পাঠাইতেছি। পঁহুছ সংবাদ ও তোমার মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই। মৃণালিনী দিদিকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবে তাহার পত্র পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। দুই তিন দিনের মধ্যে তাহাকে পত্র লিখিব। হেমলতা কহিলেন, মাস মাস ৮০ আশি টাকা পাঠাইলে তোমাদের সব বিষয়ে সুবিধা হয়, এজন্য ঐ হিসাবে ৮০ টাকা আর সাবেক খাজনার বাবতে ৭৫ পঁচাত্তর টাকা দিলাম। সমুদয়ে ১৫৫ এক শত পঞ্চান্ন টাকা হয়। হেমলতা এখানে পাঁচ টাকা লইয়াছেন, বাকী একশত টাকা প্রেরিত হইল। ইতি ৩রা চৈত্র ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরী

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই। অতিশয় দুর্ব্বল আছি। বাটীর সকলে ভাল আছেন। মৃণা, কুন্দ, প্যারী, মীত ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। তাহাদিগকে মনে করিলেই চক্ষে জল আইসে। শুনিলাম মৃণার এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। যাইবার আগে জানিতে পারিলে, যাইতে দিতাম না। মধ্যে মধ্যে তোমাদের সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি ২৬শে চৈত্র ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

সংসার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মীয়বর্গের অনেককে যেমন পত্র লিখিয়াছিলেন, পুত্রবধূকেও নিম্নলিখিত পত্রে মনের ঐরূপ ভাব ব্যক্ত করেন। এই পত্র পাঠে বুঝা যায় যে, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক টাকা ইঁহাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

ভবসুন্দরী

আমি তোমাদের নিকট এ জন্মের মতো বিদায় লইলাম। তোমাদের নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত, আপাততঃ ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকা নির্ধারিত করিয়া দিলাম। ইতি—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরী

এই পত্রের মধ্যে আশি টাকার নোট পাঠাইতেছি, পঁহুছ সংবাদ ও তোমরা সকলে কেমন আছ তাহার সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। আমি সেইরূপই আছি। অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মৃণা, কুন্দ, প্যারী ও মতিকে আমার স্নেহসম্ভাষণ বলিবে! তাহাদের জন্য সর্বদাই মন কেমন করে। মধ্যে মধ্যে চক্ষে জল পড়ে। আমি ৩।৪ দিনের মধ্যে একবার কর্মাটার যাইব। সেখানে ৪।৫ দিনের অধিক থাকিব না। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১২৯২ সাল। পত্রের পঁহুছ সংবাদ কলিকাতার ঠিকানায় লিখিবে। শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন (২৮)

তুমি পত্র লিখিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তুমি মন দিয়া লেখা পড়া করিবে তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব। তুমি প্রতি মাসে, দুইবার আমাকে পত্র লিখিবে।

তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহ্লাদিত হইলাম। আমি এখন অনেক ভাল আছি। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মতিমালা কুন্দমালা মৃণালিনী ও তোমার জননীকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। ইতি ২৭শে পৌষ ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

---

২৮ Babu Pyari Mohan Banerjee, Vidyasagar house Beersingha, Kharar.

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও আহ্লাদিত হইয়াছি। একখানা বাঙ্গালা ম্যাপের জন্য লিখিয়াছ দুই তিন দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব। মনোযোগপূর্বক পড়িলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইব। তোমার মাতা, কুন্দ, প্যারী ও মতিকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ বলিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি সেইরূপই আছি। ইতি ৩০শে চৈত্র ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পরম কল্যাণভাজন

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী স্নেহাস্পদেষু

বিদ্যাসাগরে বাটী বীরসিংহ ( খড়ার ) (২৯)

পুত্রের নিকট হইতে পূর্বোক্ত বৃহৎ পত্রখানি পাইয়া তাঁহার মনের ভাব যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় স্থলে নারায়ণবাবুর কৃতজ্ঞতা পরিচায়ক একখানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

শ্রীঃ—

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতি পূর্বকং নিবেদনম্—

পিতৃদেব, এবার মনে করিয়াছিলাম, যে আমার সমস্ত দুঃখের কথা জানাইয়াছি, এক বার মহাশয়ের পদতলে নিপতিত হইয়া আমার ভাঙ্গা কপালের শুভাশুভ ফল স্থির করিয়া লইব। কিন্তু নিষ্ঠুর দৈব হতভাগ্যের ভাঙ্গা কপালকে শতধা বিচূর্ণিত করিয়া দিল।

স্নেহময়ী জননীদেবীকে এ জন্মের মতো হারাইয়াসংসারে একবারে অসহায় হইতে হইত, মা মরা ছেলের মতো কাঁদিয়া বেড়াইতে হইত, কেবল, দয়াময় পিতৃদেবের সদয় ব্যবহারে প্রকৃতিস্থ হইয়া আছি। মহাশয়ের চরণ ছাড়া হওয়া অবধি মাতৃদেবীর চরনাশ্রিত হইয়া কালযাপন করিতেছিলাম, সুমধুর 'মা' বলিয়া মাকে ডাকিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছিলাম, কিন্তু যখন মা আমার হতভাগ্য পুত্রকে নিরাশ্রয় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, যখন সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম, সেই দুঃসময়ে, পিতৃদেব কৃপা বিতরণ করিয়া হতভাগ্য সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিলেন। সেই কৃপাবলে এই হতভাগ্য মাতৃশোক সহ্য করিতে পারিতেছে। হতভাগ্যের প্রতি যে

২৯ পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় পত্রে নারায়ণচন্দ্রের বাটীই বারবার নিজের বাটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এত দূর কৃপা করিবেন, তাহা কি স্বপ্নেও কখনও আশা করিয়াছি? জানিতাম এ জন্মের মতো এ হতভাগ্যের ভাগ্যদীপ নির্বাণ হইয়া গিয়াছিল। এবার আপনার সম্মুখে সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দোতলার উপরে শুইবার অনুমতি পাইয়াছি, ভরসা করিয়া মহাশয়ের সহিত দুই-একটা কথা কহিয়াছি, এক দিন সন্ধ্যার সময় জল খাবার চাহিতেছিলাম, মহাশয় নীচে ছিলেন, শুনিতে পাইয়া হেমলতাকে কহিলেন, ও ভীমি; তোর দাদা জলখাবার চাহিতেছে, কথাগুলি শুনিয়া আমার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সকল কৃপাদৃষ্টিতে এ হতভাগ্য চরিতার্থ ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। অন্তরে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে বলে Intoxicate with joy আমার তাই হইয়াছে। বহুদিন অনাহারের পর উপাদেয় আহার পাইলে লোকের অন্তরে যেমন একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি জন্মে, ১৪ বৎসরের পর মহাশয়ের শ্রীমুখের বচনামৃত পান করিয়া হতভাগ্যের অন্তরাত্মা পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক একটি কৃপার পরিচয় পাইয়াছি আর আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছি। আর কেবল সেই সময় এই ভাবিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে সে যদি এই কৃপাদৃষ্টি আমার দুঃখিনী মা দেখিতে পাইতেন তবে আমার জীবন সার্থক হইত। মা গো! একবার চাহিয়া দেখ মা! তোমার হতভাগা নারায়ণ পিতৃচরণে আশ্রয় পাইয়াছে। মা! তুমি যে অন্তিমকালেও হতভাগা সন্তানের জন্য ব্যাকুল হইয়া, 'কর্তাকে ডাক, কর্তাকে ডাক, ১০/১২ বছরের মনের দুঃখের কথা বলিয়া যাই—আমার নারায়ণকে দিয়া যাই,' বলিয়াছিলে, এখন একবার দেখ মা! দয়াময় কর্তা তোমার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। মা! একবার দেখ, বাবা তোমার জন্য কত ব্যাকুল হইয়াছেন। যতই জননীর স্নেহ ভাবিতেছি ততই হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে।

আপনি আমার প্রতি যতটুকু কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেই আমি চরিতার্থ। মরণকালে ইহা ভাবিয়াও সুখে মরিব যে পিতৃদেব অপরাধী অনুতাপযুক্ত সন্তানকে ক্ষমা করিয়াছেন, আপনার চরণে ক্ষমারই ভিখারী ছিলাম, কতবার পদতলে পড়িয়া কাঁদিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহাশয় শোকসন্তপ্ত বলিয়া সাহস করি নাই। আমি আর ঐ চরণ ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার হৃদয়ে যে ভাবটি শুষ্ক হইয়াছিল, সেই ভাবটি মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টিতে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আর কি ছাড়িয়া থাকিতে পারি? আপনাকে কিছুমাত্র বিরক্ত করিব না, কর্তৃত্ব, ধন কিছুরই আশা নাই, আশা, পদতলে পড়িয়া থাকিব। মহাশয়ের তামাক সাজিব, বিছানা করিয়া দিব, জুতো মুছিব, বিদেশ গমন করিলে সঙ্গে মোট বহিয়া যাইব। পবিত্রতম আপনার চরণ ও স্বর্গীয় মাতৃদেবীর চরণ স্মরণ করিয়া জানাইতেছি আমার মনের অপর বাসনা নাই। মাতাদিগের মতো থাকিয়াই আমি সুখী

হইব। আপনার বাটীতে যাহাই হউক, আমাকে কেহ লাঞ্ছনা করুক, কান থাকিতে শুনিব না, চক্ষু থাকিতে দেখিব না, মা আমাকে কাঙ্গালী করিয়া গিয়াছেন, আমি কাঙ্গালী বেশেই আছি, আর সেই ভাবেই কালযাপন করিব। আপনার পদসেবার জন্য সর্বত্যাগী হইব, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব, পূর্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য দেহ ও প্রাণ আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিব।

আমি আপনাকে আর একটি নিবেদন করিব। যদি এক্ষণে একেবারে নিজের নিকট রাখিতে সম্মত না হয়েন, তবে আপাততঃ অপরের মতো আমাকে স্কুলে একটি কিছু হউক কর্ম করিয়া দিন। কর্মপারগতা, ব্যবহার ও চরিত্র দেখিয়া যদি সন্তুষ্ট হয়েন, তখন চরণসেবার অনুমতি করিবেন, আমার তাহা হইলেই দুই বেলা শ্রীচরণ দর্শন ঘটিবে। ফলকথা আমাকে যেরূপে হউক চরণে আশ্রয় দিতেই হইবে। আমার নিজের আফিস ও লোকাল বোর্ড আফিস দুইটা আফিসে কার্য সুচারুরূপে চালাইয়া মায়ামমতাশূন্য বিদেশীয় কর্তৃপক্ষগণের মনে সন্তোষ জন্মাইতে পারিতেছি, আর দয়াময় পিতৃদেবের সন্তোষ জন্মাইতে পারিব না? নিষ্কর্মা থাকিতে আমার আর সাহস হয় না। মহাশয়কে ছাড়িয়াও আর থাকিতে পারিব না।

হেমলতা, মাতৃদেবীর গহনাও বাসনের চাবিকাঠি আমাকে দিতেছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত মহাশয়ের চরণে পঁহুছাইয়া দিতে হেমলতাকে বলিয়াছি। ইতি তারিখ ২৮শে ভাদ্র ১২৯৫ সাল।

হতভাগ্য ভৃত্য
শ্রীনারায়ণ শর্মণঃ

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে একবার অত্যধিক পীড়ার সময়ে আমি না বুঝিয়া বলিয়াছিলাম—এত পরিশ্রমে শরীর দিন দিন ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে, শরীরপাত না করিয়া কিছু দিনের জন্য আপনার বিশ্রাম স্থান খর্মাটারে গিয়া বাস করিলে হইত না? এই কথার উত্তরে তিনি অতি আর্তভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, 'আমার কি যাবার পথ রেখেছি? এই এক কাজে আমি আপনাকে এমন জড়িয়ে ফেলেছি যে কোথাও যাইবার উপায় নাই।' এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া হস্তস্থিত একখানি তালিকা পুস্তক আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে মাসিক দানের হিসাব থাকে। ঐরূপে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তালিকার শেষ পত্রে দেখিলাম, মাসিক দান ৮০০ আট শত টাকারও কিঞ্চিৎ অধিক। এগুলি সমস্তই গরীব দুঃখীদিগের মাসিক বৃত্তির হিসাব। এতদ্ভিন্ন সাময়িক ও এককালীন দান স্বতন্ত্র ছিল। অভিমান ভরে ঐ হিসাব পুস্তক আমার সমক্ষে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ 'আমার এক আত্মীয়-সুহৃদের হাতে ২৫০০ টাকা দিয়া তিন মাসের জন্য বিদায় লইয়া গত বৎসর একবার খর্মাটাড়ে

গিয়াছিলাম। যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, মাস মাস যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিবে। আমার এমন পোড়া কপাল যে, এক মাস যাইতে না যাইতে চারিদিক হইতে সংবাদ যাইতে লাগিল, 'আমাদের পেটে ভাত নাই, উনানে হাঁড়ি চড়ে না, কেহই মাসহারার টাকা দেয় না।' যাঁহার উপর ভার ছিল, তাঁহাকে লিখিলাম, জবাব নাই, শেষে লোকের তাগাদার জ্বালায় কলিকাতায় ছুটিলাম, আসিয়া আত্মীয়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: 'লোকে মাসহারা পায় নাই কেন?' সুহৃদ উত্তর দিলেন, 'অন্য কার্যের বড় ভিড় ছিল, তাই পারি নাই।' এই বলিয়া তিনি গা ঢাকা দিতেছিলেন, আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম, 'আচ্ছা না পারিয়াছ টাকাগুলি আনিয়া দাও, আমি যাহাকে যাহা দিবার নিজে দিয়া যাই।' আমার সেই পরমাত্মীয়টি বলিলেন: হ্যাঁ—তা—টাকা—টা—অন্য—বাবদে খরচ হইয়া গিয়াছে'!' বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন 'আমার নিকটে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন দুঃখ, ক্ষোভ ও অভিমানের সমান সমাবেশে তাঁহার মুখে এক বিচিত্র ভাব দেখিয়াছিলাম; বিষাদপূর্ণ উত্তেজনার ভাবে বলিলেন, 'তখনই ২৫০০ টাকা কর্জ করিয়া আনিয়া প্রত্যেকের তিন মাসের দেয় বৃত্তি একবারে দিয়া, অবশিষ্ট দুই মাসের জন্য বিশ্রাম করিতে গেলাম।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনব্যাপী বিবিধ প্রকারের দুঃখ কষ্টের মধ্যে দু-একটি সুখের বিষয় ছিল। শেষ দশায় কলিকাতায় কন্যাগুলিকে লইয়া যখন বাদুড়বাগানের বাটীতে বাস করিতেন, সেই সময় তাঁহার বালক দৌহিত্রেরা তাঁহার পরম আরামের স্থল হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর যতীশচন্দ্র সমাজপতি তখনও বালক; ইঁহাদিগকে লইয়া এবং কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রদিগকে লইয়া সর্বদা আনন্দে কালযাপন করিতেন। শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইতেন। কন্যারা এক এক কোণে এক এক জন দাঁড়াইতেন, দৌহিত্রগুলি কেহ বা দক্ষিণে কেহ বা বামে, কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে সকলেই চর্বিত তাম্বুলের উমেদার হইতেন, সকলকে একেবারে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্যায়ক্রমে পরে পরে পান দিতেন। তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্যা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল। প্রসাদের প্রার্থী হইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, 'আচ্ছা একটু বিলম্ব কর, পানে, "সম্বরা" দেই।' তাহার অর্থ এই যে পান খাইতে খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে। পানে "সম্বরা" দিয়া পরে গুণানুসারে পরে পরে সকলকে পান দিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ শিশু দৌহিত্র গুজে (রামকমল) তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র ছিল। ঐরূপ পারিবারিক সান্ধ্যসমিতিতে এই শিশুই

প্রধান নটের কার্য করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে উপহার দিবার জন্য নূতন সিকি, দুয়ানি, আধুলি ও টাকা সর্বদাই নিকটে রাখিতেন। সে বালক চাহিবামাত্র তাহাকে দিতেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'দাদা তুমি কাকে ভালবাস?' শিশু বলিত 'দাদামশাই, তোমাকেই খুব ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নূতন নূতন সিকি দুয়ানিকে বেশী ভালবাসি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, 'সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝ না তাই বলে ফেল, অন্যেরা ও কথা স্বীকার করে না।'

বৈরাগ্যের ভাবপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কিয়ৎ পরিমানে শান্ত চিত্তে নির্জন বাস সম্ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার জননীদেবী কাশীবাসের জন্য কর্তার নিকট গমন করেন। কাশীবাস মনঃপূত না হওয়াতে শেষে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া বীরসিংহ প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময়ে কাশী হইয়া আসেন। সেখানে কর্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কর্তাকে বাড়ি আনিবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাস তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কাশীতেই থাকিতে চাহিলেন এবং গৃহিণীকেও তথায় থাকিতে বলিলেন। ভগবতী দেবী কর্তার কথার উত্তরে বলিলেন, 'তোমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি যেখানেই থাকি, এই কাশীতে আসিয়া তোমার আগে মরিব, আমার পর তুমি যাইবে। তাই বলিতেছি, এখনও বিলম্ব আছে বাড়ি চল।' ভগবতী দেবী যাহা বলিয়াছিলে দৈববাণীর ন্যায় তাই ঘটিয়াছিল। ঠাকুরদাস পীড়িত হইয়া আসন্নকাল সন্নিকট বোধে কলিকাতায় ও বীরসিংহে সংবাদ দেন। তদনুসারে ১২৭৭ সালের ২রা ফাল্গুন তারিখে দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র জননীকে সঙ্গে লইয়া কাশীযাত্রা করেন। এ দিকে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া পিতৃপরিচর্যার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। উপযুক্তরূপ সেবা, শুশ্রূষা ও ঔষধাদির সুব্যবস্থায় ঠাকুরদাস আরোগ্য লাভ করিলেন। ১৫ই ফাল্গুন ঈশ্বরচন্দ্র, জননী ও সহোদরদিগকে পিতার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ঠাকুরদাস ক্রমে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু ভগবতী দেবী ফাল্গুন চৈত্র দুটি মাস কাশী বাস করিয়া বৎসরের শেষ দিনে বিষম বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি পুত্র-কন্যা পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আত্মীয়-স্বজন চারিদিক পরিপূর্ণ ও সুপ্রসন্ন দেখিয়া কর্তার নিকট পদধূলি চাহিতে চাহিতে ও সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে লোকলালাদ সংবরণ করেন। ঠাকুরদাস বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত বিপন্ন ও বিষন্ন হইয়াও গৃহিণীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমায় আমি আর কি আশীর্বাদ করিব, তুমি পুণ্যবতী স্ত্রী, আপনার পুণ্যে আপনিই আগে চলিলে, তোমাই জিত হইল।'

জননীর মৃত্যু সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি মাতৃহীন বালকের মতো সর্বদাই রোদন করিতেন। জননীর মৃত্যু কালে নিকটে থাকিতে ও সেবা করিতে পান নাই বলিয়া, নিরতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে সর্বদাই কালাতিপাত করিতেন। কাশীপুরের গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপণ করিয়া একবৎসর কাল সর্বপ্রকার সুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে স্বহস্তে পাক করিয়া একাহার, নিরামিষ ভোজনে দিন যাপন করিতেন। যখন নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িতেন, তখনই কেবল পত্নী দিনময়ী দেবী পাকাদি কার্যে সহায়তা করিতে পাইতেন; এক বৎসরের জন্য বিনামা, ছত্র ও কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি দীন দুঃখীর ন্যায় কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছেন। মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র তদগতচিত্তে জননীর গুণাবলী ধ্যান করিতেন। জননীর লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরেও প্রসঙ্গক্রমে যখন একবার তাঁহার পরমারাধ্যা গুণময়ী মাতার গুণের উল্লেখ করিতে হইয়াছিল তখন তিনি নিতান্ত অসুস্থ; তাঁহাকে অসুস্থ শরীরে শিশুর ন্যায় কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হইতে দেখিয়া, আমি বলিয়াছিলাম, 'আপনাকে এত কষ্ট দিব জানিলে, আমি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতাম না।' গুণবান পুত্র অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, 'তুমি আমায় কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি ত আমার বন্ধুর কার্য করিলে, তোমার প্রয়োজন সাধনেও ত এখন আমার মায়ের কথা মনে পড়িল, মায়ের নামে দুফোঁটা চক্ষের জল পড়িল, এও ভাল; এতই দুর্দশা যে, সর্বদা সকল সময়ে পিত-মাতাকে স্মরণ করিতে পারি না।'

মাতৃবিয়োগ ঈশ্বরচন্দ্রের মনে কিরূপ স্থায়ী বিষাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ কৃষ্ণনগরনিবাসী ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃবিয়োগে যে সান্ত্বনা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। সহৃদয় ব্রজবাবু পত্রখানিকে এরূপ মূল্যবান উপহার বলিয়া মনে করিতেন যে, উক্ত পত্রের আবরণের উপর স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'যাবজ্জীবন এই পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিব।' সেই পত্রখানি এই ঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

সাদরসম্ভাষণ মাবেদনম্—

চণ্ডীর (ডিপজিটরীর পূর্বতন ম্যানেজার বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়) মুখে শুনিলাম, গত শুক্রবার জননীদেবী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার দেহান্ত সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইয়াছে। তিনি যাতনামুক্ত হইলেন এবং আপনাকে জীবিত দেখিয়া দেহত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে আপনার দশদিক শূন্য হইল। অতঃপর সংসার যাত্রা কেবল বিড়ম্বনার স্থান হইয়া উঠিল। যে কয় দিন জীবিত থাকিবেন, আর অমৃতময় স্নেহসম্ভাষণ শুনিতে পাইবেন না। যাহা হউক আপনি তাঁহার শেষ দশায় শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছেন এবং অন্তিম সময়ে সন্নিহিত থাকিয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বা তাঁহার জিজ্ঞাসার

উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে, কিন্তু আপনাকে যেরূপ জানি তাহাতে আপনি বিলক্ষণ মাতৃভক্ত ছিলেন, সুতরাং সহসা মাতৃশোক সংবরণ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার হইবেক না।

এই সংবাদ শুনিয়াই আমার আপনার নিকট যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ১৫।১৬ দিন হইতে শিরোরোগ ও নিদ্রার ব্যাঘাত বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একেই অতিশয় দুর্বল, তাহাতে এই কয় দিনে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থায় স্থানান্তরে যাওয়া আমার পক্ষে কোনো মতে সম্ভাবিত নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনোও মতে যাইতে সাহস করিতে পারিলাম না। অপরাধ মার্জনা করিবেন। ইতি ১৬ই মাঘ ১২৮৪ সাল।

ত্বদেকাত্মনঃ

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

বিবিধ অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের সংহারে একে একে তাঁহার প্রিয়জনগুলি বিদায় লইতে লাগিলেন। পূর্বে জননীর দেহত্যাগ নিবন্ধন দীর্ঘকাল নির্জন বাসে কালাতিপাত করিয়াছেন। সে শোকের সংবরণ হইতে না হইতে আর এক ভীষণ দুর্ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এককালে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ১২৭৯ সালের ২৩শে মাঘ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ সর্বজনপ্রিয় পরম স্নেহাস্পদ জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় দারুণ বিসূচিকা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দীর্ঘকাল হতাশ বিষণ্ণ ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এই ঘটনাসূত্রে পারিবারিক জীবনে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহারও উল্লেখ আবশ্যক। জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী যখন জীবনব্যাপী বিষাদ ও যন্ত্রণার পরিচায়ক বৈধব্যানুষ্ঠানের সূচনা করিলেন, তখন বিদ্যাসাগর-পরিবারে এক মহাশোকের ব্যাপার চলিতে লাগিল। কন্যার তরুণ জীবনে বেশভূষার পরিবর্তন ও আহারাদির সংযম পিতৃগৃহে গভীর মনোবেদনার সৃষ্টি করিল। এই দুঃখকষ্টপূর্ণ সংসারের সর্ববিধ অসুবিধাকে সাদরে বরণ করাতে, কন্যার কোমল প্রাণে যে ক্লেশ হইয়াছিল, সুহৃদয় পিতা নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া জনসমাজসমক্ষে পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কন্যা যখন নিরামিষ-একাহারে প্রাণ ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি স্বাভাবিক ভাবে মৎস্য ত্যাগ করিলেন ও রাত্রির আহার কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন। যখন আহারে বসিতেন, দুঃখিনী বিধবা কন্যার কঠোর জীবন যাপনের কথা মনে হইত, আর আহারে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেন না। কন্যা মৎস্য ত্যাগ করিয়াছে, এই চিন্তার প্রবলতায় তিনি মৎস্যাদি মুখে

তুলিতে পারিতেন না, রাত্রিতে আহারের সময়ে, কন্যা উপবাসিনী, এই চিন্তাতেই তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনা আপনি লোপ পাইত।

আমরা সমাজ সংস্কার অধ্যায়ের সূচনায় একস্থানে বলিয়াছি: 'সুপ্রবীণ পিতা নিজের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার বৈধব্যানুষ্ঠানের বিষাদরাশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, কোমলপ্রাণা কন্যা ও ভগ্নীকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কি এইরূপ হইবে?' বিধবাবিবাহের পথপ্রদর্শক নারীসুহৃৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পারিবারিক জীবনে করুণহৃদয় অভিভাবকের আদর্শ চিত্র কি পরিস্ফুট হয় নাই? যেখানে ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন, সেখানে কার্যতঃ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা কিরূপে কন্যার এইরূপ পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অনুকরণের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিছু দিন পরে বিধবা (জ্যেষ্ঠা) কন্যাই বহু সাধ্যসাধনায় পিতার নিরামিষ ভোজন ও একাহারের নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কন্যা এরূপে দুঃখিনী হইলে পিতা-মাতার সহানুভূতিই কন্যার পরম সম্পদ। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের অনেকেই সে সমবেদনা প্রকাশের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবগত নহেন, সে বিষয়ে বিশিষ্টরূপে চিন্তাও করেন না।

কাশীতে জননীর মৃত্যু হওয়াতে দীর্ঘকাল আর কাশী যাইতে সম্মত হন নাই। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল পুত্রের মুখাবলোকনে বঞ্চিত, তাই পুত্রকে একটিবার একদিনের জন্য কাশী যাইতে অনুরোধ করিয়া নিম্ন লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন:

'শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শুভানুধ্যায়ী শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্মণঃ

পরমশুভাশীর্বাদ-বিজ্ঞাপনমিদম্—আমার ৮৩ বৎসর বয়স হইল, বিশেষতঃ এই অবসন্ন সময়ে সর্বদা আমার ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তুমি আমার বংশের শ্রেষ্ঠ, এতাবৎকাল তুমি আমার ভরণ পোষণ প্রভৃতি করিতেছ, এক্ষণে আমার মানস তোমার মুখ দর্শন করি। অতএব লিখি, যদ্যপি তুমি শরীরগতিক স্বচ্ছন্দরূপ সুস্থ থাক, তাহা হইলে ইতি মধ্যেই এখানে এক দিনের জন্য আসিয়া আমার মানসপূর্ণ করিবে। ইতি ৫ই পৌষ।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র পিতৃচরণ দর্শন মানসে কাশী যাত্রা করেন। কয়েক দিন পিতার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সর্বপ্রকার সুখ ও সুবিধা সাধন করিয়া পরে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তৎপরে ১৪ই চৈত্র ঠাকুরদাসের পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া একে একে অনেকেই কাশীতে উপস্থিত হন। সন ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরদাস দুঃখকষ্টময় সংসার ভার উপযুক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে রাখিয়া পরিজন ও পুত্রগণের ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুতেও ঈশ্বরচন্দ্র অনাথ

বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। বিলম্ব হইতে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি শান্তভাবে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আড়ম্বর-বিহীনভাবে, আপনারাই পিতার মৃতদেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। সাহায্য করিবার জন্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু লোকের সমাগম দেখিয়া, 'আমরাই সমস্ত করিব' এই বলিয়া মিষ্ট কথায় ভদ্রলোকদিগকে বিদায় দিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে স্নান তর্পণাদি শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া পিতা-মাতার শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সুপণ্ডিত, জ্ঞানী ও সুপ্রবীণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন পিতা-মাতার সর্ববিধ সুখ সাধনে পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন; মা বাপের অনুগত হইয়া চলাই তাঁহার পরম ধর্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে সর্বদা দেবতাবোধে পিতা-মাতার সেবা করিয়াছেন। আজ, সেবক, শেষ দেবতা হারাইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আজ সে মধুরমূর্তি মাতৃদেবীও নাই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সৎকর্মশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ ও পিতৃদেবকেও স্বহস্তে শ্মশান-ভস্মে পরিণত করিয়া আসিলেন। তাই আজ বালক অপেক্ষা অসহায় হইয়া রোদন করিয়া রজনী যাপন করিলেন। তাঁহার পক্ষে বালকের ন্যায় রোদন করা অতি স্বাভাবিক। ঠাকুরদাসের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ ও ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আদর্শ হিন্দু গৃহস্থ অধিক মিলে না। তিনি ধর্মনিষ্ঠবোধে গৃহকর্ম সকল সম্পন্ন করিতেন, ধর্মবোধে তিনি যুগব্যাপী ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সুশিক্ষা লাভের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দিবারাত্রি সন্তানের জ্ঞানোন্নতির জন্য শ্রম করিয়াছিলেন। নিজের উপার্জিত সামান্য আয় হইতে সম্ভবমতো শতবিধ সদনুষ্ঠানে নিজ পরিবারবর্গকে নিযুক্ত রাখিতেন; সেই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বংশগুণে ও পারিবারিক সদনুষ্ঠানাদির সুবাতাসে আশৈশব সুশিক্ষা লাভ করিয়াই লোকসেবাপরায়ণ পুরুষরত্নে পরিণত হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক অনাথ বালক তাঁহার বীরসিংহের বাটীতে লালিত, পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিনের জন্যও তাহারা পরগৃহে বাস করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারে নাই; কারণ, ঠাকুরদাস প্রিয়তম পৌত্র নারায়ণ ও সেই সকল অনাথ বালকদের আহার বিহারে কিছুমাত্র তারতম্য করিতেন না। এরূপ উচ্চ উদার লোকহিতৈষণার ক্রোড়ে পালিত হইয়াই বিদ্যাসাগর দয়ার সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। জেমস্ মিল, জন স্টুয়ার্ট মিলের সুশিক্ষালাভে সহায়তা করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ঠাকুরদাস নিজ অধ্যবসায় ও সাধনা গুণে ঈশ্বরচন্দ্রকে জনসমাজের সুহৃদরূপে গঠন করিয়া জেমস্ মিলের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মিল পিতৃবিয়োগে আপনাকে বালকের ন্যায় অসহায় বোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রও পিতৃবিয়োগে ঝঞ্ঝাতাড়িত ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাস গ্রামবাসীর প্রতি এরূপ

অনুকূল ছিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে নিতান্ত বিরল বলিয়াই বোধ হয়। বিধবাবিবাহ বিষয়ে গ্রামবাসিগণের মধ্যে যাহারা বিদ্রোহী ছিলেন তাঁহারা সুযোগ পাইলে ঠাকুরদাসের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার জাহানাবাদের তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে ঐ কথা বলেন। ঘোষাল মহাশয় মফঃস্বলে ভ্রমণে বাহির হইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হন। সেখানে ঠাকুরদাসের পিতৃস্নেহ সম্ভোগ করিয়া বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, গ্রামের লোক আপনার উপর বড় অত্যাচার করে, তাহাদের নাম আমাকে বলিতে হইবে।' ঠাকুরদাস হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'সে কলিকাতায় থাকে, কার মুখে কি শুনিয়াছে, তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া এখানকার কাহাকেও কিছু বলিও না। ইহারা সকলেই আমার উপর সদাপ্রসন্ন।' ঘোষাল মহাশয়কে এই কথা বলিয়া গ্রামবাসিগণকে গোপনে সংবাদ দিলেন যে হাকিম বিধবাবিবাহবিরোধী পক্ষের লোকদের দৌরাত্মের কথা কোথা হইতে শুনিয়া আসিয়া আমার নিকট নাম চাহিতেছেন। আমি কাহারও নাম করি নাই, বরং বলিয়াছি আমার সঙ্গে সকলের বেশ সদ্ভাব আছে। তেমারা হাকিমের সামনে এক বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়। (৩০) এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ।

মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা নিবন্ধন পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িল; তাঁহারও বিসূচিকা রোগের লক্ষণ দেখা দিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেকেই কাশী ত্যাগ করিয়া সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা সেইখানেই আদ্যকৃত্য শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। তিনি এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অশৌচাবস্থায় ঔষধাদি সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া অবশেষে সকলের পরামর্শ মতো সেই রাত্রিতেই কলিকাতা আসা স্থির হইল। কলিকাতায় আগমন করিয়া ক্রমে অল্পে অল্পে সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি কার্য সমাপন করিয়া বহুকাল অতি নিভৃতভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সহজে কোথাও কোনো কার্যে লিপ্ত হইতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে কাহারও কর্তৃক অত্যধিক অনুরুদ্ধ হইলেই কেবল তাঁহাদের কার্যকলাপে যোগ দিতেন, নতুবা সর্বদা নির্জনবাসকালে জ্ঞানচর্চা ও হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনই তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রধান কার্য হইয়াছিল।

---

৩০ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

শরীরের অবস্থা দিন দিন নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ে সময়ে এক একখানি অন্তিম বিনিয়োগপত্র ( উইল ) দ্বারা নিজের সম্পত্তি ও তাহার আয় হইতে কিরূপ ব্যয় হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার সর্বশেষ উইলের যে-যে অংশ সাধারণের জানিবার উপযোগী তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্বতন সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চোগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় জনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্রের মর্মানুযায়ী যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় প্রভৃতির ভরণ পোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, ঐ সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদিগের পরিবারবর্গের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার উইলে যে মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মোট সমষ্টি ৫৬১ টাকা, আর বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৫। এতদ্ভিন্ন, প্রয়োজন হইলে অপর ৬ জনের সম্বন্ধে ১০৫ টাকার বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই শেষোক্ত বৃত্তিদান বিষয়ে কার্যদর্শিগণের উপর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বৃত্তি দানের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তাহার অন্যথা হইলে, সে সকল বৃত্তি দান বিষয়ে নিষেধ বাক্যের উল্লেখ আছে।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে সদনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে ঃ

১. জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় ১০০ টাকা
২. ঐ ঐ ... ... চিকিৎসালয় ... ৫০ টাকা
৩. ঐ ঐ ...অনাথ ও নিরুপায় লোক ... ৩০ টাকা
৪. বিধবাবিবাহ ... ... ১০০ টাকা

মোট ২৮০ টাকা

উইলের ১৪শ প্যারার নির্দেশ মতো দানের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে তাঁহার কি-কি কার্যের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ ছিল। এদেশের শিক্ষাবিস্তার ও বিধবাবিবাহ প্রচলনপক্ষে যে তাঁহার জীবন ব্যাপী অনুরাগ ছিল, তাঁহার অন্তিম বিনিয়োগ পত্রেও তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গড়ু এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে কার্যদর্শীরা তাঁহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ টাকা দিবেন।

১৮। এইক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে, যদি উত্তর কালে তাহার খর্বতা হয়, তাহা হইলে যাহাকে অথবা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্বন্ধ করিলাম কার্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনানুসারে তাহায় ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোনো অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে, আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত আমার পুস্তকসকল ঐ স্থানে বিক্রীত হয়। তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য নির্বাহ হইতেছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা হইলে, কার্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (৩১)

এই উইলের তারিখ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৭ সাল। (৩২)

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মোঃ কলিকাতা

উইলের স্বাক্ষী।

| | |
|---|---|
| শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | শ্রীনীলমাধব সেন (ডাঃ) |
| শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় | শ্রীযোগেশচন্দ্র দে |
| শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন | শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী |
| শ্রীশ্যামাচরণ দে | শ্রীকালীচরণ ঘোষ |

---

৩১ নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই এই ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

৩২ ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া বন্ধুবান্ধব সন্নিধানে এই উইল পরিবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনের অত্যল্পকাল পূর্বে তাঁহার অভিপ্রায়মতো এক সংশোধিত উইল প্রস্তুত হইয়াছিল, অপরাপর অংশ অনুমোদিত হইলেও মেট্রপলিটন কালেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়া বৃদ্ধি হয়, পরিশেষে আর সংশোধিত উইল স্বাক্ষর করা হয় নাই।

তিনি সন ১২৮৩ সালের শেষভাগে বাদুড়বাগানে স্বকৃত নূতন বাড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়টিকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ দূর করিলেন। পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত নির্জন ক্ষুদ্র বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দ এই ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখা পড়া করিবার বিস্তর অবসর পাইতেন এবং দিবারাত্রি কোনো না কোনো একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞানচর্চা বা শাস্ত্র পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি প্রাথমিক বিলাতযাত্রিগণের পৃষ্ঠপোষক হইয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে নানা কারণে বিলাত যাওয়ার বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে আবার আধুনিক কালের কাহারও কাহারও, বিশেষতঃ সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র [জ্ঞানেন্দ্রনাথ] গুপ্তের বিলাত গমনে সম্মতি ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে একবার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিলাত যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এতদূর প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে গোপনে জননীর অনুমতি লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই বিলাত যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্রের জননী অতি বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি এই সকল গোপন আয়োজন দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি ছেলে হয়ে যেমন আমাকে না বলিয়া যাইতে পারিতেছ না, তোমাকে যাইতে দিবার আগে মেয়ে ব'লে আমারও কি বাবাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়?' (৩৩) তখন সুরেশচন্দ্র বিলাত যাত্রার বিশেষ প্রতিবন্ধক দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া মাতামহের অনুমতি প্রার্থনার সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। আর বিলম্ব সহে না, এমন সময় একদিন এই কথা বলিবার জন্য কতবার সে বিদ্যাসাগর সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা বলিবার নহে। তিনি দৌহিত্রের বারংবার ছুটাছুটিতে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর কিছু দরকারি কথা আছে বলিয়া বোধ হয়, তা কিছু থাকে ত বল্ না।' সুরেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি বিলাত যাইব।' বিস্ময়াবিষ্ট রহস্যের স্বরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'কি? ব্যারিস্টার হয়ে এসে চাকরির জন্য আমারই উমেদারী কর্‌বি তো?' তারপরে রহস্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'টাকাকড়ির বড় অনটন হইয়া পড়িয়াছে, অবস্থায় আর হয় না।' বালক তখন নিতান্ত নিরাশ ও বিপন্ন হইয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, শেষে শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ও বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের উপরোধে

৩৩ জ্যেষ্ঠা কন্যা এই সকল সদ্‌গুণেই পিতার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তাই সকল বিষয়ে পিতার নিকট আব্‌দার, উপরোধ ও অনুরোধ চলিত। চলিত বলিয়াই অনেক সময় সুযোগ পাইলেই একমাত্র সহোদরের সুখ ও সুবিধাসাধনে বিস্মৃত হইতেন না।

ও অনুরোধে তিনি দৌহিত্রকে বিলাত পাঠাইতে সম্মত হন। কিন্তু পরিশেষে পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় সে চেষ্টা আর কার্যে পরিণত হয় নাই।

এই বিলাত যাওয়ার কথাবার্তা লইয়া বাটীর ভিতরে একদিন বালক জননীর সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিয়া ফেলিলেন, 'আমার বাবা থাক্‌লে কি আর তোমার বাবার কাছে আবদার করিতে যাইতাম?' এই কথা কয়টি জননীর হৃদয়ে বজ্রসম বিদ্ধ হইল, ওদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরের জানালা হইতে দৌহিত্রের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। ঐ কথা তাঁহার কর্ণ-গোচর হইবামাত্র তিনি দৌহিত্রকে ডাকেন এবং ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, গভীর ক্ষোভ ও অভিমানে বহুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'তোরা আমাকে পর ভাবিস্। সে থাক্‌লে তোদের জন্য যাহা করিত, আমি তার চেয়ে কি কম করিতেছি?' শেষে সরেশচন্দ্র নিজের অল্প বুদ্ধির দোহাই দিয়া দোষ স্বীকার করিয়া বহু পীড়াপীড়িতে তবে দাদামহাশয়ের মানভঞ্জন ও ক্ষোভ নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

একটি দুটি কি ততোধিক অথচ অল্পসংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিরূপ যত্নের সহিত আহার করাইতেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু একটি ঘটনার উল্লেখের আবশ্যক। একবার রায় রামগতি মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও শ্রীকৃষ্ণপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারিকবাবুর একটি ছোট ছেলেকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। আহারের সময় নিকটে বসিয়া কে কোন্ তরকারি পাক করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতেছেন, মিত্র মহাশয়ের বালক-পুত্র বিদ্যাসাগর বাটীর বৃহৎ আয়োজন আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিকটে বসিয়া দু-একবার দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া শেষে জুতা ত্যাগ করিয়া নিজে জননীর মতো অন্ন ব্যঞ্জন মাখিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রাস প্রস্তুত করিয়া তাহার খাইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। সরলতা, উদারতা ও সেবার ভার এই ঘটনাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৃহৎ ব্যাপার, সমারোহের কার্য তিনি এদেশীয় পদ্ধতি অনুসারে বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত উপবাসে অপেক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজন হইতে ইতর জাতীয় প্রত্যেক লোকটির আহারের পরিসমাপ্তি না হইলে নিজে আহার করিতেন না। কত মিষ্ট কথায় অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিয়া শেষ পর্যন্ত পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রীতি সমাদর প্রদর্শন করিতেন। দুর্ভাগ্যবশত আজকালকার দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

১২৮৩ সালের শেষ ভাগে বাদুড়বাগানের বাড়িতে আসিবার পূর্বে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ পরিবারের আবাল বৃদ্ধ সকলেই

যে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথম চাকরির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সর্ববিধ অনুষ্ঠানেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণবাবুর সহকারিতা পাইয়াছেন, এবং দীর্ঘকালের একত্র বাস নিবন্ধন সকলেই যেন তাঁহার আপনার লোক হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ একটি ক্ষুদ্র বালিকা সামান্য কয়েক দিনের জন্য রাজকৃষ্ণবাবুর গৃহে পৌত্রীরূপে অবতীর্ণা হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিশুপ্রিয়হৃদয়েদীর্ঘকালস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল। বালিকাটির নাম ছিল প্রভাবতী। বালিকার রাজত্ব বিস্তার, তাহার বিচ্ছেদ এবং তন্নিবন্ধন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাতরতার পরিচায়ক কয়েক পঙ্‌ক্তি "প্রভাবতী সম্ভাষণ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

প্রভাবতী সম্ভাষণ

বৎসে প্রভাবতী! তুমি সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, একেবারে নয়নের অন্তরাল হইয়াছ; কিন্তু আমি অনন্যমনাঃ হইয়া, এরূপ অবিচলিত স্নেহভরে নিরন্তর তোমার অনুধ্যান করি যে, তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার নয়ন পথের অতীত হইতে পার নাই। প্রতিক্ষণেই আমার স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যেন তুমি বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, নীনা (৩৪) বলিয়া, কর প্রসারণপূর্বক কোলে লইবার নিমিত্ত করিতেছ; যেন তুমি উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, আয় না বলিয়া সলিল কর-সঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ; যেন আমি আহার করিতে গিয়াছি, তুমি, তোর সঙ্গে খাব বলিয়া, আমার কোলে আসিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছ; যেন আমার কোলে বসিয়া আহার করিতে করিতে কৌতুক করিবার নিমিত্ত মাগী শোলো (৩৫), বলিয়া আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, পীঠোপরি শয়ন করিতেছ, যেন আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থান করিবামাত্র, তুমি আমার সহিত ঝগড়া করিতেছ, আর সকলে আহ্লাদে গদগদ হইয়া, উৎসুক চিত্তে শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন (৩৬) যেন আমি

(৩৪) নেনা।

(৩৫) মাগী শুইল। আমি আদর করিয়া তোমার মাগী বলিয়া আহ্বান করিতাম তুমিও কখনো কখনো কৌতুক করিয়া আপনাকে মাগী নির্দেশ করিতে। তোমার এই মঞ্জুল শয়নলীলা অবলোকন করিয়া ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইতেন।

(৩৬) তুমি এই কৃত্রিম ঝগড়াকালে এরূপ স্বরভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস ও অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে যে, তদ্দর্শনে নিতান্ত পামরেরও হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে ও অভূতপূর্ব কৌতুকরসে উচ্ছলিত হইত। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার এত মধুর ও এত প্রীতিপদ বোধ হইত যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, অনেকে তৎপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন।

বিকালে জল খাইতে গিয়াছি, তুমি কোলে বসিয়া আমার সঙ্গে জল খাইতেছ, এবং জল খাওয়ার পর, দুখানি (৩৭) দে বলিয়া, আমার মুখ হইতে সুপারি বহির্গত করিয়া লইতেছ ঃ যেন তুমি বাহিরে আসিবার নিমিত্ত আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে আমার চিবুকধারণ পূর্বক কহিতেছ, নাফাসুনি পড়ে যাব ; আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত কহিতেছি, না আমি লাফাব ; তুমি অমনি তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিতেছ, দেখ্‌দিকি মা। (৩৮) যেন তোমার দাদারা ভচ্চে আর তোমায় ভালবাসিবেন না এই বলিয়া পরিহাস করিতেছ, তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া পাছে আমি না ভালবাসি, এই আশঙ্কায় ভাল বসুবি, ভাল বুসবি (৩৯), এই কথায় আমার অনুপমেয় শিরশ্চালন সহকারে বারংবার কহিতেছ (৪০) ; যেন আমি, খাব খাব বলিয়া, মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি, তুমি, এই খা বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ ; আমি, খাব না বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি ; তুমি, তবে এই খা বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ, আমিও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি, অবশেষে তুমি, আর কিছু না বলিয়া যেন উপায়ন্তর নাই ভাবিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পণ করিতেছ।

এইরূপ আমি সর্বক্ষণ তোমায় অবলোকন, এবং তোমার সহিত কৌতুক ও কথোপকথন করিতেছি ; কেবল তোমায় কোলে লইয়া তোমার লাবণ্যময়

(৩৭) দুখানি।

(৩৮) তুমি এমন ভীরুস্বভাবা ছিলে যে, কখন সাহস করিয়া গাড়ি চড়িতে পারি নাই ; এবং সেই ভীরুস্বভাব বশতঃ, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায়, সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে, আমায় সাবধান করিয়া দিতে।

(৩৯) ভাল বাসিবি, ভাল বাসিবি।

(৪০) এ বিষয়ে এক দিনের ব্যাপার স্মরণ করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছি, তুমি বাড়ির ভিতরের নিচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া, আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ ; এমন সময়ে শশী কৌতুক করিবার নিমিত্ত কহিল, ভচ্চে আর তোমায় ভালবাসিবেন না। তুমি অমনি শিরশ্চালন পূর্বক ভাল বসুবি, বসুবি বলিয়া আমায় বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন আমি ভালবাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম ; সে দিবস সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলাম। তুমিও প্রতিবারেই, না ভাল বসুবি এই কথা কহিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তুমি কিঞ্চিৎ স্ফূর্তিহীন বদনে, তুই ভাল বসুবিনি, আমি ভাল বসুবো, এই কথা এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত ও স্নেহরস সহকারে বলিয়া বিরত হইলে যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি বোধ হয় যাবজ্জীবন এই ব্যাপার বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। একদিন দিবাভাগে নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল, কেবল সেই দিন সেই সময়ে, ক্ষণকালের নিমিত্ত, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অভূতপূর্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহুদ্বারা পীড়নপূর্বক, সজলনয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল। এই আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সে দিবস, যে বিষম ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যদি তুমি এত সত্বর পলাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলে, (৪১) সংসারে না আসাই সর্বতোভাবে বিধেয় ছিল। তুমি অল্প দিনের জন্য আসিয়া সকলকে কেবল মর্মান্তিক বেদনা দিয়া গেলে। আমি যে তোমার অদর্শনে কি বিষম যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবার ভাবিতেছ না। আমার যে আহার বিহার, শয়ন, উপবেশন কোনো বিষয়ে অণুমাত্র সুখ নাই। আহারের সময় অধিক দিন, শোকসংবরণে অসমর্থ হইয়া, নয়নজলে অন্ন ব্যঞ্জন দূষিত করি; একাকী উপবিষ্ট হইলে, তোমার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করি; রাত্রিকালে শয়ন করিয়া, অধিকাংশ সময়ই, অনন্যচিত্তে তোমায় চিন্তা করি; কখন কখন, ভাবনাভরে, যেন যথার্থই তোমার কথা শুনিতে পাইলাম, এই মনে করিয়া চকিত হইয়া উঠি। ফলতঃ তুমি যে আমায় কিরূপ যাতনায় নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছ, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করিতে পারিতেছ না।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই; তাহা থাকিলে তুমি কদাচ এরূপ আচরণ করিতে না। বলিতে কি, তুমি অত্যন্ত মায়াবিনীর ব্যবহার করিয়াছ। কতিপয় দিবস মাত্র, অতিমাত্র স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করিয়া, তুমি অকস্মাৎ নিতান্ত নির্মম ও নৃশংসের আচরণ করিলে। এরূপ করিবে জানিলে আমি কখনই তোমার স্নেহপাশে ও মমতাজালে বদ্ধ হইতাম না। পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া, যেমন নিতান্ত নির্বোধের কর্ম করিয়াছিলাম, তুমি তেমনই আমায় সমুচিত প্রতিফল দিয়াছ। তোমার এই অতর্কিত নৃশংস আচরণ দ্বারা যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাতে অন্ততঃ এই মহোপকার হইয়াছে যে আমি আর কখন এরূপ যন্ত্রণাভোগের পথ প্রস্তুত করিব না। বৎসে! তুমি যে আমার কি অপকার করিয়াছ তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। আমি তদগতপ্রাণ ছিলাম, এবং যাহাতে তোমার প্রীতি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে

---

(৪১) তুমি, ১৭৮২ শকের ২২শে মাঘ সোমবার জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৮৫ শকের ৪ঠা ফাল্গুন সোমবার নরলীলা সংবরন করিয়াছ; সুতরাং তোমার বয়ঃক্রম তিন বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

যত্ন করিতাম। কিন্তু তুমি, তাহার বিনিময়ে, আমার বক্ষঃস্থলে বজ্র প্রহার করিয়া গিয়াছ। যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমায় নির্মম, নৃশংস, নির্দয় ও কৃতঘ্ন বলিতে পারি।

বৎসে! কিছু দিন হইল, আমি যে অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি তাহাতে আমার কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হয় না। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। এক পদার্থ ভিন্ন আর কোনো বিষয়েই প্রীতি বা সুখ বোধ হইত না। তুমি আমার এক অপদার্থ ছেলে। একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতাম। নানা কারণে যখন চিত্ত আন্তরিক অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া সংসার কেবল যন্ত্রণাভবন প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে তোমায় কোলে লইলে ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, সর্বশরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানিং তুমিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং তোমার অসদ্ভাবে আমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি অনায়াসেই অনুভব করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, অনেক অংশে আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে ব্যক্তিমাত্রেই তোমার মোহিনী মূর্তি ও মাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলে তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু কোনো পরিবারেই, তোমার ন্যায় অবিসংবাদে সর্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য নিরীক্ষণ করি নাই।...

এইরূপে তুমি সংসারসংক্রান্ত সকল লীলা (৪২) সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয় যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে অশেষ যন্ত্রণাভোগ অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে, এই জন্যই ঈদৃশ স্বল্প সময় মধ্যে, সংসারযাত্রাসংক্রান্তিক সকল সাধ সম্পন্ন করিয়া সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি স্বল্পকালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া আমার বোধে, অতি সুবোধের কর্ম করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয়ত অদৃষ্টগুণে দুঃখভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে তুমি কখনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা সমাধান করিতে পারিতে না।

---

৪২ শৈশবলীলা অবলম্বনে জীবনের পরিণত বয়সের যাবতীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিয়াছেন। তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এক বিষয়ে আমার হৃদয়ে বিষম ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। পীড়াকালে তুমি পিপাসায় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমার ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধসেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, আর খাব বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসা প্রদর্শন করিতে আমি তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি নিশ্চিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না। ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, তোমার যন্ত্রণা নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে! তুমি যে পিপাসায় আকুল হইয়া জলপ্রার্থনাকালে আমার দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে, বিষদগ্ধ শল্যের ন্যায় নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, সেই মর্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্তের নিমিত্ত আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, আমার মতো পামর ও নৃশংস ত্রিভুবনে আর নাই।

বৎসে! তুমি আমায় আন্তরিক ভালবাসিতে, ও আমিও যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসিতাম, তাহা আমরা পরস্পরে বিলক্ষণ জানি। আমি তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, অত্যন্ত অসুখী হইতাম; তুমিও, আমায় অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে, এবং আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে তোমার অদর্শনে আমি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি, কিন্তু তুমি, আমায় এতদিন না দেখিয়া কি ভাবে কাল যাপন করিতেছ, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি নিতান্ত নির্মম হইয়া, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমায় নিমিত্ত আকুল হইতেছ কি না জানিতে পারিতেছি না, আর হয়ত এত দিনে আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু আমি তোমায় কদাচ বিস্মৃত হইব না। তোমার মোহন মূর্তি, যাবজ্জীবন আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবে। কালসহকারে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায় তোমার সংক্ষিপ্ত লীলা লিপিবদ্ধ করিলাম, সর্বদা পাঠ করিয়া তোমায় স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিব; তাহা হইলেই, আমার বিস্মৃত হইবার ভয় রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, যেন অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ কর; আর যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন। যেন তাহাদিগকে, আমাদের মতো, যন্ত্রণাভোগ করিতে না হয়।

কলিকাতা। ১লা বৈশাখ, ১৭৮৬ শকাব্দঃ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সূত্রে রাজকৃষ্ণবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে রাজকৃষ্ণবাবুর সংস্কৃত শিক্ষার আগ্রহের মধ্যে যে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্র আমরণ বিবিধ আকারে সেই আত্মীয়তা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুমণ্ডলী উল্লেখযোগ্য। বন্ধুদিগের কাহারও কাহারও দ্বারা সময়ে সময়ে ক্লেশ পাইলেও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী পরম গৌরবের স্থল—পরম আদরে রক্ষা করিবার জিনিস। ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র, ৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺দ্বারকানাথ মিত্র, ৺শ্যামাচরণ দে, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৺প্যারীচরণ সরকার, ৺কালীচরণ ঘোষ, ৺নরামতনু লাহিড়ী, ডাক্তার ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবানুভব করিতেন। সম্পদে বিপদে পরামর্শ লইতেন এবং প্রয়োজন হইলে পরস্পরে মিলিয়া অনেক দুঃখের কান্নাও কাঁদিতেন। এরূপ দুর্লভ বন্ধুজন পরিবেষ্টিত হইতে পাওয়া পরম সুখ, সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব, মুখের কথায় বা চিঠিপত্রে আবদ্ধ থাকিত না। তিনি সুহৃজ্জনের সকল অবস্থায় সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাদের বিপদে মাথা পাতিয়া দিতেন, বন্ধুসেবায় কোনো ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না।

ইহার আভাস পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ ভাবে কয়েকখানি পত্র ও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে :

বিদ্যাসাগর মহাশয় সৌভাগ্য সোপানের প্রথম স্তরে যখন পদার্পণ করেন, সেই সময়ে বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণবাবুর সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিবিধ আকারে তাহার পরিবর্তন ও পরিণতি হইয়া ডাক্তারবাবুর মরণান্তকাল পর্যন্ত তাঁহার পরিবার পরিজনদের সংবাদ হইতে ও সুরেন্দ্রবাবুর সর্ব প্রকার সুবিধা সাধনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুরাগভরে নিযুক্ত ছিলেন। ইংলণ্ডে সুরেন্দ্রবাবুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় বয়স লইয়া গোলোযোগ বাধিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই উদ্যোগী হইয়া মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া এখান হইতে বয়সের প্রকৃত বিবরণ প্রেরণ করিয়া সুরেন্দ্রবাবুর বিপদুদ্ধার করেন। পুনরায় যখন অন্যাবিধ দুর্বিপাকে পড়িয়া সুরেন্দ্রবাবুর অতি আদরের সিভিলিয়ানী সুখে জলাঞ্জলী দিতে হইয়াছিল, তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সুরেন্দ্রবাবুকে সাদরে নিজের মেট্রপলিটন কালেজে শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সেকালের বন্ধুদিগের মধ্যে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সহিত

বিদ্যাসাগর মহাশয় দীর্ঘকালব্যাপী আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহিত কিরূপ গভীর আত্মীয়তা ছিল, তাহা বর্ণিত হইবার নহে। শেষ দশায় জীবনের কোনো এক গুরুতর ও পারিবারিক ঘটনায় সর্বাধিকারী মহাশয় যে আক্ষেপ ও গভীর দুঃখের পরিচায়ক কাতরোক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, অকৃত্রিম সুহৃদ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেইরূপ আত্মকথা কেহ প্রকাশ করে না। পরিশেষে সামান্য একটা ঘটনায় সর্বাধিকারী মহাশয় ক্ষুন্ন হইয়া অনুযোগপূর্ণ এক পত্র লেখায় তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই ঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী

ভ্রাতঃ! প্রায় দুই সপ্তাহ কাল আমি অত্যন্ত অসুস্থ ও একটি দৌহিত্র উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। এজন্য পরিচারকদিগকে বলিয়াছিলাম, কাহাকেও আসিতে দিও না। বলিবে আমি অতিশয় অসুস্থ আছি, দেখা হইবেক না। অনেকে এই কথায় ক্ষান্ত না হইয়া চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় লিখিয়া পরিচারকদিগকে দিতেন, তাহারা ঐ সকল চিরকুট আমার নিকট আনিত; আর যদি কেহ কাহারও পত্র আনিতেন তাহাও আনিয়া দিত। এইরূপ চিরকুট ও পত্র প্রত্যহ অন্ততঃ পঁচিশখানা তাহারা আনিয়া দিয়াছে। এক গোস্বামীর পুত্রকে তুমি যে পত্র দাও, তাহা আনিয়া দিয়াছে; তোমার প্রেরিত যে পত্রের উত্তর লিখিতেছি তাহাও আনিয়া দিয়াছে, এমন স্থলে তোমার উল্লিখিত Gentleman's son (ভদ্রলোকের ছেলেটি) যে পত্রখানি আনিয়াছিলেন, কেবল সেইখানি আনিয়া আমায় দিতে অসম্মত হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পত্র পাইয়া পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, 'কোনও ব্যক্তি পত্র আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া আপনাকে দিতে অসম্মত হইয়াছি, যদি কেহ এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তিনি অন্যায় কহিয়াছেন, আমরা পত্র লইয়া যাইব না, এরূপ কথা কাহাকেও বলি নাই ঃ যিনি যখন পত্র আনিয়াছেন তখনই ঐ পত্র আপনার নিকট আনিয়া দিয়াছি।' যাহা হউক সমুদায় অনুধাবন করিয়া পরিচারকদিগকে অপরাধী করিতে সাহস হইতেছে না এবং আপনাকেও অপরাধী ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বৃত্তান্ত কিছুই জান না, সুতরাং তোমার Gentleman's son (ভদ্রলোকের ছেলেটি) যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া উচিত ও আবশ্যক বোধে আমায় যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছ। ফল কথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়, সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেক দিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, এজন্য তোমার পত্র পাঠ

করিয়া সবিশেষ ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলাম না। ইতি ১৫ই মাঘ ১২৮৭ সাল।

ত্বদেকশর্ম শর্মণঃ—

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ—

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যখন কর্মোপলক্ষে প্রথম কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর গমন করেন, তৎপূর্বেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি প্রতিভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয়েই উভয়কে আদরের পাত্র ভাবিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। সেই সম্বন্ধের পরিচায়ক একখানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনার নির্বিঘ্নে পঁহুছান সংবাদ পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু যাইয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর স্থান ভাল, ত্বরায় সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকিবেন কোনো সন্দেহ নাই; তবে সে স্থান নূতন, এখানে যেমন সর্বদা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিতেন ও সর্বদা তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা দুর্লভ, সুতরাং এ নিমিত্ত কিছুদিন মনের অসুখ থাকিবেক, ক্রমে তথায়ও আত্মীয় সঙ্ঘটন হইবেক। সংসারের এই রীতি। লিখিয়াছেন Second master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার সহিত অস্বরস হইলে অসুখের বিষয় ঘটিতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত মিল করিয়া লওয়া ভাল। আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত অধিক করিয়া খাইবেন, আপনি ধর্মতঃ আপন কর্ম নির্বাহ করিবেন, তাহা হইলে ধর্মদ্বারে খালাস।

লোক্যাল কমিটির ( Local Committee ) মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখিবেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও হানি নাই। বোধ করি, সাক সাহেব তথায় ম্যাজিস্ট্রেট। আমি শুনিয়াছি তিনি ভদ্র বটেন ও বুদ্ধিজীবীও বটেন; বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ আছে।

সর্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং অনুগ্রহ পূর্বক মধ্যে মধ্যে মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও সুস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

ভবদেকশর্মশর্মণঃ

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ ঘোষ, বাবু শ্যামাচরণ দে ও তদীয় ভ্রাতা বাবু বিমলাচরণ দে, ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি মহাশয়গণের সহিত সর্বদাই একত্র বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত পত্রাদি লেখার অধিক অভ্যাস ছিল না। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কোনো প্রকার বিপদ-আপদে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার জন অপেক্ষাও অধিক স্নেহমমতা ও যত্নের সহিত সেবা করিয়াছেন।

বাবু শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের গৃহে এক ভয়ানক পারিবারিক দুর্ঘটনা উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই জনে জনে স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখে জল দিয়াছিলেন। শ্যামবাবুর তরুণবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি অল্প বয়সে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন। এই নিদারুণ বিপৎপাতে গৃহের সমগ্র পরিজনবর্গ যখন ধরাশায়ী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই একাকী সকলকে শান্ত করিয়াছেন, ভূশয্যা হইতে উঠাইয়া মুখে সরবতের বাটি ধরিয়াছেন, যতদিন পরিবারের প্রত্যেকে একটু সবল না হইয়াছে, ততদিন প্রতিদিন নিকটে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রত্যেকের চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন। (৪৩)

এক সময়ে বারাসত নিবাসী ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে দীর্ঘকালের জন্য ভাগীরথী-বক্ষে নৌকাবাসে কালযাপন করিতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় অকৃত্রিম সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ভাগীরথী-বক্ষে বাস করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে কায়স্থ পরিবারের কোনো এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহিণী তাঁহাকে পিতৃসম্বোধনে সুখানুভব করিতেন; কিন্তু এই রমণী উন্মাদিনী ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে আহার করাইতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময়ে একাদিক্রমে ছয়মাস কাল বেলা দশটার সময় সেই কন্যাস্থানীয়া মহিলাকে আহার করাইতে গিয়াছেন। বার্ধমাননিবাসী ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন, 'তাঁহাদের পরিবারে (৪৪) কোনো প্রকার আপদে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত কোনো কার্যই হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেখানেই থাকুন ঐ পরিবারে কাহারও পীড়া হইলে, কলিকাতায় লইয়া যাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন হইতে পারিত না।' গঙ্গানারায়ণবাবু বলেন, 'তিনি ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ, এ পার্থক্য আমাদের স্মরণ থাকিত না। আমরা সর্বদাই তাঁহাকে আমাদের অভিভাবক, পরমাত্মীয়, গুরুজন বলিয়া মনে করিতাম।'

তাঁহার এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কত স্থানে কত পরিবারের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সামান্যরূপ বর্ণনারও স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নহে। তিনি বন্ধু সেবার জন্য কান্দী ও কৃষ্ণনগর, বর্ধমান ও বরিশাল, কলিকাতা ও কাশী, ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্বত্র ছুটাছুটি করিতে পারিতেন। বন্ধুজনের বিপদ্বিমোচন ও সুখসাধনে সর্বস্ব ব্যয় ও আত্মবিক্রয় করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না।

তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং কিরূপ সুহৃৎ

---

৪৩ ৺শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

৪৪ বর্ধমান নিবাসী ৺প্যারীচরণ মিত্র মহাশয়ের পরিবার।

বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার সেই স্নেহভাজন বন্ধুগণের কাহারও পত্র এবং কাহারও পত্রাংশের দ্বারা তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে ঃ

প্রিয় মহাশয়— ১৮ই জুন ১৮৭৪

আমার শরীর ভাল নহে, জ্বর নাই কিন্তু কোনো প্রকার উপকার বোধও করিতেছি না। বেশীর ভাগ ইহার উপর আবার হাঁপানি হইয়াছে, কাল হইতে মেঘলা হইয়া আরও উপকার হইয়াছে!! আপনি কি লোকনাথবাবুকে লিখিয়াছিলেন? আমি অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছি। একাদশীর পূর্বে আমাকে যাইতেই হইবে, তা না হইলে সমস্ত উপসর্গগুলি লইয়া জ্বরটি আবার দেখা দিবে। আপনি যদি আমাকে বাঁচাইতে চান শীঘ্রই আমাকে এখান হইতে বিদায় করিবার উপায় করুন। (৪৫)

আপনার স্নেহভাজন<br>
( স্বাক্ষর ) শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার<br>
ঢাকা

জগদীশ শরণম্

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং

...মহাশয়ের পুস্তকগুলি আগামী বুধবারের জাহাজে রওয়ানা হইবে। আমি মঙ্গলবার অপরাহ্ণে মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি। সময় পাইলে সেদিনই রওয়ানা করিতাম। এই পুস্তকগুলির মূল্য আমার লিখিতে হইতেছে না। আমি আমার প্রয়োজনের জন্যে ২।৩ বৎসর হয়, কলাপের সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে 'আখ্যাত' ছাড়া আর সকলগুলি পুস্তকই ভাল পণ্ডিতের ঘরের। আমি কলিকাতা থাকা কালেই এই বইগুলি মহাশয়কে উপহার দিব বলিয়া মনে মনে স্থির রাখিয়াছিলাম। এবং সেই সঙ্কল্প অনুসারে আগামি জাহাজে পাঠাইতেছি। যদি মহাশয় গ্রহণ না করেন, অথবা মূল্য দিতে চান, আমি অন্তরে বড়ই আঘাত পাইব। আপনি মনের সহিত পূজা করিতে পারেন, এমন কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে কখনও আসেন নাই বলিয়া, দয়া করা কাহাকে বলে ইহা যেমন বুঝেন, পূজা ও ভক্তি করা

---

৪৫ My Dear Sir, 18-6 74.

I am not doing well, no fever no improvement. And in addition I have got return of the asthma, thanks to the foul weather prevailing since yesterday. Have you written to Lokenath Babu (Dr. Lokenath Moitra)? I have become impatient. I must go before "Ekadosi" or I am sure to have a relapse of the fever with all attendant troubles. If you want to save me, do something quick to send me away.

Yours affectionately,<br>
(Sd.) Mahendralal Sarcar.

রাজা ৺কৃষ্ণনাথের (৪৬) সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম পরিচয় ও ক্রমে আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। রাজা কৃষ্ণনাথ অপুত্রক ছিলেন। সদনুষ্ঠান-প্রিয় রাজা কৃষ্ণনাথ জনহিতকর অনুষ্ঠান বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। সম্ভ্রান্ত জমিদার কিংবা রাজন্যবর্গের কাহারও সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয়তা হইলে, তিনি সর্বদাই দরিদ্রপালন ও নানাবিধ সদনুষ্ঠানে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেন। রাজা কৃষ্ণনাথের হৃদয়েও সেই পরোপকার সাধনেচ্ছার আকাঙ্ক্ষা প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে একটি উচ্চ শ্রেণীর কালেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানীয় লোকের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ মুক্ত করিয়া দিবার সমস্ত ব্যবস্থাই হইয়াছিল। দৈবদুর্বিপাকবশতঃ এই সদাশয় মহাত্মা যৌবনসীমা অতিক্রম করিতে না করিতে লোকলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে কোমলপ্রাণা—দীনবৎসলা মহারাণী স্বর্ণময়ী সি. আই. ই. তরুণ বয়সে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন। সকল সুখের অধিকারিণী হইয়াও মহারানী কালের তীক্ষ্ণধার কুঠারাঘাতে নবীন জীবনে ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হন। কালস্রোতঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সে হৃদয়ভাব ও চিত্তগ্লানি ধৌত করিলে পর, তিনি তাঁহার পরলোকবাসী স্বামীর অভিপ্রায় মতো পথে চলিয়া ও দেশের শত প্রকার কল্যাণ সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিরশ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া কত সময়ে মহারাণীর লোকবৎসলতার শত প্রকার আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াছি। বিশেষতঃ তিনি নিজে কৃতজ্ঞতা-ঋণ স্মরণ করিয়া এই পুণ্যশীলা রমণীর গুণকীর্তন করিতেন, তাহার প্রমাণপ্রদ দু-একখানি পত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে ঃ

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি. আই. ই. মহোদয়া সমীপেষু,
বিনয়বহুমানপুরঃসরাশীর্বাদপূর্বকং নিবেদনম্

বহুদিন হইল, কার্যবিশেষ উপলক্ষে টাকার আত্যন্তিক প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে, অধুনা লোকান্তরবাসী নিরতিশয় উদারচরিত রাজীবলোচন রায় দেওয়ানজী মহাশয় সাতিশয় দয়া প্রদর্শন পূর্বক, শ্রীমতীর অনুমতি অনুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে আমাকে ৭৫০০ টাকা দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না, যখন সুবিধা হইবেক, পরিশোধ করিবেন।

এই টাকা পাইয়া আমি কি পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার নয়, যত কাল জীবিত থাকিব, এই মহোপকার আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবেক। লোকের উপকার করিবার জন্যই শ্রীমতীর জন্মগ্রহণ। দেশে অনেক ঐশ্বর্যশালী লোক আছেন, কিন্তু কেহই শ্রীমতীর ন্যায় সর্বসাধারণের

৪৬ কাশীমবাজার রাজপরিবারের তদানীন্তন মুখপাত্র।

যথার্থ ধন্যবাদের আস্পদ ও উপকৃতবর্গের আন্তরিক আশীর্বাদের ভাজন হইতে পারেন নাই।

দীর্ঘকাল এই ঋণের পরিশোধের সুবিধা না হওয়াতে, আমি অতিশয় কুণ্ঠিত ছিলাম ; এক্ষণে আমার সুবিধা হইয়াছে, এজন্য এই পত্রের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশত টাকার নোট পাঠাইতেছি। অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া আমায় ঋণে মুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়, কিমধিকেনেতি।...

নিয়তগুণানুকীর্তনশুভানুচিন্তনকর্মণঃ

( স্বাক্ষর ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

কাশিমবাজার রাজধানীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত ৭৫০০ টাকা পেঁছিলে পর, মহারানী প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পত্রের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই :

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি. আই. ই. মহোদয়া সমীপেষু,

বিনয়বহুমানশুভাশীর্বাদপূর্বকং নিবেদনম্

শ্রীমতীর অনুগ্রহপূর্ণ পত্রে রাজধানীর মঙ্গল সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আমি পরিবারবর্গের সহিত কায়িক ভাল আছি। শ্রীমতীর পত্রে লিখিত হইয়াছে, 'মৎপ্রতি শ্রদ্ধা বিচলিত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।' এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি সর্বাদিসম্মত প্রশংসনীয় গুণ। এই দুই গুণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু শ্রীমতীর কার্য পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের সবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এমন স্থলে শ্রীমতীর প্রতি যাহার শ্রদ্ধা না জন্মিবেক, অথবা শ্রদ্ধা বিচলিত হইবেক, তিনি নিতান্ত পামর. কিমধিকেনেতি ৮ই ফাল্গুন ১২৮৯ সাল।

নিয়তগুণকীর্তনশুভানুচিনকর্মণঃ

( স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকাদি কোনো প্রকার অনুষ্ঠান তখনও সম্পন্ন হয় নাই—সেই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই সে সকলের আয়োজন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন,—এমন সময়ে কৃষ্ণনগর হইলে ডাকযোগে সংবাদ আসিল যে, বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত। বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প, তাই কাতরবচনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিয়াছেন। সুহৃদানুগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল অনুষ্ঠান পড়িয়া রহিল ! তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। পুত্রের বিবাহের পরবর্তী অনুষ্ঠান সকলের সুসম্পাদনের আয়োজন করিতে করিতে বন্ধুজনের বিপৎপাতের সংবাদ পাইবামাত্র গৃহে অনুষ্ঠানাদি উপেক্ষা করিয়া এরূপ দূরস্থানে তৎক্ষণাৎ গমন করিতে পারা তাঁহার মতো হৃদয়বান্ লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই ঘটনাটিতে তাঁহার এবং তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু ডাক্তার

সরকার মহাশয়ের ত্যাগস্বীকার ও সুহৃৎসেবা সামাজিক জীবনে আদর্শস্থল বলিয়াই মনে হয়।

রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগর

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্—আপনকার অত্যুৎকট অশুভ ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, আমি মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছি। এই ভয়ানক অশুভ ঘটনার দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছি। আমি মনে করিতাম আপনি সাংসারিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে সুখী। দৈববিড়ম্বনায় আপনাকে সেরূপ ভাবিবার পথ রহিল না। সংসার অতি বিচিত্র স্থান। সংসারে আসিয়া, কেহ কখনও সর্বাংশে সুখী হইতে পারিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে।

আমি আপনার জন্য তত উদ্বিগ্ন নহি। আপনি নানা বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিয়া অনেক সময় অন্যমনস্ক হইতে পারিবেন। কিন্তু যিনি গর্ভধারণ দিবস অবধি অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বিষয় ভাবিয়া আমার আন্তরিক অসুখের একশেষ উপস্থিত হইতেছে। তিনি এজন্মের মতো দুস্তর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ফল কথা এই, পিতা ও মাতা হওয়া অপেক্ষা অধিকতর মহাপাতকের ভোগ আর নাই। পিতা-মাতাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী করেন, এরূপ পুত্র অতি বিরল, কিন্তু অসদাচরণ ও অকালমরণ প্রভৃতি দ্বারা পিতা-মাতাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন এরূপ পুত্রের সংখ্যায় অধিক।

প্রিয় বিয়োগ নিবন্ধন হৃদয়বিদারণ শোকের সহসা সংবরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। এমন স্থলে আপনারা শোক সংবরণ পূর্বক চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করুন এরূপ অনুরোধ করা বা উপদেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয় দৈব অনুগ্রহে অচিরে শান্তিসলিলে সিক্ত হউক, এই আমার প্রার্থনা। ইতি ১২ই আশ্বিন ১২৯১ সাল।

ভবদীয়স্য

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মিত্র মহাশয়ের কলিকাতায় অবস্থান কালে উভয় পরিবারের মধ্যেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি পীড়িত অবস্থায় সুকিয়া স্ট্রীটেই ছিলেন। পীড়ার সময়ে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে ও অন্য নানা প্রকারে সে সময়ে মিত্র পরিবারের তত্ত্বাবধান করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্রুটি করেন নাই। দীনবন্ধুবাবুর অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ণ স্থান আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ক্ষতি স্মরণ করিয়া কত সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদীয় বিচ্ছেদে কাতর হইয়া দীর্ঘকাল মিত্র পরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া মিত্রগৃহিণী যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পরমাত্মীয়ের ন্যায় সর্বদা সংবাদ লইয়াছেন, নিকটে থাকিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন এবং সংসার-সংগ্রামে ও বালকগণের শিক্ষা বিধানে সহায়তা করিয়া পরলোকগত মিত্র মহাশয়ের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদর-নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। অনেক সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে খাস্তগির মহাশয়ের সহকারিতায় আত্মীয়তার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল খাস্তগির বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পারিবারিক শোক সংবাদ প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রুগ্নশরীরে বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে ডাকাইয়া আপন স্নেহালিঙ্গনপাশে বন্ধ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'বাবা! তোমার বাবার মৃত্যুর পূর্বে একবার সংবাদ দাও নাই; আমার সঙ্গে শেষ দেখাটা হল না, একবার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না, নিজের মতো চিকিৎসা করাইতেও পারিলাম না। নিতান্ত পরের মতো একটা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলে, তোমার বাবা যে আমার পরমাত্মীয় ছিলেন।'

এইরূপ ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবন্ধ করা অসম্ভব। এরূপ ঘটনার সুবিস্তৃত তালিকা এত দীর্ঘ এবং জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি এত লোকের সেবা করিয়াছেন যে তাহার পূর্ণাবয়বসম্পন্ন বিবরণেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইতে পারে। সুতরাং এস্থলে এরূপ বিবরণের উল্লেখ অসম্ভব। প্রশস্তহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আস্থাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অপরাপর বিষয়ে তিনি সাধারণ লোকমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নিকট সামাজিকতায় হিন্দু বলিয়া অধিক দাবী, কিম্বা অন্য সম্প্রদায় বলিয়া, কোনো প্রকার উপেক্ষা স্থান পাইত না। তিনি লোকসমাজকে নিজের সমাজ বলিয়া মনে করিতেন। সৌহৃদ্য-সূত্রে যাঁহাদের সহিত আবদ্ধ হইতেন তাঁহাদের বর্ণেতরত্ব কোনো প্রকারে আত্মীয়তার খর্বতা সাধন করিতে পারিত না। পৌরাণিক কালের ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আদর্শপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র মিত্র সম্বোধনে গুহককে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। বর্তমান বর্ণাভিমানপ্রিয় ভারতসন্তান বিদ্যাসাগর-সদনে শ্রীরামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত উচ্চনীতির জীবন্ত মূর্তি দেখিতে পাইবেন। তিনি চিরজীবন প্রচলিত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বিস্মৃত হইয়া গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের পরম পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার পিতামহের ন্যায় তিনিও যাঁহাকে আচরণে ও গুণে সৎলোক দেখিতেন, তাঁহারই সমাদর করিতেন এবং নিজের সমকক্ষ মনে করিতেন। এইরূপ সমাদর করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার করিতেন না। এই সূক্ষ্ম সূত্রের প্রভেদ দ্বারা

গুণের প্রাধান্য কখনও খর্ব করেন নাই। এবিষয়ে তিনি প্রাচীন আর্য ঋষিগণকেই তাঁহার পথপ্রদর্শক ও আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক জীবনে বড়ই মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমোদ প্রমোদে, আলাপ পরিচয়ে, রঙ্গ রহস্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। একস্থানে কোনো আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহকর্তাকে দৈববিপাকে পড়িয়া প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন বর্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ নূতন আয়োজন করিয়া তবে সকলকে আহার করাইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহকর্তাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'ভয় কি, তুমি যত শীঘ্র পার সমস্ত আয়োজন কর। নিমন্ত্রিত লোককে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রকার গল্পে এরূপ ভাবে আকৃষ্ট করিলেন যে কেহই বেলাধিক্যের জন্য কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিবার অবসর পাইলেন না।

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইঁহাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভগ্নীপতি; সেইসূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে ভগ্নীপতি সম্পর্কেই সম্ভাষণ করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় দীর্ঘকাল হইল কাশী বাস করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনের কিছু দিন পূর্বে একবার আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভট্টাচার্য মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণে আসনে বসাইয়া তামাক দিতে বলিয়াই বলিলেন, 'তুমি মরিয়াছ নাকি?' 'কেন, আমি মোরবো কেন? ম'লে কি আসিতেম?' 'আমিও তাই বলি, না ম'লে কি আসতে? তা দেখো, আমাকে যেন পেয়ে ব'সো না।' ভট্টাচার্য মহাশয় তামাক খাইতে লাগিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তোমার শেষটা কাশীতে খেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা জুটলো না। তা গেছ ত আবার এ রকম স'রে পড় কেন? জান ত কাশীবাস করিয়া বাহিরে ম'লে কি হয়?' হ্যাঁ তা ত জানি, তবুও মাঝে মাঝে দায়ে প'ড়ে আসতে হয়।' 'শিগ্‌গির শিগ্‌গির পালাও, না হলে, কাশীর এপারে ওপারে, ভিতরে বাহিরে অনেক ফারাক; বলি একটু গাঁজা টাজা খেতে শিখেছ ত?' 'কেন গাঁজা খেয়ে কি হবে?' বলি একটু অভ্যাস রেখো, কি জান, কখন কি কাজে লাগে বলা ত যায় না। মনে কর, যদি তোমার কাশী প্রাপ্তি হয় তা হ'লে ত শিব হ'বে? শিব হলে তোমার নন্দী ভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে, তখন টানতে হবে ত? আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে, দম আটকে মরে যাবে, আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।' (৪৭)

একবার কোনো কর্মোপলক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর বাহিরের ঘরে অনেকে বসিয়া

৪৭ এই আলাপের সময়ে আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম।

গল্প করিতেছিলেন। সে বৈঠকে জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। পল্লীস্থ একজন লোক অনবরত জানালায় উঁকি মারিতেছিল। সে বারংবার এরূপ করিতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি ভয়ে জড় সড় হইয়া নত মস্তকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'বাপু অত উঁকি ঝুঁকি মারছিলে কেন?' সে ব্যক্তি সভয়ে উত্তর করিল, 'জজ দ্বারিক মিত্তির এসেছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি মারছিলাম।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'দেখবার জন্য উঁকি মারবার দরকার কি? এঁকে চেন কি? এঁর নাম কৃষ্ণদাস পাল; এখানে এর চেয়ে যেটি সুন্দর, সেইটিই দ্বারিক মিত্তির! বল দেখি কোনটি?' (ইঁহাদের কেহই সুপুরুষ ছিলেন না, কাজেই ঘরে যত লোক বসিয়াছিলেন, সকলের সমবেত অট্টহাস্যে লোকটি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পলায়ন করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি ঢিল ছুঁড়িয়া তিনটি পাখী মারিলেন।)

আহারাদি বিষয়ে নিতান্ত আত্মীয় স্থলে এক প্রকার দৌরাত্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভোজনসমিতি (Gastronomy Club) নামে একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইয়াছিল। এই সভার ৯।১০ জন সভ্য ছিলেন। সভ্যদিগের পূর্ণ-সংখ্যা ও নাম সংগ্রহ করা কিছু কঠিন। যাঁহারা (৪৮) সে সভার সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জীবিত দুই জনের কাহারও সকলের নাম ঠিক মনে নাই। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে দল বাঁধিয়া নিতান্ত আত্মীয় স্থলে এক এক দিন উপস্থিত হইয়া খাইতে চাহিতেন। গৃহকর্তা রহস্যচ্ছলে প্রথম প্রথম কিছুই দিবেন না বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে চাহিতেন, শেষে সকলে মিলিয়া আহারাদি সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী উপনগরেই এ দৌরাত্মটা অধিক ছিল। ভবানীপুরে পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে ও প্রসিদ্ধমামা উকিল বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এরূপ আশ্রমপীড়া মধ্যে মধ্যে উপস্থিত করিতেন। কলিকাতায় ৺শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের বাটীতে এবং এরূপ আত্মীয় স্থলেই কেবল এই বিভ্রাট ঘটাইতেন। একবার এক গৃহস্থকে এইরূপ পীড়ন করিয়া একটা খুব জাঁকাল গোছের আহার জুটিল। কিন্তু পরদিন দলের এক জনের (সম্ভবতঃ দ্বারিকবাবুর) পেটের পীড়া হইল। সকলের মিলিত সেবাশুশ্রূষায় রোগী আরোগ্য লাভ করিলেন। পীড়ার সময়ে সেবা করিতে করিতে কেহ কেহ বলিলেন, ইহার পেটের দোষ আছে ইহাকে সভ্যপদ হইতে খারিজ করিয়া দাও। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন: 'না

---

(৪৮) অবসর প্রাপ্ত সবজজ ও মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের বর্তমান কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টচার্য, মেট্রপলিটনের ভূতপূর্ব শিক্ষক ৺প্রসন্নচন্দ্র রায়, ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং।

হে উহাকে খারিজ করিলে অধর্ম হইবে ; যে ব্যক্তি Martyr to the cause (এই কার্যে প্রাণ দিতে উদ্যত) তাহাকে বিদায় করিয়া দিলে, কাকে নিয়ে থাক্‌বে ?'

একবার তাঁহার এক সাংঘাতিক কারবঙ্কল হয়। যখন সেই সুকঠিন পীড়ার সূত্রপাত হয়, তখন তিনি খর্মাটাড়ে ছিলেন। রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অগ্রে বর্ধমানে আসেন। সেখানে চিকিৎসায় কোনো উপকার না হওয়াতে সেই আধপাকা কারবঙ্কল লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কয়েক দিনের চিকিৎসায় সেটি কাটিবার মতো হইয়া উঠিল। এই সময় পাশীবাগাননিবাসী মল্লিক মহাশয়দের বৈষয়িক এক শালিসীর ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি বসিয়া ৺দীননাথ মল্লিক মহাশয়ের সহিত শালিসীবিষয়ক কথাবার্তা কহিতেছিলেন, আর ডাক্তার চন্দ্রমোহণ ঘোষ একাকী সেই কারবঙ্কল পটলচেরা করিয়া তাহার পুঁজরক্ত বাহির করিয়া বাঁধিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। মল্লিক মহাশয় বলিলেন, 'তবে ডাক্তারবাবুর কাজটা হয়ে যাক্ না, আর বিলম্ব কেন ?' তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলেন, যেটা হইয়াছিল সেটা কারবঙ্কল, আর তাহা এই কথাবার্তার মধ্যেই অস্ত্র করাও হইয়াছে। শালিসীর মীমাংসা করিতে করিতে একটা কারবঙ্কলের অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া গেল, নিকটস্থ কেহ জানিতেও পারিল না, সামান্য নড়া চড়া কি উঃ আঃ কিছুই না! বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে, আলাপ করিতে করিতে, শরীরের উপর নিরুদ্বেগে অস্ত্র চলিতে দেওয়া একদিকে, আর পীড়িতেররোগ যন্ত্রণা দর্শনে—শোকসন্তপ্তলোকজনের অশ্রুজলদর্শনে, বিপন্নের বিষাদময় মুখে নিরাশার আর্তনাদ শ্রবনে তাঁহার যে স্বতঃই গভীর ক্ষোভ ও যন্ত্রণার উদয় হইত এগুলি আর একদিকে। একদিকে আত্মশাসন, আর একদিকে পরদুঃখে কাতর ক্রন্দন! একাধারে এতদুভয়ের সমাবেশ কি বিচিত্র দৃশ্য নহে ? এই দৃঢ়তা ও কোমলতার মিশ্রণই তাঁহার জীবনব্যাপী উচ্চতার উপাদান, উপকরণ ও গঠনের কার্য করিয়াছে, এবং ইহাতেই সে জীবনের সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। (৪৯)

কাহাকেও গায়ের কাপড় দিতে হইলে, শীতবস্ত্র ক্রয়ের ভারটা বাবু ব্রজনাথ দে মহাশয়ের উপর পড়িত। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'দেখ যখনই গায়ের কাপড় দরকার হয়, তোকেই শালওয়ালার দোকানে পাঠাই, একজন লোক চিরকাল কষ্ট পাবে ওটা ভাল নয়। তুই কাল আমাকে নিয়ে গিয়ে একবার দোকানটা দেখিয়ে দিস্, তা হ'লে যখন ইচ্ছে গেলুম, যা দরকার নিয়ে এলুম। তুই কাল একবার আসিস্।'

পরদিন ব্রজবাবুর প্রাণ যায়—বিদ্যাসাগরের সহিত চলিতে গিয়া প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িল। তিন চারিবার বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রজবাবুকে

৪৯ এই ঘটনাটি ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি

পশ্চাতে ফেলিয়া, শেষে আবার গুছাইয়া লইয়া বলিলেন, 'আমার চলাটাই কেমন একটু বেশী-বেশী, সঙ্গে যারা থাকে তারা পেরে উঠে না। এক কাজ কর, তুই এগিয়ে চল্, আমি তোর পেছনে পেছনে যাই।' পথে যাইতে যাইতে পরামর্শ হইল যে, শালের দোকানে ধরা দেওয়া হইবে না। অপরিচিতের ন্যায় যাইব, জিনিস লইয়া চলিয়া আসিব।

বড় বাজারে শালের দোকানে উঠিবার সময়ে গোলমালে ব্রজবাবু পশ্চাতে পড়িয়াছেন, বিদ্যাসাগর অগ্রবর্তী হইয়াছেন। উপরের দালানে বিদ্যাসাগরই অগ্রে দেখা দিলেন। যেমন সিঁড়ি হইতে উপরের ঘরে পদার্পণ, অমান শালওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'আইয়ে পণ্ডিতজি, আজ ত হামারা সুপ্রভাত হ্যায়।' বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রজবাবুকে চুপে চুপে বলিলেন, 'ওরে এরা যে চিনেছে রে।' শালওয়ালা বলিল, 'ক্যা পণ্ডিতজি। আগক্যা কভি ছিপা রহে সাকথে। (৫০)

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহারা কখন দেখে নাই, এরূপ লোক যদি কখন তাঁহাকে তাঁহার প্রতিদিনের কার্যকলাপের মধ্যে দেখিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিতান্ত ব্যয়কুণ্ঠ লোক বলিয়া মনে করিত। কোথাও যাইতে হইলে, সহজে গাড়ি কি পাল্কী ভাড়া করিতেন না। তিনি সর্বদাই তাঁহার সবল চরণ দুখানির উপযুক্ত ব্যবহার করিতেন। একবার কোথাও যাইবার সময়ে কলিকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়া ট্রেন না পাওয়াতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার সময়ে পাঁচ আনা করিয়া দশ আনা ভাড়া লাগে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ি ভাড়া দিবার সময়ে দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, 'এই দশ আনা মিথ্যা মিথ্যা গেল।' নিকটে নারায়ণবাবু ও অন্য কেহ কেহ ছিলেন; তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাসিতেছ কেন?' উপস্থিত ব্যক্তিগণের একজন বলিলেন, 'এমন কত দশ আনা যাইতেছে।' তিনি বলিলেন, 'এইরূপ অপব্যয়?' 'কেন কত লোক আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কত টাকা লইয়া যাইতেছে।' তাঁহার সেই সরল মুখভঙ্গিমায় তিনি উত্তর করিলেন, 'তাহাকেই বুঝি অপব্যয় বলে? সে ত একজনকে হাতে তুলিয়া দিলাম, আর কিছু না হউক যে পাইল সে উপকার বোধ করিল ত? আর এ যে 'ন দেবায় ন ধর্মায়,' যে ব্যক্তি পাইল, সে তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া লইল, আর আমি দিলাম বটে, কিন্তু আমার কোনো উপকারে আসিল না।' তখন তাহাদের কেহ কেহ বলিলেন, 'আপনার অর্থব্যয় নীতি এত উচ্চ তাহা বুঝিতাম না।'

কোথা হইতে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া, তাহার মোড়কের কাগজ ও দড়িগুলি অতি যত্নের সহিত তুলিয়া রাখিতেন। বিদ্যাসাগর

৫০ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দে মহাশয় নিজেই এ ঘটনাটি বলিয়াছেন।

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্রদ্বয় সর্বদা নিকটে থাকিতেন ইঁহারা তখনও বালক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিকে বন্যার জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু অপর দিকে এক বিন্দু দাঁড় বা এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া রাখিতেন। এ সকল দ্রব্য ঐরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে দেখিয়া বালকেরা হাসিত। একদিন রাত্রিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শয়ন করিলে পর, কনিষ্ঠ দৌহিত্র নিতান্ত প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া চুপে চুপে আলমারির উপর হইতে সেই দাড় আনিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেল। গৃহে প্রবেশ ও আলমারির উপর হাত দিতে না দিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওখানে কে রে?' কোনো উত্তর নাই, বাহক ভয়ে জড়সড়! দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবামাত্র উত্তর আসিল, 'আমি যতি'। 'অন্ধকার কি করছিস্?' একটু দড়ি নেব।' 'এত রাত্রিতে কেন?' পরে প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া তখন বলিলেন, 'থাম্, আমি দিচ্ছি। দাদা!—যখন বুড়ো দড়িগুলি কুড়াইয়া রাখে তখন ভাব, দাদামশাই কি বোকা, কেবল ছেঁড়া দড়ি, আর ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া মরে! এখন চুপি চুপি সেই ছেঁড়া দড়ি সরাইতে আসিয়াছ? বলি, বুড়ো কুড়িয়ে না রাখ্‌লে, এখন এত রাত্রে দড়ি কোথা পেতে বল ত?'

কোথাও হইতে পত্রাদি আসিলে তাহার ব্যবহারোপযোগী অংশ কাটিয়া লইতেন এবং এইরূপ ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড টেবিলের এক প্রান্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। আমরা স্বচক্ষে তাঁহাকে ঐরূপ পত্রাংশ কাটিয়া লইতে দেখিয়াছি। প্রয়োজন মতো ক্ষুদ্র পত্রাদি লিখিতে ও প্রেস কপি দিতে ঐ সকল কাগজখণ্ড ব্যবহার করিতেন। একদিন এক পরিচারিকা রন্ধনের বাট্‌না বাটিতে বাটিতে শিলধোয়া হলুদের জলটুকু ফেলিয়া দিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সস্নেহস্বরে বলিলেন, 'বলি ও কি হলো? হলুদের জলটা ফেলে দিলে।' সে দাসী অবাক্ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু রহস্যের স্বরে বলিল, 'দাদামশাই-এর কত টাকা যাচ্ছে, সে দিকে নজর নাই আর এই হলুদের জলটুকুতে চোখ পড়েছে!' তিনি বলিলেন, 'দেখ, হলুদের জলটুকু তরকারিতে দিলে, কাজে লাগ্‌তো ত, আমি ত আর টাকা জলে ফেলে দিই না, লোককে দিই। ও জলটুকু নষ্ট হবে কেন?' যে চারিটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল, এই চারটি ঘটনাই তাঁহার গৃহকর্মে নিপুণতা, অতি সামান্য দ্রব্যাদিও যত্নের সহিত রক্ষা করার অভ্যাস এবং ব্যয় বিষয়ে সমদর্শিতার উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতেন বলিয়াই তিনি বৃহৎ ব্যাপারে, মহদনুষ্ঠানে সর্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার মতো উচ্চ উপাদানে গঠিত মানবের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

# একাদশ অধ্যায় ॥ লোকসেবায় বিদ্যাসাগর

পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দান মহাপুণ্যকার্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সকল কর্ম অপেক্ষা দানধর্মের গুণকীর্তনে শাস্ত্রের অনেক অংশ লিখিত হইয়াছে। তাহার কারণও আছে; দানে যেমন আত্মত্যাগ হয়, দানে যেমন অপার্থিব পবিত্র সুখের আস্বাদন সম্ভোগ করা যায়, এবং সে আত্মত্যাগ ও পরতৃপ্তিসাধনজাত সুখে হৃদয় যে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে বাস করিতে শিখে, তাহার আভাষ সাধারণ লোকের ক্ষুদ্র সুখ সাধনের মধ্যেও ক্ষুদ্র আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। মানুষ যখন একবার সেরূপ সদনুষ্ঠানের মধুর আস্বাদনে মুগ্ধ হয়, তখন আর তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না। ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীগৌরাঙ্গ দুটি ছোট কথায় সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'নামে রুচি ও জীবে দয়া' এই জীবে দয়া হইতেই বিশ্বব্যাপী বিপুল প্রেমের প্রবাহ মানবহৃদয়ে প্রবাহিত হয়। লোক-সেবা পরায়ণ মহাপ্রেমিক যিশুখৃস্ট বলিয়া গিয়াছেন, 'পরহিতার্থে তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিবে, তোমার বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে।' আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'গুপ্তদানং মহাপুণ্যং। দান করা ত ভালই, কিন্তু গোপনে দান করিলে অধিকতর পুণ্যকার্য হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে পরোপকার সাধনে মনে আত্মাদর ও উত্তেজনার উদয় হইতে পারে; লোকচক্ষুর অগোচরে এরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হইলে, আমাদের আত্মাদরের বিশুদ্ধতা সুরক্ষিত হইবে এবং নিজের অনুষ্ঠানবিষয়ে অন্য লোকের অজ্ঞতানিবন্ধন উত্তেজনার সম্ভাবনা অতি অল্প হইবে। তাহার পর আবার সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপর দশ জনের সমক্ষে সাহায্য লইতে যত লজ্জা বোধ করে, নিজের হীনতা স্মরণ করিয়া যত কুণ্ঠিত হয়, লোকের অজ্ঞাতসারে সে সাহায্য পাইলে, তাহার তত জড়সড় ভাব থাকে না; তাই আত্মহিতার্থে ও পরহিতার্থে 'গুপ্তদানং মহাপুণ্যং। লোকের সেবা দুই প্রকারে করিতে পারা যায়। যথা—জীবনের প্রারম্ভ হইতে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসুখ সম্ভোগের তৃষ্ণা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, পরের হৃদয়ে তৃপ্তি বিধানের জন্য যে বাসনার সঞ্চার হয়, তথায় লোকসেবারূপ মহাব্রতের ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি উর্বরা ভূমি প্রাপ্ত হয়। এইখানেই 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' এই মহাবাক্যের সফলতার সূচনা হয়। এই মহামন্ত্র সাধন করিতে করিতে, মানবহৃদয় হইতে 'অয়ং নিজঃ পরোবেতি, লঘুচেতাদিগের; এই ক্ষুদ্র ভাব ক্রমে তিরোহিত হয়, এবং পরিশেষে

'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই মহাতত্ত্ব পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। পরসেবায় মানবগণ দেবত্বলাভ করিয়া জগতের আদর্শ-নরনারীমণ্ডলী মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। আর এক প্রকার লোক-হিতসাধন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সামান্য নহে; চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া কেহ শেষ দশায় অথবা মৃত্যুকালে, বহুক্লেশসঞ্চিত দুই হাজার, দশ হাজার, কি লক্ষ, কি দুই লক্ষ টাকা কোনো সদনুষ্ঠানে দান করিয়া থাকেন। এরূপ পরসেবা আদরণীয় সন্দেহ নাই, এবং ইহার দ্বারা জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যেই এরূপ দানের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া আমরাও ঐরূপ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি কার্যটি সর্বাংশে সুন্দর হইলেও পূর্বোক্তরূপে সহজ ও স্বাভাবিক পরার্থপরায়ণতার তুলনায় শেষোক্তটি কিঞ্চিৎ নিম্ন স্থান অধিকার করে। সহজে ও সুশিক্ষাগুণে শৈশবকাল হইতে পিতা-মাতা ও পরিবার পরিজনের অনুষ্ঠিত সাধুদৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে দিতে, খঞ্জ ও অন্ধের খঞ্জত্ব ও অন্ধত্বজনিত দারুণ মনস্তাপের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে করিতে ঘোর বিপদের গভীর অন্ধকারে আবৃত মানবের মুখমণ্ডলের দারুণ বিষাদরাশি দর্শন করিতে করিতে, শিশুর কোমল হৃদয়ে যে দয়ার সঞ্চার হয় এবং সেই বাল-হৃদয়জাত দয়াবৃত্তির চরিতার্থতা লাভে শিশু যে অনুপম স্বর্গীয় সুখের মধুবিন্দু সম্ভোগ করে, তাহাহইতেলোকসেবার যে অমৃতসিন্ধুর সূত্রপাত হয়, তাহারই পূর্ণতা সাধনে, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম ভারতের লোকসেবা—ভারতের সর্বভূতে সমদর্শিতা—এক বিচিত্র বস্তু, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সে উদার উচ্চ শিক্ষা আমাদের মধ্যে স্থান পাইল না। যে পঞ্চযজ্ঞের দৈনিক অনুষ্ঠান পূর্বকালে আর্যজাতিকে নিত্য উচ্চ নীতি শিক্ষা দিত, তাহার অনুষ্ঠানে আর কেহ আগ্রহশীল নহে। আমরা আমাদের আচার আচরণ দ্বারা পরার্থ অপেক্ষা স্বার্থকেই আদরের জিনিস করিয়া তুলিয়াছি। স্বার্থ ও পরার্থের সংগ্রামে স্বার্থের জয় ঘোষণায় আমরা দিন দিন অন্ধ হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং শাস্ত্রবাক্য শাস্ত্রেই রহিল, আর আমরা যাহা তাহাই রহিলাম। আমাদের জীবনে শাস্ত্রবাক্য সফলতা লাভ করিবার সুযোগ পাইল না।

এইরূপে অবস্থার ভিতর যখন বঙ্গদেশের স্বার্থপরতা শাখাপ্রশাখাযোগে বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল, তখন আবার সেই পৌরাণিক ইতিহাসের পুনরাভিনয় সংঘটিত হইল। অমর পুরুষ বলিরাজ নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াই যেন আমাদের সমক্ষে মহান আদর্শ দেখাইতে আসিলেন; অথবা মহাবীর কর্ণ কুরুক্ষেত্রের সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ কুলের উচ্চ আদর্শ

দেখাইবার জন্য আমাদের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। পাঠক নিবিষ্ট-চিত্তে অনুধ্যান করিয়া দেখ, দেখিবে বলিরাজের ত্রিপাদ ভূমি দানের আখ্যায়িকা বিদ্যাসাগর-জীবনে দেখিতে পাইবে; দাতাকর্ণের পুত্রদান ও সর্বজয়ের নিদানস্বরূপ কবচকুণ্ডলদান বিদ্যাসাগরে দেখিতে পাইবে।

অনেক আখ্যায়িকা শুনিয়াছি, অনেক উপদেশের কথা গুরুজন ও উপদেষ্টাদের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র পটদশায় নিজের বাড়ির চরখাকাটা মোটা সুতায় প্রস্তুত গুণ চটের মতো অনতিদীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্র খণ্ডে কায়ক্লেশে নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া নিজের ছাত্রবৃত্তির টাকায় গরীব সহপাঠীদিগকে ভদ্রোচিত বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; নিজের এবং নিজেব প্রদত্ত পরিচ্ছদের পার্থক্য কখনও তাঁহার সুখানুভবেব ব্যাঘাত জন্মায় নাই। ঈদৃশ উৎকৃষ্ট ও অত্যদ্ভুত দৃষ্টান্ত কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র যে কি বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত হিসাব-পত্র এই একটি ঘটনার মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। কর্তব্য সাধনের জন্য লোকহিত সাধনের জন্য—বিদ্যাসাগর মহাশয় অবলীলাক্রমে নিজের সর্বনাশ সাধন করিতে পারিতেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত তাঁহার সুবিস্তৃত জীবনে নানা ঘটনাব মধ্যে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আমরা কেবল সেইগুলিকে একত্র মিলাইবার কথঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব। প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়-পরিশোভিত তাঁহার সেই সদনুষ্ঠানের পুষ্পোদ্যানের শোভা যে কত মনোহর, কিরূপ হৃদয় মুগ্ধকর ও উপদেশপ্রদ, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

বিদ্যাসাগব মহাশয় বিদ্যালয়ের সমপাঠীদিগের অভাব মোচন করিতে, তাহাদের পীড়াতে চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যে কত শত শত রোগীর শয্যাপার্শ্বে যামিনী যাপন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। দুরন্ত বালক এইরূপে ক্রমে সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবকে পরিণত হন, সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবক ক্রমে এক বিশ্বব্যাপী উদারতার চরম আদর্শে পরিণত হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তি কিরূপে আত্মসুখের বিনিময়ে পরের তৃপ্তি বিধানেই জীবন ধারণ করিতে পারেন, আমাদের সমক্ষে তিনি তাহার অতুলনীয় দৃষ্টান্তের সুদৃঢ় স্তম্ভ চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ও ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্গের অমর কবি শ্রীমধুসূদন যখন ফরাসী দেশের অন্তর্গত ভার্সেলিস্ নগরে নানা বিপদে আক্রান্ত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, যখন তাঁহার বঙ্গীয় সুহৃদ্‌গণ তাঁহার অনটন, অনশন ও পরিশেষে তাঁহার কারাবাসের সম্ভাবনা-সংবাদেও নিরুদ্বেগে সুনিদ্রা-সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ বিপদের সংবাদ

আসিলেও ভারপ্রাপ্ত সুহৃদমণ্ডলী যখন কোনো তত্ত্ব লইলেন না, বিলাত গমন কালে সর্বপ্রকার ভার গ্রহণ করিয়া শেষে যখন পত্রের উত্তর পর্যন্ত দিতে তাঁহারা বিমুখ হইয়া পড়িলেন, তখন তীক্ষ্নবুদ্ধি মধুসূদন, নিজের বিপদের প্রকৃত গুরুত্ব অনুভব করিয়া, বন্ধুজনের ব্যবহারে ভগ্নহৃদয় হইয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নিরবচ্ছিন্ন নিরাশার ঘন অন্ধকার যখন তাঁহার গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিল, তখন সেই অন্ধকার পথে তাড়িতালোকে কোন্ মূর্তি অঙ্কিত হইল? সেই প্রবাসী মধুসূদনের বিষাদের অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন্ মহাপুরুষের মধুরমূর্তি তাঁহার হৃদয়প্রান্তে উদিত হইয়া আশার সঞ্চার করিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই পাঠক বুঝিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সেই মহাপুরুষ। মধুসূদনের সুবিস্তৃত জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি বঙ্গের সকল সম্ভ্রান্ত লোকেরই সঙ্গলাভ ও সহবাস সুখে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশে বিপন্ন মধুসূদনের স্থির বুদ্ধি একে একে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল সেই মহাপুরুষকে তিনি নিজে কবিতাসম্ভাষণে (১) বলিয়াছেন ঃ

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ সদনে!—
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিংকরী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ শিরঃ তরু-দল দাস-রূপ ধরি
পরিমলে ফুল-কুল দশদিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ২রা জুন তারিখে মধুসূদন নিরুপায় হইয়া যে পত্রের দ্বারা 'সুবর্ণচরণে' আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই সুবৃহৎ পত্রের কোনো কোনো অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল (২)

---

১ চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৮৫ পৃষ্ঠা।

২ You will be startled, I am sure, grieved to learn, that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি শুনিয়া চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবেন যে, দুই বৎসর পূর্বে উচ্ছ্বাসপূর্ণহৃদয়ে আপনার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় লইয়াছিল, আজ এইক্ষণে আমি সেই সবলকায় ও প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র, এবং কয়েকজন লোকের নিষ্ঠুরতা, বোধাতীত নির্মম ব্যবহারের জন্য আমি এইরূপ দুর্বিপাক মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে এক জন আবার আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃৎ।...

আমার ৪০০০ টাকা স্বদেশে পাওনা, তবু আমি অর্থাভাবে এ দেশীয় কোনো কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোনো অনাথ-আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে।

যে দুরবস্থার মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে আপনি একমাত্র সুহৃৎ এবং ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে যে বিশাল কর্ম-নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা আপনারই অন্তরে দৃঢ়তা ও প্রতিভার নিত্য সহচর। একটি দিনও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

---

who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I, felt strongly pursuaded, was my friend and well-wisher.···

I am going to a French jail, and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution though I have fairly Rs. 4,000 due to me in India.

You are the only friend who can rescue me from the painful Position to which I have been brought, and in this you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost,

Shall I apologise for the trouble I am giving you ? I do not think so ; for I know you enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God and you, under God, help me to do so.

I am. my dear Sir,
Ever yours faithfully,
Michael M. S. Dutt.

আপনাকে যে ক্লেশ দিতেছি, সে জন্য কি ক্ষমা প্রার্থনা করিব? আমি তাহা আবশ্যক বোধ করি না, কারণ আপনাকে বেশ জানি ও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, একজন বন্ধু ও স্বদেশীয়কে আপনি এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরিতে দিবেন না।

দয়া করিয়া ফরাসী দেশে উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন, কারণ দৈবানুগ্রহ ও দৈবানুগৃহীত আপনার করুণা ব্যতীত এখান হইতে স্থানান্তরিত হইবার অন্য কোনো পার্থিব সম্ভাবনা নাই।

প্রিয় মহাশয়, আপনার চির বিশ্বাসভাজন,
(স্বাক্ষর) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'

এই পত্র পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসীম দুর্ভাবনার আর কূল কিনারা রহিল না। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসচ্ছলতার মধ্যভাগ। তিনি নিজে সে সময়ে ঋণ-জালে জড়িত, অভাব ও অনটনের মধ্যে বহু কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন, সামান্য অর্থ পাইলে, তাঁহারই আর্থিক অসচ্ছলতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারেন। এইরূপ দুর্দিনে প্রবাসী মধুসূদনের দারিদ্র্য ও তন্নিবন্ধন সমূহ বিপদের আশঙ্কা অবগত হইয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ মধুসূদনের বন্ধুগণের আচরণের কথা অবগত হইয়া আরও ক্ষুন্ন হইলেন। তাহার নিজের প্রতি লোকের যে আচরণ দেখিয়া তিনি স্বদেশীয়গণের আচরণে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বিদেশবাসী মধুসূদনের বিপদের বার্তা ও বন্ধুজনের বিরূপ ভাবে তাঁহার পূর্ব সংস্কার আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি মধুসূদনের বন্ধুগণের নিকট ও অন্য নানা স্থানে চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া নিজের ঋণ বৃদ্ধি করিয়া, মধুসূদনের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইলেন। বহু কষ্টে পরবর্তী ডাকে ১৫০০ টাকা মধুসূদনকে পাঠাইলেন এবং অর্থ প্রাপ্তিমাত্র ইংলণ্ডে গমনপূর্বক নিজের প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যাপৃত হইতে পরামর্শ দিলেন। যে দিন ডাক পঁহুছিবার কথা, সেইদিন প্রাতঃকালে ভার্সেলিস্ নগরে দত্ত পরিবারে কাতর ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা মধুসূদনের নিজের উক্তিতেই পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ঃ

'ভার্সেলিস্ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪

প্রিয় সুহৃদ্,—বিগত ২৮শে আগস্ট রবিবার প্রাতঃকালে আমি আমার ক্ষুদ্র পাঠাগারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার দুঃখিনী স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'ছেলেরা মেলা দেখিতে যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু আমার হাতে তিন ফ্রাঙ্ক (৩) মাত্র আছে; তোমার দেশের লোকগুলি

---

৩ এক ফ্রাঙ্ক পূর্বহিসাবে আট আনারও কম। আজ কাল আট আনার বেশী।

কেন আমাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন ?' আমি বলিলাম, 'আজ ডাক আসিবার দিন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কোন না কোনো সংবাদ পাইব, কারণ যে লোকের নিকট অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছি, তিনি আর্য ঋষির ন্যায় প্রতিভাশালী ও বিজ্ঞ, ইংরাজের ন্যায় কার্যকুশল ও বাঙ্গালী জননীর ন্যায় কোমলহৃদয়।' আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম, কারণ এক ঘণ্টা পরেই ১৫০০ টাকা সমেত আপনার পত্রখানি প্রাপ্ত হইলাম। হে সুজন, কীর্তিমান, পরম সুহৃদ! আপনাকে কেমন করিয়া আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব ? আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন··· ।' মধুসূদন এই পত্রে অনেক দুঃখের কান্না কাঁদিয়া, যাঁহাদের নিকট টাকা পাইতেন, তাঁহাদের নাম ও টাকার হিসাব দিয়া শেষে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন: 'কেমন, আমি কি ঠিক বলি নাই যে, আপনার হৃদয় বাঙ্গালী মায়ের মতো ?' (৪)

মধুসূদনের বন্ধুগণের নিকট টাকার কোনো কিনারা করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মধুসূদনকে আরও অনেক টাকা পাঠাইতে হইল। কিন্তু তন্তুকীট যেমন আপন লালানির্মিত কোষমধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণের দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর কোনো উপায় রহিল না। গুটিপোকা যেমন আত্মবিনাশ করিয়া জনগণের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ আত্মবিনাস করিয়া মধুসূদনের কল্যাণসাধন করিতে লাগিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবস্থা অবগত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ:

---

Versailles. 2nd September, 1864.

৪ My dear Friend,

On the morning of last Sunday, 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said, 'The children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs; why do those people in India treat us this way?' I said—'The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage. the energy of an English man and the heart of a Bengali mother'. I was right; an hour afterwards I received your letter and Rs. 1,500 you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend; you have saved me···am I not right in thinking that you have the heart of a Bengali mother?'

'ভার্সেলিস ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৬৪

প্রিয় সুহৃদ—২৪৯০ ফ্রাঙ্কের হুণ্ডিসহ আপনার পত্র যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে, এই টাকা নিতান্ত দুঃসময়ে আসিয়াছে, কারণ হাতে কিছু ছিল না, আমরা অতি ব্যাকুলভাবে আপনার সংবাদ পাইবার জন্য পথপানে তাকাইয়া ছিলাম। আমি যে সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আপনার পত্র পাঠে আমি অন্তরে দারুণ বেদনাও পাইলাম, যেমন কেহ আমাদের মাতৃভাষায় বলিতে পারে: 'আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে হতভাগার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপজ্জালে পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করি! আমার এমন একটি বন্ধু নাই, যে তাঁহার স্মরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতো মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই যে, আপনাকে সাহায্য প্রদান করি। অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এই কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে।' (৫)

পত্রের শেষে অংশটুকু বাঙ্গালায় লিখিত। দুঃখের বিষয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়া মধুসূদনের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইয়া দীর্ঘকাল ঋণব্যূহে আবদ্ধ ছিলেন। মধুসূদন, ইংলণ্ডে অবস্থান কালে কিংবা এদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কোনো দিনও ঈশ্বরচন্দ্রকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সে ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবিধ বিপদের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও মধুসূদনের বিপদুদ্ধার করিয়াছিলেন। অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাঁহাকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি এত অসুবিধা ভোগ করিয়া এরূপ বিপুলঋণভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দেশে আনাইয়াছিলেন, স্বদেশে পদার্পণ করা অবধি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক দিনের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর হেন সুহৃদের পরামর্শে কিংবা উপদেশে চলিতে প্রয়াস পান নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাদের নিকট বলিয়াছেন, 'মাইকেল আসিয়া সুখে বাস করিতে পারেন, এরূপ একখানি পছন্দসই বাড়ি পূর্ব হইতে ভাড়া লইয়া, একজন বিলাত প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত লোকের বাসোপযোগী করিয়া সাজাইয়া

---

৫ Versailles. 18th December, 1864.—My Dear Friend,—Your kind letter with a draft for 2490 Francs reached me in due course and in very good time :—for we were without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little as one would say in our mother-tongue···

রাখিলাম ; বড় সাধ, মধুসূদন আসিয়া সেই বাড়িতে বাস করিবেন, কিন্তু আমার নির্বাচিত ও সুসজ্জিত গৃহ পড়িয়া রহিল, মধুসূদন আসিয়া স্পেন্স হোটেলে উঠিলেন।' বিদ্যাসাগর মহাশয় সাক্ষাৎ করিয়া আনিতে গেলেন। বিফলমনোরথ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মধুসূদন ভারতে আসিয়া নিজের ইচ্ছামতো চলিয়া ফিরিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে প্রতিভায় প্রস্ফুটিত শতদল কমল—মধুসূদন চলচ্চিত্ত বাঙ্গালী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী মায়ের হৃদয় শক্তি' পরিচালিত হইয়াই মধুসূদনের অবজ্ঞার ভাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সর্ববিধ সুবিধার উপায় করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের জীবনচরিত-প্রণেতা বলিয়াছেন ঃ 'যে মহাত্মা, তাঁহার প্রবাসকালে সাহায্য করিয়া অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার দয়ার বিরাম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মধুসূদনের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য পূর্ব হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্যে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।' (৬)

বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনি ঋণজালে জড়িত হইয়া মধুসূদনকে ঋণ দিয়া ছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন, মাইকেল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, যে কোনো উপায়ে হউক ঋণ পরিশোধ করিবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ত্বরায় সে আশায় বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। মধুসূদনের নিকট টাকা আদায় হওয়া কিরূপ সুকঠিন ব্যাপার হইয়াছিল এবং সে জন্য তাঁহাকে কিরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত পত্রে পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ঃ

'সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—অদ্য সাত দিন হইল বর্ধমানে আসিয়াছি, এপর্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্বে আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এজন্য লিপি দ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোনো ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব লক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূলবাবুর ( জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ) নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব ; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই

৬ বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু বি. এ. প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, ৪৬৯ পৃষ্ঠা।

আশঙ্কায় অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের (শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন) নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলবাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোনো সংশয় নাই।

এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়া শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোনো মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধহয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম; অসুস্থতাবশতঃ পারিলাম না। কিমধিকমিতি—

ভবদীয়স্য—

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

'প্রিয় বিদ্যাসাগর মহাশয়,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম, এই পত্র পাঠে প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ পাইলাম। আপনি জানেন, পৃথিবীতে এমন কোনো কর্ম নাই, যাহা আমি আপনার জন্য করিতে কুণ্ঠিত হইব। এই অপ্রীতিকর ঋণভার হইতে মুক্তিলাভের জন্য আপনি যাহা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাই করিবেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। শ্রীশ ২১০০০ হাজার টাকা ঋণ দানের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। আপনি কি মনে করেন, অনুকূল উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আরও কিছু বেশী টাকা ঋণ দিতে পারেন না? সুদের বাড়্তি টাকাটা আমি নিজ হইতে দিতে পারি, আমি তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিব কি? এইরূপে যদি সম্পত্তিটা বাঁচান যায় ভালই, না হয়ত শেষে ছাড়িয়া দিব। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল এখনই ছুটিয়া আপনার নিকট যাই, হয়ত আগামী শনিবার আমি যাইব।

মহাশয়ের একান্ত শ্রদ্ধাবনত,

(স্বাক্ষর) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।' (৭)

---

৭ My dear Vidyasagar, I, Spence Hotel

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in

টাকা আদায় হইল না। মধুসূদন টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোনো প্রকার শৃঙ্খলা জানিতেন না। টাকা পাইলে বিবেচনা করিয়া খরচ করিতে, কিংবা রাখিয়া ঢাকিয়া চলিতে জানিতেন না। অর্থ বিষয়ে হাজার দুই হাজার কি দশ হাজার, কথায় কথায় বলিয়া ফেলিতেন। তাঁহার কোনো পত্রাদিতে দুই দশ টাকার উল্লেখ নাই, দুই পাঁচ শত টাকারও উল্লেখ বড় বেশী দেখা যায় না। টাকার কথা যখনই পড়িয়াছে তখনই হাজারের এদিকে নামাইতেন না। দুই-দশ-বিশ হাজার টাকা লেখনীর অগ্রভাগে সর্বদাই বিরাজ করিত। অথচ' টাকা পাইলেই আর নাই, এইরূপ লোকের হাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেরূপ দুর্দশা হইবার কথা, পাঠক তাহাই অনুমান করিয়া লউন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহাই হইয়াছিল। মধুসূদনের ঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহাকে সংস্কৃত যন্ত্রের তিন ভাগের দুই ভাগ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও তিনি কাতর হন নাই। তিনি মধুসূদনকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতর হইয়াছিলেন ; মধুসূদন তাঁহার কথা না শুনায় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। শেষে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করার পরেও, স্বদেশে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সময়ে সময়ে অল্প সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল ঋণভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি মধুসূদনকে যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই পত্রখানি এই ঃ

'প্রিয় দত্ত, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন একবারে অসম্ভব। আমার কোনো প্রকার চেষ্টা কিংবা ধনকুবের ব্যতীত অন্য কোনো লোকের প্রাণপণ চেষ্টা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তালি দিয়া রাখিবার অবস্থা পার হইয়া

---

this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Srish has written to me offering Rs. 21,000. But don't you think Onookool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estate let us do so if not then go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

With affectionate regard,

Sir, yours

( Sd. ) M. S. Dutt.

গিয়াছে। আমি অসুস্থ এবং সেই জন্য অধিক লিখিতে অক্ষম। ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ৭২। আপনার বিশ্বাসভাজন ( স্বাঃ ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।' (৮)

এইরূপে দুর্বিপাক ও দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া মধুসূদন ত্বরায় পীড়িত ও শেষে লোকান্তরিত হন। মধুসূদনের লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরে সিটি কালেজের অধ্যক্ষ অধুনা স্বর্গীয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক আহূত মধ্য-বাঙ্গালা ও যশোহর-খুলনা সম্মিলনীর মিলিত সভার উদ্যোগে মধুসূদনের অস্থিপঞ্জর রক্ষা ও তদুপরি কোনো প্রকার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হয়। উক্ত সভার অনুরোধক্রমে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বহু আলাপ ও বিলাপের পর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন, চেয়ে দেখ, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জান্ রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। তোমাদের নূতন উৎসাহ ও আগ্রহ আছে, তোমরা করগে।' এই কথাগুলি বলিয়া শেষে যে বিলাপ করিয়াছিলেন, অন্তরের যে গভীর পরিতাপ ও আক্ষেপের পরিচয় পাড়িয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কোনো হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না।

মন্বন্তর।—সন ১২৭২ ( ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ) সালের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন উক্ত বৎসরের শেষ ভাগে বিশেষতঃ ১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি কয়েক মাস এদেশে যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্তণ্ড যখন সমগ্র বঙ্গভূমিকে সন্তপ্ত ও বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আর এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র দেশ দগ্ধ হইয়াছিল। আদিত্য-প্রতাপে বঙ্গভূমি নীরস ও শুষ্ক, আর জঠরানল জ্বালায় বঙ্গসন্তান বিশুষ্কমুখে ও শীর্ণ কলেবরে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ছুটিয়া কে কোথায় গিয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত পুত্র বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া, যুবতী জননী কোমলকলেবর শিশু-সন্তানকে পথ-পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া কোন্ অপরিচিত পথে, কোন্ অজ্ঞাত দেশে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি, একমুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ লালায়িত। অন্নাভাবে

---

৮ My dear Dutt,

I have tried my best and am sadly convinced that your case is an utterly hopeless one. No exertion of mine, or that of anybody else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch-works, I am very unwell and am therefore unable to write.

Yours sincerely,
Iswara Chandra Sarma.

30th Sept. '72.

লতাপাতা ও বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে করিতে শেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলের লোক অত্যধিক বিপন্ন হইয়া বিদেশে, অতি দূরদেশে গিয়া পড়িয়াছিল। এই দুর্দিনে বঙ্গবীর মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া দীন দুঃখীর ক্ষুধানল নির্বাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমত নিরন্ন প্রজামণ্ডলীর দারুণ অভাবের প্রকৃত বিবরণ রাজকর্মচারীদের গোচর করিতে এবং তদ্দারা রাজপুরুষদিগের দ্বারা দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে অনুসন্ধান এবং মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার নানা স্থানে সরকারী খরচে অন্নছত্র খোলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী গ্রামের লোকসকল অন্নাভাবে কাতর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই অন্নাভাব ও আর্তনাদের সংবাদ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পেঁছিবামাত্র তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকমণ্ডলীর জঠরানল নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎবাটী গমন করিলেন। তাঁহার নিজ ব্যয়ে যে কত লোক প্রাণধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল এবং সেজন্য তাঁহার যে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ এক্ষণে সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তবে তিনি যে অন্নছত্র খুলিয়া অকাতরে ৪।৫ মাস অন্ন দান করিয়াছিলেন, তাহার মোটামুটি বিবরণ জানা যাইতে পারে; অসংখ্য অন্নক্লিষ্ট লোক আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ১২ জন পাচক দিবারাত্রি রন্ধন করিয়াছে। ২০ জন লোক অবিশ্রান্ত পরিবেশন করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইত। এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বৈশাখ আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস কাটিয়াছে।

প্রথম প্রথম ১০০।২০০ লোক খাইত। ক্রমে যখন অভাবের আগুন চারিদিকে পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল, তখন অন্নার্থী লোকের সংখ্যাও অগণ্য হইয়া পড়িল। শেষে এমন হইল যে দিবারাত্রি অন্ন বিতরণ করিয়াও কুলায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়া পাঠান, 'যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন অভুক্ত না থাকে। সকলেই যেন খাইতে পায়।' এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় সর্বদাই বাটী যাইতেন। একবার বাটী গেলে অন্নার্থী লোকেরা তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিল যে খেচরান্ন খাইতে খাইতে আহারে অরুচি জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক এক দিন চারিটি সাদা ভাত হইলে ভাল হয়। যেমন জানান হইল, অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তাহে একদিন অন্ন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই ভাতের ব্যবস্থার প্রথম দিনই একটি নিতান্ত

হৃদয়বিদারণ দুর্ঘটনা ঘটে—অন্ন ব্যঞ্জনের আয়োজনে এক ব্যক্তি হৃষ্ট মনে ভাত খাইতে গিয়া তরকারির জন্য অপেক্ষা অসহ্য হওয়াতে সেই শুষ্ক অন্ন মুখে দিয়া দম আটকাইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এই দুর্ঘটনায়, আনন্দকর ব্যাপার সহসা নিরানন্দে পরিণত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মৃতব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেকক্ষণ রোদন করেন। তাহার ভাত খাওয়া হইল না, অনাহারে মৃত্যুর দিনে, আহার করিতে গিয়া বেচারা মরিয়া গেল, এই দুঃখ চিরদিন শক্তিশেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ ছিল।

ইতরজাতীয় দরিদ্রলোকদের প্রতি পাছে কোনো প্রকার অযত্ন হয়, এই আশঙ্কায়, তিনি নিজে দুঃখিনীর মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন। হাড়ি, ডোম প্রভৃতি ইতর জাতীয় লোকদের রুক্ষ মাথায় তৈল দিতে কেহই অগ্রসর হইত না, তাই তিনি নিজ হাতে তৈল লইয়া তাহাদের মাথায় মাখাইয়া দিতেন। তিনি নিজে এইরূপ করিতেন বলিয়া কেহই আর তাহাদের প্রতি কোনো প্রকারে অযত্ন করিতে সাহস করিত না। তাঁহার ঈদৃশ আচরণ গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে প্রচলিত হওয়াতে দীনদুঃখী লোক তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিয়া ঘোষণা করিত। যে অসংখ্য স্ত্রীলোক এই ছত্রের অন্নে প্রাণ ধারণ করিত, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের সন্তান সম্ভাবনা ছিল। গৃহে থাকিলে প্রসবের প্রাক্কালে এ দেশে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে অন্নছত্রেই সেই সকল অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইল। ইহার কারণ এই যে গরীব লোক, গৃহে পরিজন পরিবেষ্টিত থাকিলে, যে সকল অনুষ্ঠানে সুখানুভব করিতে পায়, দুর্দিনে অন্নছত্রে আছে বলিয়া, সে সুখে বঞ্চিত হইবে কেন? পাঠক একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা কর, কিরূপ উচ্চ উদার মহাপ্রাণতা থাকিলে, এতাদৃশ মানব-প্রেমের উৎস উৎসারিত হইতে পারে! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে যে সমগ্র সংসারের লোকের পান্থশালা, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন যে তাঁহার লোকসেবার সহায় মাত্র এবং তিনি যে সংসারে পরের দুঃখ দূর ও তাহাদের সুখসাধন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমগ্র জীবনের বিবিধ আচরণে তাহার শতপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রাণ মহাপ্রাণ—নরদেহে বিধাতার দয়ার ধারা কিরূপে সংসারের দুঃখ হরণ করে, তাঁহার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নছত্রে তাঁহার লোক-সেবার অন্তরালে দেখিতে পাইতেছি।

এই সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের দারুণ হাহাকারে যখন চারিদিক নিনাদিত হইয়াছিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অর্থব্যয়ে এবং রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করিয়া নানা প্রকারে বঙ্গসন্তানদের জঠরানল নির্বাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য নরনারীকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। দীন দরিদ্রজন তাঁহাকে এই সময় হইতে দয়ার সাগর বলিয়া ডাকিতে শিখিল। রাজপুরুষগণ তাঁহার

সহৃদয়তা ও সুপরামর্শ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক পত্রখানি এই ঃ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বীরসিংহ

মহাশয়, বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারীর ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখের আদেশমতো আপনাকে জানাইতেছি যে বিগত মন্বন্তরের সময়ে গলী জেলার দরিদ্র লোকদিগের অভাব মোচনে নানা প্রকারে সাহায্যের জন্য গভর্নমেণ্ট আপনার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

( স্বাক্ষর সি. টি. মনট্রিসর,
কমিশনর, বর্ধমান বিভাগ (১)

বর্ধমান—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলওয়ে খুলিবার পূর্বে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺রামগোপাল ঘোষ ও রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মহোদয়দ্বয়ের সঙ্গে বর্ধমান যাত্রা করেন। ঘোষ মহোদয় ও রাজা বাহাদুর বর্ধমানাধিপ মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রমণে যান। পূর্বোক্ত মহোদয়দ্বয় মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরাধিক স্নেহের পাত্র ৺শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের ভগ্নীপতি ৺প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করেন। মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগমন সংবাদে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে আনাইবার জন্য লোক প্রেরন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে যাত্রা মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রথমে অসম্মত হন। কিন্তু বার বার অনুরোধ করিয়া সম্ভ্রান্ত কর্মচারীদিগকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করাতে পরিশেষে বাধ্য হইয়া রাজবাটীতে গমন করেন। মহারাজ তাঁহার সম্মানার্থে এক জোড়া শাল ও ৫০০ টাকা বিদায় দেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার এই লোভশূন্যতায় তিনি মহারাজের

---

১ To Pundit Isvara Chandra Vidyasagar, Beersingha.

Sir, I have been instructed by the Secretary to the Government of Bengal, under order of the 20th instant, to express to you the warm acknowledgement of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly District.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant.
(Sd.) C. T. Montrisor
Commissioner, Burdwan Division.

অধিকতর ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টরের কার্যভার প্রাপ্ত হওয়াতে অনেকবার স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শনার্থে বর্ধমান গিয়াছিলেন। যখনই যাইতেন, রাজসমাদর উপেক্ষা করিয়া বন্ধুবর প্যারীবাবুর বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দের শেষভাগে কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দর্শনার্থে গমন করিয়া পথে যে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং যে আঘাতে তাঁহাকে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী করিয়াছিল, সেই পীড়া হইতে কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বর্ধমান যাত্রা করেন। এই বার তিনি মহারাজ মহাতাপচাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া রাজবাটীতে পুনরায় পদার্পণ করেন। মহারাজ তাঁহাকে রাজভবনে থাকিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। 'কোথায় আছেন', জিজ্ঞাসা করায় ব্যঙ্গচ্ছলে প্যারীবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্যারীবাবুর হোটেলে'। (১০) সেকালে বর্ধমানই স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বর্ধমান অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রয়োজন হইত না। সুতরাং অসুস্থতা নিবন্ধন যখনই কলিকাতা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমানে গিয়া অবস্থিতি করিতেন।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের জন্য বর্ধমান যাত্রা করেন। এইবার বর্ধমানে অবস্থানকালে শহরের নানা স্থান দর্শন করেন। একদিন পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাবিধৌত কমলসায়ার ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ উপবন সকল সন্দর্শন করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি উপভোগ করেন। উপবন পরিবেষ্টিত কমলসায়ারের তীরে মহারাজের এক অতি মনোরম উদ্যানগৃহ দেখিয়া তাহাতে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মহারাজ বাহাদুর ঐ বাটী ভাড়া দিতে পারেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে জানাইলেন যে তিনি ভাড়া দিবেন না, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাটীতে বাস করিলে নিতান্ত সুখী হইবেন! রাজামাত্যবর্গের অনুরোধ এবং বন্ধুগণের পরামর্শে পরিশেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং সে যাত্রা চারি মাস কাল কমলসায়ার নিকেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস করিয়াছিলেন। এই কমলসায়ারে বাস হইতেই তাঁহার বর্ধমানের প্রতি স্থায়ী প্রীতির সূত্রপাত হইল। এই উপবনের সন্নিকটে

১০ 'হোটেল কথাটি ব্যবহার করার একটু অর্থ ছিল। ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস, ৺প্যারীচরণ সরকার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সে সময়ের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বায়ু পরিবর্তন জন্য বর্ধমান গমনপূর্বক মিত্র মহাশয়ের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। যে গৃহে এই বিদ্বানমণ্ডলীর মজলিস হইত, সে গৃহখানি এখনও বর্তমান আছে।

অনেকগুলি দরিদ্র মুসলমানের বাস। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই সকল দরিদ্র লোক তাঁহার আত্মীয়স্বজন মধ্যে—পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। ঐ পল্লীর ছোট ছোট বালক বালিকা তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে প্রতিদিন খাবার কিনিয়া দেন, তাহাদের স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতিরও নানা অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবসায়াদি চালাই-বার মতো মূলধনও দিয়া সর্বদা স্থায়ী অন্ন সংস্থান করিয়া দেন; এইরূপে এই পল্লীর দরিদ্র লোক তাঁহাকে পরমাত্মীয়—আপনার জন করিয়া লইল।

বর্ধমান দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির উপযোগী স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে বর্ধমানের যে সৌভাগ্য অস্তমিত হইবার সূত্রপাত হইল। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে যে সংক্রামক জ্বরের সূচনা হয়, তাহা পরবর্তী ৪৪ বৎসর কাল ধরিয়া নদীয়া, বারাসত, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার অসংখ্য গ্রামে ভীষণ কাণ্ড ঘটাইয়া বহুলোকের প্রাণ সংহার করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ অরণ্যে পরিণত করিয়া পরিশেষে ভাগীরথী পার হইয়া হুগলী ও বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। এই ভয়ংকর ম্যালেরিয়া জ্বরে সমগ্র বঙ্গদেশ শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। এই সংক্রামক ব্যাধির সমাগমে যখন বর্ধমানের সুখ ও স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ করিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় দুশ্চেদ্য দরিদ্র বাৎসল্য নিবন্ধন বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন, পূর্বের ন্যায় প্যারীবাবুর বাটীতে না থাকিয়া তাঁহার বাটীর নিকটে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রোগক্লিষ্ট লোকমণ্ডলীর যন্ত্রণা দূর করিবার মানসে তিনি প্রথমে রাজপুরুষদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ বর্ধমানের দরিদ্র লোকমণ্ডলীর দুর্দশার বিষয় অবগত হইয়া এবং পূর্ব হইতে বর্ধমানের সিভিল সার্জন উপযুক্তরূপ মনোযোগ দেন নাই বলিয়া, তাঁহার স্থানে যোগ্যতর চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে শহরে ও মফঃস্বলে আরও অনেকগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া গভর্নমেণ্ট ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। মহারাজের সাহায্যেও অনেকের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নিতান্ত নিঃস্ব লোকদিগের জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই, তাই তিনি নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ধমানের বিপন্ন দরিদ্রদিগের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরোপকারপ্রিয় ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ঔষধালয়ে চিকিৎসার ভার লইয়া তদীয় কার্যে বিশেষ সহকারিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অর্থের সদ্ব্যয় হইত কি না সন্দেহ।

এই দীর্ঘকালব্যাপী সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরে বর্ধমানের অসংখ্য লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত, বিপন্ন ও শ্রীভ্রষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দরিদ্রজনের

দ্বারে দ্বারে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে দেখিয়াছেন, কৃশ ওরুগ্ন মুসলমান শিশু সন্তান তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে, কেহ বা আত্মচেষ্টায় তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপবীত ও পরিশোভিত দেহ অপবিত্র হয় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ চিত্র কি সুন্দর! কি উদার!! এইরূপে পীড়িত হইয়া অনেকে তাঁহার সহায়তায় জীবন লাভ করিয়া যখন কোনো প্রকার সংস্থানের অভাবে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল, তখন তাহাদের অন্যবিধ অভাব দূর করিয়া তাহাদিগের দিনাতিপাত করিবার নানা প্রকার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। (১১)

কর্মাটাড়।—নানা প্রকার শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক শ্রমকর কার্যে দীর্ঘকালের জন্য ব্যাপৃত থাকিয়া যখন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন বিশ্রাম লাভের জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইতেন ; সেই বাসনা পূর্ণ করিবার মানসে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে জামতাড়া ও মধুপুরের মধ্যবর্তী কর্মাটাড় স্টেশনের সন্নিহিত পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় বাটী সমেত একখণ্ড ভূমি জমা লইয়া সেখানে নিজের মনের মতো বাসোপযোগী একখানি গৃহ নির্মাণ করেন। প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে সেইখানে গিয়া বাস করিতেন, কিন্তু বিশ্রাম তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। তাই নির্জনবাসেও বিশ্রাম করিতে পাইতেন না। তাঁহার প্রকৃতিগুণে কর্মাটাড়ের নির্জন বাসস্থান ত্বরায় জনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসী সাঁওতাল। ইহারা অতি সরল প্রকৃতির লোক। স্নেহ মমতা, আদর যত্ন ও মিষ্ট কথার গোলাম, কিন্তু চরিত্র বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ অধিকাংশই খুব খাঁটি লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মিষ্ট কথা ও দয়া মায়া দেখিয়া সেখানকার সমগ্র সাঁওতাল অধিবাসী তাঁহার আপনার লোক হইয়া পড়িল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মাটাড় অবস্থান কালে প্রায় সর্বদাই লেখা পড়া করিতেন। লেখা পড়া করিতে করিতে যদি দেখিতেন, কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অমনি নিজের কাজ রাখিয়া তাহার নিকট আসিতেন' তাহার কি অভাব তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। রোগ হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দিতেন ; বস্ত্রাভাবে বস্ত্র, অন্নাভাবে অর্থ দিতেন। এতদ্ভিন্ন থালা, ঘটি, বাটি যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিতেন। আমাদের দশ হাত কাপড় হইলে চলে, সাঁওতালদের বার হাত কাপড় চাই, কেহ কেহ ১৩।১৪ হাতও লইত।

সাঁওতালদিগকে বিদ্যাসাগর এত ভাল বাসিতেন যে, বর্ধমান হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ইহাদের জন্য লইয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কর্মাটাড়ের সাঁওতালগণ বর্ধমানের সীতাভোগ ও

---

১১ শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংকলিত।

রসগোল্লার আস্বাদন পাইয়াছে। একবার কিছু খেজুর ক্রয় করিয়া লইয়া যান। তাহারা এই খেজুর খাইয়া, আরও চাহিয়াছিল; তাই একবার ১০। ১২ বস্তা খেজুর লইয়া গিয়া ইহাদিগের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে দেন। ইহারা তাঁহাকে এরূপ আপনার লোক মনে করিত যে তাঁহার হাত হইতে খাবার জিনিস কাড়াকাড়ি করিয়া লইতে কুণ্ঠিত কি ভীত হইত না। বালিকা ও যুবতী সাঁওতাল স্ত্রীলোকদের চপলতায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে ঐরূপ দ্রব্যাদি বিতরণের সময়ে ধাক্কা খাইতেও হইত। তাহারা তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িত। ইহারা সুখ সংবাদ দিতে, বিপদ আশ্রয় ও নিজেদের পরস্পরেব মধ্যে কলহের পরামর্শ লইতে এবং বিবাদ মিটাইতে আসিত, রোগে ঔষধ ও অভাবে অন্নবস্ত্র লইতে আসিত। পুজার সময়ে তিনি ইহাদেব সকলকেই নূতন কাপড় দিতেন। অনেকে আসিয়া পাছে কাড়াকাড়ি করে, তাই পূর্ব হইতে প্রত্যেকের নামে স্বতন্ত্র গাঁটরি বাঁধিয়া রাখিতেন, তাহারা আসিবামাত্র নামে নামে কাপড় বিতরণ করিতেন।

এই অঞ্চলে মৎস্য ব্যবসায়ী কেহ নাই। কারণ এই যে, মৎস্য ক্রয় করিবার লোক অতি অল্প। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া দেন যে, মৎস্য আনিলেই ক্রয় করিবেন। তদনুসারে তিনি যখন খর্মাটারে থাকিতেন তখন মৎস্য ধরা, অর্থোপার্জনের একটা পন্থা হইত। যে যত মাছ ধরিয়া আনিত, তিনি সে সমস্তই ক্রয় করিতেন, নিজের প্রয়োজনমতো রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই স্টেশনের বাবুদিগকে ও পোস্ট মাস্টার বাবুকে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি তথায় থাকিলে কর্মোপলক্ষে অবস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুদের আহারের বেশ সুবিধা হইত। মধ্যে মধ্যে বিবিধ আয়োজনে নিমন্ত্রণ খাওয়াটাও ঘটিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেখানে যখন থাকিতেন সঙ্গে সর্বদা ঔষধ থাকিত; এজন্য অনেক সময়ে তাঁহার নিকট থাকাটাই লোকে নিরাপদ মনে করিত। তাঁহার সাঁওতাল সুহৃদ্‌দিগের রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই অধিক ফলপ্রদ হইত। ইহাদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণের জন্য সর্বদা প্রচুর পরিমাণে ঔষধ ও ঔষধ দিবার জন্য অসংখ্য শিশি মজুত থাকিত।

খর্মাটাড়ের সাঁওতাল ও অন্যান্য দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিজ ব্যয়ে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল করিয়া দিয়াছিলেন।

এই স্থানে নির্জ্জন বাসের প্রারম্ভ হইতেই অভিরাম মণ্ডল নামক একজন যুবককে বাটী ও উদ্যান রক্ষকদের প্রধান রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকটি নিজের আচরণের গুণে তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে, সে ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। তাঁহার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস থাকায় অনেক সময় সেখানকার লোকদিগের মাসহারার টাকা ও বস্ত্রাদি তাহারই

নিকট পাঠাইতেন, এরূপ মাসহারা পাঠাইবার জন্য যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার পত্রখানি এই ঃ

শ্রীহরিঃ শরণম্‌

শুভাশিষঃ সন্তু।—এই পত্রের মধ্যে ত্রিশ টাকার নোট পাঠাইতেছি, সকলকে দিবে, আমি যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অসুখ ও কাজের ঝঞ্ঝাট এই দুই কারণে যাইতে পারিতেছি না।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ'

এই ভৃত্যের পুত্র রামটহলেব বিবাহের সময় সমস্ত ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করেন, নিজ ব্যয়ে সে বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দেন।

উত্তরপাড়া যাইতে পথে শকট হইতে পতনে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল তাহা আর কখনও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় নাই। সর্ব্দাই অল্পাধিক অসুস্থ থাকিতেন। ক্রমে বয়োধিক্য সহকারে পেটের পীড়ায় প্রবল হইয়া উঠে। চিকিৎসকের পরামর্শে একটু একটু লডেনম্‌ সেবন করিতে আরম্ভ করেন। খর্মাটাড়ে অবস্থান কালে একবার ভ্রমক্রমে অধিক মাত্রায় লডেনম্‌ সেবন করায়, বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। অত্যল্পক্ষণ পরেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিবিধ প্রক্রিয়া যোগে বমন দ্বারা তাহা উঠাইয়া ফেলেন। তাই অল্পে অল্পে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই ঃ 'বুদ্ধির দোষে যে শারীরিক উপদ্রব ঘটাইয়াছিলাম তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু অদ্যাপি সচ্ছন্দ শবীব হইতে পারি নাই। উদর ও মস্তক অদ্যাপি প্রকৃতিস্থ হয় নাই।

খর্মাটারে অবস্থান কালে, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন। এই উপলক্ষে অনেকের সংবাদ লইয়া গৃহে ফিরিতেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা থাকিত, তাঁহার সঙ্গে চলিতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। তিনি সর্ব্দাই সোজাপথে চলিতেন; যেখানে পথ ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে লতা গুল্ম, উঁচু নীচু, উপেক্ষা করিয়া সোজা যাইতেন। জুতা অচল হইলে খালি পায়ে চলিতেন, পায়ে আঘাত লাগিলে গ্রাহ্য করিতেন না। সঙ্গের লোকদিগকে সর্ব্দাই ছুটিতে হইত।

সাঁওতালগণ তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে তথায় তাঁহার গমন সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রাতঃসন্ধ্যা ইহারা তাঁহার পেঁছান সংবাদপাইবার জন্য অতি ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিত। প্রত্যেকবারেই তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করিতে আসিবার সময়ে, যাহাব যাহা থাকিত, তাঁহার জন্য উপহার লইয়া আসিত। তরকাবি ও শাকসবজিব ভাগই অধিক। এক ব্যক্তির কিছু না থাকায় সে একটা মুবগীর ছানা লইয়া আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার

উপবীত দেখাইয়া বলিলেন, 'আমি ত উহা লইব না।' সে ব্যক্তি মর্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া সেই কুক্কুট-শাবক হাতে করিয়া লইলে পর সে ব্যক্তির মনক্লেশ দূর হইল। তিনি এইরূপ মুক্তভাব ও উদার আচরণেই সকল লোকের প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন।

এই উপবন পরিশোভিত নির্জন বাসভবন অতি রমণীয়। ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি বিষয়ে ভৃত্য অভিরামকে লইয়া তিনি নিজে অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সে উদ্যানের অনেক বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও কুসুমকুঞ্জ তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত। আমরা যখন এই উপবন পরিশোভিত গৃহ ও ইহার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, সেই উদ্যানের প্রীতিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমাদের প্রাণে বিষাদমাখা গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বোধ হইয়াছিল যেন, তিনি যেন সংসারের শোক মুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম কলেবরে পরমানন্দে সেই সাধের নির্জন বৃক্ষবাটিকায় মহাধ্যানে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। বোধ হইয়াছিল যেন, সে উদ্যানের প্রত্যেক তৃণলতা পর্যন্ত তাঁহার সাকার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া মনের দুঃখে নত মস্তকে বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

হোমিওপ্যাথি।—কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার সূত্রপাত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম ইঁহার নিকট হোমিওপ্যাথি মতের উপকারিতা ও উপযোগিতা বেশ বুঝিতে পারেন। তিনি যখন বুঝিলেন যে, এই বিন্দু বিন্দু ঔষধ সেবনেও উপকার হইয়া থাকে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঔষধের উৎকৃষ্টতা, মূল্যের অল্পতা এবং সেবনের সুবিধা সন্দর্শনে তিনি ইহার সুপ্রচারে প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে, একদিন বহু বাগ্‌-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কের পর শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে স্বীকার করাইলেন যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোনো ফল লাভ হয় কি না, ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অনুসন্ধানপ্রিয় ডাক্তার সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপকারিতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া, ত্বরায় ইহার বিজ্ঞান-সঙ্গত মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অত্যল্প কাল মধ্যে তাঁহার এই সংস্কার—ক্রমে এই বিশ্বাস জন্মিল যে, এই পদ্ধতি অনুসারে অল্পব্যয়ে ও অল্প আয়াসে লোকে রোগমুক্ত হইতে পারে। বিশ্বাস জন্মিবামাত্র অমনি সেই পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এই পরিবর্তনের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের অনুরোধে ও পরামর্শে ক্রমে ক্রমে এই পথে একে একে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথির সুপ্রচারে তিনি এতই অনুরাগী ছিলেন যে, পল্লীগ্রামের নানাস্থানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতেও সহায়তা করিয়াছেন। ভাস্তাড়া নিবাসী জমিদার বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'বিতরণের জন্য আমি হোমিওপ্যাথি ঔষধালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি উদ্যোগী হইয়া এখানে শুভাগমন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।' হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার সুপ্রচার সাধিত হইলেও এখনও লোকের ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসায় ষোল আনা নির্ভর করিতে পারিতেন। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যখন থাকিতেন, সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স ও পুস্তক থাকিত। চিকিৎসা করিতে করিতে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে পঠদ্দশা হইতেই পীড়িত ছাত্র ও অন্যান্য লোকের রোগ-শয্যার পার্শ্বে যে কত সময় ব্যয় করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। হোমিওপ্যাথির প্রচারের পূর্বে পীড়িত দরিদ্রজনের চিকিৎসায় তিনি ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, বিহারীলাল ভাদুড়ী, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক চিকিৎসকের সাহায্য পাইয়াছেন। ডাক্তার সর্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনুরোধক্রমে দিবারাত্র কত সময়ে কত বার যে দুঃখী লোকের চিকিৎসার্থে গিয়াছেন, তাহার ধারা-বাহিক বিবরণে একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কিন্তু সে সকল ধারাবাহিক রূপে স্মরণ নাই।

হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিশ্বাস হওয়াতে যেমন তাঁহার আগ্রহ ও উদ্যোগে অনেকগুলি যোগ্য চিকিৎসক ঐ মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, অন্য দিকে তিনি নিজে দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন, এবং ক্রমে অন্য চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে অতি কঠিন পীড়াক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসায় কৃতকার্য হইতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা আরম্ভ করায় তাঁহার এই সুবিধা হইল যে, যখন-তখন যাকে-তাকে দেখিতে যাইতে পারিতেন, এবং সময়ে অসময়ে কত লোক যে, তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এরূপ ঘটনা আমরা অনেকবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। তিনি লোকের রোগযন্ত্রণায় এতই ক্লেশ পাইতেন যে তাহা নিবারণের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শূল ও হাঁপানি কাশীর ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সর্বদা বিতরণ করিতেন। যে যখন গিয়াছে বিনা মূল্যে ঔষধ পাইয়াছে।

অর্থ গ্রহণ না করিয়াও তিনি লোকের উপকারার্থে চিকিৎসা বিষয়ে

কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেন এবং সেই কার্যে তাঁহার কিরূপ নিষ্ঠা ছিল, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে খর্মাটাড় হইতে লিখিত পত্রখানিতে তাহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ 'আমি কল্য অথবা পরশু আপনাকে দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুইটি রোগীর চিকিৎসা করিতেছি যে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোনো মতে উচিত নহে। এজন্য ২।৪ দিন দেওঘর যাওয়া রহিত করিতে হইল।' বলা বাহুল্য যে তিনি তাঁহার গরীব সাঁওতালদের জন্য যাহা করিতেন, অনেক চিকিৎসা ব্যবসায়ী টাকা লইয়াও সেরূপ নিষ্ঠার সহিত কার্য করেন না।

মধুসূদনের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের বিপদুদ্ধার, অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত লোকমণ্ডলীর প্রাণরক্ষা, ম্যালেরিয়া ক্লান্ত মুসলমানের গৃহে গৃহে ঔষধ ও পথ্য দান ও সাঁওতালগণের সহিত আত্মীয়তা এ সকলই তিনি একই সাধু প্রবৃত্তির উত্তেজনাপরবশ হইয়া সাধন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে একদিকে অনেক বিপন্ন সম্ভ্রান্ত লোক বন্ধুহীন হইয়াছেন, অপর দিকে দুঃখী লোক অবলম্বনচ্যুত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে।

হিন্দু পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার।—যাহারা পরের দুঃখ অনুভব করে সংসারে তাহারাই দুঃখী। যাহারা বহু কষ্টে ২।১০ টাকা উপার্জন করিয়া কায়ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে, প্রাতঃসন্ধ্যা নিজের অদৃষ্টের চিন্তা করিতে করিতে অভাবজনিত অশ্রুজলে গৃহতল সিক্ত করিতে করিতে যাহারা দিন যাপন করে, তাহারাই দুঃখী। বঙ্গের মধ্যবিত্ত দরিদ্র ভদ্র পরিবারই এই শ্রেণীর দুঃখী লোক। একজন সামান্য উপার্জনক্ষম লোকের উপর বহুপরিবার নির্ভর করে। দৈবক্রমে সেই একটি লোক লোকান্তরিত হইলে বহুলোক নিরুপায় হইয়া পড়ে। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্য কোনো কোনো সদাশয় মহাশয়ের সাহায্যে উপরোক্ত বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরূপে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন, স্যার রমেশচন্দ্র এবং উদ্যোগিরূপে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু নবীনচন্দ্র সেন, রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ছিলেন। আজ এই বৃত্তি ভাণ্ডারের সাহায্যে অসংখ্য পরিবার অসময়ে অনটনের মধ্যে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারনে সক্ষম হইতেছেন। এই বৃত্তি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পর, কয়েক বৎসর কাজকর্ম বেশ আশানুরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এমন সময় আফিসের একজন কর্মচারীকে লইয়া বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমে মতান্তর ও পরে মনান্তর ঘটে। এই ঘটনায় তাঁহার এতই বিরক্তি ও অপ্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল যে আর কোনো ক্রমেই একত্র কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি নিজে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

তাঁহার এইরূপ সংস্রব ত্যাগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই নিতান্ত বিষন্ন ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার সংকল্প পরিবর্তনের জন্য বিধিমতো চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার সংস্রব ত্যাগে মহারাজ স্যার যোতিন্দ্রমোহন ও স্যার রমেশচন্দ্র ফণ্ডের ট্রাস্টির পদ ত্যাগ করিলেন। অপর সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু বিধাতার কৃপায় ক্রমে ক্রমে সকল আশংকা তিরোহিত হইল এবং সেই বৃত্তিভাণ্ডার অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া অসংখ্য দুঃস্থ ও বিপন্ন লোকের অভাব মোচন করিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যক্তিগত কলহের অধীন হইয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিভাণ্ডারের সহিত সকল সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহার মতো লোকের নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা স্বাভাবিক। তিনি আবার অত্যধিক মাত্রায় নিজের সংকল্পের অধীন হইয়া চলিতেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী লোকের দুই-একটা আবদার সহ্য করিয়া তাঁহার সহকারিতায় কোনো সাধারণ অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে দেওয়া উচিত, আমাদের দেশের লোকের সে শিক্ষা এখনও হয় নাই। আবার তিনিও অপর দশজনের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া দশ জনের সহিত মিলে মিশে কাজ করিতে পারিতেন না। দশ জনের মিলিত কাজে তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল না। তাই একাকীই অনেক কাজ করিতেন, এবং যাহা করিতেন তাহাতেই কৃতকার্য হইতেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিই যখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, তখনই মধুসূদনের ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ছাপাখানার দুই তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির কার্যকলাপ নিজে পরিদর্শন করিতেন না। নানা বিশৃংখলা নিবন্ধন এক সময়ে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ডিপজিটরির স্বত্ব ত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। একদিন এই রূপ আলাপের সময় তাঁহার পরমাত্মীয় কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, 'আপনি বিরক্ত না হইয়া যদি ত্যাগ করেন, সন্তুষ্ট হইয়া যদি দেন, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিয়া আপনার পছন্দ মতো চালাইতে পারি। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অনেক সহস্র টাকা পাইতেন, যে সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য পর দিন অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সেই মজলিসে বসিয়া মুখের কথায় ব্রজবাবুকে দান করিলেন। বলিলেন, 'আচ্ছা আপনাকেই দিলাম।' এই কথা বলার পরদিন প্রাতঃকালে সত্য সত্যই লোকে টাকা লইয়া সাধাসাধি করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে কথা মুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহা আর ফিরাইলেন না। অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'উহার বিশ হাজার টাকা মূল্য হইলেও, দান করিয়াছি।'

আমাদের দেশে তাঁহার অপেক্ষা ধনবান লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় যখন বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারত সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন অনেক সম্পন্ন লোকের দানের পরিমাণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার দানের অঙ্ক উঠিয়াছিল। তিনি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সুহৃদ্‌রূপে এই সদনুষ্ঠানের সূত্রপাতে ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন।

একবার বর্ধমান হইতে বীরসিংহ যাইবার সময়ে পথে একস্থানে পাল্‌কী নামাইলে পর, একটি বালক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শিশুপ্রিয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি বালকের উপর পড়িবামাত্র বালক বলিল, 'বাবু একটা পয়সা দেবেন?' তিনি বলিলেন, 'এক পয়সা কি করবি?' 'কেন খাবার খাব।' 'যদি দুটি পয়সা দি?' 'আজ এক পয়সা কাল এক পয়সা খাব।' 'যদি চার পয়সা দি?' 'হাটে আঁব কিনে গাঁয়ে বেচে দু'আনা করবো, লাভের পয়সা খাবো, আসল পয়সায় আবার ঐ রকম করে কেনা বেচা করবো।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের কথায় খুশি হইয়া তাহাকে কিছু বেশী পয়সা দিয়া বলিয়া যান যে, 'এই পয়সা যদি তুই বাড়াইতে পারিস তোকে টাকা দিয়া দোকান করিয়া দিব।' ফিরিবার সময়, সে পয়সা থেকে টাকা করিয়াছে দেখিয়া তাহাকে দোকান করিয়া দেন, আর তাহার বিবাহের সময় সমস্ত খরচ দেন।

মেট্রপলিটন কালেজে বিনাবেতনে যে কত ছাত্র পাঠ করিত, তাহার সংখ্যা হয় না। যে কখনো কোনো প্রকার সন্তোষজনক প্রমাণসহ নিজের দারিদ্র্য জানাইয়া তাঁহাকে ধরিয়াছে, সেই বিনাবেতনে পড়িতে পাইয়াছে। কেবল ফ্রি পড়িতে পাইয়াই কি বালকেরা তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছে? তাহা নহে। সময় সময় পরিধানের বস্ত্র ও উদরের অন্নের জন্যও তাঁহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। এইরূপ দরিদ্র ছাত্রবর্গকে সাহায্য করিতে কত সময়ে তাঁহাকে যে প্রবঞ্চিত হইতে হইত, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার জননীর লোকান্তর গমনের পর একে একে অনেক বালক কেবল 'মা নাই' বলিয়া তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিল। দুই-তিনটি বালক 'মা নাই, বলিয়া সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে বাটীর নিকটস্থ মুদির দোকানের মালিক প্রথমোক্ত বালকের কৃতকার্যতা জানিতে পারিয়া সাহায্যপ্রার্থী অপরাপর বালকগণকে এরূপ বলিতে শিখাইয়া দেয়।

কলিকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে একটি অনাথ বালককে বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে পড়িতে অনুমতি দেন। কয়েক দিন পরে নিজে বিদ্যালয়ে গিয়া টিফিনের সময়ে দেখেন, সেই সুন্দর বালকটি বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। প্রথমে বিশ্বাস হইল না, পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে সেই অবৈতনিক বালকটিই বটে; কিন্তু তখনও তাঁহার বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয় নাই। কারণ সে বালককে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বলিয়াই জানিতেন, এবং পূর্ব স্বচ্ছলতার শেষ চিহ্নরূপে ঐ

সকল পরিচ্ছদ থাকা অসম্ভব নহে, এইরূপই মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তাহাকে একটি বাটি দুধ ও সন্দেশ খাইতে দেখিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাঁহার সম্পন্ন বন্ধু ঐ উপায়হীন বালকের জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ পত্র দিয়াছিলেন, এবং যাঁহার অনুরোধের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উক্ত বালককে বিনা বেতনে পড়িতে দেন, সেই সুপরিচিত সম্ভ্রান্ত লোকটি ঐ বালকের ভগিনীপতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই ঘটনা এবং এই ঘটনাসংসৃষ্ট ব্যক্তির নাম অবগত হইয়া আমরাও দেশের লোকের অপদার্থতা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও ক্ষোভে মস্তক অবনত করিয়াছিলাম। অভাবে পড়িয়া লোক প্রবঞ্চনা করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে ; কিন্তু এইটি যাঁহার কার্য তাঁহার পক্ষে শ্যালককে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়াইয়া, মৃত্যুকালে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাওয়া কিরূপে কার্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে !

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীনবৎসলতার প্রতি কত লোক যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। একবার একটি বালক উত্তরপাড়া স্কুলের কোনো এক নিম্নশ্রেণীর ঠিকানা দিয়া পত্র লেখে। পত্রের মর্ম এইঃ 'আমি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক। সংসারে কেহই নাই, পরের বাড়ি এক মুঠো ভাত খাইয়া বহুকষ্টে লেখাপড়া শিখিতেছি। এমন একটি পয়সা নাই যে পার হইয়া কলিকাতায় গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করি। যদি দয়া করিয়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে নিশ্চিন্ত মনে একটা বৎসর লেখাপড়া করিতে পারি।' পত্রেব ভাবভঙ্গিতে বিশ্বাস করিয়া অন্যকৃত পুস্তক ক্রয় করিয়া স্বরচিত পুস্তকের সহিত একত্র করিয়া নিজ হইতে ডাক খরচ দিয়া সেগুলি পত্রোক্ত ঠিকানায় পাঠাইলেন। বৎসর বৎসর এইরূপে সেই বালক উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াছি বলিয়া, নূতন নূতন পুস্তক তাঁহার নিকট হইতে লইয়াছে। যে বার পুস্তক লইবার শেষ বার, সেইবার উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কথা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নামের একটি বালক এই বার তোমার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে, সে ছেলে কেমন পড়ে বল ত?' শিক্ষক বলিলেন, 'কই এ নামের ছেলে আমার স্কুলের প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে নাই ত!' বিদ্যাসাগব মহাশয় রহস্যের স্বরে বলিলেন, 'তুমি বেশ মাস্টার ত! একটা ছেলে পঞ্চম শ্রেণী হইতে বৎসর বৎসর 'ক্লাসে উঠিয়াছি বলিয়া' আমার নিকট বই লইতেছে; স্কুলের ঠিকানায় ডাকে বই পাঠাইয়াছি সে পাইয়াছে আর তুমি বল কিনা এ নামের কোনো ছেলে নাই? তুমি কি তবে সকল ছেলেকে চেন না নাকি?' মাস্টার মহাশয় অতি ভালমানুষ তার উপর আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন, কাজেই বেশী কিছু না বলিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা আমি সন্ধান করিয়া কল্যই আপনাকে জানাইব।

এমন হ'তে পারে যে ছেলেটির দুটো নাম আছে।' পর দিবস হেড্ মাস্টার মহাশয় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস অনুসন্ধান করিয়া ঐ নামের ছেলে পাইলেন না। কিন্তু ঐ নামের একজন পুস্তক বিক্রেতা বিদ্যালয়ের অতি নিকটে পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহাকে পীড়াপীড়ি করায় সে নিজকৃত অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল ঐরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে বৎসর বৎসর পুস্তক আনাইয়া বিক্রয় করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঘটনার উল্লেখকালে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে দেশের বালক এরূপ প্রবঞ্চক, সে দেশের কি সহজে ভাল হইবে?'

লোকে পিতৃমাতৃদায় জানাইলে, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন, কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছি না বলিয়া তাঁহার নিকট বিপদ জানাইলে, তিনি সাহায্য করিতেন, সংসারের দৈনিক উদরান্নের জন্য ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া সংসারের সমস্ত সংস্থান বিনষ্ট করিয়াছে, মাথা রাখিবার স্থানটুকু বন্ধক দিয়াছে, আর ২।৪ দিন পরে ঋণদাতা ঘর বাড়ি, ও ভূসম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিয়া লইবে, এরূপ বিপদে তিনি লোককে সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমরা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক (চিকিৎসক) রোগ শোক প্রভৃতি নানা বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন। (১২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরোপকার সাধনে আপনার সর্বনাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। একবার এক ভদ্রসন্তান (নাটোরের পুলিস্ সব্ ইন্স্পেকটর) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, 'গত কল্য অপরাহ্নে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। এই ভদ্রলোক বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। এক মকদ্দমায় ইঁনি নিরপরাধ হইয়াও ছয়মাসের জন্য কারাবাসের আদেশ পাইয়া অব্যাহতি লাভের জন্য হাইকোর্টে মোশান করিয়াছেন। সাত শত টাকায় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাটী হইতে গতকল্য টাকা আসিবার কথা, আসে নাই। আজ প্রথম শুনানীর দিন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘোষ মহাশয়কে একটু পত্র দিলে তিনি অদ্যকার কাজটি করেন, ইত্যবসরে টাকা আসিলেই তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা অবশ্যই আসিবে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাপারটি অবগত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, 'এ কর্ম আমার দ্বারা হইবে না। এক জনের এক

---

১২ রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

পা জেলে, আর এক পা বাহিরে, তাহার টাকা বাকি রাখিয়া কাজ করিতে বলা কেমন দেখায়? আর তিনিই বা কি মনে করিবেন? তাহার পর ঘোষেব বিলাত যাওয়ার সময়েই তাঁহার সহিত আত্মীয়তা, তাহার পর আর বড় বেশী দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, এরূপ স্থলে সহসা এরূপ একটা অনুরোধ করিয়া পাঠান কেমন কেমন দেখায়; এটা কি করা যায়? তুমিই কেন ঘোষকে ইহার কথা বল না। তিনি ত শুনি পরোপকারী বিপন্নের বন্ধু। আমি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখন কাহারও জন্য তাঁহার নিকট এরূপ অনুরোধ করিলে আজ অসঙ্কোচে তাঁহাকে একথা বলিতে পারিতাম।'

বিপন্ন ভদ্রলোক এই কথা শুনিয়া সাশ্রুনয়নে সাগরের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'শুনিয়াছি, কোথাও যাহার কিনারা না হয়, সে এখানে আশ্রয় পায়, আমার তাহাও গেল!' সাগর সংক্ষুব্ধ হইলেন। আর্দ্র হৃদয়ে পত্র লিখিতে বসিলেন।

'My Dear Ghosh' পর্যন্ত লিখিয়া আর লেখনী অগ্রসর হয় না। এক মিনিট দু-মিনিট করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন বলিলেন, 'না এ কর্ম আমার দ্বারা হইবে না।' বিপন্ন ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তবে আমি কি জেলেই যাইব?' আর্তের এই নিদারুণ হতাশবাক্য বিদ্যাসাগর-হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল, তিনি দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া কি করিলেন পাঠক! শুনিতে চাও? সেদিনকার কপর্দকশূন্য বিদ্যাসাগর বাক্স হইতে ব্যাঙ্কের চেক্ বই বাহির করিয়া সাত শত টাকার একখানি চেক্ হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ, আমার ব্যাঙ্কেও টাকা নাই, এই চেক্‌খানি ঘোষকে দিয়া বলগে, তিনি যেন কাল বেলা সাড়ে এগারটার পূর্বে এই চেক্ ব্যাঙ্কে না পাঠান। আমি আজ দিনের মধ্যে যেমন করিয়া হউক, এই টাকা ব্যাঙ্কে মজুত করিয়া দিব।'

সুকৃতি বলেই হউক, আর স্বপক্ষে প্রবল প্রমাণ ছিল বলিয়াই হউক, সব ইন্‌স্পেকটর বাবু হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়া চতুর্থ দিবসে সাত শত টাকা লইয়া দয়ার সাগরের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে সেই বন্ধুটি। প্রণামান্তে টাকাগুলি সম্মুখে রাখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'আমি হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছি, আর আজ প্রাতঃকালে বাড়ি হইতে এই টাকাগুলি আসিয়াছে, তাই সুসংবাদটি আর টাকাগুলি দিতে আসিলাম।' বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন প্রত্যাশায়, বন্ধুসহ দারোগাবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তুমি ভদ্র সন্তান হইয়া আমাকে বঞ্চনা করিলে, আর তুমি (বন্ধুটিকে) আমার পরিচিত হইয়া আমার সঙ্গে চাতুরী করিলে?' দুইজনে হতবুদ্ধি ও শুষ্কতালু হইয়া দণ্ডায়মান। অল্পক্ষণ পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় বলিলেন, 'তুমি

না বলিয়াছিলে, তুমি পুলিশে কর্ম্ম কর?' (সভয়ে উভয়ের উত্তর) 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'না, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না, তুমি আমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছ।' উত্তর—'আজ্ঞে না মহাশয়, অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে আমি নাটোরের পুলিশ সব্ ইনস্পেকটর।' বন্ধুটি তখন কথার ভঙ্গিমায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনি কি বলিতে চান?' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, 'মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি মনে করিব? এই দীর্ঘকালে অনেকলোক 'দিব' বলিয়া টাকা লইয়া আর দেখা দিল না, নিরুপায় লোকদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু সুপরিচিত সম্পন্ন ব্যক্তিরাও ত প্রয়োজন সাধনের জন্য টাকা লইয়া সকল সময় ফিরাইয়া দেন নাই, আর অন্তরঙ্গের ত কথাই নাই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশে তুমি পুলিশের দারোগা হইয়া সাত দিনের কড়ারে টাকা লইয়া চতুর্থ দিবসে ফেরত দিতে আসিয়াছ কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?' দারোগা বাবু উচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়া নত মস্তকে দণ্ডায়মান। তখন তাঁহাকে বন্ধুসহ বসিতে বলিয়া বলিলেন, 'হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময় মকদ্দমা না বুঝিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেয়, তোমারও দেখছি তাই হয়েছে, তোমার ত জেলে যাওয়া উচিত ছিল। সাত দিনের কড়ারে টাকা লইয়া চারিদিনের দিন যে ফেরত দেয়, সে পুলিশের দারোগাগিরি চাকরি ক'রে জেলে যাবে না ত জেলে যাবে কে?' রহস্যের সুযোগ পাইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচিত অপরিচিত বিচার ছিল না; লোককে অপ্রস্তুত করিতে ছাড়িতেন না। উপর্যুক্ত ভদ্রলোকের নিষ্কৃতি লাভে অশেষ প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরে টাকাগুলি তুলিবার সময় বলিলেন, 'ওহে আট আনা কম দিলে কেন?' দারোগা বাবু অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয় টাকার মধ্যে কোনো প্রকারে একটা আধুলি থাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গের বন্ধুটি বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন 'আমি যার নিকট টাকা লইয়াছিলাম, তাঁহাকে টাকা দিয়াছি, এখন এই টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে গেলে গাড়ি ভাড়া কি আমাকে দিতে হবে?' আর আট আনা না পেলে আমি ও টাকা বাক্সে তুলিব না।' ক্ষণকাল এইরূপ রঙ্গরসে সময়াতিপাত করিয়া বলিলেন, 'যখন আমার লোকসান করিলে, তখন আরকিছু লোকসান কর।' পাঠক, এখন বুঝিয়া লউন, এ লোকসানে দারোগা বাবুর রসনার কিরূপ পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। (১৩)

অসুস্থ অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময় ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতি করিতেন। একদিন তিনি জাহ্নবীর তীরে রাজপথে পদচারণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটি স্ত্রীলোক একটি বালককে ক্রোড়ে লইয়া

১৩ মাইকেল মধুসূদনের কর্মচারী বাবু কৈলাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট এই বিবরণ শুনিয়াছি। তিনিই দারোগা বাবুর সঙ্গে ছিলেন।

সেই পথে বেড়াইতে আসিয়াছে। ছেলেটিকে দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি সেই বালকের পায়ের উপর পড়িল। তাহার দুখানি পায়ের আকার সমান নহে দেখিয়া তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে বালকের দুখানি পা-ই এক রকম ছিল; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একখানি পা শীর্ণ ও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার কে আছে, এবং ইহার চিকিৎসা হইয়াছে কিনা?' প্রত্যুত্তরে স্ত্রীলোকটি জানাইল যে 'ইহার বাপ-মা সামান্য অবস্থার লোক হইলেও, ছেলেটির পাখানির এই দোষ দূর করিবার জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, ইহাদের আর কিছুই নাই।' বালকের পিতা-মাতা বালকের রোগ শান্তির জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। সেই অসুস্থ শরীরে ইহাদের বাড়ি গিয়া সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাদের বাড়ি গিয়া বালকের পিতার সহিত কথাবার্তা কহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ফরাসডাঙ্গায় থাকিয়া সেখানকার চিকিৎসক ও হুগলীর সিভিল সার্জন দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছে, কোনো ফল লাভ হয় নাই। লাভের মধ্যে সর্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়াছে।

তখন অনুকম্পার উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থান, সময়, অবস্থা ও লোক বিচার না করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া বসিলেন, 'ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভাল ডাক্তার দেখাইলে ত ভাল হইত!' এই অযাচিত বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ দান শুনিয়া বালকের পিতা এই মোটা চাদর গায়ে উড়িষ্যার আমদানি চেহারার অপরিচিত লোকটিকে বাতুল ভাবিবে কি না, মনে মনে তাহারই মীমাংসা করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বালকের পাখানি আর একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'আমার বোধ হয়, মেডিকেল কালেজের ডাক্তারখানায় দেখাইলে কিছু না কিছু উপকার হইত।'

তখন বালকের পিতা বলিল, 'কলিকাতায় লইয়া গিয়া ডাক্তার দেখান আমার সাধ্যাতীত।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ববৎ পরমাত্মীয়ের ন্যায় বলিলেন, 'আচ্ছা যদি কেহ কলিকাতায় যাওয়া আসা, সেখানকার থাকা আর ডাক্তার ও ঔষধের ব্যয় বহন করে, তাহলে তোমরা ছেলেটিকে নিয়ে কলিকাতায় যেতে পার কি না? বালকের পিতা ব্রাহ্মণের বাহিরের অবস্থা ও প্রস্তাবের গুরুত্ব এতদুভয়ের বৈষম্য স্মরণ করিয়া কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে গৃহস্থের দ্বারে ক্রমশঃ জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে সংবাদ দিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া ত্বরায় অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে জনতা ও জনতাজাত কোলাহলের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল, উপস্থিত জনগণের কেহই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিত না বটে, কিন্তু তিনি যে বাড়ির ঠিকানা

দিয়াছিলেন, তাহাতেই গোল বাধিয়া গেল। ঐ পল্লীর এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অপরিচিত ব্রাহ্মণের উক্তি সকলের পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া এবং নির্দিষ্ট বাটী অবগত হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কেহ চিনিতে পার নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এমন কথা আর কে বলিতে পারে? অপরাহ্নে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তিনি যেরূপ বলিবেন, তাহাই করিলে উপকার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে জানিবে।' তখন চারিদিকে 'বিদ্যাসাগর' 'বিদ্যাসাগর' বলিয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে ঐ বালকের খঞ্জত্ব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম নানা আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বালকের পিতা বালকের মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যার সময় নির্দিষ্ট বাটীতে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। কিন্তু আগন্তুক কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথাই বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে যেটুকু গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটুকু ধরা পড়িয়াছে; তিনি যে তিনি, তাহা ইহারা বুঝিয়াছে। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি ঠিক করিলে?' বালকের পিতা করজোড়ে ক্ষমা চাহিয়া বলিল, 'আজ আমার দরজায় আপনার পায়ের ধুলা পড়িয়াছিল, আমরা এ সৌভাগ্য জানিতে না পারায় আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি, আগে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন, তাহার পর অন্য কথা।' সাগর স্বাভাবিক সদাশয়তার বশবর্তী হইয়া বলিলেন, 'তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর নাই সুতরাং তোমার অপরাধও হয় নাই। এখন বল দেখি কি স্থির করিয়াছ?' বালকের পিতা বলিল, 'আমরা নিরুপায়, মহাশয় কোনো ব্যবস্থা করিলে, আমরা মাথা পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিব।' তখন হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বালকের পিতার দিকে তাকাইয়া সাগর বলিলেন, 'তবে তোমাদের এখানকার সব বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় যাইবার ও সেখানে কিছুদিন থাকিবার আয়োজন কর। আর কবে যাবে, তাহা আমাকে বলিয়া যাইবে, তাহা হইলে আমি গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিব।' তখন বালকের পিতা পুনরায় বলিল, 'আজ্ঞা সেখানে থাকিতে হইবে? তা হইলে অনেক টাকা খরচ হবে, এত টাকা—।' দয়ার সাগর বলিলেন, 'সে ভাবনা তোমার কেন?'

আমরা এই ঘটনার সমগ্রভাগ তাঁহার নিকটে না শুনিলেও ঘটনাটি সত্য কি না, জানিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ফরাসডাঙ্গার সেই ছোট ছেলেটির পাখানি কি সারিয়াছে?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'না, একেবারে সারে নাই, তবে যেমনটি ছিল, অন্ততঃ তেমনটিই থাকবে, আর বাড়বে না এইটুকু লাভ।' মানুষের সুখ সুবিধাটা তিনি এতই দেখিতে শিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা মানুষের যেখানে যেটুকু লাভের সম্ভাবনা ছিল, প্রাণপণে সেটুকু করিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা জানি এই বালকটির

চিকিৎসার ঔষধ, ডাক্তারের ভিজিট, ইহাদের তিন-চারি মাসের গ্রাসাচ্ছাদন ও বাড়িভাড়া ইত্যাদিতে চারি-পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মানুষ সুস্থ-শরীরে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক, এজন্য তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না।

কলিকাতা রাজধানী ও বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে অসংখ্য দীন দরিদ্র লোক আট আনা, এক টাকা, দু টাকা, তিন টাকা, চার টাকা, পাঁচ টাকা সাহায্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পাইয়াছে। সময়ে সময়ে এরূপ বিপন্ন লোকদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরাও তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি, এবং তিনি দয়া করিয়া এরূপ অনেক লোককে আমাদের অনুরোধে অনেক দিন ধরিয়া সাহায্য করিয়াছেন। যাহারা একবার তাঁহার করুণাদৃষ্টি লাভ করিত, তাহারা যে কেবল মাসে মাসে কিছু কিছু পাইয়া উপকৃত হইত, তাহা নহে; তাহাদের বিপদ আপদে সাময়িক সাহায্য এবং পূজা প্রভৃতিতে বস্ত্রাদিও এক প্রকার পাওনার মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইত।

সম্পন্ন কি দরিদ্র, ভদ্র কি ইতর, আহারের সময়ে কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে, তাঁহার নিকটস্থ হইলে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, আহার হইয়াছে কি না। একবার একটি দূরদেশীয় লোক কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া শেষে র্থমাটাড়ে গিয়া তাঁহার দর্শন পায়। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে সে ব্যক্তি বাটীর নিকটে দাঁড়াইয়া বাটীর দিকে তাকাইতেছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেই ব্যক্তি তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে সর্ব প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার আহার হইয়াছে কি?' লোকটি নানা দেশ পর্যটন করিয়া বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সস্নেহ সম্ভাষণে সে ব্যক্তির হৃদয় আর্দ্র ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন?' সে ব্যক্তি বলিল, 'এত ক্লেশ পাইয়া এত লোকের নিকট গিয়াছি, কিন্তু কই কেহ ত খাওয়া হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করে নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে তাহার আহারের আয়োজন করিয়া দেওয়াইলেন পরে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের একজন লোক বড় আশা করিয়া কলিকাতার দুই জন বড়লোককে দেখিতে আসেন। এক স্থানে কয়েক দিন দরবার করিয়া সাক্ষাৎ না হওয়াতে তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে পুনঃ পুনঃ পানার্থে জল প্রার্থনা করিয়া না পাওয়াতে ক্রোধে কম্পিত-কলেবরে ও আরক্ত নেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আহারান্তে অনাবৃত দেহে একটি হুকা হাতে নীচের ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান। লোকটি আসিয়া বিরক্তির ভাবব্যঞ্জক মুখে ও কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হবে?' বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দুর্ঘটনা কল্পনা

করিয়া বলিলেন 'হঁ্যা দেখা হবে বই কি, আপনি বসুন।' সে ব্যক্তি বলিলেন, 'হবে বইকির কর্ম নয়, এক জনকে সেরে এলুম, এঁকেও সেরে চলে যাই, হয়ত হোক।' বিদ্যাসাগর মহাশয়, তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে কি না, জানিয়া তামাক দিতে বলিলেন। তামাক খাইতে খাইতে লোকটির মেজাজ একটু নরম হইলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আহারাদি হয়েছে কি?' সে ব্যক্তি বলিলেন, আর আহারে কাজ নাই, তুমি একবার ডেকে দাও দেখে চলে যাই।' তিনি বলিলেন, 'আহারাদি না হয়ে থাকে ত এখনই যোগাড় হতে পারে।' ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইঙ্গিতে জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। লোকটিকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া কিঞ্চিৎ জল খাওয়াইলেন। জল খাওয়ার পর তামাক খাইতে খাইতে লোকটি বলিলেন, 'একবার ডাকিয়া দিলে এঁকেও দেখে চলে যাই, আর এমন দুষ্কর্ম করিব না। অনেক পীড়াপীড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমস্ত ঘটনাটি শুনিলেন, এবং অপরিচিত লোকের নিকট বিনাদোষে তাঁহার তিরস্কারভাজন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাও বুঝিলেন। তারপর অতিথির পীড়াপীড়িতে আত্মপরিচয় দিতে না দিতে, সে ব্যক্তির মনের উত্তেজনা ও মুখের আরক্তিম ভাব পলকমধ্যে তিরোহিত হইল। লোকটি নিতান্ত বিস্ময়বিজড়িত ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আ—মি—আ—মি—আ—প—না—কে আপ—নাকে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় 'আপনার কোনো দোষ নাই। মানুষ এরূপ অবস্থায় পড়িলে, মনের ঐরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে, ইহাতে কোনো দোষ নাই।' তখন লোকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহিমাময় নামের উপযুক্ত পরিচয় পাইয়া পরমানন্দে আপন আলয়ে গমন করিলেন। (১৪) পাছে লোকের এইরূপ অসুবিধা হয়; এই ভয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাণান্তেও নিজের গৃহদ্বারে দ্বারবান রাখিতেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য যাতায়াতের মুক্ত পথ কখনও রোধ করিতেন না। একবার কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য এক পরিচালককে প্রহরীরূপে দ্বারে বসাইয়াছিলেন। কোনো এক সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রবেশের সময় দ্বারে দ্বারবানের নিষেধে অপদস্থ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। নিমন্ত্রণকারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গৃহে আসিয়াই একজনকে প্রহরীরূপে দ্বারে বসাইয়া বলিয়া দেন যে, 'আমার বিনা হুকুমে কাহাকেও এখন বাড়িতে আসতে দিবে না।' ক্ষণকাল পরেই তাঁহারা আসিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহের মুক্তদ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পাইলেন। সাক্ষাৎ হইল না তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন।

বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত লোকদের কাহারও পীড়া নিবন্ধন কাজ কর্মে

---

১৪ স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের মুখে এই ঘটনাটি শুনিয়াছি। ঘটনা সংসৃষ্ট ব্যক্তি বরিশালবাসী।

অপটু হইলে, তাহার সংবাদ লইতেন ; কেমন করিয়া চলিতেছে, এ সংবাদটা সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন। অচল হইলে কোনো না কোনো উপায়ে সাহায্য দান করিতেন। একবার অত্যধিক পীড়া নিবন্ধন আমাকে কর্মস্থান হইতে দীর্ঘকালের জন্য বিদায় লইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকমুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিয়া পাঠান। দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'দাদামশাই বলিয়াছেন যদি আপনার উঠিবার শক্তি থাকে, তবে একবার যাইবেন, তিনি শয্যাগত, তা না হ'লে, তিনি নিজেই আপনাকে দেখিতে আসিতেন।' আমি তাঁহার এই স্নেহপূর্ণ আহ্বানে অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার চরণ দর্শনার্থে যাই। আমি গিয়াছি শুনিয়া আমাকে তাঁহার শয়নকক্ষে শয্যাপার্শ্বে আহ্বান করিলেন। আমি প্রণত হইয়া চরণসমীপে দণ্ডায়মান হইতে না হইতে নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফুরণ এত ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইল যে তাহাতে আমার প্রাণে ত্রাস ও গভীর ক্লেশ সঞ্চার হইল। তিনি বসিতে বলিয়া বলিলেন, 'তোমার কি খুব বেশী অসুখ?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ।' 'ছুটি লইয়াছ, বেতন পাও ত?' আমি বলিলাম, 'অর্ধেক।' 'চলে কি রকমে?' 'ঋণ ক'রে।' 'মাসে এরূপ কত টাকা ঋণ হইতেছে?' মাসে ৩০।৪০ টাকা।' 'এ টাকার সুদ দিতে হয়?' 'হ্যাঁ, হয়।' 'তোমরা আজকালকার ছেলে, কোনো কথা বলতে ভয় হয়, শেষে কোন্ কথায় ইন্সল্ট্ (insult অবমাননা) হইবে তাহার ত ঠিক নাই।' আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, 'আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিবার হয় করুন, আমাকে ঐরূপ বলিলে, আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশের কথা ; কারণ আপনার কোন আদেশই আমার কাছে ঐরূপ উপেক্ষার বিষয় নহে।' তখন বলিলেন, 'সুদ দিয়া অন্যত্র টাকাটা কর্জ করা অপেক্ষা বিনাসুদে আমার নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ মাসে মাসে লইলে হইত না? যখন সুবিধা হইবে ২।১ টাকা ২।৪ টাকা করিয়া পরিশোধ করিলেই ত হইতে পারে।' আমি বলিলাম, 'আপনার মতো মহাজনের নিকট ঐরূপ কড়ারে টাকা লইলে, সে টাকা কি আর পরিশোধ করিতে পারিব?' উত্তরে বলিলেন, 'নাই পারলে!' আমি বলিলাম, 'আপনার টাকায় আমার অপেক্ষা অনেক গরীবের অন্ন-সংস্থান হয়, তাহাদিগকে বঞ্চিত করা কি উচিত?' তিনি সেই পূর্ববৎ সরস মুখভঙ্গিমায় বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, 'আমি বুঝিতে পারি নাই, তুমি যে হে বড় লোক!' এই কথা বলিতে না বলিতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, 'না—আমি তা বলি নাই।' অমনি বলিলেন, 'তাহোক্, না হয় তুমিও আমার কিছু খেলে!' আমি বলিলাম, 'দেখি, আমার নিতান্ত অচল হইলে আমিই আপনাকে বলিব।' 'বলি, অচল আর কাকে বলে?' 'যে কয় দিন চলে চলুক।' তার পর সাবাড় হ'য়ে যাবে যে।' সাবাড় হবার মতো

হয় ত আমিই আপনাকে বলিব।' তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হ্যাঁ, সাবাড় হবার অবস্থা বুঝে আমার টাকাটা নিও, তা'হলে আর শোধ দেবার নাম করতে হবে না। তা হবে না বাবু, তুমি যদি এখন জ্যান্ত থাকতে থাকতে না লও ত সাবাড় হবার সময় আমি কিছু করবো না। তখন কিছু করা আর জলে ফেলে দেওয়া এক কথা। তা হবে না। বাড়ি গিয়া হিসাব ক'রে কতগুলি টাকা মাসে বেশী লাগছে আমাকে জানাবে, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিব।' আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া দীর্ঘকালের জন্য গাঢাকা দিলাম। আরোগ্য লাভ করিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, আমি শীঘ্রই কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইব, অসুখ সারিয়াছে।' তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, তুমিও বাঁচিলে আমিও বাঁচিলাম।' কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই হইতে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অত্যধিক স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলাম। এই ঘটনার পর যখন যাহা বলিয়াছি, তাহাই অনুগ্রহ করিয়া শুনিয়াছেন।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের আচরণের প্রতি তাঁহার এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। একদিকে প্রেমিকহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মানবের প্রতি মহা-প্রেমে অনুপ্রাণিত, অপরদিকে মানুষের আচরণে ভগ্নহৃদয় ও বিশ্বাসবিহীন। এরূপ অবস্থা যে কতদূর যন্ত্রণাদায়ক, মানুষকে যাঁহারা প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছেন, আকাশসদৃশ বহুবিস্তৃত সমবেদনার প্রান্তরে যাঁহার হৃদয় ছুটাছুটি করিয়াছে, তিনিই কেবল বুঝিতে পারিবেন, মানুষের নির্মম ব্যবহারে—নিষ্ঠুরাচরণে হৃদয়ে সরস ভাব কতদূর বিনষ্ট হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশায় অতি আর্তভাবে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরুষ মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভাল হয়।' তাঁহার প্রাণে যে এরূপ দারুণ নরবিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহার জন্য আমরাই অনেক পরিমাণে দায়ী, কারণ আমাদের আচার আচরণ দেখিয়াই তাঁহার ঐরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল ঃ আর আমরাও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারিব যে আমাদের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ধারণার পোষকতা করিতেছে। কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে বলিলেই, তিনি বলিতেন, 'রও, ভেবে দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি ত কখনও তাহার কোনো উপকার করি নাই।' তাঁহার শেষ ধারণা এই জন্মিয়াছিল যে উপকৃত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই কৃতঘ্ন হয়। বহু লোকের আচরণ দেখিয়াই তাঁহার ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল।

নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে আশানুরূপ সুফল দর্শনে বঞ্চিত হইয়া একদিন দুঃখ করিয়া মানুষের আচরণের কথা বলিতে বলিতে একটি উদ্ভট শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া বলেন, মানুষ ইতর জন্তুর অপেক্ষাও অধম। তাহার প্রমাণঃ

কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

একঃ প্রমাদী স কথনং ন হন্যাতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

এই শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, 'এক একটা ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া জীবগণ বিনষ্ট হয়; আর যে মানুষের এই পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্তভাবে কার্য করিতেছে তাহার বিনাশ কত সহজ, আর কত সাবধান হইলে, তবে মানুষ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, মানুষ কি তা ভাবে? মানুষ দিবানিশি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া আপনাকে ইতর জন্তু অপেক্ষা হেয়, ঘৃণিত, অধম করিতেছে। ইতর জন্তু কারা? মানুষ যাহাদিগকে ইতর জন্তু বলে, তাহারা—না মানুষ নিজে? মানুষ সকল অপকর্মই করিতে পারে; তবে সে শৃগাল, কুকুর, সিংহ; ব্যাঘ্র, গো, মেষ প্রভৃতি জীবদিগকে কেন ইতর জন্তু বলিবে?' সে দিন তাঁহাতে যে উত্তেজনা যে অভিমান, যে ক্ষোভ দেখিয়াছিলাম সেরূপ অতি অল্পই দেখিয়াছি। শ্লোকটি বড়ই ভাল লাগিল, তাই তঁাহার দ্বারা শ্লোকটি লিখাইয়া লইয়াছিলাম।

দুঃখ এই যে তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি লোকের সেবা, লোকের সুখ সাধন করিতে গিয়া পদে পদে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছেন; আর তাঁহার সেই শান্ত হৃদয়—সেই কোমল প্রাণ বারবার সন্তপ্ত ও দগ্ধ হইয়াছে। ক্লেশ? জীবনব্যাপী ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু কখনও লোকের দুঃখ নিবারণে বিমুখ হন নাই। মানুষের দুঃখ শুনিলেই তঁাহার সরল প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইত। ধনবান কি দরিদ্র, ভদ্র কি ইতর, পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সতী কি স্বৈরিণী, দয়া করিবার সময় তিনি এ বিচার করিতেন না। মানুষ কেন, তঁাহার সরল প্রেমে পশুপক্ষীরাও বশ হইয়াছিল। বিহঙ্গকুলের মধ্যে কাক অতি ধূর্ত বলিয়া বিদিত এবং তাহাদের আচার আচরণেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাক তঁাহার ভালবাসার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিকটে দঁাড়াইয়া ইহাদিগকে যাহা দিতেন, ইহারা অসঙ্কোচে তাঁহার হাত হইতে তাহাই লইয়া খাইত। একবার বাবু ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় কমলা লেবু খাইতে দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরামবাবু লেবু খাইয়া তাহার ছিবড়াগুলি ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তঁাহাকে সেগুলি ফেলিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'দেখ, ওগুলি ফেল না, খাইবার লোক আছে।' তখন ক্ষুদিরামবাবু অবাক হইয়া বলিলেন, 'কমলার ছিবড়া কে খাবে?' তখন তিনি বলিলেন, 'জানালার বাহিরে ঐখানে রাখ, দেখিবে যাহারা খায়, তাহারা আসিবে। ক্ষণকাল ঐরূপে রাখার পর কেহই আসিল না দেখিয়া ক্ষুদিরামবাবু বলিলেন, 'কই কেউ ত এল না।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়

বলিলেন, 'তোমার চোগাচাপকানের জাঁকজমক দেখিয়া তাহারা আসিতেছে না ; তুমি সর দেখি,' বলিয়া তিনি নিজে গিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইবা মাত্র অমনি চির-পরিচিতের ন্যায় কাকেরা আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত সেই খাদ্যগুলি গ্রহণ করিল। (১৫) যাঁহার প্রেমে পশুপক্ষী বশ হয়, তাহাতে মানুষ বশ হইল না! মানুষ সে প্রেমের মর্যাদা বুঝিল না! সে সরল স্বাভাবিক প্রেম মানুষের নিষ্ঠুরাচরণে যে ক্ষত বিক্ষত ও ম্লান হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? তাই তিনি অহংকার করিয়া বলিতেন, 'তোমাদের মতো ভদ্রবেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভাল লোক।'

---

১৫ বাবু ক্ষুদিরাম বসু মহাশয় আমাদিগকে এই ঘটনাটি বলিয়াছেন।

## দ্বাদশ অধ্যায় ॥ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অথবা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বঙ্গদেশীয় জমিদার ও রাজন্যবর্গের নাবালক পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউশন নামে একটি বাসভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় রাজকুমার ও জমিদারতনয়গণ এইখানে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় এই ইন্স্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষগণের প্রধান একজন ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। একবার এক সময় ওয়ার্ডের বালকগণের আহারাদি ও অন্যান্য ঐরূপ বিষয় লইয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত মতান্তর ও শেষে মনান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মিত্র মহাশয় উভয়েই সমান স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং উভয়ের স্বাধীনতার সংঘর্ষণে একটু অগ্ন্যুৎপাত হয়। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ অপ্রিয় সংঘটন হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে থাকিয়া অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করিতে কিংবা অন্যকে সরাইতে চেষ্টা করিতেন না। নিজেই সংস্রব ত্যাগ করিয়া অশান্তির স্থানে শান্তিস্থাপনে অগ্রসর হইতেন। এখানেও তিনি তাহাই করিলেন। ইন্স্টিটিউশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই পদত্যাগপত্র ফিরাইয়া লইতে পুনঃ পুন অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহাকে এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া কর্তৃপক্ষ অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দের শেষভাগে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পীড়িত হইয়া রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কান্দীর রাজভবনে বাস করিতেছিলেন। বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাজা প্রতাপচন্দ্রের আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে কান্দীর রাজভবনে বাস করিয়াছেন। এবারেও রাজার কঠিন পীড়ার সংবাদে বহু অর্থব্যয়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কান্দিতে গমন করেন, এবং সুচিকিৎসার দ্বারা তাঁহার রোগশান্তির চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে রাজা বাহাদুর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির ট্রাস্ট ও নাবালক পুত্রদিগের একমাত্র অভিভাবক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজার এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বহু চেষ্টাতেও রাজা তাঁহার উপর এই কার্যের ভার অর্পণ করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে অন্য

কোনরূপ সুব্যবস্থা করিবার পূর্বেই রাজা কাশীপুরে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। রাজা বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে অনুরোধ করিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজার লোকান্তর গমনের পর শোকদগ্ধ আত্মীয়রূপে দীর্ঘকাল সমস্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। রাজ-সম্পত্তি যাহাতে সুরক্ষিত ও সুপরিচালিত হয় এবং রাজকুমারেরা যাহাতে সুশিক্ষাগুণে পিতার ন্যায় সজ্জনসমাজে বরণীয় হইতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁহার যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। ইংরাজ-রাজের তত্ত্বাবধানে রাজ-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। নাবালক রাজকুমারদিগকে ওয়ার্ডে না রাখিয়া বাটীতে জননী ও পিতামহীর নিকট রাখাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছোট লাট বিডন সাহেবের নিকট দরবার করিতে হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধক্রমে রাজকুমারদের অভিভাবকরূপে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজা প্রতাপচন্দ্রের পরম বন্ধু বলিয়া গভর্নমেণ্ট তাঁহাকেই প্রধানরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার সহোদর রামময় ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত পদের প্রার্থী হন। অপর দিকে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও উক্ত পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন প্রেরণ করেন। উভয়েই যোগ্য পাত্র, এজন্য সকলেই মনে করিয়াছিলেন, রামময় ভট্টাচার্য মহাশয়ই সহোদরের পদে নিযুক্ত হইবেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কালেজের ছাত্র না হইলেও কাব্য ও অলঙ্কারে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ষড়্দর্শনে সে সময়ে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিভাজন হইয়াছিলেন। একমাত্র শূন্য পদের প্রার্থী হইয়া দুইজন পণ্ডিত আবেদন করিয়াছেন। অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব কাহাকে নির্বাচন করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিপন্ন হইলেন। পরিশেষে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'অলঙ্কার শ্রেণীতে "কাব্য-প্রকাশ" পড়াইতে হইলে ন্যায় ভাল জানা থাকা আবশ্যক। ন্যায়রত্ন সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র রীতিমতো অধ্যয়ন করিয়া বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব আমার মতে ন্যায়রত্নই ঐ পদ পাইবার উপযুক্ত পাত্র।' (১) বলা বাহুল্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ই উক্ত শূন্য পদে নিযুক্ত হইলেন।

বোম্বাইয়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক কলিকাতা পরিদর্শন মানসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাদুঘর দেখাইতে যান। তিনি এশিয়াটিক্ সোসাইটির সদস্যরূপে বহুবার ঐ বাটীতে গিয়াছেন, কিন্তু কখনও কেহ তাঁহাকে তাঁহার পাদুকা ত্যাগ করিতে বলে নাই। এবার কি কারণে বলা যায় না, সেখানকার

১ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

দ্বারবানেরা তাঁহাকে পাদুকা ত্যাগ করিয়া যাদুঘরে যাইতে বলে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, যাদুঘরে চটি জুতা লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেই বিদেশী ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনাকে অন্য কোনো বন্ধুর সহিত পাঠাইয়া দিব। আমি আর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব না। এই বলিয়া যখন চলিয়া আসেন, তখন যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ সাহেব (কিউরেটার) এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বহুসাধ্যসাধনাতেও আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি তখন আর ঐ গৃহে প্রবেশ করিবেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। কর্তৃপক্ষাদিগের নিকট এই ব্যাপার অবগত করায় তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইলেন যে, তিনি যখন যে পরিচ্ছদে ইচ্ছা যাদুঘর ও সোসাইটির অফিসে আসিতে পারিবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া লিখিয়া পাঠান যে, আমার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণের জন্য এক নিয়ম এবং আমার জন্য আর এক নিয়ম, এইরূপ নিয়ম বিপর্যয়ের প্রশ্রয় দিতে আমি কোনো মতেই সম্মত নহি। যদি সাধারণের জন্য এরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় তবেই কেবল আমি সেই সাধারণ নিয়মের অধীন হইয়া যাতায়াত করিতে পারি, নতুবা বিশেষ নিয়মের সুযোগ লইয়া অপরের সঙ্গে নিজের এরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে সম্মত নহি। এই কলহে যাদুঘর ও সোসাইটির কর্তৃপক্ষ, তৎপরে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, ক্রমে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত পত্র লেখালেখি হইয়া শেষে সরকারী জেদ বজায় রহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণের পক্ষ সমর্থনে প্রয়াসী হইয়া যখন বিফলচেষ্ট হইলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও যাদুঘরের দ্বার অতিক্রম করিবেন না। ১৮৮৩।৮৪ খৃস্টাব্দের শীতকালে মহামতি লর্ড রিপণের রাজত্বকালে যখন কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর যাবতীয় বিচিত্রতার সমাবেশে সে স্থান এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমস্ত ব্যাপার অবগত করিয়া একটিবার দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, লোকের মুখে শুনিয়া ও তোমাদের অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া একবার যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুনিয়াছি সেই বড় বাড়িটার বড় দরজা পার হইয়া নাকি প্রদর্শনীতে যাইতে হয়, তা হ'লে আর আমার কেমন করে যাওয়া হয়? আমি ত এ জীবনে সে দরজায় আর পা দিব না। এরূপ লোকবৎসলতা ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা কয়জন লোকের পরে সম্ভব?

বিদ্যাসাগরসুহৃৎ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালী-পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় চূড়া ভগ্ন হয়। সেই স্থান পূরণের ভার

মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ইংরাজ সম্পাদক রাখিয়া কার্য চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহার ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়া ইহার উপযুক্ত পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথমে ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন। তাঁহারই নির্বাচনে রায় বাহাদুর পেট্রিয়ট সম্পাদকরূপে স্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। এই পরিবর্তনের জন্য ডাক্তার মুখোপাধ্যায় চিরজীবন বিদ্যাসাগরের উপর বিরক্তির ভাব পোষণ করিতেন।

মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সহিত নানা সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। সিংহ মহোদয়ের অক্ষয় কীর্তি মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাই সিংহ মহাশয় সর্বপ্রকারে কার্যটি সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হন।

সংস্কৃত কালেজের দ্বিতল গৃহে সংস্কৃতকালেজের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ প্রয়োজনবশতঃ সেই গৃহ চাহিয়া বসিলেন এবং নীচের অন্ধকূপসম একটি অপরিচ্ছন্ন গৃহে, বহুকাল হইতে সংগৃহীত ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলির স্থান নির্দেশ করিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় এই অনুচিত আবদারে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনিও বিদ্যাসাগরী ধরনে গঠিত হইয়াছিলেন। স্বদেশীয় সুদুর্লভ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি নীচের ঘরে অযত্নেরক্ষিত হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত হইবে, ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, লাইব্রেরি গৃহ ত্যাগ করা অসম্ভব; কারণ, তাহা হইলে বহুমূল্য গ্রন্থসকল ত্বরায় বিনষ্ট হইবে। এই সংগ্রামে কর্তৃপক্ষের নিকট সাহেব বাদী জয়লাভ করিয়া যখন সংস্কৃত পুঁথিগুলি নীচের ঘরে নামাইতে লাগিলেন, তখন সর্বাধিকারী মহাশয় কর্মত্যাগের অভিপ্রায় জানাইয়া বিদ্যাসাগর সদনে পরামর্শপ্রার্থী হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়পক্ষের মর্যাদা রক্ষা করিবার মতো কোনো উপায় করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল না হওয়াতে সর্বাধিকারী মহাশয় কর্মত্যাগ করিলেন। কর্তৃপক্ষ এই পদত্যাগ পত্র লইয়া বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। কলহে একপক্ষ পরাধীন বাঙ্গালী, অপর পক্ষ শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ। ন্যায় বিচার করিতে গেলে সর্বাধিকারী মহাশয়েরই জয় হইত, তিনি এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে না পারিয়া কর্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের প্রাচ্য সাহিত্য জন্য তাঁহার আবদার পূর্ণ করা নিতান্ত হীনতার পরিচায়ক বোধে, কর্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু অপরদিকে কি কারণে এবং কি সূত্রে বলা যায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে নানা স্থানে এই মর্মে সংবাদ প্রচার হইতে

লাগিল যে সর্বাধিকারী মহাশয় সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে এই কার্য করিতেছেন। ছোট লাট বিডন সাহেব বাচনিক ও গোপনীয় পত্রাদির দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই সকল পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ সকলের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল। (২) ছোট লাট বিডন সাহেবের নিকটেও উপরি-উক্তরূপ নিন্দা প্রচারের সন্দেহ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ দেওয়া গেল।

কলিকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা দুই সহোদরে পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। হাইকোর্টের উকিল কাউন্সেলেরা রাশীকৃত অর্থ শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো কারণবশতঃ পূর্ব হইতে তাঁহাদের উপর বিরক্ত থাকিয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জনে ও অকারণ অর্থব্যয় নিবারণে অগ্রসর হইলেন। উভয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারে নত-মস্তকে সম্মত হইবেন

---

২ My dear Sir—When I had the pleasure of waiting upon you last, you were pleased to allude to the resignation of the Offg. Principal, Sanskrit College. But as I was not aware of all the circumstances connected with the afiair, I could not tell you anything regarding the matter. I have since made myself acquainted with the facts of the case and am inclined to think that the treatment of the Principal by · has been unnecessarily and unbecomingly harsh, as will, I believe, appear to you also on perusal of the papers enclosed ·

I have therefore tried my best to persuade him to withdraw his letter of resignation. But he says ··

( Sd.) Isvara Chandra Sarma.

My Dear pundit—I am sorry you have not been able to induce P. C. Sarbodhicari to withdraw his resignation, because I feel sure it is a step which he will hereafter regret and I am always sorry to lose the services of good officers specially if it be for an inadequate cause···

As to the fitness of the room for the reception of the Sanskrit Mss I will make enquiry.

Believe me, your sincerely,<br>( Sd ) Cecil Beadon.

-বলিয়া আশ্বাস দেওয়াতে তিনি বিষয় বণ্টনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ সম্পূর্ণ সম্মত হইলেন ; অপর জন কনিষ্ঠ বলিয়া তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি রাখিয়া বিষয় ভাগ করিলেও তিনি অপর কোনো কোনো বিষয় বেশীর ভাগ প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তুমি ছোট বলিয়া তোমার দাদার প্রতি অন্যায় বিচার করা হয়, অধর্ম করা হয়, ইহার অধিক আমি পারিব না।' কনিষ্ঠের অসঙ্গত আবদারে, সামান্য পরিমাণ মণিমুক্তা প্রভৃতির অনুরোধে বণ্টন-কার্য সুসিদ্ধ হইয়াও হয় নাই। শেষে রাজ্যসংক্রান্ত কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থায় একটু এদিক ওদিক করিয়া মিটাইয়া দিলেন।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘিনিবাসী বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। উক্ত জমিদার পরিবারের প্রধান ৺সারদাপ্রসাদ [ সিংহ ] রায় মহাশয়ের সহিত আত্মীয়তার চিহ্নরূপে চকদীঘি ইংরাজী বিদ্যালয়টি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার দাতব্য ঔষধালয়টির পরিচালনাভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের প্রধান ছিলেন। এই জমিদার পরিবারের

---

My Dear Sir,

As I am inclined to suspect that he may have also represented the matter to you in the same light I beg to assure you that I had no hand whatever in inducing Babu P. C. Sarbadhicari in forming his resolution. On the contrary as I was under the impression that the severance of his connection with the Sanskrit College would be injurious to that institution I tried my best to make him withdraw his resignation.

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

My Dear Sir.

You may be quite sure that if I had the least suspicion that Babu P. C. Sarbadhicari had acted under your advice in resigning his appointment in Sanskrit College I should not have asked you to try and induce him to reconsider what I thought a hasty and unasked for step.

Yours sincerely.

(Sd.) C. Beadon.

সম্পত্তি রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ে সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

সিয়ারসোলের রানী হরসুন্দরী দেবীর পিতারসহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা থাকায় রানীর সম্পত্তি রক্ষা ও সর্বাঙ্গীন কুশল চিন্তা করিতেন। প্রয়োজন হইলে সুপরামর্শদানে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতেন। একদিকে সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে সর্বদাই দুঃখীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ ও আত্মীয়তা স্থাপনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতেন।

একবার মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা বিভাগের ( বর্তমান ক্যাম্বেল স্কুল ) তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছাত্রগণকে মেকলে বর্ণিত কতকগুলি সুমিষ্ট বিশেষণে অভিহিত করেন। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেই সময়ে মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা বিভাগে পড়িতেন। তিনি এবং অপরাপর কয়েকজন ছাত্র অধ্যক্ষের এইরূপ অসদাচরণে মর্মাহত হইয়া দল বাঁধিয়া বিদ্যালয় ত্যাগের সংকল্প এবং ছোট লাট সমীপে, অধ্যক্ষের এইরূপ অশিষ্ট ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিয়া কোনোপ্রকার প্রতিকার হয় কি না তাহার চেষ্টা করেন। বালকেরা দলবদ্ধ হইয়া গোলদীঘির ময়দানে সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, সাহেব যতক্ষণ নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিবেন, ততক্ষণ স্কুলে যাওয়া হইবে না। অধিকাংশ বালককেই বিদ্যালয়ের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। ইহাদের বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে দিন চলাও ভার হইয়া উঠিল। উপর্যুক্ত সংকল্প সকল কার্যে পরিণত করিবার জন্য সকলে সমবেত হইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বেই সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিলেন। বালকগণকে প্রথমতঃ বুঝাইয়া স্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালকেরা সুবিধা অপেক্ষা আত্মমর্যাদার অধিক পক্ষপাতী, গোস্বামী মহাশয় সকলের অগ্রণীরূপে তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া বলায়, তিনি ছোট লাট সদনে তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইয়া রীতিমতো অনুসন্ধান করাইয়া অধ্যক্ষের দ্বারা বালকগণকে ডাকাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। (৩) দুই তিন মাস বৃত্তির টাকা বন্ধ থাকায় অনেক বালককে যে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা দূর করিতে তিনি নিজে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও সম্মানের সূত্রপাত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময়ে কোনো সম্ভ্রান্ত জমিদার বন্ধুর বাটীর নিকটস্থ এক পূর্ব পরিচিত মুদির আহ্বানে তাহার দোকানে পদার্পণ করেন।

---

৩ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।

তাহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া দোকানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একখণ্ড চটের উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সেই সম্ভ্রান্ত ধনী বন্ধু 'সুবৃহৎ অশ্বযোজিত রাজশকটে সান্ধ্য-সমীরণ সেবনে বহির্গত হইয়া তদবস্থাপন্ন বিদ্যাসাগর-সমীপে রাজপথে উপস্থিত হন ; বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া যেমন একদিকে অসম্ভব, অপরদিকে সম্ভ্রমশালী লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ স্থানে উপবিষ্ট বিদ্যাসাগরকে সপ্রণাম সম্ভ্রম প্রদর্শনও ততোধিক অপমানজনক ! কিন্তু শেষোক্ত অপমানে কার্যই ধনীর সন্তানকে করিতে হইল ! পরে এক সময়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'সে দিন বড় বিপদে পড়েছিলে।' প্রত্যুত্তরে বন্ধু বলিলেন, 'আপনি পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে ঐরকম বসেন, ওতে বড় লজ্জা বোধ হয়।' বীরপুরুষ অমনি বলিলেন, 'লজ্জা বোধ হয় ? আমার সঙ্গে পরিচয় না রাখিলেই সব চুকে যায়. তোমাকে পথে-ঘাটে অপদস্থ হইতে হইবে না। সে ব্যক্তি গরীব ব'লে কি তোমার অপেক্ষা অল্প আদরের পাত্র হইবে ?'

একবার সংস্কৃত শাস্ত্র-বিষয়ক একটি তর্ক বিতর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছোট লাটের প্রয়োজন হয়। সংবাদ আসিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, 'আমি অল্প কয়েকদিন পিতৃহীন হইয়া অতি দীনভাবে দিনযাপন করিতেছি, আমার মনের অবস্থা ও বেশভূষা কোথাও যাইবার উপযোগী নহে। যদি আপনাদের অপমান বোধ না হয়, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, আমি অনাবৃত দেহে বেলভেডিয়ারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।' গরজ বড় বালাই। ছোট লাট তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আপনি যেমন আছেন তেমনই আসিবেন। আমার তাহাতে কোনো আপত্তি নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরের ন্যায় নির্ভীকভাবে খালি পায়ে ও খোলা গায়ে ছোট লাট সমীপে উপস্থিত হইয়া যাহা বলিবার বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। (৪) হ্যাট্, কোট, চোগা, চাপ্‌কান্, আতর গোলাপ ও সুরুচিসঙ্গত কেশবিন্যাসে কি এতদপেক্ষা এক বিন্দু অধিক জাতীয় ভাব—হিন্দু আদর্শ কাহারও জীবনে সুরক্ষিত হইয়াছে ? অথচ তিনি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। পাঠক ! এখন চিন্তা কর, তাঁহার সমাজ সংস্কারের ভাব কত উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিল।

ব্রাহ্মসমাজে জাতীয় ভাব সুরক্ষিত হয় নাই বলিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন। ক্লেশের কারণ এই যে, তিনি অপর দশ জনের ন্যায় ব্রাহ্ম-সমাজকে অপ্রিয়দৃষ্টিতে, নিন্দার চক্ষে, শত্রুভাবে দেখিতেন না। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজেই জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের আশা-ভরসা করিতেন। তাই ইহাকে বিপথে যাইতে দেখিয়া প্রাণে গভীর ক্লেশ পাইতেন। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ-বাবুর সহিত কথোপকথনের সময়ে একবার বলিয়াছিলেন, 'আপনারা ( আদি-

৪ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এ ঘটনাটি শুনিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ ) একটা গলির মধ্যে পড়েছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা অন্যদিকে অত্যগ্রগামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।' তিনি ব্রাহ্মসমাজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। ভালবাসিতেন বলিয়াই, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষতা করিয়াছেন। যে সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি লইয়া দেশ মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, যখন চারিদিকে আপত্তি নিবন্ধন বর্তমান ব্রাহ্মবিবাহ আইন এক কিম্ভুতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছিল, সে ঘোরতর আপত্তি ও আন্দোলনের দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনের স্বপক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে নিজে অনুকূল অভিপ্রায় দিয়াছিলেন এবং কাশীর অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট হইতে আইনপ্রার্থী ব্রাহ্মদের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা আনাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইঃ 'আমার বিবেচনায় ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ও আবশ্যক। ব্রাহ্মমতে মধ্যে মধ্যে বিবাহ হইতেছে...আমার নিকট ও কতকগুলি পণ্ডিতের নিকট নূতন ব্রাহ্মেরা ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন, আমরা সকলে এই ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছি।' এক সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অর্থাভাবনিবন্ধন তাঁহাদের পাক্ষিক সংবাদ পত্র ধর্মতত্ত্ব প্রচার সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে কয়েক সংখ্যার মুদ্রণভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্থলে ১৭৯১ শকের ১লা আষাঢ়ের পত্রিকায় লিখিত হইয়াছেঃ 'দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকদিন হইল দুইখানি ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা বিনামূল্যে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া দেন।' ব্রাহ্মসমাজের গণনীয় ব্যক্তিগণের অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পূজ্যপাদ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি পরমাত্মীয় মনে করিতেন, তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। লাহিড়ী মহাশয় যখন যে বিষয়ে অনুরোধ করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোনো কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পৃথিবীসুদ্ধ লোক পরাস্ত হইলেও পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধ ও উপরোধ চলিত। কখনও উপেক্ষিত হইত না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণবাবু, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি সেকালের অনেকের প্রতি তাঁহার যেমন অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, নব্যদলের অগ্রণিগনের প্রতিও আবার তদ্রূপ প্রীতি ও স্নেহ ছিল। সকল বিষয়ে মতে না মিলিলেও স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র ও তৎসহ একখানি করিয়া প্রোগ্রাম তাঁহার নিকট আসিত। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন, বাবু দুর্গা-মোহন দাশ মহাশয়কে তিনি যে কত ভালবাসিতেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। যখন

দুর্গামোহনবাবুর শেষ বিবাহ লইয়া সুতীব্র সমালোচনা চলিয়াছিল, তখন তাঁহার সহোদরাধিক সুহৃৎস্থানীয় পরমপূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহ সংবাদে পরিতুষ্ট হইয়া লিখিয়াছিলেন ঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

প্রিয় ভ্রাতঃ—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। আমার আন্তরিক বাসনা ও প্রার্থনা এই, যে কয়েক দিন জীবিত থাক, নবপ্রণয়িনীর সহিত সুখে কালযাপন কর। তোমার নব-প্রণয়িনীকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহসম্ভাষণ জানাইবে; ইতি—
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৮।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ উদার ও উচ্চপ্রাণ এবং গভীর সহৃদয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্বদা সর্বত্র সকল লোকের সুখসাধন করিতে পারিলেই ও সকলকে সুখী দেখিতে পাইলেই পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন; তাই চিরদিন মানবের স্বাধীন-হৃদয়ের—মুক্তভাবের- পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ এবং সম্প্রদায়, শাস্ত্র এবং বিধি যখন তাহার অনুকূল, তিনিও তখন তাহার পক্ষপাতী, যখন তাহারা মানবের ন্যায্য সুখের বিরোধী তিনিও তখন সে সকলের ঘোর শত্রু!

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে কর্তব্যপরায়ণ লোক ছিলেন, কাজেই অপরকে কর্তব্য কর্মে উদাসীন দেখিলে, ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেখিলে, যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহার অন্যথা দেখিলে, ক্ষোভ ও অভিমানে, জ্বলিয়া উঠিতেন; এমন কি, এইরূপ কোনো কোনো ঘটনায় এমন ধৈর্যচ্যুতিও হইয়াছে, যাহা তাঁহার মহিমাময় প্রতিষ্ঠার পক্ষে 'চাঁদে কলঙ্ক'-এর মতো—শুভ্রোজ্জ্বল তুষারমণ্ডিত হিমালয়শিরে ভস্মকণার মতো প্রতীয়মান হয়। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত আশৈশব সৌভ্রাত্র-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বিষয় কর্মে লিপ্ত হওয়ার পর সংস্কৃত-যন্ত্র লইয়া মনোমালিন্যের কারণ উপস্থিত হয়। এই বন্ধুবিচ্ছেদ এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সহিত সর্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন, তদনুসারে সংস্কৃত-যন্ত্র ও তথায় মুদ্রিত পুস্তকাদির বণ্টন কার্য শেষ হইলে পর, তর্কালংকার প্রণীত শিশুশিক্ষাত্রয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পত্তিভুক্ত হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কালংকার মহাশয়ের জননী, স্ত্রী ও বিধবা কন্যাদের প্রত্যেকের মাসিক ১০ টাকা সাহায্য করিতেন। তাঁহারা অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন। তর্কালংকার মহাশয়ের জামাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিশুশিক্ষাত্রয়ে, তর্কালংকার পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইতে পারে, এই বিশ্বাসে বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের নিকট পুস্তকত্রয় তর্কালংকারের মধ্যমা-বিধবা-কন্যা কুন্দমালার নামে দান চাহিবামাত্র 'বিদ্যাসাগর মহাশয়

প্রকৃত দানবীরের পরিচয়ও দিয়াছিলেন।' শিশুশিক্ষাত্রয় চাহিবামাত্র তিনি বলিলেন: 'তথাস্তু।' (৫)

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, "তথাস্তু'র অন্যথা হইল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন, 'আমি যোগেন্দ্রবাবুকে বলিলাম, কুন্দমালাকে বলিবে আমি তাহার প্রার্থনা অনুসারে শিশুশিক্ষার তিন ভাগ তাহাকে দিলাম।'(৬)

উভয়পক্ষের কথাই এক। তবে কি কারনে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস' এবং যোগেন্দ্রবাবুর 'নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস বিফল' এই উভয় পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমাদের যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যোগেন্দ্রবাবুর অতিব্যস্ততাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পরিবর্তনের কারণ। যাহা হউক যোগেন্দ্রবাবুর ব্যস্ততা ও বিরক্তিকর ব্যবহারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থির-প্রতিজ্ঞার যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তিনি মুখ হইতে যে কথা বাহির করিয়াছিলেন. শত প্রকারের নিগ্রহগ্রস্ত হইয়াও তাহা রক্ষা করিলেই ভাল হইত। কারণ যাহাই হউক, তিনি যে দান করিয়া অথবা দান করিতে চাহিয়া নিজ অভিপ্রায় পরিবর্তন করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। তবে এই অপ্রীতিকর ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সান্ত্বনা এই যে, তিনি সামান্য কারণে নিজের উক্তির প্রত্যাখ্যানকরেন নাই, গুরুতর মর্মবেদনায় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে ঐরূপ মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈষয়িক কার্যকলাপ এত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদিত হইতে যে তাহাতে কোনো প্রকার স্বার্থপরতার লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি দীর্ঘকাল পরে অযাচিতভাবে সুদসমেত চার হাজার নশো এগার টাকা পাঁচ আনা এক পয়সা গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া পরিশোধ করিলেন; এই টাকা গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য কি না, তাহা গভর্নমেণ্ট কেবল জানিতেন না এমন নহে, বরং তাঁহাদের হিসাবপত্র মধ্যে কোথাও ঐ টাকার অনাদায়ের উল্লেখ কিংবা হিসাবে ভুল পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই টাকা পরিশোধ করিয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা ও পরস্ব বিষয়ে লোভ সংবরণের অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যিনি চিরজীবন পরস্ব বিষয়ে এতদূরে সাবধান হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কার্যকলাপের প্রতি কেহ অযথা নিন্দার কালী মাখাইলে, প্রাণে গভীর ক্লেশের সঞ্চার হয়, কিন্তু দেশকালপাত্র বিবেচনায় এ সকল সহ্য করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রীস, রোম, মিশর ও ভারতবর্ষে মানবশরীরজাত বসন্তবীজ হইতে টীকা দিয়া বসন্ত রোগ নিবারণের পদ্ধতি (নৃমসূর্যাধান)

---

৫ নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস বিফল, ১১ পৃষ্ঠা।

৬ নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস, ১৩ পৃষ্ঠা।

প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করেন যে, অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে গোবীজ হইতে টীকা দিয়া বসন্ত রোগের বহুবিস্তৃতি নিবারণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। পরে নানা কারণে এ দেশ হইতে তাহা লোপ পাইয়াছিল। পরিশেষে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ইংরাজ গভর্নমেণ্ট এই নিয়ম করেন যে, মানবদেহজাত বসন্তবীজ হইতে টীকা না দিয়া গোবীজ হইতে টীকা দেওয়া শ্রেয়স্কর। কিন্তু লোকের কুসংস্কার নিবন্ধন দীর্ঘকাল এই পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কৃষ্ণনগর গমনপূর্বক হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায় দেশে ইংরাজী টীকার প্রচলনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোক সকল চৈত্র সংক্রান্তিতে দেহের নানা স্থান বিদ্ধ করিয়া সন্ন্যাস সমাপন করিত। কেহ কেহ সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিত। আমরা শৈশবে পল্লীগ্রামে চড়কের সময় এরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। এইরূপ সর্বাঙ্গবিদ্ধ নৃত্যশীল লোকদিগের রুধিরাক্ত কলেবর দর্শনে আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতাম। ১৮৬৫-৬৬ খৃস্টাব্দে গভর্নমেণ্টের আদেশানুসারে এই কুপ্রথা রহিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কুরীতির নিবারণে বিশেষ ভাবে গভর্নমেণ্টের স্বপক্ষতা করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় জার্মেনীর অন্তর্গত লিপ্‌সিক নগরে সমবেত মনস্বীমণ্ডলীর প্রদত্ত সম্মানচিহ্নে সম্মানিত হন। সে বহু সম্মানের পরিচায়ক পত্রখানি জার্মান ভাষায় লিখিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত প্রকারে কত লোকের শুভ সাধনে চিরজীবন নিযুক্ত ছিলেন, তাহার বহুবিস্তৃত তালিকা প্রদান করা নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া যে সকল সহৃদয় বঙ্গসন্তান ভক্তিচর্চিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের এবং অন্য কোনো কোনো ভক্তিমান্ সুসন্তানের পূজার নির্মাল্য-পুষ্প দুই-একটি আমরা এখানে উপহার দিতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যাপকরূপে কখনও কুত্রাপি বিদায় গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু মাতৃভক্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে একটি রৌপ্যনির্মিত পানপাত্রে (গেলাস) নিম্নলিখিত শ্লোকটি অঙ্কিত করাইয়া উপহার দিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃভক্ত সন্তানের এই দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন :

'পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগরশর্মণে।
স্বর্গকামনয়া মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া ॥'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহভাজন স্বর্গীয় বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় (৭) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া তন্নিম্নে

---

৭ মাইকেল মধুসূদনের ব্যারিষ্টার থাকা কালের প্রধান কর্মচারী।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি সন্নিবিষ্ট করিয়া সদগৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন ঃ

'শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোহয়ং বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞকঃ।
ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্তিমদ্দেবতং ভূবি ॥'

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্লোকের রচনানৈপুন্য দর্শন করিয়া বহুবিধ ব্যঙ্গোক্তির পর প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সংস্রবে লিখিত পত্রখানি এই ঃ

'মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে ছবি বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই ছবির নীচে লিখিবার নিমিত্ত, উক্ত সংস্কৃত শ্লোক বিরোচিত হয়। ছবির নীচে শ্লোক লিখিত এবং ছবি বাঁধাই হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম! তিনি দেখিয়া, তাঁহার নিজ অভ্যস্ত রসিকতা সহকারে কহিলেন, 'শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোহয়ং' ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর নাই। 'শ্রীমান' না হইলে কি এমন উড়েবেহারার রূপ হয়? 'মূর্তিমদ্দেবতং ভূবি' এ কথার আর প্রতিবাদ নাই। সাক্ষাৎ দেবতা না হইলে, এমন কর্মভোগ আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? এইরূপে আমার শ্লোকের টীকা করিয়া পরিশেষে নিজ মহোদার্য প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, 'তোমরা যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, ইহাই আমার জীবনের লাভ; আমি অবতার হইতে চাহি না।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, আমিও তাঁহাদের অন্যতম, ভরসা করিয়া এ কথা কহিতে পারি। আমি তাঁহার জীবনের অনেক দৈনন্দিন ঘটনা অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাতে তাঁহাকে মানবদেহধারী দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। বাবু চণ্ডীচরণ, আপনার পুস্তক, বিদ্যাসাগরের সেই দেবভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে আপনাকে সাধুবাদ দিয়াছি।

খুলনার নৈহাটি, কৈলাস-কুটীর শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু'

কবি মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়া তাহার মঙ্গলাচরণে লিখিয়া রাখিয়াছেন ঃ

মঙ্গলাচরণ—বঙ্গকুলচূড়া—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম—এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে—স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা—উক্ত মহানুভবের নিকট—যথোচিত সম্মানের সহিত—উৎসর্গ করিল—ইতি ১২৬৮ সাল ফাল্গুন।

তৎপরে বঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয় তাঁহার রচিত 'দ্বাদশ কবিতা' নামক গ্রন্থের শিরোভাগে নিম্নে প্রদত্ত, উৎসর্গ স্থাপন করিয়াছেন ঃ

স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমারাধ্যবরেষু

মহাশয়,

কল্পনাকাননে প্রবেশপূর্বক যত্ন সহকারে কয়েকটি কবিতাকুসুম চয়ন করিয়া 'দ্বাদশ কবিতা' নামে একছড়া মালা সংকলন করিয়াছি। আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম। যদি যোগ্য বিবেচনা করেন, আপনি তনয়ার করে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি—

স্নেহাভিলাষী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

"পলাশীর যুদ্ধ" নামক কাব্যশিরে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ঃ 'দয়ার সাগর—পূজ্যতম—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দেব!—যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার আশীর্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়ার সাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে সেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল; এই কারণে তাহার এত আনন্দ। বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস-উদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ পবিত্র পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন, আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার এইমাত্র সাহস—এইমাত্র ভরসা।

১লা মাঘ [ বৈশাখ ] সন ১২৮২ আপনার চিরানুগত,

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন'

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "সীতার বনবাস" শীর্ষক কাব্য [ নাট্য ] গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লিখিত হইয়াছে ঃ 'উৎসর্গ পত্র—পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীচরণেষু।—গুরুদেব—দীননাথ!—মাতৃভাষা জানি না বলা ভাল নয়, মন্দ, মহাশয়ের "বেতাল" পাঠে বুঝিলাম। আচার্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

কলিকাতা, বাগবাজার, মাঘ ১২৮৮ সেবক,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ'

তৎপরে আর একজন গ্রন্থকার তাঁহার রচিত কোনো একখানি গ্রন্থের শিরোভাগে লিখিয়াছেন ঃ 'উৎসর্গ—লোকসেবাব্রতরত ও অশেষ গুণসম্পন্ন

পণ্ডিত-পুঙ্গব—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র করকমলে ভক্তি, প্রীতি ও প্রাণের সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপ এই গ্রন্থখানি উপহার প্রদত্ত হইল।'

বিপন্ন রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত ও অনাহারক্লিষ্ট দুঃখী নরনারীমণ্ডলী তাঁহাকে 'দয়ার সাগর' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে!

গভর্নমেণ্টও তাঁহাকে সংস্কারপ্রিয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিনায়ক—মুখপাত্র বলিয়াই স্বীকার করিতেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে প্রদত্ত সম্মানের চিহ্নস্বরূপ প্রশংসা-পত্রে অতি স্পষ্টভাষায় গভর্নমেণ্ট এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন: 'ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে, রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবাবিবাহ পক্ষীয় দলের অগ্রণী এবং সমাজসংস্কারপ্রিয় হিন্দুগণের পরিচালক বলিয়া এই প্রশংসা পত্র দেওয়া যাইতেছে। (স্বাক্ষর) রিচার্ড টেম্পল। (৮) তৎপরে ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ১লা জানুয়ারি তারিখে, সি. আই. ই. উপাধি দ্বারা গভর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজসম্মানে অধিকতর সম্মানিত করেন। (৯) ইহার পর স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অভিপ্রায় ও উপদেশে গভর্নমেণ্ট দেশীয় অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্য হইতে যোগ্যতর ব্যক্তি নির্বাচন পূর্বক "মহামহোপাধ্যায়" রূপ জমকাল উপাধিদানের ব্যবস্থা করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সর্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই উপাধি-সম্মানে অলঙ্কৃত করিতে কর্তৃপক্ষীয়কে পরামর্শ দেন, তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঐ উপাধিদানের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পর, তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া "মহামহোপাধ্যায়" মহিমান্বিত হইতে অসমর্থতা জ্ঞাপন পূর্বক অব্যাহতি লাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'যাহা চাপান আছে ফিরাইয়া লইলে রক্ষা পাই, এই অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যেক দরবারে 'যাইতে পারিব না' বলিয়া পত্র লিখিতে ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ পাঠাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

---

৮ To Pundit Isvara Chandra Vidyasagara in recognition of his earnestness as leader of the widow-marriage movement, and position as leader of the more advanced portion of the Hindu Community. Richard Tempel.

৯ Grant of the dignity of a Companion of the Order of the Indian Empire.—To Pundit Isvara Chandra Vidyasagara.

# ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ধর্মমতে বিদ্যাসাগর

অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো প্রকার ধর্মবিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত এই বিষয়ে কথাবার্তা কহিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার আচার-আচরণ যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, তিনিঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোনো এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান্ হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই।

এক অনাদি অনন্ত পুরুষ স্রষ্টারূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশিত রহিয়াছে, তাঁহারই মঙ্গল নিয়মে বিশ্বরাজ্য নিয়মিত; জীব সকল তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার কাল পূর্ণ হইলে তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে, মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাস কর্তৃক অভিব্যক্ত এই সূক্ষ্মতম ধর্মসূত্রে বিশ্বাস করিতেন। বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবোদ্যমে উদ্ভাসিত ধর্মান্দোলনে যখন ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে তিনি জীবনের প্রথম উদ্যম ও আগ্রহ ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে, 'নানাপ্রকার মতভেদ নিবন্ধন যখন অপ্রিয় সংঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে বিদায় লইলাম। এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে, ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব? এক্ তো নিজে কত শত অন্যায় কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া তাকে বিপথে চালাইয়া কি শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব? নিজের জন্য যাই হোক্, পরের জন্য বেত খেতে পারবো না বাপু। এ কার্য আমাকে দিয়ে

হবে না। নিজে যেমন বুঝি সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি দেখিলে বলিব, 'এর বেশী বুঝিতে পারি নাই।'

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোককেই তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বোধোদয় সম্বন্ধে বলেন, 'মহাশয়, অনেকে আমার নিকট বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা নাই কেন?' বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।'(১) ইহার পরবর্তী সংস্করণ হইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি পাঠ বোধোদয়ে সন্নিবিষ্ট হইল। নিজ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে তাঁহার মতো শিক্ষার সুহৃদ্ বালকগণের পাঠ্য-পুস্তকে ঈশ্বর-বোধক পাঠ সন্নিবিষ্ট করিতেন না। বোধোদয়ের মতই তাঁহার ধর্মমত। গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি প্রবল ধর্মবিশ্বাসবিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও নিজের ধর্মমত কিংবা বিশ্বাস দেখাইতে কিংবা জানিতে দিতে চাহিতেন না। ধর্মমত ও বিশ্বাস সর্বদাই গোপন করিয়া চলিতেন। গোস্বামী মহাশয় ধর্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি নাকি কি-একটা হয়েছ?' ঐ প্রচারক হওয়াটাকেই তিনি একটা বিভীষিকা মনে করিতেন। তিনি মনে করিতেন, প্রচারক হইলে, উপদেষ্টা হইলে মানুষের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়। তাই গোস্বামী মহাশয়কে ঐরূপ বলিয়াছিলেন। একদা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় সিটি কালেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্. এ. মহাশয়ের পিতা ৺চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য বাদুড়-বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর চারি পার্শ্বে অর্ধঘণ্টার উপর ঘুরিয়া ফিরিয়াও বাড়ি বাহির করিতে পারেন নাই। পরে বৃদ্ধ মৈত্র মহাশয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীর সন্ধান করিয়া লন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে মৈত্র মহাশয় ঐ বিপদবার্তা জ্ঞাপন করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ-প্রদর্শক সঙ্গীটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যেই শুনিলেন যে পথ-প্রদর্শক বাদুড়বাগানেই বাস করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, অমনি, চমকিত ও স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন, 'নিকটের ঐ বাড়িতে তুমি বাস করিয়া বৃদ্ধকে আমার বাড়িতে আনিতে এত বেগ দিয়াছ, তবে,

---

১ আমরা স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই বৃত্তান্তটি শুনিয়াছি।

তুমি মানুষকে কি করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেছ ? এখন থেকে এখেনে যখন তোমার এত গোলযোগ, তুমি সেই অজানা পথে কেমন করে লোক চালান দাও ? আমি বুঝেছি, তুমি ও ব্যবসা ত্বরায় ত্যাগ কর। ও তোমার কর্ম নয়। যার জানা পথে এত গোল, সে অজানা পথে না জানি লোকের কত দুর্দশাই করিয়া থাকে। তুমি বাপু ও কাজ আর করো না।' এই বিদ্রুপের কথাগুলি হইতে তাঁহার ধর্মমত বিষয়ক ধারণা বেশ সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তাহা তাঁহার নির্জনপ্রিয় যোগীসদৃশ সুহৃদ্ কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের গভীর আত্মীয়তা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারের তীব্র তিক্ততা পরিহার মানসে বারাসতে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে অনেক সময় কালযাপন করিতেন, এবং তাঁহার নির্জন কুটিরে নিষ্ঠাপূর্ণ তপস্যার সুবাতাসে অনেক সময়ে সুখে বাস করিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিধাতার প্রতি গভীর আক্ষেপ ও আক্রোশ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। নানাদেশীয় অসংখ্য নরনারীসহ "স্যার জন লরেন্স" নামক স্টিমারখানি যখন জলমগ্ন হয়, তখন তিনি আমাদের সমক্ষে গভীর মনস্তাপ সহকারে সাশ্রুনয়নে বলিয়াছিলেন, দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর ? যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন। আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলালয় হইয়া কেমন করিয়া এই ৭০০।৮০০ লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিলেন। দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ। এই সকল দেখিলে, কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।' সময়ে সময়ে তাঁহার মুখে এইরূপ তীব্র গভীর আক্ষেপোক্তি শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরবিশ্বাসবিহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কারণ, এইরূপ নিদারুণ মর্মপীড়ায় ঈশ্বরের অনেক ভক্তসন্তান অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিবার সময় এইরূপ ভাবের পরিচয় দিয়া ফেলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রণয়নার্থ যে সকল পত্রাদি আমাদের হাতে পড়িয়াছে তাহার সকলগুলিতেই "শ্রীহরিঃ শরণম্" লিখিত আছে। তিনি কেবলমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কোনো কাজই করিতেন না। যাহা নিজ-হৃদয়ের অনুমোদিত, তাহাই অসংকোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।

অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার ধর্মমত জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মবিষয়ে সহজে কাহাকেও স্পষ্টরূপে নিজ অভিপ্রায় জানিতে দিতেন না। প্রায়ই বেত খাবার গল্প এবং ঐরূপ আমোদজনক রহস্যের উপর দিয়া প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোনো স্নেহভাজন প্রিয়জনের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিলেই, নিজের প্রকৃত মত প্রকাশ করিতেন।

একবার তাঁহার স্নেহভাজন ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয় তাঁহাকে ধর্মমত বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করায় শেষে বলিয়াছিলেন, 'গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।'

রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মগতপ্রাণ সাধুগণের সন্দর্শন লাভে বড়ই সুখানুভব করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে এরূপ ধর্মনিরত সাধুগণের সঙ্গে মিলিত হইতে দেখিয়াছি। একদা তিনি শিষ্যবর্গকে বলিলেন, 'একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিব।' শিষ্যবর্গ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, 'বিধাতার কৃপা ও বিধাতার ভক্তি ভিন্ন তৎ সদৃশ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয় না।' অনন্তর এদিন অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরকে দেখিতে আসিবার ব্যবস্থা হইল। পরমহংস আসিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি পরমহংস বিদ্যাসাগর সমীপে গৃহতলে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'খানা ডোবা খাল বিল পার হইয়া এইবার সাগরে আসিয়া পড়িলাম!' প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'এসে পড়েছেন, আর ত উপায় নাই, দুই-এক ঘটি নোনা জল তুলিয়া লইয়া যান, এ সাগরে নোনা জল ভিন্ন আর কিছুই পাইবেন না।' পরমহংস বলিলেন, 'সাগর ত কেবল লবণের নহে, ক্ষীর-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র, মধু-সমুদ্র প্রভৃতি আরও ত অনেক সমুদ্র আছে! আপনি ত আর অবিদ্যার সাগর নহেন, আপনি বিদ্যারসাগর। আপনাতে রত্ন লাভই হইয়া থাকে, যখন আসিয়াছি তখন রত্নই লইয়া যাইব। নোনা জল কেন তুলিব?' এইরূপ কথা কাটাকাটির পর পরস্পরের কথাবার্তা খুব জমিয়া গেল, আলাপও বহুক্ষণ ধরিয়া হইল। নিকটস্থ সকলে সে আলাপে পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন।' (২)

তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের একটি স্বাভাবিক পরিচয় দিয়া আমরা বিষয়ান্তরে অগ্রসর হইব। তিনি একদিন কয়েকজন বন্ধুর সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে অখিলান্দন নাম এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকির একটি গান করিতে করিতে যাইতেছিল। গানের প্রথম চরণ, 'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন' শুনিবামাত্র তিনি তাহাকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি আসিলে. তাহাকে বসাইয়া ঐ গানটি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ প্রাণ ভরিয়া শুনিলেন। যতক্ষণ গান শুনিয়াছেন, ততক্ষণ অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন। গান শেষ হইলেও অনেকক্ষণ নীরবে সঙ্গীতজাত ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লোকটিকে বোধ হয় (৩) আট আনা দিয়া বিদায়

২ এই বিবরণটি আমরা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

৩ কারণ সে অনেক দিনের কথা, সে লোকটি বলিতে পারে না এক টাকা কি আট আনা।

করিলেন এবং তাহাকে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিয়া দিলেন। আমরা বহু অনুসন্ধানে এই ফকিরকে পাইয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর কিছু বেশী পয়সা দিয়া গানটি (৪) লিখিয়া লইয়াছি। সে ব্যক্তি বলিল, 'বিদ্দেসাগরবাবু আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, আর এই গান শুনিয়া খুব খুসী হইতেন। তাঁহার নিকট অনেক পয়সা পাইয়াছি।'

---

৪ (১) কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্ণয় কর্বে রে কে,
তুমি কোন্‌খানে খাও কোথায় থাক রে, মন অটল হয়ে,
কোথায় ভু'লে রয়েছ ——— ।

(২) তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়নদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাইল বৈঠা ।

(৩) তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখ্‌বো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাইচাঁদ বাউলে বলে সে নাম ভুল্‌ব না রে প্রাণ গেলে।

(৪) তুমি আপনি অসার আপনি হও সার,
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনারা,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুল্‌বে না রে প্রাণ গেলে।

(৫) আপনি তারা আপনি সারা, আপনি জড় আপনি মরা,
আপনি হও সে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে শ্মশান কর্তা গো
আপনি হও সে জলের মীন ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো স্নাকিম,
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।

# চতুর্দশ অধ্যায় ॥ স্বর্গারোহন

নব্য ভারতের পরম গৌরবস্থল বঙ্গজননীর বীরপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন-লীলা শেষ হইয়া আসিল। বিধাতার বরপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র সংসার-সংগ্রামে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে, জীবনের বিন্দু বিন্দু ব্যয় করিয়া এক্ষণে মহা-শয়নের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির ঠিক এক [ তিন ] বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দীনময়ী দেবী দুরারোগ্য রক্তাতিসার রোগে একেবারে শয্যাগত হইলেন। ১২৯৫ সালের ১লা ভাদ্র সন্ধ্যার পর পতি, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনের সেবা ও সমাদরে জীবনের শেষমুহূর্তও সুখে কাটাইয়া সকলের অশ্রুধারসিক্ত হইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সংসার জীবনে নানা বিষয়ে সামান্য সামান্য ঘটনায় অনেক সময়ে নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। এই সকল স্মরণ করিয়া প্রেমিকবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণে বিচ্ছেদের আগুন শত শত গুণে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি এই পত্নীবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনা তাঁহার প্রাণে এতই প্রবলরূপে আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি শারীরিক কি মানসিক কোনো শক্তিই পুনরায় যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিতে পারিলেন না; তাঁহার দুঃখময় জীবন ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের সমক্ষে কতবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'আর কেন? এখন গেলেই হয়।'

এইরূপ শোকজর্জরিত অবস্থায় আরও দুটি বৎসর অল্পাধিক রোগ ভোগ করিতে করিতে কাটাইয়া দিলেন। অনেক সময়েই অনেক দিন শয্যাগত থাকিতেন, এবং উপবাস ও বার্লি ভক্ষণ একমাত্র ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অসুস্থ অবস্থাতেও যখনই একটু ভাল থাকিতেন, তখনই উঠিয়া আপনার বসিবার আসনে বসিতেন এবং যথাসম্ভব কর্মকাজও করিতেন। নিষ্কর্মা বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

তিনি এতটাই কর্মপ্রিয় ছিলেন যে, এই প্রকার জীর্ণ শীর্ণ ও অসুস্থ অবস্থাতেও যখনই শরীরে একবিন্দু শক্তি অনুভব করিয়াছেন, তখনই তাঁহার পরম প্রিয় শেষ কীর্তি মেট্রপলিটন কালেজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেন। এরূপ যাতায়াত কত সময়ে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। (১) ইহার

---

১ মেট্রপলিটন কালেজের অধ্যক্ষ ৺ এন্. এন্. ঘোষ মহাশয়ের বাৎসরিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে শ্রুত।

পর ১২৯৭ সালের শেষভাগে তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে শীতের সময়ে ফরাসডাঙ্গার বিশ্রামভবনে বাস করিতে গেলেন। কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে বুঝিলেন যে, তথায় শরীর ভাল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। ইতস্ততঃ করিতে করিতে চৈত্র-বৈশাখ মাস কাটিয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় আসিয়া রীতিমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। চিকিৎসকদিগের পরামর্শমতো অহিফেন সেবন ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হওয়াতে হাকিমী চিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি ও অহিফেন সেবন ত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২।১০ দিন একটু উপকার বোধ হইলেও তাহা স্থায়ী হইল না। ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল ততই শরীর দুর্বল ও রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আষাঢ়ের শেষভাগে ডাক্তার হীরালাল ঘোষ এবং বাবু অমূল্যচরণ বসু মিলিত হইয়া রোগ পরীক্ষা করেন। পরে ডাক্তার ম্যাকনেল সাহেবকে আনাইয়া রোগ পরীক্ষা করায় যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ নির্দিষ্ট হইল। শেষেঅমূল্যবাবু, হীরালালবাবু ম্যাকনেল ও বার্চ সাহেবমিলিত হইয়া পরামর্শ করেন। কিন্তুপরামর্শে সকলের সংস্কার জন্মিল যে, রোগ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সংকট অবস্থায় চিকিৎসা চলা সম্ভব বলিয়া বোধ না হওয়াতে সাহেব ডাক্তারদ্বয় রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন নাই। মধ্যে কয়েকদিন অমূল্যবাবুই চিকিৎসা করেন। পরিশেষে পরামর্শ করিয়া ডাক্তার সাল্‌জারকে আনাইয়া হোমিও-প্যাথিমতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। সাল্‌জার সাহেবও পরীক্ষা করিয়া পীড়া গুরুতর—রোগমুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পীড়া যতই গুরুতর হউক, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, দুর্বলতা ও বার্ধক্যই আশঙ্কার প্রধান কারণ, তাহাও বলিলেন। অনেক মতান্তর ও কথান্তরের পর ডাক্তার সাল্‌জার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিনের জন্য যেন কিছু উপকার বোধ হইতে লাগিল। নানাপ্রকার উপসর্গের মধ্যে হিক্কাই প্রধান। ইহাই অত্যধিক ক্লেশদায়ক ও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। এই হিক্কা ঔষধের গুণে কখনো কমে, কখনো বাড়ে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হইল না। ইহার উপর জ্বর অল্প অল্প হইতেছিল, ক্রমে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। জ্বর ও যন্ত্রণার জ্বালায় শরীর এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সরল উজ্জ্বল চক্ষু ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া দীনতার পরিচয় দিতে লাগিল। যে মুখে মধুর হাসি সন্দর্শনে কত শত লোক পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ হইত, তাঁহার সেই মুখশ্রী আজ মলিন,—প্রতিদিন বোধ হইতেছে কোনো অলক্ষিত হস্ত সে মুখের শোভা ও সৌন্দর্য চুপে চুপে হরণ করিতেছে। আষাঢ় চলিয়া গেল, শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ যায়। ডাক্তার সাল্‌জার রোগীর অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইলেন। অন্য কোনো চিকিৎসায় আর কোনো প্রকার ফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিজের ব্যবস্থামতো যে ঔষধ বিদ্যাসাগর মহাশয়

পূর্বে ব্যবহার করিতেন, তাহাই পুনরায় আরম্ভ করিলেন। তাতেও একটু উপকার হইল বটে কিন্তু ফল হইল না, ক্রমে আসন্নকালের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে জ্বরের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণার হ্রাস হইতে লাগিল। এইরূপ জীবন মৃত্যুর দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যেও তাঁহার জীবনের শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত সুন্দর জ্ঞান ছিল। যাঁহারা দীর্ঘকাল পরেও সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বসিতে বলিয়াছেন, কোনো কোনো স্থলে ক্ষীণকণ্ঠে দু'-একটি কথাও কহিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় দেখিতে আসিলে পর, অতি মিষ্ট ভাবে তাঁহাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী আত্মীয়তার বন্ধন ও তাহা ছিন্ন হওয়ার কারণ স্মরণ করিয়া কাতর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুকষ্টে দু'-একটি কথা কহিতে পারিয়াছিলেন। বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবাল্য তাঁহার স্নেহের পাত্র। সিভিলিয়ানী পরীক্ষায় বয়সের প্রশ্নবিষয়ে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের সন্দেহভঞ্জন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বপক্ষতার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা পুলিশ কোর্টে সুরেন্দ্রবাবুর বয়সের নির্দেশ করায় কর্তৃপক্ষ তাহাই স্বীকার করিয়া লন। সিভিল সার্ভিস হইতে অসময়ে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়া যখন সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় চারিদিক শূন্য দেখিয়াছিলেন, তখন সেই দুর্দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্বক সুরেন্দ্রবাবুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুরেন্দ্রবাবু আপন বুদ্ধি-কৌশলে চেষ্টা ও যত্নের বলে এবং প্রাণপণ অধ্যবসায় যোগে যখন রিপন কালেজের স্বত্বাধিকারী তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ সীমায় সমুপস্থিত। তখন আর তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হয় না। সুরেন্দ্রবাবু দেখিতে আসিয়াছেন। অতি স্নেহে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তা পরিচালিত হইয়া নিজের পরিপক্ব শ্মশ্রু স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, 'তোমার এত শীঘ্র কেশ পক্ক হইল?' এইরূপে যত লোক দেখিতে আসিয়াছিলেন, সকলকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শনে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

সন ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিকালে ও সন্ধ্যার পরেও তাঁহার প্রবল জ্বর ছিল। ১৩ই শ্রাবণের কাল রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় বঙ্গজননী ক্রোড় শূন্য করিয়া—রজনীর অন্ধকারে বিষাদরাশি ঢালিয়া দিয়া—বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অমরধামের পথে অগ্রসর হইলেন। গৃহে পুত্র কন্যারা সন্তানসহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদনকরিতে লাগিলেন আত্মীয়-স্বজন শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া মৃত্যুশয্যার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান, অসহায় দুঃখীজন অবলম্বনশূন্য হইয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত—কিন্তু অমর-ধামের পথে স্বর্গীয় বিদ্যুতের আলো জ্বলিল, দেবতারা অমরাত্মার সম্ভাষণার্থে অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের কণ্ঠে জয়গীত—মঙ্গলধ্বনি—আনন্দকোলাহল উত্থিত

হইল। ইহলোকে বিষাদের ঘনঅন্ধকার—পরলোকের পথে আনন্দের সৌদামিনী-লীলার সূচনা। একদিকে অমাবস্যা—অন্যদিকে পৌর্ণমাসী যামিনীর জ্যোৎস্না-ধারা। একদিকে মহাশূন্যতা চারিদিক গ্রাস করিল—অন্যদিকে পবিত্রজনতাজাত মধুর কলনিনাদে চারিদিক নিনাদিত হইল। তাহারই একটি রেখা দৈবক্রমে মর্ত্যধামে বঙ্গগৃহে ঈশ্বরচন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রতিভাত হইল। সেই রেখাটি এই :

একিরে সহসা স্বরগ হইতে নামিয়া আসিল পুষ্পকরথ।
পারিজাতফুল করি বরিষণ ঢাকিল কে যেন গগন পথ।
বিজলী চমকে রথের চাকায় চূড়ায় স্বর্গীয় কেতন দুলে।
আশে পাশে শোভে মণিমুক্তাচয়, বিমল স্বর্গীয় বিভাস খুলে।
চারিধারে তার, চারিটি বালিকা, বিশদ বসনে আবৃত দেহ।
কেহ আনিয়াছে মন্দাকিনী বারি, কেহ বা চামর চন্দন কেহ।
অপরা বালার সুকোমল করে স্বর্ণপটে লেখা কি জানি কথা।
ধীরে ধীরে তারা নামি রথ হ'তে দাঁড়াল প্রাচীন তাপস যথা।
চরণকমলে নোয়াইয়া শির স্বর্গীয় বীণায় তুলিয়া তান,
কি জানি কহিল সবে সমস্বরে স্বর্গীয় ভাষায় গাহিয়ে গান... ।
'হে তাপসবর! সাধনা তোমার, হইয়াছে শেষ চলহে তবে,
নিতে ইষ্টবর চল দেবপুরে দাঁড়ায়ে দুয়ারে দেবতা সবে।
নিজে কীর্তিদেবী গাঁথি ফুলমালা করিছে প্রতীক্ষা আকুল মনে,
বসাবে তোমারে যতন করিয়া বসে নাই কেহ যে সিংহাসনে...
চল চল দেব ত্বরা করে যাই কোরোনা কোরোনা বিলম্ব আর,
মন্দাকিনী জলে ধৌত করি দেহ ঘুচাও ধরার দুঃখের ভার।
এ দিব্য চন্দন দেই মাখাইয়ে চরণরাজীবে আমরা সবে।
উঠ উঠ দেব! ত্বরা করে রথে বৃথা এ বিলম্বে কাজ কি তবে ?
এই স্বর্ণপটে রয়েছে লিখিত তোমার মহিমা জ্বলদক্ষরে,
আছে অনুমতি পরম পিতার তোমায় স্বরগে নিবার তরে।
মিলিয়ে অমনি চারিটি বালিকা ধরিয়ে তাপসে তুলিয়া রথে
আবার কুসুম প্রসন্ন অন্তরে লরষে দেবতা গগন-পথে।
অগ্রসর হয়ে আপনি চন্দ্রমা বরণ করিয়া লইল তায়,
আনন্দ স্বরূপে অমৃত কিরণ অমর নগরে ভাসিয়ে যায়।
একবিন্দু প্রাণ অনন্তের সনে মিশিয়া লভিল অনন্ত প্রাণ
বাজিল স্বরগে বিজয় দুন্দুভি গাহিল দেবতা বিজয় গান। (২)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর আত্মা ১৩ই শ্রাবণের দ্বিপ্রহরা রজনীর

---

২ শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রমোহন চন্দ প্রণীত, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর নামক পুস্তিকা।

নিস্তব্ধতার মধ্যে মর্ত্যধাম পশ্চাতে রাখিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইলেন। রজনী প্রভাত হইবার পূর্বে, অসংখ্য বঙ্গনরনারীর শোকোচ্ছ্বাসে চারিদিক পূর্ণ হইবার পূর্বে, তাঁহার শব শ্মশানে লইবার আয়োজন হইল। পথে তাঁহার চিরপ্রিয় মেট্রপলিটন কালেজের সম্মুখে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার মহাশ্মশান নিমতলার ঘাটে আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতদেহ বহন করিলেন। চন্দন-কাষ্ঠনির্মিত পর্যঙ্কে বিদ্যাসাগর-দেহ শায়িত, আর চারিদিকে আত্মীয়-স্বজনগণ বিষণ্নমুখে দণ্ডায়মান! প্রভাতে এই দৃশ্যের একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইলে পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। সেই সুবৃহৎ চিত্রে অঙ্কিত মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ছায়া যে ঘন বিষাদ-রাশিঢালিয়া দিয়াছে, সেদিকে তাকাইলে প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়—হৃদয় অবশ হইয়া পড়ে—অন্তরে কেমন এক উদাস অপ্রিয় ভাবের সঞ্চার হয়, তাই আমরা সে শায়িত চিত্রের প্রতিলিপি দিতে বিরত রহিলাম। ইহার পর চারিদিক অপেক্ষাকৃত সুপরিষ্কৃত হইলে স্নান করাইয়া চিতা-শয্যায় শয়ন করাইবার পূর্বে যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল, তাহারই প্রতিকৃতি পাঠক তোমার সমক্ষে উপস্থিত। রোগে জীর্ণ শীর্ণ ও মৃত্যুর করাল করে বিকৃতিপ্রাপ্ত মুখে, সেই শান্তি ও কমনীয়তা, দেহে সেই দৃঢ়তা, দক্ষিণ হস্তে সেই লোকসেবার ভার পরিপুষ্ট।

হে বীরবর! আজ তোমায় কি বলিয়া, কোন্ প্রাণে আমরা বিদায় দিব? হে অভাগিনী বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান! তুমি যে পিতৃমাতৃভক্তদিগের আদর্শ! হে দেব! তুমি চলিয়া গেলে, পিতৃমাতৃপূজকদের জীবন্ত আদর্শ যে চলিয়া যায়! তুমি বিদায় লইলে আদর্শ ছাত্রজীবনের জীবন্তদৃষ্টান্ত হইতে বাঙ্গালী বালকগণ যে বঞ্চিত হইবে! তুমি চলিয়া গেলে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কে আর দুঃখী জনের দুঃখ দূর করিবে? তাই বলি, তুমি যেও না,—তুমি আমাদিগকে ছেড় না,—তুমি গেলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আশা ভরসা, সুখ সৌভাগ্যও চলিয়া যাইবে,। তাই বলি, তুমি যদি যাও, তবে বল কোথায় যাইবে? আমরা সেই সুখের রাজ্যে গিয়া তোমার স্নেহ মমতা ও মিষ্ট হাসির আলোকে বাস করিয়া সুখে কালযাপন করি। তুমি ত পরম বিজ্ঞ, তবে কি বুঝিতেছ না, তোমার অভাবে আমাদের কি সর্বনাশ হইবে? কত শত নিরুপায় লোক অন্নাভাবে কাতর ক্রন্দনে চারিদিক নিনাদিত করিবে। তুমি জীবদ্দশায় একদিন অশ্রুপূর্ণনয়নে অভিমানভরে দরিদ্রের মাসহারার পুস্তকখানি আমাদের সমক্ষে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলে, আমার কি যাবার পথ রেখেছি? এই এক কাজে আমি আপনাকে এমন জড়িয়ে ফেলেছি যে, কোথাও যাইবার উপায় নাই।' হে দেব! তবে আজ সকল কর্ম ফেলিয়া সকল মায়া কাটাইয়া, দুঃখীজনের দুঃখ ভুলিয়া কোথায় যাও! যদি আমাদের ক্রন্দন—আমাদের প্রাণের সদ্ভাব তোমাকে ধরিয়া রাখিতে না পারে, তবে ঃ

'যাও দেব সুরপুরে করগে বিশ্রাম !
পাইয়া দেবের দয়া ভুলোনা সকল মায়া
স্মরিও স্মরিও দেব ভারতের নাম ।
অভাগিনী বঙ্গভাষা, করিও মঙ্গল আশা,
বালবিধবার প্রতি হ'য়োনাকো বাম
দরিদ্র বাঙ্গালিগণে, জাগাও জাগাও মনে,
মরণে না হয় যেন চির পরিণাম ।' (৩)

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি ! আজ তোমার সুপ্রভাত—তাই তুমি প্রাতঃসমীরণ-সম্ভাষণে আনন্দে নৃত্য করিতেছ, ! আজ তোমার পুণ্যনীরে পুতকলেবর ঈশ্বরচন্দ্রের মহামূল্য ভস্মরাশি ভাসিবে, তোমার তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিবে, তুমি গর্ভভরে সেই দেবদেহের ভস্মকণা লইয়া সাগর সম্ভাষণে যাইবে বলিয়া আজআনন্দে দিশাহারা হইয়াছ ! যুগ-যুগান্তরেতোমার ললাটে যে সুবর্ণ মুকুট উঠে না, আজ তাহা পরিধান করিয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিবে বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছ । দেখ, যেন এই মহামূল্য রত্নরাশির অনাদর না হয় ! তুমি যে কত প্রাণের আশা ভরসা, কত লোকের সুখ সম্পদ, কত লোকের আনন্দ ও আরাম হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, তাহা হয়ত জান না ! আজ তোমার অসীম সৌভাগ্যের সমাগম দেখিয়া আমরা শূন্যহৃদয়ে তোমারই পানে চাহিয়া আছি—অসমর্থ ও অসহায় লোকমণ্ডলী পঙ্গুর ন্যায়, তোমার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে, দেখ যেন কেহ নিরাশ না হয় ! তাহাদের আদরের—পরম যত্নের ঈশ্বরচন্দ্রের ভস্মরাশি পরম যত্নে তোমার সঙ্গম-গর্ভে রক্ষা করিও।

যাঁহারা শব বহন করিয়াছিলেন, যাঁহারা সঙ্গে গিয়াছিলেন, ভাগীরথীতটে শ্মশান ক্রোড়ে শায়িত বিদ্যাসাগর দেখিবার জন্য যাঁহারাছুটিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধের পুতুল ভাসাইয়া দিয়া ম্লানমুখে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও শূন্য হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরব কার্যপ্রিয় লোক ছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়এই যে ; তাঁহার অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়াকালে অন্য কোন শব সমাগত হয় নাই। নানা প্রকার উৎপীড়ন ও নির্যাতন মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে, শেষে শ্মশানে একাকী ভস্মীভূত হইতে পাইয়াছিলেন, ইহাও কথঞ্চিৎ সুখের বিষয়। এখানেও তাঁহার জীবনের স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত।

১৪ই শ্রাবণ প্রাতঃকালে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত, ও তৎপরে নির্বাপিত ও চিতাভস্ম বিধৌত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে—বাঙ্গালার জেলায় জেলায়—বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে—ভারতের বিভিন্ন দেশেরলোকেরহৃদয়ে এক মহাশূন্যতার সূচনা হইল। ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই সন্তপ্তহৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। সমগ্র ভারতবর্ষ বিষাদ পূর্ণ হইল। এরূপ সমগ্র জনমণ্ডলীর শোকচ্ছ্বাস ইতিপূর্বে কখনও

৩ দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর নামক পুস্তিকা।

ঘটে নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পিতৃহীন হইয়াছে মনে করিয়া পাদুকাত্যাগ করিল, সংবাদপত্র সকল বিষাদের চিহ্ন ধারণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইল; চারিদিক ভীষণ হাহাকার ও ক্রন্দনে পূর্ণ হইয়া গেল। বাঙ্গালার সমাজ-দেহের প্রাণবায়ু যে নিঃশেষ হয় নাই, বাঙ্গালী যে সুহৃৎ-শোকে সমবেত হইয়া সত্য সত্যই কাঁদিতে পারে, বাঙ্গালী যে বীরপূজায় আত্মবলী দিতে এখনও সক্ষম, তাহার আভাস বিদ্যাসাগরবিয়োগে প্রকাশ পাইয়াছে। বিধাতাকৃপা করুন, এইসুহৃৎ-শোক হইতে, বীরপূজা হইতে জাতীয় জীবনের শুভ সূচনার সূত্রপাত হউক। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের পত্রে পত্রে বীরচরিত লিখিত হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণে ভারতসংসারে যে জাতীয় শোক, ক্ষোভও মনস্তাপের অভিনয় দেখা গিয়াছিল, কোনো সদুপায়ে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিলে, জাতীয় জীবনের গঠন ও সমুন্নয়ন করিবার পক্ষে সে শক্তি পরমৌষধির কার্য করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর শক্তির সম্মিলিত স্ফুরণে জাতীয় অভিনয় প্রদর্শনে এখনও বহু বিলম্ব আছে, তাই বিদ্যাসাগর-বিয়োগে ভারতের নানাস্থানে সভাসমিতির আহ্বান ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের স্বতন্ত্র আয়োজন হইয়াছে। কলিকাতার গৃহে গৃহে ও বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বঙ্গের নানা স্থানে নানা আকারে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করা হইয়াছে। ঢাকার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সমগ্র-শহরবাসীর উৎসাহ ও আগ্রহে এক মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সভাপতিরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবিধ গুণের কীর্তন করিয়াছিলেন। সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ঢাকা কালেজে বিদ্যাসাগর-স্কলারসিপ নামে মাসিক দশ টাকার একটি বৃত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বর্ধমানে সাধারণের উদ্যোগে এবং বিদ্যাসাগর-ভক্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর হেন সুহৃদের জন্য কেবল এই পর্যন্তই কি যথেষ্ট? দুঃখ এই যে, কলিকাতার বিরাট সভায় বহুলোকের অশ্রুজলে কেবল আট-দশ হাজার টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যিনি দশ-বার লক্ষ টাকা দরিদ্র সেবায় ও সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, যিনি সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্য-চর্চায় ও লোকসেবায় জীবনদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূজার মূল নৈবেদ্যের মূল্য দশ হাজার টাকা মাত্র !!

ফ্রান্সের অকৃত্রিম সুহৃৎ ক্ষুদ্রকলেবর কর্সিকানু নেপোলিয়ানু যখন স্বজন ও স্বজাতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেণ্টহেলেনার নিভৃত নিবাসে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন বিনা আড়ম্বরে নীরবে বোনাপার্টের দেহ কবরস্থ করা হইয়াছিল, তখন ফরাসী জাতি জাতীয় ঋণভার বুঝিতে পারে নাই, জাতীয়

কর্তব্য বুদ্ধির তীব্র তিরস্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু; তাহার পরলোক প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে যখন তদীয় মৃতদেহটিকে, সমুদ্র-বেষ্টিত সেণ্টহেলেনার লোকশূন্য কারানিবাস হইতে দেবদেহের ন্যায় পবিত্র বস্তু জ্ঞানে উদ্ধার করিয়া ফরাসি রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ফ্রান্সের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশই এক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, এক শব্দে শব্দিত, এক ভাবে উন্মাদিত এবং একদেহবৎ উত্থিত হইয়া পিতৃশোকাতুর পুত্রের ন্যায় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়াছিল এবং কিবা প্রাসাদে কিবা কুটীরে কিবা ধর্মাধিকরণে কিংবা প্রমোদ-গৃহে যে যেখানে ছিল, সেই সেখান হইতে পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া বাহির হইয়া লোকারণ্যের শোভা বাড়াইয়াছিল। তখন ফ্রান্সে গ্রাম ও নগর অরণ্য ও জনপদ এক হইয়া গিয়াছিল এবং সেই একীভূত, অদৃষ্টচর, অভূতপূর্ব উন্মাদময় লোকারণ্যেরউন্মাদিনী শোভা দেখিয়া সমগ্র ইউরোপ বিস্মিতহৃদয়ে ও ভীত-ভীত ভাবে মাথা নোয়াইয়াছিল।' (৪) পরাধীন ভারতে বিদ্যাসাগর-বিয়োগে জাতীয় শোকোচ্ছ্বাসেব তরঙ্গে তরঙ্গে বীরপূজার পুষ্পরাশি নৃত্য করিয়াছেঃ 'ইহা দেখিয়া আমার মনে গভীর আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এতদিনে জাতীয় সঞ্জীবন কার্য আরব্ধ হইয়াছে।...যাঁহার জন্য আজ সকলে কাঁদিতেছে, তিনি যে মহাপুরুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যিনি এত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাব হৃদয় যে বিশাল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাগর না হইলে কে আব স্রোতস্বিনী সকলকে নিজাভিমুখিনী করিতে পারে?' (৫) কিন্তু দুঃখ এই যে, স্রোতস্বিনী সকল সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়া পথিমধ্যে সামাজিক জটিলতার উওপ্ত মরুক্ষেত্রে অদৃশ্য হইল। আমরা জীয়ন্তে মরা হইয়া রহিলাম! কি এক দারুণ অবসাদবিষে আমাদের সর্বাবয়ব অবসন্ন হইয়াছে যে, আমরা সহজে উঠিতে, উঠিলে, দাঁড়াইতে, দাঁড়াইলে, ছুটিতে, ছুটিলে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই কত দেশে কত জাত উঠিতেছে দেখিয়াও আমাদের চেতনা হয় না, আমরা অবসাদ-শয্যায় অবসন্ন ভাবে শায়িত হইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শত প্রকার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছি, এবং বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণতার প্রলাপ বকিতেছি।

বিধাতা আশীর্বাদ করুন, এই ঘোর অমানিশার ঘন অন্ধকারে 'সাগর-চরিত' পাঠে বাঙ্গালী পাঠক-হৃদয়ে যেন জাতীয় জীবনের লালসা, নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যসাধনে অধ্যবসায় এবং বীরোচিত গুণাবলীর অনুকরণে প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। তাহা হইলে এ জাতি ধন্য হইবে, জাতীয় 'ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা আবার নূতন করিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে সক্ষম হইব।

---

৪ শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি. আই. ই. প্রণীত, নিভৃতচিন্তা, ১৪৪পৃষ্ঠা।

৫ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ. লিখিত বীরপূজা।

ঘটে নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পিতৃহীন হইয়াছে মনে করিয়া পাদুকাত্যাগ করিল, সংবাদপত্র সকল বিষাদের চিহ্ন ধারণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইল; চারিদিক ভীষণ হাহাকার ও ক্রন্দনে পূর্ণ হইয়া গেল। বাঙ্গালার সমাজ-দেহের প্রাণবায়ু যে নিঃশেষ হয় নাই, বাঙ্গালী যে সুহৃৎ-শোকে সমবেত হইয়া সত্য সত্যই কাঁদিতে পারে, বাঙ্গালী যে বীরপূজায় আত্মবলী দিতে এখনও সক্ষম, তাহার আভাস বিদ্যাসাগরবিয়োগে প্রকাশ পাইয়াছে। বিধাতা কৃপা করুন, এই সুহৃৎ-শোক হইতে, বীরপূজা হইতে জাতীয় জীবনের শুভ সূচনার সূত্রপাত হউক। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের পত্রে পত্রে বীরচরিত লিখিত হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণে ভারতসংসারে যে জাতীয় শোক, ক্ষোভও মনস্তাপের অভিনয় দেখা গিয়াছিল, কোনো সদুপায়ে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিলে, জাতীয় জীবনের গঠন ও সমুন্নয়ন করিবার পক্ষে সে শক্তি পরমৌষধির কার্য করিত,তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর শক্তির সম্মিলিত স্ফুরণে জাতীয় অভিনয় প্রদর্শনে এখনও বহু বিলম্ব আছে, তাই বিদ্যাসাগর-বিয়োগে ভারতের নানাস্থানে সভাসমিতির আহ্বান ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের স্বতন্ত্র আয়োজন হইয়াছে। কলিকাতার গৃহে গৃহে ও বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বঙ্গের নানা স্থানে নানা আকারে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করা হইয়াছে। ঢাকার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সমগ্র-শহরবাসীর উৎসাহ ও আগ্রহে এক মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সভাপতিরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবিধ গুণের কীর্তন করিয়াছিলেন। সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ঢাকা কালেজে বিদ্যাসাগর-স্কলারসিপ নামে মাসিক দশ টাকার একটি বৃত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বর্ধমানে সাধারণের উদ্যোগে এবং বিদ্যাসাগর-ভক্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর হেন সুহৃদের জন্য কেবল এই পর্যন্তই কি যথেষ্ট? দুঃখ এই যে, কলিকাতার বিরাট সভায় বহুলোকের অশ্রুজলে কেবল আট-দশ হাজার টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যিনি দশ-বার লক্ষ টাকা দরিদ্র সেবায় ও সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, যিনি সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্য-চর্চায় ও লোকসেবায় জীবনদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূজার মূল নৈবেদ্যের মূল্য দশ হাজার টাকা মাত্র !!

ফ্রান্সের অকৃত্রিম সুহৃৎ ক্ষুদ্রকলেবর কর্সিকানু নেপোলিয়ানু যখন স্বজন ও স্বজাতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেণ্টহেলেনার নিভৃত নিবাসে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন বিনা আড়ম্বরে নীরবে বোনাপার্টের দেহ কবরস্থ করা হইয়াছিল, তখন ফরাসী জাতি জাতীয় ঋণভার বুঝিতে পারে নাই, জাতীয়

কর্তব্য বুদ্ধির তীব্র তিরস্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু; তাহার পরলোক প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে যখন তদীয় মৃতদেহটিকে, সমুদ্র-বেষ্টিত সেণ্টহেলেনার লোকশূন্য কারানিবাস হইতে দেবদেহের ন্যায় পবিত্র বস্তু জ্ঞানে উদ্ধার করিয়া ফরাসি রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ফ্রান্সের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশই এক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, এক শব্দে শব্দিত, এক ভাবে উন্মাদিত এবং একদেহবৎ উত্থিত হইয়া পিতৃশোকাতুর পুত্রের ন্যায় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়াছিল এবং কিবা প্রাসাদে কিবা কুটীরে কিবা ধর্মাধিকরণে কিংবা প্রমোদ-গৃহে যে যেখানে ছিল, সেই সেখান হইতে পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া বাহির হইয়া লোকারণ্যের শোভা বাড়াইয়াছিল। তখন ফ্রান্সে গ্রাম ও নগর অরণ্য ও জনপদ এক হইয়া গিয়াছিল এবং সেই একীভূত, অদৃষ্টচর, অভূতপূর্ব উন্মাদময় লোকারণ্যের উন্মাদিনী শোভা দেখিয়া সমগ্র ইউরোপ বিস্মিতহৃদয়ে ও ভীত-ভীত ভাবে মাথা নোয়াইয়াছিল।' (৪) পরাধীন ভারতে বিদ্যাসাগর-বিয়োগে জাতীয় শোকোচ্ছ্বাসের তরঙ্গে তরঙ্গে বীরপূজার পুষ্পরাশি নৃত্য করিয়াছে: 'ইহা দেখিয়া আমার মনে গভীর আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এতদিনে জাতীয় সঞ্জীবন কার্য আরব্ধ হইয়াছে।...যাঁহার জন্য আজ সকলে কাঁদিতেছে, তিনি যে মহাপুরুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যিনি এত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে বিশাল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাগর না হইলে কে আর স্রোতস্বিনী সকলকে নিজাভিমুখিনী করিতে পারে?' (৫) কিন্তু দুঃখ এই যে, স্রোতস্বিনী সকল সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়া পথিমধ্যে সামাজিক জটিলতার উত্তপ্ত মরুক্ষেত্রে অদৃশ্য হইল। আমরা জীয়ন্তে মরা হইয়া রহিলাম! কি এক দারুণ অবসাদবিষে আমাদের সর্বাবয়ব অবসন্ন হইয়াছে যে, আমরা সহজে উঠিতে, উঠিলে, দাঁড়াইতে, দাঁড়াইলে, ছুটিতে, ছুটিলে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই কত দেশে কত জাত উঠিতেছে দেখিয়াও আমাদের চেতনা হয় না, আমরা অবসাদ-শয্যায় অবসন্ন ভাবে শায়িত হইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শত প্রকার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছি, এবং বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণতার প্রলাপ বকিতেছি।

বিধাতা আশীর্বাদ করুন, এই ঘোর অমানিশার ঘন অন্ধকারে 'সাগর-চরিত' পাঠে বাঙ্গালী পাঠক-হৃদয়ে যেন জাতীয় জীবনের লালসা, নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যসাধনে অধ্যবসায় এবং বীরোচিত গুণাবলীর অনুকরণে প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। তাহা হইলে এ জাতি ধন্য হইবে, জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা আবার নূতন করিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে সক্ষম হইব।

---

৪ শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি. আই. ই. প্রণীত, নিভৃতচিন্তা, ১৪৪পৃষ্ঠা।

৫ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ. লিখিত বীরপূজা।

# উপসংহার

পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন জাতির উত্থান পতনের স্থায়ী প্রতিধ্বনি মাত্র। এই জাতীয় উত্থান পতনের মধ্যে যাঁহারা ইহার উন্নতি সাধনে অথবা ইহার অধঃপতনে সহায়তা করেন, তাঁহারা লোকসমাজে অনন্তকাল ধরিয়া নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার বা তিরস্কারের ভাজন হইয়া থাকেন। কিন্তু দেহের শোণিতপাতে, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের বিন্দু বিন্দু দানে এবং জীবনের মহামূল্য সময় ক্ষয়ে যাঁহারা জাতীয় জীবনের গঠন ও সমুন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা বিভিন্ন রুচি বিভিন্ন ভাব ওবিভিন্ন প্রবৃত্তির লোকপূর্ণ এই বসুন্ধরার সমক্ষে চিরদিন পরম পূজনীয় দেবচরিত্রের লোক বলিয়া অভিহিত, আদর্শ মানব বলিয়া সমাদৃত। তাঁহারাই জনসমাজের উন্নতিপথে পরম সহায় বলিয়া পরিগণিত ও পূজা প্রাপ্ত হন। এতাদৃশ পূজার যোগ্য মানব সন্তানের আবির্ভাবে পৃথিবীর সকল জাতিই অল্পাধিক গৌরবান্বিত, কিন্তু বর্তমান সময়ের বলবান্ ও সৌভাগ্যগর্ব-স্ফীত জাতি সমূহের উপেক্ষার পাত্র ভারত-সন্তানই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্। সত্য, ওয়াসিংটনের নামে আমেরিকাবাসিগণের প্রাণে কি এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক আলোকের রেখাপাত হয়, কমনীয়তার কোমল ক্রোড়ে প্রস্ফুটিত ভাবনিচয়ের আধার ইমার্সনের নামে প্রকৃতিচর্চাপ্রিয় মানবমাত্রেই চিরমুগ্ধ, থিয়োডোর পার্কারের বিশ্ববিজয়ী পুরুষকারের স্মরণে মানব অবনতমস্তক, সাময়িক ত্রুটি, দুর্বলতা ভুলিয়া ফ্রান্সবাসিগণ নব্য ইউরোপের জন্মদাতা নেপোলিয়নের নামে উন্মত্ত, বর্তমান প্রত্যক্ষবাদিগণের পথপ্রদর্শক মহাত্মা কোম্‌ত ও বেন্‌থাম্-শিষ্যপ্রবর মহামতিমিল মানবসমাজেরচিরসুহৃদরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন। ধর্মসংস্কারক মহাত্মা লুথার আবর্জনা রাশির মধ্য হইতে খৃষ্টধর্মকে উত্তোলন করিয়া নবজীবনের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়া পাশ্চাত্য সমাজের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ সকলই সত্য, কিন্তু তবুও বলি, ভারত সন্তানের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাই বিদেশীয় মহাত্মাদের দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকটতর আত্মীয় স্থলে উপস্থিত হওয়া যাউক। স্মরণাতীতকালে যাহারা অভ্যুদিত হইয়া আমাদের প্রিয় বাসভূমি ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বিষয় ধারাবাহিকরূপে অল্প কথায়ও উল্লেখ করা অসম্ভব। তথাপি একথা বলা নিতান্ত আবশ্যক যে, যাহাদের জাতীয় জীবনের

পথে পূর্ব ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, ত্রেতার আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-মাধুরী অলক্ষিতভাবে আপনা আপনি অন্তরে উদিত হয় এবং রামায়ণোক্ত চরিত-কাহিনী নীরবে নিশার শিশিরপাতের ন্যায় জাতীয় জীবনের সংগঠন সাধন করে, সে জাতির সৌভাগ্যের সীমা নাই। দ্বাপরের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে শরশয্যায় শায়িত মহানুভব দেবব্রতের ব্রতোদ্‌যাপন ও উপদেশ দান যে দেশের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছে, যাহাদের রাজনীতি ও সমাজনীতি ও ধর্মনীতির পরিস্ফুটনে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষ আদর্শরূপে দণ্ডায়মান, সেই দেশবাসী নরনারীমণ্ডলীর শিখিবার ও শিখাইবার, শুনিবার ও শুনাইবার অনেক অমূল্য রত্ন আপনাদের পর্ণকুটীরের আবর্জনারাশির মধ্যে লুক্কায়িত; এই জন্যই তাহা কোনো কোনো স্থানে উপেক্ষিত কোথাও বা পরিত্যক্ত আরপ্রায় সর্বত্রই অনাদৃত। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞমণ্ডলীর অনেকের মুখেই শুনিতে পাই, রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তির ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জন্ম না হইয়া ভারতে কেন জন্ম হইল? ইহার সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর এই যে, যে দেশ শাক্যসিংহের জন্ম-ভূমি বলিয়া চিহ্নিত, যে দেশে শঙ্করাচার্যের বিশাল প্রতিভা ও পরাক্রমের উৎস উৎসারিত, যে দেশ শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনে টলমল করিয়াছে, রামমোহনের অভ্যুদয় ও ঈশ্বরচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র সে দেশ না হইয়া অন্য দেশ কেন হইবে? ভারতবর্ষের বিশেষত্বের বলে, বঙ্গভূমির বহু পুণ্যেই রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর সাধু, সজ্জন, ঋষি ও তপস্বীর তপস্যার ফলে রত্নসম পুত্রধন লাভে আমাদের জন্মভূমির অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

পূর্বতন মনস্বী আর্য ঋষিগণের প্রবর্তিত কালবিভাগ অনুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বহু-সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস.; সি. আই. ই. মহোদয় এই চারি যুগের সঙ্গে সঙ্গে, এক নূতন ঐতিহাসিক কালবিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ঐতিহাসিক কাল ছয় যুগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা: প্রথম—বৈদিক যুগ। দ্বিতীয়—মহাকাব্য যুগ। তৃতীয় দার্শনিক যুগ। চতুর্থ—বৌদ্ধ যুগ। পঞ্চম—পৌরাণিক যুগ। ষষ্ঠ—রামমোহন রায় যুগ। ইহার প্রত্যেকটিই সুবিবেচনার সহিত নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্তটি আরও সমধিক সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। রামমোহন বর্তমান যুগের জন্মদাতা। যাঁহারা চিন্তাশীলতাসহকারে বিষয় সকলের সারসংগ্রহে রত, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যতপ্রকার চিন্তাস্রোতে আজ বঙ্গসমাজ প্লাবিত হইতেছে, তাহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মমূল ধারা সকল রামমোহনের সুদৃঢ় ও সমুন্নত হৃদয় কন্দন হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শাস্ত্র-চর্চা ও ধর্মালোচনা

হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও অন্নহীন কৃষক ও শ্রমজীবিগণের অবস্থার উন্নতি সাধনাদি প্রত্যেক বিষয়ের সহিত তাঁহার সমান সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি সকল বিষয়েরই যুগান্তরের প্রবর্তক।

মহাত্মা রামমোহন রায় যে যুগের প্রবর্তক, পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই যুগের দ্বিতীয় মহাপুরুষ। মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগান্তে মেট্রপলিটন কালেজ কর্তৃক আহূত সভায় সভাপতিরূপে বলিয়াছেন: 'বর্তমান কালের সমগ্র অবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় সে মৃত মহাত্মা রামমোহন রায় ভিন্ন তুলনায় অপর কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। (১)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র পৃথিবীর লোকমণ্ডলীর জাতীয় উন্নতি ও ঐশ্বর্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় শুনি, ভগীরথ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গা আনিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া সূর্যবংশের সদ্গতি সাধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মানবকুলেব সদ্গতি সাধনের জন্য বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকালে যে সকল মহাপুরুষ তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সাধনের বলে মনুজসন্তানের সুখ-সৌভাগ্যের তমসাচ্ছন্ন পূর্বাকাশে সম্পদ-সূর্যের ভাবী অভ্যুদয়েব আভাস প্রাপ্ত হইয়া সে সময়েব জ্ঞানিগণ পুলকে পূর্ণ হইয়াছিলেন। সে সময়ে, আমেরিকায় মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন্ ও পুরুষপ্রবর ওয়াসিংটনের পুরুষকারের বলে পরাধীনতার দৃঢ় নিগড় ভগ্ন হওয়ায়, জাতীয় জীবনের স্রোত কেবলমাত্র প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সময়ে পার্কার ও গ্যারিসন হতভাগ্য কাফ্রি ক্রীতদাসদিগের দুঃখ দূরীকরণ মানসে স্বার্থপর লোকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সমর ঘোষণার সূত্রপাত করিতেছিলেন, সে সময়ে ইংলণ্ডে বার্ক, ফক্স প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদগণ প্রবলের অনুষ্ঠিত বিবিধ অত্যাচার নিবারণে প্রাণপাত করিয়াছিলেন, যে সময়ে উইলারফোর্স প্রভৃতি সহৃদয় মহাত্মাগণ দুর্বলের পক্ষ সমর্থনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সময়ে বিরাট পুরুষ নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যচক্র নির্দেশ করিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উত্তোলন করিয়া ধরাকে নীরব করিতে চাহিয়াছিলেন, যে সময়ে কত শত সহৃদয় মহাত্মাগণ, পৃথিবীর নানা স্থানে অসহায় মানবসন্তানগণের দুঃখহরণ ও সুখসাধনে জীবন পণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ভারতবক্ষে আড়ম্বরের কোলাহল, তামসিক রঙ্গরস, ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত বিবিধ দুর্নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে উদয়াচল শিখরে নবযুগের সমাসমসঙ্গীত শ্রুত হইয়াছিল। বিধাতার বিধানে রাজর্ষি রামমোহন, সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া ভারতের পূর্ব প্রান্তে

১ He was second to none except one—The Great Rammohan Roy.

অভ্যুদিত হন। তিনি প্রাণপাত করিয়া যে সকল সদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন, তিনি অকালে লোকান্তরিত হওয়ায় সেই সকল শুভানুষ্ঠান অসম্পূর্ণ ছিল, কয়েকটি বীরপ্রকৃতি বঙ্গ সন্তান আরব্ধ ব্রতের উদ্‌যাপন গ্রহণ করেন।

যে সময়ে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি স্বদেশের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যে সময়ে স্যাফটস্‌বারি, ব্রাইট কব্‌ডেনপ্রভৃতি মহাত্মাগণ ইংলণ্ডে লোকহিতৈষণাব্রতে নিযুক্ত, সে সময়ে কুমারী কার্পেণ্টার ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকাদিগের দুর্দশা দর্শনে কাতর হইয়া লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সুকঠিন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সফলকাম হইয়া বালক-বালিকাদিগেব জন্য সংশোধন বিদ্যালয়বিধি Reformatory School Act বিধিবদ্ধ করাইতেছিলেন, যখন কুমারী কব্‌ ও কুমারী নাইটইঙ্গেল নারীহিত সাধনে কুমারীব্রতগ্রহণে প্রস্তুত হইতেছিলেন, যখন রুশ সম্রাট্‌ আলেক্‌জাণ্ডার সিংহাসনারোহণে সুখের বিনিময়ে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মানবসন্তানকে দাসত্বশৃংখল হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, যে সময়ে মানবদেবতা লীন্‌কল্‌ন নিজ জীবনের বিনিময়ে দাসদিগের স্বাধীনতার সনন্দপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শতপ্রকার সামাজিক নিপীড়ন নিগ্রহগ্রস্ত হইয়া বঙ্গবীর ঈশ্বরচন্দ্র ভারতীয় রমণীকুলের সুখসাধনে জীবনপণ করিয়া সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এক্ষণে যে গুণে, যে বীর্য ও বীরত্বের বলে, যে সাহস ও পুরুষকারের পরিচয়ে তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম এক ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব।

সম্পন্ন লোকের উপবন ও লতা-মণ্ডপে ভৃত্যের জল-সেচন ও পরিচর্যায় প্রস্ফুটিত শোভনদৃশ্য মার্সাল নীল (২) স্যার ওয়াল্‌টার স্কট (২), কিংবা ভিক্‌টোরিয়া রোজের (২) ন্যায় তিনি বহু সমাদরে লালিত-পালিত হন নাই। অবত্নসম্ভূত বনকুসুমযেমন আপনি উঠে,আপনি ফুটে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদ্রূপ বীরসিংহের গ্রাম্য-গৃহে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণকরিয়া আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। দরিদ্র পিতা ঠাকুরদাস কিরূপ ক্লেশে তাঁহাকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, সে দুঃখকাহিনী শ্রবণে অশ্রু সংবরণ অসম্ভব। অপরিচিত দরিদ্র বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিয়া, সুখসম্ভোগ ও মানসম্ভ্রমেব অধিকারী হইয়া প্রায়ই "ধরাকে শরা জ্ঞান" করে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এরূপ অঘটন কখনও ঘটে নাই। তিনি বহুবিদ্যার আধার হইয়া, প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, প্রচুর ধন, সম্পদ ও সম্মানের অধীশ্বর হইয়া, একদিন এক মুহূর্তের জন্যওবিস্মৃত হন নাই যে, তিনি বীরসিংহবাসী দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। পর্ণকুটীরে শৈশব কাল কাটাইয়াছিলেন, এটি সর্বদাই

২ এগুলির প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট গোলাপ পুষ্প।

গৌরবভরে স্মরণ করিতেন। একাহার ও অনাহারে ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল এ কথার উল্লেখে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার সময়ে তাঁহার অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই ছিলেন।

আমরা আজ যে বাংলা ভাষা পাঠ করি এবং যাহার অল্পাধিক আলোচনায় তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি, ইহার জন্য আমরা তাঁহারই নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। তিনি এবং তাঁহার সহযোগী ৺অক্ষয়কুমার দত্ত বর্তমান বাঙ্গালা-ভাষার সৃষ্টিকর্তা। উভয়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ পরিচর্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য বঞ্চিত হইলে, ইহার এরূপ ত্বরিতপদে উন্নতি-পথে অগ্রসর হওয়া বহু বিলম্বসাধ্য হইয়া পড়িত। সাহিত্য সেবাতেও তাহার কার্যগত মৌলিকতার প্রচুর প্রমান আছে। একদিন কয়েকঘণ্টার পরিশ্রমের ফলে উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছিল। উপক্রমণিকায় তাঁহার বিশেষত্বের বিশিষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। বেতাল, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস যে লেখনীর গৌরব সাধন করিয়াছে সেই লেখনীর বিশেষত্ব এই যে, তাহাই সুকুমারমতি শিশুগণের পাঠোপযোগী সরল গ্রন্থ সকলের জনয়িত্রী। আবার সেই লেখনী হইতেই বর্ণমালা ও সহজ শব্দবিন্যাসের পরিচয়স্থল বর্ণপরিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাও আবার বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে পথে পাল্‌কীতে যাইতে যাইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিরচিত হইয়াছিল। কোমলকাঠিন্যের সমাবেশই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যবিষয়ক বিশেষত্বের পরিচয়স্থল।

তিনি বাল্যকাল হইতে পরসেবায় রত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে যখন সম্ভ্রমের উচ্চশিখরে উপবিষ্ট, তখন হইতেই তিনি গুনবানের গুণের আদর এবং দুঃখীজনের দুঃখহরণ ও সুখসাধন করিতে সদা ব্যস্ত; তাঁহার সে সময়ের সর্ব্বোচ্চ অধিকার মানবসেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। এইরূপ প্রেমপূর্ণ সেবার ভার লইয়া তিনি জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের সূত্রপাত করেন। যে ভুবনবিজয়ী কার্যকলাপের ভারে সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার সমক্ষে নতমস্তক, সে সমাজসংস্কার ব্যাপারে তিনি সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বের পূর্ণপরিচয় দানে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহারও ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি তদীয় কিশোর বয়স্ক ছাত্রজীবনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বালিকা আত্মীয়াদিগের বৈধব্য ও তন্নিবন্ধন বিবিধ দুঃখ-কষ্টের চিত্র দর্শনে ক্রমে নারীসুহৃদরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্তণ্ড যখন চারিদিক দগ্ধ করিত, বালিকা বিধবা আত্মীয়াগণের শুষ্ককণ্ঠে ভূমিশয্যায় ইতস্ততঃ অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কখন সুযোগ হয়, তবে কোমলপ্রাণা রমণীকুলের এ দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের চেষ্টা করিব।'

তাঁহার অধ্যাপক বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের বালিকা স্ত্রীকে দেখিয়া তিনি

দারুণ মনস্তাপে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। যিনি একটিমাত্র বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, সে সময়ের ঐ প্রকার শত শত অনুষ্ঠান যে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহায়া অবলাগণের পরম বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মতো হৃদয়বান্ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্মান পক্ষে এই ঘটনা এবং এইরূপ অসংখ্য ঘটনা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

দরিদ্রের গৃহে নানাপ্রকার অভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হওয়া এবং চিরদিন দীনজনের সুহৃদরূপে জীবন যাপন করিয়া যাওয়া পুরুষশক্তিবিশিষ্ট মহাত্মা লোকের কার্য। তিনি বিদ্যালয়ে আদর্শ বালকরূপে, কর্মস্থানে নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ, কর্মচারীর আদর্শরূপে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সবল, মার্জিত ও শ্রুতিমধুর গদ্য রচনার পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সুহৃদ্‌সেবায় তাঁহার তুলনা মিলে না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সকল অবস্থাতেই সুহৃদ্‌রূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। বিধবাবিবাহের আন্দোলনে তিনি অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। সে আত্মীয়তার ঋণ তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিতেন এবং বন্ধুর লোকান্তর গমনের পর তদীয় নাবালক পুত্রগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বপ্রকার অসুবিধাই সহ্য করিয়াছেন। সমাজ সংস্কারক্ষেত্রে আজ তাঁহার স্থান অধিকার করিবার কেহই নাই। তিনি যে বীরবেশে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় জীবনের আবর্জনা-রাশি নির্বাচন, উত্তোলন, ও দূরে নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহার সে কার্যকলাপের উপযুক্ত সমাদর আমাদের নিকট হইতেছে না। আমরা সময় ও অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সে মুক্তিশান্ত মুক্তভাব, সে অতিমানব ঔদার্যের সমাদর কিরূপে করিব? তিনিই তাঁহার কার্যকলাপের তুলনাস্থল। তাঁহার অন্য তুলনা মিলে না। সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনে তিনি জনসমাজ সমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপরিমেয়তা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং জটিল সামাজিক প্রশ্ন-বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার রণনৈপুণ্য কিরূপ বিচিত্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়স্থল, তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল হইয়া থাকিবে এবং কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিতমাধুরী আরও সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে।

মানব-প্রেম তিনি যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সেরূপ স্নেহের রসাঞ্জনে সুরঞ্জিত মধুমিষ্ট দৃষ্টিতে মানুষকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে শিখে। তিনি যে প্রাণ দিয়া পরোপকার সাধন করিতে সত্যসত্যই সক্ষম ছিলেন, তাঁহার পরিণত বয়সের

শতপ্রকার ঘটনা দ্বারা তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, কিন্তু মানব-প্রেমের ধারা কিরূপে সর্বপ্রথম তাঁহার শৈশবনিষ্ঠুরতার দুরতিক্রমণীয় প্রাচীন উল্লঙ্ঘন করিয়া জলপ্রপাতের আকার ধারণ করে এবং প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, আমরা কেবল তাহার গোপন তত্ত্বটুকুর উল্লেখ করিব মাত্র। দ্বাদশবর্ষীয় বালক বিদ্যাসাগর নিজে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বৃত্তির টাকায় পরসেবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে যে বালক এরূপ পরদুঃখকাতর ও প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, আত্মসুখাপেক্ষা যে বালক পরসুখে পরিতৃপ্ত, তিনি যে উত্তরকালে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্পৃহ, পরসুখ-সাধন-প্রিয় ও পরসেবাপরায়ণ মহাপুরুষে পরিণত হইবেন, ইহাই বিধাতার ব্যবস্থা।

পরোপকারে তাঁহার আত্মপর, স্বজাতি ও ভিন্নজাতি, স্বদেশী ও বিদেশী স্ত্রী ও পুরুষ এ সকলের বিচার ছিল না। মানব মাত্রেই তাঁহার প্রেমের পাত্র ছিল। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, বিপন্ন মাদ্রাজী পরিবারসহ মৃত্যুমুখে তাঁহার সহায়তায় প্রাণ পাইয়াছে—ফিরিঙ্গি দরিদ্র পরিবার বহুসন্তান লইয়া তাঁহার সাহায্যে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়াছে- সর্বজন পরিত্যক্ত, মুমূর্ষু স্বৈরিণী তাঁহার সেবায় প্রাণ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে! গৃহস্থের প্রয়োজনে গোবৎস মাতৃদুগ্ধপানে বাধা পাইতেছে দেখিয়া, যে মহাত্মা দীর্ঘকাল দুগ্ধপানে বিরত ছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে কত কোমল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কিনা সন্দেহ! তাই বলি তাঁহার লোকহিতৈষণা ও জীবে দয়ার অন্য তুলনা মিলে না— তিনিই তাহার তুলনা স্থল।

কালস্রোতে প্রবাহিত ভাগীরথী নীর শৈলবক্ষঃ অতিক্রম করিয়া, যেমন দক্ষিণে ও বামে সুখ ও সম্পদ, পুণ্য ও পবিত্রতা বিতরণ করিয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়াছে, শতপ্রকারে প্রতিবেশিপীড়নপ্রিয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তরবৎ শৈশব নিষ্ঠুরতার পাষাণ ভেদ করিয়া লোকসেবার যে মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাও তদ্রূপ সমগ্র দেশের সুখসাধন করিয়া, সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়া কত কোটি লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

## APPENDIX A

No. 1.

Sir,

When I had the honour to wait on you on Saturday last and solicited permission to make a few suggestions regarding the appointment of an Inspector for South Bengal, you were pleased to direct me to submit a written memorandum upon the subject. I have accordingly availed myself of the permission and beg respectfully to suggest that if you should feel inclined to transfer me to that post, the appointment of a successor in the Sanskrit College may be made in consultation with me, as from an intimate personal knowledge of the several parties from whom the selection may be made, I think, I will be best able to recommend the most proper person for the place. If, however, it should be thought inexpedient to place the division under my charge on account of the Government English colleges and schools in it, I would earnestly solicit that at least the districts in which there are model schools, *viz* Hooghly, Midnapur, Burdwan and Nuddea, may be placed under me, the colleges and schools being without inconvenience in charge of the person who may be appointed Inspector of the Division.

I have so often troubled you with the subjects connected with Vernacular Education that I really feel ashamed to intrude any further on your valuable time.

I have the honour to be,<br>
Sir,<br>
Your most obedient servant.<br>
(Sd.) Isvara Chandra Sarma

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

No. 2

Darjeeling, 27th May, 1857.

My Dear Sir,

You will have seen that before the receipt of your letter I had nominated Mr, Lodge to the vacant Inspectorship.

It was first offered to Lieut. Lees who is in Europe, but he has refused it. I shall hope soon to see you, as I am on my way to Calcutta, and it will give me much pleasure to talk to you again on the subjects which interest us both.

Yours sincerely,

(Sd.) Fred, Jas Halliday,

To—Pundit Isvara Chandra Sarma, Calcutta.

No. 3,

Calcutta.

Sanskrit College, 20th August 1857.

My Dear Sir,

As you are about to leave town for 3 months, I consider this a fitting occasion toyouintimate toyou you that I have made up my minb to retire from the public service in a short time. The reasons, which have induced me to come to this determination, are more of a private than of a public nature, and I therefore refrain from mentioning them.

The new arrangements for the Sanskrit College have not yet been fully developed and as I am desirous of completing them which will occupy two or three months more, I wish to continue in my present office until the end of December next, when I shall tender my resignation in due form.

My object in addressing you now is that you may have ample time to consider the arrangements that you may deem most desirable for supplying my place in the Education Department.

I remain, Yours truly,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—W. Gordon Young, Esq. Director of Public Instruction.

No. 4,

Calcutta, Sanskrit College,

31st August, 1857.

My Dear Sir,

Some time ago while talking upon the subject of Education, you were pleased to ask me for a memo on the state of Vernacular Education in Bengal, under the present system of management and I agreed at the time, though with reluctance, to submit it. On subsequent consideration however I feel task a very delicate one inasmuch as the required memo cannot but reflect on the action of my brother officers and others. I therefore earnestly beg to be pardoned for not submitting the memo as I had promised.

I may here be permitted to state that I have made up my mind to retire from the Public Service from January next and that I have intimated my intention to Mr Young in a demi-official note of which I venture to enclose a copy for your information also.

I remain, my dear Sir,
With every sentiment of respect and esteem,
Yours most faithfully,
(Sd.) Isvara Chandra Sarma,

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

No. 5,

31st August, 18.7,

My Dear Pundit,

I am really *uery sorry* to hear of your intention.

Come and see me on Thrusday and tell me why it is that you have come to this determination.

Yours sincerely,

(Sd.) Fred. Jas, Halliday.

To—Pundit Isvara Chandra Sarma.

No. 6.

To W. Gordon Young, Esq.,

Director of Public Instruction,

Sir,

The unceasing mental exertion required by the discharge of my public duties has now so seriously affected my general health, as to compel me to tender my resignation to the Hon'ble the Lieutenant Governor of Bengal.

2. I feel that I can no longer devote the assiduous attention to my duties which their due performance necessitates. I need repose, and in justice to the public interests, as well as to my own comforts and happiness, can only secure that repose by retiring into private life.

3. The moment my health is restored, it is my intention to devote my time and attention to the composition and compilation of useful works in the Vernecular language of Bengal, Thus, although my direct official connection with the education and enlightenment of my countrymen will have ceased, I venture humbly to hope that my remaining years will still be devoted to the advancement of great and sacred cause in which my deep and earnest interest can only close with my life,

4. Among the minor causes that have led to my taking so serious a step are the absence of all further prospects of abvancement and the want of that immediate personal sympathy with the present system of Education, which every conscientious servant of the Department should possess.

5. With regard to the former I can occupy my time more profitably and with infinitely less strain upon mind and body than in my persent position. It would be idle to deny that such considerations must have weight with one who has not yet been able to make any permanent provision for his family and who fears that failing health will prevent his doing so, if

he delays longer the severance of his connection with the arduous and onerous duties that belong to the offices he holds.

6. With respect to the other, I feel that I have no right to obtrude my views and opinions upon the Government ; yet I could not conceal from those I serve, the fact that my heart is not in my work, and that thereby my efficiency is, and must be, impaired. More I am unwilling to say, lest I could not express, with the maintenance of the honesty of purpose which I deem to be an essential quality of a conscientious public servant.

7. I retire with the conscious gratification that I have always laboured earnestly to discharge my duties to the best of my humble ability and trust that I shall not be deemed presumptuous in tendering my most sincere and heartfelt acknowledgements for the unvarying kindness, indulgence and consideration, which I have always experienced at the hands of the Government

I have the honour to be,

The Sanskrit College,
Sir,
5th August, 1858.
Your most obedient servant,
(Sd ) Isvara Chandra Sarma.

No. 7.

My Dear Sir,

Is it the case that you desire to make some alteration in your letter dated 5th of last month. If so, perhaps you had better looked here some day soon and you can either do as you wish in that way or take back the letter and send another corrected) in its place. But whatever is done should be done on an early day. I shall be here on Saturday and again on Tuesday.

As I understood from you on Saturday that you did not wish to press *your* application for leave, I have not sent it on to Government.

Yours very truly

9th September. 1858
(Sd) W. Gordon Young.

No. 8

My Dear Sir,

After mature deliberation I find that I cannot either with consistency or propriety omit the parts of my letter which appear objectionable to you, It is true that ill-health is one of the principal causes which have iuduced me to resign. But I cannot conscientiously say that is the *sole* cause If it were so, I could have applied for a long leave and renovated my health. I had often represented to you, that I frequently felt it disagreeable and inconvenient to serve Government under existing circumstances and that I considerd the present system upon which the Department of Vernacular Education was conducted, was a mere waste of money You are aware that I often met with discouragement in my way. I saw besides no prospects of advancement and more than once I felt my just claims passed over. Thus I hope you will be pleased to admit that I had reasonable grounds of complaint: but I would nevertheless have continued in my present post for sometime longer. If I were not forced to take the step I have taken by prolonged ill-health, which has made me unfit for my responsible duties, and when the above considerations had such a considerable shares in the decision to which I have come, their omission in my letter would certainly have made me liable to the charge of disingenuousness For the same reasons, I feel it very difficult to alter it now.

Further contents of my letter. since it left my hands, have become known to a great many people and there is as much chance of the fact of the alteration becoming equally known, in which case I shall not only be lowered in the estimation of my friends but of the public generally...

Nothing can exceed the deep regret which I have felt since I have heard from you that the passage in question may possibly put you to some inconvenience; but words cannot

express my feelings of distres when I think that unwillingly I should have given you the least cause for trouble and inconvenience. I should certainly have felt it a great relief if circumstances had permitted me to retract with any degree of consistency; but I humbly hope that you will be pleased to admit after a due consideration of circumstances I have explained at length. in what an awkward position I have been placed and how dalicate and difficult it is for me now to make any alteration in my letter.

with much deference and respect and with my apologies for toubling you in a matter so purely personal to myself.

I remain,

15th September, 1858. Yours most faithfully,

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

No-9

Dear Sir. 15th September 1858.

I have received your letter of this day's date. You are mistaken in supposing that the restoration of the paragraph to which you allude, in your letter of resignation is likely to put me to any inconvenience. To me it is indifferent whether the paragraph be retained or not.

I mentioned that I thought it possible you might be asked to explain the cause of your dissatisfaction with the administration of the department and as you expressed an insuperable objection to do this in a public form, I suggested that it might be better to omit what you were unwilling to account for and merely allude to your illness which though not *sole* was certainly a sufficient reason for resignation.

You ask me to admit that you have had reasonable grounds of complaint. I am quite unable to admit this as to what is now assigned as your grievance—namely (1) that you thought the present system of Vernacular Education a waste of money, (2) that you often met with discouragement,

and (3) that your just claims to promotion have been passed over.

It will be sufficient to say that I quite differ with you as to the last point and as to the second can see nothing in which you have ever been discouraged by me but the contrary, as to the first point it is a mere matter of opinion and moreover cannot relate to the special system of Vernacular Education with which only you had to do.

I remain. Dear Sir
Yours faithfully,
(Sd) Fred Jas. Halliday

To—Pundit Isvara Chandra Sarma.

No. 10

Monday, 20th Sept. 18ᵏ8

My Dear Sir,

After a mature deliberation I find that I cannot consistently make any alteration in my letter of resignation.

Hoping to be excused for the delay in replying to your note.

I remain, Yours truly
(Sd) Isvara Chandra Sarma.

To—W. Gordon Young Esq.
Director, Public Instruction.

No. 11

My Dear Sir,

I am very glad to learn from your note that the retention. of the para, in my letter of resignation therein allude to, will, in no way, put you to any inconvenience. As far As I can remember I was led to believe from the tenor of our conversation of the other day that the para, might occasion such inconvenience, and were it not for that idea, I would never have allude to it, in my letter of the 16th instant, I feel now, a great weight removed from my mind.

There is only one point upon which I would wish to say a few words, I regret I did not sufficiently explain it in my last. I never for a moment meant to say that I wits ever discouraged by you. On the contrary, I am fully sensible of

the encouragement which I often received from you, and I think I have given vent to my feelings on this point at the conclusion of my letter of resignation. In referring to the discouragement I met with, I meant to say, that obstruction, I often met with in my way, to remove which I was frequently obliged to trouble you. You were always pleased to lend an attentive ear to my representations and very often those obstacles were removed by your kind interference. I always felt it very disagreeable to my feelings thus frequently to trouble you. But it was merely from absolute necessity that I did so.

I would not again have troubled you, if I did not think it my duty to offer an explanation upon so delicate a point concerning myself.

I remain,

18th Sept, 1858 With great respect and esteem

Yours most faithfully,

(Sd) Isvara Chandra Sarma.

To—The Hon'ble F. J. Halliday.

No 12.

Extract from a letter No. 1566, dated 25th September 1858, from the Junior Secretary to the Government of Bengal, to the Director of Public Instruction.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 2095, dated the 18th ultimo, with its enclosure, and in reply to state that the Lieutenant Governor is pleased upon your recommendation to accept the resignation tendered by Pundit Isvara Chandra Sarma, Principal of the Sanskrit College and Special Inspector of Schools. It is to be regretted that the Pundit should have thought fit to make his retirement somewhat ungraciously, especially as he can heve no fair reason for dissatisfaction. You will, however, be good enough to inform him, that he carries with him the acknow-

ledgements of the Government for his long and zealous service in the cause of Native Education.

( True Extract. )

( Sd ) W. Gordon Young

Director of Public Instruction.

To—Pundit Isvara Chandra Sarma

Principal, Sanskrit College.

No. 13

My Dear Sir,

I received your letter No. 2461 yesterday noon communicating the acceptance of my resignation ··

I am already in a very disagreeable position for not having yet been able to pay the Pundits of the Female School, and I am afraid that I will be more so, as soon as I leave my post. And though it is very desirable in consideration of the present state of my health, that I should cease from work as soon as possible, yet I would wish, in the above account, to defer making over charges if you see no particular objection, till the decision of Government on my application for the payment of the bill of the Female School is ascertained.

5th Oct. 1858.

Yours very truly

To—W. G. Young Esqr.

(Sd) Isvara Chandra Sarma.

Director of Public Instruction.

No. 14

My Dear Sir,

As various arrangements have been made and orders issued in regard to the charge of the College, Normal School, Vernacular Schools, &c, which it would be very inconvenient now to cancel, and specially as it is uncertain within what time the Supreme Government may issue final *orders* inthe matter of the Female School, I do not think it will be

expedient on public ground to defer carrying out the new arrangements any longer. Had your note of the 5th written a week or two ago I dare say your request would have been complied with, but now I think it is too late

I trust the matter of the Female Schools will be dealt with justly and generously by the Supreme Government and that before long you will be relieved from your present awkward position in regard to these Schools

I remain Yours truly
(Sd) W Gordon Young

To—Pundit Isvara Chandra Sarma

## APPENDIX B.

Calcutta Ist October 1867

My Dear Sir,

Since we met last, I have made careful enquiries and have thought over the subject, I regret to say that, I see no reason to alter my opinion as regards the difficulty of practically carrying out Miss Carpenter's Scheme of rearing a body of Native Female Teachers either in connection with the Bethune School or independently, such as may be acceptable to the bulk of the Hindu community and worthy of their confidence. Indeed, the more I think about it the more am I convinced that I cannot conscientiously advise the Government to take the direct responsibility of setting in motion a project which, in the present state of the native society and native feeling, I feel statisfied, will be attended with failure. You can easily conceive whether respectable Hindu will allow their grown-up female relatives to follow the profession of tuition and necessarily break through the present seclu sion, when they do not permit the young girls of ten or eleven years to quit zenana after they are married. The only persons, whose services may be available, are unprotected and helpless widows, and apart from the consideration

whether morally they will be fit agents for educational purposes, I have no hesitation in saying that the very fact of their dispensing with the zenana seclusion and offering themselves as public teachers will lay them open to suspiton and distrust and thus neutralize the beneficial action aimed at.

I think the Government cannot pursue a better course on this subject than what has been indicated in the India Government's letter lately published in the papers. The best test of popular feeling will be the application of the grant-in-aid principle. If the people are willing to carry out Miss Carpenter's idea, they should be assisted with liberal grants by Government. Although the great bulk of the Hindu community, so far I can perceive, will not avail themselves of such assistance, still there are particular individuals who seem to be very sanguine on this subject and if they are sincere and earnest they will, at any rate it may be hoped, come forward and with Government aid, begin the experiment.

I am free to confess that I do not place much reliance in them but they will have no right to complain under the rules announced by the Government of India.

I need hardly assure you that I fully appreciate the importance and desirableness of having female teachers for female learners ; but if the social prejudice of my countrymen did not offer an insuperable bar, I would have been the first to second the proposition and lend my hearty co-operation to-words its furtherance. But when I see that success is by no means certain and that the Government is likely to place itself in a false and disagreeable position, I cannot persuade myself to suport the experiment.

As regards the Bethune School, I entirely go with you that the results are not proportionate to the amount expended upon it, but at the same time I cannot recommend its abolition altogether. As a memento of the services to the cause of female enlightment in India of the great philanthropist whose name tth Institution bears, it has, I submit a claim

to the support of Government. In the next place, it is very desirable that there should be a well-organised female school in the heart of the metropolis to serve as a model to sister institutions in the interior. The moral influence of the present institutions in native society has been undoubtedly great. It has, in fact, paved the way to female education in surrounding districts and this, in my humble opinion, is no mean return for large sums which has been annually expended upon it. But I must say that there is great room for economy and improvement, The expenses, I think, can be reduced to nearly half, the present amount without detriment to the efficiency of the institution.

I intend to go the North-Western Provinces shortly for prolonged change for the benefit of my health and if you wish to know my views on there-organization of the Bethune School, I shall be happy to await your return to Calcutta and confer with you on the subject.

I remain my dear Sir,<br>
Yours Sincerely,<br>
(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—The Hon'ble William Grey.

My Dear Sir,

Sunderbuns<br>
October 14, 1867.

I am greatly obliged to you for your letter of the 1st instant; it is both useful and interesting. I hope you will not, on any account postpone your visit to the N. W. Provinces, and I trust that you will obtain a revival of health from the change.

Should I find you in Calcutta however a few days hence, I shall be most happy to see you and to learn your views as to the re-organization of the Bethune School. Otherwise you can perhaps find leisure to write to me on the subject from the N. West.

If you should desire to have letters of introduction to any

of the Government officers in the N. W. Provinces, I shall be glad to assist you in that way. I shall be at Belvedere from 18th inclusive.

I am yours sincerely,
(Sd.) W. Grey.

## APPENDIX C

( Legislative Council—Marriage of Hindoo : Widows—Petition of certain inhabitants of Bengal, submitting a Draft Bill for legalizing the Marrige of Hindoo Widows.)

To

The Honourable the Legislative Council of India,

The Humble petition of the undersigned Hindoo inhabitants of the Province of Bengal.

Respectfully Sheweth.

1. That by long established custom the marriage of Widows among Hindoos is prohibited.

2. That, in the opinion and firm, belief of Your Petitioners, this customs, crel and unnatural in inself, is highly prejudicial to the interests of morality, and is otherwise fraught with the most mischievous consequences to society.

3. That the evil of this custom is greatly aggravated by the practice among Hindus of marrying their sons and daughters at a very early age, and in many cases in their infancy, so that female children not unfrequently become widows before they speak or walk.

4. That, in the opinion and firm belief of Your Petitioners, this custom is not accordance with the Shasters, or with a true interpretation of Hindu Law.

5. That Your petitioners and many other Hindoos have no objection of conscience to the marriage of widows, and are prepared to disregard all objections to such marriages, found on social habit or on any scruple resulting from an erroneous interpretations of religion.

6. That your petitioners are advised that by the Hindoo Law, as at present administered and interpreted in the Court of Her Majesty and the East India Company, such marriages are illegal, and the issue there of would be deemed illegitimate.

7. That Hindoos, who entertain no objections of concience to such marriage, and who are prepared to contact them not withstanding social and religious prejudices are by the aforesaid interpretation of Hindoo Law prevented thereform.

8. That, in the humble opinion of your petitioners, it is the duty of the Legislature to remove all legal obstacles to the escape from a social evil of such magnitude which though sanctioned by custom, is felt by many Hindoos to be a most injurious grievance, and to be contrary to true interpretation of Hindoo Law.

9. That the removal of the obstacles to the marriage of widows, would be in accordance with the wishes and feelings of a considerable section of pious and orthodox Hindoos, and would in no wise affect the interests, though it might shock the prejudices of those who conscientiously believe that the prohibition of the marriage of widows is sanctioned by the Shastres, or who uphold it on fancied ground of social advantage

10. That such marriages are neither contrary to nature nor prohibited by law or custom in any other country or by any other people in the world.

11. That Your Petitioners, therefore, humbly pray that your Honorable Council will take into early consideration the propriety of passing a law (as annexed) to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo widows, and to declare the issue of all such marriages to be legitimate.

And your petitiones, as in duty bound, shall ever pray.

## AN ACT

*To declare the lawfulness of the marriage of Hindoo Widows.*

WHEREAS the marriages of Hindoo widows is by long established custom and received opinion prohibited, and whereas this prohibition is not only a grievous hardship upon those whom it immediately affects, but also tends generally to depravation of morals, and the injury of society ; and whereas it is believed by many Hindoos that this prohibition is not in accordance with a true interpretation of the Shasters and whereas it is expendient to declare the lawfulness of such marriages, and to make provision for the consequence of the second marriage of a Hindoo widow as regards her rights in her first husband's estate. It is hereby declared and enacted as follows :

I. No marriage contracted between Hindoos, shall be deemed invalid, or the issue there of illegitimate, by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person since deceased, any custom or interpretation of Hindoo Law to the contrary notwithstanding.

II. All rights and interests which any widow may by law have in her deceased husband's estate, either by way of maintenance or by inheritance shall, upon her second marriage, cease and determine as if she had then died, and the next heirs of such deceased husband then living, shall thereupon succeed to such estate. Provided that nothing in this Section shall affect the rights and interests of any widow in any estate or other property to which she may have succeeded or become entitled under the will of her late husband or in any estate or other property which she may have inherited from her own relations, or in any *stridhan* or other property acquired by her, either during the life-time of her late husband, or after his death.

To
H. Scott Smith, Esq.,
Registrar, Calcutta University.
Sir,

We have the honour to request the favour of laying before the Syndicate this our application for the affiliation of the Metropolitan Institution to the Calcutta University.

We beg to annex hereto the declaration and the statement required by the rules for affiliation.

With regard to the provision proposed to be made for the instruction of the students up to the standard of the B. A. degree. we beg to state that we have decided to organize the instructive staff as indicated in the statement. At present arrangements have been made for the instruction of the students in the course prescribed for the First Examination in Arts and 39 students have already been admitted to the class which has been opened from the commencement of the current session. Three teachers (১) have been entertained for his special purpose and additions will be made to the instructive staff as the new department will be developed.

We beg leave to assure the Syndicate that the Metropolitan Institution will be maintained on the proposed footing for five years at least

We have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servants,

Calcutta, the 22nd April, 1864

(Sd.) Protap Chandra Singha.
(Sd.) Hara Chandra Ghose.
(Sd.) Isvara Chandra Sarma.
(Sd.) Hara Nath Tagore.
(Sd.) Ram Gopal Ghose.

Members of the Senate
Calcutta Univesity.

১(1) Babu Ananda Krishna Bose, one of most distinguished senior scholar of the late Hindoo College. He is a man of solid and extensive acquirements

(2) Babu Herumboa Lal Gosain, graduated in the Calcutta University in January, 1864.

(3) Babu Mohesh Chandra Chatterjee, a distinguished senior student of the Sanskrit College.

To
J. Sutcliffe, Esq. M. A.
Registrar to the Calcutta Uuiversity.
Sir,

We, the Managers of the Metropolitan Institution, request that you will be so good as to lay before the Syndicate this our application for its affiliation to the Calcutta University up to the First Arts Examination.

As required by the rules for affiliation, we hereby declare that the Institution has the means of educating up to the First Arts Examination Standard.

We annex a statement showing the provision cotemplated to be made for the instruction of the students up to the same standard after the sanction for affiliation is accorded. We beg leave to state that we will employ senior scholars of the pre-university-era or graduates of the Calcutta University as professors of the Institution.

We hereby assure the Syndicate that the—Institution, if affiliated, will be maintained on the proposed footing for five years, and trust that this assurance will be deemed satisfactory.

Calcutta Metropolitan Institution. We have the honour to
The 28th January, 1872.

Sir,
Your most obedient servants.
(Sd) Isvara Chandra Sarma
(Sd.) Dwaraka Nath Mitter.
(Sd.) Kristo Das Pal
(Sd.) Rama Nath Tagore.
(Sd.) Rajendra Lal Mitra.

Countersigned by Members of the Senate, Calcutta University.

List of the instructive staff to be entertained.

| | | |
|---|---|---|
| Professor of the English Language | ... | One. |
| Sanskrit ... ... ... | ... | One. |
| Mathematics ... ... | ... | One. |
| Histroy and Philosophy ... | ... | One. |

(Sd.) Isvara Chandra Sarma.
(Sd.) Dwarka Nath Mitter.
(Sd.) Kristo Das Pal.

My Dear Sir,

I beg to inform you that we have this day sent in our application for the affiliation of our Institution to the University for submission to tne Syndicate at their meeting at this afternoon. I need hardly repeat that I would not have moved in this matter, did I not persuaded that we would have your kind support. Last year I took no action, bccause I could not manage to see you. I do not know how the other members of the Syndicate would feel disposed, but I may mention for your information that one of the managers of the Institution saw Mr. Sutcliffe and also Mr. Atkinson, and the latter told him that although he had objections to the course proposed, still he had made up his mind not to oppose the application. If it should be urged at the Syndicate that the character of the instruction to be imparted in the Institution would be inferior in as much as the instructive staff would enlist exclusively of natives. I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches up to the B. A. Standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident that native Professor if elected with care and judgement, would be found quite competent, but should we from experience feel the necessity of entertaining an English Professor for instruction in the English language in which English aid might be necessary, we would certainly employ one—our object, it is needless for me to mention, is the good of the Institution, and we will spare no means to accomplish it. I belive there is a desire in certain quarters to know the scale of pay we will allow to our Professors, that is a matter I submit, between the employer and the employee, and the affiliation rules, so far as I can understand them do not require such detailes, It will be our aim to combine efficiency with economy,and asI havespent, I may say, mywhole life in managing schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating pay.

I cannot too earnestly impress upon your mind that we

strongly feel the necessity of converting our Institution into a High School The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitory to many middle class youths, while their parents being opposed to their boys being sent to Missionary Colleges, they are obliged to give up academic education after Matriculation. This Institution would be a great boon to them.

The managers of the Institution are myself, Justic Dwaraka Nath Mitter, and Babu Kristo Dass Pal We are satisfied that the means at our command will be quite sufficient for all the purposes of the Institution. But should any deficiency arise, we will be prepared to supply it from our own pockets. I trust our assurance for the maintenance of the Institution on the proposed footing for five years will be deemed satisfactory by the Syndicte.

Trusting to be excused for the trouble.
The 27th January, 1872,

I remain, My dear Sir,
Yours sincerely,
(Sd.) Isvara Chandra Sarma.

To—E. C. Bayley, Esq, &c &c.

## APPENDIX D.

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উক্তির অসারত্ব বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত সবজজ মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের ভূতপূর্ব কর্মাধ্যক্ষ নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য বাহাদুর মহাশয়ের পত্রখানিই উপযুক্ত প্রমাণ :

শ্রীজগদীশ

প্রিয় চণ্ডীবাব,

আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকায় আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে আমিই দ্বারিবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। পূর্বে তিনি দ্বারিবাবুকে কখন দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ইহা আমার বেশ স্মরণ আছে যে, অনেকক্ষণ আলাপ

পরিচয়ের পর দ্বারিবাবু বিদায় লইয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ও ছোকরা কে হে! ও যে আমাকে কথা কহিতে দিলে না'—ঠিক এ কয়েকটি কথা কিনা আমি শপথ করিতে পারি না, তবে এই মর্ম্মের কথা, ইহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

দ্বারিবাবু যখন হুগলি কালেজে, আমি কৃষ্ণনগর কালেজে এবং শ্রীনাথ দাস হিন্দু কালেজে, তখন শ্রীনাথবাবুর বাটীতে দ্বারিবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়, তাহার পর আমি কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহাকে হুগলিতে পত্র লিখিতাম তিনি হুগলি হইতে আমাকে কৃষ্ণনগরে পত্র লিখিতেন। কতদিন পরে আমি কৃষ্ণনগর হইতে হিন্দু কালেজে এবং তিনি হুগলি কালেজ হইতে হিন্দু কালেজে যান; এক সঙ্গে এক অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম, কিন্তু ক্লাস এক ছিল না। তিনি উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন, কিন্তু অনেক বিষয়ে এক পাঠ ছিল আমার বাসা বহুবাজারে ছিল, তাঁহারও মাতুলের বাটী সেখানে, সুতরাং সর্ব্দা দেখা শুনা হইত এবং পরস্পরের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তিনি হাইকোর্টের জজ হওয়ার পরেও আমাকে 'My dear friend' পাঠ লিখিতেন—তাঁহার একখানি পত্র আজিও আমার নিকট আছে। এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এইজন্য আমি দ্বারিবাবুকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে লইয়া যাই। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আলাপ থাকিলে আমার সঙ্গে তিনি যাইবেন কেন? হইতে পারে পূর্ব্বে কখন দেখা শুনা ছিল, কিন্তু দ্বারিবাবু সে পরিচয়ে সাহসী হইতে পারেন নাই এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত স্মরণ থাকিবে মনে করেন নাই। ফলতঃ সে দিনের কথাবার্ত্তাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয় অবাক হইয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। ছেলোটি অসাধারণ ইহা তিনি সেই দিন বুঝিলেন এবং সেই ভাব প্রকাশ করিলেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র লিখিত পত্র কয়খানিও এখানে প্রকাশিত হইল। শম্ভুচন্দ্র নারায়ণবাবুর বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত মুচিরামের বিবাহ বিষয়ক ব্যাপারের উল্লেখ স্থলে জ্যেষ্ঠের সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমনিরাসের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'ক্ষীরপাইনিবাসী হালদার বাবুদের অনুরোধে পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' নিম্নে প্রদত্ত পত্রগুলিতে শম্ভুচন্দ্রের নিজের উক্তিতেই এক বৎসর পরেও অনেকগুলি বিধবার বিবাহের আয়োজনের উল্লেখ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "পশ্চাৎপদ" ও "কাপুরুষ" বলিয়া গালি দিয়াছেন। আজীবন জ্যেষ্ঠের অন্নে পালিত হইয়া এখনও তাঁহারই আনুকূল্যে দেহধারণ

করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ মধুর বিশেষণে অভিহিত করিয়া আত্মীয়গণের নিকট ও জনসাধারণ সমীপে অব্যাহতি পাওয়া কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব।

পাঠক! পত্র কয়খানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে শম্ভুচন্দ্রের অনেক গুণপনার পরিচয় পাইবেন। পূর্ব সংস্করণে সমগ্র পত্র মুদ্রিত না করিয়া কেবল প্রয়োজনোপযোগী পত্রাংশ মুদ্রিত করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য এই তিনখানি পত্র পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হইল। শম্ভুচন্দ্রের সম্ভ্রমহানির ভয়ে অন্য অনেক পত্র মুদ্রিত হইল না।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্—

শ্রীচরণেষু—

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

৬৫০ ছয় শত পঞ্চাশ টাকার নোট পঁহুছিল আদেশানুসারে বিলি করিব। অনুগ্রহপূর্বক ভৈরবের মাং মাসহারার খাতা প্রেরণ করিবেনঃ সাবেক মাসহারার ৩ খানা খাতা চূড়ামণির হস্তে পাঠাইয়াছি বোধকরি পাইয়া থাকিবেন। কৃষ্ণনগরের কন্যা ভবসুন্দরীকে গত রবিবার কলিকাতা পাঠাইয়াছি বোধ করি তাঁহারা পঁহুছিয়া থাকিবেন। পরম্পরায় শুনিতেছি নারায়ণ বাবাজীউ কৃষ্ণনগরের কন্য ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি! আমি কন্যাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি মহাশয় কর্তা আপনি কন্যাকে যে পাত্রে দিবেন তাহাতে আমার কোনো আপত্তি নাই আর নারায়ণের মাতা আমাকে বৃথা দোষ দেন নারায়ণ ছেলে মানুষ নয় যে আমি ভুলাইয়াছি (২) কৃষ্ণনগরের কন্যার বিষয়ে মহাশয়ের যেরূপ অভিলাষ হয় তাহাই করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কোনো কথা বলিবার নাই। যদি নারায়ণের বিবাহ হয় তাহা হইলে জননী দেবীকে যেন পত্র পাঠাইয়া লইয়া যান জননী দেবীর বিধবাবিবাহে বিশেষ যত্ন আছে। আর ৩টি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে এক্ষণে বিদায় করিয়াছি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে মহাশয়ের নিকট পাঠাইব গোপাল বাবাজীউ বিধবা বিবাহ করিতে চান অপর ১টি কন্যাও উপস্থিত ফলে মধ্যম দাদার বিনা মতে গোপালের বিবাহ হইতে পারে না। ঈশান ভায়া বাটী আসিয়াছেন গোপাল মূর্খ ও মাতাল তাহাকে বিবাহ করিতে সহসা কেহ রাজী হয় নাই। ইতি ২৪ আষাঢ়।

ভৃত্য

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মণঃ

পুঃ—নারায়ণ বাবাজীউ অদ্য কলিকাতা গমন করিবেন।

---

২ নারায়ণবাবুর জননী চিরদিন এই পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে সংসার করিয়া গিয়াছেন।

পুঃ—রাধানগরের ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের পুত্রকে পুস্তক ও বস্ত্র দিবার জন্য উমেশ নায়েবকে বরাত করিয়াছিলেন নায়েব এখানে উপস্থিত নাই পুস্তক ও বস্ত্রাভাবে পাঠ বন্ধ হয় এ বিষয়ে যেরূপ আদেশ হয় তাহা লিখিবেন।

শম্ভু

শ্রীদুর্গা শরণম্

শ্রীচরণেষু—

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

শ্রীমতি জননী দেবী প্রভৃতি নির্বিঘ্নে, বাটী পৌঁছিয়াছেন নারায়ণ বাবাজীউ বিধবাবিবাহ করিবেন দেশে প্রচার হইয়াছে এই নিমিত্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ আমাকে বিশেষ অনুরোধ করায় মহাশয়কে লিখিতেছি ইঁহারা বলেন আর ও ২।৪ বৎসর নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকুক, পরে যদি বিধবাবিবাহ করাই শ্রেয়ঃকল্প হয় তাহা হইলে ৭।৮ বৎসরের অর্থাৎ অক্ষতযোনি কন্যার সহিত বিবাহ হইলে ভাল দেখায় ও শাস্ত্রসম্মত হয়। আর ইহারা আমাকে বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের বিবাহ দিউন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, নারায়ণের বিবাহ দিলে আমরা আর তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারি এমত বোধ হয় না কারণ তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিলে সমাজে রহিত হইব আর নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমাদের পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইবে এই কারণেই নারায়ণের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি এতাবৎকাল মহাশয়দের অনুগত ও আশ্রিত থাকিয়া অতঃপর আমাদের কি দশা ঘটিবে স্থানান্তরে যাইলে আমাদিগকে কেহ হুঁকো দিবে না ও উপহাস করিবেক (৩) ইঁহারা নারায়ণকে ক্ষান্ত করিবার জন্য আমাকে কলিকাতা যাইতে বলেন আমি তাহাদিগকে বলিলাম অগ্রে অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখি তিনি যেরূপ আদেশ করেন পরে আপনাদিগকে জানাইব এমত স্থলে যাহা কর্তব্য হয় করিবেন ও নারায়ণ বাবাজীউকে আমার প্রণয় সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ জানাইবেন এখানকার সকলে ভাল আছেন। ইতি

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণঃ

---

৩ অন্যান্য আত্মীয়বর্গের ধুয়া ধরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পুত্রের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিতে প্রয়াসপাওয়া কতদূর সুবিবেচনার কার্য পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এখানে কেবল বক্তব্য এই যে, নারায়ণবাবুর বিবাহের পর শম্ভুচন্দ্র নিজ পুত্রের বিবাহের সময় জ্যেষ্ঠের নিকট আনুকূল্য গ্রহণ করিয়াও সে সময় (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই) তাঁহার ভাবী কুটুম্বের নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সামাজিক সংস্রব রাখেন না এখনও তাঁহার কুটুম্বগণের পূর্ব সংস্কার সুরক্ষিত কিন্তু এদিকে বিদ্যাসাগর বাটীর সহিত তাঁহার শত প্রকার সামাজিক সংস্রবের প্রমাণ বিদ্যমান।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

শ্রীচরণেষু—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

মহাশয়ের পত্র পাইলাম, ২৭শে শ্রাবণ নারায়ণ বাবাজীউ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম এতাবৎকাল আমরা অপরের বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত ছিলাম আপনাদের বাটীর কাহারও বিবাহ দিতে সমর্থ হই না এই কারণে লোকে বলিত বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবেন, অনেকে ভণ্ড ও প্রতারক মনে করিতনারায়ণ বাবাজীউ আমাদেরসেই কলঙ্ক ঘুচাইলেন নারায়ণের যে এতদুর সাহস হইবে তাহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর যাহা হউক নারায়ণকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

আমি যে ইতিপূর্ব্বে নিবারণকে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা কেবল আত্মীয়-গণের অনুরোধে পড়িয়া লিখিয়াছিলাম তাহা পত্রেই ব্যক্ত আছে নচেত পত্র লেখা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। শ্রীমতী জননী দেবী নারায়ণের বিবাহ সম্বাদ শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, ইতিমধ্যে কলিকাতা যাইয়া সাক্ষাৎ করিবার সম্পূর্ণ মানস আছে ৺কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অগত্যা ২।৪ দিন অবস্থিতি করিতে হইল, নারায়ণ বাবাজীউ ও বধূ মাতাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আশীর্বাদ জানাইবেন দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বিবাহের সময় যাইতে পারি নাই সমাচার পাইলে অবশ্য উপস্থিত হইতাম নারায়ণের জননী দেবী পঁহুছিয়াছেন। ইতি ৪ ভাদ্র।

ভৃত্য

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীরামঃ শরণম্

বৈদ্যনাথ, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

নমস্কার্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং

স্মৃতিরত্ন মহাশয়, গতকল্য আপনার "বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ" পুস্তক পাইয়াছি। আমি এখানে আসিয়া অবধি কোনদিনই রাত্রিতে কোনো কার্য্যই করি না, কিন্তু ঔৎসুক্য বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে কল্য রাত্রি ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত মনোয়োগের সহিত আপনার পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

একবার মাত্র পাঠ করিয়াই যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা আপনাকে জানান উচিত মনে হওয়াতে সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে। আপনি, আমার একজন পরমাত্মীয়, আপনার সুখ্যাতি ও নিন্দাতে আমাদিগের সন্তোষ ও কষ্ট আছে। অতএব আপনার গ্রন্থে যে যে অংশে দোষ দৃষ্ট হইল, তাহা দেখাইয়া দিয়া সাবধান করিতেছি ; এজন্য ত্রুটি ও ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।

আপনার গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে আপনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছেন, অনেক বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং 'বেহুদা পণ্ডিত' গোচ অনেক শাস্ত্র তুলিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এবং আপাততঃ অধিকাংশ লোকেই মনে করিবেন যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় খুব লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে, যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে বা যাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে পড়া আছে তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে, এ পুস্তকখানি আপনার উপযুক্ত হয় নাই, ইহাতে আপনার সম্মান গৌরব ও পদের হানি ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

আপনি এতদিন, বিশেষতঃ এই পুস্তকখানি রচনা করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্র সমুদায় আলোচনা করিয়াও যে কিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে বিধবা-বিবাহ আদৌ শাস্ত্রবিহিতই নহে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই সিদ্ধান্তটি রক্ষা করিবার জন্য যে কত মুনিবচনের কত প্রকার নূতন নূতন অর্থ করিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়া দিব কি, আপনি একটু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি। আমরা অজ্ঞ ব্যক্তিকে তত দোষ দিই না। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া জিগীষাপরবশ হইয়া, যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে আমরা মনের সহিত ঘৃণা করি, বঞ্চক ও অধার্মিক বলিয়া থাকি। আপনি অনেক স্মৃতি নিবন্ধ দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি কোন্ নিবন্ধকার এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ আদৌ শাস্ত্রসিদ্ধই নহে? আপনি যে নিবন্ধকারকে একবার প্রামাণিকরূপে গণনা করিয়াছেন, আবার নিজের মতের সহিত তাঁহার মতের বিরোধ হইলে সেই নিবন্ধকারকেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন; যেমন নীলকণ্ঠ।

'পতিরন্যো বিধিয়তে' এই বচনটি নিয়োগপর বলিয়া এক ভয়ানক অপসিদ্ধান্ত ও শব্দশাস্ত্রে নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা নিয়োগের প্রতি ক্ষেত্রীয়তাপুত্রতাই একমাত্র কারণ বলিয়াছেন, এক্ষণে আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদেশস্থ পতির অনুমতি না পাইলেও সপুত্রা স্ত্রীরও নিয়োগ চলিবে, এবং (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন) এক পুত্র পুত্রই নহে, অতএব দ্বিতীয় পুত্রোৎপত্তি পর্যন্ত নিয়োগ কার্য চলিবে। আবার আপনার মতো অপর কোনো স্মার্ত হইত বলিবেন 'এষ্টব্যাঃ বহবঃ পুত্রাঃ' এই বচন অনুসারে পুত্র পাইবার জন্য যাবজ্জীবন নিয়োগ চলিবে। যাহা হউক বিধবাবিবাহ ঘৃণিত ব্যাপার বলিয়া তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমান করিতে গিয়া অতীব পবিত্র সাধুজন সমাদৃত নিয়োগব্যবস্থা প্রচার করিয়া জগতে বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের আপনি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকার, আপনার ব্যবস্থাতে সধবা বিধবা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেরই উপকার আছে দেখিতেছি। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ঘরের কুলবধূকে অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে, ঘরের বৌ ঘরে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে অথচ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিণ্ডের সংস্থান হইবে। ইহার নাম "গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকে পিতৃলোকের তৃপ্তি।" সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইলেও অনেকে বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতারা উহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। আপনি নিজে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই বোধ হয় পরাশর বচনের এই সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

'পতিরন্যো বিধিয়তে' এই স্থলে পতি শব্দে 'পতিস্থানীয় সন্তানোৎপাদক' ইহা স্বীকার করিতে হইবে লিখিয়াছেন। কেন স্বীকার করিতে হইবে? আপনার গরজে স্বীকার করিতে হয়, স্বতন্ত্র কথা, শব্দশাস্ত্রানুসারে ত কখনই হইতে পারে না। পতি শব্দে সন্তানোৎপাদক এরূপ অর্থ কোনো গ্রন্থকার কখনই করেন নাই। আপনার আমলে পতি শব্দের একটি অর্থ বাড়িল ইহাও মন্দ নহে। আচ্ছা পতি শব্দের এইরূপ অভূতপূর্ব অর্থ করিবার পূর্বে আপনার কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, 'অন্য' 'অপর' প্রভৃতি শব্দের বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্য জাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তির সত্তা বুঝায়, যেমন অন্য পণ্ডিত, অপর ছাত্র, বলিলে একজন পণ্ডিত ও একজন ছাত্র, তদ্ভিন্ন আর একজন পণ্ডিত ও আর একজন ছাত্র বুঝায়। সেরূপ 'অন্য পতি,' বলিলে দ্বিতীয় পতি বুঝায় পূর্বে পতি শব্দে যেরূপ অর্থ বুঝাইয়াছিল তদপেক্ষা 'পতিস্থানীয় সন্তানোৎপাদক' রূপ স্বতন্ত্র অর্থ বুঝাইলে 'অন্য' পদটি কখনই বিশেষণ রূপে সঙ্গত হইতে পারে না। আচ্ছা আপনি যেন স্মার্ত, আপনার পুস্তক সংশোধক নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এ বিষয়ে কিরূপে সম্মতি দিলেন? যদি পরাশর বচনটি দ্বিতীয় নিয়োগ বিষয়ক বলিয়া, দ্বিতীয় সন্তানোৎপাদক, অর্থ করেন, তবে আমি নিরস্ত হইলাম। আচ্ছা, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, জিজ্ঞাসা করি পতি শব্দে সন্তানোৎপাদক, ঊঢ়া শব্দে বাগ্দত্তা, পুনরুদ্বাহ ও পুনঃসংস্কার শব্দে নিয়োগ ধর্ম ইত্যাদি নানা মুনি বচনের ও নিবন্ধনকারীদিগের সহজ সন্দর্ভের সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া অদৃষ্টপূর্ব, স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া কেন মুনি ও নিবন্ধনকারীদিগের অবমাননা করিলেন? আপনিই বা কেন উপহাসাস্পদ হইলেন? পরাশরবচন নিয়োগপর হইলেও ত আপনি কলিযুগে নিয়োগ প্রচলিত করিবেন না, পরিশেষে আপনাকে মাধবাচার্যের শরণাগত হইয়া বলিতেই হইয়াছে, যে 'এ বচনটি যুগান্তরবিষয়'। যদি তাহাই হইল, তবে পরাশরের বচনটি বিবাহপর হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল, কলিযুগবিষয়ক ত হইল না। সুতরাং আমরা অবশ্য বলিব, আপনার পরাশরের বচনটি নিয়োগের প্রতিপন্ন করিতে যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র, তাহাতে লাভ কিছুই

হয় নাই। কেবল কতকগুলি অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি লোকের সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরমহাশয়ের 'বিধবাবিবাহ পুস্তক' ২০ বৎসরের অধিক কাল হইল প্রচারিত হইয়াছে; এতকাল কোনো উচ্চবাচ্চ না করিয়া এক্ষণে হঠাৎ আপনার এরূপ খড়্গহস্ত হইবার কারণ কি বুঝিলাম না। যদি 'ব্রজ-বিলাসে'র প্রদর্শিত বিদ্যারত্নমহাশয়ের ব্যবস্থার প্রতি দোষারোপ উদ্ধারার্থ আপনি এ উদ্দম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল কেবল সেই বিষয়টি লইয়াই থাকা, অন্য হলাৎপলাৎ বকিয়া "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা" গোচ নিয়োগধর্ম প্রচার করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। ইহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতো ভুল; কেন না বিদ্যারত্নমহাশয় পরাশর বচনটি বাগ্‌দত্তা-বিষয়ক বলেন; আর আপনি ঐ বচনটি নিয়োগপর বলিলেন। বাগ্‌দান ও নিয়োগ যে ব্রাহ্মণশূদ্র তফাত তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই।

ব্রজবিলাসে 'ভাইপোস্য'-কৃত প্রশ্ন কয়েকটির আপনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহাও ভাল সঙ্গত হইতেছে না। আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরস্থলে (৮৯ পৃষ্ঠাতে) লিখিয়াছেন 'অন্য জাতীয় পাত্রে বিবাহিতা কন্যাকে অন্য পাত্রে বিবাহ দিবার বিধি থাকিলে অন্য জাতীয় কর্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃন্যায় ভরণপোষণ করিবে ইহা বলিবার কোন তাৎপর্য থাকে না।' কেন থাকে না তাহা আমরা বুঝিলাম না। এক বচনে বিধান করিতেছে যে, যদি অন্যজাতীয় পাত্রে কন্যা অর্পিত হইয়া থাকে তাহা হইলে পিতার কর্তব্য অপর পাত্রে বিবাহ দেওয়া, অপর বচনে বলিতেছে যে, পাত্র অন্যজাতীয় হইলে তাহার কর্তব্য বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃবৎ প্রতিপালন কারা। এক বচনে পিতার ও আর এক বচনে পাত্রের কর্তব্য বিধান করিল তাহাতে দোষ কি হইল? পিতা আপনার কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়া কন্যার আর বিবাহ না দেন বা কন্যা আর বিবাহ না করে, তবে পাত্রকে ঐ বিবাহিতা কন্যাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, এই উভয় বচনের মর্ম্ত আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় না।

অপর প্রশ্নে 'ভাইপোস্য' দেখাইয়াছেন যে অর্জুন নাগরাজের কন্যাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। আপনি (৯২ পৃষ্ঠায়) উত্তর দিয়াছেন যে বিবাহ নহে, নিয়োগ যেহেতু, শেষে লেখা আছে 'এবমেষ সমুৎপন্ন পরক্ষেত্রেহর্জুনাত্মজঃ'। এই অংশে পরক্ষেত্রে শব্দের উল্লেখ আছে। আচ্ছা স্মৃতিরত্নমহাশয়, একটি "পরক্ষেত্রে" শব্দ দেখাইয়াই কি আপনি অন্যান্য শব্দের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে এককালে ভুলিলেন? এ ত মীমাংসকের উচিত নহে; দেখুন দেখি 'ঐরাবতেন সা দত্তা'‚'ভার্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ' 'অর্জুনস্য আত্মজঃ' অর্জুনাত্মজ' এই সকল সন্দর্ভগুলি বিবাহ প্রতিপাদক আছে কি না। একটি পরক্ষেত্রে শব্দের বলে বিবাহ প্রতিপাদক স্পষ্ট সন্দর্ভগুলি ত্যাগ করা যায় কিনা না?

আপনি একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, মীমাংসাদর্শনে আছে কিনা যে, 'শ্রুতি সর্বাপেক্ষা বলবতী' তবে 'ঐরাবতেন সা দত্তা' 'ভার্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ' এই দুইটি শ্রুতির বিরুদ্ধে 'পরক্ষেত্র' শব্দ, বোধ্য লিঙ্গকে কিরূপে বলবান করিলেন। 'এবমেষ সমুৎপন্নোহংপরক্ষেত্রেহর্জুনাত্মজঃ' এইরূপ পাঠ হইলেও ত হইতে পারে। যদি আপনার লিখিত পাঠই প্রকৃত হয় তথাপি এরূপ অর্থ অনায়াসেই হইতে পারে এবং এরূপ অর্থাৎ নাগরাজের বিধবা কন্যার রীতিমত ভার্যাদি দান প্রতিগ্রহ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে পরক্ষেত্রে ত ( এক্ষণে এইরূপে স্বক্ষেত্র হওয়ায় ) ইরাবান্ ইন্দ্রের আত্মজরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। আপনি স্মার্তপ্রধান, আপনাকে স্মৃতির একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। নাগরাজের সহিত অর্জুনের কি সম্পর্ক যে নাগরাজ অর্জুনকে নিজ কন্যার নিয়োগে নিযুক্ত করিলেন? য্যাকে তাকে নিয়োগে নিযুক্ত করা যায় না কি? (দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভিন্ন স্থলে)। নিয়োগোৎপাদিত, পুত্র ত ক্ষেত্রীরই হইয়া থাকে আমরা জানি, তবে ইরাবান্ অর্জুনের পুত্র হইল কেন? এসকল কি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নে 'ভাইপোস্য' লিখিয়াছেন, দান ও গ্রহণ ঘটিত বহু লক্ষণ বিবাহের হইতে পারে না, যেহেতু গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের দান ও গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নাই। এতদুত্তরে আপনি বলিয়াছেন (৯৫ পৃষ্ঠায়) না সকল বিবাহের দান ও গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। এইজন্য নারদের বচন তুলিয়া খুব ধুমধাম করিয়াছেন। কিন্তু আপনার একবার ভাবা উচিত ছিল যে যাহাদের গান্ধর্ব বা রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ঐ বিবাহে দান পরিগ্রহ হইয়াছিল কি না? শকুন্তলাকে কে কবে দান করিয়াছিল? রুক্মিণীকে কে কবে দান করিয়াছিল? কন্যার কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বলপূর্বক কন্যাহরণের নাম রাক্ষস বিবাহ; ছল পূর্বক কন্যা হরণের নাম পৈশাচ বিবাহ। এই দুই বিবাহে কি কন্যাকর্তার সহিত বরের দেখা শুনার সম্ভব আছে যে, তিনি দান করিবেন। তবে যদি 'বাবা গঙ্গা বল, না কাজে কাজেই' গোচ কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া মনে মনে অমনি দান করিয়া বসে, সে স্বতন্ত্র কথা। এই জন্যই বলিয়া থাকে যে, পণ্ডিতগণ বিষয়মূর্খ।

তৃতীয় প্রশ্নে 'ভাইপোস্য' বলিয়াছেন, পরাশরের বচনটি বাগ্দত্তাবিষয়ক হইলে তৎসমানার্থক নারদ বচনের বিবাদ হয়। তদুত্তরে (৯৭ পৃষ্ঠা) আপনি বলিয়াছেন, নারদ বচন নিয়োগ ধর্মবিষয়ক বলিতে হইবে। আচ্ছা যেন তাহাই বলিলাম, তাহা হইলেও ত পরাশর বচন বাগদান বিষয়ক হইলে বিরোধ সেইরূপই রহিল, সিদ্ধান্ত কই হইল? এজন্য পরাশর কোনো বচন বাগ্দানবিষয়ক নয় বলেন তাহা হইলেও ত বিদ্যারত্নমহাশয়ের পরাজয় হইল, 'ভাইপোস্য'রই জয় হইল, এটি কি একবারও ভাবেন নাই।

চতুর্থ প্রশ্নে 'ভাইপোস্য' আপত্তি করিয়াছেন, যে যখন বিদেশ গমন প্রভৃতি

পাঁচটি স্থলমাত্র ধরিয়া পরাশর বাক্‌দত্তা কন্যাপক্ষে বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন তদ্ভিন্ন স্থলে কিরূপে বাগ্‌দত্তার বিবাহ হইতে পারে? এ আপত্তি খন্ডনার্থে আপনি ভট্টোজী দীক্ষিতের আশ্রয় লইয়া বলিয়াছিলেন(১০০পৃষ্ঠায় 'ক্লীবে চ, এই 'চ'কার দ্বারা অন্য জাতীয় প্রভৃতি পরিগৃহীত হইবে। স্মৃতিরত্ন মহাশয়, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ভট্টোজী দীক্ষিত বলিয়াছেন ত আপনিও ঐ কথা বলিয়া বসিলেন ; কিন্তু ওটি সঙ্গত কি না তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল ; চকারের অন্যান্য কতকগুলি সমুচ্চয় করিলে 'পঞ্চসু' আপৎসু, এই 'পঞ্চসু শব্দটি কিরূপে সঙ্গত হইবে ? আপনি এই দোষটি উদ্ধার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দায়ভাগের 'ষট্‌সংখ্যান বিবক্ষতার সহিত এ স্থলে 'পঞ্চসু' শব্দের যে অনেক প্রভেদ আছে তাহা প্রণিধান করেন নাই। জীমূতবাহন 'ষড়্‌বিধ'পরিচয় দিবার স্থলে 'দত্তঞ্চ' এই চকার দ্বারা অন্যান্যবিধ স্ত্রীধনের সমুচ্চয় করেন নাই, যেহেতু তাহা করিতে গেলে, ষড়্‌বিধ শব্দটি অসঙ্গত হইয়া যাইবে। এইমাত্র বলিয়াছেন যে যখন অন্যান্য বচনে আরও অনেক প্রকার স্ত্রীধন আছে লিখিত আছে, তখন 'ষড়্‌বিধংস্ত্রীধনং স্মৃতং, এই বাক্য দ্বারা অধ্যগ্ন্যাদি ধনে স্ত্রীধনত্ব মাত্রের বিধান, স্ত্রীধনের ষড়্‌বিধত্বের বিধান নহে, ষড়্‌বিধত্ব অবিবক্ষিত। পরাশর বচনের 'পঞ্চসু'র পরিচয়স্থলে আপনি চকার দ্বারা পাঁচের অধিক বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সুতরাং তাহা কোনো মতেই হইতে পারে না। অতএব আমরা অবশ্যই বলি যে আপনার ভট্টোজী দীক্ষিতের আশ্রয় লওয়া বৃথা হইয়াছে। জীমূতবাহনের অভিপ্রায় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

পঞ্চম প্রশ্নে 'ভাইপোস্য' বলিয়াছেন, যে বিদ্যারত্নমহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কশ্যপবচনে যে সকল স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই সকল স্ত্রীর উক্ত পঞ্চবিধ আপদে পরাশর বিবাহের বিধান দিয়াছেন এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বিদ্যারত্নমহাশয় বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন, যেহেতু কশ্যপবচনে বাগ্‌দত্তার ন্যায় রীতিমতো বিবাহিতার উল্লেখ আছে। বিদ্যারত্নমহাশয় পূর্বাপর না ভাবিয়া এই যে একটি অসঙ্গত কথা বলিয়া বসিয়াছিলেন, তজ্জন্য 'ভাইপোস্য' তাঁহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন। আপনি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্ববচোব্যাঘাত উদ্ধার করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন (১০৭ পৃষ্ঠা) তাহাও বিফল হইয়াছে ঃ কশ্যপবচনে সাতটি কন্যার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে চারি পাঁচটি যদি বাদ দেওয়া হয় কশ্যপবচনোক্ত নিষেধের প্রতিপ্রসব এই কথাটি কতদূর সঙ্গত হয় বলুন দেখি। তদপেক্ষা অমনি বলিলেই ত হইত যে পরাশরবচন বাগ্‌দত্তার বিবাহবিধায়ক তাহাতে আর কোনো কথাই থাকিত না। 'ভাইপোস্য' তামাশা করিয়া যাহাই বলুন বিদ্যারত্নমহাশয়ের যে বিধবা বিবাহ অনভিমত

তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু তিনি যেরূপ অসাবধান হইয়া পরাশর-বচনের বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় বলা হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উত্তর আপনি কি দিবেন? বিদ্যারত্নমহাশয়ের উক্তি পূর্বাপর বিরুদ্ধ হয় বলিয়া আপনি তাহার টীকা করতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু 'বাদী ভদ্রং ন পশ্যতি' 'ভাইপোস্য' তা শুনিবেন কেন? বিদ্যারত্ন-মহাশয়ের বাক্য ত বেদ নহে; বা বিদ্যারত্নমহাশয়ও ত মনু নহেন, যে তাঁহার অসামাল পরিষ্কার করতে 'ধ্যায়েৎ কি না' ঝাঁড়টা গোচ যা ইচ্ছা তাই তাঁহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে।

আপনার অনুরোধে (১০৮ পৃষ্ঠা) বাধ্য হইয়া আমরা বলিতেছি স্মৃতিরত্ন-মহাশয়, নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিয়াছি আপনার পাঁচটি প্রশ্নেরই উত্তর হয় নাই।

আমি ক্রমশঃ দূরে আসিয়া পড়িলাম; একটা কথা বলিয়াই এই স্থানেই নিবৃত্ত হই। আপনি পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া ভাল করেন নাই; দেশীয় পণ্ডিতদিগকে পুনরায় 'ভাইপোস্য' দ্বারা অপদস্ত হইতে হইবে। 'ভাইপোস্য'র দ্বিগুণ অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে এজন্য বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। ইতি

আপনার আত্মীয়

**শ্রীমহেশচন্দ্র শর্মা**

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

# কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর ও আরও কিছু অজ্ঞাততথ্য

## হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলার লোক বিদ্যাসাগরমহাশয়কে সমাজসংস্কারক বলিয়াই জানে। তিনি বিধবা-বিবাহ চালাইয়াছেন, বহুবিবাহ বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা আরও জানে তিনি পড়ার বই নূতন করিয়া লিখিয়াছেন, সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন যে বাঙালিও ইংরেজের মত স্কুলকলেজ করিয়া চালাইতে পারে, সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলাতেও পড়ানো যায়, সর্বপ্রথম সুরুচিপূর্ণ বাংলা বই তিনিই লিখিয়াছেন। দানেও তিনি বীর ছিলেন,—১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোককে নিজে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করিয়াছেন। তিনি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, কেমন করিয়া গবর্মেণ্টের চাকুরি পান, কেমন করিয়া সে চাকুরিতে তাঁহার উন্নতি হয় এবং ক্রমে তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ও স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার হন. এ সব কথা বাঙালিরা বড়-একটা জানে না, বড়-একটা খোঁজও লয় না। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে' সেই না-জানা কথাগুলি গবর্মেণ্টের দপ্তর হইতে চিঠিপত্র দেখিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া গবর্মেণ্টের দপ্তরে যাতায়াত করিতেছেন ও সেখানকার নথি দেখিয়া বর্তমান ইতিহাসে বাঙালির সম্বন্ধে অনেক না-জানা কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। গবর্মেণ্ট রেকর্ড আপিসে বাহিরের লোককে বড় ঢুকিতে দিতে চান না; কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুকে তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ব্রজেন্দ্রবাবুও কোন গোপন সংবাদ দেন না। বাঙালিরা যে-সকল সংবাদ পাইবার জন্য উৎসুক, অথচ পায় না, কেবল সেই সকল সংবাদই দেন। ব্রজেন্দ্রবাবু এইরূপে গবর্মেণ্টের রেকর্ড হইতে বাঙালিদের ইতিহাস বাহির করিয়া বেশ যশ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স এমন বেশি নয়। ইনি এই লাইনে আরও অনেক কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার চাকুরি-জীবনের সকল কথাই বলিয়াছেন। সংস্কৃত পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া তিনি প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার হন; সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়া তাঁহার মুরুব্বি মার্শাল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালায় এসিস্টাণ্ট

সেক্রেটারি করেন, কিন্তু সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় ছয় মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেন ও আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভাল চাকরি পান। দত্ত-মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগরমহাশয় পুরা সেক্রেটারি হন (১৮৫০) এবং এক বৎসরের মধ্যে একখানি রিপোর্ট লিখিয়া গবর্মেণ্টে পাঠান; সে রিপোর্টের ফলে সংস্কৃত পাঠশালা কলেজ হইয়া যায়। তাহাতে কথা থাকে—তিন ভাগের দুই ভাগ সংস্কৃত ও এক ভাগ ইংরেজি পড়িবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরাই বাংলা লিখিবে; সংস্কৃত ভাল না জানিলে সে লেখকদ্বারা বাংলার উন্নতি হইতে পারে না। সেই রিপোর্টের ফলে তিনিই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজি সাহিত্যের ও ৺শ্রীনাথ দাস ইংরাজি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পূর্বে যে পাঠশালাটি ছিল, তাহার এক এক ঘরে এক এক জন সংস্কৃত অধ্যাপক বসিতেন; ছেলেরা তাঁহার কাছে পড়িতে যাইত। প্রথম ব্যাকরণের ঘরে পড়িত, তারপর সাহিত্যের ঘরে, তারপর অলঙ্কারের ঘরে; তারপর স্মৃতির ঘরে, তারপর ন্যায়ের ঘরে; কেহ কেহ জ্যোতিষের ঘরেও পড়িত। প্রথম বার বছর ধরিয়া (সংস্কৃত পাঠ-শালায়) একটি বৈদ্যকেরও ঘর ছিল। সেখানকার অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে পদত্যাগ করিয়া সেখানে পড়িতে যান এবং প্রথম ছুরি দিয়া মড়া কাটেন। প্রথম যেদিন তিনি ছুরি ধরেন, সেদিন নাকি তোপ হইয়াছিল। মধুসূদন পদত্যাগ করিলে বৈদ্যকের ঘর উঠিয়া যায়। বলিতে গেলে' সংস্কৃত পাঠশালায় বৈদ্যকের ঘর হইতেই মেডিকেল কলেজের সৃষ্টি। যাহারা বৈদ্যকের ঘরে পড়িত, তাহাদের একজন সাহেবের কাছে কেমিস্ট্রি পড়িতে হইত, আর মরা পশুর দেহ কাটিয়া এনাটমি শিখিতে হইত; কিন্তু সাহেবের ঘর কলেজের বাড়িতে ছিল না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাড়িভাড়া করিতে হইত। বৈদ্যকের ঘরের সঙ্গে সঙ্গে কেমিস্ট্রি এনাটমিও উঠিয়া গেল।

১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল হইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই গবর্মেণ্টের মতলব হইল দেশে বাংলা-শিক্ষা চালানো। দক্ষিণ-বাংলার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন। তিনি যখন ইন্‌স্পেক্টারের কাজ করিতে যাইতেন, তখন একজন ডেপুটীপ্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিত। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কাজ করিবার ক্ষমতা অসীম ছিল। ইন্‌স্পেক্টারের কাজেও তাঁহার খুব যশ ও সুখ্যাতি হইল। তিনি গবর্মেণ্টের একজন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাথা বেশ পরিষ্কার ছিল। তিনি হাতে-কলমে নিজে কাজ করিতেন বলিয়া অনেক জিনিস তাঁহার উপরওয়ালার চেয়ে ভাল বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে তাহাই লইয়া খুঁটিনাটি আরম্ভ হইল; আর গবর্মেণ্ট বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ইন্‌স্পেক্‌শনের কার্য

সঙ্কোচ করিয়া দিলেন। ইহা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভাল লাগিল না। তিনি পদত্যাগ করিলেন। গবর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—তুমি থাক; কিন্তু তিনি থাকিলেন না। বাংলার প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গবর্নর হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র ফিরাইয়া লইতে বলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—যে-কার্য তিনি মন দিয়া করিতে পারিবেন না, শুধু টাকার জন্য সে-কার্য করিতে তিনি রাজি নন। হ্যালিডে সাহেব বলিলেন—আমি জানি তুমি সব দানধ্যান কর, কিছুই রাখ না। সাত শত টাকা মাহিনার চাকুরি ছাড়িয়া খাইবে কি? বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন—ডাল-ভাত? সাহেব বলিলেন—তাই বা পাইবে কোথা থেকে? তিনি বলিলেন—এখন দুবেলা খাই, তখন না-হয় একবেলা খাব; তাও না জোটে, একদিন অন্তর খাব। তাই বলিয়া যে-কাজে মন বসিতেছে না, সে কাজ করিয়া টাকা লইতে আমি চাই না।*

বিদ্যাসাগরমহাশয় পদত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু গবর্মেণ্ট যখন যে-বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিতেন, তিনি বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরামর্শ দিতেন। সেজন্য গবর্মেণ্টে তাঁহার খুব খাতির ছিল। ১৮৮০ সালে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই করেন।

বিদ্যাসাগরমহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেক গুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারি বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন। এই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী তাঁহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে; ইহা এখনো বর্তমান আছে;—কিন্তু উহার হিসাব রাখার নিয়ম খুব সুন্দর, যখনই যাও, আগের মাস পর্যন্ত যত বই বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই তোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে।

সাংসারিক কাজে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির আর একটি উদাহরণ দিব। বিদ্যাসাগর দেখিতেন—বাড়ির রোজগারী পুরুষ মরিয়া গেলে বিধবার এবং বিধবার ছেলেপুলের বড়ই কষ্ট হয়; তাই তিনি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিয়া

* এ কথাগুলি আমি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নিজমুখে শুনিয়াছি।

হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফণ্ডের সৃষ্টি করেন (১৮৭২)। স্বামী যতদিন জীবিত থাকিবেন—মরিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য কিছু কিছু টাকা ফণ্ডে দিবেন; তিনি মরিয়া গেলে ফন্ড মাসে মাসে স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন তাঁহাকে একটা মাসহারা দিবেন। এইরূপে ভদ্রঘরের কত বিধবা যে এই ফণ্ডের মাসহারা লইয়া জীবনধারণ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি ফণ্ডের এমন বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং এই ষাট বৎসরে এত টাকা জমিয়া গিয়াছে যে তাহার সুদ হইতে ফণ্ডের সমস্ত খরচ চলিয়া যায়, এবং মাসিক চাঁদা সমস্ত জমিয়া যায়। এইরূপে অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে। মূল টাকা গবর্মেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার হাতে থাকে। এ ফণ্ড ফেল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের আর এক কীর্তি সোমপ্রকাশ। বিদ্যাসাগরমহাশয় দেখিয়াছেন—যে সকল বাংলা কাগজ ছিল, তাহাতে নানারকম খবর দিত; ভাল খবর দিত, ভাল খবর থাকিত মন্দ খবরও থাকিত। লোকের কুৎসা করিলে কাগজের প্রসার বাড়িত, অনেক সময় কুৎসা করিয়া তাহারা পয়সাও রোজগার করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোনো কাগজে ইংরেজির মত রাজনীতিচর্চা করা যায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগজের চেহারা ফেরে। তাই তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন;—সোমবারে কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ। যাঁহারা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে কাগজের ভার দিয়া সরিয়া পড়িলেন। বিদ্যা ভূষণ মহাশয় কাগজের সম্পাদকতা করিয়া অনেক অর্থ ও সম্মান উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। যখন ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার কাগজ বন্ধ করিয়া দেন, তারপর অনেকে ধরিয়া-করিয়া কাগজখানিকে আবার খুলিয়া লন।

বিদ্যাসাগরমহাশয় যত বই লিখিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার এক তালিকা দিয়াছেন তাহাতে 'নিষ্কৃতিলাভ' প্রয়াসও ছাড়েন নাই, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'ও ছাড়েন নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বড় বড় দুইখানি বইয়ের নাম তিনি করেন নাই। একখানির নাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য, ১ম ভাগ,' আর একখানির নাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য, ২য় ভাগ।' বহুবিবাহ লইয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতি খুড়োর সঙ্গে তাহার খুব বিচার চলে, সেই সময়ে 'ভাইপোস্য' বাহির হয়। তখন কলিকাতার লোক এই বই দুখানি পড়িয়া হাসিয়া অস্থির হইত। খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন, একটা জবাবের নাম—'লাঠি থাকিলে পড়ে না।' কিন্তু হার খুড়োরই হইল; খুড়ো লিখিতেন সংস্কৃতে; বিদ্যাসাগর লিখিতেন বাংলায়; খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরের বই সবাই পড়িত।

# কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর

'কর্মাটাঁড়' শব্দের অর্থ—করমা নামে একজন সাঁওতাল মাঝি ছিল, তাহার টাঁড় অর্থাৎ উঁচু জমি যাহা বন্যায়ও ডুবিয়া যায় না। এখন কর্মাটাঁড়ে একটি ই. আই আর. লাইনের এই স্টেশন হইয়াছে। উহা জামতাড়া ও মধুপুর স্টেশনের মধ্যে। ১৮৭৮ সালে স্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এক বাংলা ছিল। বাংলাটিতে দুটি হল, চারটি ঘর ও দুটি বারান্ডা ছিল; বাংলার চারিদিকে একটি চারচৌরশ জমি, চার-পাঁচ বিঘা হইবে,—সেইটি বাগান; বাগানটিতে বিদ্যাসাগরমহাশয় নানা দেশ হইতে আঁবের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি লতানে আঁব গাছ ছিল; বিদ্যাসাগরমহাশয় গাছগুলির বিশেষ যত্ন করিতেন। বাগানে আরও নানারকমের গাছ ছিল। বাগানের বাহিরে গোটাকতক সেকেলে অশ্বত্থগাছ ছিল। তখনকার স্টেশন মাস্টারমহাশয় ওখানকার সর্বময় কর্তা ছিলেন I am the monarch of all I survey—বিদ্যাসাগরমহাশয় কর্মাটাঁড়ে যাওয়ায় তাঁহার আধিপত্যের একটু ক্ষতি হইয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগরমহাশয়কে সুনজরে দেখিতেন না। বিদ্যাসাগরমহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন কিছু হইল না, তখন তিনি নন্-কোঅপারেশন করিয়া বসিলেন।

আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই। এখানে আমার সর্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর হইত; সেইজন্য লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যাইবার আট-দশ দিন পূর্বে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি—আমি একটানা লক্ষ্ণৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে একদিন থাকিয়া যাইব। ঠিক দিনে পৌঁছিবার আশায় আমি পথ্য করিয়াই যাত্রা করি; আমার সঙ্গে আমার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি ছেলে ছিল; তাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর, তাই তাহার বাপ আমার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা কর্মাটাঁড়ে পৌঁছিয়া আমাদের মালপত্র স্টেশনমাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বাংলায় গেলাম। প্লাটফরমের নীচেই বাংলা, বাগানের গেটে ঢুকিতেই দেখি, তিনি বাংলার বারান্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি কে? আমি পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন—আমি উহাদের খুব চিনি। ও যে তোমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে এতদূর কেমন করিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। তিনটার পর গাড়ি পৌঁছিয়াছিল;—সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল।

তিনি আমার বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম. এ. ক্লাসেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষচরিতখানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকিটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এতবড় পণ্ডিত হইয়াছে যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?—যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত ও অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময় তিনি আমার ঘরে আসিলেন এবং স্বহস্তে যে-কটি জানালা ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবিকুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি চাবিকুলুপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি দরজাটিও চাবি বন্ধ করিয়া শুইবে, এখানে বড় চোরের ভয়।

পরদিন সকালে তালা খুলিয়া আমি ও সতীশ বাহির হইলাম। বাহির হইয়া যে ঘরে পড়িলাম—দেখিলাম তাহার চারিদিকে ব্রাকেটের ওপর তাক, তাকের নীচে এক জায়গায় দেখি—এক হাঁড়া মতিচুর ও এক হাঁড়া ছানাবড়া বোধ হয় বর্ধমান হইতে আমদানি- হইয়াছে। বিদ্যাসাগরমহাশয় বারাণ্ডায় পায়চারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করিতেছেন। যেভাবে প্রুফগুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রুফ দেখিয়াছেন। আমি বলিলাম —কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইত;—তাই সর্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম —বাপ রে, এই বুড়া বয়সেও ইহার বাংলার ইডিয়মের উপর এত নজর।

রৌদ্র উঠিতে না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমায় পাঁচগণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগরমহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল,—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগরমহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম—বাঃ, এতো বড় আশ্চর্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগরমহাশয় একটু হাসিলেন, তারপর দেখি—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যা-

সাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন—দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।

এইরূপ ভুট্টা কেনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে দুটা কুড়ি-বাইশ বছরের সাঁওতাল ছুঁড়ি আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে। তাহারা উঠানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রকে উঠিল না। আমি বলিলাম—ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া রহিয়াছে, দু-একটা দেন না। তিনি বলিলেন, দূর হ; ওরা কি ওর স্বাদ জানে, না রস জানে? দিলে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। ওদের খাবার হইলেই হইল, ভালমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওর জন্যে আবার আর এক রকমের লোক আছে। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে কোরা বলিয়া এক গ্রাম আছে, সেখানে এক মারহাট্টা রাজা আছে। বারগীর হাঙ্গামার সময় এইখানে উহারা একটি ছোটখাট রাজত্ব করে। এখনও সেখানে অনেক মারহাট্টা আছে; ব্রাহ্মণও আছে, অন্য জাতও আছে। কিন্তু সাঁওতালের সঙ্গে থেকে সাঁওতালের মত হইয়া গিয়াছে। তাদের কেবল ভাল খাবার দিলে তারা এক কামড় খাইয়া দেখে, পরীক্ষা করে, কি কি জিনিসে তৈরি জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে আনানো হয়েছে; তখন আমি বুঝতে পারি, এদের জিব আছে; আর এই এদের কিছুই নেই। মুড়ি চিঁড়াও যেমন খায়, সন্দেশ রসগোল্লাও তেমনি খায়।

আমার কথায় মতিচুর ছানাবড়া দিলেন না দেখিয়া আমি বলিলাম—তবে আমি এক কাজ করি, আমার সঙ্গে কতকগুলা পরশু-ভাজা লুচি আছে, আমি সেগুলি ইহাদিগকে দিয়া দি। তিনি বলিলেন—তোর সঙ্গে আছে নাকি? কই, দেখি। আমি দৌড়িয়া স্টেশনে গিয়া পোঁটলা খুলিয়া কলাপাতায় বাঁধা প্রায় দুদিস্তা লুচি লইয়া আসিলাম। বলিলাম—দুদিন বাঁধা আছে, কলাপাতাগুলা সেদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লুচিতেও কলাপাতার গন্ধ হইয়াছে। বলিয়াই সেগুলা ঐ ছুঁড়িদের দিতে যাইতেছি, বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন; আমায় দে, ওদের কি অমন ক'রে দিতে আছে? বলিয়া লুচিগুলি লইয়া কলাপাত খুলিয়া একটু হাওয়ায় রাখিয়া বলিলেন—এই দেখ কিছু গন্ধ নেই। তার পর মাঝখান হইতে চারখানা লুচি লইয়া বেশ সাবধানে তুলিয়া রাখিলেন। আমি বলিলাম—আপনি ও কি করছেন? তিনি বলিলেন—খাবো রে। তোর মায়ের হাতের ভাজা? আমি বলিলাম—না বড় বউয়ের। তিনি বলিলেন—তবে আরও ভাল। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড় প্রিয়পাত্র ছিল। তার পর উপর হইতে দুখানি লুচি তুলিয়া

সাঁওতালনীদের দিলেন। তারা টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন—দেখ্লি, ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?

ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি—বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম—নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষ বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর-মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম—আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওরে, খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি ক'রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে-খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল দেড়েক হবে। আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম বিদ্যা-সাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন।

বাংলায় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোনো দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোন দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলা শুক্‌না পাতা ও কাঠ। বিদ্যা-সাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেষণ করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্‌না কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়ও—ভারি ফুর্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যেসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যা-সাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিদ্যাসাগর আমাদের স্নানাহার করাইলেন। বিদ্যা-সাগর কখন যে কি খাইলেন এবং কোথায় খাইলেন আমরা তাহা কিছুই টের পাইলাম না। বারটার পর আমরা তাঁহার টেবিলে আসিয়া বসিলাম। তিনি

বলিলেন—তোর জন্যে আমার একটু ভয় হয়েছে। তুই লক্ষ্ণৌয়ে পড়াইতে যাইতেছিস, পারবি কি? আমি বলিলাম—কেন, কিছু ভয়ের কারণ আছে না-কি? তিনি বলিলেন—আছে বইকি। সেখানে পুনো জ্যাঠা বলিয়া এক বাঙালি ছেলে আছে; আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমি যে-কদিন ছিলাম, রাজকুমার সর্বাধিকারীর বাড়িতেই ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে খুব যত্নে রাখিয়াছিল। অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে আসিতেন। একদিন পূর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল—রাজকুমারবাবু, এখানে ত অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোনটি? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে সে বলিল—ওমা, এই বিদ্যাসাগর। উড়ে কামানো-কামানো, পাল্কির নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত অধোবদন, আমিও কতকটা তাই। তারপর কিছু আলাপচারী করিয়া আমায় বলিল—বিদ্যাসাগরমহাশয়, আপনি ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির সিনিয়ার ফেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি। যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায় সেও লেখে I has; যে এন্ট্রাস পাশ করে, সেও লেখে I has; যে এল্. এ পাস করে সেও লেখে —I has; যে বি. এ পাস করে, সেও লেখে I has; যে এম. এ. পাস করে, সেও লেখে—I has; এ জিনিসটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভারসিটির মা-বাপ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে-সময় লাহোর ছাড়া উত্তর-ভারতে আর ইউনিভারসিটি ছিল না। আগরা হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির অধীন ছিল, নাগপুরও ছিল, সিলোনও ছিল। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন—আমি দেখিলাম পুনোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; আমি তাহাকে বলিলাম—পূর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্য আপনাকে দুটি গল্প বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন এরূপ হয়।

প্রথম গল্প।—আপনি জানেন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দুস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন আমাদের একটা সখ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব। আট মূর্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম; বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে একটি গলির মধ্যে দিয়া যাইতে হয়, গলির সুমুখেই আড্ডার দরজা। আমরা গলির আর এক মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন এতোগুলো ফরসা,

কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি খোলায়-ছাওয়া হল। তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না-দিয়ে পালায় সেইজন্য ওই একটি দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেইখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। দেখিলাম প্রায় দুশো আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে; সকলেরই সামনে একটা কল্‌সীর কানা, তার উপর একটা থেলো হুঁকো, নল্‌চেটি ছোট, নলটা খুব লম্বা; নল্‌চের উপর একটা কলিকা, কিন্তু উপরভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোঁয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু নয়,—সামনে মাল্‌সায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে এক টুকরা সোলা ফেলা আছে। ধোঁয়া টানিয়াই এই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম—হলের পূব দিকে সবাই মাটিতে বসিযা গুলি খাইতেছে উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইটের উপর বসিষা আছে। আমরা আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা ইটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন—আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা ইট দেওয়া হইবে। কথাটা শুনিয়া আমাদের যে উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—ওই যে একজন লোক আটখানা ইটের ওপর বসিয়া আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল—৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল—টক্কর দেওয়াত হ'ল না, কিন্তু একবার এইসব গুলিখোরেরা কি গল্প করে শোনা যাক্। তাই আমরা তাহাদের কাছ ঘেঁষিয়া গেলাম। পাছে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে আস্তে কথা কয়, হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম। শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে।

যে একখানি ইটের উপর বসিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল—চানক চানক। গোল করাত—মস্ত গোল, তার ওপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে; ফর ফর ফর ফর করিয়া কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা—এই সব বাহির হইতেছে।

যে দুখানা ইটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল—ও কি কল!

কল ত বরফের। একখানা পাথরের বারকোশ—মস্ত—ঘর-জোড়া, তার ওপর দুখানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরিতেছে। আর সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা সেখানে ফেলিয়া দিতেছে ; কলের দুটো মুখ, একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান খোল বাহির হইতেছে।

তিনখানা ইটের ওপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও-বা কি কল! আকড়ায় দেখিলাম—পাঁজায় পাঁজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইট ঢোলাই করিয়া দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশপাতাল ছাঁক্‌নি। কলের গুঁড়া গিয়া তার উপর পড়িতেছে। কোথাও ১ নং, কোথাও ২ নং, কোথাও ৩ নং সুরকি, কোথাও কুরুই পড়িতেছে।

বিদ্যাসাগর বলিলেন—পূর্ণচন্দ্র, সব গুলিখোরের গল্প দিয়া আমি আর তোমার ধৈর্যচ্যুতি করিব না, শেষ গল্পটা দিয়াই তোমার কথার জবাব দি। যিনি আটখানা ইটের ওপর বসিয়াছিলেন, তিনি কথা না কহিয়াই হাত ঘুরা-ইয়া বলিয়া দিলেন—ওসব কল কিছু না। তিনি বলিলেন—আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও বাড়ি নাই, ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই, সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্যন্ত সব ধুধু করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুরঙ্গ আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ ; একটা দিয়ে পালে পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া গাড়ি গাড়ি গাড়ি আক যাইতেছে; মাটির ভিতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক খুঁজিয়া বুঝিলাম —মাটির ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া রাতাবী, কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাঁচাগোল্লা, কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনটা দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখ সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কি না।

বিদ্যাসাগর বলিলেন—তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মহিনা নিই, পাংখা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি,—দেখাইয়া দিই, এইখানে মাস্টার আছে, এই-খানে পন্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারি হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এন্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল্‌ এ হইয়া, কেহ বি এ. হইয়া, কেহ বা এম্‌. এ হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has ; এক পাকের তৈরি কি না!

দ্বিতীয় গল্প।—পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আপনারা যে ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন, বই, কাগজ, খাতাপত্র

ইন্‌স্‌ট্রুমেণ্ট বক্স, রঙের বাক্স—এই সব কেনান, তাদের শেখান কি ?—দেন কি ?

বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন—পূর্ণবাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান নাই। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা হয় ; ঘর-বাড়ি, মাঠঘাট, ক্ষেত-খামার বাগান-বাগিচা—সব জলে জলময় হইয়া যায়। সেই সময়ে যারা আমাদের গ্রাম থেকে ঘাটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার মর্ম জানে। সব ত জলে জলময়,—কেবল মনের আট্‌কালে রাস্তাটা কোথা দিয়ে ছিল—তারা তাই আঁচিয়া লয় এবং সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। পায়ের তেলো সর্ব্বত্রই ডুবিয়া যায়। ডাঙ্গাজমি দেখা যায় না, তার ওপর কোথাও হাঁটুজল ; কোথাও কোমর জল ; মাঠে এর চেয়ে বেশি জল হয় না ; এই জল কাটাতে কাটাতে প্রায় চার ক্রোশ গিয়া তার একটা বাঁশের টং দেখিতে পায়—জল ছাড়া প্রায় বিশ হাত উঁচু। টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বসিয়া আছেন, একখানা মই তাতে লাগানো। অনেক কষ্টে টঙের কাছে আসিয়া সে মাঝিকে বলিল—মাঝি, আমায় পার ক'রে দাও। সে বলিল—মশাই, আপনি ওপরে আসুন। ওপরে আসিলে সে বলিল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময়ে যাহা রাখেন তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে, তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি বলিল—ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে ; নৌকায় বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নাই ; বন্যার সময় নদীতে লগি দিয়া থাই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওই ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করিয়া বলি—ঐ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাস্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড়গে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও।

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, বুঝা গেল আমাদের গাড়ি আসিতেছে। আমরা উঠিয়া স্টেশনের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারটা চিরদিনই আমাদের মনে গাঁথা থাকিবে। আমরা যেন কোন মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির হইতেছি। দেখুন, প্রায় বাহান্ন বছর পরেও সেদিনের কথা আমার কেমন মনে আছে।

## রুই মাছের মুড়ো

আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, আমরা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নাম খুব শুনিয়াছি। পূজোর সময় শান্তিপুরের কাপড় পাইতাম, তাহার পাড়ে

লেখা থাকিত 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে' দাদারা যে সব বই পড়িতেন, তাতে প্রায়ই লেখা থাকিত 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপ্রণীত।' বাড়িতেও প্রায় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নাম হইত।

একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়েমহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে—'ওমা এমন ত কখনও শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে!' কেউ বলিল—ঘোর কলি! কেউ বলিল—সব একাকার হ'য়ে যাবে; কেউ বলিল—জাতজন্ম আর থাকবে না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কেড়ে খেয়েছে? মা বলিলেন জানিস্ নি? বিদ্যেসাগর। আমি জিজ্ঞেস করলুম—তিনি কি এখানে এসেছেন? মা বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—কাল থেকে এসেছেন।

বাড়ির পুরুষদেরও দেখিলাম সব মুখ ভার। কেউই বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এ ব্যবহারটা পছন্দ করেন নাই। না-করিবারই কথা। কেন-না সেই বৎসরই প্রথম বর্ষায় একদিন আমার দাদা, আমার নূতন ভগ্নীপতি এবং আমার এক জেঠতুত ভাই—তিনজনে গোয়ালঘরে লুকিয়ে মুসুরডালের খিচুড়ি রেঁধে খেয়েছিলেন—এই অপরাধে বাড়ির বুড়োকর্তা তিনজনকেই বাড়ি থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন;—তারা এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় শুইয়া থাকিত; বাড়ি থেকে ভাত বহিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া আসিতে হইত। ক্রমে মা'র অত্যন্ত সাধ্যসাধনায় বুড়োকর্তা বৈধ গঙ্গাস্নান করাইয়া আমার ভগ্নীপতিকে প্রায় পনর দিন পরে বাড়ি আসিতে দিলেন। বাকি দুজনের আরও ১৫ দিন লাগিয়াছিল। সে-বাড়ির লোকে মেয়ে-পুরুষে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এই ব্যবহারে যে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন, সে কথা কি আর বলিতে।

যাহা হউক, সেইদিন বৈকালে বাবা টোলে যান নাই, বাড়ির একটা ছাতে বসিয়া পুঁথি দেখিতেছিলেন; আমরাও ছাতে খেলা করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম—দু'জন ভদ্রলোক বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। একজনের গায়ে ধবধবে বিছানার চাদর, পায়ে তালতলার চটি, গায়ে একটা চৌ-বন্দি হাতকাটা ফতুয়া। শুনিলাম ইনিই বিদ্যাসাগর। সঙ্গের লোকটি কে—সে খবর পাইলাম না। বাবা তাঁহাদিগকে এক একটি মাদুর পাতিয়া দিলেন, তাঁহারা বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা গল্প করিলেন। কত কি কথা হইল, আমরা বড়-কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দুটি ঘরের দরজা দিয়া ছাতে যাওয়া যাইত। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগরকে দেখিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হব হব সময় তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। শুনিলাম তিনি অমৃতলাল মিত্রের বৈঠকখানার পাশে বাঁড়ুজ্জেদের চণ্ডীমণ্ডপে স্কুল বসাইয়া গিয়াছেন।

## অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট'

১৮৮৮ কি ৮৯ সালে আমি একদিন বিদ্যাসাগরমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি একাই আছেন। তখন তিনি বৃন্দাবন মল্লিক লেনে নিজ বাড়িতেই থাকেন। বাড়ির উত্তর দিকে দোতালাতে যে তিনটি ঘর ছিল, তাহার পশ্চিমের ঘরে তিনি বসিয়া ছিলেন। কথা উঠিল—বঙ্কিম বেশি সংস্কৃত লেখেন, না বিদ্যাসাগর লেখেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন—বারাসতে কালীকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ি একদিন এই কথা উঠিয়াছিল। তাহার পর বলিলেন—ছাপাখানায় 'এম' কা'কে বলে তুই জানিস? আমি বললাম—না। তিনি আমাকে 'এম' বুঝাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বঙ্কিমের একখানা ও আমার একখানা বই আনিলেন। আমার বইয়ে যতগুলো 'এম্' ছিল বঙ্কিমের বইয়েও ততগুলো 'এম্' লইলেন। তাহার পর কথা গণিতে লাগিলেন। আমার সেটুকুতে ৫৫টা সংস্কৃত কথা ছিল, আর বঙ্কিমের ৬৫টা। আমি কালীকৃষ্ণবাবুকে দেখাইয়া দিলাম—এই ত, কার সংস্কৃত বেশি দেখ; তার ওপর আমি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আর উনি অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দেখিলাম, বিদ্যাসাগরমহাশয় একটু বিচলিত হইয়াছেন। কথাটা চাপা দিবার জন্য আমি বলিলাম—চলতি ভাষায় বই লেখা কি আপনার মত' নয়? তিনি বলিলেন—ভাষাটা ত মার্জিত হওয়া চাই। আমি বলিলাম—কিন্তু চলতি ভাষাতেও খুব ভাল ভাল বই হতে পারে এবং তা লোকে পড়েও খুব খুশি হয়। তখন আমি তাঁহাকে 'বিবাহ-বিভ্রাট' নামক নাটকের ২য় গর্ভাঙ্কটি যতদূর মুখস্থ ছিল, আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের হাসি একটু বিচিত্র ছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে নুগিয়া পড়তেন। এক এক সময় মনে হইত, তিনি বুঝি-বা চেয়ার হইতে পড়িয়া যান। তিনি অনেকবার নুগিয়া নুগিয়া পড়িলেন। যে-সকল জায়গায় হাসির কথা আছে সে-সব জায়গায় তিনি খুব enjoy করিলেন। যথা—

'নন্দ। আহা, গৌরীবাবুর কি অদৃষ্ট!

বিলাসিনী। কি, jealousy হয় নাকি?

নন্দ। কার না হয়? আমি বিলেত থেকে ফেরা [illegible] যদি আপনি মিস্ থাক্‌তেন?

বিলাসিনী। Wifeও widow হয়।

নন্দ। Would to God। সেকি হবে?

বিলাসিনী। আপনি সায়েন্স পড়েছেন, God বল্‌লেন যে? God মানেন না কি?

নন্দ। রাম! ওটা কথার কথা বললেম। যেদিন গ্যানো কিনেছি, সেইদিনই বুঝেছি—God নেই।'

ক্রমে আমার গর্ভাঙ্ক ফুরাইয়া আসিল। শেষ বেহারার প্রবেশ—

'বেহারা। বহু মহারাজ।

বিলাসিনী। বাবু কেয়া করতা?

বেহারা। মসেলা পিস্‌তা।'

গর্ভাঙ্ক শেষ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের হাসিও ফুরাইল। আমি তখন মনে করিলাম—বিদ্যাসাগরমহাশয় একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে এ-রকম ফাজ্‌লামোটা ভাল হয় নাই। তিনিও তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়াই বলিলেন—এ বই কার লেখা? আমি বলিলাম, গ্রন্থকার কে আমি জানি না। শুনিলাম তিনি বাগবাজারের থিয়েটারপার্টির একজন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন? আপনার এ বই ভাল লাগলো? তিনি বলিলেন—খুব। আমি বলিলাম—তবে আপনাকে একখানি বই আনাইয়া দিব। পরের দিন দোকানে দোকানে ঘুরিয়া একখানি বই সংগ্রহ করিলাম। বইখানি লইয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বাড়ি গেলাম। দেখিলাম—টেবিলের উপরে রাশীকৃত বই, কাগজ ছড়ানো রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—বই এনেছিস নাকি? আমি বইখানি তাঁহার সামনে রাখিলাম। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন—বইখানা রেখে যা। তোর সঙ্গে আজ আর পড়ে উঠতে পাচ্ছি না। আজ ভারী ব্যস্ত।

কি করি। অত্যন্ত মনমরা হইয়া সেদিন ফিরিয়া আসিলাম।

## শেষ অবস্থা

১৮৯১ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে আমি শুনিলাম—বিদ্যাসাগর-মহাশয় হাওয়া-বদলির জন্য ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে একটি বাড়িতে আছেন। ফরাসডাঙ্গায় গবর্মেণ্ট হাউসের দক্ষিণে কতকগুলি বাড়ি আছে, একেবারে গঙ্গার ওপরেই। অনেক কলিকাতার লোক সেখানে হাওয়া বদল করিতে যায়। এবার বিদ্যাসাগরমহাশয় উহারই একটি বাড়িতে ছিলেন। আমার তখন সাধ হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগরমহাশয় যখন এত কাছে আছেন, তখন একদিন তাঁহাকে বাড়িতে আনিয়া তাঁহার পদধূলি লইব। তাই আমি একখানি নৌকা করিয়া ফরাসডাঙ্গার দিকে গেলাম; নৌকায় উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল যে আতপুরের মুখুজ্জেদের ইটখোলায় গিয়া একটা কথা বলিয়া আসি। তাই আগে আতপুরে গেলাম, পরে সেখান হইতে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বাড়ি গেলাম। তাঁহার বাড়ির সামনে গঙ্গার চড়ায় বিস্তর ইট পড়িয়াছিল; রাস্তা ছিল না, ইটের উপর দিয়া অতি কষ্টে যাইতে হইত। নৌকা হইতে নামিয়া দেখিলাম—সামনের বাড়িতে বারাণ্ডায় বিদ্যাসাগরমহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন,

—আমার নৌকাখানা ও ইটের উপর দিয়া আমার যাওয়ার কষ্টটা দেখিতেছেন। আমি তাঁহার কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকিয়া এদিক-ওদিক বেড়াইতেছি, তিনি উপর হইতে বলিলেন—ঘরের ভেতর ঢোক না, উহার ভিতর সিঁড়ি আছে। আমি উপরে উঠিয়া দেখি বিদ্যাসাগরমহাশয় দাঁড়াইয়াই আছেন; টেবিলের কাছে চেয়ারে একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটিকে কোথায় দেখিয়াছি দেখিয়াছি মনে হইল;—দুচারটি কথায় বুঝিতে পারিলাম তিনি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। বুঝিলাম—তিনি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কলেজে চাকরি চান। বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহার সহিত যেরূপভাবে কথা বলিতেছেন, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহাকে স্নেহও করেন, সম্ভ্রমও করেন। তাঁহার সহিত বন্দোবস্তও হইল, তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজি পড়াইবেন, বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহাকে ২০০৲ টাকা মাহিনা দেবেন। কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল, তিনি উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—তা হবে না, কিছু খেয়ে যেতে হবে। বলিয়াই পিছনের হলঘরে ঢুকিলেন। দেখিলাম সেখানে পাঁচ-সাতটি কাঁচের আলমারি আছে, প্রত্যেক তাকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আঁব। বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহাকে একখানি আসনে বসাইয়া সামনে একখানি রেকাবি দিয়া নিজে ছুরি দিয়া আঁব কাটিতে বসিলেন। একবার এ-আঁবের এক চাক্‌লা দেন, একবার ও-আঁবের এক চাক্‌লা দেন,—পাঁচ-সাত রকমের আঁব তাঁহাকে খাওয়াইলেন। কর্মাটাঁড়ে ভুট্টা দেখিয়াছিলাম, এখানে দেখিলাম আঁব।

আশুবাবু উঠিয়া গেলে বিদ্যাসাগরমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কোথা এসেছিলি? আমি বলিলাম—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করিয়াছি, যদি আপনার পায়ের ধূলা আমার বাড়িতে পড়ে। বিদ্যাসাগর বলিলেন—কিন্তু তুই যে এদিক দিয়ে এলি? আমি ভাবিলাম—দুষ্টু বুড়া তাও দেখিয়াছে। বলিলাম—আপনার এখানে আসিব বলিয়াই বাহির হইয়াছিলাম, পথে একটা কথা মনে হওয়ায় মুখুজ্জেদের ইটখোলায় গিয়াছিলাম। তা আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কৃতার্থ হব। তিনি বলিলেন—কেন? তুই আমাকে ঘটা করিয়া খাওয়াইবি নাকি? আমি বলিলাম—সে ভাগ্য কি আমার হবে? তিনি বলিলেন—তাই ত আমি বলিতেছিলাম; আমি কি খাই তা জানিস? বেলশুঁঠোর সঙ্গে বার্লি সেদ্ধ করে তাই একটু একটু খাই। তবে যে এই আঁব দেখছিস্, ও আমার জন্যে নয়। যে নিজে কিছু খেতে পারে না, অন্যকে খাইয়েই তার তৃপ্তি। তাই ত আশুকে অত করে নিজে হাতে আঁব খাওয়াচ্ছিলাম। যাহোক, তুই এসেছিস্, ভালই হয়েছে। কিন্তু আমি তোকে জিজ্ঞাসা করবো না, তোর বাড়ির কে কেমন আছে, হয়ত তুই বলবি—অমুক মারা গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে, এসব কথা শুনতে আর আমার ইচ্ছে হয় না। আমার বড় কষ্ট হয়। আমি বলিলাম; ঈশ্বরের ইচ্ছায়

আমাদের ওখানকার সব সংবাদই ভাল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়িতে পায়ের ধুলোর কথা বলছিলি. তোরা কি নতুন বাড়ি করেছিস্ না কি? আমি বলিলাম—একটু কুঁড়ে বেঁধেছি বইকি। তিনি বলিলেন—আমি গেলে আমায় কি খাওয়াইতিস্? আমি বলিলাম—বাড়ির মেয়েরা স্বহস্তে পাক করিয়া কি খাওয়াইত, তা জানি না, আমাদের দেশের দুটো ভাল জিনিস আছে, আমি মনে করেছিলাম তাই খাওয়াব। তিনি বলিলেন—কি কি? আমি বলিলাম—নৈহাটির গজা আর রসমুণ্ডি। তিনি বলিলেন—আচ্ছা তা তবে আনিস্। আমি বলিলাম--আপনি যখন আনিস্ বললেন, তখন শুভস্য শীঘ্রং—আমি আসছে রবিবারেই লইয়া আসিব। তারপর আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, আশুবাবুসম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। এক জন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ কেমন করিয়া বহিয়া যায়, আশুবাবু তাহার একজন নিদর্শন। উনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই লোকে উহার বিদ্যার সুখ্যাতি করে, কিন্তু স্বভাবের নিন্দা করে। আমি বলিলাম—যদি উনি নিবৃত্তিপ্রবৃত্তি করিয়া আপনার কলেজে থাকেন, আপনার কলেজেরও মঙ্গল, ওঁরও মঙ্গল। তিনি বলিলেন—তাই ত আমি ওকে নিলাম ও একেবারে ২০০ টাকা দিতে রাজি হলাম।

সেদিন সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া আমি আসিয়া নৌকায় উঠিলাম, এবং বাড়ি আসিয়াই রসমুণ্ডি ও গজার ফরমাস দিলাম। পরের রবিবারে ঐ দুটি জিনিস লইয়া আমি আবার নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ি গেলাম। গিয়া দেখি তাঁহার ছোট জামাই শরৎ বাড়ির সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বিদ্যাসাগরমহাশয় কোথা। সে বলিল—জরুরি কাজ পড়ায় কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। আমি হতাশ হইয়া পড়িলে শরৎ বলিল—আপনি কি তার জন্যে কিছু খাবার এনেছিলেন না-কি? আমি বলিলাম—হাঁ, এনেছি বইকি? সে বলিল—তিনি ত আর খান না। আমরাই খাই, এটাও আমাদের দিয়ে যান। কারণ তিনি ত খাওয়াইয়াই খুশি। আমি বলিলাম—ভাল, তাই-সই। নৌকায় আছে, নাও। শরৎ হাঁড়ি দুটি লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল, আমিও ফিরিয়া আসিয়া নৌকায় বসিলাম। মনটা বড় খারাপ হইল। সোমবারে কলিকাতায় আসিলাম। বৃহস্পতিবারে সকালে শুনিলাম—বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বহুতর লোক খালি-পায়ে তাঁহার বাড়িতে যাইতেছে। আমিও তাহাই করিলাম। দেখিলাম—তাঁহার বাড়িতে অনেক লোক। সকলেই উৎসুক হইয়া শুনিতেছে—কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল, কেমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল, কোথায় কোথায় তাঁহার খাট নামানো হইল। আমিও একমনে তাহাই শুনিতে লাগিলাম। সেখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সেজভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনিই আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়া আসেন, প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবুর কাছে আমাকে চিনাইয়া দিয়া আসেন এবং

দশ-পনর দিন সকালে আমার পড়া বলিয়া দিয়া আমায় যথেষ্ট উপকার করেন। তিনি দাদার মৃত্যুতে বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু তাঁহার কান্না থামিল না।[১]

---

১. এই লেখাটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' (বৈশাখ ১৩৩৮) বইয়ের ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) সংস্কৃত শাস্ত্রে, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বৌদ্ধ দর্শন ও ইতিহাসে পন্ডিত; ইংরেজি ও বাংলায় সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হয়ে মুখের কথ্য ভাষায় বাংলা লিখতেন, এই কারণেই বঙ্কিমের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অতিরিক্ত মুখের ভাষার কাছাকাছি আসতে গিয়ে ভাষার শুদ্ধতা তিনি রক্ষা করতেন না। এই বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের উপন্যাসের সংলাপেও লক্ষ করি: 'বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়িতে আছেন, তোমাকে একবার দেখবার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা! হাজার হোক্ শাশুড়ি। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নির কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়া এস না?' (বিষবৃক্ষ)। 'বলিলাম—আপনার এখানে আসিব বলিয়াই বাহির হইয়াছিলাম, পথে একটা কথা মনে হওয়ায় মুখুজ্জেদের ইটখোলায় গিয়াছিলাম। তা আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কৃতার্থ হব।' শেষ অবস্থা, (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)! ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এই জাতীয় মিশ্রণ প্রায় সকলের মধ্যেই। ব্যতিক্রম বিদ্যাসাগরের বর্ণনায় ও সংলাপে, কোথাও বিসদৃশ মিশ্রণ নেই, দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় এই শুদ্ধতা। এই শুদ্ধতাই রক্ষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে।

হরপ্রসাদের রচনার কথ্য ভাষার জীবন্ত রূপের মধ্যে হাল্‌কা লঘু চালও লক্ষণীয়। কিন্তু তথ্যে ঘটনায় বাস্তবতায় এই রচনার মূল্য। কার্মাটাঁড়ের ঘটনা অন্য কারো লেখায় এতো জীবন্ত পাওয়া যায় না, সেদিক থেকে অনন্য। এবং পুনোজ্যাঠার কাহিনীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্ছৃঙ্খল সমাজের রূপই বিদ্যাসাগরের মুখ দিয়ে হরপ্রসাদ বর্ণনা করেছেন, এ বর্ণনা অন্য কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাবচরিত্রের ইঙ্গিতও অর্থবহ। সেই দিক থেকে এটি মূল্যবান দলিল।

—বাণিক রায়

# বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে

## কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

তিনি বলিলেন—'কথাবার্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ডাঃ জন্‌সন্‌সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গমগমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না। তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগরমহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমনকি বাঙ্গালা slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া' ( to be confounded ) 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও,, 'বিধঘুটে', 'বাহবা-লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত, যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণত ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালোবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগরমহাশয় যে-ভাষার উপরে আপনার style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি এই বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে তিনিও সেই অর্থে সর্বদাই ব্যবহার করিতেন; অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না—ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না, উহা একেবারে ভুল।

'একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে তিনি একটা বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা।' এই শব্দটি ন্যায়শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দটির ইংরাজিতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness *per se* যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই ঃ—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার' ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমরা একদেশের লোক, এক জাত,

এই শহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা করলেই পারতেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি ; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপ-যোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।'—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।

'আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগরমহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন ; —'এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে নীলাম্বরের বাড়িতে বিদ্যাসাগরমহাশয়কে এই হিন্দুস্থানী পণ্ডিতটির কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

'তিনি বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লেখা অসম্ভব, যাহা লেখা যায় সবই গোঁজামিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাই সর্বোৎকৃষ্ট ; তিনি 'উত্তরচরিত,' 'শকুন্তলা' ও 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন। তাহা অতি সুন্দর, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হয়।

'একদিন কালিদাস ও শেক্সপিয়র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন, একথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেমবাবুর 'ভারতের কালিদাস জগতের তুমি' এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না।' আমি তাঁহাকে ঠান্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে হেমবাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কথাটা তাঁহার মনে লাগিল। আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—'বটেই ত, খেতে, বসতে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।'

'বিদ্যাসাগরের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যগঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা

করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousyস ম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎ সংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে; নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশংকর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের—এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত; তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন; একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

'শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; ল্যাটিন ও গ্রীক জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্য দর্পণ'কারের ভাষায় ভরত-শিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গঃ (the fancy man of eighteen courtesans of languages)। শ্যামাচরণবাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন। শ্যামাচরণবাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণবাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না। ইহার পরে Hindu Law সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য হাইকোর্টের জজরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজি তর্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন। Encyclopaedia-তে ইংরাজি ও বাঙ্গালা পাশাপাশি ছাপা হইয়াছিল। ইংরাজি তাঁহার নিজের রচনা ছিল না। বামপৃষ্ঠে কোনাও ইংরাজি গ্রন্থ, দক্ষিণ পৃষ্ঠে তাঁহার রচিত বাঙ্গালা অনুবাদ, এই প্রণালীতে ঐ পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না; কেবল বলিতেন, 'লোকটার রকম দেখছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।'

'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটি ইংরাজিতে একজন ধনুর্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি। যদি কিছু আমার জানা শুনা থাকে তা' সংস্কৃতশাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন,—'বাস্ রে; ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে!' এইরূপ কোনও এক আসরে

বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্বোধও নেই', তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য; তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দিকে দেদীপ্যমান; কিন্তু তোমাদিগকে নির্বোধ এই জন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।' রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' কোথায় ভাসিয়া গেল।

ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগরমহাশয় ভাবিতেন সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন,—'অক্ষয় লিখ্‌তে-টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে-শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

* * *

'বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি car cature করিতেন,—

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

'তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না; কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature, যে revolution-এর চূড়ান্ত হইল Wordsworth-এ। Edinburgh Review Wordsworth-কে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—'This will never do।' কিন্তু কবি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।

'বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না। আমার দাদার বেকনও তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট ছোট সাধারণ বাঙ্গালা কথা ছিল। আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁহার bigotry, তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে

তাঁহার অনবরতবিগলিতবাষ্পাকুলিতলোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গহস্ত।

পরগুণপরমাণূন্ পর্বতীকৃত্য নিত্যং
নিজহৃদিবিকশন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।

এই দুই ছত্রে 'ভাবিনীবিলাস'-এর কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে উদারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের সে উদারতা কোথায়? পরগুণের পরমাণু-গুলিকে পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলা ত দূরের কথা, তিনি ইংরাজিশিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

'বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন; 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।

'কিন্তু আমিই সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সাধারণ্যে সমর্থন করি। একথা আমার জোর করিয়া বলার কারণ আছে। যখন আমি রিপন কলেজে কাজ করি, একদিন আমার একটি পুরাতন ছাত্র—স্বর্গত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্ট—আমার সহিত কলেজে দেখা করিতে আসিলেন। তখন আমি বিদ্যাসাগরের ভাষার একটু তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন; 'সে কি মশাই? আমরা যখন আপনার কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালা পড়িতাম, তখন তো আপনিই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতার চলিত কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।' আমি হাসিয়া বলিলাম; 'বটে? তা সে কথাও ত ঠিক।'

*    *    *

'বিদ্যাসাগরমহাশয়কে তিনি কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। পাইকপাড়ার রাজা তাঁহার কথায় উঠিতে বসিতেন; তাঁহার কথায়, কোনও security না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ দিয়াছিলেন, বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন,—'আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, একথা পূর্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে কিছু রাখিতাম। নগদ টাকা সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।' সাহিত্যের দিক দিয়া যদি দেখ, তাহা হইলে,

দেখিতে পাইবে যে, এই পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদনের প্রথম ও প্রধান patron ছিলেন। তাঁহাদের রাজবাটীতে 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়।'

'বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙালির চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে-সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে-সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন। 'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙালি মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিসের মূল্য হয় না।

'আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙালির 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশি প্রতিপত্তি হয়। পূর্বে আমি যে তাঁহার literary jealousy-র কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, একথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্বল্য ছিল, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। 'সাহেবদের' নিকট পশার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে 'সাহেবসমাজে' যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

* * *

তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' অবশ্যই প্রতিভার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গ্রন্থখানির মূল্য আছে। রচনাসম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সংস্কৃতবহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয়, ১৮৫৪/৫৫ খ্রীস্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। একটা প্রবন্ধের মধ্যে Xenophon থেকে ভাঙা এই শব্দযোজনা ছিল। বিদ্যাসাগর হাসিতেন। 'মাসিক পত্রিকা'র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ সেই tendency চূড়ান্ত করিয়া যান। তাহার পরে যখন দুই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য সংঘটিত হইল, বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন বল সঞ্চয় করিল। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই আমাদের সাহিত্যের ভাষায় সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন।

*   *   *

বিদ্যাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি এই একটানা কুরুচির স্রোতের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারেন? নব্যদলের মধ্যে তাঁহার পশার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন বুনিয়াদী বড় লোকের আসরে তিনি কি করিতে পারেন? তথায় সুরুচির দোহাই দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইত।

কিন্তু unconsciously সাহিত্যে উৎকট কুরুচি হইতে সুরুচির দিকে যে transition আরম্ভ হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর তাহাতে কতকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। সচেষ্টভাবে একটা reform movement যে করিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। এই transition-এর ইতিহাস চাহ? ইতিহাস দিতে পারিব না, তবে কয়েকটি কথা বলিতে পারি।

বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খাতির হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন; সমাজের কুরুচি ব্যাধি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মার্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। অত কথায় কাজ কি, স্বভাব কবি ধীরাজ বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল সে গানটি এত রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকাইয়া বলিতেন; 'ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত। সেই যে, 'বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,' ধীরাজ অমনি সভার মধ্যে গান ধরিত,—

বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,<br>
পরাশরের * * * * দিয়েছে।'

গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসেবে অপাঠ্য অশ্রাব্য। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সে সময়ে সমাজের বায়ু কিরূপ দূষিত ছিল। কোঁৎ যে intellectual sanitation-এর কথা বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সে দিকে কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সময় যে নব্যযুবক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা সবল ও পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছিল। কেশব সেন যখন আসিলেন, তখন transition হইয়া গিয়াছে।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার গভর্মেণ্ট যখন আরব্ধ হইল, তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে ঝুঁকিল, সভায়, debating club-এ, বৈঠকখানার আসরে রাজনীতির চর্চা হইতে লাগিল। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে আমি যখন

Presidency College-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি তখন আমাদের একটা debating club ছিল।[১]

* * *

'এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা যায়। আমি দেখিতেছি, এক্ষণে উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যেও সনাতন ধর্মের দিকে যে একটা reaction আসিয়া জুটিয়াছে তাহার প্রভাবে বিধবাবিবাহের প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আরও এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোঁতের দলও সেই বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করেন। এস্থলে বক্তব্য যে কোঁতের বিবিধ apercu এর মধ্যে একটি apercu আছে তাহার নাম তিনি দিয়াছেন বিশুদ্ধ বিবাহ—chaste marriage।'

* * *

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—'তোমার মুখে আমি শুনিতেছি যে, কেহ কেহ বলিতেছেন, বিদ্যাসাগরের প্রতি আমার কিছু আন্তরিক আক্রোশ আছে: সেই কারণেই আমি তাঁহার সম্বন্ধে ২।১ টি কথা এরূপ বলিয়াছি যাহাতে তাঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ reflection হয়। আমি আপনি ত বুঝিতে পারি না, এমন কি কি কথা বলিয়াছি। আমি মনে মনে জানি যে, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত, এবং তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও ঔদার্য সর্বাঙ্গীণ বলিয়া স্বীকার করি। তবে হয়ত দুই একবার তোমাকে বলিয়াছি যে, He could not bear a brother near the throne, কিন্তু এই সামান্য দুর্বলতাটুকু পৃথিবীর বিস্তর বড়লোকের চরিত্রে দেখা যায়। বড়লোকের স্বভাবে, বিশেষত যাঁহারা বিশিষ্ট বড়লোক তাঁহাদিগের স্বভাবে এ দুর্বলতাটুকু হইবে বলিয়া যেন বিধিনির্বন্ধ আছে। যাঁহারা বিশিষ্ট বড় লোক, তাঁহারা নিজের ভাবভঙ্গি লইয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, অন্য ধরনের ভাবভঙ্গি উৎকৃষ্ট হইলেও উহা appreciate করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না। এই নিমিত্তই বোধ হয় মেকলে স্থলবিশেষে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহারা পরের লেখা বিষয়ে ভাল সমালোচক হয়েন না—'Great authors are seldom good critics'. মাঝামাঝি গোছের বুঝদার লোক হইলে সমালোচক ভাল হয়। ইহা যেন হইবারই কথা। সুতরাং বিদ্যাসাগর-মহাশয় একটা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম যে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আর আক্রোশের কথা যে বলিতেছ, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে নির্বুদ্ধিতাবশত আমি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের

---

১. বিদ্যাসাগর কখনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান নি তাঁর সারা জীবনে; এইখানেই মনে হয়, তখনকার প্রগতিবাদী যুগ থেকে তিনি কিছুটা বিচ্ছিন্ন।—বার্ণিক রায়

নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সে বিপ্রকৃষ্ট ভাব (distance) নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াও ঘুচাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তুমি জান, তোমাকেই আমি পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, আমার জীবনের পূর্বোক্ত ঘটনাসম্বন্ধে আমারই সম্পূর্ণ ভুল এবং তিনি সম্পূর্ণ ঠিক, ইহা আমি ঘটনার দুই এক বৎসর পরেই কথা উঠিলেই সকলের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম এবং এখনও করি। আমি কায়মনোবাক্যে বুঝি যে, তিনি আমার ভালই করিয়াছিলেন। সুতরাং সে আক্রোশের লেশমাত্র এক্ষণে আমার মনে নাই এবং তৎপ্রবর্তিত হইয়া কিছুমাত্র মালিন্য মনে ধারণ করিও না এবং কোনও বিরুদ্ধ কথাও আমার মুখে আসে না।'

কথাটা অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য আমি বলিলাম ; দেখুন, বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরপয়ার ছন্দে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বহুকাল পরে মাসিক পত্রিকায় সাবেক ধরনের পয়ার পাইয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমার মনে হয় আবার কিছুদিন খাঁটি নির্ভাজ পয়ার যদি আমাদের কবিরা চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্তত আর কিছু না হউক, মুখ বদলান হয়।'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—'তোমার কথায় বিদ্যাসাগরকে মনে পড়িল। বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগপূর্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যাবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা।'

'আমার বিশ্বাস মদনমোহনের 'বাসবদত্তা' তাঁহার পঠদ্দশায় বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'রসতরঙ্গিণী'নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পদ্য ও গদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল। আমি তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, আমার মনে হয়, তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসাপুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা-নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল

বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোলতা হইতে পারিল না।

'বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যাবুদ্ধিসম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমানজমিন্ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়ত vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হযেন কি না সন্দেহ।

'বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরে'র খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাব প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন; কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি শেক্সপিয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিযা দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।'

'বিদ্যাসাগর এ দিকে পাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সাংসারিক লোকজ্ঞতা এবং সাধারণ বিষয়বুদ্ধি বড় কম ছিল না। একসময়ে শ্রীহট্ট জিলা-নিবাসী কোনও এক ব্যক্তি চাকরির প্রার্থনায় তাঁহার শরণাগত হয়। অন্তত তিনি সুপারিশ দিয়া তাহাকে কোথাও একটা চাকরি করিয়া দেন, সে এ প্রকার বাঞ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের বড় চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন। নিজের চাকরি দিবার ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না, আর সুপারিশের দ্বারা যে চাকরি দিতে পারিবেন এ ভরসাও তিনি বড় করিতেন না। উমেদারটি নিজের কার্যসিদ্ধি ও বিদ্যাসাগরের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট সিলেটি পাটি উপহার দিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে কিন্তু উহা লইতে চাহেন নাই; উমেদারের পীড়াপীড়িতে শেষে লইলেন। আমার নিকট এই গল্প করিবার সময় বিদ্যাসাগর কহিলেন; 'আমি বেশ বুঝলুম যে, চাকরি না হোলে উমেদার পাটির দাম চা'বে। এই ভেবে আমি সে পাটি ব্যবহার করলুম না, তুলে রাখলুম। ফলে আমি যা ভেবেছিলুম তাই ঘটল। উমেদার যখন কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করে চাকরির বিষয়ে হতাশ্বাস হোলো, তখন বিদায় নেবার সময় বল্লে, 'মশাই পাটির দামটা পেলে ভাল হয়।' আমি বল্লুম; বাপু, তোমার পাটি একদিনের জন্যেও ব্যবহার করি নি; ঐ

দেখ, তোলা রয়েছে ; তুমি ফেরত নিয়ে যাও।' উমেদার কতকটা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে পাটি নিয়ে বিদায় হোলো।

'সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের প্রতি শেষাশেষি, বিশেষত বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর, বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছিল। আমি বড় বড় দিগ্‌গজ অধ্যাপকদিগের বিষয় বলিতেছি না ; তাঁহাদিগকে তিনি যাবজ্জীবন পূজনীয় জ্ঞান করিতেন, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং অকাতরে অর্থদানও করিতেন। কিন্তু যাঁহারা দু' দশ পাতা সংস্কৃত পড়িয়া ডেঁপোমি করিয়া বেড়ান, এবং বিদায়ের লোভে চারিদিকে হাঁটাহাঁটি করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ইদানীং 'ল্যাজকাটা' বা 'টিকিদাস' এ ছাড়া অন্য নাম দিতেন না। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে—'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং' ; এই শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিয়া একটি পরিহাসের ব্যাখ্যা লালমোহন-নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়াছিলেন। লালমোহন প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তারের ভ্রাতা ছিলেন, সহোদর কিনা ঠিক বলিতে পারি না। অর্থটা হইল এই—পণ্ডিতের সবই গুণ, দোষের মধ্যে খালি মূর্খ। বিদ্যাসাগর এই পরিহাসের ব্যাখ্যাটি লইয়া সর্বদাই আমোদ করিতেন এবং বলিতেন যে লালমোহন শ্লোকের অর্থটা ঠিকই করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর অশ্রদ্ধা হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমে অনেকে তাঁহার পক্ষে সায় দিয়া শেষে অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে বিপক্ষের দলে মিশিয়া গেল। ইহাতে তিনি ঐ পণ্ডিত-জাতির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।

'প্রথম বয়সে বিদ্যাসাগরের দেহটি বেশ মজবুত ছিল। আকার খর্ব বটে, কিন্তু এ দিকে খুব গ্যাট্টাগোঁট্টা, যাহাকে সংস্কৃতে 'অবষ্টব্ধ' বলে, সেই গোছের ছিল। তিনি শারীরিক পরিশ্রমও খুব করিতে পারিতেন, এবং খুব পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে ; কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া সদ্যাই হাঁটাপথে বাড়ি পোঁছিতেন। পায়ে কেবল এক চটি জুতা ; হয় ত বার আনা পথ শুধু পায়েই যাইতেন, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নরৌদ্রও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই হাঁটাপথে যাইবার সময়ে একদিনের একটি বৃত্তান্তের গল্প অতি করুণ-ভাবে তিনি বলিতেন। তিনি বলিতেন ; 'আমি একদিন বাড়ি যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্যে একটি খোড়ো বাড়ির বাহিরের রোয়াকে বোসে আছি, এমন সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে দুটি দুই তিন ছেলে নাচতে নাচতে আর গানের সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে, আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি ত দেখে শুনে অবাক্। ভাবলুম যে, এদের এত দুরবস্থা যে বছরের মধ্যে পাল পার্বণের মত দু'এক দিন ডাল রান্না খেতে পায়! আর বোধ হয় এমন অনেকেই আছে।' এই গল্প করিতে করিতে কখনও তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত।

'তারানাথ তর্কবাচস্পতিমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রকার গ্যাঁট্টাগোঁট্টা শরীরের জন্য তাঁহারা উঁহাকে 'ঢিপুলে' বলিয়া ডাকিতেন; এবং বিদ্যাসাগর যখন কোনও একটা শাস্ত্রের—বিশেষত স্মৃতিশাস্ত্রের ভালরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তখন তাঁহারা বলিতেন 'আমাদের ঢিপুলে না হোলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।'

'বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন তর্ক-বাচস্পতিমহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, 'শূদ্রস্য ভার্যা শূদ্রৈব সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে' এই মনুবচনের বিদ্যাসাগর যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সম্পূর্ণসম্মত। শেষে কিন্তু তর্কবাচস্পতিমহাশয় বহুবিবাহের সমর্থনপক্ষে লেখনী ধারণ করিলেন, এবং এবং বিদ্যাসাগরের সহিত বাদানুবাদে (controversy) প্রবৃত্ত হইলেন।

'পদব্রজে পথপর্যটনে কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেষাবস্থায় যখন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না, তখন ডাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন; 'খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; 'কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব?' ডাক্তার বলিলেন; 'যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন; 'তাহ'লে ত রাত্রি দিন হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।'

'কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার পর তিনি কিছুদিন কলেজের ইমারতেই বাসা করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মালির ঘরের দিকে মাটি ফেলিয়া মস্ত একটা কুস্তির আখড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। জীবহিংসা পরি-হারের জন্য তিনি কিছুকাল মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বাছুরকে কষ্ট দিতে হয় বলিয়া দুগ্ধ পর্যন্ত বোধ হয় ছাড়িয়া ছিলেন। যাহা হউক, এ বাতিক বোধ হয় অধিক দিন চলে নাই, নচেৎ বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহার লেখনীপ্রসূত অনেক গ্রন্থ হইতে হয় ত বঞ্চিত হইতে হইত, তিনি কখনই বেশিদিন বাঁচিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে কোঁৎ বলিয়া গিয়াছেন যে সৃষ্টি-কাণ্ডে ইহা একটি অসম্পূর্ণতা (imperfection) এবং সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণাময়ত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধযুক্তি যে, জীবহিংসা ব্যতীত মানুষের মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হইবার যো নাই। অতএব পশুদিগকে যত কম হয় কষ্ট দিতে হইবে; যাবজ্জীবন তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করা উচিত; এবং সেই যে চরম মুহূর্ত—যখন আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে যাইতেছি, তখন যেন তাহারা মৃত্যুর বিভীষিকা আদৌ না টের পায়; এই চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, এবং প্রাণসংহার ব্যাপারও এরূপ অনিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাশূন্য রীতিতে সম্পাদন করা উচিত যে, তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ না হয়। আমি জানি

যে, এখানকার উদ্ভিদ্‌ভোজীর দল কোঁতের এই সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এখনও শরীরবিধান শাস্ত্র (Physiology) দ্বারা উদ্ভিজ্জভোজনের সর্বাভিপ্রায়সাধনতা সর্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম; 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আপনার কখনও positivism সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল? তিনি বলিলেন; 'না—না। তবে ঘটনাচক্রে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি কোঁতের শিষ্য। আমার দাদার মৃত্যু হইলে আমি যেন সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখিলাম। হৃদয়ের আবেগে একখানা খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি কোঁৎকে প্যারিসের ঠিকানায় লিখিলাম; আমার নিজের ঠিকানা দিয়াছিলাম care of Iswar Chandra Vidyasagar। কোঁৎ যে তখন জীবিত নাই তাহা জানিতাম না। চিঠিখানা dead letter আপিশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগরের হাতে পড়িল। আমাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন; 'প্যারিস থেকে তোর একখানা চিঠি ফিরে এসেছে। তোর এ আবার কি পাগলামি?' বুঝিলাম, তিনি ঐ খোলা চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে পাগল ঠাহরাইয়াছেন। আমাকে তিনি কিসে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছেন এ কথা আমি তাঁহাকে একদিন অভিমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন; 'আরে না, না, সে রকমের পাগল নয়, তুই একটু বেশি romantic।'

'তুমি বোধ হয় জান না, বিদ্যাসাগরমহাশয় একটু তোৎলা ছিলেন; কেহ তাহা টের পাইত না। তোৎলার প্রধান ঔষধ আস্তে কথা কহা। বিদ্যাসাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে তিনি তোৎলা। সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি ত অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কখনও ক্লাসে পড়ান নাই। একবার শুনিয়াছিলাম তিনি 'উত্তরচরিত' ও 'শকুন্তলা' ক্লাসে পড়াইবেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা ঘটে নাই। আমার বোধ হয় পূর্বোক্ত কারণবশতই তিনি ক্লাসে পড়ান ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন চাকরি করিতেন তখন বোধ হয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক এক জন সিভিলিয়ন ছাত্র লইয়া বাঙ্গালা পড়াইতে হইত। কারণ তিনি নিজেই গল্প করিয়াছেন যে তিনি বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল অংশ পড়াইতে সংকুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্র তাঁহাকে সে বিষয়ে অভয় দান করেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বাহির হইবার পূর্বে বাঙ্গালায় 'পুরুষ পরীক্ষা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। সিভিলি-য়ানরা তাহাই পাঠ করিত। এখনকার রীতি অনুসারে ঐ দুখানি গ্রন্থ পছন্দ হইবার কথা নহে। সেই জন্যই বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা

করেন। 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের মধ্যে একটি সন্দর্ভ লইয়া পূর্বে খুব হাস্যপরিহাস চলিত। এই সন্দর্ভের মধ্যে লেখা আছে যে, বুদ্ধি চারি প্রকার: বেগবেগা, বেগচিরা, চিরবেগা, চিরচিরা। বেগবেগার অর্থ, যে শীঘ্র বুঝিতে পারে, অথচ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; বেগচিরা শীঘ্র বুঝে, অনেক দিন মনে রাখে; চিরবেগা বুঝিতে দেরি হয় অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; চিরচিবা বুঝিতে দেরি হয়, কিন্তু অনেক কাল মনে থাকে। এই চিরচিরা লইয়া লোকে বিস্তর আমোদ করিত। যাহা হউক সে গ্রন্থ একেবারে লুপ্ত হওয়া ভাল নহে; কারণ বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত রীতির পূর্বে কি প্রকার প্রচলিত ছিল, বিশেষত্ব ডেঁপো পণ্ডিতদিগের মধ্যে, তাহার অতিসুন্দর নমুনা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ পড়াইবার সময় বিদ্যাসাগর বোধ হয় হাড়ে চটিয়া যাইতেন; বোধ হয় তাঁহার শয্যাকণ্টক বোধ হইত; তাই তিনি অত উৎসাহের সহিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কালখানি পাইয়া ছিলেন; রক্তমাংস ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। তাই বাঙ্গালায় অমন সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

'১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া মুর্শিদাবাদ যান। আমি তখন বোধ হয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাসে পড়ি। রামকমল সেনের বাড়ির উপরে এক হলের ভিতর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাস বসিত। ১৮৫০ সাল হইতে মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কলঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাহিনা। কালক্রমে যাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' গ্রন্থে এই মনোমালিন্যের কারণসম্বন্ধে নিজে চুপ করিয়া গিয়াছেন, তখন যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইব না।

'তর্কালঙ্কারের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগব তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতে লেখা মুক্তার মত ঝলমল করিত। লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লেখাপড়া জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একবার Librarian-এর নামে শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল, সে কবিতার আর কিছুই আমার এখন মনে নাই,

-কেবল 'লাইব্রেরিয়ান গরীয়ন্‌' এই দুটি কথা যেন কানে বাজিতেছে। পুনশ্চ,

তারাশঙ্কর শংকর সদয়া
বিদ্যাসাগর সাগর কৃপয়া
বিদ্যামন্দির মধ্য বিরাজে
পুস্তকধক্ষ্যক লাইব্রেরিকাজে।

'পুস্তকাধ্যক্ষ' লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না তাই কথাটা পরিবর্তিত হইল। তারাশংকর, তথা বিদ্যাসাগর, খুব আমোদ পাইয়াছিলেন।

"আবার রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়ো ঝাঁ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন,

যঃ ঈশ্বরো নিমুগতঃ করন্তি
সঃ ঈশ্বরো নিজালয়ং নয়ন্তি।

'লোকটির impudence আবার এত ছিল যে, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতে কাটকুট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে 'সংকর', খুড়া ভাবিলেন দন্ত্য স ভুল ; লিখিলেন তালব্য 'শ' এবং আদর্শ পুঁথিতে 'স' কাটিয়া 'শ' করিয়া দিলেন।

'মদনমোহন চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বীটন মেমোরিয়ালের ( Bethune memorial ) জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বীটনকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা কারতেন। তাঁহার মৃত্যু কবে হইল ঠিক আমার মনে পড়ে না ; কিন্তু বেশ মনে পড়ে, যেদিন বেথুন কলেজগৃহ খোলা হইল। সংস্কৃত কলেজে আমি তখন মাসিক আট টাকা বৃত্তি পাই। বিদ্যাসাগর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোদের scholarship থেকে এ মাসে দু'টাকা কেটে নিচ্ছি, বীটন মেমোরিয়ালের জন্যে। কি বলিস ? বিদ্যাসাগর যখন বলিলেন, ব্যাপারটা বুঝি আর নাই বুঝি, তাঁহার কথার কি প্রতিবাদ করা চলে ?

'Law member ও শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন হলে পারিতোষিক দেওয়া হইত ; সেই সময়ে তিনি বক্তৃতা করিতেন। একবার আমি বিদ্যাভূষণের ক্লাসের পারিতোষিক লইতে টাউন হলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, dais-এর উপর অনেক য়ুরোপীয় উপবিষ্ট। নিম্নে আলাহিদা জায়গায় সংস্কৃত, হিন্দু, কৃষ্ণনগর, হুগলি ও ঢাকা কলেজের অন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'কাদম্বরী'র অনুবাদক তারাশঙ্কর ও আমার দাদা সংস্কৃত কলেজের front bench-এ উপবিষ্ট। সভাপতি ছিলেন বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্নর Sir John Littler। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বীটন উপবিষ্ট। স্যর জন বেঁটে ছিলেন, পেটটি মোটা। বীটন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রসন্নবাবুর মুখে শুনিয়াছি ( কারণ, তখন তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতার রসগ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না, ) বীটন

সভাপতির দিকে ফিরিয়া 'Sir John'—বলিয়া সহসা পুরা নামটি উচ্চারণ না করিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রসন্ন বাবু বলিলেন যে, বেশ বুঝা গেল, ডেপুটি গবর্নরের সেই খর্বাকৃতি, বর্তুলোদর মূর্তিটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া Sir John বলিতে গিয়া বীটনের মনে Falstaff-এর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া লইয়া শুধু Sir দিয়া বক্তৃতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কলেজগুলি পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল; বক্তৃতায় ছেলেদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ পরস্পরের প্রতি এই রেষারেষির আবশ্যকতা আছে কি? শিকারের সময় এক প্যাক কুকুর অগ্রসর হইয়া যদি খরগোসটাকে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে অন্য প্যাকগুলির বিশেষ লজ্জার কারণ কি?

পণ্ডিতমহাশয় থামিলেন। আমি বলিলাম, 'আপনার মুখে পূর্বে শুনিয়াছি যে, পাটিগণিত রচনা করিবার সময় প্রসন্নবাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গত রামকমল ভট্টাচার্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটিগণিত ও বীজগণিতের পরিভাষাসম্বন্ধে ঋণী ছিলেন?'

পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন; 'না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লীলাবতী' প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না। তিনি নূতন ধরনে ইংরাজি প্রণালীতে অধ্যাপনার প্রবর্তন করিবার পূর্বে সংস্কৃত কলেজে 'লীলাবতী' প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের নিকট 'লীলাবতী' পড়ি; বিদ্যাসাগর ইঁহাকে পরে মুন্সেফ করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'লীলাবতী' পড়েন কলেজের এক খোট্টা পণ্ডিতের কাছে, তাঁহার নাম পণ্ডিত যোগধ্যান। পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত একজন না একজন বড়গোছের বরাবরই প্রায়ই নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিদ্যাসাগর জয়নারায়ণের ছাত্র, শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ লাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাহাদিগের নাম একটি শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছিল:

কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দসূনো
নাথুরামো প্রাজ্ঞ বর্জ্যৈপ্যনল্পং

যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনায় ।

'পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্বপ্রথম মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত 'শকুন্তলা' প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—'কেশব কেন ঈশবর ঈশবর করে বেড়ায় ? ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কলকব্জা এখানে করবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।'

'এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না ; পয়সার লোভে সৎপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের এগুণটা সাধারণত আছে। তবে জজপণ্ডিতরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। ঘুষ লইত।'

'বিদ্যাসাগরমহাশয যখন বহুবিবাহের অবৈধতার বিষয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন, সে সময়ে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রথমে তাঁহার মতের অনুমোদন করিতে উদ্যত ছিলেন। বহুবিবাহ যে অবৈধ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর একটি সুপরিচিত মনুবচনের নতুন প্রকার ব্যাখ্যা করেন। সে বচনটি এই ঃ

'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রাণাং সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ।'

পূর্বে এই শ্লোকের মোটামুটি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষে প্রথমে স্বজাতীয় কন্যা বিবাহ করা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকর্তব্য; পরে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা হইলে স্বজাতীয়া বা ভিন্নজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগরমহাশয়ের অতি সূক্ষ্মবিবেচনা প্রয়োগপূর্বক মনুবচনদ্বয়ের এইরূপ অর্থ স্থির করিলেন যে, ধর্মকর্মের জন্য স্বজাতীয়া পত্নীর একান্ত আবশ্যক ; কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্বজাতীয় পত্নী হইতেই পারে না, ভিন্নজাতীয় পত্নী চাহি। কিন্তু মনু প্রতিলোম বিবাহের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন ; অতএব তিনি অনুলোম রীতিতেই ভিন্নজাতীয় পত্নীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি এই ছিল যে, যখন মনুর মতে কাম্যবিবাহ ভিন্নজাতীয় কন্যা ব্যতীত হইতেই পারে না, এবং যখন কলিতে জাত্যন্তর বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, তখন কলিতে বহুবিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় হইতেছে।

'বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এই ব্যাখ্যা বিলক্ষণ সূক্ষ্মদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষ প্রণিধানের সহিত বচন দুটির পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে

আমারও অনেক সময়ে বোধ হয় যে, মনুর অভিপ্রায় বা ইহাই ছিল। তবে একটা গোল এই থাকে যে, শূদ্রের পক্ষে কি কাম্যবিবাহ ঘটিবে না? কারণ শূদ্রের চেয়ে ছোটজাতি আর নাই; এবং মনুরমতে কাম্য বিবাহ আপন অপেক্ষা ছোট জাতির কন্যার সহিতই শাস্ত্রানুমোদিত। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি, তারানাথ তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমাদের ঢিপ্‌লে না হোলে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বার করতে পারে? বিদ্যাসাগরের গ্যাঁট্টাগোঁট্টা খর্বাকৃতি দেহ ছিল; এই জন্য তারানাথ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আদর করিয়া তাঁহাকে 'ঢিপ্‌লে' বলিয়া ডাকিতেন। তর্কবাচস্পতিমহাশয়ের মুখে এই আদরের ডাকনাম আমি অনেকবার শুনিয়াছি।

* * *

'বিদ্যাসাগরের প্রবল যুক্তিতে কাহারও মন আর্দ্র হইল না। যাঁহারা য়ুরোপীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া একাধিক বিবাহবিদ্বেষী হইতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। ইংরাজ গভর্মেন্ট বহুবিবাহনিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। বিধবাবিবাহের বৈধতা সম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহের কোন জবরদস্তি নাই, কেবল অনুমতি দেওয়া মাত্র ( permissive—not coercive)। আইন বিধবাকে বলিতেছে—ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর , না হয়, না কর ; কিন্তু যদি কর, তোমার সন্তান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয় ; এই জবরদস্তি করিতে ইংরাজ গবর্মেন্টের ভরসা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন সিপাহীবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুতরাং এরূপ আইনবিষয়ে ইংরাজের আতঙ্ক জন্মিয়া ছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টা বিফল হইল।

কিন্তু একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল ; কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাস রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহুবিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস' 'রত্ন-পরীক্ষা', 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাশার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সেকালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে ; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য ; এবং পিতাপুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী

পাঠকও বেশি নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা বড় একটা বুঝেন না ; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায়-আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এদেশে এ সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে ; যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে প্রকার উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চস্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর এদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন ; কারণ, তিনি বাঙ্গালা ভাষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন ; কেহ পড়ুক আর না পড়ুক, আনন্দ করুক আর না করুক, বাঙ্গালা লিখিতে তাঁহার নিজের এত আমোদ বোধ হইত যে, সেই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন ; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্তায় হাসি-তামাশার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে সকল রসিকতার কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে বোধ হয়, বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে ; কিন্তু সেরূপ শক্তি এখন কাহারও আছে কি না, বলিতে পারি না। আমার কিছু কিছু সময়ে সময়ে মনে পড়ে। বীটন কলেজ বরাবরই কোনও না কোনও কমিটির শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। এক সময়ে বিদ্যাসাগর সেক্রেটারি ছিলেন, তখন অনেক উচ্চপদস্থ 'সাহেব' কমিটির মেম্বার ছিলেন। একটি ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কি কারণে জানি না, একজন স্কুলের পণ্ডিতের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ জন্মিয়াছিল, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারি ; তদন্ত করিবার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইল। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর বুঝিলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষই নাই। পরে এই বিষয়ের বিচারের জন্য একদিন কমিটির বৈঠক হইল। সেই বৈঠকে বিদ্যাসাগর সকলকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পণ্ডিতটি নিরপরাধ। কিন্তু কমিটির মেম্বার অধিকাংশ য়ুরোপীয়, প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফিরিঙ্গি ; কমিটি ভাবিল, পণ্ডিতকে একেবারে নির্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে শিক্ষয়িত্রীর অপমান করা হয়, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল ; তবে না হয়, দু'এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে suspend করা যাক ; কেমন, বিদ্যাসাগর, তুমি কি বল ?' বিদ্যাসাগর গত্যন্তর না দেখিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন, yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her.

আচ্ছা—তবে তাই কর, যদি তোমরা ভাব যে, কিছু বলিদান না করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না। ইংরেজরা আর যাহাই হোক, প্রকৃত রসিকতা (wit) পাইলে গুণ গ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যাসাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন। একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্মেণ্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ওহে, আজকে political world-এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।' এই gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর একবার তাঁহার কোনও এক বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন; বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর আসাতে তিনি বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া বিদ্যাসাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন; 'যাও, আর উস্‌খুস্ কোরচ কেন? বাড়ির ভেতরেই যাও।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসব পাইলেই শ্বশুড়বাড়ি যাইতেন, এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় শ্বশুরবাড়িতে থাকিতেন। বিদ্যাসাগব একদিন একত্রে দুজনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—'হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ।'

আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যমহাশয় বলিলেন; 'বিদ্যাসাগরের একটা চিরকালের অভ্যাস ছিল যে প্রায় ছোকরাদলের সকলকেই তিনি কখনও 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলিতে পারিতেন না। তিনি আমাকে যে 'তুই' বলিতেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি যখন ৬।৭ বৎসর বয়সে কেবল আব্দার করিযা আমার দাদার সঙ্গে কলেজে যাইতাম, প্রত্যহ তাঁহাদের ক্লাসের ঘরের একপাশে সমস্ত দিন বেঞ্চের উপর গড়াগড়ি দিয়া বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বাড়ি আসিতাম, তখন বিদ্যাসাগর একদিন (তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) আমাকে লইয়া নিম্নতম শ্রেণীতে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের ঘরে ভর্তি করিয়া দিলেন। সেই অবধি প্রায় আমার চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়াছি, কখনও 'তুই' সম্বোধন পাই নাই। ইহা যে কখনও আমার মন্দ লাগিয়াছিল এমন কথা আমি বলি না; আমি বরং ভাবিতাম যে, তিনি যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ও আমাকে যে স্নেহ করেন, 'তুই' সম্বোধন তাহারই পরিচায়কমাত্র। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতাম যে ইহা সকলের ভাল লাগিত না। সংস্কৃত কলেজের একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন; তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র গুপ্ত। বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা তিনি অনেক junior ছিলেন; একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে

বলিলেন, 'তুই বলিতে যতক্ষণ, তুমি বলিতেও ততক্ষণ ; তবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে তাহাকে তুই বলিয়া বসেন, তুমি বলিতে বড়ই বিমুখ, ইহার মানে বুঝা যায় না।' উমেশ গুপ্ত এই কথা বিরক্তির ভাবেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমার এই বোধ হয় যে, এই অভ্যাসটি বিদ্যাসাগরের সারল্যগুণের পরাকাষ্ঠার পরিচায়কমাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে, বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ ছিল না ; যাহাকে যে-ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোক দেখান বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সেই পরিবর্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা'কে ছেলেবেলা হইতে যে 'তুই' সম্বোধন করিতেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার পরিবর্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। বিধবা-বিবাহের গল্প করিতে বসিয়া একদিন তিনি বলিলেন,—যখন আমি বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আপনার মত স্থির করিয়া বসিয়াছি, তখন ভাবিলাম যে, মা'কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না, তিনি কি বলেন ? আমাকে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে বলেন, কি মানা করেন ? এই অভিপ্রায়ে একদিন তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, 'মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব (আমি মাকে চিরকালই 'তুই' বলে ডাকি ; ছেলেবেলার অভ্যাস কখনও ছাড়িনি) আমি ত বিধবাবিবাহ চালাব স্থির করেছি, এতে তোর মত কি ? মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এটা যে শাস্ত্রের যথার্থ মত, তোর কি তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ আমার তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তুই চালাগে যা, আমার তাতে অমত নেই।'

'এখনকার দিনে আমি দেখিতেছি যে, পুত্র একটু বড় হইলে এবং রোজগারি হইলে, পিতা তাহাকে 'তুই' বলা দূরে থাকুক, পরোক্ষে 'তিনি' বলিয়া থাকেন! আমি অনেক পিতার মুখে এইরূপ শুনিয়াছি ; এবং আমার এটা যেন কেমন কেমন লাগে। কোনও কোনও পরিবারের মধ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, বাল্যকালেও পিতা পুত্রকে 'তুমি' বৈ 'তুই' বলেন না ; পুত্রও পিতাকে শৈশবাবস্থা হইতে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিতে অভ্যাস করে। ইহার একটা মানেও আছে। সেই সকল পরিবারের কর্তারা বিবেচনা করেন যে, সভ্যতার সমুদাচার (কথাবার্তা আদবকায়দা ইত্যাদি) শিক্ষা করা বালকের পক্ষে একান্ত কর্তব্য, এবং খুব অল্প বয়সেই অভ্যাস করা ভাল।

'বিদ্যাসাগর যে সকল ছোকরাকেই 'তুই' বলিতেন, আমি এমন কথা বলিতে চাহি না। আমার মনে হয় না যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' কখনও বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নিজের কথা আমি জানি ; রাজকুমার সর্বাধিকারীর কথা জানি ; ডাক্তার সূর্যকুমার

সর্বাধিকারীর কথাও জানি। কলিকাতায় একবার হোসেন খাঁ নামক বাজীকরের দিনকতক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ; সূর্যবাবু তাহার দু'চারিটা ভেল্কি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে গল্প করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আরে আমি তোর কথা শুনিনে। তোকে আমি জানি, তুই কতকটা আহ্লাদে। আমি আমার হাতে আংটি মুঠো করে ধরে থাকি ; যদি আমার হাত থেকে হোসেন খাঁ আংটি উড়িয়ে দিতে পারে, তা হোলে বুঝব যে, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।' শ্রীমান্ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় যখন কাশ্মীরের দেওয়ানী করিয়া মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখনও বিদ্যাসাগরের কাছে সেই সাবেক 'তুই' সম্বোধন পাইলেন, ভুলেও একবার 'তুমি' নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, প্রসন্নকুমার রায় (মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম হেডমাস্টার) ইহাদের কাহাকেও কখনও তিনি 'তুই' বলেন নাই। অথচ প্রসন্নবাবুর দুই এক বৎসরের ছোট তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সূর্যবাবুকে তিনি 'তুই' বলিতেন। এই বিষয়ে তিনি যে কি পার্থক্যের নিয়ম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। ইদানীন্তন বালকদিগের মধ্যে তাঁহার অপরিচিত একটি এম. এ. চাকরির প্রার্থনায় তঁহার নিকট গিয়াছিল। ছোকরাটি থিয়সফিস্ট ; লম্বা চুল রাখিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, 'আরে তোকে মাস্টারি কর্ম দোবো কি ! তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।' এরূপ অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও তিনি কাহাকেও বা 'তুমি' কাহাকেও বা 'তুই' বলিতেন।

'শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন ? কিন্তু লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য হইয়াছিল যে অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এরূপ অসার যে, অর্থ-লোভে তাহারা না পারে এমন কাজ নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কোনও বিধবাবিবাহদ্বেষী তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-জাতির সংখ্যা অনেক বেশি, যদি বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক অপরিণীতা কুমারীর বিবাহ হওয়া ভার হইবে ; সেটা কি মঙ্গলকর ? এই আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া তিনি এক দিন বলিলেন,—'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না ; অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।'

'এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশ অসভ্যজাতিদিগের

সরলতা ও অকপটতার প্রীতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কর্মটাঁড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতালজাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙালি সাঁওতাল পরগনায় কিছু জমি খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ সীমাসহরুদ্দ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙালিটি অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে যে অমুক শিমুল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজি হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—শিমুল গাছটা বটে; পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতে বলিয়া উঠিল, কিন্তু ঐ গাছটি বটে, বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাসাগরমহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন, 'দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।'

'আমার এই পুরাতনপ্রসঙ্গের মধ্যে বিদ্যাসাগর কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বোধ হয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ; কিন্তু যখন তিনি তাঁহার মেছোবাজার স্ট্রীটের ছোট একতালা বাসাবাড়ির একটি কক্ষে বসিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা শুনাইতেন, তখন আমার অন্তরে যে পুলক সঞ্চারিত হইত, তাহার ক্ষীণ আভাসটুকুও বোধ হয় তোমরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছি; বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন; আসবাববিহীন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারায় হেলান দিয়া একখানি বহি হাতে করিয়া বিদ্যাসাগর নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন; কলেজ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম, বলিলাম, 'শম্ভুনাথপণ্ডিত তাঁহার বাড়িতে এক ডিনার-পার্টি'তে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ নাই, সেখানে আমি যাই কি করিয়া?' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তাই ত; এটা বেশ বিবেচনার কাজ হয় নি।' আমিও আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম না। এমনিতর ছোট বড় কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তাম্রকূট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; সটকা নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার হাতে থাকিত। তিনি নস্যও লইতেন; তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিন্তু নস্য কিংবা তামাক কিছুই সেবন করিতেন না।

'বিদ্যাসাগর নিজের ছাত্রাবস্থার কত গল্পই করিতেন। যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য জয়গোপাল

তর্কালঙ্কার নির্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখি, কেমন লিখেছ।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মতো পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল; আমার বোধ হয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন :

> ত্বৎকীর্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
> রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
> শ্রীকীর্তিচন্দ্রনৃপকজ্জললাঞ্ছনেন
> প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥

হে কীর্তিচন্দ্র মহারাজ। তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

'দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল :

> অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
> হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
> তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
> তেভ্যস্তান যদি পাসি পালক তদা কীর্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিরা আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে; সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে।

'সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

'অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছ্বাসের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাঁহার ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে তদবস্থ দেখিয়াছি। তিনি 'কুমারসম্ভবে' যখন পড়িতেন ঃ

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥

তখনই আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।

'ঐ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদের নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। বায়রনের 'চাইল্ড্ হ্যারল্ড' পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন ভাবোন্মত্ত হইতাম যে, আহা, হা, করিয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইত।

'বিদ্যাসাগর বরাবরই চেয়ারে বসিতেন; কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মেছোবাজারের সেই ছোট বাড়িটিতে ত ফরাসের ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধায়ের বৈঠকখানায় সুন্দর ফরাসের বিছানা ছিল; বিদ্যাসাগর কখনও সেখানে বসিয়া গল্প করিতেন না; সন্নিকটবর্তী একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া কথাবার্তা কহিতেন, আমরা বিছানায় উপবেশন করিতাম। বিদ্যাসাগরের সহিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বহুকাল স্থায়ী। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাড়ি বৌবাজারে ছিল; তাহারই সন্নিকটে বিদ্যাসাগর বাসা করিয়াছিলেন; ক্রমে বিদ্যাসাগর নিজের বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজকৃষ্ণের বাড়িতে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিজের বাসায় কিন্তু তাঁহারই আত্মীয় দশ-বার জন লোক সদাসর্বদা থাকিত; তিনি তাহাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যয়ভার বরাবর বহন করিতেন। পরে বিদ্যাসাগর যখন মেছোবাজারে বাসা করিলেন, তখনও বৌবাজারে তাঁহার এই বাসা ছিল; তাঁহার গ্রামের লোক আসা-যাওয়া করিত, এবং সেইখানেই থাকিত। যখন তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধায়ের বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিবেন, তখনও বৌবাজারের বাসা ছিল।

'বিদ্যাসাগরের চটিজুতার কথা শুনিয়াছ, তিনি চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পায়ে দিতেন না; তাঁহাকে কখনও খড়ম পায়ে দিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; কখনও কখনও তিনি সখ করিয়া তালতলার চটি বিলাতি বার্নিশের মতো ঝক্‌ঝকে কালো করিয়া বুরুশ করাইয়া লইতেন; এই চটিজুতা পায়ে দিয়া খুব হাঁটিতে পারিতেন।

'দেখ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বেশি দূরে হাঁটিতে হইলে চটিজুতা পরাই ভাল, পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে না। আমি কিন্তু তাহা পারিতাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আমি একবার গ্রীষ্মাবকাশে পদব্রজে হাবড়া হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসন্নবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম। শুধু পায়ে পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, চটি জুতা হাতে ছিল! সেখানকার জল-হাওয়া তখন খুব ভাল ছিল। সেবার বন্যায় নিকটবর্তী তিন চারিটা গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছিল, আমার অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তি আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিশীথে যখন গ্রাম সুপ্ত প্রসন্নবাবুর কোনও সাড়াশব্দ নাই, আমি নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদী অভিমুখে চলিলাম; নদীর কূল কিনারা দেখা যায় না। সেই জলরাশির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য মন আকুল। জলের ভিতর দিয়া খানিকদূরে অগ্রসর হইয়া এক বৃহৎ বটগাছের উপর উঠিলাম। নীচে চাহিয়া দেখি, গ্রামের কয়েকজন লোক আমাকে অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়াছে; তাহারা আমাকে তদবস্থ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে বারংবার অনুনয় করিল; তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না, বৃক্ষশাখা হইতে জলরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িলাম। এপার-ওপার সন্তরণ করিয়া আমার ক্লান্তিবোধ হইল না। বিদ্যাসাগরের দামোদর নদীবক্ষে সন্তরণের কথায় বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Act-এতেই বিদ্যাসাগরের নাম আছে, কিন্তু তিনি যে কখনও সেনেটের কার্যে যোগদান করিয়াছেন তাহা ত আমার স্মরণ হয় না। অবশ্যই ১৮৭২ সালের পূর্বের কথা আমি ঠিক জানি না, ঐ বৎসর হইতে আমি সেনেটের মেম্বার হইয়া আসিতেছি। ধুতি ও চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পরিধান করিতেন না বলিয়া যে তিনি সেনেটে যাইতেন না, এমন আমার মনে হয় না।

'বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া পরিহাস করিতেন; ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'হাঁ রে, ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?' ললিত উত্তর দিতেন, 'আছে বৈ কি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কা'র?' বিদ্যাসাগর হাসিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল; যে সকল বিদেশীয়

পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, একথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই; ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

'আমার এই পূর্ব স্মৃতি বিবৃতি করিতে বসিয়া যাঁহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারীলাল, জজ দ্বারকানাথ, আমার দাদা সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র ও ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন: 'কুসুমাঞ্জলি' ও হবস্, দুইই তাহার আয়ত্ত ছিল। 'কুসুমাঞ্জলি'র এত খ্যাতি ছিল যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাওয়েল 'সাহেব' গ্রন্থখানিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন; গ্রন্থকার উদয়নাচার্য সম্বন্ধে 'সাহেব' তাঁর পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, Udayanacharya is a fixed star of which neither the distance nor the dimensions can be ascertained. তিনি কোন্ দেশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কাহার কাছে অধ্যয়ন করিলেন, ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। সেই গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক Syllogism,—ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্ব অর্থাৎ the five elements earth, water, etc must have had some author or creator because they are the result of some activity (কার্য) like all artificial objects। এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

'আমি Positivist; আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসঙ্গ বিবৃতির সূত্রপাত হয়; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে,—কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight, and he can slight all things divine.'

* * *

সম্প্রতি 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'পুরাতন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর' শীর্ষক একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত তৎসম্বন্ধে আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। তিনি বলিলেন,—

'লেখকমহাশয় 'অনুতাপের ঘটা' বলিয়া আমাকে একটু টিটকারি দিয়াছেন। আমি কিন্তু কুত্রাপি বিদ্যাসাগরমহাশয়কে উদ্ধত-স্বভাব বলি নাই। আমার বলিবার অভিপ্রায় এই,—আমরা চুনোপুঁটি আমরা তাঁহার দেখাদেখি চলিতে গেলে উদ্ধত হইবার সম্ভাবনা। সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে বড়লোকের অনুকরণ করা আহাম্মুকি মাত্র; কিন্তু যে ব্যক্তি বড়লোককে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করে, সে অনেক সময়ে সেই আহাম্মুকি করিয়া ফেলে। আমারও যৌবনাবস্থায় তাহাই ঘটিয়াছিল। এই কথাই কেবল আমি বলিয়াছি। তাঁহার পক্ষে যেটা তেজস্বিতা, আমার পক্ষে তাহা ঔদ্ধত্য দাঁড়াইয়া গেল।

'বিদ্যাসাগরমহাশয় যে বঙ্কিমের লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। তাঁহার একজন গোঁড়া ভক্ত প্যারী কবিরত্ন এই সম্বন্ধে একটা ছড়া বাঁধিয়া গিয়াছেন। সেই ছড়াটি সিকদারপাড়া লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখস্থ আছে। বঙ্কিমের অপরাধ,—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু নরম গরম সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকেই ইহাতে চটিয়া গেলেন। 'হালিসহর পত্রিকা' লিখিল,—

'কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে,
নাচিতেছে জাদুমণি হাততালি দিয়ে।
যারে পায় তা'রে ধরে দিগাদিগ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোল-তাবোল বকে সকলই নীরস,
'সাগরে' সাঁতার দিতে করেছে সাহস।
কাল চোখে কাঁচ খোকা পরিয়া কাজল,
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,
সে দিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা।
ভারতের মধুমাখা কবিতালহরী,
অনা'সে ফেলিল ছিঁড়ে আব্দার করি।
এখন 'ছিঁড়িব' বলি পাড়িয়াছে ধুম।
আয় আয় আয় 'বঙ্গদর্শনে'র ঘুম।

"প্যারী কবিরত্ন গাহিলেন,—

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তা'র?

পদে পদে দেখ্‌তে পাই,
কর্ম্ম কর্তা বোধ নাই,
ভাবরসের মা গোঁসাই,
কেন লেখার ছল ধরে ?
দুটো একটা গল্প লিখে,
রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে,
ধরাটাকে সরাসম জ্ঞান করে।
এ আস্পর্ধা ক'ব কা'রে
গোষ্পদ বলে না যা'রে
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হোলো না তার ?
হ'তেন যদি কূপ কি ডোবা,
তা' হোলেও ত পেতো শোভা,
নদনদী মধ্যে খুঁজে মেলা ভার।
মরি আপশোষে
কোন সাহসে,
কি জিনিস বেরুলো দেশে,
কিসের এত অহঙ্কার ?
ভারতচন্দ্র গুণাকরে,
নিন্দুকেরাই নিন্দা করে,
সেরূপ রসমাধুরী ভাষায় কি বেরুলো আর ?
অদ্যাপি কবি সকলে,
মুক্তকণ্ঠে কে না বলে,
কবিকুলে ছিলেন কণ্ঠরত্নহার।
সমকক্ষ নর,
মেলা সুদুষ্কর,
ভারতে 'ভারত' তুল্য কবি কেউ হবে না আর।
'চ্যাংড়া, কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
শুনে শরীর জ্বলে যায়,
এর চেয়ে চ্যাংড়াম করা বোধ হয় হোতে পারে না আর।
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য,
প্রভায় প্রভাহীনাদিত্য,
যে যশ অদ্যাপি ধরায় ধরে না।
তাঁর দোষ ধরা,
ক্ষ্যাপাম করা,

বাণেশ্বর শঙ্করাদি সভায় ছিলেন সভ্য যাঁ'র।
এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে,
Editor বহু নরে,
কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে তা' অনেকে জানে না।
ভূষিমাল গর্দাভরা,
ভেতরেতে ময়লা পোরা,
কাগজগুলো কেবল ভাল,
Binding পরিপাটি ;
একখানা বিকোয় না দেশে,
মসলা বান্ধে অবশেষে,
তবু কত সর্বনেশে,
কলম ধরতে ছাড়ে না।
অতি যা'চ্ছে তাই,
যা' দেখ্‌তে পাই,
'সাগর' বৈ কে লিখ্‌তে জানে,
কা'র লেখায় কি উপকার ?
'হুতোম প্যাঁচা' বলে ছিল,
( বল্‌তে বল্‌তে মনে হোলো )
বেওয়ারিস্ বাংলা ভাষা,
যা'র যা' ইচ্ছা তাই করে।
ওয়ারিস্ কেউ থাক্‌লে পরে,
অনেকে ঝুমঝুমি পোরে,
লেখার গুণে প্রায় যেতো দ্বীপান্তর।
কেউ শত্রু নাই,
এরা বাঁচে তাই,
যে যা' করে তাই শোভা পায়,
মগের মুল্লুক অবিচার।
Gunny cloth যা'রা বোনে,
তা'রা ভাবে মনে মনে'
কিংখাব কাশ্মীর শাল, সে অতি সহজে হয়।
শাল যে কি বস্তু বোঝা,
তা'দের পক্ষে বিষম বোঝা,
কবিরত্ন বলে কথা সোজা নয়।
বামন হয়ে হায়,
চাঁদে হাত বাড়ায়,

কালে কালে হোলো কবি-
কদম্বের হাটবাজার।

'চিঠির উপর শ্রীহরি লেখা থাকিলে লোক নাস্তিক হয় কিনা ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; তবে আমি শপথপূর্বক বলিতে পারি যে, কোনও কোনও সময়ে বিদ্যাসাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন;—'ঈশ্বর যদি থাকেন তিনি ত আর কামড়াবেন না।' একথা আস্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায় তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন। আর Cannot bear a brother near the throne এ দুর্বলতা অতি তুচ্ছ; বিস্তর বড়লোকের শুনা যায়; ইহাতে কাহারও বড়ত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় না; এবং আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, এটুকু কিঞ্চিন্মাত্রায় তাঁহার ছিল। ইহার প্রমাণ এই যে, আমি কখনও তাঁহাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Revd. K. M. Banerjee প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষদিগকে সমুচিত প্রশংসা করিতে শুনি নাই; এমন কি তিনি 'সাহেব' দিগের সংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে অনেক সময়ে অসঙ্গত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। Goldstucker-এর একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে কি একটু ভুল করিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া তিনি কখনও কখনও এরূপভাবে কথা কহিতেন যে সংস্কৃতজ্ঞতাসম্বন্ধে Goldstucker যেন মানুষের মধ্যেই নহে; ইহা স্মরণ করিলে আমাদের ত গা শিহরিয়া উঠে।

'বিদ্যাসাগরের রচনা-পদ্ধতির প্রতি আমি যে স্বভাবতই পক্ষপাতী হইব ইহা ত আমার Education-র ফলস্বরূপ। আঠার বৎসর বয়সে 'বিচিত্রবীর্য' নামে একখানি বাংলা বহি লিখিয়াছিলাম। সে বহি বড় একটা কেউ পড়ে নাই; আদরও করে নাই; কিন্তু বঙ্কিমবাবু তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'এ ত বাংলা না, এ ত সংস্কৃত'—তাতেই বুঝিয়া লইবেন যে রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি বিদ্যাসাগরের চেলা কি বিদ্বেষী। তবে আমার এই বিশ্বাস যে, ভাষার বিকাশ সম্বন্ধেও একটা Natural selection আছে; কেন যে বিদ্যাসাগরের ভাষাই দাঁড়াইয়া গেল আর কেনই বা লোকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ভুলিয়া গেল, ইহার কারণ নির্ণয় করা ভার; নতুবা ইঁহারা দুইজনে বাংলাতে বিস্তর লেখা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কই, আজ কাল কেহ তাহা পড়েও না জানেও না। তবে আমি এখন ইহাও দেখিতেছি যে, বঙ্কিমবাবুর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিদ্যাসাগরের ভাষাপদ্ধতি অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে; এখন বাংলা চলিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের কাছে তাহা ধরিলে তিনি 'ছি ছি' করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেন।

'আমার গুরুভক্তির বিষয়ে একটু কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র বিস্তর জায়গায় তাঁহার প্রতি যে প্রকার দেবতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কথা কহিয়াছি সে সবগুলি এই পত্রের লেখক চাপিয়া রাখিয়াছেন; কেবল দুই একটি সামান্য কথা ধরিয়া আমাকে টিটকারি দিয়াছেন।

অবশ্য কাহাকেও গালি দিতে হইলে এই নিয়মেই চলা উচিত। ইহাতে আমার কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। শ্যামাচরণবাবুর ব্যাকরণসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে তাঁহাকে নীচপ্রকৃতি কিরূপে বলা হইল ইহা ত বুঝিতে পারিলাম না; তিনি বাস্তবিকই বহিখানি অসার ভাবিয়াছিলেন, এবং সেই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমাদের এক্ষণে যে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে সে মতের পোষকতা করিতে পারি না। অতএব এখন বুঝিতেছি যে তখন তাঁহার সঙ্গে সায় দেওয়াতে ভাল করি নাই; কিন্তু ইহার চারা কি আছে? তখন আমাদের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, আমরা সেইরূপ কাজই করিয়াছি। বহিখানি কিন্তু অপ্রচারিত রহিয়া গেল, এখন তাহার এক Copy খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, তবে আমার একটু একটু মনে হয় যে, সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে কতকগুলা Copy কেনা হইয়াছিল। যদি আমার এ ধারণা সত্য হয়, তবে বোধ হয় সেই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন না। লেখক আমার প্রযুক্ত 'অকৌশল' কথাটি যেন অচল ও অপ্রযোজ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, কিন্তু 'অকৌশল' বলিতে মনান্তর যে চলিত আছে সেটা কি তিনি মানেন না?

'মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে, তবে লেখকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে। আর সেনেটে তিনি কেন যাইতেন না, এ বিষয়ে সঠিক আমি কিছু বলিতে পারি না। তবে আমার একটা অনুমান হয় যে বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা কখনও অভ্যাস করেন নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার কথার ধরনে বোধ হইত যে, এ প্রকার বক্তৃতা করা তিনি যেন একটা সঙ্ সাজার মত জ্ঞান করিতেন, এই জন্যই তাঁহার বোধ হয় সঙ্ সাজিতে ইচ্ছা হইত না। ফলত কোনও বিশেষ গুরুতর বা দরকারি কাজ সভা-সমিতির দ্বারা যে ভালরূপ হয় ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ওসব তিনি কেবল ডেঁপোমি ও নিজের বাহাদুরি দেখানোর উপায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে কখনও বড় একটা কোনও সভা-সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন এমন ত আমার মনে পড়ে না, তবে Bethune Society-তে পঠিত হইবার জন্য 'সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি প্রবন্ধ বাংলায় রচনা করিয়াছিলেন; নিজে কতকটা তোৎলা বলিয়া স্বয়ং পড়েন নাই, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পড়িয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি ঐ বিষয়ের অদ্যাবধি চূড়ান্ত রচনাস্বরূপ হইয়া আছে।

'যাহা হউক 'হিতবাদী'তে আমার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' লইয়া এই যে আলোচনা হইয়াছে ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়। কারণ হিতবাদীর জন্মের সময় আর পাঁচজনের সঙ্গে আমি ধাত্রীর কার্য করিয়াছি, এবং প্রথম লালনপালনের

ভার আমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ইহার পিতার কার্যটা যে আমার কর্তৃক সুচারুরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল, আমি জ্ঞানপূর্বক সে অহংকার করিতে পারি না। এত দিনের পর 'হিতবাদী' সেই প্রথম পালয়িতাকে যে স্মরণ করিয়াছে ইহাতে আমি ধন্যম্মন্য। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাত্যহিক স্মরণের জন্য যে শ্লোকখণ্ডটি বাছিয়া দিয়াছিলেন সেই 'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ'—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা যেন চিরকাল চলে, ইহাই প্রার্থনীয় ?'

* * *

অনেক দিন পরে আবার পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের চরণবন্দনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইল।

'আপনি কেমন আছেন ?'

'মন্দ নয়।'

'যে বৃষ্টি !'

'দেখেছ ! খনার বচন ফলিল কই ? ভাদ্র মাসে এত বৃষ্টি বড় সুবিধার নয়। জান ত'—

কর্কটে ছরকোট, সিং শুকনো, কন্যা কানেকান,
বিনা বায়ে তুলো বর্ষে, কোথা রাখবি ধান ?

—অর্থাৎ শ্রাবণমাসে জলেকাদায় সব ছরকোট, সিংহরাশি অর্থাৎ ভাদ্র-মাসে শুকনো, কন্যারাশি অর্থাৎ আশ্বিনে সমস্ত জলাশয় কানায়-কানায় জলে পূর্ণ, তুলারাশি অর্থাৎ কার্ত্তিকে ছিটা-ফোঁটা বৃষ্টি, তবে ত প্রচুর ধানের সম্ভাবনা ! কিন্তু ভাদ্রের লক্ষণ বড় ভাল নয়।'

'আপনার মুখে অনেক দিন পুরানো কথা শুনি নাই ; যখনই আসি, কিছু শুনিতে ইচ্ছা করে।'

"কি আর শুনিবে ? সুরেন্দ্র, রাসবিহারী, সকলে চলিয়া গেল ; থাকিবার মধ্যে রহিলাম আমি আর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী। এই সেপ্টেম্বর মাসে আমার ৮৬ বৎসর পূর্ণ হইল। খুব পুরানো কথা শুনিবে ? যতই বয়স বাড়িতেছে, অতীতের কথাগুলি উজ্জ্বলতর ভাবে আমার মানসপটে প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু ধারাবাহিক বলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। নিজের স্মৃতি কথা কতকটা autobiographic হইলে ক্ষতি কি ? গোড়ার কথা একটু বলি, শোন।

'জীবনের প্রত্যুষে যে জিনিসটি আমার প্রথম মনে পড়ে, সে আমার পিতার গঙ্গাযাত্রা ! তখন আমি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করি নাই। বেশ মনে পড়িতেছে মাতাঠাকুরানীর ক্রন্দন ;—কেন কাঁদিতেছেন, তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না। বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আমার ছিল না, তবে মাতাঠাকুরানীর রোদনে একটু বিমর্ষভাব আসিল। ঊর্দ্ধে আকাশমার্গে ঘুড়ি উড়িতেছিল, অন্যমনস্কভাবে তাহাই দেখিতেছিলাম।...তিন চারি দিন

পরে পিতৃদেব গঙ্গালাভ করলেন; দাহকার্য সম্পন্ন করিয়া আমার অগ্রজ গৃহে ফিরিলেন, সঙ্গে ছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পিতা দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। দেবনাথবাবু আমার পিতার ছাত্র; তিনি আমাদের বাড়িতে থাকিতেন, আমাদের অগ্রজ-স্থানীয়। এই জন্য নীলাম্বর ও ঋষিবর আমাকে শেষ পর্যন্ত ছোট খুড়ো বলিয়া ডাকিতেন। সে যাহা হউক, অতি কষ্টে ক্রন্দনবেগ সম্বরণ করিয়া দাদা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, চিৎকার করিয়া কাঁদিবার জন্য ছুটিয়া ঘরে ঢুকিতে গেলেন, দেবনাথ দাদা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। সেই সময়ে হরপঞ্চানন নামে এক প্রবীণ ভদ্রলোক সদরে উপস্থিত ছিলেন; ইনি পিতার বন্ধুও বটেন, ছাত্রও বটেন। তিনি বলিলেন—'আহা উহাকে যাইতে দাও, একটু ভাল করিয়া কাঁদুক।'·· সমস্ত ব্যাপারটি আমার চক্ষুর সম্মুখে দোদীপ্যমান। ম্লানায়মান অপরাহ্নে পিতৃদেবের সেই গঙ্গাযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত করুণ ব্যাপারটি আমার শিশুহৃদয়ে অংকিত হইয়া গেল।

'পিতৃদেবের গঙ্গালাভের পর আমরা দুই সহোদর, এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও মাতাঠাকুরানী, এই কয়জন মাত্র পরিবারভুক্ত রহিলাম। দেবনাথদাদা আমাদের অভিভাবক রহিলেন। বাল্যকালে বাড়ির সকলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন; আমিও সকলের অনুকরণে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতাম। পরে ক্রমে পাঁচজনে ইহা ভাল দেখায় না বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন যে, আমি আমার অগ্রজকে বড়দাদা বলিয়া ডাকিব। একা আমার নিকট তাঁহার নিকট তাঁহার সেই সংজ্ঞা চিরকাল ছিল। তিনি আমা অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। তখন আমাদের উপজীবিকা ছিল মাথা-ঘসা গলির ধনাঢ্য বসাকবাবুদিগের নির্ধারিত একটি মাসিক বৃত্তি। তাঁহারা প্রতি মাসে আমাদিগকে ২৩ টাকা করিয়া দিতেন; তদ্ভিন্ন বহুকাল যাবৎ বহু সামগ্রী, অলংকার বস্ত্রাদি তাঁহারা আমাদিগকে দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইতিহাস একটু শুনিবে কি? তখনকার হিন্দু-সমাজে ধনী গৃহস্থের সহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, ইহাতে তাহার একটু নিদর্শন পাইবে।

'বহুপুরুষ যাবৎ আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। প্রপিতামহ কৃষ্ণকিঙ্কর, পিতামহ ঘনশ্যাম, পিতা রামজয়, সকলেই অধ্যাপক ছিলেন। ঘনশ্যামের না কি কিছু কিছু occult knowledge (অতীন্দ্রিয় জ্ঞানশক্তি) ছিল। তিনি নাকি নখদর্পণে সমস্ত জানিতে পারিতেন। বসাক-বাবুদিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বসাক তখন Treasury-র দাওয়ান। তাঁহার বিমাতার নাম ভাগ্যবতী দাসী। ঘনশ্যাম নখদর্পণ দ্বারা বলিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহাদের বাগান হইতে ঠাকুর উঠিবেন। বাস্তবিক সিংহবাহিনী ঠাকুরের আবির্ভাব হইল। ভাগ্যবতীর যথেষ্ট স্বাধীন সম্পত্তি ছিল। তিনি প্রায় সমস্তই সিংহবাহিনীর দেবোত্তর

করিয়া দিলেন, এবং ঘনশ্যামকে কলিকাতার সিমলায় মালির বাগানে মধ্যে 'চার কাঠা জমির উপর একখানি দ্বিতল বাড়ি কিনিয়া দিলেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মথুরানাথকে ভিক্ষাপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই মথুরানাথ না কি পরম সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার ভিক্ষা-মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; যে সকল সাটিনের পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্টাংশ আমরাও দেখিয়াছি বিলক্ষণ মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু অকালে মথুরানাথের মৃত্যু হয়; সেই শোকে ঘনশ্যাম কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীবাস করিতে গেলেন। ভাগ্যবতী পত্রাদি দ্বারা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন, এবং রাধামাধব নামে এক বিগ্রহঠাকুর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'ইঁহাকে তোমার মৃতপুত্রস্থানীয় জ্ঞান কর।' ঐ ঠাকুরেব মাসিক বৃত্তি ২৩ টাকা নির্ধারিত করিয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত যত দিন ভাগ্যবতী জীবিত ছিলেন, নানাপ্রকারে তিনি এত দিতেন যে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ফলত আমরা বসাকবাবুদের অন্নে প্রতিপালিত, এবং যতদিন আমার জ্যেষ্ঠের চাকরি না হইয়াছিল, আমরা উহাদিগেরই আশ্রিত ছিলাম বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভাগ্যবতীর নিজ গর্ভজাত দুইটি পুত্র,—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সপত্নীপুত্র। প্রাণকৃষ্ণ পর পর দুইবার বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের সন্তান,– উদয়চাঁদ। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তিনি মাতার জীবদ্দশাতেই বিবাগী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। জয়কৃষ্ণ পাগল ছিলেন। ভাগ্যবতীর দেহান্তে উদয়চাঁদ বসাক, এবং তাঁহার দেহান্তে তাঁহার বিমাতা সিংহবাহিনী ঠাকুরানীর সেবায়েৎ হইয়াছিলেন। ঐ বিমাতার দেহান্তে রাধাকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীচাঁদ এবং তৎপরে রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র নির্মলচাঁদ বসাক সেবায়েৎ হন। এখন নির্মলচাঁদ নাই। সেবায়েৎস্বত্ব লইয়া মোকদ্দমা প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত গিয়াছে। সমস্ত ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক হইল, কারণ আমাদের রাধামাধব ঠাকুরের পূর্বোক্ত তেইশ টাকা বৃত্তি উদয়চাঁদের আমলে কমিয়া গিয়া দশ টাকা হয়; এবং বোধহয় ১৮৫৩।৫৪ খ্রীস্টাব্দে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

'কিন্তু অর্থাভাবে আমরা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িলাম না। তখন আমার জ্যেষ্ঠ সংস্কৃত কলেজে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন; আমিও কিঞ্চিৎ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের পিতা তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতেই একপ্রকার আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল। ইহা ব্যতীত, উপরিউক্ত তারিণীবাবুর মাতা আমার অগ্রজকে ভিক্ষাপুত্র লন। পুত্রের মত প্রচুর না হইলেও তিনি যে সকল সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

'পিতৃদেবের দেহাবসান কালে আমার অগ্রজের বয়স এগার বৎসর মাত্র ছিল। পিতার নিকটে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টি ও অভিধান পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ অল্প বয়সে সৎ পরামর্শ দিবার লোক বড় কেহ ছিল না, তথাপি তিনি স্বভাবসিদ্ধ সুমতির প্রভাবে আপনা হইতেই সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। সেই শ্রেণীর অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়. তখন মাসিক ছাত্রবৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তানদিগকে অধ্যয়ন করিবার জন্য আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা ছিল। দাদা যখন ভর্তি হইলেন, তখন সে প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না। পড়িবার পুস্তক কলেজের লাইব্রেরি হইতে পাওয়া যাইত। বোধহয় তিনি ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে কলেজে ভর্তি হন। তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা-প্রণালী কিরূপ ছিল জান? প্রথম চার-পাঁচ বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান হইত। পরে এক বৎসর অভিধানও ভট্টি; তদনন্তর সাহিত্য-শ্রেণীতে রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি কাব্য নাটক যথাসম্ভব অধ্যাপিত হইত। পর বৎসর সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ, এই দুই অলংকার গ্রন্থ-পাঠের জন্য অলংকারের শ্রেণী ছিল। তাহার পর দুই শ্রেণী,—স্মৃতি ও দর্শন। কেহ বা স্মৃতিতে যাইতেন, কেহ বা দর্শনে যাইতেন। কেহ কেহ আবার সাহিত্যাদি শ্রেণীতে দুই দুই বৎসর করিয়া পড়িতেন। আমার দাদা রামকমল সাহিত্যশ্রেণীতে দুই বৎসর, অলংকার শ্রেণীতে নিশ্চয়ই দুই বৎসর, এবং দর্শন শ্রেণীতে একাদিক্রমে চারি বৎসর পড়িয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও চার পাঁচ বৎসর কালমধ্যে ইংরাজি সাহিত্যে,গণিতে ও ইতিহাসে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল তিনি ভরতচন্দ্র শিরোমণিমহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার সময়ে অলংকারের অধ্যাপক ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ; দর্শনের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধ্যাপিত শাস্ত্রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। দাদার মুখে শুনিয়াছি তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে 'বিজ্ঞানরাশি' বলিতেন। ঐ শব্দটি মুদ্রারাক্ষস নাটকে কোনও এক আয়ুর্বেদোক্ত ভিষকবরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। দাদা আমাকে ঐ শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য একদিন বলিলেন—'বিজ্ঞানরাশি কাকে বলে জানিস্? যেমন মনে কর্ আমাদের তর্কপঞ্চাননমশাই। ওঁকে ঠিক 'বিজ্ঞানরাশি' বলা যেতে পারে।' —তর্কপঞ্চাননের বিজ্ঞানরাশিত্ব রামকমলই প্রকৃতরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ তিনি একাদিক্রমে চার বৎসর তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করেন। সে আবার যেমন-তেমন চার বৎসর নহে। গ্রীষ্মাবকাশের দুই মাস কালও রামকমল পাঠের ছুটি লইতেন না। ঐ সময়ও তিনি প্রত্যহ দশটায় আহার সমাধা করিয়া প্রায় দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নারিকেল-

ডাঙায় তর্কপঞ্চাননমহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ন পাঁচটা পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। ফলত একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করা অবধি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অধ্যয়ন ব্যতীত আর কোন কার্য তাঁহার ছিল না। কখন বাটির বাহিরে খেলাধূলার জন্য যাইতেন না। অন্যান্য কার্যের মধ্যে প্রথম প্রথম কিছুকাল বাটির ঠাকুরদিগের সেবা-আরতিতে তিনি কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সতের আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ, এই সকল ধর্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিশিষ্ট নিষ্ঠা ছিল। পরে কিন্তু ইংরাজি অধ্যয়ন ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ বেশি ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল, তত হিন্দুধর্মে শৈথিল্য জন্মিল। অবশেষে তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিকও ত্যাগ করিলেন, ঠাকুর-সেবা হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন আমি ঠাকুরসেবা করিতে লাগিলাম। তোমার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা যাইতেছে? আমার মত ধ্রুবদর্শন-বাদী (Positivist) যে কখনও দেবসেবায় রত থাকিতে পারে, ইহা বোধ করি তুমি কল্পনা করিতে পার নাই। কিন্তু আমিও কায়মনোবাক্যে পূজা, ধূপদান, আরতি প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতাম। সমস্ত চণ্ডী আমার মুখস্থ ছিল। পরে কিন্তু আমিও জ্যেষ্ঠের পশ্চাতে অনুগমন করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব আমাদের দুই ভাইয়ের উপর বড় সামান্য ছিল না। আমি এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, কলিকাতা অঞ্চলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে বৈদিকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই এই অঞ্চলের প্রচলিত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি সর্বব্যাকরণ শিরোমণি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাণিনির বাচ্চাস্বরূপ নানা ক্ষুদ্র ব্যাকরণ আটপৌরে ব্যবহার নিমিত্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোথাও কলাপ, কোথাও সুপদ্ম, কোথাও সংক্ষিপ্তসার, কোথাও সারস্বত, কোথাও লঘুকৌমুদী,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ পরিগৃহীত হইয়াছে। মুগ্ধবোধ ত বোপদেবের রচিত, আর বোপদেব বোম্বাই অঞ্চলে দেবগিরির নগরের লোক ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণখানি এত বড় বড় জেলা ও প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে কিরূপে প্রচারলাভ করিল, ইহা একটি সমস্যার কথা। ঠিক এইরূপ আর একটি সমস্যার কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের মত বাংলাদেশ ব্যতীত আর কুত্রাপি চলে না; অথচ ঐতিহাসিক প্রবাদে যে প্রকার পাওয়া যায়, তাহাতে জীমূতবাহন গুজরাট অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়। এই সকল সমস্যার মীমাংসাকল্পে আমি নিজে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব না।

'তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার সিনিয়র অধ্যাপক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। কয়েক মাস পরে ইনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছু দিন আমি একা কার্য চালাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব আত্মীয়তা ছিল। রাজকৃষ্ণ কখনও ইস্কুল-কলেজে পড়েন নাই; পণ্ডিতদিগের সাহচর্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহাকে নিযুক্ত করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর সচেষ্ট হইলেন। তখন স্যার সেসিল বীডন বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রাজকৃষ্ণ বাংলার জুনিয়র অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে আমাকে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়। আমি সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিয়া প্রিন্সিপ্যাল সট্‌ক্লিফ্‌কে একটি পত্র লিখি। বোধ করি সে পত্র এখনও প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে আছে। ইতিহাসের অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েল্‌কে সট্‌ক্লিফ সেই পত্র দেখান। কাউয়েল আমাকে বলিলেন—'Your scheme is too ambitious; তুমি 'কাদম্বরী' প্রভৃতির নাম করিয়াছ?' কাউয়েল সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; গফ্‌ সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া তিনি 'কুসুমাঞ্জলি' অনুবাদ করেন। 'কুসুমাঞ্জলি'র রচয়িতা উদয়নাচার্যের কালনির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি লিখিলেন—a fixed star whose distance in time cannot be measured। রাজকৃষ্ণ প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন। আমিও ঐ দুই ক্লাসে কিছু কিছু পড়াইতাম। মাঝে মাঝে একটু একটু খিটমিটি লাগিত। মনে পড়ে এক দিন 'মুনিপুঙ্গব' শব্দটির সমাস আমি পাণিনির নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম—মুনিঃ পুঙ্গব ইব; ছেলেরা আবার রাজকৃষ্ণকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—মুনিষু পুঙ্গবঃ। ছেলেরা একটু কৌতুক অনুভব করিল। কয়েক দিন পরে তিনি ছেলেদের বলিলেন—'না তোমরা ঐটেই বোলো, মুনিঃ পুঙ্গব ইব।' কলেজে ছাত্রসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইল, সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হরিশ বিদ্যারত্নকে আমি তৃতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করাইয়া দিলাম।

'সংস্কৃত প্রবর্তনের পূর্বে আমাকে বাংলা পড়াইতে হইত। কাশীদাশ কৃত্তিবাস হইতে কিছু কিছু বাছাই করিয়া পড়াইতাম। যতদূর মনে পড়ে, ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র পড়িত। সে পরে হুগলিতে ও কলিকাতা হাইকোর্টে একজন বড় উকিল হইয়াছিল; যদি আরও কিছু দিন বাঁচিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে হাইকোর্টের জজ হইত। আল্‌ফ্রেড্‌ ক্রফট্‌ দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া প্রথম প্রথম কিছু বিপন্ন হইয়াছিলেন; ত্রৈলোক্য তাঁহাকে ফিল্‌জফির ধর্‌তা ধরাইয়া দিল। দেবেন্দ্র

ঘোষও বোধ হয় ক্লাশে পড়িত। ইংরাজি হইতে বাংলায় অনুবাদ সে অতি সুন্দররূপে করিতে পারিত। 'স্পেক্টেটরে'র কোনও কোনও অংশ অনুবাদ করিতে দিতাম। আমার মনে আছে সে 'eccentric' শব্দটার বাংলা প্রতি-শব্দ দিয়াছিল—'সৃষ্টি ছাড়া'। সে পরে আলিপুরের বড় উকিল হইয়াছিল। শুনিয়াছি, তাহার একটি ছেলে হাইকোর্টের জজ হইয়াছে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে রাসবিহারী ঘোষ ছাত্র ছিল। 'মেঘনাদ বধ' প্রকাশিত হইলে আমি উহা কলেজে ধরাইয়া দিলাম। 'সম্ভাবশতক' পঠিত হইত। বাংলা কবিদিগের রচনা হইতে অলংকারের নানা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া একখানি পুস্তক লালমোহন ভট্টাচার্য রচিত করিলেন। সেটি পড়াইতে হইত। আমার দাদার 'বেকনের সন্দর্ভ' রাসবিহারী কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। মুখস্থ করিবার শক্তি তাহার অসাধারণ ছিল। ক্লাসে পরীক্ষার সময় একবার সে জর্জ পেনের মেণ্ট্যাল ফিলজফির ভাষা এমনভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিল যে, পরীক্ষক মনে করিলেন সে চুরি করিয়া লিখিয়াছে। তখন সে দাঁড়াইয়া সমস্তটা অনর্গল বলিয়া গেল। মুখস্থ করিবার শক্তি সারদাচরণ মিত্রেরও খুব ছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণখানা সে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।'

* * *

অনেক দিন পরে আজ পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের চরণবন্দনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইল। দুই একটি কথার পর তিনি বলিলেন, 'মানসী'তে মায়ের ছবি সব দেখিলে আমার ইচ্ছা করে ঐ ছবিগুলি তুলিয়া ধরিয়া মেয়োবিবির 'মাদার ইণ্ডিয়া'র (Mother India) জবাব দিতে। ...বিদ্যাসাগরের মা'র চেহারা দেখিলে?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম; 'বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মাকে আপনি কখনও দেখিয়াছিলেন?' তিনি বলিলেন; 'না। বিদ্যাসাগর কলিকাতায় একলাই আসিতেন, মা দেশে থাকিতেন। এখন যেখানে কিং কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান, ঐখানে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর লোকজন লইয়া থাকিতেন; তাহার পূর্বে বৌবাজারে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যের পৈতৃক বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। রাজকৃষ্ণ পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধাংশ লইয়া দাদা নীলকমলের নিকট হইতে পৃথক হইলেন এবং সুকিয়া স্ট্রীটে নূতন বাড়ি করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর অধিকাংশ সময় ঐখানে অতিবাহিত করিতেন। ঐ বাড়িতেই প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। আমি তখন কলেজে পড়ি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ;—লোকে লোকারণ্য, ভয়ানক গোলমাল,—কিন্তু বিধবাবিবাহ সুশৃংখলে সম্পাদিত হইল। কয়েক বৎসর পরে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ হইল, তোমরা জান না বোধ হয় যে এই বিধবাবিবাহ-প্রচলন সিপাহী-

বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল। শুধু দাঁত দিয়া টোটা কাটা নয়,—বিধবাদের বিবাহ দিয়া ইংরাজ হিন্দুর সর্বনাশ করিতেছে, এইরূপ একটা রব উঠিয়াছিল। এই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আজকাল দেখিতে পাই সাধারণত লোকের একটা ধারণা আছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার আগ্রহে এই বিধি প্রচলিত হয়; কিন্তু আমি বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের মুখে একটু অন্যরূপ শুনিয়াছি। যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'মা আমি একটা কাজ করিতে যাচ্ছি, তাতে তুই কি বলিস্? (বিদ্যাসাগর শেষপর্যন্ত মাকে 'তুই তোকারি' এই ভাবে কথা কহিতেন)। আমার বোধ হয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি তাই বিধবাবিবাহের আইন পাশ করাবার চেষ্টা করব ভাবছি; কিন্তু আগে আমি তোর একটা মত নিতে ইচ্ছা করি। এ কাজ তুই ভাল বলিস্ কি না?' মা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন; 'তুই কি ঠিক বুঝেছিস্ যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত?' আমি বলিলাম—'হ্যাঁ। আমি অনেক বিবেচনা করে দেখলাম যে, বিধবার বিবাহই শাস্ত্রসম্মত,—এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।' তখন তিনি বলিলেন, 'তবে আমি তোকে বারণ করি না, তুই এ কাজ করগে যা; —যে যা বলে বলুক।'

'বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, অত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন্ দেশে একজন পণ্ডিত একখানি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রচনা করিয়াছিলেন বল দেখি? কিন্তু বহু-বিবাহ আন্দোলনের সময় তারানাথ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমস্ত বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। আমরা তখন ফরাসিবিপ্লব-সাহিত্যে মস্‌গুল; বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপাত্মক রচনা পাঠ করিয়া ভল্‌টেয়ারকে মনে পড়িত। তারানাথ বিদ্যাসাগরের উপর রাগ করিয়া সমগ্র কায়স্থজাতির উপর চটিয়া গেলেন। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু ছিলেন কায়স্থ কুলতিলক শ্যামাচরণ বিশ্বাস। শ্যামাচরণের উপর রাগ হইল বিদ্যাসাগরের জন্য, এবং সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর রাগ হইল শ্যামাচরণের জন্য। বাচস্পত্যভিধান রচনায় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম। কতক কতক প্রুফ আমাকে দেখিতে হইত। 'কায়স্থ' শব্দের অভিধানিক ব্যাখ্যায় গ্লানিসূচক শ্লোক দেখিয়া আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয়বিনয় করিয়া সেই শ্লোকটি এবং আনুষঙ্গিক অপব্যাখ্যাটুকু বাদ দিতে প্রবৃত্ত করাইলাম।

'সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতসম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা জানি না, তারানাথের বিষয়বুদ্ধি কিন্তু অনন্যসাধারণ ছিল। শালওয়ালাদের নিকট হইতে শাল

আনিয়া তিনি ধনী গৃহস্থ বাড়িতে 'ফিরি' করিয়া বিক্রয় করিতেন। বোধ হয় তাঁহার ধারণা ছিল যে পশুলোমজাত বস্ত্র পণ্য হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় করিতে ব্রাহ্মণের কোনো বাধা নাই। একবার এক সভায় তর্কস্থলে তর্কবাচস্পতি বলিলেন,আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমি ব্যাবসা ছাড়িয়া দিব।' প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ ব্যাবসা মহাশয়? —শাস্ত্রব্যাবসা না শালের ব্যাবসা?' তাঁহার নিজ গ্রাম অম্বিকা-কালনায় তিনি একটা সুরকির কল বসাইলেন, গ্রামবাসীরা অস্থির হইয়া উঠিল, কেহ তখনও সুরকির কল দেখে নাই। সংস্কৃত পুঁথি সম্পাদন ( edit ) করিয়া প্রকাশিত করিতে অনেক সময় লাগিবে, তাই তিনি বহুসংখ্যক পুঁথি যেমনটি ছিল তেমনই ভাবে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশিত করিলেন। পুত্র জীবানন্দ অনেকস্থলে কিছু কিছু পাদটীকা সংযোজিত করিয়া দিতে লাগিলেন। জীবানন্দের সংস্করণ মার্কিনে ও ইউরোপে এমন সমাদর লাভ করিল যে একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব হতাশভাবে বলিয়াছিলেন, ঐ জীবানন্দ লোকটার (That fellow Jibananda) সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তারানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণ সর্বত্র সমাদৃত ছিল। সেই নামের অনুকরণে জীবানন্দের পুত্রগণের নামকরণ হইয়াছিল। বাচস্পতি অভিধান রচনা করিয়া তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গেল।

'মানসীর একজন লেখক, রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইহা তিনি কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। আমি কখনও এ কথা শুনি নাই। এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার কৌতূহল হয়। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ খুব বড় উকিল ছিলেন; সকলেই আশা করিয়াছিল তিনি জজের আসন অলংকৃত করিবেন; যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, তিনি রোগশয্যায় পড়িলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্বোপার্জিত বাইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হরিমোহন ও প্যারীমোহনকে আমি কিছুদিন পড়াইয়াছিলাম। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুদিন তাহাদের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় আমি এই অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হই। রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়িতে পড়ানর ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্কুলের একটি ঘরে ছেলে দুটি পড়িতে আসিত। লোকে বলিত যে, রামমোহন রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় হইলে ভাল হইত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি character ছিলেন। শুনিতে পাই, যখন হিন্দু কলেজে তিনি পড়িতেন তখন সতীর্থদের সহিত পাল্লা দিয়া অনেক সময় কাণ্ড করিয়া বসিতেন যাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ অস্থির হইয়া উঠিত। একদিন কথা হইল যে ক্লাসের মাঝখানে সকলের সম্মুখে জামা

ও চাদর পরিত্যাগ করিতে হইবে,—কে পারে ? বালক জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যতীত আর কেহই পারিল না। ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন একবার জজের সম্মুখে অবজ্ঞার সুরে বলিলেন : If the authors of Hindu Law knew anything about it, I would not have to stand before your lordships to expound it. পিতার সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেন ঐ ওকালতির টাকা আমি স্পর্শ করিব না। পরে কিন্তু ঐ সম্পত্তি লইয়া গ্রান্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছিল। বিপত্নীক জ্ঞানেন্দ্রমোহন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর দানপত্রে যে বিলাতী entail-এর ব্যবস্থা করিলেন, আদালতে তাহা টিকিল না। এখানে স্যার বার্নস পিকক্ বলিলেন যে, কেবল একজনকে দিব না এই কথা ক্রমাগত বলিয়া উইল করা মোটেই ঠিক হয় নাই ; বিলাতের আদালত বলিলেন যে কোনও একজন হিন্দু সমগ্র হিন্দু আইনকে উলটাইয়া দিতে পারেন না ; বিলাতী entail হিন্দু আইনে কিছুতেই খাপ খায় না ; কাজেই যাহারা এখনও জন্মায় নাই, তাহাদের উল্লেখ করিয়া কোন হিন্দু উইল করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টে অকারণ আমার কিছু প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। আমার 'টেগোর ল' লেকচার' লইয়া কিছু নাড়াচাড়া হইল। মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি বলিলেন, ঐ যে unborn generations, ওটা আগে কেহই জানিত না, তুমিই উহার জন্মদাতা।' আমি ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিতাম। তিনি বলিতেন : I know, I know—you are the Father of unborn generations। অ্যাডভোকেট জেনারেল পল সাহেবের মুখেও একদিন ঐ সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত সুখ্যাতি লাভ করিলাম। অথচ বাস্তবিক আমি এ সুখ্যাতি পাইবার উপযুক্ত পাত্র কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তারপর যখন স্যার সৈয়দ আমেদের পুত্র জস্টিস মামুদ তাঁহার রায়ের মধ্যে আমার লেকচার হইতে প্রায় দেড় পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া এলাহাবাদে আমার নাম জাহির করিয়া দিলেন, তখন আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

'মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জিকে একবার বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, ব্যানার্জি সাহেব জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বুঝাইয়া তাঁহার স্বত্বটুকু বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত করাইবেন। ব্যানার্জি সাহেবের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবা-মাত্রই জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিলেন : 'কেন আমার স্বত্ব বিক্রয় করিব ? আমি বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছি ; নগদ কতকগুলো টাকা পাইলে ইহার অধিক আমার আর কি হইবে ?' পিতার উপর তাঁহার আক্রোশ ছিল বটে, কিন্তু একবার তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিছু খারাপ হওয়ার জন্য তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে তাহাদের পিতামহের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি character। তারক পালিত ও ডব্লু. সি. ব্যানার্জির সহিত তিনি মুরুব্বির মত ব্যবহার করিতেন। পালিতের পিঠ চাপড়াইয়া একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন 'after all you have a mind'। ব্রাহ্মধর্মের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, 'Religion? Religion is not for men. It is for women.' শেষ বয়সে তিনি পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন ও প্রবাসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'রামমোহন রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলে ঠিক মানাইত একথা লোকে বলিত বটে কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথও উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। একবার একটী ধনী গৃহস্থ ঋণের দায়ে পৈত্রিক ভদ্রাসন বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বাড়িটি যে দিন বিক্রয় করা হইবে, দ্বারকানাথ সেইদিন সেই বাড়ির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। একটি শিশু তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা এরা কা'রা?' মা বলিলেন' 'এই বাড়ি এখন এরা কিনবেন।' 'তবে আমরা কোথায় যাব?' 'ভগবান আছেন, আশ্রয় দেবেন।' দ্বারকানাথ সব শুনিলেন; কর্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঐ ছেলেটি কে?' উত্তর হইল, 'এই গৃহকর্তারই পুত্র।' প্রিন্স দ্বারকানাথ ছেলেটিকে কাছে ডাকিলেন, সস্নেহে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন; 'তোমারা কোথাও যাবে না বাবা, এই বাড়িতেই থাকবে এ বাড়ি তোমারই রইল।'

'জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বিলাতে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন কি না ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগকে তিনি কিছু দিন বাংলা শিখাইয়াছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রীতিমত বাংলা অধ্যাপনা আরম্ভ হইল, আমার সময় হইতে। সিনিয়র অধ্যাপক রাম মিত্তির একটি character ছিলেন। নিরীহ ছাত্রকে সামান্য ত্রুটির জন্য হয়ত শাসন করিতেন, কিন্তু দুষ্ট ছেলের কাছে জব্দ হইতেন। তারক পালিত তখন সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ে; পণ্ডিত মহাশয় যে বই পড়ান তাহার এক সতীর্থ বন্ধু সে বই সেদিন ক্লাসে আনে নাই; রাম মিত্তির তাহাকে একটি চড় মারিলেন, তারক বলিল; 'পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ওকে মারলেন?'

'হ্যাঁ মেরেছি, ও বই আনে নি কেন?'

'আমিও ত বই আনি নি—আমাকে মারুন দেখি।'

অতি কোমল স্বরে পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন, 'তুমিও বই আননি! আচ্ছা বাবা, পাশের ছেলেটির বই দেখে পড়।' এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে, এনসাইক্লোপিডিয়া হইতে বিটনের বংশ সম্বন্ধে তিনি কিছু পড়িয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে কার্ডিন্যাল বিটন-সম্বন্ধে আলাপ করিয়া রাম মিত্তির বলিলেন, 'আহা, আর

একজন পণ্ডিত আপনাদের বংশে ছিলেন। তিনি গ্যালিলিওর জীবন চরিত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারও নাম ড্রিংকওয়াটার বিটন।' 'তিনি আমার পিতা; তোমার দেখিতেছি অনেক জানা শুনা আছে।' এই বলিয়া সাহেব রাম মিত্তিরের পিঠ চাপড়াইতে লাগিতেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিবার পূর্বে তিনি একটি স্কুলে ইংরাজি পড়াইতেন; সেখানে তাঁহার সুযশ হওয়ায় মাসিক তিন শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, অধ্যাপক রাম মিত্তির আমার জন্য একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিবার ভার বিশেষ ভাবে আমার উপর ন্যস্ত হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নাম ছিল গিরিশ, তিনি তাঁহাকে 'বাবা গিরিশ' বলিয়া ডাকিতেন, কলেজের সব ছেলেরাই ক্রমে তাঁহাকে 'বাবা গিরিশ' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পণ্ডিত মহাশয়ের একটু প্রতিপত্তি ছিল।

'ধর্ম' সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মন্তব্য তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ত তবু রিলিজনটাকে বিশেষ স্ত্রীলোকের সামগ্রী বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার কি ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজে দেখিয়াছ কি? সরকার নাকি হুকুম জারি করিয়াছেন যে, তরুণ শিক্ষার্থীদিগের সম্মুখে গড্ ও রিলিজন্ উপস্থাপিত করা চলিবে না; ভগবানে ও ধর্মে বিশ্বাস তাঁহাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তরায়। দেখ, অনেক পূর্বে কারলাইল যীশু খ্রীস্টের প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, The game is played out'। আজ তিনি জীবিত থাকিলে কি বলিতেন? জার্মানির দুরবস্থা দেখিয়াই বা তিনি স্থির থাকিতেন কি?

* * *

'গিরিশবাবু ও তাঁহার অগ্রজদ্বয় ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারিতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের ছাত্র না হইয়াও তাঁহারা তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাপ্তেন সাহেবের কাছে বোধ হয় তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। বিদ্যানুরাগ তাঁহাদের শেষ পর্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। সরকারি কাজ করিয়াও পত্রিকা পরিচালনে গিরিশবাবু যে দক্ষতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজকাল তোমরা কল্পনা পারিবে না। হিন্দু-প্যাট্রিয়ট যখন কালীপ্রসন্ন সিংহের টাকায় জমিদারের করিতে মুখপত্র দাঁড়াইয়া গেল, তখনই মূঢ় মূক রায়তের বাণীস্বরূপ বেঙ্গলির আবির্ভাব হইল। গিরিশ ঘোষ কোনও কারণে ন্যায় ও সত্য হইতে ভ্রষ্ট-

হইতেন না। তাঁহার সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল ; অথচ তিনি তাঁহার কাগজে আমার 'বিচিত্রবীর্যে'র যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। ধীরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি অবিচার করেন নাই। আমার সেই সংস্কৃত ভাষাবহুল রচনাকে তিনি অন্যান্য বিশেষণের মধ্যে turgid আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ছাত্র চন্দ্রনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে 'বিচিত্রবীর্যে'র প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় একবার অন্বেষণ করিতে, কোথাও সেই ম্যাগাজিনের সে খণ্ডটি পাওয়া যায় কি না।

'দীর্ঘকায় বিপুল বলিষ্ঠ গিরিশ ঘোষ অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি বেলুড়ে কিছু জমি কিনিয়া বাড়ি নির্মাণ করিলেন, স্বহস্তে কোদাল লইয়া বাগানে ভূমি খনন করিতে ভালবাসিতেন। আমার দাদাকেও তিনি তাঁহার জমির নিকটে একটু ভূমি ক্রয় করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে বাড়িতে যাইবার পূর্বেই আমার অগ্রজের অপমৃত্যু ঘটিল। এই মাটি খোঁড়ার কথায় বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়িয়া যায়। পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, সংস্কৃত কলেজের এক অংশে যখন তিনি থাকিতেন, তখন কুস্তি করিবার জন্য সেইখানে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই জমিতে তিনি কুস্তি করিতেন। ইহাতে তাঁহার লজ্জা-সঙ্কোচ বিন্দুমাত্র ছিল না। বিদ্যাসাগব পাল্কি চড়িতেন, ঘোড়ার গাড়ি চড়িতে সহজে রাজি হইতেন না, বলিতেন যে, পাল্কি চড়ায় কোনো দোষ আছে মনে করি না। ঘোড়ার গাড়ি চড়ায কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি। ঘোড়াগুলোকে তাদের অনিচ্ছায় আমাকে বহন করিতে বাধ্য করান হয় ; কিন্তু পাল্কি বেয়ারারা স্বেচ্ছায় অর্থের প্রত্যাশায় আমাকে বহন করে। এই জন্য এক হিসাবে ঘোড়ার গাড়ি চড়া কতকটা ımmoral মনে করি।'

## বিদ্যাসাগরের চরিত্র

### শিবনাথ শাস্ত্রী

আমার মাতুলের পরেই যাঁহার সংস্রবে আসিয়া আমি বিশেষ রূপে উপকৃত হই, তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমি ১৮৫৬ সালে নয় বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসি। আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হই। তখন বিদ্যাসাগরমহাশয় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাহা নহে, বন্ধুতা-সূত্রে আমার মাতুলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসাতে আসিতেন। অগ্রেই, বলিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিলেই হাতের দুই অঙ্গুলি চিমটার মতো করিয়া আমার ভুঁড়ির মাংস টানিয়া ধরিতেন। এই ভয়ে, তিনি আসিয়াছেন জানিতে পারিলেই, আমি সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আসিয়াই আমাকে খুঁজিতেন, আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন! আমার বাবাকেও অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন এবং মাতুলের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া বিচার উপস্থিত হইলে, বাবাকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন। বাবার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

কলেজে আমরা তাঁহাকে ভয়ের-সঙ্গে দেখিতাম এবং দূরে-দূরে থাকিতাম। ছেলেরা দুষ্টামি করিলে তিনি ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেন, কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন এবং বইয়ের পাতাকাটা স্লাইসের দ্বারা তাহাদের পেটে মারিতেন। আমার যেন মনে হয়, আমার কোন দুষ্টামির জন্য আমাকে ধরিয়া লইয়া আমার ভুঁড়িতে মারিয়াছিলেন ও আমাকে কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা কলেজের ছোটবড় সকল ছেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন ক্ষণজন্মাপুরুষ বলিয়া মনে করিতাম। আমার বেশ মনে আছে, তিনি যখন ডিরেক্টরের সহিত ঝগড়া করিয়া কলেজ ছাড়িলেন, তখন আমরা গবর্নমেন্টের উপর মহা চটিয়া গিয়াছিলাম। তিনি যেন আমাদের প্রাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

তাহারপর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার সঙ্গে আরও গাঢ় যোগ হইতে লাগিল। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে বাবার যে ক্লেশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারও মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল। বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মানুষ যেমন ছেলে যমকে দেয়, তেমনি আমি ছেলে কেশবকে দিয়াছি।' তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু পথে ঘাটে আমার সঙ্গে দেখা হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই করিতেন: 'হ্যাঁ রে তোর কেমন করে চলে?' আমি গৃহ-তাড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছি, এই মনে করিয়া তাঁহার ক্লেশ হইত।

আমি গবর্নমেন্টের চাকুরি যখন ছাড়িলাম, তখন একজন গিয়া তাঁহাকে

বলিলেন ঃ 'মশাই, পাজিটা এমন সুখের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।' তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ 'কোন পাজির কাছে বলছ? সে তো আমার মনের মতো কাজ করেছে।'

কেহ তাঁহার নিকট গিয়া আমাকে গালাগালি করিলে, তিনি আমার ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশের জন্য দুঃখ করিতেন ; কিন্তু বলিতেন ; 'যাই বল, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করেনা।'

আমি নানা স্থলে নানা অবস্থাতে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃতির গুণ সকল দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম। এইরূপ দয়াবান, সদাশয়, তেজীয়ান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমার প্রণীত 'প্রবন্ধাবলী'-নামক গ্রন্থে 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে তাঁহার অনেক গুণের উল্লেখ করিয়াছি।

## বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে

'অনেকদিন' 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার তিনি একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে (অক্ষয় কুমার দত্ত) আমরা জানিতাম। ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া বিদ্যাসাগরের দলে মিশিলেন। বিদ্যাসাগরের কথায় তিনি 'চারুপাঠ' প্রভৃতি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইল।

প্রশ্ন করিলাম—বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?' উত্তর হইল—ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী। এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন? যেটা আমার অনুভূতির সামগ্রী সেটাকে হয়তো আমি বাহিরে Present করিতে পারি না; খানিকটা represent করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। সব জিনিসই কি বাহিরে আমরা Present করিতে পারি? Represent করা ছাড়া আমাদের উপায় কি আছে?' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (পুরাতন প্রসঙ্গ)

দেবেন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তকে নাস্তিক বলতেন।

রামকৃষ্ণদেবের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে। যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাইরের কাজ যা কচ্ছে সে সব কম পড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়-মধ্যে ঈশ্বর আছেন একথা জানতে পারলে তারই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেকদিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল, দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা, এদেরই উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা।

(কথামৃত, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ)

বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরকে রামতনু লাহিড়ির মতো মহাত্মা ভাবতে পারেন নি ঈশ্বরে তথাকথিত ভক্তির অভাব ছিলো বলে। লণ্ডনে ইউনিটেরিয়ানদিগের নেতা গুরু ও আদর্শ জেমস মার্টিনোর কথাগুলি যেন শিবনাথ বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধেও বলতে চান ঃ

'কেবলমাত্র ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে ধর্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে এই এক বিপদ আছে যে, ধর্মভাবসম্পন্ন

ভক্তিপ্রধান ব্যক্তিদিগকে সেইরূপ সমাজে তৃপ্ত করিয়া রাখা যায় না। দেখ, আমারই স্ব-সম্পর্কীয় কতকগুলি লোক আমাদের অবলম্বিত ইউনিটেরিয়ান ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া ত্রিত্ববাদী খ্রীস্টীয় দলে প্রবেশ করিয়াছে,এবং এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে, যাহারা একেবারে নিরীশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছে।

( আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ২২৬, বিশ্ববাণী সংস্করণ )

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সরাসরি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলেছেন ঃ

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সেই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুজ্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন ; ললিত সেই সময় যেন কতকটা যোগসাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন ; 'হ্যাঁ রে, ললিত, আমার ও পরকাল আছে নাকি ?' ললিত উত্তর দিতেন, 'আছে বই কি। আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার ?' বিদ্যাসাগর হাসিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই ; ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্র বিপ্লবের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ কবিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল ; চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন ; বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

( পুরাতন প্রসঙ্গ )

তাঁর ধর্মজীবন সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাঁর কাছে ধর্ম জীবন কর্মগত ছিল কাজই তাঁর কাছে ধর্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, 'বোধোদয়ে' আমরা তার নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন—'বাসুদেব চরিত'। প্রতিমাপূজা তিনি লৌকিক ভাবেই দেখতেন। কেননা বাড়িতে ত কোন পুজা হতে দেখি নি। মোটের উপর মনে হয় তিনি Agnostic সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি বলতেনও—'যেটা পারবি সেইটে কর।' লোকসেবাই তাঁর ধর্ম ছিল। তাঁর নীতি ছিল লোককে না ঠকানো। তিনি বলতেন, দুনিয়ার মালিক যদি অনন্ত দয়ালু হত ত এত কষ্ট সংসারে থাকত ? লোকে এত কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে, দয়াময় হরি আছেন, আর ভাবনা কি ?' আবার তাঁকে এ-ও বলতে শুনেছি—বিশু খৃস্টের ধর্ম ভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়েছে, ওটা

আমাদের ধাতে ঠিক মিশ খেতো। ইউরোপে গিয়ে পড়ে একরকম অপাত্রে পড়েছে।

এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে তিনি বলেছিলেন—তারা বলছে শুনলাম আমরা মুশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, আরে বাপু ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য মরে ত ভূত হয়ে গিয়েছে, পায়ের ধুলো কিরে বাবা?' আর এক সময়ে তিনি বলেছিলেন—বয়স ঢের হয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক একটা দেখিনি। সকলেই নীচের দিকে তাকায়। উপরের দিকে কেউ তাকায় না।' কেশববাবু বলেন যে তাঁতে ভক্তির দিকটা কম ছিল।

অনেকদিন কেটেছে এমন যে বিকেল থেকে ঠার ঘরে বসে গল্পগুজব হতে হতে রাত হয়ে গেছে, সেখানেই খাবার-টাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ত দেখিনি।

ক্ষুদিরাম বসু

মাতার মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর যে ধর্মীয় আচারপ্রথা পালন করেছেন, তাতে তাঁর নাস্তিকতার পরিচয় নেই। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন:

'জননীর মৃত্যুসংবাদে অগ্রজ মহাশয় যৎপরনাস্তি শোকাভিভূত হয়েন। দিবারাত্রি রোদন করিয়া সময়াতিপাত করিতেন। দশাহে যথাশাস্ত্র কলিকাতার অতি সন্নিহিত কাশীপুরস্থ গঙ্গাতীরে চন্দনধেনু করিয়া ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করেন। শাস্ত্রানুসারে এক বৎসর কাল শোকচিহ্নস্বরূপ স্বহস্তে নিরামিষ পাককরতঃ এক সন্ধ্যা ভোজন করিয়া, শরীর ধারণ করিতেন। চর্মপাদুকা, আতপত্র, পালঙ্ক প্রভৃতি সুখসেব্য (দ্রব্য ও বিষয়) গুলি এক বৎসরের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। কয়েকমাস বিষয়কার্য পরিত্যাগপূর্বক নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেন। (বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, পৃষ্ঠা ২০৪-৫)

ভগবতী দেবীর ধর্মবোধই বিদ্যাসাগরের মধ্যে কাজ করছিলো, ভগবতী দেবী তাঁর এই অপৌত্তলিক ধর্মবোধলাভ করেছিলেন তাঁর তান্ত্রিক পিতৃদেবের কাছ থেকে:

'এই' প্রবীণা গৃহিণী মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন: 'আমার মা বলিতেন, যে-দেবতা আমি নিজে হাতে গড়িলাম সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? খাঁশ, খড় দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গড়ে পুজো করে কি ধর্ম হয়।' ইহা হইতে বুঝা যায় তাহার ধর্মজ্ঞান কেমন স্বাভাবিক, কত সরল ও নির্মল ছিল। (বিদ্যাসাগর: চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

"এক দিবস দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে দুই জন ধর্ম প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্বক

জিজ্ঞাসা করিলেন, "'বিদ্যাসাগরমহাশয় ! ধর্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলুস্থুল পড়িয়াছে, যাহারা যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এবিষয়ের কিছুই ঠিকানা নাই ; আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের, মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।' ইহা শুনিয়া তাঁহারা আরও পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব 'না'—এই বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

'এক দিবস মৃত্যুরাজ, কর্মচারিগণসহ কাছারি খুলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আনিলে, মৃত্যুরাজ তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করিয়া কি জন্য অমুকের উপাসনা করিলে? উপাসক বলিলেন, আমার অপরাধ নাই, অমুক ধর্ম-প্রচারক আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তদনুসারে কার্য করিয়াছি। এই কথায় মৃত্যুরাজ, উপাসকের প্রতি পাঁচ বেতের আদেশ দিয়া, তাহাকে এক সন্নিহিত বৃক্ষতলে রাখিতে বলিলেন। এইরূপ তিন-চারি জন উপাসককে দণ্ড দিবার পর, আপনার মত একজন ধর্ম-প্রচারক আনীত হইলেন। ঐ ধর্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যাসাগরের উপদেশানুসারে আমি অমুক উপাসনা করিয়াছি এবং অনুগামী ব্যক্তিদিগকেও ঐ উপাসনার উপদেশ দিয়াছি। মৃত্যুরাজ, প্রথমত তাঁহার নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া, অনুগামী উপাসকদিগকে আনাইয়া, প্রত্যেকের হিসাবে পাঁচ-পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এরূপ দুই তিন জন প্রচারকের পর, আমিও মৃত্যুরাজের সম্মুখে নীত হইলাম। প্রথমত আমাকে নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া, প্রত্যেক উপাসক ও প্রত্যেক প্রচারকের হিসাবে পাঁচ-পাঁচ বেত হুকুম দিলেন। ইহাতে আমার শরীরে তিলার্ধ স্থান রহিল না ; তথাপি বহুসংখ্যক বেত বাকি রহিল এবং অবশিষ্ট বেত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ বেত খাইতে হইল।' এই কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আমার বোধ হয় যে, পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ এই তর্ক থাকিবে ; কস্মিনকালেও ইহার মীমাংসা হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, মহাভারতে বেদব্যাস লিখিয়াছেন, বকরূপী ধর্মরাজ, এই মর্মে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন :

বেদা বিভিন্নাঃস্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্যমতং ন ভিন্নং

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

বিদ্যাসাগরের একটি ধর্মবোধ ছিলো, সে বোধ একান্তই নিজের গোপন, নিভৃত, তাকে বাইরে কখনোই প্রকাশ করতে চাইতেন/না। কেননা ধর্মবোধ ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। ধর্মের তত্ত্ব গুহাহিত ও নিহিত জানতেন বলেই বাইরে

তাকে কখনো প্রকাশ করতে চান নি। বাইরের ব্যবহারে কর্ম প্রণালীতে মানুষের সেবায় ও দয়ায় যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে, সেরূপের মধ্যে কোঁতের চিন্তার মূর্তরূপ অনেকাংশেই দেখা যায়। বঙ্কিম কোঁৎ-দর্শন প্রবন্ধে যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কর্মের অনেক জায়গায় মিল :

১. 'যিনি কারণজ্ঞান মানুষের সাধ্যাতীত বলেন, তিনি যে বিশ্বের আদি কারণজ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার মতে বিশ্বের উৎপত্তির বিষয় মনুষ্য কখনই জানিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা বৃথা।'

২. 'কোমৎ বলেন, যখন মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক নিয়মসকল ভালরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন দৈব বলে বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হইবে।'

৩. 'মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর আছেন বলিয়া কর্মফল হয়, এমন নহে, তিনি থাকিলেও হইবে, না থাকিলেও হইবে।' এই বচন সাংখ্যদর্শন, কোমৎ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূলসূত্র বলিলে বলা যায়। এ পর্যন্ত কোমতে ও কপিলে মিল আছে।'

৪. 'ওগুস্ত কোমতের মতে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কর্তব্যানুষ্ঠানই পুরুষার্থ। 'কর্তব্যানুষ্ঠানেই মানবাধিকার'—ইহা তাহার প্রসিদ্ধ বচন। কর্তব্যসাধনে আমাদের সুখ হইতে পারে, কিন্তু সুখ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে।'

৫. 'কোমতের আর এক বচন পরোপকারার্থে জীবনধারণ'। সমস্ত মানবজাতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হওয়া কর্তব্য। এই দেবের নাম 'পরমসৎ' (Grand etre) রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, কালে সকলে অন্যদেবের উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরম সতের উপাসনা করিবে। যে পরিমাণে উপচিকীর্ষাবৃত্তি স্বার্থপরতাকে জয় করিবে, যে পরিমাণে মনুষ্যজাতি স্বার্থবিরত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সেই পরিমাণে পরম সতের সেবা হইবে ও পুরুষার্থ লাভ হইবে।'

(এই আদর্শের প্রভাবেই বঙ্কিমের কমলাকান্ত বলে : 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।')

'কেবল উপচিকীর্ষার দ্বারায় সম্যক উন্নতি লাভ করা দুঃসাধ্য। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিস্নেহ আমাদের উন্নতির এক প্রধান সোপান। কোমতের রূপে ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতিরূপা ভার্যা এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা।'

কমলাকান্তের উক্তিতে এরও প্রতিফলন আছে।

৬. 'কোমতের মতে যে-দ্রব্য আহার করিলে আমাদের বলাধান ও স্বাস্থ্য-বর্ধন হয়, তাহাই আহার করা উচিত। ' শরীরের বলাধানের একমাত্র উদ্দেশ্য

পরমসত্তের সেবা। তিনি সুরাপানের দোষ দিয়া সুরাপান প্রতিষেধকারী মহম্মদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কামরিপু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই রিপু সকল রিপু অপেক্ষা দুর্দান্ত এবং ইহার শাসন বহুকাল পর্যন্ত চিত্ত-শাসনের প্রধান উপায় থাকিবে।'

যুগের প্রভাবে কোঁতের এই সব চিন্তার স্পর্শ অথবা সাদৃশ্য বিদ্যা-সাগরের জীবনে একেবারে না এসেছে, মনে করবার কোনো কারণ নেই। ফোরবেস 'Positive Son in Bengal' বইয়ে তা দেখিয়েয়েছেনও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের নিভৃত হৃদয়ের গোপনে দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে ব্রাহ্ম-ঐতিহ্যে, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের বোধ ও উপলব্ধি নিহিত ও গূহাহিত রূপে কাজ করেছিল। চিঠির মাথায় 'শ্রীশ্রীহরি' ঃ ও 'শ্রীদুর্গাশরণম্' লেখা হয়তো পারিবারিকসূত্রে অভ্যাসবশত পেয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু চিন্তায় মননে কার্যে বিদ্যাসাগরকে যদি অকৃত্রিম অকপট ও সৎ ও সন্নিষ্ঠ ভাবি, এবং নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত জীবনে ও চরিত্রে এমন কোনো কপটতার নজির নেই, তাহলে 'বোধোদয়ে'র লেখাকে তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধিজাত সত্য বলেই গ্রহণ করে নিতে পারি। সর্বজনীন যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রের বিশ্বাসে তাঁর টানাপোড়েন চলেছে, শেষে শাস্ত্রের দিকে পাল্লা ঝুঁকেছে, কিন্তু তাহলেও চরিত্রে ও কার্যে কোনো অসংগতি বিরোধ বা কপটতা নেই, যা অন্যদের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। 'বোধোদয়ে'র লেখায় প্রমাণিত হয়, তিনি নাস্তিক ত ননই, সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদীও নন; তাঁর প্রত্যয় ও বিশ্বাস থেকেই শিশুদের জন্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্তি করেছেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা করে পয়সা অর্জনের জন্যে নয়ঃ

'ঈশ্বর, কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; তিনি সর্বদা বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।'

এই 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'কে বিদ্যাসাগর জগতে সমস্ত বস্তুর মধ্যে দেখেছেন ঈশোপনিষদের মতো; শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে চৈতন্যস্বরূপ যেমন বিশ্বকর্মে ও মহান্ আত্মারূপে মানুষের হৃদয়ে আছেন, তেমনিভাবে দেখেছেন; শংকরাচার্যের মতো জগৎকে মায়িক বলে উড়িয়ে দিতে চান নি, রামমোহনের ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেন নি, তাই বেদান্তকে মিথ্যা বলেছেন তিনি। এই কারণেই জগৎ ও মানুষ বিদ্যাসাগরের ভালোবাসায় সংস্কার হীন ও প্রথাহীনভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে; রামকৃষ্ণের আদর্শ তাঁর নয়ঃ ভগবানের সাধনাই জীবের উদ্দেশ্য। এই 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'কে মেনে নিয়েও দেবেন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরের সঙ্গে লীলার আনন্দে মাতেন নি নিভৃতে

নির্জনে ও প্রকাশ্যে ; এইখানেই তাঁর সঙ্গে প্রভেদ বিদ্যাসাগরের। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে দেখেছেন মানুষের হৃদয়ে, মনুষ্যত্বে ঃ তাই মানুষের সেবায় দয়ায় করুণায় ব্যথায় সেই ঈশ্বরকেই উপলব্ধির করেছেন ; উপলব্ধির বিভিন্ন উপায় ; দুঃখজনক এইখানেই, দ্বিজেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক হয়েও এই উপলব্ধি ধরতে না পেরে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলেছেন ঃ 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা', এই উক্তির সঙ্গে কোঁতের পরম সৎ বা 'grand ette'-এর সামান্য সাদৃশ্য আছে। এবং কোঁৎও নাস্তিক নন কখনো। তবে এই দেবতাকে লাভ করবার যে-উপায় নির্ধারিত হয়েছে উপনিষদে, হৃদামনীষামনসাঽভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি, সেটা দেবেন্দ্রনাথের ধ্যেয়, বিদ্যাসাগরের নয় ; এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগর নাস্তিক—যা একান্তই অমূলক॥

## বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থ থেকে আমরা আরো কিছু জানতে চাই

চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগরচরিত যদিও উচ্ছ্বাসময়, মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরকে দেবতায় উন্নীত করেছেন তিনি, তবু বস্তুচয়নে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, আধুনিক জীবনবোধের ধারাবাহিকতায়, সাহিত্য ও সংস্কারের মূল্যায়নে, বস্তুবিচারে এটি উল্লেখযোগ্য। কালের সময়ের সমাজের রাষ্ট্রের ইতিহাস ও দ্বন্দ্ব এখানে চিত্রিত হয় নি, কালানুক্রমিকতাও অরক্ষিত। বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাসের রচনা করেছিলেন; ইতিহাসে অর্থনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা অপরিহার্য। রাষ্ট্রচিন্তার দিক থেকে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালি ও ভারতবাসীর কী সম্পর্ক বিদ্যাসাগর ভাবতেন, তার কথা ইঙ্গিতে ইতিহাস-গ্রন্থে আছে; এবং এখন আমরা সিপাহীবিদ্রোকে বিপ্লব বলে আখ্যা দিই, কিন্তু এই বিদ্রোহকে বিদ্যাসাগর কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, তার কোনো সদুত্তর এই বইয়ে নেই। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিলো, কিন্তু এই জমিদারেরা প্রজাদের শোষণ করতো খাজনা আদায় করে, জমি থেকে উৎখাত করে, জমিদার ও প্রজার বিরোধ তাঁর সময়ের বিরাট সমস্যা, সেই সমস্যা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আদৌ কিছু ভেবেছিলেন কিনা চণ্ডীচরণ সে সম্বন্ধে আলোকপাত করেন নি। ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষের চিন্তা বিদ্যাসাগরের কাছে তেমন দানা বাঁধে নি, কিন্তু ইংরেজের শাসন যে শোষণের উপায় এ-সম্বন্ধে জাতীয়তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি সিপাহীবিদ্রোহের পরই বুঝতে শিখেছিল, সে সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগর কেন নীরব। বিদ্যাসাগর কায়স্থকে শূদ্রই ভাবতেন, শূদ্রদের সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য করেছেন, তাই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের সঙ্গে শূদ্রদের সন্তানদের সংস্কৃত কলেজে পড়বার অধিকার দিয়েছিলেন; কিন্তু কেন সুবর্ণ বণিকের পুত্রকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন তাদের অসম্ভ্রান্ত বলে, এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কী যুক্তি ছিলো, জানতে পারলে ভালো হতো। বাংলায় কায়স্থদের পর নবশাখসম্প্রদায়, নবশাখসম্প্রদায় পর জল অনাচরণীয় বর্ণের লোক, যাদের স্পর্শের জল অন্য বর্ণের লোকেরা খেতো না, এই কারণে কি পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের ভয়ে বিদ্যাসাগর সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সন্তানদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দেন নি? এটা ঘটেছে আঠারশ পঞ্চান্ন সালে। এর পরে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যমে শিবনাথ শাস্ত্রীর আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদপ্রথা উঠে গিয়েছিল, যে-জাতিভেদপ্রথাকে ব্রাহ্ম হয়েও দেবেন্দ্রনাথ মেনে চলেছেন। এদিক দিয়ে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজে জাতিবর্ণের মিলনের ব্যাপারে সর্বসংস্কারমুক্ত। সুবর্ণবণিকদের সন্তানকে প্রবেশাধিকার না-দেওয়ায় তিনি সমাজের ও প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদের কাছেই নতি স্বীকার করেছেন; ওপর-অলাকে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের

গোঁড়া পণ্ডিতদের সংস্কারে শুধু আঘাত দেবে না, জনপ্রিয়তা ও গ্রন্থাকে আঘাত দেবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে দোষমুক্ত করতে পারি পরের বাক্যটির জন্যে ; ব্যক্তিগতভাবে আমি সর্বদাই বাধাদায়ক বিষয়ের বিরোধী, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য জাতির ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে কাউন্সিলকে লেখা আমার আগের রিপোর্ট থেকেই প্রতীয়মান হবে। (Personally I have always been opposed to the exclusive system as will appear from my former reports to the late council on the subject of admitting applicants of other castes than Brahmans and Baidyas) কাজ করতে গেলে বাস্তবকে মেনে চলতে হয়, বাস্তবকে অস্বীকার করে কোনো কাজ মানেই অবাস্তব উৎকল্পনা। নতি স্বীকার তিনি করেছেন বিপুল অন্ধকার সংস্কার কাছে। এর পরে আরো তিন বছর তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন কি সমস্ত হিন্দুদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন, এই তথ্য কোনো জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ সংস্কারমুক্ত মানুষ বিদ্যাসাগরকে জানতে গেলে এই তথ্য অতি প্রয়োজনীয়। যিনি কায়স্থ আনন্দকৃষ্ণ মিত্রের পাত থেকে মাছের মুড়ো থাবা মেরে খেতেন ব্রাহ্মণ হয়েও, যিনি মেথরমুচিকে নিজের হাতে সেবা ও পরিচর্যা করেছেন , গণিকা, সাঁওতাল, মুসলমানের কোনো ভেদ যাঁর ছিলো না, তিনি সুবর্ণ বণিকদের প্রবেশের ব্যাপারে আপত্তি করবেন ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু কুসংস্কারের জঞ্জালপাথরের কাছে বাস্তবক্ষেত্রে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল, এই সত্য স্বীকার করতেই হয় তথ্যের দিক থেকে।

জীবনীগ্রন্থে আরেকটি বিষয়ও আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে, বিদ্যাসাগরের মাতুল ও মাতুলপুত্রদের সম্বন্ধে কোনো জীবনীগ্রন্থেই কোনো আলোচনা নেই। অথচ বিদ্যাসাগর এঁদের সম্বন্ধে আত্মচরিতে যে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন তা বিস্ময়কর। মাতুলের পরিবারের আদর্শ ও প্রভাব তাঁর জীবনে পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস। যে-উদারতা স্নেহ পরোপকারের প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন, বিদ্যাসাগরের জীবনে তার সুস্পষ্ট প্রভাব আছে।

'অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুত, ঐ অঞ্চলের কোনোও পরিবার, এ বিষয়ে, এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল কথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণমহাশয়ের আবাসে আসিয়া, সকলেই, পরম সমাদরে, অতিথি সেবা ও অভ্যাগত পরিচর্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।'

মায়ের দিক থেকে ভগবতী দেবীর মামার পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতির কথা বিদ্যাসাগর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই মধুসূদন বাচস্পতিকেই বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুলের শিক্ষকের পদের জন্যে গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেই: For the second mastership I would propose Pundit Modhoosudan Bachaspati. He is a distinguished ex-student of the Sanscrit College, an able and elegant Bengali writer, well acquainted with the art of teaching, and in my opinion in every respect qualified to fill the post for which he is recommended.

বিদ্যাসাগরের কাকা ও পিসিদের সম্পর্কেও কিছুই জানি না আমরা। দীনবন্ধু শম্ভুচন্দ্র ঈশানচন্দ্র সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানি, কিন্তু মনোমোহিনী দিগম্বরী মন্দাকিনী এই বোনেদের সঙ্গে জীবৎকালে বিদ্যাসাগরের কি সম্পর্ক ছিলো, যাতায়াত আদৌ ছিল কিনা বিবাহের পর, সে সম্বন্ধে আমরা অন্ধকারে। যদিও উইলে তিন বোনকেই দশ টাকা করে মাসিকবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং মায়ের ও পিতার দিক থেকে অনেককেই মাসিকবৃত্তি দিয়েছেন। মাসিকবৃত্তির মধ্যে তাঁর দয়া ও দানশীলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কী সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো, কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটতো, তার কিছুই জানা যায় না, এবং শাশুড়িকে তিনি মাসোহারার ব্যবস্থা করেন দশ টাকা করে; কিন্তু শ্বশুর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ও শ্যালকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের শ্বশুরের যে-চিত্র এঁকেছেন, তাতে জামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকারই কথা। অনুমান করতে পারি, সংস্কারমুক্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গোঁড়া সংরক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের সম্পর্কের যোগ ছিন্ন অথবা ক্ষীণ ছিলো, এমনকি তাঁর ভায়েরাই তাঁকে বুঝতেন না, এবং গ্রামের নিকটস্থ আত্মীয় প্রতিবেশীই বিদ্যাসাগরকে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেবার জন্যে শাসিয়েছে, গ্রামছাড়া করবার জন্যে ভয় দেখিয়েছে। সুতরাং পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যাসাগরের ভালো ছিলো বলে মনে হয় না। তবু জীবনীকারদের এ বিষয়ে মনোনিবেশী হওয়া দরকার।

যদিও তুচ্ছ, তথাপি জীবনের জন্যেই কৌতূহল জাগে। বিদ্যাসাগর বাল্যকালে তামাক-খাওয়া শিখলেন কোথায় কবে কার কাছ থেকে। গিরিশ বিদ্যারত্নের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় সে-কালে সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা তামাক ও অন্যান্য দেশীয় নেশায় অধ্যয়নকাল থেকেই আসক্ত হতো।

হিন্দু কলেজের ছেলেরা যেমন গোরুর মাংস খেতো, মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করতো, তেমনি পুরনো স্কুলের পড়ুয়ারাও গাঁজা চরস ভাঙ্ খেতে শিখতো, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের মুখে এই গল্প বসিয়েছেন: 'আপনি জানেন

সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল একই রাস্তার মধ্যে। হিন্দু স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড় মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত ; আমরা দেখিতাম আমাদের পয়সা ছিলনা, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা সব উপর ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট দশ ছিটে পর্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম, তখন আমাদের একটা পথ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব।' এই বর্ণনায় তখনকার কালের সমাজের গ্লানির বাস্তব রূপই প্রকাশ পেয়েছে। এই দুয়ের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগরকে বড়ো হয়ে উঠতে হয়েছে জীবনে। সেই চিত্রও জীবনের মধ্যে অবশ্য প্রয়োজন, কেননা এই পরিবেশ থেকে বাঁচাবার জন্যেই ঠাকুরদাস নিজে বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে করে বিদ্যালয়ে দিয়ে আসতেন। 'বর্ণপরিচয়' এর চিত্র আছে।

সেই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর জগাখিচুড়ি সমাজব্যবস্থার ছবিও দেখবার ঔৎসুক্য জাগে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মার্জিত সংস্কৃতবানেরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন জমিদারেরা, সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াতন্ত্র পাশাপাশি। এমনকি সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই বুর্জোয়াতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা একই সঙ্গে চলছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথের পরিবার দেবেন্দ্রনাথের ও সত্যেন্দ্রনাথের জীবনচর্চা; অর্থোপার্জনে সামন্ততান্ত্রিক, যদিও ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিকতা পরাধীন বাংলায় কখনো আসতে পারে নি, তবু একই সঙ্গে দুই মনোভাব একই ব্যক্তির মধ্যে জটিলমনোভাবের সৃষ্টি করেছিলো। বিদ্যাসাগর যে-সব জমিদারের সঙ্গে মিশতেন, অর্থ সাহায্য নিতেনবিদ্যালয়স্থাপনের জন্যে,ঋণ নিতেন, তাদের জীবনচর্চার ইতিহাস জানলে জমিদারসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মানসিকতা বুঝতে সহায়তা হয়। তিনি দীন দরিদ্র ভিখিরির জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন, তাদের সঙ্গেই তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন সবচেয়ে বেশি। অথচ এই জমিদার-রাজাদের কাছে আসতেই হতো, ফলে প্রজাপীড়ক জমিদারদের তিনি কোন্ চোখে দেখতেন, প্রজাপীড়নের ব্যাপারটা কি কখনোই তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। এ নিয়ে কোনো কথা বলেন নি, এতো অচেতন কি বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজের ব্যাপারে? যদিও শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছেন : 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটি জুতো শুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' এ প্রসঙ্গ কেন উঠেছিল, কিসের জন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে এই কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন রাজাদের বিরুদ্ধে? যদি এর কারণ জানা যায়, তাহলে জমিদার-রাজাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে। সর্বহারাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা আরো উজ্জ্বল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

রাজনীতিসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নীরব, ইংরেজের সঙ্গে যে-বিরোধ তা তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিক থেকে তিনি কি বিদেশি শাসনসম্বন্ধে কিছুই ভাবেন নি? হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো, হরিশের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস পালকে তিনি এর সম্পাদক করেন। এ পত্রিকায় ডালহৌসির অযোধ্যা-নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় মনোভাব গড়ে তোলা হয়েছে, বিদ্যাসাগরকে কি এর কিছুই স্পর্শ করে নি? তিনি এতোই অসাড় এ ব্যাপারে? আমার ভাবতে কষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে জীবনীকারদের অনুসন্ধান দরকার আরো; কেননা এতে তো তাঁর সেই মানুষই অত্যাচারে পীড়িত। বিবেকানন্দ ছিলেন মেট্রোপলিটনের ছাত্র, বিদ্যাসাগরের আদর্শ তাঁর জীবনে সঞ্চারিত, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত কী সম্পর্ক ছিলো এ নিয়ে তেমন কোনো তথ্য আমরা পাই না, এটাও একটা অন্ধকার দিক বিদ্যাসাগরের জীবনের। স্কুলে বিদ্যাসাগর ক্লাশে মাস্টারের পাশব হাত থেকে নরেন্দ্রনাথকে রক্ষা করেছিলেন, এটা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিবেকানন্দের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়।

বিদ্যাসাগবের জীবন নিয়ে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আমরা দেখতে পাই নি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনালোকিত দিক এখনো রয়েই গেছে, ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে মাত্র।

তবু চণ্ডীচরণ নির্মোহ দৃষ্টিতে সংস্কারমুক্ত মনে রামমোহন থেকে প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারায় স্বাধীনচেতা আধুনিক মানবদরদী ভারতের প্রথম শিক্ষাব্রতী ও মনীষীরূপে যথাযথ চিত্রিত করেছেন। দুতিনটি তথ্যগত ভুল আছে, তা অতি নগণ্য। লোকের কথা শুনেই শম্ভুচন্দ্রের বিবাহের রাত্রে মার্শালের কাছে ছুটি নিয়ে বর্ষায় স্ফীত দামোদর নদ সাঁতরে পার হবার কাহিনী ঢুকিয়ে বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি, অসীম সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, বাস্তবের সঙ্গে এই কাহিনীর যোগ নেই। বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে প্রথমে, পরে রাজনারায়ণ বসুর কাছেও ইংরেজি শিখেছিলেন; রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে আন্তরিকতা ও বন্ধুতা ছিলো বেশি। এবং তাঁরা সমবয়সী, রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে মদনমোহনের সম্পর্ক ছিলো ঘনিষ্ঠ, মদনমোহন বিদ্যাসাগরের সহপাঠী; রামগোপাল ঘোষ ও রাজনারায়ণ দুজনেই ইংরেজিতে কৃত্যবিদ্য, পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃঢ় প্রভাব এঁদের সংস্পর্শেই গড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগরের জীবনে।

বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র গোড়া সংরক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন বলেই সমাজসংস্কারে সমর্থন জানাতে পারেন নি। অথচ এই সমাজসংস্কারেই বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যা একান্ত আধুনিক। অথচ সহবাস সম্মতি আইনে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন, একি দ্বন্দ্বময় বিরোধ?

—বার্ণিক রায়

## চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে চব্বিশ পরগনার বারাসতের নলকুড়া গ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাম কমল, পারিবারিক দুর্যোগে গৃহত্যাগী হয়ে কাশীবাসী হন, ফলে দারিদ্র্যে চণ্ডীচরণ লেখাপড়া করতে পারেন নি। অল্প বয়সেই নড়াইলের জমিদারের কর্মচারী রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন, তাঁর সাহায্যে সামান্য বিদ্যা আয়ত্ত করেন। যৌবনেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন ও অসবর্ণ বিবাহকরেন। সারা জীবনে তাঁর দারিদ্র্য যায় নি, সামান্য বেতনে চাকরি করতেন, অসুখের সময় দেনা করে সংসার চালান, বিদ্যাসাগর সাহায্য দিতে চাইলে এবং বিনা সুদে ধার দিতে চাইলে মর্যাদা ও সততার গুণে তা নেন নি। দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যসাধনা সারা জীবনই করে গেছেন: মা ও ছেলে ১ম খণ্ড,১৮৮৭; মা ও ছেলে দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৯; মনোরমার গৃহ, ১৮৯২; বিদ্যাসাগর, ১৮৯৫; বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবন, ১৮১৬; জীবনসোপান, ১৮৯৪; স্বদেশরেণু, ১৯০৫; অদৃষ্ট লিপি, ১৯১৪; স্যার বাসুদেব জীবনী, ১৯১৬; বিদ্যাসাগর হিন্দি, ১৯১৬; কীর্তিগাথা, অমরধাম, পাপীর জীবন লাভ ইত্যাদি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, ৭ই পৌষ ১৩২৩, ট্রামগাড়িতে চাপা পড়ে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হন। চণ্ডীচরণের জীবনও আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের জীবন-কাহিনী, পাপীর 'জীবনলাভ' গ্রন্থে চণ্ডীচরণের আত্মজীবনের অনেক ঘটনা বিবৃত আছে। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তথ্যে ও বস্তুবর্ণনার আন্তরিকতায় ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পরিস্ফুট।

# বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জি

১৮০০ ঃ ৪ঠা মে ওয়েলেসলিকর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা, ২৪ নভেম্বর অধ্যাপনা কার্য শুরু।

১৮০১ ঃ রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'।

১৮০২ ঃ রামরাম বসুর 'লিপিমালা,' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বত্রিশ সিংহাসন'। গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ'। Cobbett-এর সাপ্তাহিক Political Register প্রতিষ্ঠা।

Cobbett-এর লেখায় তৎকালীন ইংলণ্ডের সমাজজীবনের ছবি সুস্পষ্ট : এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে রাষ্ট্রে সমাজে; র‍্যাডিকাল দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে ইংলণ্ডে, তার ঢেউ এসে লেগেছে ভারতে : The taxing and funding…system has…drawn the real property of the nation into fewer hands ; it has made land and agriculture objects of speculation ; it has, in every part of the kingdom, moulded many farms into one ; it has almost entirely extinguished the race of small farmers ; from one end of England to the other, the houses which formerly contained little farmers and their happy families, are now sinking into ruins, all the windows except one or two stopped up, leaving just light enough for some labourer, whose father was, perhaps, the small farmer, to look back upon his half-naked and half-famished children, while, from his door, he surveys all around him the land teeming with the means of luxury to his opulent and overgrown master…we are daily advancing to the state in which there are but two classes of men, masters, and abject dependents.

Political Register, 15 March 1806

A labouring man, in England, with a wife and only three children, though he never lose a day's work, though he and his family be economical, frugal and industrious in the most extensive sense of these words, is not now able to procure himself by his labour a single meal of meat from one end of the year unto the other. Is this a state in which the labouring man ought to be ?

Political Register, 6 December 1806

England has long groaned under a commercial system, which is the most oppressive of all possible systems, and it is, too, a quiet,

silent, smothering oppression that it produces, which is more hateful than all others.

Political Register, 21 November 1807

১৮০৩ : রামমোহনের 'তুহ্ ফৎ-উল্-মুয়াহ্ হিদ্দীন' প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা', তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'।

১৮০৪ : ফরাশিদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ আবার শুরু। পিটের দ্বিতীয় মন্ত্রিত্বের আরম্ভ।

১৮০৫ : ১৩ই এপ্রিল প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্ম বর্ধমানের শাকনাড়া গ্রামে। চণ্ডীচরণ মুন্শির 'তোতা ইতিহাস'। জুলাই-এ মার্কিজ কর্নওয়ালিশ গভর্নর জেনারেল; অক্টোবরে স্যার জর্জ বার্লো।

১৮০৬ : জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের জন্ম। ২০-মে জন স্টুয়ার্ট মিলের জন্ম।

১৮০৭ : জুলাই-এ ব্যারন মিণ্টো গভর্নর জেনারেল। ইংলণ্ডে দাসব্যাবসাব লোপ।

১৮০৮ : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'; রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ'। স্পেনে ইংল্যান্ড পেনিনসুলার যুদ্ধ শুরু করে।

১৮০৯ : বেন্হামের A Catechism of Parliamentary Reform রচনা, প্রকাশ ১৮১৭ সালে।

১৮১০ : মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের 'ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ'।

১৮১১ : পাগল তৃতীয় জর্জের হয়ে প্রিন্স জর্জ রিজেণ্ট হিশেবে কাজ করেন।

১৮১২ : নাপোলেআঁর রাশিয়ার সামরিক অভিযান ব্যর্থ, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা। ক্লাইডনদীতে স্টিমবোট কমেটের-এর আবির্ভাব।

১৮১৩ : ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন শনদ একচেটিয়া ব্যাবসার সমাপ্তি।

১৮১৪ : মাঝামাঝি সময়ে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বাস করতে শুরু করেন; নিউঅর্লি আনসে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়।

১৮১৫ : রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' স্থাপন; হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' নাপোলেআঁ ফ্রান্সে ফিরে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, পরাজিত হন ওয়াটার্লুতে। ভিয়েনা চুক্তি। ইংলণ্ডে কৃষিরক্ষার জন্য কর্ন ল'।

১৮১৬ : রামমোহনের 'ঈশোপনিষদ' প্রকাশিত। ইংলণ্ডে মধ্যবিত্তদের সন্তুষ্ট করবার জন্য আয়কর রহিত।

১৮১৭ঃ ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা; ৪ঠা জুলাই স্কুল বুক সোসাইটি গঠন বাংলায় ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে।

১৮১৭ সালে জেমস মিলের History of India গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তীব্র নিন্দা করা হয় ভারতীয় ঐতিহ্যকে যুরোপীয় স্বার্থ ও নীতি আচ্ছন্ন করেছে বলে। বইটির রচনা শুরু হয় ১৮০৬ সালে। মানুষের অধিকার ও সাম্য এই দুটিই ছিলো তাঁর জীবনের ধ্যেয়।

১৮১৮ঃ সেপ্টেম্বর স্কুল সোসাইটি স্থাপন; পাঠশালা সংস্কারের পর আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, পরে সহজে হিন্দু কলেজে ঢুকে অনায়াসে ছাত্ররা বিদেশি ভাষা শিখতে পারে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত।

১৮১৯ঃ রামমোহনের 'মুণ্ডকোপনিষদ' প্রকাশিত।

১৮২০ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম; বর্তমানে মেদিনীপুর, পূর্বে হুগলি জেলার বীরসিংহগ্রামে, বাংলা ১২ই আশ্বিন, ১২২৭ সাল, মঙ্গলবার। বৃশ্চিক রাশি, মিথুন লগ্ন, একাদশে মেষের গৃহে মঙ্গল, দশমে রবি বুধ কেতু, অষ্টমে শুক্র, তৃতীয়ে বৃহস্পতি, চতুর্থে রাহু ও শনি।

ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম ১৫ই জুলাই চুপিতে।

তুর্কির বিরুদ্ধে গ্রিক বিপ্লবের শুরু।

রামমোহনের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত' পুস্তিকার প্রকাশ।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের জন্ম ১২২৬ বৈশাখ মাসে, ইংরেজি ১৮১৯, এপ্রিলে, চব্বিশ পরগনার চাংড়িপোতায়। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে আছে বিদ্যাসাগর দ্বারকাভূষণের চেয়ে এক বছরের ছোটো ছিলেন।

১৮২১ঃ ১৮২১ Female Juvenile Soceity স্থাপিত হয়। মিস্ কুক্ আসেন ১৮২১-এ, তিনি একজন বাঙালি শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন মিস্ কুক্ নন্দনবাগান গৌরী বাড়ি জানবাজার চিৎপুর অঞ্চলে জুভেনাইল স্কুল, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল, বার্মিংহাম স্কুল নামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা এখান থেকেই শুরু, রাধাকান্ত দেবের চেষ্টাও স্মরণীয়।

রামমোহনের 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন', 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ পায় সেপ্টেম্বরে; 'সংবাদ কৌমুদী' ৪ঠা ডিসেম্বরে। স্থাপিত হয় 'ইউনিট্যারিয়্যান কমিটি'।

Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity স্থাপিত হয়।

রাধাকান্তদেবের 'বাংলাশিক্ষা গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চাননের 'পদার্থকৌমুদী'; জেমস মিলের Elements of Political Economy-র প্রকাশ।

১৮২২ ঃ রামমোহনের 'মীরাত্-উল্-আখ্বার' ১২ এপ্রিল প্রকাশিত হয়। রামমোহনের 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠা' হেদুয়ায়।

ঃ স্টুয়ার্ট মিলের Utilitarian Society-র প্রতিষ্ঠা।

ঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকারের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালংকার-রচিত 'জুভেনাইল সোসাইটির' উদ্যোগে 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' পুস্তিকার প্রকাশ। ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির য়ুরোপীয় সম্পাদক পদে বৃত। তিনি এর আগেই শিমুলিয়া ঠনঠনিয়া পটলডাঙায় অবৈতনিক ইংরেজিবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮২৩ ঃ ২২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে, পোস্তার রাজা নরসিংহের বাগান বাড়িতে হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি 'গৌড়ীয় সামাজে'র প্রতিষ্ঠা ঃ এর উদ্দেশ্য বাংলাভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যরচনার জন্যে প্রেরণাদান। এই ধারা পরবর্তীকালে কার্যকর হয়েছিলো। এই গৌড়ীয় সমাজে পণ্ডিত, নব্য শিক্ষিত ও প্রবীণ সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে রাধাকান্তদেব রামকমল সেন দ্বারকানাথ ঠাকুর; নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তারাচাঁদ চক্রবর্তী শিবচন্দ্র ঠাকুর; পণ্ডিতদের মধ্যে রামজয় তর্কালংকার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন গৌরমোহন বিদ্যালংকার।

ঃ ২৩ জানুয়ারি প্যারীচরণ সরকারের জন্ম, পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের বন্ধু।

রামমোহনের 'পাদরি ও শিষ্যসংবাদ,' 'গুরুপাদুকা' 'পথ্যপ্রদান' প্রকাশ। A Letter on European Education আমহার্স্টকে লেখা, এই চিঠিটিই বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতিতে অনেকটা অনুসৃত।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থের প্রকাশ। এতে তৎকালীন সমাজজীবন প্রকাশিত।

১৮২৪ ঃ মধুসূদনের জন্ম ২৫ জানুয়ারি যশোরে সাগরদাঁড়িতে।

১ জানুয়ারি ৬৬ বহুবাজার স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের পাঠ আরম্ভ; ২৫ ফেব্রুয়ারি নতুন বাড়ির ভিতস্থাপন; উইলসন সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

প্রথম বার্মিজ যুদ্ধ ঘটে।

১৮২৫ ঃ বিদ্যাসাগর বীরসিংহগ্রামে সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় পড়েন নি তিনি বালকদের প্রহার করতেন বলে। পাঁচ বছর বয়সে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পড়েন। এঁর কাছে তিন বছর বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। বাংলাভাষা ও অঙ্ক কষতে শেখেন।

প্লীহা ও উদরাময় রোগে ভোগেন, মাতুলালয়ে গিয়ে বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়। পাতুলগ্রামে মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের প্রতি অনুরাগ ও

শ্রদ্ধা বাড়ে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' প্রকাশিত হয়।

১৮২৬ ঃ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালার ছাত্র বিদ্যাসাগর। এবং দুষ্টুমি। মথুরাচরণ মণ্ডলের মাতা পার্বতী ও পত্নী সুভদ্রাকে বিরক্ত করার জন্যে প্রত্যেকদিন বাড়ির দোরগোড়ায় মলমূত্র ত্যাগ; শস্যক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যবের শিস্ চিবোতেন, একবার চিবোতে গিয়ে গলায় যবের সুঙ লেগে প্রায় মরে যান, পিতামহী দুর্গাদেবী আঙুল দিয়ে গলা থেকে শিস্ বের করেন।

১ মে হিন্দু কলেজসহ সংস্কৃত কলেজের গৃহপ্রবেশ।

২রা মে ডিরোজিয়ো হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকপদে যোগ দেন।

রামমোহনের 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' পুস্তিকার প্রকাশ। ভরতপুরের পতন।

১৮২৭ ঃ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের অধ্যয়ন। দুষ্টুমি যথারীতি চলতে থাকে।

রামমোহনের 'বজ্রসূচী' 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং' প্রকাশিত।

বাধাকান্তদেবের 'সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ' প্রকাশ।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী-সংকলিত বাংলা-ইংরেজি অভিধান।

ডিরোজিয়োর প্রথম কাব্যসংকলনের প্রকাশ, ছাত্রদের মধ্যে তার উত্তেজনা।

১৮২৮ ঃ রুশ-তুর্কি যুদ্ধের শুরু।

ঃ বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যু।

ঃ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের জন্ম।

ঃ পিতার সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কলকাতায় আগমন; কলকাতায় ১৩ নম্বর দয়েহাটা স্ট্রিটে জমিদার জগৎদুর্লভ সিংহের বাড়িতে বাস।

ঃ রামমোহনের 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মসংগীত' প্রকাশ ঃ ২০-এ আগস্ট রাম-মোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা।

রাইমণিসম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র ঃ

'এই সময়ে, জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্য শব্দে সম্ভাষণ করিতেন; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদামহাশয়, তাহার ভগিনীদিগকে, বড়দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম। এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাড়িতে আছি বলিয়া, একদিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন

থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির যত্ন ও স্নেহ তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ-পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে।'

ঃ 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, সভাপতি ডিরোজিয়ো, সম্পাদক উমাচরণ বসু। ডিরোজিয়োর উপদেশেই এই সভার প্রতিষ্ঠা। এই সভার সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ি, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি। ডিরোজিয়োর চরিতকার টমাস এডোয়ার্ডস এই সভার আলোচ্য বিষয় জানিয়েছেন ঃ Free will, free ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against the existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid, Dugald Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry, and the shams of the priesthood, were subjects which stirred to their very depths the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta ; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণের—নব জাগরণের নয়—সব চিহ্নই এখানে সুস্পষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

১৮২৯ ঃ সংস্কৃত কলেজে ভর্তির আগে বড় বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ির কাছে ধনী সুবর্ণ বণিক শিবচরণ মল্লিকের পাঠশালায় তিন মাস শিক্ষা লাভ করেন। কলকাতায় আসবার পাঁচ-সাত দিন পরেই ঐ পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করা হয়। বিদ্যাসাগর নিজেই লিখেছেন ঃ 'অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধহয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।'

ঃ ১ জুন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮২৯-৩৩ বিদ্যাসাগর ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন ঃ পাঠ্য ছিলো মুগ্ধবোধ, অমরকোষের মনুষ্যবর্গ, ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ। তাঁর সহপাঠী মদনমোহন তর্কালংকার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীশ বিদ্যারত্ন।

ঃ ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-নিষেধ-প্রথা আইন বিধিবদ্ধ ঃ রাধাকান্ত দেব সেদিনই সতীদাহ নিষেধের বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থাপক সভা'র কাছে আবেদন জানান।

ঃ রামমোহনের প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অনুষ্ঠান, সহমরণ বিষয়, **Universal Religion ; Petition to Govt. against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands 1829.**

ঃ জেমস মিলের **Analysis of the Phenomena of the Human Mind** প্রকাশিত।

ঃ দেবেন্দ্রনাথ এই সময় রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে'র ছাত্র। রামমোহনের বিলাতপ্রবাসের সেক্রেটারি স্যাণ্ডফোর্ট আর্নটের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ। ইংরেজি ও বাংলা দুইই এখানে শেখানো হতো। 'স্কুল বুক সোসাইটি'-প্রকাশিত বই পাঠ্যপুস্তক ছিলো ছাত্রদের, ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে এই স্কুলের যোগ ছিলো যেমন, তেমনি 'ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র ব্যক্তিদের সঙ্গেও সান্নিধ্যলাভ ঘটে দেবেন্দ্রনাথের। আত্মচরিতে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় ঃ 'শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু কলেজও ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত।' পৃষ্ঠা, ৬৩

ঃ ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হন ঈশ্বর। কলকাতায় কিছুদিন দুর্গাদাস কবিরাজের চিকিৎ-সাধীন ছিলেন, কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় পিতামহী দুর্গাদেবী সংবাদ পেয়ে এসে তাঁকে নিয়ে যান। বাড়িতে বিনা চিকিৎসায়ই সাত-আট দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার ঠাকুরদাস তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এবার একা এসে পথে ভীষণ কষ্ট হয়। পাতুল, তারকেশ্বরের রামনগরের মধ্য দিয়ে ও অনেক কষ্টে শ্রীরামপুর হয়ে কলকাতায় আসেন।

ঃ হিন্দু কলেজে ইংরেজি পড়বারই তাঁর ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু পিতার ইচ্ছে ছিলো সংস্কৃত শিখে টোল খুলে অধ্যাপনা করাবার, কারণ দারিদ্র্যের জন্য তাঁর সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। এই কারণে ইংরেজি স্কুলে ঠাকুরদাস তাঁকে ভর্তি করেন নি। মধুসূদন বাচস্পতির নির্দেশে, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সংস্কৃত শিখে বিদ্যাসাগর প্রকৃত পশ্চিমী শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে বিদ্যাসাগর পড়তে পারেন নি পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্যে, কিন্তু হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্রদের চেয়ে মানসিকতায় তিনি অনেক বেশি প্রাগ্রসর ও আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চিন্তা ভাবনায় ও কর্মে, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে, মানুষের সঙ্গে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মিলনের ক্ষেত্রে। এ-ও যেন তাঁর জীবনের এক চ্যালেঞ্জ ; বাল্যে যা পান নি, নিষ্ঠায়, কর্মে, সাধনায়, একাগ্রতায়

তাকে শুধু লাভ করেন নি, লাভ করে ছাড়িয়ে গেছেন। হয়তো বিদ্যাসাগরের অবচেতনে এই চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া কাজ করছিলো। এই সময়কার ঘটনা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর লিখেছেন ঃ

'মাইলস্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়রা একবাক্য হইয়া, 'তবে ইহাকে রীতিমত ইংরেজি পড়ান উচিত' এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে, সিদ্ধেশ্বরী তলায় ঠিক পূর্ব দিকে একটি ইঙ্গরেজি বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া, বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে ; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও ; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক ; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজির চূড়ান্ত হইবেক। আর,যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজি জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে,ও যেমন-তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবে।' অবস্থার চাপে আকস্মিকতার আঘাতে উদ্ভূত ঘটনাকেই সাধারণত লোকে ভাগ্য বলে। হিন্দু কলেজের ছাত্র হলে সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করে বিধবাবিবাহের অনুমোদন-অন্বেষণ হয়তো তাঁর পক্ষে সহজ হতো না, বিদ্যাসাগর উপাধিই লাভ হতো না জীবনে। তাঁর জীবনের ভাগ্যনির্ধারণ করে দিলেন মধুসূদন বাচস্পতি। তাঁর মায়ের মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র ঃ 'তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক ; আর যদি চাকরি করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে ; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।'

বিদ্যাসাগরের জীবনে হিন্দু কলেজের পশ্চিমী আদর্শ ও সংস্কৃত কলেজের শাস্ত্রীয় দীক্ষা দুয়ের গভীর আকর্ষণ ও আলোড়ন তাঁর জীবনকে মথিত করেছে, তাঁর জীবন ও কর্মে এই দুয়েরই প্রতিফলন।

ঃ রামমোহন ও দ্বারকানাথের সম্পাদনায় 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও 'বঙ্গদূত' নামে ইংরেজি ও বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। তাঁদের দ্বারা 'কলোনাইজেশন' আন্দোলনের শুরু।

১৮৩০ ঃ বিদ্যাসাগরের উপনয়ন।

ঃ ঠগী দমন শুরু হয়।

ঃ ফেব্রুয়ারি মাসে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র মুখপত্র 'পার্থিনন' পত্রিকার প্রকাশ প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা ও ভারতে ইংরেজদের বাসসম্পর্কে প্রস্তাব ছিলো 'পার্থিননে'র দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিলো ; কিন্তু এর প্রচার বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ।

ঃ ২৭ মে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ খ্রীস্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন।

ঃ ডাফ্ বিলেত থেকে এসে প্রথমে ২২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে নরসিংহের বাগান বাড়িতে বাস করেন।

ঃ বেন্থামের **Constitutional Code** প্রকাশিত।

ঃ ১৭ই জানুয়ারি 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা।

ঃ বেণ্টিঙ্ক গভর্নর জেনারেল হন।

ঃ ১০ই জুলাই রামমোহনের 'জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইন্স্টিটিউশনে'র প্রতিষ্ঠা।

ঃ ২৩ জানুয়ারি 'ব্রাহ্মসমাজে'র নতুন বাড়িতে জোড়াসাঁকোয় কাজ আরম্ভ।

ঃ **Address to Lord William Bentinck, upon the Passing of the Act for the abolition of the Suttee.**

ঃ **Essay on the rights ot Hindoos over ancestral property according to the Law of Bengal.** রামমোহনের চিঠি ও রচনা।

ঃ ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিদেশ যাত্রা কবেন।

ঃ সংস্কৃত কলেজে ১৪ই এপ্রিল থেকে ইংরেজির প্রথম সহকারী শিক্ষক গঙ্গাচবণ সেন নিযুক্ত হন।

ঃ জোড়াসাঁকোয় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে ডাফের স্কুল প্রতিষ্ঠা।

ঃ কলকাতায় 'ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

১৮৩১ ঃ মার্চ মাস থেকে বিদ্যাসাগর পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান পে-স্টুডেণ্ট হিশেবে ও আউট-স্টুডেণ্ট হিশেবে পান নগদ আট টাকা ও একটি ব্যাকরণ। গদাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক।

ঃ ২৫ এপ্রিল ডিরোজিয়ো হিন্দু কলেজ থেকে পদচ্যুত হন। ১৭ জুলাই মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি এন্কোয়েরার' পত্রিকার প্রকাশ। ১৮ জুন মাসে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রকাশ। ১ জুন ডিরোজিয়ো-সম্পাদিত **'The East Indian'** পত্রিকার প্রকাশ। এই সময়ই 'হেস্পেরাস' পত্রিকা সম্পাদন করেন। ২৩-এ ডিসেম্বর ডিরোজিয়োর মৃত্যু।

ঃ দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবত মে মাস থেকে ডিরোজিয়োর পদচ্যুতির পর হিন্দু কলেজে ছাত্র হিশেবে প্রবেশ করেন।

ঃ ২৮ জানুয়ারি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রকাশ।

ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকর্তৃক ডেভিড হেয়ারকে অভিনন্দন পত্রপ্রদান, কেননা হিন্দু কলেজের আদি রূপমূর্তিকার ছিলেন ডেভিড হেয়ারই।

ঃ ৮ই এপ্রিল রামমোহন লিভারপুল পেঁছোন।

ঃ ১৮৩১-৩২ সালে ইয়ংবেঙ্গলের চিন্তায় টমাস পেইনের ভাবনা কাজ করতো। 'দি এইজ অব রিজন' বইয়ে পেইনের এই কথা সকলের মধ্যে ঃ I believe in one God, and no more ; and I ho.e for happiness beyond this lite.

I believe in the equality of man ; and I believe that religious duties consist in doing justice, loving mercy, and endeavouring to make our fellow creatures happy.

'দ্য রাইট্‌স অব ম্যান' বইয়ের ভাবনা-চিন্তা উচ্চকিত ঃ

As it is not difficult to perceive, from the enlightened state of mankind, that hereditary Governments are verging to their decline, and that Revolutions on the broad basis of national soveriegnty and Government by representation, are making their way in Europe, it would be an act of wisdom to anticipate their approach and produce Revolutions by reason and accommodation, rather than commit them to the issues of convulsions. টমাস এডোয়ার্ডসের ডিরোজিওর জীবনীতে ইয়ংবেঙ্গলদের সম্বন্ধে পেইনের লেখার প্রতি আগ্রহের কথা সুন্দরভাবে লিখিত।

১৮৩২ঃ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় পুরস্কার পান 'অমরকোষ', 'উত্তররামচরিত', 'মুদ্রারাক্ষস'। পে-স্টুডেণ্টরূপে পান দুটাকা। এবং বিদ্যাসাগর কাব্যশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' 'রাঘব পাণ্ডবীয়' প্রথমবর্ষে পাঠ করেন; দ্বিতীয়বর্ষে মাঘ ভারবি 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'উত্তররামচরিত', 'বিক্রমোর্বশী', 'মুদ্রারাক্ষস', 'কাদম্বরী', 'দশকুমারচরিত' পাঠ্য ছিলো।

ঃ ৬ জুন, বেন্থামের মৃত্যু।

ঃ বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু কলকাতায় আসেন, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। বিদ্যাসাগর দীনবন্ধু ও ঠাকুরদাস একত্র থাকেন, বিদ্যাসাগর রান্না করেন। সকলের বাজারও করেন সকালে। একদিন বাজার করতে গিয়ে দীনবন্ধু নতুন বাজারে ঘুমিয়ে পড়েন, বিদ্যাসাগর খুঁজে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন।

ঃ দ্বারকাভূষণ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।

ঃ বড়ো ও ছোটো কোর্টে উভয় জায়গায়ই ভারতীয়েরা জুরি হবার অধিকার পায়।

ঃ ইংলণ্ডে Great Reform Bill পাশ হয়।

ঃ রামমোহন সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে প্যারি যান।

: ১১ই জুলাই প্রিভি কাউন্সিল রাধাকান্ত দেবের সতীদাহনিষেধের প্রতিবাদ-আবেদন নাকচ করে দেয়।

: ৩০ ডিসেম্বর রামমোহনের 'আংলো-হিন্দু স্কুল' ভবনে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপিত হয় বাংলাভাষায় সাহিত্য ও রচনার অনুশীলনের জন্যে। এর উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। 'গৌড়ীয় ভাষায় উত্তমরূপে আলোচনার্থ এই সভার উদ্দেশ্য।' জয়গোপাল বসুর উক্তিতে এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট : 'এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোনো সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষায় আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে মঙ্গল হইবেক।' রমাপ্রসাদ সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক, বাংলা ভাষাতেই এর কার্যবিবরণী লেখা হয়। এবং এরই বিস্তার 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় ; এইসব প্রচেষ্টাই বিদ্যাসাগরকে উদ্বেলিত করেছিলো এই সময়ে।

১৮৩৩ : বিদ্যাসাগর ইংরেজি পরীক্ষায় পেয়েছেন 'হিস্টরি অব গ্রিস', 'ইংলিশ রিডার'। নবকুমার চক্রবর্তী ইংরেজি পড়ান ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে। এ বছর বিদ্যাসাগর বার্ষিক পরীক্ষায় পুরস্কার পান নি বলে রাগে-ক্ষোভে কলেজ ছেড়ে গাঁয়ে টোলে পড়তে যেতে চান।

: রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত।

: ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু।

: কোম্পানির শনদ পুনর্নবীকরণ হলো, কোম্পানির ব্যাবসার ক্ষমতা লোপ পায় ; আইনের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।

: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শনদ নতুন করে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় ; নতুন আইনের সাতাশি ধারাতে আছে :

And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident there in, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment, under this said company. এই আইনই ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে নতুন যুগ আনে। ইংলণ্ডে দাসত্বের লোপ।

: রামতনু লাহিড়ি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতায় পদ গ্রহণ করেন।

: হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলে মধুসূদন অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

: ৫ই জানুয়ারি 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় 'শাস্ত্রের শাসন ও স্ত্রীলোক' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ৬ই জুলাই 'Bribery and Corruption'-এর প্রকাশ।

: ইংলণ্ডে ফ্যাক্টরিতে সরকারি পরিদর্শনের আইন ; অক্সফোর্ড আন্দোলন শুরু।

১৮৩৪ঃ দীনময়ীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিবাহ, শ্বশুর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য। এবং কলেজে জয়গোপাল তর্কালংকারের কাছে সাহিত্যের পাঠ নেন।

ঃ জনসাধারণের টাকায় মেদিনীপুরে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা জুলাই মাসে।

ঃ **Tagore and Company**-র প্রতিষ্ঠা; 'জ্ঞানান্বেষণে' ৯ আগস্ট এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রকাশ ঃ 'দেশীয় বাণিজ্য উদ্যোগ'।

ঃ সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা এডুকেশন সাবকমিটির সেক্রেটারির কাছে আবেদন করেন জেলা কোর্টে অ্যাপ্রেণ্টিস হিশেবে কাজ করবার জন্যে। পরে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হবার দাবি রাখেন। 'জ্ঞানান্বেষণে' ২০ মার্চ এ-সম্পর্কে সংবাদ ছাপা হয়। 'জ্ঞানান্বেষণে'র মন্তব্য এ-বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর; এই মনোভাব বিংশ শতাব্দীর শেষেও ইংরেজবিদদের মধ্যে অটুট ঃ বিদ্যাসাগরকে এরই মধ্যে পথ কেটে এগোতে হয়েছিলো ঃ It has been repeatedly proved, at least to the satisfaction of all intelligent men, that the Sanskrit language is not at all fitted to edify the mind. The literature, it contains, abounds with the most obscene stories, that we can possibly imagine. The sciences or systems of philosophy which may be found in it, are equally objectionable in as much as their falsehood has been demonstrated ages ago. This has been granted by the most staunch advocates of the Sanskrit language. ওরিয়েণ্টালিস্টরা এর ভিন্ন মত পোষণ করতেন, এবং তাঁদের চেষ্টায়ই ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। Colebrook ১৭৯৫ সালে 'On the Hindu Widows' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, ইয়ংবেঙ্গলদের অনেক আগে। ১৮০৫ সালে 'On the Vedas' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করে বেদকে ভারতীয়দের কাছে তুলে ধরেন। পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম দিকের শিক্ষকেরা—বেইলি কেরি বার্লো বুকানান গিলক্রাইস্ট ব্রাউন কোলব্রুক প্রমুখেরা বিশ্ববিদ্যাকেই প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশে। এবং এর আদিতে আছেন উইলিয়াম জোনস্।

ঃ মিথ্যা অভিমানহত মুসলমানেরা কিছুটা দায়ী হলেও, ইয়ংবেঙ্গলদের নীতিআদর্শ আচরণে এবং অতিরিক্ত ইংরেজিআনায় ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে; ঐতিহ্যসম্বন্ধে অজ্ঞতাই এর কারণ; বাঙালি ও ভারতের বেশির ভাগ মুসলমানই হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত, এ তথ্য তাঁরা জানতেন না ঃ

I was looking out for your last Tuesday's paper with all anxiety to read a long editorial, congratulating the Indian public on the abolition of remnant of Mohammedan tyranny. The Persian

language, from the Mofussil Courts ; but how greatly I was disappointed. ( Gyanannesbun. 12 April, 1834 )

: ইংরেজের দুর্গ অধিকার।

: আগ্রা রাজ্য-গঠন।

: ইংলণ্ডে 'Grand National Consolidated Trades Union' শুরু করেন রবার্ট আওয়েন। 'Poor Law Reform Act' পাশ হয়, গির্জায় অনাচারের জন্য 'Ecclesiastical Commission' নিযুক্ত হয়।

: মেকলে আইন-সভার সদস্য হন।

: অক্ষয়কুমার দত্তের 'অনঙ্গমোহন কাব্য' প্রকাশ।

: রাধাকান্ত দেব চা-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন নতুন শস্যের ফলে।

: জনসনের ইংরেজি অভিধান-অনুসারে রামকমল সেনের ইংরেজি-বাংলা অভিধান দুইখণ্ডে প্রকাশিত।

১৮৩৫ : বিদ্যাসাগর অলংকার শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের ছাত্র। অলংকার শ্রেণীতে পড়বার সময় ঠনঠনের ধাড়িতে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মধুসূদন বাচস্পতির কাছে যেতেন, সেখানেই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে দেখা হয়। বিদ্যাসাগরের মুখে 'সাহিত্যদর্পণে'র আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। এ বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পুরস্কার পান 'রঘুবংশ', 'সাহিত্যদর্পণ', 'রত্নাবলী', 'মালতীমাধব', 'উত্তররামচরিত' 'মুদ্রারাক্ষস' 'বিক্রমোর্বশী' 'মৃচ্ছকটিক'।

: ইংরেজিতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে পুরস্কার পান 'পোয়েটিক্যাল রিডার'নম্বর থ্রি, 'ইংলিশ রিডার' নম্বর টু।

: স্টুয়ার্ট মিলের সম্পাদনায় 'The London Review' পত্রের প্রকাশ। ব্রিটিশ র‍্যাডিক্যাল মতবাদের প্রচার।

: প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে বিরোধ।

: মে মাস থেকে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হয়ে এসেছেন শ্যামলাল সেন। রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, ১৮৩৮ পর্যন্ত ছিলেন।

: রাধাকান্ত দেব দ্বারকানাথ ঠাকুর জেমস কিড কলকাতার অবৈতনিক 'জাস্টিস অব পিস্' নিযুক্ত হন।

: ৭ মার্চ ভাষাশিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজি ঘোষিত ; মেকলের নীতি অনুসৃত ; এখন থেকেই ভারতীয়দের আত্মিক বন্ধ। সংবাদপত্রের নিষেধ-বিল লোপ ৩ অগাস্ট।

: জুন মাসে কলকাতায় 'মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গলে'র প্রতিষ্ঠা।

: লর্ড অকল্যান্ড গভর্নর, ১৮৪২ পর্যন্ত।

১৮৩৬ : জানুয়ারি মাসে মধুসূদন গুপ্তের নেতৃত্বে বাঙালি ছাত্রদের দ্বারা

শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা শুরু হয় এবং ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার শুরু।

ঃ ২১ মার্চ 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'র প্রতিষ্ঠা।

ঃ জেমস মিলের মৃত্যু। স্টুয়ার্ট মিলের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য-গ্রহণ।

ঃ রামকৃষ্ণদেবের জন্ম। হুগলি জেলায় কামারপুকুরে ১৮ই ফেব্রুয়ারি।

ঃ রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক।

ঃ 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'-এর উত্তেজনা।

১৮৩৭ ঃ বিদ্যাসাগর স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

ঃ উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ।

রাধাকান্তদেব সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, এই সূত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় ঘটতেও পারে।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল 'মতিলাল শীল ও বিধবাবিবাহ', ৯ ডিসেম্বর 'উচ্চ সরকারী পদে দেশীয় লোক', ১৬ ডিসেম্বর 'স্ত্রীলোদের অধিকার' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

স্ত্রীশিক্ষার জন্যে কলকাতায় ধনীদের দ্বারা সমিতি গঠিত হয়েছে, ২৮ এপ্রিল 'জ্ঞানান্বেষণে' সংবাদ।

১৮৩৮ ঃ ভ্রাতা দীনবন্ধুর বিবাহ। বিবাহের কাজে সমস্ত টাকা ব্যয় হওয়াতে কলকাতার বাসায় আহারে অনটন।

মেজর জি. টি. মার্শাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন, এই সময় থেকেই বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে, তাঁরই চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের চাকরি ও উন্নতি।

সম্ভবত ভ্রাতা হরচন্দ্রের জন্ম এ বছর।

ঃ ২৬ জুন, ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায়।

'দ্য রিফর্মার পত্রিকায় ২৫ নভেম্বর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহসম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, 'পরাশর সংহিতা'র এই শ্লোকটিও সেখানে উদ্ধৃত। সুতরাং বিদ্যাসাগরের কালে বিধবা-বিবাহের চিন্তার ধারা চলেই আসছিল। ১৭৬০ সনেই ঢাকার রাজা রাজবল্লভ সেন তাঁর বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার জন্যে দ্রাবিড় তৈলঙ্গ, কাশী ও মিথিলার পণ্ডিতদের মত জানতে চান, পণ্ডিতেরা মত দেন, কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মত জানতে পারেন না নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতায়।

ঃ ১৯ মার্চ রাধাকান্তদেবের চেষ্টায় 'জমিদার-সভা' গঠন।

ঃ ১৭ এপ্রিল কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।

ঃ ১৬ মে আত্মীয়পার্জিকা সভার প্রতিষ্ঠা সমাজ ও রাষ্ট্রের আলোচনার জন্য।

ঃ ১৯ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম।

এই বছরের প্রথম দিকে বিদ্যাসাগর স্মৃতিঃ পড়ছেন, মাসিক বৃত্তি আট টাকা আট আনা ছ'পাই। পাঠ্য বই। 'মনুসংহিতা', 'মিতাক্ষরা', 'দত্তক মীমাংসা', 'দত্তক চন্দ্রিকা', 'দায়তত্ত্ব', 'দায়ক্রমসংগ্রহ' ও 'ব্যবহারতত্ত্ব'। স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ। তর্কভূষণের কাছে পড়ে তৃপ্তি হতো না বলে হরনাথ ভট্টাচার্যের কাছেও অধ্যয়ন করতেন। ১৮৩৮-৩৯-এ স্মৃতিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, আশি টাকা নগদ পুরস্কার পান। সংস্কৃত কলেজে এ বছরই ছাত্রদের গদ্যপদ্য রচনাপরীক্ষার নিয়ম চালু হয়।

সত্য কথনের মহিমা 'সত্যং হি নাম' অধ্যাপক হেমচন্দ্র তর্কবাগীশের চাপে লিখে একশ টাকা পুরস্কার পান।

অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের চাপে পড়ে 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' এই বিষয়ে পদ্য লেখেন। এই অধ্যাপকের চাপে পড়েই সরস্বতীর পুজোর সময় সরস্বতীর পুজোর সরস বর্ণনা লেখেন, সকলকে চমৎকৃত করেন। ন্যায়ের ছাত্রের থাকবার সময়েই তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়েছিলেন।

১৮৩৯ : ২২-এ এপ্রিল বিদ্যাসাগর ল' কমিটির পরীক্ষায় বসেন; ১৬মে ল' কমিটির প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

: 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'র সদস্য 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে ২৫ ডিসেম্বর অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হন।

: 'তত্ত্ববোধিনী-সভা' প্রতিষ্ঠা ৬ অক্টোবর; জুলাই মাসে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

: প্রথম আফগান যুদ্ধ।

: ভূদেব মুখোপাধ্যায় সপ্তম শ্রেণীতে মধুসূদনের সহপাঠীরূপে যোগ দেন হিন্দু কলেজে। জুলাই মাসে লণ্ডনে অ্যাডাম 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪০ : বিদ্যাসাগর অগাস্ট থেকে নভেম্বর এই চার মাস ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিচরণ তর্কপঞ্চানন অসুস্থ থাকায় অধ্যাপনা করে আশি টাকা পেয়েছেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ক্লাশে ন্যায় অধ্যয়ন করেন। 'ভূগোল খগোল' বিষয়ে একশ শ্লোক লিখে মিয়র সাহেবের কাছ থেকে একশ টাকা পুরস্কার পান।

: ১৩ জুন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন।

: কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম, সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে।

: কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

: মধুসূদনের সহপাঠীরূপে গৌরদাস বসাকের পরিচয় হয় হিন্দু কলেজে।

: মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ বিদ্যাসাগরের সহপাঠী হিন্দু কলেজ-সংলগ্ন পাঠ-শালার জানুয়ারি মাসে পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাভাষার সাহায্যে সাহিত্য ও প্রাচ্যপ্রতীচ্যের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; এই আদর্শে বিদ্যাসাগর অনুভাবিত। মুক্তারাম এখানে এক বছর ছিলেন।

১৮৪১ঃ ৪ঠা ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন শেষ করেন বিদ্যাসাগর। বারো বছর পাঁচ মাস পড়াশোনা করেন এখানে। অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, এর আগেই বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন। প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষরকারী অধ্যাপকেরা ছিলেন ঃ ব্যাকরণের গঙ্গাধর শর্মা, কাব্যশাস্ত্রের জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, অলঙ্কারের প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্তশাস্ত্রের শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, ন্যায়শাস্ত্রের জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জ্যোতিষশাস্ত্রের যোগধ্যান মিশ্র, ধর্মশাস্ত্রের শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি।

ন্যায়শ্রেণীর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় অনেক পুরস্কার পেয়েছেন বিদ্যাসাগর। ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম হবার জন্যে একশ টাকা; সংস্কৃত হাতের লেখার জন্যে আট টাকা; সংস্কৃতে অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা বিষয়ে পদ্য লিখে একশ টাকা; কোম্পানির রেগুলেশন সম্বন্ধে বাংলায় পরীক্ষা দিয়ে পঁচিশ টাকা পান। এই সময়েই যোগধ্যান মিশ্রের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন।

ঃ বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিশচন্দ্রের জন্ম।

ঃ ১৬ জানুয়ারি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগের পদে নিযুক্ত হন দু'বছর এখানে ছিলেন, পরে কলকাতার মাদ্রাসার ইংরেজি স্কুল-সংলগ্ন বাংলাক্লাশে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন ২৬ জুন ১৮৪৩। হিন্দু কলেজে পাঠশালার পণ্ডিতের পদে থাকবার সময় ছাত্রদের জন্যে একটি ভূগোল বই মুক্তারাম লিখেছিলেন বাংলায়।

ঃ ২৯ ডিসেম্বর মাসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬, ৩ এপ্রিল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। মার্শাল বিদ্যাসাগরের কাছে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' 'শকুন্তলা' 'উত্তররামচরিত' 'বিক্রমোর্বশী' পাঠ নেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ও হিন্দি শিখতে আরম্ভ করেন সিভিলিয়ানদের ভালোভাবে পড়াবার জন্যে। এখন থেকেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন। এর আট বছর পরে জয়নারায়ণ বসুর কাছে শেখেন। বিদ্যাসাগরের ইংরেজি লেখাসম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন ঃ 'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাজিতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দর ইংরাজি লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকে জানেন না; এমনকি তাঁহার হাতের ইংরাজি লেখাটিও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজিওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয়।'

ঃ বিদ্যাসাগরের চাপে ঠাকুরদাস চাকুরি থেকে অবসর নেন। কুড়ি টাকা করে প্রতি মাসে পাঠাতেন এরপর থেকে। কলকাতায় বহুবাজারে দয়ারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকেন, অন্য তিন ভাই ও আরো অনেকে একত্র বাস

করেন। এইখানেই [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। শম্ভুচন্দ্র বলেন : 'তৎকালে বাসায় আমরা তিন সহোদর, দুইজন পিতৃব্য পুত্র, দুইজন পিতৃস্বস্রেয়, একজন মাতুলপুত্র, পৈতৃক আমলের ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত, এই নয়জন অবস্থিতি করিতাম। বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না, সকলকেই পাকাদিকর্ম সম্পন্ন করিতে হইত।'

: লর্ড যোরো গভর্নর।

১৮৪২ : জুন মাসে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু।

: দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই সময় ইংরেজি শিখতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগর দুর্গাচরণকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড-রাইটারের পদে চাকরি পেতে সাহায্য করেন। পরে তাঁর কলেজে দুর্গাচরণের পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে অধ্যাপকের চাকরি দেন তাঁর কলেজ দু'শ টাকা বেতনে। হেয়ারের মৃত্যুর পর দুর্গাচরণকে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে সুযোগ দিতে রাজি না হওয়ায় হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার পদ ত্যাগ করেন তিনি। মার্শাল বিদ্যাসাগরের অনুরোধে দুর্গাচরণকে হেডরাইটারের পদে চাকরি দেন আশি টাকা মাইনেতে, বিদ্যাসাগর পেতেন পঞ্চাশ টাকা।

: চারজন সঙ্গী নিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর য়ুরোপে যান।

: 'বেঙ্গল স্পেক্টটরে'র জুলাই সংখ্যায় 'রি-ম্যারেজ অব হিন্দু উইডোজ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

: জুন মাসে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা বেরোয়, অক্ষয়কুমার দত্ত এর সম্পাদনা করেন।

: শ্যামাচরণ সরকার রামরতন মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত শিখতে আসেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

: রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহজ উপায়ে সংস্কৃত শেখাবার জন্যে বাংলায় উপক্রমণিকা রচনার পরিকল্পনা।

: গিরিশ বিদ্যারত্ন তখন বিদ্যাসাগরের কাছে থাকেন।

: মদনমোহন তর্কালংকার ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকে কর্মে নিয়োগের সহায়তা করেন।

: হার্ডিঞ্জ এই সময় একশ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে। এইসব স্কুলের জন্যে পণ্ডিত-নিয়োগের ভার বিদ্যাসাগরের ওপর ছিলো।

: কস্ট সাহেবকে সংস্কৃত কবিতা লিখে দিলে দু'শ টাকা পুরস্কার দিতে চান কস্ট, কিন্তু সেই টাকা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত রচনার জন্যে পারিতোষিক হিশেবে দেওয়া হতো বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে চার বছর দেওয়া হয়েছিলো।

শম্ভুচন্দ্র বলেন : 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্ম করিবার সময় লিটিলস্কোর,

কল্ট্, ড্যাম্পিয়ার, সিসিল বিডন, গ্রে, গ্রান্ড, হেলিডে, লর্ড, ব্রাউন, ইডেন প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত সিভিলিয়ানের সহিত অগ্রজের বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ছিল।' এই কারণেই কৃষ্ণকমল বলেছেন ও 'যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইতেছিলেন। সাহেবদের নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙালি মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাহাদের সিলমোহরের ছাপ না পাড়লে জিনিশের মূল্য হয় না।' কিন্তু কৃষ্ণকমলের এ কথা ঠিক নয়, বিদ্যাসাগর তোতলা ছিলেন বলে পড়াতে পারতেন না। বিদ্যাসাগরের পড়ানোয় মার্শাল উচ্ছ্বসিত। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকবার সময় পড়ানোর সময় পেতেন না।

১৮৪৩ঃ ২০ এপ্রিল জর্জ টমসন ও ইয়ংবেঙ্গল শিষ্যদের দ্বারা 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। ৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন কলকাতার মিশন রো'তে ওল্ড মিশন চার্চ গৃহে মাইকেল নামে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন, দীক্ষা দেন আর্চ ডিকন ডেয়ালট্রি, সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুর সময়ও কৃষ্ণমোহনই ছিলেন পাশে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সাহায্য করেছিলেন।

ঃ দাসপ্রথার বিলোপ।

ঃ জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে জর্জ টমসন ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন, তাঁর বক্তৃতায় নব্য শিক্ষিত যুবকেরা উন্মাদনায় প্রাণিত।

ঃ ১৬ই অগাস্ট অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র ১৯৭৪ অনুকরণে প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্যে পেপার কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর প্রথম থেকেই এই পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন। এই পত্রিকার জন্যে তিনি মহাভারতের উপক্রমণিকা লেখেন, পরে অন্য অনেক রচনাও লিখতে হয়। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় অনেক গুণী সদস্য সংগঠিত হয়ঃ বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি।

ঃ ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ শ্রীধর ভট্টাচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ হরদেব চট্টোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্ত, লালা হাজারীলাল শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়— এঁরা সব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

ঃ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কলেরায় অসুস্থ হলে চিকিৎসা করেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু তর্কবাগীশ মারা যান।

ঃ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের [illegible] চিকিৎসা। [illegible] টাকা [illegible] তর্ক[illegible]কে

ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও গিরিশ বিদ্যারত্নকে যথাক্রমে পঞ্চাশ ও তিরিশ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন।

ঃ ২৮ নভেম্বর মার্শালকে চিঠি ঃ 'অদ্য আমার পিতৃব্য পুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারিবার ভেদ হইয়াছে, ২০ গ্রেম লডেনম দেওয়াতে আপাততঃ প্রায় এক ঘণ্টা ভেদ বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয় না। অতএব তাহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক, সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না, ত্রুটি মার্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি।' মার্শালসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরেব শ্রদ্ধা ঃ 'মহাশয় আমি টাকার প্রত্যাশা করি না, আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি অনেক নূতন নূতন উপদেশ পাইব।'

বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা পরিবর্তন, পবিবর্জন ও সংশোধন করে দিতেন, যদিও বিষয়বস্তু ও ভাব বিদ্যাসাগরের থেকে আলাদা। কৃষ্ণকমল বলেছেন এ প্রসঙ্গে ঃ "বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাংলাভাষার গঠন বিষয়ে কেইই সহায়তা করিতে পাবে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যে যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন অক্ষয় লিখতে-টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে-শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের style ভাব লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।' ভাব স্বতন্ত্র হলেও ভাষা সংশোধন করে অপরের উপকার করা যায়, কৃষ্ণকমল এটা বুঝতে পারেন নি।

ঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্নর।

১৮৪৪ ঃ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' মাধ্যমেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বহু লোকের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সময় থেকেই পরবর্তী কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বিভিন্ন জনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা ঘটে ঃ কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, কালীচরণ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি।

ঃ রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন ; তাঁদের এই প্রতিজ্ঞাপত্র ছিলো ঃ ১. সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব একমাত্র; অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের প্রীতি প্রীতি দ্বারা এবং তাহার কার্যসাধন দ্বারা তাঁহাদের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। ২.

পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনো বস্তুর আরাধনা করিব না। ৩. রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব। ৪. সৎকর্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব। ৫. পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব। ৬. যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি তবে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্বক তাহা হইতে বিরত হইব। ৭. ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব। (১৮৪৩, ৭ই পৌষ)।

ঃ 'ব্রাহ্মধর্মের বীজ' ১. ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্বমসৃজৎ। ২. তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি-সর্ব-নিয়ন্তৃ-সর্বাশ্রয়-সর্ববিৎ-সর্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। ৩. একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। ৪. তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঃ জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন বারো বছর সাত মাস অধ্যয়ন করবার পর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে, সম্ভবত বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়, কিছুদিন নবাগত সিবিলিয়ানদের বাংলা পড়িয়েছিলেন। ৯ নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের পুস্তক-অধ্যাপক নীলাম্বর শর্মার মৃত্যু হলে ১৬ নভেম্বর থেকে তিরিশ টাকা বেতনে দ্বারকানাথ এই পদে নিযুক্ত হন।

ঃ রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ও পুরনো কালের ছাত্রদের নেশা করা ও ব্যভিচারের ছবি সুস্পষ্ট, এই দুয়ের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অন্য ছাত্রেরা নিষ্পিষ্ট হতো ঃ 'আমার ইচ্ছা ছিল যে আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাহাদিগের এক পুরুষ পূর্বের যুবকরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল। গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহারা কখনই পাপাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি প্যাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেকদিন কার্য করিয়াছেন) প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোল দীঘিতে মদ খাইতাম এবং এক্ষণে যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া

[illegible] কটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উইল্‌সনের হোটেল হইতে কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্র্যান্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদিঘিতে মদ খাইয়া টংপ ভুজঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটিতে আসাতে মাতাঠাকুরানী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি আর কলকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব,' পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্যে ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিত পায়ী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না।'

১৮৪৫ ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

ঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শুরু।

ঃ ২২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে মতিলাল শীলস্ ফ্রি কলেজ ছিলো।

ঃ গিরিশ বিদ্যারত্ন ১৪ জানুয়ারি গ্রন্থাধ্যক্ষ হন তিরিশ টাকা বেতনে।

ঃ রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের অধ্যয়ন শেষ করে কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। রাজনারায়ণের পাঠ্যগ্রন্থ ছিলো ঃ হিউমের 'হিস্টরি অব ইংল্যান্ড', গিবনের 'রোমান এম্পায়ার,' মিটফোর্ডের 'হিস্টরি অব গ্রিস', ফার্গুসনের 'রোমান পাবলিক,' এলফিনস্টোনের 'ইন্ডিয়া', রাসেলের 'মডার্ন ইউরোপ' এবং মেকলে। কবিদের মধ্যে স্পেন্সার টমসন বায়রন শেক্সপিয়র ও মিল্টন, বেকনের প্রবন্ধ, পোপের প্রবন্ধ ও কবিতা, ইয়ঙের নাইটস থট ও গ্রে'র কবিতা। গণিতে ইউক্লিডের প্রথম ছটি ও একাদশ বই, ট্রিগোনোমেট্রি, অ্যানালিটিক্যাল কোনিক সেক্শনস্, ডিফারেনশিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, সেই সঙ্গে মেকানিক্স, এ্যাস্ট্রোনমি, হাইড্রোস্ট্যাটিকস, অপটিক্স ও 'ক্যালকুলেশন অব এক্লিপ্সেস'। এই পাঠ্যতালিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকার প্রভেদ লক্ষণীয়। ১৪ জানুয়ারি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন পঞ্চাশ টাকা বেতনে কলেজের সেক্রেটারি জি. টি. মার্শালের সুপারিশে। ১৮৫৫, ১৪ মে পর্যন্ত এই পদে ছিলেন; এই পদে থাকবার সময় ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করেছিলেন কৈলাসচন্দ্র বসুর কাছে ঃ কৈলাসও দ্বারকানাথের কাছে সংস্কৃত শিখতেন।

১৮৪৬ ঃ [illegible]

কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর কলেজের পঠন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে সম্পাদক রসময় দত্তকে এক রিপোর্ট দেন, রসময় দত্ত এই রিপোর্ট শিক্ষা পরিষদ্‌কেও পাঠান না, রিপোর্টের ভিত্তিতে কলেজের পঠন-ব্যবস্থার কোনো উন্নতিতে হাত দেন না। ১৬ জুলাই বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন।

: ১ মার্চ খ্রীস্টান ধর্ম প্রসারের রোধের জন্যে রাধাকান্তদেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় Hindu Charitable Institution প্রতিষ্ঠা। এবং অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এর প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

: প্যারীচরণ সরকার বারাসত সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বালিকা বিদ্যালয় ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী ভূমিকা নেন। রাধাকান্তদেবের অনুসরণ স্মরণীয়।

: দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু ১ অগাস্ট।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মের আন্দোলনের পেছনে দ্বারকানাথের প্রভূত অর্থের নিরাপত্তা ছিলো; এই আর্থিক নিরাপত্তাই ঠাকুর পরিবারে উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি নিয়ে এসেছিলো, দ্বারকানাথের মধ্যে দুটি প্রবণতা একই সঙ্গে লক্ষণীয়ঃ প্রচুর অর্থোপার্জনের সঙ্গে জাতীয় ও স্বদেশীয় উন্নতির চিন্তা ; তারই পাশাপাশি ইংরেজদের সহায়তা ও বন্ধুতাকে নিয়ে নিজের ও দেশের সম্পদকে বাড়িয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী চিন্তা ও কর্মের বীজ দ্বারকানাথের জীবনেই দেখতে পাওয়া যায়। ১৭৯৪ সালে দ্বারকানাথের জন্ম, পিতা রামমণি, মাতা মেনকা। ভ্রাতা রামলোচনের সন্তান মারা গেলে দ্বারকানাথকে দত্তক নেন, রামমণির চেয়ে রামলোচন স্বচ্ছল ছিলেন। সংস্কৃত-আরবি-পার্শি শেখেন পরে ইংরেজি। প্রথম বয়সে ঠিকাদারি, জমি কেনাবেচা, টাকা সুদে খাটানো, য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির ব্যাবসা ও বড়ো জমিদারদের আইনে পরামর্শ দিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করতেন দ্বারকানাথ। ১৮২৩ সালে নিমক মহলের কালেক্টরের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন, ১৮২৯ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ১৮১৯, ১মে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা; ১৮২৪, ২ অগাস্ট ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা; ১৮২৯, ১৭ অগাস্ট য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। ১৮২৮ সালে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগ ঘটে; ১৮৩১ সালে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন হলে দ্বারকানাথ কোম্পানির মধ্যবর্তীর লেনদেন করেন। ১৮৩১, ১৪ জুলাই দ্বারকানাথ য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সভায় অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। ব্যাঙ্ক-ব্যাবসার সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো।

১৮৩৪, ১৭ই অগাস্ট দেওয়ান পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ব্যাবসা ও জমিদারি পরিচালনা করেন আত্মনিয়োগে। ব্যবসায়িকের জন্যে। দ্বারকানাথই এঞ্জেল্স ও

বিদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা প্রথম করেন। কারঠাকুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাও এই সময়। জমিদারি ক্রয় করেন রাজশাহীর কালীগ্রাম, পাবনার শাহজাদপুর, রংপুরের স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাট এস্টেটের তের আনা অংশ, স্বারবাসিনী, জগদীশপুর, মহম্মদশাহী এবং কটকের সরগরা। এই জমিদারিই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে এসেছিলো পরে।

কিন্তু দ্বারকানাথের কৃতিত্ব ও খ্যাতি জমিদারি কেনা ও পরিচালনায় নয়, জমিদারির মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের উপকার ও অর্থোপার্জনে সাহায্য করেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারির মধ্যে নানারকম ব্যাবসা, কুঠি বা শিল্প কলকারখানা স্থাপন করেন; শিলাইদহে নীলকুঠি স্থাপন; কুমারখালিতে রেশম কুঠি ক্রয় করে কার্য শুরু; বারুইপুর গাজিপুরে ও পাবনায় চিনির কুঠি স্থাপন; পাশ্চাত্য প্রণালীতে ভারতবর্ষে দ্বারকানাথই প্রথম ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদন করেন। শর্করা-উৎপাদনে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহারও তিনিই প্রথম করেন। দ্বারকানাথ প্রকাশ্য নীলামে এক ইংরেজ কোম্পানির থেকে রানীগঞ্জে একটি কয়লাখনি কেনেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনের চারের দশকে ভারতবর্ষের মধ্যে নদীগুলির মধ্যে বাষ্পীয় পোত প্রবর্তনের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ; তাঁর একটি নিজের স্টিমারও ছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরে এই ধারা অনুসরণ করেন।

সুয়েজের পথে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থার জন্যে আন্দোলনে অংশীদার ছিলেন দ্বারকানাথ।

পাটশিল্পে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও লিপ্ত হয়েছিলেন পাটে।

জাতীয় ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্যে জীবনবীমা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। 'লবেডল সোসাইটি নামে' বীমাকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করেন। ১৮৩৪, ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অংশীদার ও ডিরেক্টরগণের সাধারণ সভায় তিনি এর অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। ওরিয়েণ্টাল ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিলো। সরকার বীমা কোম্পানিগুলি গ্রহণ করতে চাইলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়; এই আন্দোলনের পুরোভাগে দ্বারকানাথ ছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলনে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যে, শিক্ষার প্রসারে দ্বারকানাথ আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন, এখানেই দ্বারকানাথের সঙ্গে রামমোহনের যোগ। দ্বারকানাথের আন্দোলন ও চেষ্টাতেই মেটকাফ ১৮৩৫, ৩ আগস্ট সংবাদপত্রের নিষেধ আইন প্রত্যাহার করেন। তাঁর আন্দোলন ব্রিটিশের প্রকৃত স্বাধীন প্রজা হিসেবে। এই সব আন্দোলন ছাড়াও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের বিরোধে সভা করেছেন; নিবাধ অধিকারের জন্যে আন্দোলনের শরিক হয়েছেন; কুলিদের নিয়ে আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। একটি জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে এই মানব-হিতৈষিতাই তাঁকে [illegible] করে [illegible]।

১৮৩৬ সালে বিতাড়ন-পরিত্যক্ত বিতর্ক-পত্রিকা য়ুরোপীয়দের সমর্থন করেছেন। ১৮৩৮, ২১ মার্চ 'ভূম্যধিকারী সভা' প্রতিষ্ঠিত হল, প্রধান উদ্যোক্তা দ্বারকানাথ। এর সম্পাদক একজন য়ুরোপীয় ও অন্যজন ভারতবাসী। প্রাচ্য-প্রতীচ্য এইভাবে মিলেছে কর্মে ও জীবনে, এই ধারাই রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা পেয়েছে। ১৮৪২, ৮ জানুয়ারি বিলাতযাত্রার পূর্বে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়েরা তাঁকে অভিনন্দনপত্র দেন, এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে দ্বারকানাথ বলেন: আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশের উন্নতিসাধন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ব্রিটেনের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও সামাজিক আচার-আচরণ লক্ষ করতে যাচ্ছি।' ১৮৪২, ৯ জানুয়ারি দ্বারকানাথ বিলাতযাত্রা করেন।

এতোটা কাহিনী লেখার উদ্দেশ্য, বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে দ্বারকানাথকে চিনতেন ও জানতেন। য়ুরোপীয় মহিলাদের আমন্ত্রণ করে বেলগাছিয়া ভিলায় হৈ-হুল্লোড়, সাহেবমেমদের সঙ্গে মদ্যপান, বাইজি নাচ, সাহেবদের সঙ্গে ওঠা-বসা, প্রচুর অর্থোপার্জন বাঙালির মনে ঈর্ষা জাগিয়েছিল, এবং চরিত্রহীনের কলঙ্ক রটিয়েছিলো নির্বিধায়। বিশ্বনাথ লাহাকে মদের দোকান খোলার জন্যে সাহায্য দেওয়ায় এই অপবাদ। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে দ্বারকানাথসম্বন্ধে বলতে বললে উত্তর দেন: 'তাঁর বিরুদ্ধে যা বলা হয়, তা নিছকই অপবাদ।' এইরকম কিংবদন্তি, বিদ্যাসাগর নাকি, দ্বারকানাথের জীবনী লিখতে চেয়েছিলেন। দ্বারকানাথ রামমোহনের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে স্ত্রীশিক্ষার জন্যে য়ুরোপীয় মহিলাশিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় খুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কার্যকর হয়ে ওঠেনি। ক্যাথলিক আর্চবিশপ ফাদার কেরু-কে লেখা চিঠিতে এই প্রস্তাব আছে। এখানেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগ।

প্রভূত সম্পত্তির অধিকারই দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে বিলাসী ও পরে ধর্মে প্রণোদিত করে তুলেছিলো।

১৮৪৭: সম্ভবত এই সময়েই জুলাইয়ের আগে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার বিদ্যাসাগরকে তাঁর ঘরে টেবিলে জুতো-সুদ্ধ পা তুলে রেখে কথা বলে অপমান করে, কারণ বিদ্যাসাগরের কাছে কোনো প্রয়োজনে দেখা করতে এলে অনুরূপ ব্যবহার করেন। কার অপমানিত হয়ে কৌন্সিলের কাছে অভিযোগ করলে বিদ্যাসাগরের লিখিত উত্তর কৌতুকজনক ও তাঁর তেজস্বিতার পরিচায়ক। [illegible] ভট্টাচার্যের কথা ঠিক নয়, সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগর বিদ্যার গৌরব প্রতিপত্তি রাখতে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। I thought that we ( natives ) were an uncivilized race quite unacquainted with refined manners of receiving gentleman visitor. I learned the manners of which Mr. Kerr complains from the gentleman himself, a few days ago, when I had an occasion to call on him. My notions of refined manners being thus formed from the conduct of an enlightened,

civilised European, I behaved myself as respectfully towards him as he had himself done.

: ৭ মে প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতায়।

: ১৬ জুলাই রসময় দত্তের ওপর বিরক্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঐ পদে নিযুক্ত হন।

: বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে ছ'টাকায় একশ কপি বিক্রয় করে ছ'শ টাকায় প্রেস কেনার ঋণ শোধ করলেন।

: মোয়াটের অনুরোধে তাঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্ককে সংস্কৃত হিন্দি বাংলা শিক্ষা দেন। পারিশ্রমিক দিতে চাইলে নেন না মোয়াটের বন্ধু বলে, অথচ অর্থের অনটন প্রচুর চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যে, দীনবন্ধুর পঞ্চাশ টাকায় সঙ্কুলান হচ্ছিল না, দীনবন্ধু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তখন চাকরি করেন।

: অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র-জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা ছিলেন।

: ৩১ জানুয়ারি শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম চাংড়িপোতা গ্রামে, তাঁর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষ, এবং বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসভাজন ও অনুগত। শিবনাথের পিতা হরানন্দও আত্ম-মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের প্রিয় পাত্র ছিলেন।

১৮৪৮ : লর্ড ডালহাউসি গভর্নর।

: ভ্রাতা হরচন্দ্রের মৃত্যু কলেরায় কলকাতাতে, সংস্কৃত কলেজে পড়তে এসেছিলো। বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে একজন।

: ১ মার্চ 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়।

: ১ জুন রাজনারায়ণ বসু হেয়ারের স্মৃতি সভায় স্বদেশীয় ভাষায় অনুশীলনসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

: বিদ্যাসাগরেব 'বাংলার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৮৪৯ : বেথুনের চেষ্টায় কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ৭ মে, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাকে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেন।

: কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিশচন্দ্রের মৃত্যু কলেরা রোগে কলকাতায়। সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্যে বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছিলো।

: মধুসূদনের প্রথম গ্রন্থ Captive Ladie এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।

বছরই হয়তো, প্রথম দিকে নীলকরকন্যা রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিবাহ করেন মাদ্রাসে অর্ফান অ্যাসাইলামে ইংরেজির শিক্ষকরূপে।

: বিদ্যাসাগরের লেখা 'জীবন চরিত' প্রকাশিত হয়।

: ২৩ অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন।

: ১ মার্চ পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে বিদ্যাসাগর মাসিক আশি টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এর আগে এই পদে বিদ্যাসাগরের বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।

: 'সর্বশুভকরী সভা' প্রতিষ্ঠা।

: ১৪ নভেম্বর পুত্র নারায়ণের জন্ম।

: ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত।

: মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, বেথুনকে উৎসর্গিত পুস্তক। প্রথম ভাগে অযুক্ত বর্ণ, দ্বিতীয় ভাগে যুক্তবর্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ভাগ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত। নীতিবিষয়ক নানারকম গল্প, অতি লৌকিকতা কুসংস্কারবর্জিত। বিদ্যাসাগর সম্ভবত এই বই তিনখানির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই নতুন করে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। দুই বন্ধুর শিশুশিক্ষাগ্রন্থের তুলনামূলক বিচার দরকার।

: ১২ মে সত্তর টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে রাজনারায়ণ বসু নিযুক্ত হন। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুর সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে যোগ দেন। বিদ্যাসাগরের সহকর্মী ছিলেন রাজনারায়ণ—এর আগেই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রাজনারায়ণের পরিচয় হয়। বিদ্যাসাগর এই সময় রাজনারায়ণের কাছে ইংরেজি শেখেন, 'আত্মচরিতে' আছে: 'অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত আমার নিকট অল্পবিস্তর ইংরেজি পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সব ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান।'

১৮৫০: 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা প্রকাশ অগাস্ট মাসে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে বন্ধুবিচ্ছেদ; 'বাল্যবিবাহের দোষ কি প্রবন্ধ' প্রকাশ; ৪ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মত্যাগ; ৫ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে নব্বুই টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত; ডিসেম্বরে বীটন নারী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক। কন্যাপেবং পালনীয়' শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ—মনুসংহিতার এই শ্লোক বালিকাবিদ্যালয়ের গাড়ির দু পাশে লিখে দেবার জন্যে সংগ্রহ করে দেন।

: ১৬ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর 'কাউন্সিল অব এডুকেশনকে' সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর একটি রিপোর্ট দেন পরিষদের সম্পাদক ময়েটের নির্দেশে। এতেই অপমানিত হয়ে রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন।

A Guide to Bengal 'বাংলার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগে'র ইংরেজি অনুবাদ।

: রাধাকান্তদেবের হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ।

: ১৮ ডিসেম্বর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম।

: ৫ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালে অস্থায়ী সম্পাদকেরও কাজ করেন।

১৮৫১: ২২ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন, বেতন দেড়শত টাকা। বিদ্যাসাগরের জন্যেই অধ্যক্ষপদ সৃষ্টি হয়।

: ৯ জুলাই কায়স্থদের সংস্কৃত কলেজে পড়বার সুযোগ দেন, কিন্তু সুবর্ণ-বণিকদের নয়। সম্ভবত এই বছর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার জন্ম হয়। বিদ্যা-সাগর কোনো মেয়েরই ষোল বছরের কমে বিয়ে দেন নি, শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে বর্ণিত উক্তি ধরে নিলে এই তথ্য মেনে নিতে হয়।

: ২৮ মার্চ কাউন্সিল

: বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়,' 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা,' 'ঋজুপাঠ' প্রথম ও তৃতীয় ভাগের প্রকাশ।

: ১২ অগাস্ট বেথুনের মৃত্যু।

: রাধাকান্তদেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' সমাপ্ত।

: ১১ ডিসেম্বর 'বেথুন সোসাইটি' স্থাপিত হয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলো-চনার জন্যে।

: ২৯ অক্টোবর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন, রাধাকান্তদেব এর সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

: খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিতদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে রাধাকান্তদেবের 'পতিতো-দ্ধার সভা' স্থাপন।

: ১১ নভেম্বর গিরিশ বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

: রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর সরকারি স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে যোগদান করলে তাঁকে চিঠি দেন। বিদ্যাসাগরের শেষ বাক্যটি তাঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুতার স্বাক্ষর বহন করে: 'সর্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং অনুগ্রহপূর্বক মধ্যে মধ্যে মঙ্গলসংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও সুস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।' সম্ভবত মার্চ-এপ্রিল মাসে লেখা এই চিঠি। ৪ মার্চ শিক্ষা বিভাগকে রাজনারায়ণের পদত্যাগের সংবাদ জানিয়ে চিঠি দেন।

: ২৩ জানুয়ারি প্রতিপদ, অষ্টমী প্রভৃতি তিথির দিনে ছুটির পরিবর্তে রবিবার ছুটির দিন নির্দিষ্ট করেন।

: নভেম্বর থেকে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ উঠিয়ে দিয়ে তাঁর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' পাঠ্য করেন। 'ঋজুপাঠ' পড়ানো শুরু হয়, 'ঋজুপাঠ' তাঁরই সংকলিত।

: Vernacular Literature Committee বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর এই কমিটির একজন সদস্য, এছাড়া রাধাকান্ত দেব হজসন, রেভারেণ্ড লঙ, প্র্যাট, সীটনকার, জন রবিনসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন। 'খ্রীস্টান নলেজ সোসাইটিজ' 'স্কুল বুক' ও 'এশিয়াটিক সোসাইটি' যে সব অনুবাদে হাত দেয় না সেগুলিই ছাপাবে। বাংলার জন্যে প্রকৃত ও যথার্থ বাংলায় গার্হস্থ্য সাহিত্য প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য। এই কমিটির টাকায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদনা করেন। অনুবাদ ছাড়া মৌলিক গ্রন্থও প্রকাশ করা হতো, যেমন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান'।

১৮৫২ : সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্যে ১৩ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে আবেদন করেন এবং সফলকাম হন। ২৮ অগাস্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবার জন্যে ছাত্রদের দু টাকা করে প্রবেশদক্ষিণা চালু করেন।

: ৮ জানুয়ারি 'বেথুন সোসাইটি'র প্রথম অধিবেশন, অনেকের মধ্যে বিদ্যাসাগর এই সোসাইটির সদস্য।

: 'ঋজুপাঠে'র তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

১৮৫৩ : মেদিনীপুরে বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন।

: 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধপাঠ, সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি বিভাগ পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠন করেন। ঐচ্ছিক না করে অবশ্যপাঠ্য করেন নভেম্বরে। প্রসন্নকুমার অধিকারী ইংরেজি সাহিত্যের ও শ্রীনাথ দাস একশ টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'লীলাবতী' ও সংস্কৃত বীজগণিতের পরিবর্তে ইংরেজি বীজগণিত চালু করেন।

: 'ব্যাকরণ কৌমুদী' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ।

: অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ ও 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের প্রকাশ।

: কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা সম্ভবত মে মাসে।

: ১৫ই জুন গিরিশ বিদ্যারত্ন ব্যাকরণের তৃতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ১৮৬৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ছিলেন তিনি ঐ পদে, তখন আর বিদ্যাসাগর কলেজে নেই, ১৮৬৩তে দ্বিতীয় অধ্যাপক, ১৮৬৬ থেকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকুরি করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা-

কাউন্সিলের সেক্রেটারি মোয়াটের কাছে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিষয়ে ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন, তাতে বেদান্ত ও দর্শনকে মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেন নি।

ঃ বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'রঘুবংশম্' প্রকাশিত হয়, সেই সঙ্গে 'কিরাতার্জুনীয়ম্'। 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' সংকলন করতে থাকেন, শেষ হয় ১৮৫৮ সালে।

ডালহাউসির রেলোয়ে মিনিট; ভারতে প্রথম রেলপথ; কলকাতা থেকে আগ্রায় টেলিগ্রাফ।

১৮৫৪ঃ ১লা মে বাংলায় ছোটলাটের পদসৃষ্টি; জানুয়ারিতে বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্সের সদস্য নির্বাচিত। ৭ই ফেব্রুয়ারি হ্যালিডেকে লেখা বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানসম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি; ৩রা জুলাই হ্যালিডেকে শিক্ষাসম্বন্ধে রিপোর্ট। ১৯জুলাই স্যার চার্লস উড-স্বাক্ষরিত ভারতের শিক্ষাবিষয়ক চার্টার।

ঃ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন হিশেবে এক টাকা নেওয়া চালু করেন জুন মাস থেকে।

ঃ অধ্যক্ষ হিশেবে বেতন পান তিনশো টাকা।

ঃ রামগোপাল ঘোষ প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে প্রথমবার বর্ধমান রাজবাড়িতে গমন; বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রচার জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। 'ব্যাকরণ কৌমুদী' তৃতীয় ভাগ ও 'শকুন্তলা'র প্রকাশ (৯ই ডিসেম্বর)

ঃ ১৫ই ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়ি 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি'র প্রতিষ্ঠা; এই সমিতির উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দুবিধবার বিবাহ, বাল্যবিবাহবর্জন, বহুবিবাহরোধ। এই সমিতির সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুগ্মসম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগর এ সমিতির সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত ছিলেন; কেননা তাঁর সমাজসংস্কারও এগুলিকেই কেন্দ্র করেই।

ঃ ২৪ জানুয়ারি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ উঠে যায়, সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা নেবার জন্যে বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্স গঠন করা হয়। ১৮৬০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সদস্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। মধুসূদনের The Anglo-Saxon and the Hindu বক্তৃতা মাদ্রাজে।

ঃ 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের প্রকাশ।

ঃ প্যারীচরণ সরকার ১আগস্ট হেয়ারের কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। এখানে থাকবার সময়েই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুতা।

ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক।

ঃ ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ছাড়াও উচ্চবর্ণ হিন্দু ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দেন।

ঃ ২১ জানুয়ারি কলেজের পরীক্ষাসম্বন্ধে মোয়াটকে বিদ্যাসাগরের চিঠি।

১৮৫৫ঃ 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা,' দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ ; ৪ঠা অক্টোবরে বিধবাবিবাহ আইনপ্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন, ২৭ ডিসেম্বরে বহুবিবাহ-নিষেধ আইনের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন। ২রা জুলাই বিদ্যাসাগরের সুপারিশে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন; বেতন দেড়শ টাকা ; মধুসূদন বাচস্পতির নামও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের জন্যে সুপারিশ করেন, এবং ইনিই বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবার জন্যে ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দেন, এই ঋণই পরিশোধ করেন বিদ্যাসাগর এইভাবে। ২৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি গঠনের সদস্য নির্বাচিত হন। 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ।

ঃ হিন্দু কলেজের পুরনো পাঠশালাকে নিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্য করে তোলবার জন্যে ট্রেনিং দিয়ে নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজে ১৭ই জুলাই।

ঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের তিনশো টাকা বেতনের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে সহকারী স্কুল ইন্‌স্পেক্টর পদে নিয়োগের জন্যে আরও দুশো টাকার বেতন পান, মোট পাঁচশ টাকা।

ঃ নদীয়ার বেলঘরিয়ায় ২২ আগস্ট মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা ; নদীয়ার মহেশপুরে ১লা সেপ্টেম্বর, ভজনঘাটে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, খাঁটুয়ায় ১১ই সেপ্টেম্বর, দেবগ্রামে ১২ই সেপ্টেম্বরে।

ঃ বর্ধমানে আমোদপুরে ২৬ আগস্ট, জৌগ্রামে ২৭ আগস্ট, খণ্ডঘোষে ১লা সেপ্টেম্বর, মানকরে ৩রা সেপ্টেম্বর, দাঁইঘাটায় ২৯ অক্টোবর।

ঃ হুগলি জেলায় হারোপে ২৮ আগস্ট, শিয়াখালায় ১৩ই সেপ্টেম্বর, কৃষ্ণনগরে ২৮ সেপ্টেম্বর, কামারপুকুরে ২৮ সেপ্টেম্বর, ক্ষীরপাই ১ নভেম্বর।

ঃ মেদিনীপুরে গোপালনগরে ১লা অক্টোবর, বাসুদেবপুরে ১লা অক্টোবর, মালঞ্চে ১লা নবেম্বর, প্রতাপপুরে ১৭ ডিসেম্বর।

ঃ ৪ঠা অক্টোবর থেকে ব্যবস্থাপক সভা বিধবাবিবাহ রদ করবার জন্যে আবেদন করে। ১৫ই মে থেকে ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রিন্সিপ্যালের সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন, বেতন ছিল মাসিক একশত টাকা। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কলেজের প্রশাসন ছাড়া মডেল স্কুলগুলির পরিদর্শনে গেলে দ্বারকাভূষণ তখন অধ্যক্ষের কাজ করতেন। ১লা ডিসেম্বর থেকে নব্বুই টাকা বেতনে দ্বারকানাথ সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন, এই পদের জন্যে সুপারিশ করেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। ১৮৭৩ সালে খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য অবসর নেন। বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুগত ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর সমস্ত কর্মে দ্বারকানাথের সহায়তা পেতেন।

ঃ ১৮৫৫, ২০ এপ্রিল, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ঃ ২১ নভেম্বর গর্ডন ইয়ংকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর সুবর্ণবণিক ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, বিদ্যাসাগরের সর্বজনীন মানব-প্রীতি আমাদের আঘাত দেয় ; এবং জীবনের সীমাবদ্ধতা ও জাতিভেদকে মেনে নিয়েছেন তিনি ঃ ( হয়তো-বা অবস্থার চাপে )

In the year 18=4 this privilege was further extended to all the respectable castes of Hindoos under further orders.

But these orders I regret cannot apply to the people of the caste to which the memorealist belongs nor would it in my humble opinion be expedient at present to admit applicants of that class. It is true that some families of Sonar Baniya of Calcutta are a popular men but in the scale of castes this clan stands very low. Admission from that class will I am sure not only shock the prejudice of the orthodox Pundits of the Institution but materially injure to its popularity as well as respectability.

ঃ বিদ্যাসাগরের অধীনে সাবইন্‌স্পেক্টরগণ ঃ হরিনাথ ন্যায়রত্ন, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। এঁদের প্রত্যেকের বেতন একশো টাকা, পথখরচ আলাদা।

ঃ Widow Marriage বিধবাবিবাহ পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ।

১৮৫৬ ঃ বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৬ই জুলাই।

ঃ নবেম্বরে সহকারী স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের জায়গায় দক্ষিণবঙ্গের স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টর রূপে নিযুক্ত হন।

ঃ আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন স্কুলকমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ৭ই ডিসেম্বর ৪৯ সুকিয়া স্ট্রিটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রথম বিধবাবিবাহ দেন শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও কালীমতীর সঙ্গে।

ঃ 'কথামালা' ও 'চরিতাবলীর' প্রকাশ।

ঃ হাইকোর্টের উকিল দুর্গামোহন দাসকে বিধবাবিবাহে ব্যর্থতায় হতাশ না হবার জন্যে চিঠি লেখেন।

ঃ সম্ভবত এই বছর বিদ্যাসাগরের মধ্যম কন্যা কুমুদিনীর জন্ম।

ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্মনীতি' ১০ মাঘ ও 'পদার্থ বিদ্যাগ্রন্থে'র প্রকাশ। ১২ই জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজ ত্যাগ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন আইন শ্রেণীতে। ১৮৫৮, ৭ই আগস্ট পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের ছাত্র ছিলেন।

ঃ শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ও মাতুল দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানে। বিদ্যাসাগরের আরেকজন কৃতী স্বনামধন্য, ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক সমাজসংস্কারে উদ্বুদ্ধ ছাত্র। তাঁর

নিজেরই উক্তি : 'আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা এবং বিধবাবিবাহের পক্ষ।' (১১নবেম্বর) : ২৫ কার্তিক বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিক্রমপুরের চণ্ডীচরণ ন্যায়-রত্নকে লেখা চিঠি। ৮ই ডিসেম্বর ঠনঠনিয়ার ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যা থাকমণির সঙ্গে বিবাহ দেন মধুসূদন ঘোষের।

: কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বিধবাবিবাহ সমর্থন করে বহু অভিজাত ব্যক্তির স্বাক্ষরসমন্বিত একটি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাতে চেষ্টা করেছিলো। বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হলে কালীপ্রসন্ন ঘোষণা করেন যে-ব্যক্তি বিধবাবিবাহ করবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই মর্মে ২৬ নবেম্বর 'সংবাদ প্রভাকরে' এক বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। জুলাই মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদনাও তাঁর, সপ্তম পর্ব তিনিই সম্পাদনা করেন। এর আগেরগুলি করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এইসব কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ সক্রিয়।

১৮৫৭ : ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত, জানুয়ারি মাসেই স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনার জন্যে হ্যালিডের সঙ্গে কথা-বার্তা, ৩০মে বর্ধমানের জৌগ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

: বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'শিশুপালবধ' বেরোয়।

:১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ।

: ১৮৫৭ সালের নবেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর পঁয়ত্রিশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন : হুগলির পোটবা গ্রামে ২৪ নবেম্বর, তালাণ্ডু গ্রামে ৭ই ডিসেম্বর, দাসপুরে ২৬ ডিসেম্বরে, বঁইচিতে ১লা ডিসেম্বর, দিগশুইতে ৭ই ডিসেম্বর, হাতিনায় ১৫ই ডিসেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর হয়েরায়, বর্ধমান জেলায় রানাপাড়ায় ১লা ডিসেম্বর।

: রাধাকান্তদেব শোভাবাজার রাজবাটিতে নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন।

: ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ১৮৫৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৬০, ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজ মিলিটারির হাতে ছিল ; সৈন্যদের হাসপাতাল করবার জন্যে দখল করা হয়। ৯২ নম্বর ১১০ নম্বর বহুবাজার স্ট্রিটে কলেজের ক্লাশ হতো এবং ১৩১ নম্বর বহুবাজার স্ট্রিটে নর্মাল স্কুলের ক্লাশ বসতো।

: এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ডিসেম্বরে স্বরূপ চক্রবর্তীর বিধবা কন্যা লক্ষ্মীমণির বিবাহ দেন যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ২১ ফেব্রুয়ারি রামসুন্দর ঘোষের বিধবা কন্যা গোবিন্দমণির বিবাহ দেন মেদিনীপুর জেলা শিক্ষক দুর্গাচরণ বসুর

সঙ্গে। দুর্গাচরণের পিতা মধুসূদন বসু রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ তাত। ৮ই মার্চ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাসের বিধবা কন্যা নৃত্যকালীর সঙ্গে বিবাহ দেন মদন মোহন বসুর।

ঃ 'বিদ্যোৎসাহিনী পাঠাগারে'র প্রতিষ্ঠা।

ঃ ১১ এপ্রিল 'বিদ্যোৎসাহিনীরঙ্গমঞ্চে'র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। রামনারায়ণের অনুবাদ 'বেণীসংহার' এখানে অভিনীত হয় প্রথম। 'বিক্রমোর্বশী' অভিনীত হয় ২৪ নভেম্বর।

১৮৫৮ঃ ২৪-এ জুন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠিতে জানা যায় স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্যে সরকার যে-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তুলে নেবার ফলে সমূহ ঋণের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। ২২ ডিসেম্বর এই সালে শেষ পর্যন্ত সরকার সমস্ত টাকা পরিশোধ করেন। টাকার পরিমাণ ৩৪৩৯-২১

ঃ ৩ নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন বা চাকরিতে ইস্তফা দেন।

ঃ বালিকাবিদ্যালয়গুলিরপরিচালনার জন্যে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলেন; চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও উচ্চতন সরকারী কর্মচারীরা। ছোট বিডনও পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য দিতেন।

ঃ টেকচাঁদ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়।

ঃ ৭ই নবেম্বর বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম শ্রীহট্টে পৈলগ্রামে।

ঃ হুগলির ন পাড়ায় ৩০এ জানুয়ারি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, উদয়রাজপুরে ২রা মার্চ, রামজীবনপুরে ১৬ই মার্চ, আকাবপুরে ২৮ মার্চ, শিয়াখালায় ১লা এপ্রিল, মাহেশে ১লা এপ্রিল, বীরসিংহে ১লা এপ্রিল, গোয়াল সারায় ৪ঠা এপ্রিল, দণ্ডীপুরে ৫ই এপ্রিল, দেপুরে ১লা মে, রাউজাপুরে ১লা মে, মলয়পুরে ১২ই মে, বিষ্ণুদাসপুরে ১৫ই মে।

ঃ বর্ধমান জেলায় জামুই-এ ২৫ জানুয়ারি, শ্রীকৃষ্ণপুরে ২৬ জানুয়ারি, রাজারামপুরে ২৬ জানুয়ারি, জ্যোৎ-শ্রীরামপুরে ২৭ জানুয়ারি, দায়ঘাটায় ১লা মার্চ, কাশীপুরে ১লা মার্চ, সানুই-এ ১৫ই এপ্রিল, রসুলপুরে ২৬-এ এপ্রিল, বন্তীর ২৭ এপ্রিল, বেলগাছি ১লা মে।

ঃ মেদিনীপুরে ভাঙাবন্ধে ১লা জানুয়ারি, বদনগঞ্জে ১০ই মে শান্তিপুরে ১৫ই মে।

ঃ নদীয়ায় ১লা মে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেনঃ শুনিয়াছি 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদাপ্রসাদ নামে তাঁহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজে জোগানো

তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বারকানাথ সম্পাদকতা ভার ও তাহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়• প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখকশ্রেণীগণ্য হইলেন। আগস্ট মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত শিরোরোগের জন্যে প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন, তার পদাভিষিক্ত হন রামকমল ভট্টাচার্য।

ঃ ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমলের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক বিচারক' বেরয় অ্যাডিসনের স্পেক্টেটরের অনুকরণে। ২২এ মার্চ বড়বাজার গদাধর শেঠের বাড়ি কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক দেখেন। ৩১ জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বাংলা 'রত্নাবলী' নাটকাভিনয় দেখেন। ছোটলাট হ্যালিডেও ছিলেন সঙ্গে।

ঃ মধুসূদন 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

ঃ এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি. এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ঃ ১৩ আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশাবে যশোহরে চাকরিতে যোগ দেন, সেখানেই দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুতা।

১৮৫৮, ১৫ই নবেম্বর 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় : আসলে বিদ্যাসাগরই 'সোমপ্রকাশ' পত্রের হোতা, সমস্ত ব্যাপারে তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধি পরিচালিত হতো। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন ঃ 'প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমহাশয় সর্বদা পদার্পণ করিতেন ; এবং পরামর্শাদি দ্বারা 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনবিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।'

ঃ ৯ই মার্চ মদনমোহন তর্কালংকারের মৃত্যু হয় কলেরায় মুর্শিদাবাদের কান্দিতে।

ঃ 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের গদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতের রচনা বলে মনেই হয় না। সন্ধি ও সমাসের জড়তা ও আড়ষ্টতা নেই, দুরূহ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নি, সংবাদপত্র বলেই জ্ঞানের সমস্ত শাখাকে স্পর্শ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের গদ্যের সঙ্গে এই গদ্যের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তবে 'সোমপ্রকাশে'র গদ্য পাঠকের কাছে তথ্য পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে রচিত, বিদ্যাসাগরের গদ্য অনুভবের ও জীবনের বোধের ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে অভিনব। 'সোমপ্রকাশে'র গদ্যসম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ 'বাংলা-সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন ; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাংলাভাষাকে ও বাংলাসাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাংলা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব পলিটিক্স, আলোচিত হইতে

লাগিল। বাংলা ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।' পুরাতন প্রসঙ্গ।

**১৮৫৯ঃ** শঙ্কর ঘোষ লেনে ভাড়া বাড়িতে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, যাদবচন্দ্র পালিত, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ও মাধবচন্দ্র ধাড়ার দ্বারা ; পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্যামাচরণ মল্লিক ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনায় সাহায্যের জন্য অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর ওই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬১ মার্চ পর্যন্ত এই কমিটির দ্বারাই পরিচালিত ছিল।

ঃ মাঘে 'পাঠমালা'র প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী বিদ্যার্থি-গণের ব্যবহারের জন্যে সংকলিত। ৮ই জানুয়ারি পিতামহী দুর্গাদেবীর মৃত্যু।

ঃ 'শব্দকল্পদ্রুমে'র জন্যে ২৫ নবেম্বর রাধাকান্ত দেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, অনেকের মধ্যে এই সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্যারীচাঁদ মিত্র।

ঃ ২৩এ এপ্রিল রামগোপাল মল্লিকের বাড়ি সিঁদুরিয়া পটিতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় দেখতে যান বিদ্যাসাগর, এর পরের কয়েকবার অভিনয়ে গিয়েও অশ্রুসংবরণ করতে পারেন নি। কেশবচন্দ্র সেন এই নাটকের অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, এই অভিনয়ে কলকাতায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঃ ৩রা সেপ্টেম্বর মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় মহা সমারোহে। মে মাসে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশে যায়, এই কারণেই বিদ্যাসাগর 'পেপার কমিটি'র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

ঃ মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

কৃষ্ণকমল খানাকুল কৃষ্ণনগরে সংস্কৃত ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন।

ঃ কালীপ্রসন্নের 'মালতীমাধব' নাটক।

ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ছোটলাট গ্রান্টকে জনশিক্ষাসম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন।

ঃ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেনঃ 'ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগরমহাশয়, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলি, দীন ঘোষ। এই কমিটি বাছাই করিয়া দিত, আমাদের মধ্যে কে কি সাজিবে।' পুরাতন প্রসঙ্গ।

ঃ ১৮৬০ মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের প্রকাশ।

ঃ 'মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ,' 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত পুস্তকাকারে

বেরোয়। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'। নীলবিদ্রোহ ঘটে ; দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ।

ঃ বিদ্যাসাগর মধুসূদনের 'তিলোত্তমা' কাব্য আস্বাদ ও উপভোগ করতে পারছেন জেনে রাজনারায়ণকে মধুসূদন লিখছেন ঃ **you will be pleased to hear that the Punditsare comingground regarding Tilottoma. Vidyasagar has at last condescended to see Great Merit in it and the Someprakash has spoken out in a favourable manner.** বিদ্যাসাগরের গদ্যের ছন্দের ওপর ভিত্তি করেই তো মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ছন্দস্পন্দ।

ঃ মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'পদ্মাবতী' নাটক ( এপ্রিলে ) প্রকাশিত হয়।

ঃ ১১ই জুলাই কৃষ্ণকমলের অগ্রজ রামকমল উদ্বন্ধনে মারা গেলে অস্থায়ীভাবে নর্মাল স্কুলের সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। আগস্ট মাসে একশো টাকা বেতনে কলকাতায় ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল পদ লাভ করেন।

ঃ মে মাসে বোর্ড অব এগজামিনার্সের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন বিদ্যাসাগর। ১লা এপ্রিল মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু হয়।

ঃ কালিদাসের 'মেঘদূত' দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম অনুবাদ করেন বাংলায়, এই অনুবাদ পড়ে মধুসূদন উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রও প্রশংসা করেছিলেন লিখে, বিদ্যাসাগরের প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রশংসায় বিদ্যাসাগরসম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে বিদ্যাসাগর নিজের রচনারীতি ছাড়া অন্যের রচনারীতি চোখে দেখতে পারতেন না ঃ 'সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল। আগে বরাবর আমি বাংলা কবিতা লিখিতাম। কবিতারচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল ; তার মধ্যে হয়ত হালকা রকমের রঙ্গরসের কবিতাও ছিল।...'মেঘদূতে' আমার নাম ছিল না। অনেকেই নিজের নিজের কবিতা পুস্তকে একটু আধটু করিয়া লইয়া বেমালুম চালাইয়া দিতে লাগিলেন ঃ এমনভাবে চালাইলেন যেন উহা তাহাদের স্বরচিত জিনিস। কেহ একটু চেণ্টা করিলেই যে আমার নাম জানিতে পারিতেন না এমন নহে। বিদ্যাসাগর কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি প্রশংসাও করিয়াছিলেন।' পুরাতন প্রসঙ্গ।

১৮৬১ ঃ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে পত্রিকার নতুন সত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকার দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে দেন ডিসেম্বরে। বিদ্যাসাগর পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন কৃষ্ণদাস পালকে এবং একটি ট্রাস্টবোর্ড তৈরি করে পত্রিকার স্বত্ব ন্যস্ত করেন তিনি।

ঃ 'ট্রেনিং স্কুলে'র পরিচালক কমিটির মধ্যে বিভেদ। নতুন কমিটি সংগঠিত হলে ঐ কমিটির সম্পাদক হন।

ঃ রবীন্দ্রনাথের জন্ম ৭ই মে।

ঃ বিদ্যাসাগরের সুহৃদ্ ও পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যু ২৯ মার্চ।

ঃ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে মধুসূদনকে সম্বর্ধনা দেন।

ঃ মধুসূদনকৃত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ গোপনে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (জুলাই-এ)। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়।

ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ 'পরিদর্শক' নামে জুলাই মাসে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'হুতোম পঁ্যাচার নকশা' প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগরী ভাষার বিদ্রোহে কেশবচন্দ্র সেনের 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার প্রকাশ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'কুমারসম্ভব' প্রকাশিত হয়।

১৮৬২ঃ জানুয়ারিতে বিদ্যাসাগর হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদকের ভার দেন মধুসূদনকে। মধুসূদন পারিশ্রমিক ঠিক না পেয়ে ছেড়ে দেন। মে মাসে কৃষ্ণদাস পালকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

ঃ মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনার' প্রকাশ। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ২৬ ফেব্রুয়ারি 'বীরাঙ্গনা' কাব্য উৎসর্গ করেন।

ঃ একটি বিধবা বালিকার বিয়ে দেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পঁ্যাচার নকশা'র প্রকাশ।

ঃ মে মাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য দুশ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

১৫ ডিসেম্বর বাংলা সরকারকে বেথুন নারীবিদ্যালয়সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দেন, তাতে প্রস্তাব দেন মেয়েদের কী কী শিক্ষণীয় হবে।

ঃ 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র চতুর্থ ভাগের প্রকাশ।

ঃ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে ভারতবর্ষ থেকে বিদায়কালে পাদরি লঙকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

ঃ বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়।

১৮৬৩ঃ 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রকাশিত হয়। ছ'টি আখ্যান ও আরো কয়েকটি কাহিনী এতে অন্তর্ভুক্ত।

ঃ নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরকে 'ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউশনে'র পরিদর্শক নিযুক্ত করে সরকার; ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউশনের পরিচালক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৬ মার্চ মাস থেকে। তাঁর বেতন তিনশ টাকা। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন, ১৮৬৭তে এই কলেজে স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত। ১৮৬৩, ১৫ নবেম্বর 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি'

বা 'সুরাপান নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

: বিবেকানন্দের, নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম জানুয়ারি ১২, পরে বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান স্কুলের ছাত্র।

: ১২ জুলাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম।

১৮৬৪ : ২২ জুন স্টেনফোর্থকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর উন্মাদ স্বামীর ঔরসে জাত পুত্রকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন হিন্দুশাস্ত্রে সিদ্ধ বলে।

: 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নাম পরিবর্তন করে মেট্রপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন রাখা হয়।

: ৪ঠা জুন মধুসূদন ভের্সাই থেকে সাহায্যের জন্যে বিদ্যাসাগরকে চিঠি দেন। ৪ঠা জুলাই 'রয়্যাল এশিয়াটক সোসাইটি'র সদস্য নির্বাচিত। ২রা আগস্ট মধুসূদনের ফ্রান্সে দেড় হাজার টাকা পাঠান।

: 'শব্দমঞ্জরী' বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়।

: বিদ্যাসাগর মধুসূদনের লেখা চিঠি পান, চিঠিগুলি লেখা ২রা জুন, ৯ই জুন, ১৮ই জুন।

: 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম দুইভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে নানা বিষয়ের রচনা আহ্বান করতেন কালীপ্রসন্ন; সেই সব রচনার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল ও কালীপ্রসন্ন; বিচারে মনোনীত হলে পুরস্কার দেওয়া হতো, বিষয়বস্তু যেমন পুরাণ পাঠের ফল কি ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো কালীপ্রসন্নের তেমনি ছিলো দেবেন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে, এমনকি দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র জন্যে কালীপ্রসন্নের কাছে উপকৃত, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র জন্যে একটি প্রেস কিনে দিয়েছিলেন কালী-প্রসন্ন। ২০ আগস্ট রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম।

: সম্ভবত এই সময়েই কার্মাটাঁড়ে জমি কিনে বাংলো তৈরি করেন, বিশ্রাম নেবার জন্যে এখানে এসে বাস করতেন, সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পেতেন। সাঁওতালদের সম্বন্ধে কবি হরিশচন্দ্রের কাছে বিদ্যাসাগরে উক্তি স্মরণীয় : 'পূর্বে বড় মানুষদের সহিত আলাপ হইলে, বড় আনন্দ হইত, কিন্তু এখন তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি। তাহারা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। তাহারা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।'

: বিদ্যাসাগরের 'আখ্যান মঞ্জরী' প্রকাশিত হয়।

১৮৬৫ : বিদ্যাসাগরের পিতা কাশীবাসী হবার সিদ্ধান্ত নেন কোষ্ঠীতে বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ জীবন বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কায়; তাঁকে জানানো হয়

বিদ্যাসাগরকে আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদের যন্ত্রণা সইতে হবে এবং দেশত্যাগীও হতে হবে শনির দশায়।

ঃ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিঘাটা বঙ্গ-নাট্যশালা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন যুক্ত ছিলেন। কার্যনির্বাহক কমিটিতে শুধু ছিলেন না, দুজনে রঙ্গ-মঞ্চের তত্ত্বাবধানও করতেন (১৮৬৫-৭৩)

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ।

ঃ বিদ্যাসাগর 'ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশনে'র পরিদর্শন রূপে ১১ জানয়ারি ও ১ সেপ্টেম্বর দুটি রিপোর্ট পেশ করেন সরকারের কাছে। দৈহিক শাস্তিদানের প্রথালোপের প্রস্তাব দেন, এবং জমিদারতনয়দের প্রকৃত শিক্ষাদান প্রণালীর ত্রুটির কথার উল্লেখ করেন বিদ্যাসাগর; তাঁর রিপোর্টের ফলে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে এবং পরিদর্শক-পদ ত্যাগ করেন বিদ্যাসাগর। রাজেন্দ্রলাল মিত্রসম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উক্তি ঃ 'ও লোকটা ইংরেজিতে একজন ধনুর্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—ইংরেজি আমি যৎসামান্য জানি, যদি কিছু আমার জানা-শুনা থাকে তা সংস্কৃত। ইহাতে সাহেবরা ভাবেন—বাসরে, ইংরেজিতে এত সুপণ্ডিত হয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃতে এর কতই বিদ্যে আছে!' পুরাতন প্রসঙ্গ।

ঃ মার্চ মাসে 'মেট্রোপলিটান স্কুলে'র জন্যে কোর্টে মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, ১৩ই মার্চ মামলা মিটে যায়, বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

ঃ ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫-১৬ ডিসেম্বর হবে) শম্ভুচন্দ্রকে চিঠি লেখেন পিতা ঠাকুরদাসকে কাশীবাসী হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে।

ঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোর নাথ গুপ্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৮৬৬ ঃ এপ্রিল থেকে জুন মাসে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটে, এই দুর্ভিক্ষে তিনি অগণিত মানুষকে সাহায্য করেন খাইয়ে, কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকায় তিনি মর্মাহত। রোগের প্রতিবিধানে ডিস্‌পেন্সারি স্থাপন করেন, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেন, ছোটলাট গ্রে-কে সাহায্যের জন্যে আবেদন পাঠান।

ঃ মেরি কার্পেণ্টার সম্ভবত নবেম্বর নাগাদ বাংলায় আসেন। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌সন অ্যাট্‌কিন্স বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ২৭নবেম্বর। ১৪ই ডি অ্যাটকিনস, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো ও মেরি কার্পেণ্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্যে যান। ফেরবার পথে গাড়ি উল্টে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাতে বিদ্যাসাগরের যকৃৎ নষ্ট হয়; এর থেকেই তাঁর পরিপাকশক্তি চলে যায় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোন।

ঃ ১১ নবেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন।

ঃ এদেশের মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী করে গড়ে তুলেবীটননারী-বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করবার জন্যে মেরি কার্পেণ্টার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মন্মোহন ঘোষ। এই আন্দোলনকে সার্থক করে তোলবার জন্যে ব্রাহ্মসমাজে একটি সভা আহূত হয় ১লা ডিসেম্বর ; বিদ্যাসাগরও এই সভায় আমন্ত্রিত এবং সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই কমিটির কার্যাবলিতে অসন্তুষ্ট হয়ে সদস্য থাকতে অসম্মত হন ৩রা ডিসেম্বর ; এবং তিনি তাঁর নাম প্রত্যাহার করেন।

ঃ পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুতে নিরাশ্রয়বোধ।

ঃ ৬ই আগস্ট দেবত্র সম্পত্তি বা জমি হিন্দু আইনে হস্তান্তর নিষিদ্ধ বলে রাজস্ববিভাগের সচিব চ্যাপম্যানকে জানান, এতে এই আইন আর বলবৎ হয় নি।

ঃ জুন মাসে ভবানীপুরে নীলমণি মিত্রের বাড়িতে উমেশমিত্রের লেখা বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসাগরেব ভাষা যথাসম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করা হয়েছিল।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র প্রকাশ ; 'সোমপ্রকাশে'র সমালোচনা বেরুলে বঙ্কিম বিরূপ হন, বিদ্যাসাগরের ওপর রাগ হয়তো এই কারণেই, কেননা 'সোম-প্রকাশে'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিলো ঘনিষ্ঠ।

ঃ ১ ফেব্রুয়ারি বহুবিবাহ রহিত করবার জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে আবেদন করেন। কৌলীন্যপ্রথা নিবারণের জন্যে কালীপ্রসন্ন ১ ফেব্রুরারি এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'পুরাণ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। 'পুরাণ সংগ্রহ' মহাভারত। বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্নের সমগ্র প্রচেষ্টায়ই সহযোগিতা ও উৎসাহবর্ধন করেছেন, মহাভারতের অনুবাদপ্রসঙ্গে কালী প্রসন্নের উক্তি স্মরণীয় বাস্তবিক বিদ্যাসাগরমহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশ অনুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দেশ করা যায় না।' কালীপ্রসন্নের কর্ম বিদ্যাসাগরেরই চেষ্টা।

১৮৬৭ঃ এই সালের শেষের দিকে বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে একটি চিঠি লেখেন ঋণশোধের জন্যেঃ 'এক্ষণে কিরূপে আমার মানরক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনা সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।' তিনি তখন অসুস্থ, ঋণশোধ না করে

শান্তি ও স্বাস্থ্যের জন্যে পশ্চিমে সম্ভবত কার্মাটাঁড়ে যেতে পারছেন না। বিদ্যাসাগরের এই চিঠি পেয়ে মধুসূদন ক্ষুণ্ণ : your letter which reached me a few minuets ago, has given me great pain. ১৮৬৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর মহাল বিক্রি করে বিদ্যাসাগরের সব ঋণ শোধ করে দেন।

: 'পদ্যমঞ্জরী' বেরোয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নরচিত, বিদ্যাসাগরের দ্বারা সংশোধিত উপদেশাত্মক কাহিনী।

: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববিদ্যা,' প্রথমখণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড ভোগকাণ্ড ১৮৬৭ সালে, তৃতীয় খণ্ড কর্মকাণ্ড ১৮৬৮, চতুর্থ খণ্ড সাধন প্রকরণ ১৮৬৯ সালে ১০ এপ্রিল প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববিদ্যা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন :

: 'আমরা বলি যে আত্মা আপনাকে এক বলিয়া জানিতেছে—সত্য, কিন্তু এরূপ কদাপি নহে যে, আত্মা আপনাকে উদাসীনভাবে জানিতেছে, প্রত্যুত ইহাই সত্য যে, আত্মা আপনাকে প্রীতি ও সদ্‌ভাবে জানিতেছে, আত্মা যে কেবল আপনাকে দর্শনমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত আছে,তাহা নহে,সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আপনাকে ভালোবাসিতেছে, আপনার যে কিছু সদ্‌গুণ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। আত্মা আপনাকে আপনি যে রূপ প্রীতি কটাক্ষে নিরীক্ষণ করে তাহা সহস্র সদুপদেশ অপেক্ষা গুরুতর।' তত্ত্ববিদ্যা, পৃষ্ঠা ১৬৯-৭০। এ যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজের দর্শন, তেমনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এই দর্শন গ্রহণকরেছিলো ; এই দর্শন জগৎ জীবন মানুষ ঈশ্বরকে নিয়ে সমগ্র দর্শন। কোঁতের ও বঙ্কিমের দর্শন থেকে আলাদা, এবং রামমোহনের চিন্তা থেকে আলাদা। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের '—জন্মাদস্য যতঃ' ব্যাখ্যায় রামমোহন শঙ্করাচার্যের অনুকরণে লিখেছেন : 'ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।' (১. ১. ২.) রামমোহনের ঐহিক উন্নতির চিন্তার সঙ্গে দর্শনের সামঞ্জস্য নেই, সেই সামঞ্জস্য ও সংগতি দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তায় সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনা ও চিন্তার দ্বারা অনুভাবিত। রামমোহনের শংকরাচার্যানুসৃত চিন্তা বিদ্যাসাগরকে কখনো স্পর্শ করেনি। তাই বেদান্ত ও সাংখ্যকে তিনি অনায়াসে মিথ্যা বলেছেন সংস্কৃতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও। এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের এই বোধের সত্যও বিদ্যাসাগবে কখনো আসে নি : 'ওঁ তৎসৎ, কিনা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা পরমেশ্বর সত্য এবং মঙ্গল একাধারে ; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্তা একাধারে তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে ; তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ একাধারে ; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে ; এক কথায় তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য—তিনি পরিপূর্ণ সত্য পরমাত্মা।' এই বোধ না থাকলেও বিদ্যাসাগর নাস্তিক নন। আবার দ্বিজেন্দ্রনাথের এই

আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক বোধেরও যোগ নেই।

১৮৬৭ঃ জ্বলাইএ জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ গোপালচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে।

ঃ ১১ এপ্রিল সুপারিশপত্রের জন্যে বিদ্যাসাগরকে মধুসূদনের চিঠি।

ঃ উত্তমণ শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা টাকা ফেরত পাবার জন্যে উত্যক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে চিঠি লিখতে বাধ্য হনঃ "কিন্তু উভয়স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলবাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই। এক্ষণে কিরূপে আমার মানরক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।' মধুসূদন এ চিঠি পেয়ে খুবই মর্মাহত হন। ১৮৬৮ ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদনের মহাল কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রি করে সমস্ত ঋণ তখনই পরিশোধ করেন।

ঃ ১৮৫৬-১৮৬৭ সাল পর্যন্ত এগারো বছরে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন ষাট জনকে; ব্যয় হয়েছিল আশি হাজার টাকা, এর জন্যে ঋণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু ঋণ শোধ করবার জন্যে জনসাধারণের সাহায্য চাননি বরং 'হিন্দু পেট্রিয়টে' সাহায্যের আবেদন তাঁর বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করেছিলেন।

ঃ এপ্রিলে নবগোপাল মিত্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় বেলগাছিয়া ভিলায় হিন্দুমেলার প্রবর্তন হয়, চোদ্দ বছর জীবিত ছিলো, স্বাদেশিকতার সূত্রপাত এখন থেকেই। ন্যাশানাল স্কুল, ন্যাশানাল জিমনেসিয়াম, ন্যাশানাল সোসাইটি ন্যাশানাল থিয়েটার এর থেকেই উৎপত্তি।

ঃ ১ সেপ্টেম্বর ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে'কে স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়সম্বন্ধে চিঠি লেখেনঃ

The only persons whose services may be available are unprotected and helpless widows, and apart from the consideration whe her morally they will be fit agents for educational purposes, I have no hesitation in saying that the very fact of their dispensing with the zenana seclusion and offering themselves as public teachers will lay them open to suspicion and distrust and thus neutralize the beneficial action aimed at.

ঃ ২২ মার্চ রাজনারায়ণের কন্যা হেমলতার বিবাহ হয় দীননাথ দত্তের সঙ্গে ব্রাহ্মমতে, সম্ভবত এর কয়েকমাস আগেই রাজনারায়ণকে কন্যার বিবাহবিষয়ে চিঠি লেখেনঃ 'প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্মধর্মে আপনকার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে-প্রণালীতে বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা

ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনকার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে কিনা, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না।' এখানে বিদ্যাসাগরের হিন্দু সংস্কার প্রবল : গ্রে-কে লেখার চিঠির মধ্যেও সমাজের প্রথা ও সংস্কারে বিশ্বাস তীব্র হয়ে উঠেছে, তারই চরম পরিণতি সহবাসসম্মতি আইনের বিলে মন্তব্যে।

**১৮৬৮ :** দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির অংশ অযৌক্তিকভাবে দাবি করেন। জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও উকিল দুর্গামোহন দাসের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটে যায়। ভ্রাতার এই নির্মম মনোভাব থাকা সত্ত্বেও গোপনে ভ্রাতৃবধুকে বিদ্যাসাগর অর্থ সাহায্য করতেন।

: আগস্ট মাসের মাঝামাঝি বীরসিংহ গ্রামে যান বাড়িতে।

: 'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

: এপ্রিল মাসে ২৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সেণ্ট পল্স ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ২২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের বাড়ি উঠে আসে, পরে ৩৩/১ আমহার্স্ট স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যাসাগর ১৮৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ২৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে আসেন। ১৮৮৬ জানুয়ারি মাসে 'দি ক্যালকাটা লাইব্রেরি' নাম দিয়ে বইয়ের দোকান খোলেন নিজের বই বিক্রির জন্যে।

: ২০ ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয়।

: ৩১ ডিসেম্বর রাজনারায়ণ বসু প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখাসাক্ষাৎ হয়।

: ২৪ আষাঢ় ( ১০-১১ জুলাই ) তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ও কেদারনাথ হালদারকে লেখা চিঠি দেন বিদ্যালয় গৃহনির্মাণের জন্যে পাঁচশত টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে।

: ইন্‌কাম ট্যাক্‌সের পীড়ন থেকে মানুষদের বাঁচাবার জন্যে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার ; তাঁর অনুরোধে বর্ধমানের তখনকার কমিশনার হ্যারিসন সাহেবকে তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন। অন্য কাজ বাদ দিয়ে এই কাজের জন্যে তাঁর দুমাস ব্যয় হয়। সম্ভবত এই বছরেই ১৯ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রকে এ বিষয়ে চিঠিতে জানান : 'তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। যাহারা দুইজনে আট টাকা দিয়া এক সার্টিফিকেট লইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যেন তাহারা কোনক্রমে একযোগে কর্ম করি বলিয়া দরখাস্ত না দেয়।'

: এই সময়েই শম্ভুচন্দ্রকে লিখছেন : 'তুমি এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলিবে ও সকল কর্ম করিবে।'

: হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন।

: বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দেয়।

১৯৬৮ : যে, বিদ্যাসাগর শুধু দয়া পরোপকার করেন নি, শিক্ষাব্রতী ছিলেন না, বিধবাবিবাহ দেন নি, বহুবিবাহ রহিত করতে চেষ্টা করেন নি; সেকালে ছেলেদের স্কুলে-স্কুলে মারামারি হলে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে পুলিশের হাত থেকে তাদের উদ্ধারও করতেন। সে যুগে স্কুলে-স্কুলে ছাত্রদেব মারামারির দৃশ্যটি এখানে ফুটে উঠেছে :

'বোধ হয় আপনি ভুলিয়া যান নাই যে, যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, তখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমার মত সুশীল বালককে ছাত্ররূপে পাইবার ভাগ্য বোধ হয় আপনার কখনও হয় নাই। হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় ইস্কুলে ইস্কুলে দাঙ্গা হইত। সে রকম মারামারি প্রায় প্রতি শনিবারে ও বড় বড় ছুটির পূর্বে হইত। জেনারল্ অ্যাসেম্বির ছেলেদের সঙ্গে হেয়ার, হিন্দুর ছেলেদের দাঙ্গাটাই বেশি হইত। আমি একটি দলপতি ছিলাম; খবর পাইলেই আমার কুস্তিগির পালোয়ান বন্ধুগণ আসিয়া পড়িত; অখিলচন্দ্র, বসন্ত বর্মণ, প্রসন্ন গাঙ্গুলী, ভূষণ ছুতোর, কড়ি ভট্টাচার্য, উমেশ দে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো, ভুবন মিত্র, বিনোদ হালদার—ইহাদিগকে re-inforce করিবার জন্য জাহাজ হইতে গোরা খালাসি ভাড়া করিয়া আনা হইত। তাহারা Fighting Charlies নামে পরিচিত ছিল; কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে boomerarg-এর মত অস্ত্র। হেয়ার স্কুলের সম্মুখের নর্দমার কাছে বেলা সাড়ে দশটার সময় দুইজন ইংরাজ প্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল। বেলা এগারোটার সময় ইন্‌স্পেক্টর কেরু সাহেব তিন-চারি শত কন্‌স্টেব্‌ল্ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবার ছেলেদের সঙ্গে পুলিশের ভীষণ মারামারি হইল। কতক্ষণ লড়াই হইল বলিতে পারি না; অবশেষে ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমি শ্যাম-বিশ্বাসের বাড়িতে পলাইয়া গেলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব জোর করিয়া স্কুলের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। হেডমাস্টার গিরীশচন্দ্র দে ও দ্বিতীয় শিক্ষক নীল-মণি চক্রবর্তী তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কোনও বাধা না মানিয়া পুলিশ ত্রিশ চল্লিশ জন বালককে ধরিয়া লইয়া গেল। হেডমাস্টার মহাশয় ছেলেদের জন্য জামিন হইতে গিয়া কলুটোলার থানায় আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। শ্যামবিশ্বাসের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড সভা হইল। বিদ্যাসাগরমহাশয়ও পাথুরিয়াঘাটার বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে সভার কিংকর্তব্য স্থির করিলেন। তাঁহারা জামিন হইয়া ছেলেদের মুক্তি দেওয়াইলেন। হেডমাস্টার মহাশয়ও খালাস পাইলেন। পরিণামে পুলিশেরই অপযশ হইল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে এই ঘটনা হইয়াছিল।' পুরাতন প্রসঙ্গ

১৮৬৯ : ১২ অগাস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের উদ্বোধন হলে সেদিন শিবনাথ কৃষ্ণবিহারী সেন আনন্দমোহন বসু রজনীনাথ রায় শ্রীনাথ দত্ত মিলে ২১ জন যুবক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। উপবীত ত্যাগ করেন, হরানন্দ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শেক্‌সপিয়ারের 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রকাশিত হয়।

: জানুয়ারি মাসে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ ত্যাগ।

: ৯ অগাস্ট বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত প্রেসের এক চতুর্থাংশ চার হাজার টাকায় বিক্রি করেন, কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চার হাজার টাকায় বেচে দেন।

: বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'বাল্মীকিরামায়ণম্' ও 'মেঘদূতম্' প্রকাশিত হয়।

: ১২ অগ্রহায়ণ ( ২৮-২৯ নবেম্বর ) মায়ের নিকট চিরবিদায় নিয়ে চিঠি লেখেন। এবং চিরবিদায় চেয়ে চিঠি লেখেন দীনময়ীকে, অন্যতম পরিচারক গদাধর পালকে। পিতাকে চিঠি লেখে বিদায় জানিয়ে ২৫ অগ্রহায়ণ ( ১১-১২ই ডিসেম্বর )। ঐ মাসেই দীনবন্ধু শম্ভুচন্দ্র ঈশানচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। পিতাকে লেখা এই চিঠির অংশে বিদ্যাসাগরের মর্মান্তিক জ্বালা প্রকাশিত : 'সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।'

: বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়।

: ৪ঠা নবেম্বর মুর্শিদাবাদের মহারানী স্বর্ণময়ীকে লেখা চিঠি : 'উপায়ন্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রানী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তিনি দয়া করিয়া আমাকে সাত হাজার পাঁচ শত টাকা ধার দেন। একখানি হ্যাণ্ড নোট লিখিয়া দিব এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব।' এ ছাড়া পাইকপাড়ার রাজপরিবারের কোনো স্ত্রীলোকের কাছ থেকেও পঁচিশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে উইল-সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্যদানের সময় বিদ্যাসাগর এ কথা স্বীকার করেন।

: মল্লিনাথের টীকাসহ কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রকাশ।

: দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জন্ম। বেথুন স্কুলের সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা।

: বর্ধমান ও হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবে লোকের মৃত্যু ; রোগনিবারণের জন্যে সরকারকে প্ররোচনা ; ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়ে সেবা ; ভয়াবহ মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের অপরিসীম বেদনা।

: ক্ষীরপাই গ্রামের মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বালিকাবিধবা মনোমোহিনীর বিবাহ নিয়ে ভাইদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় চিরকালের জন্যে বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করেন : কেননা তাঁর প্রতিশ্রুতিকে তাঁর ভাইয়েরা চূর্ণ করে দিয়েছে, হয়তো কোনো গুরুতর কারণে, নারীর সততার হেতু বিদ্যাসাগর এই বিবাহে রাজি হন নি।

: এই সময়ে পিতা ও মাতাকে লেখা চিঠিগুলি বিদ্যাসাগরের অভিশপ্ত জীবনের মর্মবেদনা প্রকাশ করেছে। মা-কে লিখছেন বিদ্যাসাগর : 'এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইযাছি তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের অপরাধ মার্জনা করিবেন।' স্ত্রীকে লিখছেন : 'তোমাব পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।' স্ত্রীর সঙ্গে কোনোদিনই ভালো সম্পর্ক ছিলো—এমন নজির নেই। পরে পুত্রের বিপথগামিতার জন্যে সম্পর্ক ক্ষীণতর হয়ে যায়। পিতাকে লেখা একটি বাক্য মর্মান্তিক : 'সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।' ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েন এই সময় বিদ্যাসাগর। চব্বিশ হাজার টাকার মতো ঋণ বিধবাবিবাহে।

: সরকারের সঙ্গে বিরোধে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নেন।

: ৪ঠা নবেম্বর কাশিমবাজার মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীর কাছে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার চান হ্যাণ্ড নোট লিখে দিয়ে। এবং তিন বছরে পরিশোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

: এতো ঋণ থাকা সত্ত্বেও প্রতি মাসে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের মারফত চারশ আশি টাকার নোট পাঠাচ্ছেন বাড়ির খরচ এবং স্কুল ডাক্তারখানা আত্মীয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দেবার জন্যে।

: অগাস্ট মাসে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারি কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে মুখের কথায় দান করে বসলেন।

: বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের বয়েস কমিয়ে এফিডেবিট করে ২১ করে দিলেন; বিদ্যাসাগরের কথায় রমানাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এ.ফডেবিটে সই করেছিলেন, তাতেই সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পান।

: বঙ্কিমচন্দ্র জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাশ করেন।

১৮৭০ : ২০ ফেব্রুয়ারি সুহৃদ্ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

: ১১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ খানাকুল কৃষ্ণনগরের

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। ভবসুন্দরীর মাতা সারদাদেবীর জন্যেই বিদ্যাসাগরের পরিবারে বিপর্যয় ও অরাজকতা এসেছিলো নারায়ণকে কেন্দ্র করে। বিদ্যাসাগর ভবসুন্দরীর সঙ্গে নারায়ণের বিয়ে দিতে চান নি, কিন্তু নারায়ণ ও ভবসুন্দরীর সম্পর্কের গাঢ়তার জন্যেই বাধ্য হয়ে এই বিয়েতে বিদ্যাসাগরকে রাজি হতে হয়েছিলো। এই বিয়েতে পরিবারের সকলের অসম্মতি ছিলো। ১৬ই অগাস্ট বা ৩১ শ্রাবণ তারিখে লেখা বিদ্যা-সাগরের চিঠিটি তাঁর জীবনের দলিলঃ 'এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোনো মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক।...নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।...সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব-মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমার পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না।..আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি।'

ঃ প্রাণপ্রতিম পুত্রের স্নেহ হারিয়ে এবং সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভগবতীদেবী ১১ই অগাস্ট কাশী যাত্রা করেন।

ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন এর অধীনে নানাবিধ বিভাগ খোলা হয় ২রা নবেম্বর, যেমন Temperance, Education, Cheap literature, Technical Education. ১৫ই নবেম্বর এক পয়সার মূল্যের 'সুলভ সমাচার' সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয় কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায়।

ঃ ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বহুবাজারে। ভারতীয় 'বিজ্ঞান সভা'র জন্যে হাজার টাকা দান।

ঃ বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'উত্তরচরিতম' প্রকাশিত হয়।

ঃ ৩১ শ্রাবণ (১৬-১৭ আগস্ট হবে) শম্ভুচন্দ্রকে বিধবা ভবসুন্দরীর সঙ্গে নারায়ণের বিবাহ হলে আত্মীয় স্বজনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি।

ঃ বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপচন্দ্রের মৃত্যু, বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ্। শেষের দিকে বিদ্যাসাগর বর্ধমানে ছিলেন।

ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিসংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে

Notices of Sanskrit Manuscripts বের করতে থাকেন। ১০ম খণ্ড ১ম ভাগ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৭১ : ১২ই এপ্রিল বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবীর মৃত্যু কাশীতে।

: 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়।

: বৈশাখ মাসের থেকে কলকাতার কাশীপুরের গঙ্গাতীরে হীরালাল শীলের বাড়িতে মাসে দেড়শ টাকা দিয়ে কয়েক বছর ছিলেন বিদ্যাসাগর।

: ২ ফাল্গুনে বিদ্যাসাগর পিতার অসুখে সেবার জন্যে কাশীতে যান, মাতঙ্গী ভট্টাচার্যের বাড়ি পাল্টে সোনারপুরস্থিত সোমদত্তের বাড়ি ভাড়া করেন।

: ১০ অগাস্ট বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রবন্ধ প্রকাশ হলে তারানাথ তর্কবাচস্পতি এর বিরুদ্ধতা করলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধতা করে বঙ্কিমচন্দ্রও প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্গদর্শনে'।

: ১লা সেপ্টেম্বর মধুসূদনের 'হেক্টরবধ' প্রকাশিত হয়, বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। ভূদেবের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'তুমি ম্রিয়মান মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এ বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।'

: বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature ক্যালকাটা রিভিয়ুপত্রে প্রকাশিত হয়, এতে বিদ্যাসাগরের রচনাসম্বন্ধে তীব্র কটূক্তি আছে।

: বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' প্রকাশিত হয়।

১৮৭২ : ১৫ই জুন বিদ্যাসাগর হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ড বা পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন করেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিচারপতি রমেশ-চন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে। এর ট্রাস্টি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রমেশচন্দ্র মিত্র ও জজ দ্বারকানাথ মিত্র। সম্পাদক নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৬ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি এই সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন পরিচালনা কার্যে অসদাচরণের জন্যে। জুলাই মাসে দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়, এফ-এ পড়াবার অনুমতি পায়।

: মার্চ মাসে 'বহুবিবাহ রচিত হওয়া উচিত কিনা' বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয় বৈশাখ মাসে, এপ্রিলে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এবং বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রহিতসম্বন্ধে পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করেন।

: ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার বাংলার প্রথম জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঃ বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। মধুসূদনের পরামর্শেই রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনেত্রী নেওয়া স্থির হয়। এপ্রিল বৈশাখ মাসে।

ঃ সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়ায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানুয়ারি মাসে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোর্টে ও হাওড়া কোর্টে ওকালতি করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরই তাঁকে সেনেটের সদস্য নির্বাচিত করেন।

ঃ এপ্রিলে শিবনাথ শাস্ত্রী 'মদনা গরল' এই নামে মাসিক পত্র বের করেন সুরাপান নিবারণের জন্যে। শিবনাথ এ বছর এম. এ পাশ করে কলেজ থেকে শাস্ত্রী উপাধি পান।

ঃ ১৯এ মার্চ কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ প্রমুখের চেষ্টায় তিন আইন বিধিবদ্ধ হয়। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্র বয়স্ক মেয়েদের ও অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী তৈরি করবার জন্যে ভারত সংস্কারক সভার অধীনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; সামান্য বেতনে শিবনাথ সেখানে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সপরিবারে বাস করতে থাকেন আশ্রমে।

ঃ ডিসেম্বরে বঙ্কিমচন্দ্রের The Confession of a Young Bengal প্রকাশিত হয়।

ঃ ১৩ই এপ্রিল নবীনচন্দ্র সেন বিদ্যাসাগরকে 'পলাশীর যুদ্ধ' উৎসর্গ করেন।

ঃ ২৮মে দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে 'দ্বাদশ কবিতা' উৎসর্গ করেন।

ঃ বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পত্র এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতায় ভবানীপুর থেকে। জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের 'কোমৎ দর্শন' প্রকাশিত হয়, কোঁতের দর্শনের প্রভাব দ্বারকানাথ মিত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি ব্যক্তির ওপর প্রভূত পরিমাণে পড়েছিলো। বঙ্কিম কোঁতের দর্শনের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে বলেছেন: 'যিনি কারণ জ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলেন, তিনি যে বিশ্বের আদিকারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিবেন, ইহা চিচিত্র নহে।' ২. মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম ভালোভাবে বুঝতে পারলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আর করবে না। ৩. তিনি নিজেকে নাস্তিক না বললেও ঈশ্বরের স্থান তাঁর দর্শনে নেই। ৪. মহর্ষি কপিল বলেন, ঈশ্বর আছেন বলেই কর্মফল হয় এ ঠিক নয়, ঈশ্বর থাকলেও হবে, না থাকলেও হবে। এখানেই সাংখ্যের সঙ্গে কোঁতের ঐক্য। ৫. 'ওগুস্ত কোমতের মতে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কর্তব্যানুষ্ঠানই পুরুষার্থ। 'কর্তব্যানুষ্ঠানেই মানবাধিকার'—ইহা তাঁহার প্রসিদ্ধ বচন। কর্তব্যসাধনে আমাদের সুখ হইতে পারে, কিন্তু সুখ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে।' ৬. 'কোমতের আর এক বচন' পরোপকারার্থে জীবনধারণ। সমস্ত মানবজাতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবায় ব্রতী হওয়া কর্তব্য। এই দেবের নাম 'পরম সৎ' (Grand etre) রাখিয়াছেন। তিনি বলেন,

কালে কালে সকলে অন্য দেবের উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের উপাসনা করিবে।' কোঁতের দর্শনে ঈশ্বর না থাকায় বঙ্কিম একে সর্বাঙ্গসুন্দর বলেন নি। কৃষ্ণকমল বঙ্কিমের কোঁতের সম্বন্ধে জ্ঞানবিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন: 'অবশ্যই বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা মনে হয় না।' তৎসত্ত্বেও কোঁতের 'কর্তব্যানুষ্ঠানই মানবাধিকার' 'পরোপকারার্থে জীবনধারণ' ও 'সমস্ত মানবজাতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হওয়া কর্তব্য'—এই তিনটি সত্যই বিদ্যাসাগরের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। হয়তো কোঁতের পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপর পড়েছিলো, তাই বলে তিনি নাস্তিক নন কখনো।

১৮৭৩: ১৬ই আগস্ট মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হয় বেঙ্গল থিয়েটারে। অনেকে মনে করেন বেঙ্গল থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কর্মিটিতে বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন ছিলেন। বারাঙ্গনাদের দিয়ে নারীভূমিকা করায় বিদ্যাসাগর বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ২৬ জুন মধুসূদনের স্ত্রী আরিয়েতের মৃত্যু বেনিয়াপুকুরে। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংবাদ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ হাসপাতালে দিতে এলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে যাঁদের নাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ ছিলো: 'কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই? কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?' বিদ্যাসাগরকে সংবাদ পাঠানো হয়নি, কিন্তু মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ভুলতে পারেন নি মৃত্যুর তিন দিন আগেও; এবং বিদ্যাসাগরও মধুসূদনকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতেন তাঁর আন্তরিকতা ও কবিপ্রতিভার জন্যে। ২৯ জুন রবিবার বেলা দুটোর সময় মারা যান মধুসূদন।

: জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যু ৪ঠা ফেব্রুয়ারি।

: 'বামনাখ্যানম্,' মধুসূদন তর্কপঞ্চাননের ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোকসহ বঙ্গানুবাদ।

: 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

: বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (জুন) ও 'ইন্দিরা' (অগাস্টে) প্রকাশিত হয়।

: বঙ্কিম দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন; সম্ভবত ইংরেজকে তুষ্ট করবার জন্যে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই কারণে তাঁকে দেশের বিশ্বাসঘাতক বলেছে।

: বঙ্কিমচন্দ্রের The Study of Hindu Philosophy প্রকাশিত হয় মে মাসে, বিদ্যাসাগরের মনোভাবের সঙ্গে পার্থক্য উল্লেখ্য।

: স্ত্রী শিক্ষা স্ত্রী স্বাধীনতা ও অন্তরাদেশ প্রভৃতি নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথের মতবিরোধ ঘটলে শিবনাথ চাংড়িপোতায় গিয়ে অসুস্থ মাতুল দ্বারকা

নাথ বিদ্যাভূষণের কাছ থেকে 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, এবং দ্বারকাভূষণের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক হন। গ্রামের নানাবিধ সমাজসংস্কারে কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন কিন্তু ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, কলকাতায় আবার আসেন।

১৮৭৪ঃ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ এবং গৃহ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেন।

ঃ যোগেশচন্দ্র বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ঃ মেট্রোপলিটানের শ্যামপুকুরের শাখা খোলা হয়।

ঃ ১৮ই এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটারে 'মায়াকানন' প্রথম অভিনীত হয়; এঁরাই এই নাটকটি মার্চ মাসে প্রকাশ করেন; এর মধ্যে মধুসূদনকে উপযুক্ত মূল্য দিয়েছিলেন অসুস্থ থাকবার সময়। শিবনাথ শাস্ত্রী ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন 'সমদর্শী' নামে দ্বিভাষিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন; কেশবচন্দ্র সেনের মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন, সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগালাঙ্গুরীয়' (জুন) 'লোকরহস্য' (নবেম্বরে) প্রকাশিত হয়।

ঃ ২৮ জানুয়ারি কাশীর কবি হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে জাদুঘর দেখতে গেলে ধুতি চাদর ও চটিজুতোর জন্যে বিদ্যাসাগরকে দারোয়ান এশিয়াটিক সোসাইটিতে ঢুকতে দেয় নি। এর প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর ৫ ফেব্রুয়ারি জাদুঘরের অনারারি সেক্রেটারি ব্লানফোর্ডকে চিঠি লেখেন।

ঃ সংস্কৃত কলেজে ব্যয়সংক্ষেপের জন্যে ছোট-লাট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করেন, সাহিত্যের ইংরেজির দুটি অধ্যাপকের পদ ও অন্যান্য পদও তুলে দিয়ে সাড়ে ছ'শ টাকা বাঁচাতে চান। অলংকারের অধ্যাপকের দ্বারাই স্মৃতির অধ্যাপনা চলবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এর বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ছোটলাট প্রাইভেট সেক্রেটারি লটসন জনসনকে চিঠি লেখেন।

ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু ক্যান্সারে। ১৮৭৪ সালের শেষের দিকে ডিসেম্বরে ও ১৮৭৫-এ বিদ্যাসাগর আমাশয় ও শীরঃপীড়ায় কষ্ট পেয়েছেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্যে কানপুরে গঙ্গাতীরে কিছুদিন বাস করেন; সেখান থেকে সুস্থ হয়ে লখ্নৌ রাজকুমার অধিকারীর বাড়িতে কিছুদিন অতিবাহিত করেন, সেখান থেকে যান প্রয়াগ, প্রয়াগ থেকে কাশীতে যান চৈত্র মাসে, সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র। সম্ভবত ১৮৭৫-এর এপ্রিলে কাশীতে পিতার কাছে আসেন।

১৮৭৫ঃ সম্ভবত জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর

বাড়িতে 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ নিয়ে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের হেডপণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রথম দেখা করেন। সেখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে, বঙ্কিমের বন্ধু ও 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক, দেখতে পান। 'জীবনস্মৃতি'তে এর সুন্দর বর্ণনা আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, এ সম্বন্ধে শিবনাথের উক্তি স্মরণীয় ঃ 'রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।'

ঃ বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধুর 'অক্ষরপরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্য' ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত হয়, ১লা জুন প্রকাশিত হয় 'চন্দ্রশেখর,' কমলাকান্তের দপ্তর'ও এ বছরই বেরয়।

ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর প্যারীচরণ সরকারের মৃত্যু ; বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারান। ২৭ নবেম্বর ডঃ ভুবনমোহন সরকারকে লেখা চিঠিতে প্যারীচরণের প্রতি তাঁর বন্ধু প্রীতির নিদর্শন সুস্পষ্ট।

ঃ ১৫ই মার্চ বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা। ৩১ মে বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে স্বাক্ষর করেন এবং পুত্রকে সম্পত্তি থেকে ও মাসিক বৃত্তি থেকেও বঞ্চিত করেন। পুত্রসম্বন্ধে লেখেন ঃ 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর-নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশতঃ বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ বা ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।'

ঃ ১৩ই জুলাই তৃতীয় কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ হয় সূর্যকুমার অধিকারীর সঙ্গে।

ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপন।

ঃ ১ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকত কুঞ্জে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রবৃন্দের বাৎসরিক মিলন-উৎসব অনুষ্ঠিত হতো, উদ্যোক্তা জগদীশনাথ রায় ও রাজনারায়ণ বসু। ১৮৭৬ সালে এমারেল্ড বাওয়ারে দ্বিতীয় কলেজ পুন-র্মিলনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা ঃ 'সেই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাহাদের সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে

পারিব—সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন।' পৃষ্ঠা ১৩৭

১৮৭৬ঃ ১২ এপ্রিল কাশীতে পিতা ঠাকুরদাসের মৃত্যু ; বন্ধুপুত্র ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুশো টাকা বেতনে মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিয়োগ ; ফেব্রুয়ারি মাসে তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন ও কলেজের সম্পাদক ও অধ্যক্ষপদে নিয়োগ। ১৫ই জানুয়ারি মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব্‌ সায়ান্স সভার ছজন ট্রাস্টির মধ্যে একজন ট্রাস্টি নির্বাচিত হন বিদ্যাসাগর।

ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। জানুয়ারি মাস নাগাদ শিবনাথ শাস্ত্রী হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ও ট্রানশ্লেশন মাস্টার নিযুক্ত হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু মিলে শিবনাথ ২৬ জুলাই অ্যালবার্ট হলে সভা করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেনঃ বিদ্যাসাগরকে সভাপতি হতে বলেন ; অসুস্থতার জন্যে তিনি রাজি হন না।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচন' ১৬ জুলাই প্রকাশিত হয়।

ঃ কলকাতায় বাদুড়বাগানে নিজের বাড়ি তৈরি।

ঃ ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারি ঢাকার কালীনারায়ণ রায়কে বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ বিষয়ে চিঠি দেন।

ঃ ১০ই বৈশাখ ( ২৩ এপ্রিল ) গিরিশ বিদ্যারত্নকে লেখা চিঠি, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ্যা তথ্য নিরসনের জন্যে গিরিশ বিদ্যারত্নের সাহায্য চান। এপ্রিলে বাদুড়বাগানের বাড়িতে মহেন্দ্রলাল গুপ্তের সঙ্গে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের কাছে আসেন ও আলাপ-আলোচনা করেন।

ঃ চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের উইলের মামলায় বিদ্যাসাগর বর্ধমান আদালতে এজাহার দেন।

ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ভাগলপুরে মামার বাড়ি।

ঃ ময়মনসিংহ থেকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৭৭ঃ ১লা জানুয়ারি বাংলার ছোটলাট টেম্পল ভিক্টোরিয়ার নামে বিধবাবিবাহ প্রবর্তক ও সমাজের অগ্রগামী দলের পরিচালক হিশেবে প্রশংসাপত্র দেন বিদ্যাসাগরকে।

ঃ জানুয়ারি মাসে নিজের তৈরি গৃহে বাদুড়বাগানে প্রবেশ।

ঃ মে মাসে কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর বিবাহ কার্তিকচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিদ্যাসাগর এই সময় শিরোরোগে ও অনিদ্রায় পীড়িত ছিলেন।

ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী 'ইনার সার্কল' (ঘন নিবিষ্ট দল) গঠন করেন, দলে ছিলেন

সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দচন্দ্র মিত্র ও আরো অনেকে। এই দলের প্রতিজ্ঞাপত্র শিবনাথের রচনাঃ অপৌত্তলিকতা, বাক্যে কর্মে জাতিভেদ-প্রথা অস্বীকার, সমাজে ও পরিবারে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার, পুরুষ-দের একুশ বছর ও মেয়েদের যোল বছরের আগে বিবাহ নিষেধ, স্ত্রীলোক ও জনসাধারণের মধ্যে যথাসাধ্য শিক্ষাবিস্তার, দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও শৌর্যের জন্যে ব্যায়ামচর্চা ও বন্দুক চালাবার প্রেরণা, স্বায়ত্তশাসনই বিধিনির্দিষ্ট একমাত্র শাসনব্যবস্থা বলে স্বীকার ও সরকারের অধীনে দাসত্ব স্বীকার না করবার সংকল্প।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী,' 'রজনী' (জুন) ও 'উপকথা' ২৪ নবেম্বরে প্রকাশিত হয়।

ঃ (১৬ই জানুয়ারি, ১লা ফেব্রুয়ারি) ৩০ মাঘ বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দেন ব্রজনাথের মাতৃ-বিয়োগ হলে।

ঃ বিপ্লবী কার্বোনারির আদর্শে হামচুপামুহাফ নামে কলকাতায় প্রথম গুপ্ত সভার প্রতিষ্ঠাঃ এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেনঃ 'জ্যোতি-দাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়েরাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম।' বীরসিংহে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটলে ওষুধপত্র পথ্য দিয়ে রোগীদের সাহায্য করেন, ৭৭-৮০ সাল পর্যন্ত এ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিলো।

১৮৭৮ঃ জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'সমালোচক' প্রকাশিত হয়।

১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হেয়ার স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে তেরো মাসের জন্যে লখ্‌নৌতে ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত পড়াতে যান; সেই সঙ্গে বায়ুপরিবর্তন ও স্বাস্থ্য উদ্ধার ছিলো মূল লক্ষ্য; লখ্‌নৌ যাবার পথে কার্মাটাঁড়ে একরাত্রি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অতিবাহিত করেন ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাঁওতালদের জীবনের সংযোগের ছবি তুলে ধরেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' বইয়ের

ভূমিকায়, এই তথ্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তার আগে বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেন ১৮৬৬ সালে। হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমারও বিদ্যাসাগরের ছাত্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত। বিদ্যাসাগরের সুপারিশেই মুর্শিদাবাদের কান্দি-স্কুলে হেডপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে ও বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্যে এলেও হরপ্রসাদ এই দুজনের ভাষারীতির দ্বারা প্রভাবিত হন নি; নিজের ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজির প্রভাব নেই, খাঁটি বাংলা রীতিকে অনুসরণ করে স্বকীয় বাংলা গদ্য হরপ্রসাদ সৃষ্টি করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ 'তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।' কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিচয় দিয়েছেন হরপ্রসাদ ঃ

'আমরা কার্মাটাঁড়ে পোঁছিয়া আমাদের মালপত্র স্টেশন-মাস্টারের জিম্বা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বংলায় গেলাম। তিনটার পর গাড়ি পোঁছিয়াছিল; সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লখ্নৌ-এ সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম. এ ক্লাসেও পড়াইতে হইবে-বিশেষ 'হর্ষচরিত'খানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকিটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্বাধিকারীমহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাইত—রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে যে, কাঁচা-পাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে—যাহা হউক তিনি আমাকে 'হর্ষচরিত' ও অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। (পরদিন) আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম।'

ঃ সাধারণ ব্রাহ্মদের 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রের প্রকাশ।

ঃ কেশবচন্দ্র তিন আইন পরিত্যাগ করে হিন্দু মতে নাবালিকা কন্যার বিয়ে দিলেন কোচবিহারের রাজা সপ্তদশবর্ষীয় নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ৬ মার্চ। ফলে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথের দলের বিরোধ বাধে। ১৫ই মে টাউন হলে সভা ডেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন শিবনাথ। ১৮৭৯ সালে মাঘোৎসবে কর্ন-ওয়ালিশ স্ট্রিটের জমিতে ভিতস্থাপন হয়। ১৮৮১, ১০ই মাঘ এই নতুন ব্রাহ্ম-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্মাণের জন্যে দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর বিনা শর্তে সাত হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে শিবনাথ গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা করেন কেশবচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে শিবনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্যঃ 'সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজের সংস্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।' বিদ্যাসাগরের আদর্শে প্রণোদিত শিবনাথ সমাজসংস্কারে ধর্মনীতিতে ও রাজনীতিতে অনেক প্রাগ্রসর।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' বেরয় ১৮ই অগাস্ট, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ২৯ আগস্ট।

ঃ রাজেন্দ্রলালের নির্দেশ হরপ্রসাদ 'গোপালতনয়ী উপনিষদে'র ইংরেজি অনুবাদকরেন।

১৮৭৯ ঃ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত। বি. এ. ক্লাশ পর্যন্ত পড়াবার অনুমতি পায়।

ঃ জানুয়ারি মাসে শিবনাথ শাস্ত্রী সিটি স্কুল স্থাপন করেন আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। শিবনাথ ছিলেন সেক্রেটারি। ২৭ এপ্রিল 'ছাত্রসমাজ' নামে একটি সমিতি গঠন করেন ধর্মশিক্ষার জন্যে। ১৮৮৪ সালে বালিকাদের জন্যে "নীতিবিদ্যালয়' স্থাপন করেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের আদর্শই অনুসৃত, তবে বিদ্যাসাগরের মধ্যে শিবনাথের মতো ধর্মের সংস্রব ছিলো না।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' ৬ই ফেব্রুয়ারি বেরয়, এপ্রিলে বেরয় 'প্রবন্ধ' পুস্তক।

১৮৮০ ঃ ১লা জানুয়ারি ভারত সরকার বিদ্যাসাগরকে সি. আই. ই উপাধি দেন। বিদ্যাসাগর এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। সম্ভবত রামকমল বা গুজেও পীড়িত ছিলো। ১৫ই মাঘ, (৩০ জানুয়ারি) প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লেখা চিঠি। বিদ্যাসাগরের পরিচারকদের আচরণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের দেখা না হওয়ায় তিনি বাড়ি গিয়ে চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে ভর্ৎসনা করেন। ভর্ৎসনার উত্তরেমর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগরঃ 'ফল কথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়, সামান্য অপরাধ ধরিয়া বা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেকদিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে; এ জন্য তোমার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলাম না।'

১৮৮১ ঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ২৬ ফেব্রুয়ারি 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা' উপলক্ষে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীমোহন মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শীতলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি এল গুপ্ত, টি এন পালিত, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কানাইলাল দে, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণবিহারী সেন, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদ্বজ্জনদের মধ্যে নেই। কিন্তু কেন? রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগরকৃত্য কি আনুষ্ঠানিক!

ঃ নবেম্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

ঃ ডিসেম্বরে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ ঃ বিদ্যাসাগর অসুস্থ, কাজ করতে পারেন না।

ঃ ২২ পৌষ (৭-৮ জানুয়ারি) দুর্গামোহন দাসকে লেখা চিঠিতে দুর্গামোহনের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ; ব্রহ্মময়ীসম্বন্ধে শিবনাথের 'আত্মচরিতে' বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত।

ঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে তাঁর লেখা 'ঋজুপাঠে'র তৃতীয় ভাগ উঠে গেলে বিব্রত হন আর্থিক ব্যাপারে, কেননা ষোল বছর এই বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ঃ বড়লাট রিপন লোকাল সেলফ গভর্নমেণ্ট বিলের প্রস্তাব করেন। কলকাতায় কর্পোরেশন ও গ্রামে 'জেলা বোর্ড' ও লোকাল বোর্ড স্থাপিত হয়।

ঃ বিনা আইনে সরকারবিরোধী প্রবন্ধ লেখার জন্যে মে মাসে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। 'স্টেটস্-ম্যান এর বিরুদ্ধে লেখে ৮ই মে।

১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Liturature of Nepal প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ এই গ্রন্থ রচনায় রাজেন্দ্রলালকে সাহায্য করেছিলেন; সেই সাহায্যের কথা রাজন্দ্রনাল স্বীকার করে লিখেছেন ঃ

It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, afriend of mine, Babu Haraprasad Sastri; M. A; offered me his cooperation and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my entire satisfaction.

রাজেন্দ্রলালই হরপ্রসাদকে পুঁথির তালিকা করতে শিখিয়েছিলেন, যার ফলে এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ পুঁথিসংগ্রহ সম্পাদনা ও প্রকাশনায় পরে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

১৮৮৩ ঃ ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলনের শুরু।

ঃ ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঃ ২৯ আশ্বিন (১৬-১৭ অক্টোবর) অভিজাত পরিবারে ব্রাহ্মণদের বৃত্তিদান

বিষয়ে রামেশ্বর মালিয়াকে চিঠি দেন।

ঃ ৮ই ফাল্গুন (২১-২২ ফেব্রুয়ারি) মহারানী স্বর্ণময়ীকে লেখা চিঠি। এই তারিখের কিছুদিন আগেই হয়তো মহারানীকে একটি চিঠিসহ সাড়ে সাত হাজার টাকার ঋণ শোধ করেন ঃ 'দীর্ঘকাল এই ঋণের পরিশোধের সুবিধা না হওয়াতে আমি অতিশয় কুণ্ঠিত ছিলাম, এক্ষণে আমার সুবিধা হইয়াছে, এজন্য এই পত্রের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশত টাকার নোট পাঠাইতেছি, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া আমায় ঋণে মুক্ত হইতে আজ্ঞা হয়। ৮ই ফাল্গুনের চিঠিতে মহারানীকে বলছেন ঃ 'দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি সর্ববাদিসম্মত প্রশংসনীয় গুণ। এই দুই গুণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু শ্রীমতীর কার্য-পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের সবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতেছে।' এই 'দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি' বিদ্যাসাগরের স্বভাবজাত।

ঃ ২ আষাঢ় ( ১৭ই জুন ) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।

ঃ বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত 'হর্ষচরিত' প্রকাশিত হয়।

১৮৮৪ ঃ নবেম্বর মাসে অসুস্থ হয়ে কানপুরে বিশ্রাম নিতে যান।

ঃ এপ্রিলে ভারতে প্রথম নারী সম্পাদিকা রূপে স্বর্ণকুমারীদেবী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

ঃ 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার প্রকাশ ; বঙ্কিমের ধর্মক্ষেত্রে প্রবেশ।

ঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য টেগোর ল' লেক্‌চারার পদে নিযুক্ত হয়ে একান্নবর্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে পারিশ্রমিক স্বরূপ দশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ২৮এ ফেব্রুয়ারি বেরয় ; ২০মে 'দেবী চৌধুরাণী'। ২৪ শ্রাবণ ( ৯-১০ আগস্ট ) চন্দ্রমুখী বসুকে চিঠি দেন, পুস্তকপ্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে। ১০ই অগ্রহায়ণ ( ২৬-২৭ নবেম্বর হবে ) চন্দ্রমুখী বসুকে চিঠি লেখেন আনন্দ প্রকাশ করে ; চন্দ্রমুখী এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শেক্‌সপিয়ারের গ্রন্থাবলি পাঠিয়ে দেন এই চিঠির সঙ্গে।

ঃ পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা চিঠি।

ঃ ১২ আশ্বিন ( ২৯ সেপ্টেম্বর ) কৃষ্ণনগরের উকিল যদুনাথ রায়কে চিঠি লেখেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে ; এই চিঠির কিছু অংশে তাঁর নিজের জীবনের প্রতিফলন ঃ 'সংসার অতি বিচিত্র স্থান। সংসারে আসিয়া কেহ কখনও সর্বাংশে সুখী হইতে পারিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে।···ফল কথা এই ; পিতা ও মাতা হওয়া অপেক্ষা অধিকতর মহাপাতকের ভোগ আর নাই। পিতামাতাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী করেন, এরূপ পুত্র অতি বিরল, কিন্তু অসদাচরণ ও অকাল মরণ প্রভৃতি দ্বারা পিতামাতাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন, এরূপ পুত্রের সংখ্যাই অধিক।'

ঃ ৭ কার্ত্তিক ( ২৪ অক্টোবর) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে মাছ পেয়ে

খুশি হয়ে চিঠি লিখছেন। ২০ বৈশাখ ( সম্ভবত ২০মে ) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তাঁদের জমিদারির মুসলমান প্রজা বাহাদুর সেখ সম্বন্ধে যে অনুরাগ ও সহানুভূতির কথা বিদ্যাসাগর লিখেছেন, তাঁতে তার জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবপ্রেমই প্রকাশিত হয়েছে ঃ 'পত্রবাহক বাহাদুর সেখ আমার নিতান্ত অনুগত—এ তোমাদের জমিদারির প্রজা—ইহাকে যে জন্য তোমার নিকট পাঠাইতেছি ইহার বাচনিক সবিশেষ অবগত হইবে এবং যাহাতে ইহার প্রার্থনা সফল হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান ও মনোযোগী হইলে আমি পরম আহ্লাদিত অতিশয় উপকৃত হইব এ বিষয়ে আমার সহস্র অনুরোধ জানিবে।... এ ব্যক্তি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আমি অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইব জানিবে কিমধিকমিতি।'

ঃ ৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু।

১৮৮৫ ঃ তাঁর মেট্রোপলিটন কলেজ বি. এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

ঃ মেট্রোপলিটন স্কুলের বড়োবাজার শাখা খোলা হয়।

ঃ ৩০ জুন যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনকে লেখা চিঠি ঃ 'আপনাদের বিষয়সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আমার ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।'

ঃ ৩০ বৈশাখ ( ১৩-১৪মে ) পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে চিঠি দেন, দেড়শ টাকা পাঠান। জ্যৈষ্ঠ মাসে, ( মে ) কার্মাটাঁড়ে দিন পাঁচ-সাতেক থাকেন।

ঃ ৩রা চৈত্র (১৭-১৮ মার্চ) পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে একশ পঞ্চাশ টাকা প্রেরণ বিষয়ে চিঠি। ২৬ চৈত্র ( ৯-১০ এপ্রিল ) ভবসুন্দরীকে লেখা চিঠিতে পৌত্র-পৌত্রীদের প্রতি স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে ঃ 'মৃণা, কুন্দ, প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। তাহাদিগকে মনে করিলে চক্ষে চল আইসে।' ৩১ চৈত্র ( এপ্রিল ১৩-১৪ ) পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা চিঠিতে বলেন ঃ 'একখানা বাংলা ম্যাপের জন্য লিখিয়াছ, দুই তিনদিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব। মনোযোগপূর্বক পড়িলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইব।' পড়াশোনার কথা এখানেও ; মানচিত্রের বদলে ইংরেজি 'ম্যাপ' শব্দ কথ্য ভাষার জন্যই ব্যবহার করেছেন বিদ্যাসাগর। ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪ নবেম্বর উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়সম্বন্ধে সুপারিশের চিঠি। ১৬ অগ্রহায়ণ তামাক পেয়ে চিঠি ; তাঁর অসুস্থতায় দুঃখিত। মে মাসে মীর মশারফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' প্রকাশিত হয়। লোকে মুসলমানদের মধ্যে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' বলতো।

ঃ ১৮৮৫, ৪ ফেব্রুয়ারি হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের আনুকূল্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য হন, এবং ফিলোলোজিক্যাল কমিটির সভ্যও হন। এই সালেই রমেশচন্দ্র দত্তকে ঋগ্বেদ অনুবাদে সাহায্য করেন ; এই ঋণের কথা

রমেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন তাঁর ভূমিকায় : 'এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।…তিনি এই বৃহৎ কার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এই গুরু কার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।'

: ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজের উদ্যমে, ডঃ পট্টভি-সীতারামাইয়া বলেন : The Indian National Congress, as it was originally started and as it has since been carried on, is in reality the work of the Marquis of Dufferin and Ava when that nobleman was the Governor General in India. Mr A. O. Hume, C. B., had in 1884, conceived the idea…He did not desire that politics should form a part of their discussion…he Lord Dufferin said there was no body of persons in this country who performed the functions which Her Majesty's opposition did in England. Lord Dufferin had made it a condition with Mr Hume that his name in connection with the scheme of the Congress should not be divulged so long as he remained in the country, and his condition was faithfully maintained. (Introduction to Indian Politics)

: ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হিউমের আহ্বানে।

১৮৮৬ : ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বিদ্যাসাগর তাঁর লেখা সমস্ত বই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি থেকে তুলে এনে ২৫ নম্বর বর্তমানে ৫২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে 'দি ক্যালকাটা লাইব্রেরি' নাম দিয়ে তাঁর নিজের বই বিক্রির জন্যে একটি বইয়ের দোকান খোলেন।

: বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্র উপন্যাস, 'রাধারাণী' ২৫ জুন 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগ ১২ই অগাস্ট প্রকাশিত হয়।

: ১লা চৈত্র ( ১৫-১৬ মার্চ ১৮৮৬ ) পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা চিঠি। তাদের জন্যে টাকা পাঠাচ্ছেন, পৌত্রপৌত্রীর জন্যে মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন নির্বাসিত থেকে : 'মৃণা, কুন্দ প্যারী ও নুদিকে আশীর্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলিবে তাহাদের জন্য আমার বড় মন কেমন করে।' বঙ্কিম কি এত সহজ সরল গদ্য লিখেছেন? এই জাতীর বিদ্যাসাগরের গদ্য কি তাঁর কখনো চোখে পড়েছে? দেবেন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে এই গদ্যের তুলনা চলতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের তাপে এই ভাষা গলে নতুন রূপ পেয়েছে। ২৭ পৌষ ( ১২-১৩ জানুয়ারি ) পৌত্র প্যারীমোহনকে চিঠি দেন : 'তুমি পত্র লিখিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তুমি মন

দিয়া লেখা পড়া করিবে তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব। তুমি প্রতিমাসে দুইবার আমাকে পত্র লিখিবে।' লেখাপড়ার কথাটাই চিঠিতে মুখ্য।

: ১৬ অগাস্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মারা যান।

: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু ২৩-এ অগাস্ট।

১৮৮৭ : মেট্রোপলিটন স্কুল বহুবাজারে শাখা বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

: মেট্রোপলিটান কলেজ নতুন বাড়িতে উঠে আসে, গৃহনির্মাণ শুরু হয় ১৮৮৫তে, শেষ হয় ১৮৮৬-এ ; খরচ পড়ে দেড় লক্ষ টাকা।

: বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' ৪ঠা মার্চ, 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথমভাগ ৭ই জুলাই বেরয়।

১৮৮৮ : মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ ও তাঁর জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীর সঙ্গে কলেজের হিশেবপত্র নিয়েমতান্তর ও মনান্তর ঘটে ; সূর্যকুমার অধিকারী হয়তো অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু সেক্রেটারির কার্যভার কেড়ে নেন বিদ্যাসাগর, ফলে অপমানিত ও লজ্জিত হয়ে বিদ্যাসাগরের কলেজ ছেড়ে দেন, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে মুর্শিদাবাদে যান সূর্যকুমার।

: ১৩ অগাস্ট বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ীর মৃত্যু হয় রক্তামাশয়। মৃত্যু পথযাত্রিণী কপাল চাপড়ে স্বামীকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, বলতে পারেন নি। নারায়ণচন্দ্র মাতার মুখাগ্নি করেন, শ্রাদ্ধাদি হয় বীরসিংহগ্রামে। বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত থাকেন নি। মায়ের মৃত্যুর পর নারায়ণ ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে বিদ্যাসাগবকে চিঠি দিয়েছিলেন ; বিদ্যাসাগর তার কোনো উত্তর দেন নি।

: 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' : 'মদনমোহন তর্কালংকারের জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্.এ. তর্কালংকার প্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে আমার উপর পরস্বাপহারী বলিয়া যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিপ্রায়ে তদ্বিষযে স্বীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ···করিয়া কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া···প্রচারিত করিতে হইল।'

: বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ অনুশীলন ১৭ই মে প্রকাশিত হয়।

: ১লা ডিসেম্বর, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন সাধারণের কাছে। বিদ্যাসাগর যেতে পারেন নি অসুস্থতার জন্যে।

: ১৫ই এপ্রিল শিবনাথ শাস্ত্রী বিলাত যাত্রা করেন পশ্চিমের উদ্যোগশীলতা, কার্যতৎপরতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভারতে সঞ্চারিত করবার জন্যে।

১৮৮৯ : সংস্কৃত রচনা, বিদ্যাসাগবের লেখা বাল্যকালের কতগুলি সংস্কৃত রচনার সংগ্রহ। Introduc.ion to Sanskrit Grammar in Bengal, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্যে রচিত। অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-

পাধ্যায়। সারা ভারতবর্ষে সহজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে এই ব্যাকরণের ইংরেজি অনুবাদের প্রসার।

১৮৯০ঃ শরীর অসুস্থ, বাদুড়বাগান থেকে পাল্‌কি করে কলেজে এসে সেক্রেটারির কাজ দেখতেন। কলেজের দায়িত্বভার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দিতে চেয়েছিলেন, যেমন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তাঁরা নেননি।

ঃ ১৮৯০, ৮ই জুলাই স্টেটসম্যানে প্রকাশিত সংবাদপত্র থেকে জানা যায় মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে বি. এ. ক্লাশের ছাত্রদের জন্যে সায়ান্সের ক্লাস খোলা হয়েছে। Metropolitan Institution : we learn that arrangements are being made at the Metropolitan Institution to open a Science class for the B. A. candidates. Paundit Iswarchandra Vidyasagar evidently misses no opportunity of improving the institution. It is to be feared that the prohibitive fees of the Presidency College act as a deterrent upon a willing student from taking up the Science course.

ঃ ১১ শ্রাবণ (২৭-২৮ জুলাই) শম্ভুচন্দ্রকে চিঠিতে বলেছেন, স্কুলের জন্যে বেঞ্চ তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে এবং 'যদি বিষ্ণুপুরিয়া ভাল তামাক ওখানে উপস্থিত থাকে এক টাকার কিনিয়া আনিবে।' এই তামাক খাওয়াটাই তাঁর একমাত্র নেশা, নস্য কম নিতেন। ২২ শ্রাবণ (৭ই অগাস্ট) স্কুলের কমিটি গঠন করেন এঁদের নিয়ে; শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রেসিডেণ্ট। রামচরণ লাহা গোবিন্দচন্দ্র পাল, রামচরণ ঘোষ সদস্য। চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় সদস্য ও সেক্রেটারি।

ঃ ২ শ্রাবণ (১৮ জুলাই) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, তাঁর চিররোগী হওয়ার জন্যে উদ্বিগ্ন। নিজের সম্বন্ধে লিখছেনঃ 'প্রায় একপক্ষ হইল আমি অতিশয় অসুস্থ ও দুর্বল হইয়াছি।'

ঃ গড়পাড়ের বাড়ি বিক্রি করে দেন।

ঃ 'শ্লোকমঞ্জরী' ঃ কতগুলি উদ্‌ভট শ্লোকের সংগ্রহ।

ঃ এপ্রিলে বীরসিংহগ্রামে বিদ্যাসাগরের ভগবতীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৯১ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি, সহবাসসম্মতি বিল (Age of Consent Bill) বিদ্যাসাগর মেয়েদের বিবাহের বয়সসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন, তখন তিনি বাদুড়বাগানে। এই মতামতে শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য বিশেষভাবে ধরা পড়েছেঃ Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonaele protection to child wives but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, is a spiritual character and is

liable to be disregarded. এই শাস্ত্রের আনুগত্য বিধবাবিবাহ নিষেধের জন্যে রচিত প্রস্তাবে না দেখে রক্ষণশীলেরা বিদ্যাসাগরকে অভিশাপ দিয়েছেন ; বিহারীলাল সরকার লিখেছেনঃ 'কর্মফল অবশ্যসম্ভাবী। একটি মিথ্যা কহিয়া ধর্মমিতার যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরমহাশয় ধর্মবিগর্হিত কার্যের যে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অসীম দাতৃত্বগুণে সে কর্মফল নিশ্চিতই খণ্ডিত হইবে না।' তাই বিহারীলাল সহবাসসম্মতি বিলসম্বন্ধে বলেনঃ 'বিধবাবিবাহ বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি-আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্দুসমাজ সুখী হইয়াছিল।' হিন্দু-সমাজ সুখী হয়নি, বরং আঘাত পেয়েছিলো। বিধবাবিবাহপ্রচলনের সময়ে মানবের কল্যাণের জন্যে সর্বজনীন বুদ্ধি ও যুক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন, বুদ্ধি ও যুক্তির সমর্থনে শাস্ত্রানুসন্ধান করেছিলেন দেশের লোককে আশ্বস্ত করবার জন্যে ; এখানে সর্বজনীন বুদ্ধি ও যুক্তির চেয়ে শাস্ত্রের আনুগত্যই মেনেছেন, শাস্ত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে, শাস্ত্রালোচনা করবার এই বিপর্যয় ও বিপদ। ১৮৬৭ সালে গ্রে-কে লেখা চিঠির মধ্যেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ও তাদের বিশ্বাসের সংস্কারের প্রতি জোর দিয়েছেন, দেশে বাধা আছে, কুসংস্কার এগিয়ে আসবে, কিন্তু যুক্তির সাহায্যে তাকে অতিক্রম করাই যুগন্ধর পুরুষের কর্তব্য। গ্রে-কে চিঠিতে বিদ্যাসাগর যেন বিধবাবিবাহের ব্যর্থতায় দেশের বাধার কাছে নতি স্বীকার করেছেন বঙ্কিমের মতো।

ঃ ১৯৯১, ৭ই ফেব্রুয়ারি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সহবাসসম্মতিসম্বন্ধে সরকারকে যে চিঠি দেন, তা আরো অবৈজ্ঞানিক ও প্রথাগত ; সরকারের প্রস্তাবিত পরি-বর্তন সমর্থন করেন নি তিনি ঃ

Under the circumstance I cannot at present believe in the opinion that there has been sufficient deterioration in the Bengali race within the last 400 years on account of early marriages.

এখানেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ।

ঃ মে মাস থেকে জুলাই ফরাসডাঙা বা চন্দননগরে হাওয়া-বদলের জন্যে গঙ্গাতীরে বাস। পেটের অসুখের জন্যে তাঁর খাদ্য হলো বেলশুঁঠের সঙ্গে বার্লি সেদ্ধ করে সামান্য পরিমাণ আহার। তাঁর অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে : 'আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে। একদিনের জন্যও সুস্থ নই।' ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। চন্দননগরে সঙ্গে আছেন কন্যা হেমলতা ও দুই দৌহিত্র।

এখানেই মেট্রোপলিটানে অধ্যাপকের পদের উমেদারির জন্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেখা করেন। পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসেন।

ঃ ১৬-১৭ মে দুর্গামোহন দাসকে চিঠি দেন তাঁর পুনর্বিবাহের আশীর্বাদ জানিয়ে। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮মে) মেজর ছক্কনলাল সিংহরায়কে লেখা চিঠি ; ছক্কনলাল বিদ্যাসাগরের অন্যতম বন্ধু সারদাপ্রসাদসিংহ রায়ের খুল্লতাত।

ছক্কনলাল চকদিঘির রাজা ছিলেন। ছক্কনলাল সাহায্যপ্রার্থী হলে চিঠি লেখেন ঃ মহেশ বিদ্যারত্ন ফরাসডাঙায় বিদ্যাসাগরের কাছে দুদিন আগে এসেছিলেন।

ঃ ১৯ মার্চ নারী ও শিশুদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ফ্যাক্টরি বিল পাশ হয়।

ঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রিপন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ৩০-এ মে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী পত্র' প্রকাশ হয়; কৃষ্ণকমল ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক, এখানেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার শুরু।

ঃ ২৬ জুলাই, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হয়।

ঃ রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর জুলাই মাসেই এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি-সংগ্রহকার্যের পরিচালক পদে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রলালের যোগ্য শিষ্য হরপ্রসাদ এদিক থেকে এবং প্রাচ্যবিদ্যার অনুসারী।

ঃ ৪ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর শয্যাশায়ী হন, উঠতে পারেন না, ১০ শ্রাবণ পর্যন্ত ভালোমন্দে কাটান, ১১ শ্রাবণ নিশ্বাসপ্রশ্বাসে ভাবান্তর ঘটে, প্রবল জ্বর হয়। ১২ই শ্রাবণ অচৈতন্য অবস্থায় কাটান, পরের দিনও অচৈতন্য অবস্থায় কাটে।

ঃ ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি এগারটায় নাভিশ্বাস ওঠে।

ঃ ১৩ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই রাত্রি ২'১৮ মিনিটে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।

ঃ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত' নারায়ণ বিদ্যারত্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

ঃ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে ১৮৯১, ৩০ জুলাই 'দ্য স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা লিখেছিলো : 'সাগর শুকিয়ে গেছে।' (The Sea is Dry). বিধবাবিবাহ আন্দোলনের হোতারূপেই বিদ্যাসাগরের পরিচয় বাংলাদেশে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় সমাজসংস্কারের একজন অত্যুৎসাহী প্রবক্তাকে হারালো। কয়েক বছর ধরেই বিদগ্ধ এই পণ্ডিত ব্যক্তিগত জীবনে অবসর নিয়ে অস্তায়মান বছরগুলি কাটাচ্ছিলেন শিক্ষার্থী হিশেবে, জনপ্রতিনিধিরূপে নয়। কিন্তু এক সময়ে বাংলায় সবচেয়ে সক্রিয় সমাজসংস্কারক ছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই দিকে তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়েছিলো ও অনুসন্ধান করা হয়েছিলো সর্বদা। জনসাধারণের কাছ থেকে সরে যাবার কারণ হলো তাঁর শিক্ষিত দেশবাসীর অনাগ্রহ ও নৈতিক আশাহীনতায়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর আদর্শে তিনি সনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর দেশবাসীর মধ্যে খুব কম লোককেই দেখা যায় যাঁদের কর্মবিধির সঙ্গে জীবনের উদাহরণের মিল আছে ঃ His retirement from public life was due, he used to say, to his loss of faith in the moral courage and earnestness of his educated countrymen, and yet with this sense of discouragement on him he still remained true to his convictions inspite of much ungenerous misjudgment and at times even persecution, for there have been few of his countrymen who have more earnestly striven to make their example accord with

**their precepts.** জীবন ও আদর্শ বিদ্যাসাগরের কাছে এক, দুয়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি একক। বঙ্কিমের মৃত্যুতে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকা এরকম অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে পারে নি, জীবন ও কর্মের মধ্যে ফাঁক নির্দেশিত হয়েছে সেখানে : Although in his official capacity his marked abilities won the respect and confidence of his superiors, it was not to official work that he devoted the great powers of his mind. His natural bent was towards literature (13 April, 1894) হয়তো 'আনন্দমঠে'র জন্যে বঙ্কিমের ওপর ইংরেজের বিদ্বেষও থাকা স্বাভাবিক। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে 'দ্য স্টেটসম্যান' যে কথা লিখেছিলো, তাতে মুগল ও ইংরেজ রাজত্বে মিত্রপরিবারের যোগের কথাই সপ্রশংসভাবে লেখা হয়েছে, দেশমানুষ ও জাতির সেবায় রাজেন্দ্রলালের অবদানের কোনো উল্লেখ নেই, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হিশেবে রাজেন্দ্রলাল খ্যাত ছিলেন ঠিকই : He (Raja Pitumbar Mitra) was a Commander of three thousand horses and held the rich jagir or heriditary fief of the district of Kurrah in the Doab. The hereditary title Raja Bahrdoor was conferred on him by an imperial sanad which is preserved as an heirloom in the archives of the family. Raja Pitumbar also rendered valuable services to the British Government and was greatly honoured by Warren Hastings and the distinguished hand of British statesman who have made that period memorable in Indian history (July 28, 1891) রাজেন্দ্রলালের মধ্যে এই ধারারই অনুবর্তন লক্ষ করা যায়। সুতরাং বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলালের চরিত্রগত দিক লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত।

—বার্ণিক রায়